এই সংখ্যায় :

সাঈদ সানাউল হকের কবিতা গুচ্ছ/বার

কবিতা লিখেছেন : ফারুক নওয়াজ/দুই, মধুসূদন ঘাটি/দুই, মহসীন খুর্শেদ/তিন, অরুণ কুমার চক্রবর্তী/তিন, তুহিন শংকর চন্দ/এগার, যদুপতি মল্লিক/এগার, অমল দাস/এগার

প্রবন্ধ/আলোচনা খেয়ামাঝি কবি যতীন্দ্রমোহন/অমিতাভ বাগচী/চার, আড়ংঘাটার যুগলকিশোর/ডাঃ স্বপন কুমার গোস্বামী/ছয়, সত্তর দশকের একজন কবি : সাঈদ সানাউল হক/হাসান কামরুল/আট

একটি সাক্ষাৎকার : রমা কথাশিল্পী সাহাদত আলী আনসারির সঙ্গে কিছুক্ষণ ফারুক নওয়াজ/দশ

নিয়মিত বিভাগ : সম্পাদকীয়/এক, পুস্তক সমীক্ষা/চোদ্দ, সংবাদ/ষোল

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

াধূলি

২৩ বর্ষ/১২শ সংখ্যা/পৌষ ১৩৮৮

সম্পাদকীয়

বাঙালীকে কেউ কেউ ঘরকুনো বলে থাকেন ; প্রায়শঃই সেই সমস্ত বক্তার ঘোরাঘুরির সীমানা বাড়ি এবং পাড়ার চায়ের দোকান পর্যন্ত। কিন্তু যাঁরা সময়-সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়েন জেলায় জেলায়, অখ্যাত গ্রামের শালবনের জঙ্গলে—দুর্গম পাহাড়ী পথে—অতলান্ত সমুদ্রের আকুল আহ্বানে—তাঁরা ভারতের সর্বত্র কেন পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে গেলেই দেখতে পান—বাঙালী ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। অষ্ট্রেলিয়া—আমেরিকা—কানাডার কোন এক প্রান্তে কিংবা আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন কোন দেশের গহণ অরণ্যে যদি হঠাৎ শুনতে পান বাংলা ভাষায় কথা বলছে কেউ—তা সে দু'বাংলার যেখানেরই বাসিন্দা হোক না কেন মনটা পুলকে উছলে উঠবে না কি ? ভৌগলিক সীমা রেখার হাল্কা বেড়াটা ঠিক সেই মুহূর্তে হুড়মুড়িয়ে ভেঙ্গে ফেলে আপনি কি আপনার আত্মার আত্মীয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবেন না ?

শীত পড়লেই সুদূর মানস থেকে, সাইবেরিয়ার বরফ-শীতল হিমেল হাওয়ার দেশ থেকে দল বেঁধে উড়ে আসে হাঁসের ঝাঁক কোলকাতায় আর আশেপাশের ঝিলে-জঙ্গলে। শীতের মিঠে রোদ্দুর মেখে বেরিয়ে পড়ুন যে দিকে দু'চোখ যায়—পৌষ ডাক দিচ্ছে—আয় রে চলে আয়।

পৌষের ২৫ তারিখে (১০ই জানুয়ারী ১৯৮১ কোলকাতার ৪৫সি, রাস-বিহারী এভিনিউস্থ দেশবন্ধু মহিলা কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বাংলা কবিতা বিষয়ক পত্রিকা 'একক'এর চল্লিশ বর্ষ পূর্তি উৎসব। বাংলা শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত সকলের পক্ষেই খুবই লজ্জার ব্যাপার—চল্লিশ বর্ষ ব্যাপী শুধুমাত্র কবিতার একটি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা পরিচালনার যে দুঃসাহসীকতা দেখিয়েছেন কবি-অধ্যক্ষ ডঃ শুদ্ধসত্ব বসু, তার প্রকৃত মূল্যায়ণ হয়নি—যোগ্য সম্মান জোটেনি তাঁর। একরকম প্রায় নিরবেই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে চল্লিশ বর্ষ পূর্তি উৎসব।

প্রতি সংখ্যা এক টাকা
বার্ষিক (সডাক) দশ টাকা

। সম্পাদক ।
অশোক চট্টোপাধ্যায়

O সম্পাদকীয় কার্যালয় : নতুনপাড়া । চন্দননগর । হুগলী । পশ্চিমবঙ্গ । ভারত

দূরে থাকা ভালো/ফারুক নওয়াজ

দূরে আছো তুমি এই ভালো বেশ, কাছে আসলেই ভয়,
কাছে আসলেই নষ্ট ইচ্ছা ঝড় তুলে অন্তরে
দূরে থাকলেই মনে হয় আমি পুরোপুরি তুমিময় ;
কাছে এলে তুমি নষ্ট ইচ্ছা মাথা কুঁড়ে কুঁড়ে মরে।

দূরে আছো তুমি তোমার খবর চৈতি বাতাস আনে,
হৃদয়ের চোখে আমি 'অপরূপী' তোমাকে দেখতে পাই।
কাছে আসলেই আমাদের প্রেমে কে যেনো আঘাত হানে ;
'অপয়া' চিন্তা হৃদয়ে জাগায় মনে হয় তুমি নাই।

দূরে থাকো তুমি; দূরে থাকা ভালো, কাছে আসা ভালো নয়
কাছে আসলেই শুরু এই মনে দুষ্টু ঝড়ের পালা—
শপথ-প্রাচীর কেনো যে হঠাৎ ভেঙে-ভেঙে হয় ক্ষয় ;
কাছে এলে তুমি আদিম স্বভাব শরীরে জাগায় জ্বালা।

দূরে থাকা ভালো ; দূরে থেকে হোক আমাদের পরিচয়—
আমরা সত্য, আমরা পূণ্য ; আমরা ঘাতক নয়।

ভালবাসা জানে জল চাঁদ ও পাথর
মধুসূদন ঘাটী

পাথরে পাথরে কথা হলো চুপচাপ
নীল সন্ধ্যায় জলে নামে চাঁদ ভীরু
জানালার ফাঁকে কুমারী দেখেছে সব
চাঁদে ও পাথরে কী মোহময় ভালবাসা।

আঁচলে সবুজ প্রভাতের রাঙা ছবি
কুমারী জাগালো পড়শি এবং সংসার
জল বন্ধনে নিলো বেঁধে প্রিয় চাঁদ
পাথর ব্যথায় গরিমা উজাড় করে
ভারী কান্নায় সরালো বুকের শীতল।
চাঁদে ও পাথরে কথা হলো সারাদিন
কেউ জানলো না কুমারী কিংবা জলও
আবার সন্ধ্যা নীল হয়ে এলো চাঁদ
ঝুপঝুপ করে উঠে গেল নিজ ঘরে
জল ও পাথর এবার জড়ালো ভীরু

ভালবাসা জানে জল চাঁদ ও পাথর।

সমীরকে নিয়ে কয়েক ছত্র/মহসীন মুর্শেদ

সর্বদা অপ্রস্তুত নিজেকে নিয়েই, আপন্ হাতের তালুতে
নাচায় আনন্দ একমুঠো, আর ঠোঁটে অনর্গল
আবৃত্তি করে ওমর খৈয়াম।
অথচ আপন নামটি তার স্বযত্নে লুকিয়ে রাখে
সমীর সরকার।
একাকীত্বে রোরুদ্যমান হয়, ছাখে হতাশা তার
বুকের পাথরে থেকে থেকে দিচ্ছে ঠোকর।

মধ্যরাতে চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবে, কোথায় যাবে?
আছে কি বাহন কোনো এতরাতে!
নাকি অবশেষে নিঃসঙ্গ বিছানা দেখে ঠাঁই
আর ব্রোথেলের স্মৃতিটুকু জাবরকাটা ছাড়া
আছে কি অন্য কোন পথ!
"কিছু পেয়েছো কি" বলে আয়নায় মুখোমুখি
বলো সমীর কি পেলে এই মারাঠা জীবন।

কখনো হেঁটে যেতে যেতে কেমনে মিশে
যায় পথে, ভিড়ে
যেন উদাশ পথচারী আর ভাবনায় স্মৃতি, সারসের
মতো ক্রমশঃ বাড়ায় গ্রীবা, সামনে ভিখিরির হাত
খেয়াল নেই, তখন তৃষ্ণাদীর্ণ চোখে ছাখে
নর্তকীর নাচের মুদ্রায় যেন বা দুঃখের কেলী
বাঁশীওয়ালার ক্লান্ত চোখে জল।

মৃত্যুচিন্তা কখনো করেনি তাকে বিষাদগ্রস্থ
তবু কখনো বিষাদের কুয়াশার মধ্যে ভেসে ওঠ
সবুজ পাসপোর্ট।
প্নের মতো সিঙ্গাপুর, একাকী হোটেলে রাত্রিযাপন
ার বাংলাদেশ দুঃখিনী মায়ের মতো
াছে ডাকে আয় ফিরে আয় আমার বুকে।

নীল দুপুর, নির্জন সাঁতার/অরুণকুমার চক্রবর্তী

এ-কোন গোপন মুদ্রায় তুমি ভেঙে দাও জ্যোৎস্নায়
সাজানো সংসার;
কিছু পাস্‌নি তুই? মনে করে ছাখ্, তোর সাথে মানসিক
দীর্ঘ সহবাস, সর্বাঙ্গে রমণপ্রপাত.........
মনে নেই? মুখোমুখি, আমি তুই, তুই আমি মোহনমগ্নতায়
শব্দের ছুরি দিয়ে নির্জন দুপুরের গায়ে এঁকেছি কবিতা,
তবু তুই নিলি না আমাকে। কেন তুই ফেলে যাস একা
অরণ্যে, পাহাড়ে, সাগরের পাড়ে, দূর থেকে ছুঁড়ে দিস্
ভাঙনের অশ্লীল বিলাস!

কোনোদিন গড়বে না জেনে কেন ভাঙো,
কেন তুমি ভেঙে দাও সব
আমার পাহাড় ভাঙো, প্রিয়তম গাছগুলি ভাঙো,
আমার সাগর ভাঙো, নীল নীল দুপুরের স্মৃতি
তাও ভেঙে দাও
রুপোলী মাছের দেশ, ঘোলাজল নদীটির বুকে
আর কতকাল কেটে যাবো নির্জন সাঁতার......।

খেয়ামাঝি কবি যতীন্দ্রমোহন

অমিতাভ বাগচী

বিগত অষ্টাত্তরের (১৩৭৮) বন্যায় গোটা দেশ প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। সে এক ঐতিহাসিক ধ্বংস। সে বছর শারদীয়ায় দেবীর আগমন বিসর্জন হয়েছিল ভাসমান দশায়। সেই ঘন দুর্যোগ কাটিয়ে জলধারা ক্রমে স্থলভাগের সঙ্গে মিশে শুষ্কতা এনে যখন মনে নিরাপদের আশার সঞ্চার করল, ঠিক সেই সময় জন্মশতবার্ষিকীর আভার উদয় হল। আমাদের মনে প্রাণে পল্লী বাংলার ছোঁওয়া লেগে গেল। বাংলার গ্রাম তখন সঞ্জীবিত হল 'আজি হতে শতবর্ষ পরে কে তুমি আসিছ...... ...সুরে'। ঐ বছরের নভেম্বরে আমরা স্মরণ করলাম পল্লীর রসগ্রাহী কবিকে। তিনি কাব্যজগতে ভাবে সমৃদ্ধ স্বয়ং যতীন্দ্রমোহন বাগচী। তাঁর নাম করে শুভ সার্থকতা অনুভব করি।

আমার মনে পড়ে যায় বারো বছর (১৩৪৮) বয়সের সময়কার কথা। ঐ সময় ছোটদের জন্য একটি দৈনিক সংবাদপত্র ছিল "কিশোর" (খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত) সেই কাগজে দেখলাম প্রচ্ছন্নভাবে ছাপা কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর দেহান্তের সংবাদ। তখনি অবগত হয়েছিলাম আমাদের 'কাজলা দিদি'র কবি চিরবিদায় নিয়েছেন। কারণ, ছেলেবেলায় আমরা পড়েছিলাম তাঁর সেই অবিস্মরণীয় কবিতা—'বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই। মাগো, আমার শোলক বলা কাজলা দিদি কই?' কাজেই বুঝতে আমার দেরী হল না অমন স্বনামখ্যাত কবির কথা। এর আরও পাঁচ বছর পরে ক্রমে গভীর পরিচিতিতে আসি, যখন আমার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার পাঠ্য নির্দ্ধারিত হয় তাঁর "খেয়াডিঙি" কবিতা। অপূর্ব ভাব ব্যঞ্জনার পূর্ণ। পড়লে মনে আপনি ভাব এসে যায়।

বাস্তবিক, কবিতাটি মাধুর্যপূর্ণ। ভাষা যেমন সহজ সুন্দর, ভাবের প্রকরণ তেমনি নয়নাভিরাম। প্রতি স্তবকে আছে জাজ্বল্য ছবি। যেন জীবন্ত প্রাণ। খেয়ামাঝিতে নিজস্ব কত জীবন দীপ রচনা। জীবিকা ও তার রূপ নিয়ে এক বিস্তৃত বর্ণনা। বড় কথা, মাঝির মনোভাব নানা রকমে ব্যক্ত করেছেন। সর্বান্তঃকরণে উপলব্ধি করেছেন মাঝির সমগ্র জীবনটা। হৃদয়ের অনুভূতিটা কোন্ দিকে তাও ভালভাবে দর্শিয়েছেন। কবিতায় আগাগোড়া আপন কথা প্রকাশ করেছেন নিজেকে মাঝি সেজে। এর মধ্যে যে জীবনের বিশিষ্টতা আছে তাও মাঝিদের বুঝিয়েছেন। দৈনিক খেয়াপারে এক ঘেয়েমির মধ্যে নতুনত্বের স্বাদ এনে দিয়েছেন। সেইজন্য গল্পের নানা উপকরণ সংযোগ করা আছে। যাত্রীদের কলগুঞ্জন, রকমারী গল্প আদান প্রদান, গ্রামের চাষবাস বন্যা ফসল নাশ আনুষঙ্গিক লাভ লোকসান ইত্যাদি কত বিষয় নিয়ে আলোচনা। তার মধ্যে মজা মজলিশও বাদ যায় না। প্রতিদিনকার প্রসঙ্গ ভালমন্দ উভয় নিয়ে চলে খেয়ার উপর। মাঝি শুনে শুনে দাঁড় টানে তা' বলে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে না। তবে বৈচিত্র্যের প্রেরণা পায়। যার জন্য বিরামবিহীনভাবে উজান বেয়ে চলে। যাত্রীদের কলতান তার কাছে বাঁশীর সুমিষ্ট সুর। আপন মনে পারাপারের মধ্য থেকে মাঝি আনন্দের রস সঞ্চয় করে। জীবনের ক্লেদ গ্লানি মনে রাখে না তাই গলা সমান জল উঠে গেলে জমির সীমানা বা আলের রেখার কোন হদিসই থাকে না আর লগিরতলা পাওয়া যায় না। হেন প্রতিকূল অবস্থাতেও মাঝি প্রাণোচ্ছ্বাসে

উজান বেয়ে চলেছে। কি সুসময় কি দুঃসময় মাঝির হাল বওয়া ঐ একই ধারায়। প্রতিটি শুবকে কবি এমন চিত্র অঙ্কন করেছেন যে, পাঠকের মনে বোধশক্তি জাগিয়েছেন মাঝিদের মধ্যে সুরসিকতার ভাবনাকে। আরও দেখিয়েছেন, মাঝির দাঁড় টানা অপরিবর্তনীয়। দুনিয়ায় কত কি ঘটছে, কিন্তু মাঝি চিরতরে সমান রয়েছে নিজ কর্তব্য কাজে। এব্যাপারে যতীন্দ্রমোহনের অপূর্ব সৃষ্টি। তাঁর কবিতা টেনিসনের Brooke কবিতার অনুরূপ— "Men may come and men may go/But I go on for ever." ওনার তেমনি একবথায় আছে, "আমি আমার নিয়ম মতন ঘাটের ডিঙা বাই"।

বলতে গেলে যতীন্দ্রমোহন পল্লীদরদী কবি। পল্লীর প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম প্রীতি। সেজন্য কবিতার মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদটা বেশী। যার ফলে গ্রাম্য মাধুর্য্য সহজে অনুভূত হয়। প্রকৃতির সৌন্দর্য রচনায় তাঁর বিশেষত্ব ছিল। প্রকাশভঙ্গী ছিল সাবলীলা সকল মানুষের কাছে ধরা দিয়েছেন সহজ সরল বাঙালী কবিরূপের গ্রাম প্রকৃতি ও মানুষকে একই রসে সিঞ্চিত করেছেন উভয় দিকে আন্তরিক ভালবাসা রেখে। এতে প্রকৃতি প্রেমিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলার নদী মাটি ক্ষেত ফসল এবং শ্যামল বনানী সমস্তর ঘনত্ব ঢেলে সাজিয়ে কাব্যলক্ষ্মী সৃষ্টি করেছেন। সেই সম্পদ আজ পল্লী ছাড়িয়ে শহরে সুবিস্তার লাভ করেছে। পাঠে আমরা পাই পল্লীর সুদৃশ্য ছবি। এবং তারি সঙ্গে হৃদয়ে মধু রস আহরণ করে মনের কোমল আরাম বোধ করি। রোদে গরায় তপ্ত ক্লান্ত, পথিক গাছের ছায়া ও জলাশয় তীরে সুশীতল বাতাসে ক্লান্তি জুড়ানোর মত তাঁর কবিতা।

কাব্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুগামী। তাঁর সমগোত্রীয় ছিলেন করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ। এঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। কাব্যে সর্বাঙ্গীন মিল পাওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আপনজন তুল্য স্নেহ করতেন। এমনকি কবি সমাজে স্বীকৃতি দিয়েছেন যতীন্দ্রমোহন আমার অনুজ শ্রেষ্ঠ। উভয়ের আত্মিক যোগ স্থাপিত হয়েছিল।

তিনি নদীয়ার জামসেরপুরের (বাগচী জামসেরপুর বলে খ্যাত। সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশের সন্তান। সেই জমিদারীপুত্র হয়েও প্রতিপালিত হয়েছেন সাধারণ গৃহস্থের মত। সেই পরিস্থিতিতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর কবিতা লেখা শুরু বিদ্যালয়ে পাঠ্যকালে। উৎস হচ্ছে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্নতা। তারপর থেকে উন্নত শীর্ষে আরোহন করেন। পরিশেষে হলেন কাব্য প্রতিভার সিদ্ধপুরুষ।

বাংলায় গৌরবদীপ্তি রক্ষা করে যতীন্দ্রমোহন বাগচী আজও যুগশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর আবেগময় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি পল্লীকে নির্জনতায় আচ্ছন্ন করেন। তাঁর সে কবিতায় রসমধুর আস্বাদন রয়ে গেছে আমার মনে। একবার স্মরণ করলেই আপনা থেকে ভেসে চলেছে পল্লীর সুদূর প্রসারিত এলাকায়। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ক্ষেত্রে যেন ডুবে রয়েছি। তিনি আমাদের চিত্তে কম ভাবের সৃষ্টি করেননি।

কবি ছাড়া তিনি একজন সঙ্গীত সাধক। কত গান রচনা করেছেন। সুর দিয়ে গান বেঁধেছেন। এবং কাব্যকেও রেখেছেন গানের সুর প্রয়োগ করে। এইভাবে সোনার বাংলা গড়েছেন। বঙ্গমাতার কাছে একান্ত প্রার্থনা করি, যুগে যুগে যেন এমন বরপুত্র দান করেন। তবেই আমাদের দেশে শ্রী বিরাজ করবে। কবি যতীন্দ্রমোহন চিরজীবি থাকুন। তাঁর কাব্যসত্তার সুসঙ্গত কাজে লাগাবার প্রয়াসের মাধ্যমে প্রণাম নিবেদনে ধন্য হই।

আড়ংঘাটার যুগলকিশোর

ডাঃ স্বপনকুমার গোস্বামী

বাঙালী হিন্দুর ঘরের দেবতা, প্রাণের ঠাকুর রাধাকৃষ্ণ নানা বিচিত্র ভঙ্গীতে ও উপকথায় সমাজজীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। সামাজিক মানুষের মতই ঐ গৃহ দেবতার তারা পূজো আচ্চা করে, সুখে দুঃখে দেবতাকেও জড়িয়ে দেয় নিত্য নৈমিত্তিক গৃহকর্মে। কোথাও দেবতা স্বয়ং দলমাদল কামান দেগে শত্রু সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়, কোথাও ডাকাতকে এঁটো পাতা চাপা দিয়ে মারে, কোথাও ঘরের চাল ছাইতে খড় জুগিয়ে দেয়। সারা দেশে সর্বত্রই রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের দেখা মেলে। নদীয়া জেলার চূর্ণী নদীর তীরে যুগলকিশোর বিগ্রহটি মূলতঃ রাধাকৃষ্ণ জাতীয় বিগ্রহ হলেও তার ধ্যানধারনা ও প্রতিষ্ঠা কাহিনীতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন রসের আমদানী দেখা যায়। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে যুগলকিশোর বিগ্রহের দুই সারি পাঁচটি ফুলকাটা খিলান বিশিষ্ট "এত প্রশস্ত দালান মন্দির পশ্চিমবঙ্গে বিরল।" পাঁচ খিলানের মধ্যটিতে শ্রীশ্রী যুগলকিশোরের যুগল মূর্তি। যুগলকিশোর মূর্তির নীচের সারিতে রাসবিহারী ও দুপাশে রাধারাণী মূর্তি। তারও নীচে দুসারি সিঁড়িতে সাজান রয়েছে বহু শালগ্রাম নারায়ণ শিলা। এই মন্দির সংলগ্ন সাধুর কুটিরে ভক্তের দেহান্তর ঘটলে তাঁর পূজিত নারায়ণ শিলা এখানে জমা হয়। নিত্যপূজো করতে অক্ষম দরিদ্র পূজারী অর্থাভাবে গৃহদেবতাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেছেন নিত্যসেবার জন্য। এভাবেই শালগ্রামশিলা ক্রমবর্ধমান। দক্ষিণ দিকে মূর্তি দুটি, যথাক্রমে শ্রীশ্রী গোপীনাথ জিউ ও শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জিউ বিগ্রহের। চতুর্থ খিলান সংলগ্ন মূর্তিটি শ্রীশ্রী কালাচাঁদের। পঞ্চম দ্বারে অবস্থান করছেন শ্যামচাঁদ। মূল দালান মন্দির ছাড়া পাশের আলাদাঘরে বলরাম রেবতী হনুমানজী পূজো পাচ্ছেন। দোতলার কক্ষে পূজিত হন সাবিত্রী, চারহাত বিশিষ্ট নাড়ুগোপাল এবং জলুয়া গোপাল। মন্দিরের অন্যতম মোহান্ত শ্রী-স্বামী অনন্তদাসজী যখন চূর্ণীতে স্নান করছিলেন তখন জলে ভেসে এসে তাঁর কোলে এই গোপাল মূর্তি উপস্থিত হয় তাই এটি জলুয়া গোপাল নামে পরিচিত। সে ১৩৮০ সনের কথা! ভক্তগণ ঘটনার সত্যি মিথ্যে নিয়ে মাথা ঘামায় না।

যুগলকিশোরকে ঘিরে আরো কিছু অলৌকিক ঘটনা রয়েছে। একবার চিঠি দিয়ে একদল ডাকাত যুগলকিশোরের স্বর্ণ অলংকার চুরি করতে আসে। মন্দিরের পিছনের এক ছোট ডোবা বা গর্তে তারা লুকিয়ে থাকে। ঐ গর্তে মন্দিরের অন্তেবাসী আশ্রমিকগণ নৈশাহারের পাতা ফেলত। ঘটনার দিন গর্তে বসে ডাকাতরা অনুভব করে এঁটো পাতা তাদের ওপর ক্রমাগত পড়েই যাচ্ছে, অথচ হিসেব মত ঐ দিন মন্দির এলাকায় জনাদশেক সাধুসন্ন্যাসীর থাকার কথা। শেষে অবস্থা এমন হল যে এঁটোপাতার চাপে তাদের দমবন্ধ হবার যোগাড়। ভয়ে ডাকাতরা রণে ভঙ্গ দেয়। পরদিন খবর নিয়ে দেখে মন্দিরে সেদিন মাত্র পাঁচ জন ভক্ত নৈশাহার করেছিলেন।

মন্দির প্রতিষ্ঠা ও মূর্তি স্থাপনের ইতিহাসেও বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে। গঙ্গারাম দাস নামে নিম্বার্ক সম্প্রদায় ভুক্ত এক সন্ন্যাসী বৃন্দাবনে শ্রীশ্রী গোবিন্দ মন্দিরের মূর্তি দেখে অভিভূত হয়ে তাঁর সেবা করতে গেলে মন্দির

পূজারীর কাছে বাধা পান। মনের দুঃখে প্রভুজীকে আরাধনা করায় তিনি স্বপ্নাদেশে অনুরূপ কিশোর মূর্তি যমুনার জলে পান। প্রাণপ্রিয় ও আকাঙ্খিত কিশোর মূর্তির বিগ্রহটি নিয়ে দেশ পরিভ্রমণ করতে করতে গঙ্গারাম নবদ্বীপের কাছে সমুদ্রগড়ে কিশোর মূর্তি স্থাপন করে মন্দির গড়লেন। কিন্তু বর্গীর হাঙ্গামায় তাঁকে বিগ্রহ সমেত দেশ ছাড়তে হল। শেষে আড়ংঘাটার বর্তমান স্থানে পৌঁছে কিশোর মূর্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিছুকাল পরে গঙ্গারাম স্বপ্নে দেখেন তাঁর কিশোর বিরহে কাতর হয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গৃহে বন্দী কিশোরীকে এনে দিতে আদেশ দিচ্ছে। গঙ্গারামের স্বপ্নাদেশের কথা শুনে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র জানান তাঁর প্রাসাদে সব মূর্তিই রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। কোন বাড়তি শ্রীরাধার বিগ্রহ নেই। অবশেষে নদীয়ারাজও স্বপ্নে প্রাপ্ত আদেশে প্রাসাদের নির্দিষ্ট স্থান খুঁড়ে কিশোরী মূর্তি উদ্ধার করে আড়ংঘাটার কিশোরের সঙ্গে মিলন ঘটান। ১১৫৪ সালের বৈশাখী সংক্রান্তিতে বকুলগাছের তলায় রাজকীয় এই বিবাহ উৎসব হয়। কৃষ্ণচন্দ্র নতুন মন্দির নির্মাণ করে কিশোর কিশোরী মূর্তি স্থাপন করে যুগলকিশোর নামকরণ করেন। সঙ্গে যৌতুক হিসাবে নিত্য সেবার জন্য ১০০ বিঘার লাখেরাজ জমি দান করে সারা জ্যৈষ্ঠমাস ব্যাপী আড়ং বা আনন্দ উৎসবের আয়োজন করেন। সেই থেকে সারা জ্যৈষ্ঠমাস ধরে আড়ংঘাটায় আড়ং বা 'জষ্ঠিমঙ্গলের মেলা' চলে আসছে। জ্যৈষ্ঠমাসে যুগলকিশোর দর্শনে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না এই লোক-বিশ্বাসে এই মেলায় সধবা মহিলাদের সমাগম খুব বেশী। ঐ যুগলের বিয়ের সাক্ষী বকুলগাছটিতে অনেকে মানতের ঢিল বাঁধে। মেলার চরিত্র যথারীতি আর পাঁচটা আধুনিক মেলার মত।

মন্দিরের বর্তমান মোহান্ত (দশম) শ্রীঅনিরুদ্ধ দাস উত্তরপ্রদেশ হতে এসেছেন। তাঁর কাছেই শোনা গেল মন্দিরের ২৫০ বিঘা জমি পূঃ পাকিস্তানে চলে গেছে। বছরে ৩০০০, সরকারী অনুদান মেলে। ছ বছর আগে শেষবার মন্দির সংস্কার হয়েছে। রানাঘাট-গেদে লাইনে গেদে লোকালে আড়ংঘাটা যাওয়া যায়। ষ্টেশনের কাছেই যুগলকিশোর।

সত্তর দশকের একজন কবি ঃ সাঈদ সানাউল হক

হাসান কামরুল

বাংলাদেশের কবিতায় সত্তর দশক উজ্জ্বল স্বকীয়তায় ভরপুর। সত্তর দশকের কবিতা প্রেমিকদের ভূমিকা অন্যান্য দশকের তুলনায় অনেক বেশী। তবে এটাও স্বীকার্য যে; এই দশকের অনেক কবিই রাজধানীতে বসেই কাব্যচর্চা করছেন, যার দরুণ অল্প সময়েই লেখা প্রকাশের ফলে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

'রাজধানী ভিত্তিক সাহিত্য' কথাটা নূতন নয়, বহু আগে থেকেই ব্যবহার হয়ে আসছে। কিন্তু বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিকরা অনেকেই রাজধানী থেকে দূরে থেকেও উল্লেখ্য প্রতিনিধিত্ব করছেন। বিশেষ করে খুলনা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী বিভাগীয় শহরগুলো থেকে তরুণরা সমানে লিখে চলেছেন—গড়ে তুলেছেন সংগঠন।

সাঈদ সানাউল হকও খুলনা বিভাগীয় শহরের একজন বিশিষ্ট কবি-প্রতিনিধি। দেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মারফতে তিনি পাঠকদের কাছে পরিচিত।

সত্তর দশকের প্রথম থেকে লিখলেও মাঝামাঝি সময়ই তাঁর উৎকর্ষতা ঘটেছে। সাঈদের সাহিত্য জীবন শুরু ছোটগল্প থেকে। কিন্তু কবিতা রচনাতেই সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন।

সাঈদ সানাউল হক যদিও সত্তর দশকের অন্যান্য কবিদের তুলনায় লেখা প্রকাশের ব্যাপারে অগ্রগামী নন। কিন্তু তার কবিতার গুণগত দিকটাই পাঠক সম্প্রদায়কে ভালো লাগে। সাঈদের সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে তার সব কবিতাতেই একটা প্রতিজ্ঞা-প্রার্থনা রয়েছে।

অনেকে সাঈদকে 'হতাশাগ্রস্ত' বলে সমালোচনা করেছে। এটা কতোটা সত্য তা' যাচাই-এর ব্যাপার তবে এটা স্পষ্ট যে, সানাউলের কবিতাগুলো মন দিয়ে পড়লে সমালোচকদের ভুল ভাঙবে একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। সাঈদের কবিতায় হতাশা এসেছে ঠিকই তবে প্রতিজ্ঞা বা প্রার্থনায় কবিতার ইতি টেনেছেন।

নীচে ক'টি উদাহরণ দেওয়া গেলো :

"দগ্ধ ঘায়ের মতো টুকরো টুকরো দহন নিয়ে
বলুন কতো দিন পথ চলা যায়, বাঁচা যায়
কতোদিন সর্পিনীর ছোবল এড়িয়ে থাকা যায়?
আমি অবসান চাই, অবসান চাই' সমস্ত সন্দেহের"
—সন্দেহের অবসান চাই/জনবার্তা

'..............................

এ ভুল, ভুল থেকে আমাদের ফিরে আসতে হবে
প্রত্যাবর্তন না হলে ঐতিহ্য তলিয়ে যাবে চিরতরে
প্রত্যাবর্তন চাই, প্রত্যাবর্তন হোক, প্রত্যাবর্তন-প্রত্যাবর্তন
—প্রত্যাবর্তন/

প্রতারিত জীবনের দুঃখ শয্যায় কতোদিন
আমি শান্তি নামক অদৃশ্য রমণী খুঁজেছি
....

তুমি বলে দাও কোন পদার্থে খুঁজবো তোমায়"

—কতো আর খুঁজে খুঁজে/আজাদ

সাঈদের উপরোক্ত কবিতাগুলোয় প্রার্থনা প্রাধান্য পেয়েছে। তাছাড়া সাঈদ সানার কবিতায় সামাজিক পরিস্থিতিটা উজ্জ্বলভাবে ধরা পড়ে। যেমন—

মেঘের নীলিমায় জ্বলে হিজল চিতা
পুড়ে যাচ্ছে ফসলী জমি"

—নূতন 'ক এক যন্ত্রণা/জনবার্তা

যদি কেউ কবিতাটাকে হতাশা বলে চিহ্নিত করেন তবে এটাই বোঝায় যে আলোচক বিজ্ঞ নন্।

খুলনার তরুণ কবি সাঈদ সানাউল হকের মুখোমুখী হলাম এক সুন্দর বিকেলে। পেয়ে গেলাম নিউ মার্কেটের দোতলায় ষ্ট্যাণ্ডার্ডার পাবলিশার্সে। নীচে প্রশ্ন-উত্তর গুলি তুলে দিচ্ছি।

প্রশ্ন : কবিতা কেনো লেখেন ?

উত্তর : কবিতার জন্য—জীবনের জন্য—মানুষের জন্য।

প্রশ্ন : কবিতার শিল্প মূল্য বলতে কি বোঝেন ?

উত্তর : অন্যান্য শিল্পের মতো কবিতারও সংগা আছে ; আছে বৈশিষ্ট্য। এইসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিচারকে শিল্প মূল্য বলে।

প্রশ্ন : আপনার কবিতার শিল্প মূল্য কতোটুকু ?

উত্তর : কবিতা যখোন লিখি—এর শিল্প মূল্য নিশ্চয় আছে। তবে সবটায় সমানভাবে নেই।

প্রশ্ন : সত্তর দশকের কোন কোন কবির কবিতা আপনার ভালোলাগে ?

উত্তর : বেশ কয়েকজনের কবিতা ভাললাগে তবে রুদ্র মুহম্মদ, শহীদুল্লাহ ও ফারুক নওয়াজের কবিতাই অনেকবার পড়ি।

প্রশ্ন : খুলনার তরুণ কবিদের সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করুন ?

উত্তর : এঁদের সম্পর্কে আমি আশাবাদী। এঁরা পিছিয়ে নেই।

বিভিন্ন কথা প্রসংগে সাঈদের অন্যান্য দিক সম্পর্কেও জানতে পারলাম। খুলনা শহরের সাহিত্য সংস্কৃতি আন্দোলনের প্রথম সারির কর্মী তিনি। খুলনা ছড়া সংসদের প্রথম সহ-সভাপতি ও অনুশীলন কবি গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক। ছাত্র জীবনে বি. এল. বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের কবি গোষ্ঠীর সম্পাদক ও পরে সভাপতি ছিলেন। সাঈদ বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করছেন।

রম্য কথাশিল্পী সাহাদত আলী আনসারীর সাথে কিছুক্ষণ

ফারুক নওয়াজ

তখন কেবল সূর্য উঁকি দিয়েছে। শীতের শির্ শির্ শরীর কাঁপানো বাতাস। রবিবারের এমন এক সময়ে পূর্বের দেওয়া কথামতো উপস্থিত হলাম আনসারী সাহেবের বাসায়। উনি শিক্ষক ও চিকিৎসক। পশ্চিম বঙ্গ থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী ও বাংলা ভাষা ও কৃষ্টিতে মাষ্টার ডিগ্রী নেন। এছাড়া একজন নামকরা হোমিওলজিষ্ট। যশোর হোমিও মেডিকেল কলেজের প্রফেসর। যশোর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্মিলিনী ইনিষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক হিসাবেও তিনি সবার শ্রদ্ধার পাত্র।

মুহম্মদ সাহাদত আলী আনসারীর অন্য পরিচয় একজন সুরসিক রম্য সাহিত্যিক। অমায়িক এবং সরলতার জন্য সবার প্রিয়। প্রায় কয়েক যুগ ধরে বাংলাদেশের বিখ্যাত পত্র পত্রিকায় রম্য-গল্প, প্রবন্ধ এবং শরীর ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিবন্ধ লিখে আসছেন, তবে দেশের প্রথম সারির রম্য কথা শিল্পীদের মধ্যে তিনি একজন।

তাঁর বিখ্যাত রম্যগ্রন্থ—'শ্রীমতীর রণভঙ্গ' বের করেছে মুক্ত ধারা প্রকাশনী, প্রচুর সুনাম কুড়িয়েছে এই রসপূর্ণ বইটি।

হোমিওপ্যাথিক ও যোগ ব্যায়াম সম্পর্কে কয়েকটি বই বাজারে আছে। আরো ক'টা প্রকাশের পথে। কথা প্রসঙ্গে কিছু কিছু প্রশ্ন করলাম আনসারী সাহেবকে। তার উত্তর ও যথাযথ পেলাম—

প্রশ্ন: রম্য ও রস সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য কতোটা?

উত্তর: তেমন কোনো তফাৎ নেই। তবে, এটা বলা যায় যে, রম্য হচ্ছে হাল্কা এবং নাটকীয় হাস্যরসে ভরপুর এবং রসসাহিত্য কিছুটা। গভীর বক্তব্যে প্রকাশ।

প্রশ্ন: আপনার 'রম্য সাহিত্য' গুলি কি রকম পরিবেশ এবং পরিস্থিতির কথা উল্লেখিত?

উত্তর: আমি সমাজের বিভিন্ন ছোটো খাটো ঘটনা যা, অনেকের চোখে ধরা পড়েনা। সেই সব

ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখি। তবে, সমাজের এক শ্রেণীর কুটিল মানুষের স্বভাব-চক্রান্তকেই বেশী আশ্রয় দিই এবং তার সমধান ও দিয়ে দিতে চেষ্টা করি।

প্রশ্ন : আমাদের দেশের রম্য সাহিত্যর ভবিষ্যৎ কি

উত্তর : রম্য রচনা সৃষ্টি তখনই সম্ভব। যখোন দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক। মানুষ অভাব থেকে যখোন দূরে থাকে। এদিক থেকে এদেশ সম্পূর্ণ 'রম্য সাহিত্য কর্মের অনুপোযোগী। তবে এটা স্বীকার্য যে' শক্তিশালী রম্য সাহিত্যিক এদেশে আছেন। এবং সময় অনুকূলে আসলে রম্য সাহিত্যের ভবিষ্যত উজ্জল হবে।

আর বেশীক্ষণ বসিনি, মিষ্টি মুখ করেই চলে এলাম। যতোটুকু সময় ছিলাম তার ভেতরেই তার জীবনের অনেক আনন্দ বেদনা মিশ্রিত ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত হলাম, তবে তার সব কথার ভেতরে এটাই বেশী উচ্চারিত হলো সাহিত্য জীবনের ভেতর থেকে, হৃদয়ের ভেতর থেকে আসে একে ফুটিয়ে তোলার জন্য আবার চাই সুন্দর নিরাপত্তাময় ও সুখী সমাজ ব্যবস্থা—পৃষ্ঠপোষকতা।

উদাসীন/তুহিনশংকর চন্দ

চলন্ত মানুষ এখন নিজের ছায়াকেও ভয় পায়,
কুয়াশা,
স্ফটিক,
আতর কিম্বা স্তনের ঘ্রাণ
সবকিছু পুরানো ইদানীং।

আসলে মানুষের চারপাশে
মানুষ কতখানি বদলে গেছে
নিজেই জানে না।

স্বপ্নের সাদা হাঁস/যদুপতি মল্লিক

আকাশের বুকে সাদা হাঁস
আমি আকাশে প্রতিদিন সাদা হাঁস খুঁজি।
আমি আকাশ দেখি স্বপ্নে হাঁসও দেখি
কিন্তু আকাশে একটিও হাঁস উড়তে দেখি না।
তবে কি এখন আকাশে কোন সাদা হাঁস নেই
শুধু ঝাঁক ঝাঁক কালো হাঁস ইতস্ততঃ এদিক সেদিক
আকাশকে কালো করে পাখা মেলে দিয়েছে।
আমি স্বপ্নের হাঁস সাদা হাঁস প্রতিদিন আকাশে খুঁজি।

শুধু কংকাল/অমল দাস

একটা বটবৃক্ষের লালন নিয়ে
সে ছিল অসম্ভব স্থির
সত্যের আকার ছিলনা বলে
অভ্যাসে ঋজু মৈনাক।

তারপর অবাধ বিস্ময়ের সেই সব
ছেলে খেলা
পড়ে আছে ঘরের হাঘরে—
কাঠের ঘোড়ার মত পা ভেঙ্গে
পায়েরই কাছে।

মানুষ আবাস চায়
বলিষ্ঠ সংক্রমণ নিয়ে
কিন্তু দৃশ্যপটে
পাঠানের অতীত কংকাল।

এই ভাবে চলে যায়
বালখিল্য টান টান বোধ।
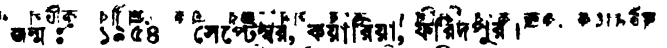
বোধ ভিন্নতর

অসুস্থ মস্তিষ্কে আমার বোধ ভিন্নতর
হৃদয়ের সমস্ত মাংস পাজরে অনুভব করি
কমলালেবু রং ঘাস ফড়িং এর জীবন পাবনা আমি
কস্মিন কালেও মৌমাছিরা চাক বাধবে না আমার উদ্যানে
এ আমার অসুস্থ বোধ-এ আমার অন্তরঙ্গ অনুভব।

লাইন চ্যুত রেলের বগির মতো ছিটকে পড়েছি আমি
এখানে ক্রেন আসবে না আসার কোন পথ নেই
প্রাকৃতিক সংঘাতে ধুকে ধুকে মরতে হবে এখানেই
মাটি থেকে জন্ম সবার মাটিতেই মিশতে হবে।

নির্জনতায় থাকাই ভালো জনতার সংসারে জ্বালা
কেবলই মিথ্যা-ব্যভিচার সুস্থ মানুষ সহ্য করবে
কি করে অসুস্থ আমি এও ভালো
বিচ্ছিন্ন থাকা-হলুদ পাখীর মতো, সাজানো ময়নার মতো
অলংকার আবৃত নারীর রমন সুখে সংসারী হওয়া
এ জীবন হবেনা – এ জীবন চাই না আমি।

তবু বাঁচার তাগিদে আমি ফুটাই ফুল
সবাইকে হাসতে হয়—হাসতে হয় দাঁত মেলে
অথচ অভ্যন্তরে শোকার্ত চোখে দেখে না কেউ
আমার বন্ধুরা শোন—এ আমার বেতার ঘোষণা
আমি নিহত উল্কা— পৃথিবীর গর্ভে বিনষ্ট
শিশু আমি ভ্রুণের মতো নষ্ট হয়ে গেছি
কোনদিন সুস্থ হয়ে উঠবো না
সূর্যে সূর্যে যতোদিন বেঁচে থাকবো মনে হয়
এ অসুস্থতা নিয়ে বাঁচতে হবে—সম্পন্ন
সুস্থতা ফিরে আসবে না—এ আমার ভিন্নতর বোধ।

পুস্তক সমীক্ষা

চণ্ডালের খড়ম/বঙ্কিম চক্রবর্তী/মহাপৃথিবী/হাওড়া-১

কবি বঙ্কিম চক্রবর্তী'র সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ 'চণ্ডালের খড়ম' বইটি হাতে পেলাম। এযাবৎ কবির পূর্বের কোন কাব্যকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভের সুযোগ আমার ঘটেনি। তথাপি বইটি হাতে পাবার পর কবির বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গী ও ঋজু উচ্চারণ কয়েকটি ক্ষেত্রে বাংলা কবিতার পাঠককুলকে অবশ্যই আমূল ভিন্ন অভিজ্ঞতায় নাড়া দেবে এ আমার বিশ্বাস। কেননা শব্দচয়ন, উপমার সুচিন্তিত প্রয়োগ এবং সর্বোপরি অনুভূতির সুগভীর ব্যঞ্জনা পাঠকমাত্রেই অনুভব করবেন তাঁর কবিতায়। যা কিনা নিয়তই পরিবর্তনশীল। এই গ্রন্থের এক জায়গায় কবি যখন বলেন,

"সমস্ত বন্ধন তুমি শেষ করেছো মানুষ দিয়ে" অথবা

"তার নবীন কান্নার ভিতর অনাদিকালের সন্তান"

তখনই বুঝতে পারি এই কবি কবিতায় কোন স্থির সিদ্ধান্তে বিশ্বাসী নন কিন্তু স্টাইলে। নিরন্তর দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে অবিরত জীবনসম্পর্কীয় সৎ ও সত্যনিষ্ঠ উচ্চারণই যদি ভালো কবিতার একমাত্র লক্ষ্য হয়; তবে সেই অমোঘ লক্ষ্যের প্রতি তিনি স্থির প্রজ্ঞায় অটল। বিভিন্ন সূক্ষ্ম ও ব্যপ্ত ভাবনার ধারাবাহিকতায় কখনো যন্ত্রণায়, কখনো ক্ষোভে, আবার কখনোবা আর্তনাদের ভঙ্গীতে তিনি সততই তাঁর পাঠককুলকে নিয়ে যান নিত্যনতুন অনুভবে। তবে একটা বিষয় যা কবির সমস্ত গ্রন্থের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে তা হল পরিশীলিত শব্দ ও শব্দবন্ধের প্রতি তাঁর অপত্য মমতা। যা হয়ত অনেকক্ষেত্রেই কবিতার দর্শনে ব্যাঘাত না ঘটালেও শব্দের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার বিরূপ হয়ে থাকে। যেমন,

"প্রতিমার ভেজা চোখ তবু যেন নিরঞ্জনে মূর্ত হয়ে ওঠে"

তথাপি আঙ্গিকের প্রশ্নে 'পাপ', 'জন্মভিটে', 'চিরসখাকে নিয়ে ছ'ছত্র জার্নাল' ইত্যাদি কবিতার চমৎকার কিছু কিছু চিত্রধর্মীতার ছাপ এই সংকলনে সুস্পষ্ট। যথারীতি সমগ্র কাব্যগ্রন্থটির মুদ্রণ ও কবিতাচয়ন আন্তরিক। শিল্পী সুবোধ দাশগুপ্তের প্রচ্ছদঅঙ্কনও অবশ্যই আকর্ষণীয়।

সম্মোহন চট্টোপাধ্যায়

তেজস্ক্রিয় ঘেরাটোপ— রবীন সুর—অরণি প্রকাশনি, ভাটপাড়া। দাম— ছ টাকা

অম্বিষ্ট অভিজ্ঞতা ও অভীষ্ট সংকল্পের সংমিশ্রণ যেমন কবির সশ্রম চেতনার দুরূহ প্রয়াসের প্রকারভেদ, তেমনই আত্মবিজ্ঞাপনের গরোজকে কাব্যচর্চার অঙ্গীভূত করা বোধ করি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুলভ করতালি লিপ্সার নামান্তর। বস্তুত আত্মসন্ধানী ও সচেতন কবির বিষয় আশ্রয়ের আধিক্যবর্জন এটাই প্রমাণ করে যে, বস্তুর বিলাস বাহুল্য অনেক ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট জীবনবীক্ষার পরিপোষক নয় এবং তাতে কবিতা ও প্রাচীর পত্রের ব্যবধান দুরীভূত হতে বাধ্য; কিন্তু তাকেই বিশুদ্ধ রীতিবাদের ছত্রাশ্রয়গ্রাহী হিসাবে চিহ্নিত করা মনে হয় যুক্তিযুক্ত হবে না; আধুনিক কবিতার দুরূহ অনুষঙ্গজনিত,

দুর্বোধ্যতার প্রশ্নও এ সূত্রেই বিবেচ্য হওয়া স্বাভাবিক। রবীনসুরের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'তেজস্ক্রিয় ঘেরাটোপ' হাতে নিয়ে এহেন একটা ধারণায় মুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে; কারণ দীর্ঘদিনের কাব্যচর্চার ফলশ্রুতি হিসাবে কবিতার কলা-কৌশলের অভিনবত্ব কবির নখদর্পণে, উপরন্তু সততা ও পরিশ্রমের মূল্যপ্রাপ্তি অবশ্যই কবিকে অন্তত এ স্বীকৃতি এনে দেবে যে, কাব্যচর্চায় সচেতন অভিনিবেশ যেমন ক্রমশ উপলব্ধি ও উদ্দেশ্যের রূপান্তর ঘটায় তেমনই সাধেয় আধারেও। তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'রাবণের সিঁড়ি' থেকে তিন বছরের সময়কালে রচিত আটত্রিশটি কবিতা সমন্বিত 'তেজস্ক্রিয় ঘেরাটোপ'-এ এসে কবি যে অধিক মাত্রায় বিবর্তিত, তা বিশেষ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেন। কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ পাঠ করে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাতে তাঁকে বক্তব্য প্রধান কবি হিসাবে চিহ্নিত করাই সমীচীন কিন্তু সে বক্তব্য কখনই নিরাভরণ নয়, অবশ্যই শিল্পের মোড়কে আচ্ছাদিত। আর এই চতুর্থ কাব্যগ্রন্থে কবিকে আবিষ্কার করলাম সম্পূর্ণ নতুনভাবে। সেটাই স্বাভাবিক, অন্তত সৎকবির ক্ষেত্রে। ফলে যে কবি একদিন লিখেছিলেন, 'অসুস্থ সংগ্রাম ছেড়ে শুদ্ধবোধ জাগ্রত চেতনে/কোন ধ্রুব রাষ্ট্রের উত্থান করে/মানবিক বিকাশের পথগুলি করে দেবে নাগাল সম্ভব' [কেবল শিশুরা আছে—রাবণের সিঁড়ি] কিম্বা 'জন্মান্তর নেই জেনে আমি এই জন্মের উপহার/হেলাফেলায় নষ্ট করে দিতে চাইনা অথচ/নাগালসম্ভব সামগ্রী মাত্রেই দুহাতে তাওড়ে জড়াতে চাইনা।' [জীবন—ঐ], তাঁকেই আবার নতুন করে বলতে শুনি 'শুঁয়াপোকার বিষ মাখানো ক্রোধ/কোথায় থাকে যখন প্রজাপতি ?/ভূত ঢুকেছে সর্ষে ফুঁড়ে তাবিজে প্রতিরোধ ?/ঝড়তো ওঠে, পোড়োবাড়ীর ঘোচেনা দুর্গতি। [অসংগতি—তেজস্ক্রিয় ঘেরাটোপ] অথবা 'জানলা খুলে যা দ্যাখো তাই সত্যি নাকি ?/কেমন আছো ? ভালই বলি/হাঁটার মত পথ দেখিনা কেন যে তবে চলি ?/মরার পর মানুষ শুধু খোঁজ রাখে না জীবন কত বাকি। [এখন কেমন ঐ]

বিবর্তন যেমন উপলব্ধিতে, তেমনি ব্যক্ত করার কৌশলেও। তুলনামূলক আলোচনা এ স্বল্প পরিসরে সম্ভবনা, আমার অভীষ্টও নয়, শুধু এটুকু বলতে পারি কবির অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি ক্রমশই তাঁর জীবনদর্পণকে গভীর থেকে গভীরতর করে তুলেছে। দেশ কাল-পাত্রের বিবর্তন তাঁর কাছে বেদনাদায়ক, যার শীর্ষ থেকে জন্ম নিয়েছে কবির সংশয় আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব। আটত্রিশটি কবিতার মধ্যে বেশীরভাগই পদ্য ছন্দে লেখা এবং দুটি দীর্ঘ কবিতাকেও কবি এই সংকলনে স্থান দিয়েছেন, ডোমজুড় : ১৯৭৮ ও পিনকোড : ৭০০০৭৩) তবে এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত অন্তত এমন কিছু মূল্যবান কবিতার সঙ্গে আমার পরিচিতি ঘটেছে, যা এখানে পরিবেশিত হলে সংকলনটির মান বৃদ্ধিপেত বলে মনে হয়। অবশ্য সেটা সম্পূর্ণরূপে কবির ইচ্ছা ও রুচির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু শব্দ ও ছন্দের ব্যবহারে কবির অধিক সতর্কতার প্রয়োজন আছে অন্ততঃ তাতে পাঠকের লাভবান হবার সম্ভাবনা বেশী। বিশেষত কতকগুলি দেশী ও বিদেশী শব্দের বহুল ব্যবহার কবির ব্যবহারে নিজস্বতার তাৎপর্য খুইয়েছে উপরন্তু ছন্দের ব্যবহারের মাত্রা অনেকক্ষেত্রেই পাঠকের ক্লান্তির কারণ হতে পারে। বইটির ছাপা ও বাঁধাই আশানুরূপ। প্রচ্ছদ অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ তবে প্রচ্ছদশিল্পির নামোল্লেখ বাঞ্ছনীয় ছিল।

উশীনর চট্টোপাধ্যায়

সংবাদ

বাংলার মহান সুফী ও ফার্সী কবি হজরত ওয়সী পীর কেবলার স্মরণ সভা

গত ৬ই ডিসেম্বর (২০শে অগ্রহায়ণ) '৮১, রবিবার বাংলার শ্রেষ্ঠ সুফী, সাধক ও ফার্সী ভাষার বাঙালী মহা কবি হজরত ফতেহ আলী ওয়সী পীর কেবলার স্মরণ সভা কলিকাতা মানিকতলা ২৪।১ মুনশীপাড়া লেনস্থ মাজার সংলগ্ন মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। উক্ত সভায় হজরত ওয়সী পীর কেবলার জীবন দর্শন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভাপতি আলহাজ হজরত পীর মওলানা জয়নুল আবেদিন আখ্‌তারী সাহেব তাঁর ভাষণে বলেন, তিনি শুধু পীর ছিলেন না, তিনি একজন অতি উচ্চ শ্রেণীর ফার্সী কবি ছিলেন। তিনি এত উচ্চ মানের ফার্সী কবিতা রচনা করেছেন, যা পারস্যের হাফেজ, জামী সাদী ফেরদৌসীর কবিতাকে ও ম্লান করে দিয়েছে। দিওয়ানে ওয়সী ১৭৯টি গজল ও ২৩টি কাসিদা সমন্বিত তাঁর অমর অবদান। এই দিওয়ানটিকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করার জন্য তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় ডক্টর হীরালাল চোপ্‌রার ও ডেপুটী স্পীকার জনাব কলিমুদ্দিন সাম্‌স-এর শুভেচ্ছা বাণী পড়ে শোনান হয়। ডক্টর চোপ্‌রা তাঁর শুভেচ্ছা বাণীতে বলেন, সুফীরা আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যে একটি সেতু। তাঁরা যুগে যুগে পৃথিবীতে এসেছেন কোন একটি জাতির জন্য নয় সকল মানুষের স্বার্থে। ঐ দিন হজরত ওয়সী পীরের উপরে একটি প্রদর্শনীও হয়। প্রদর্শনীতে তাঁর পীর এবং ৩৫ জন খলিফার অধিকাংশের মাজারের ফটো ও তার উপরে লিখিত বিভিন্ন প্রায় ৩৫টি পত্র পত্রিকা দেখান হয়। সভাতে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের এ্যাডভোকেট জনাব আব্দুস সালাম সাহেব, মনোজ রায়, সেখ আহম্মদ আলী, সেখ আনোয়ার আলী, সেখ বাউজুল হোসেন, মোঃ কমরুদ্দিন আহমাদ, মওলান গোলাম মহিউদ্দিন জিলানী, মওলান মহিউদ্দিন সাহেব এবং শাহজালাল পীর কেবলার সন্তান সন্ততিও আরও অনেকে বক্তৃতা করেন, দেশের বিভিন্ন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁর অগণিত ভক্তরা উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর সমাধি ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা জানাতে। উক্ত সভাটি ওয়সী মেমোরিয়াল এ্যাসোশিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত হয়।

লোক কবি শ্রীনিবারণ পণ্ডিতকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন

লোক কবি শ্রীনিবারণ পণ্ডিতকে কোচবিহারে তাঁর ডাওয়াগুড়ি কলের পার গ্রামের বাসভবনে রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে ১৫ আগষ্ট এক সম্বর্ধনা জানান হয়। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পরিবহন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী সম্বর্ধনা জানান। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে শ্রীপণ্ডিতকে নগদ ২৭০১ টাকা এবং একটি তাম্রফলক দিয়ে সম্মান জানান হয়। সম্বধান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীআইনুদ্দিন মিঞা। লোক সংস্কৃতি পরিষদের সুপারিশক্রমে এই সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয় এবং পর্ষদের পক্ষ থেকে শ্রীদিলীপ সেনগুপ্ত, শ্রীশিবপদ ভৌমিক প্রমুখ সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

হরিপালে সাহিত্যের আসর

হরিপালের খামারচণ্ডীগ্রামে গল্পকার অরুণ সরকারের বাড়িতে ৬ই ডিসেম্বর দুপুরে বসেছিল এক গল্প-কবিতা-গান ও আলোচনার আসর। ঋষিণ মিত্র তাঁর কবিতার গানে গানে জমিয়ে তুলেছিলেন পরিবেশ। গল্প-কবিতা ও আলোচনায় ঐদিনের অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন অমর ঘোষ, গৌর বৈরাগী, অমল দাস, সনৎ মান্না, চিন্ন মিত্র, অজিত ভড়, দ্বিজেন আচার্য্য, শ্যামলকান্তি মজুমদার ও অরুণ চক্রবর্ত্তী।

অমলেন্দু কর্মকারের চিত্রপ্রদর্শনী

চন্দননগরের সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠান 'লেখনী' ডিসেম্বরের ২০ থেকে ২২ তিনদিনব্যাপী শিল্পী অমলেন্দু কর্মকারের জলরঙে আঁকা ছবির এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন চন্দননগরের ফরাসী ইন্সটিটিউটে।

গঙ্গার ধারে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত এই প্রদর্শনী দেখতে প্রতিদিনই প্রচুর জন সমাগম হয়েছিল।

ত্রিসপ্তকের বার্ষিক অনুষ্ঠান

প্রতি বছরের মতো এবারেও ১৩ই ডিসেম্বর 'ত্রিসপ্তক' আয়োজিত কবিতা পাঠ, আলোচনা, কবিতার গানের আসর বসেছিল ১৪/১ বি, বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটে।

বিভিন্ন জেলা থেকে দলে দলে এসেছিলেন কবিরা। কোলকাতার কবিরাতো ছিলেনই। উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে ছিলেন—অমিতাভ দাশগুপ্ত, অজিত বাইরী, শম্ভু রক্ষিত, অভিজিৎ ঘোষ, আরতি দত্ত, কেদার ভাদুড়ী, বঙ্কিম চক্রবর্ত্তী, সমীর মণ্ডল, অরুণ চক্রবর্ত্তী, অমর ঘোষ প্রমুখ।

এই উপলক্ষ্যে একটি পত্র-পত্রিকা ও কাব্যগ্রন্থের প্রদর্শনীরও আয়োজন করেছিলেন ঋষিণ মিত্র।

শব্দবর্ণে শিল্প সংস্কৃতির দুপুর

কবি অরুণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী চন্দননগরের শুকসনাতনতলায়। তাঁরই বাড়ির পেছনের ছায়াঘন বাগানে ২০শে ডিসেম্বর দুপুর একটা থেকে এক মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে শুরু হোল শিল্প-সংস্কৃতির দুপুর। ঋষিণ মিত্র, সুভাষ চক্রবর্ত্তীর গানে, মৃদুল দাশগুপ্ত, অশোক চট্টোপাধ্যায়, সনৎ মান্না, অরুণ চক্রবর্ত্তী, নির্মল বসাক, ডলি দত্ত, অমল দাস, বীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায়, সমীর মণ্ডল, অমর ঘোষ, দীপক্ রায় চৌধুরী প্রমুখের কবিতায়—গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় অমিতাভ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিতে আবৃত্তিতে এবং সর্বশেষ কমলকান্তি মজুমদারের পরিচালনায় 'ছড়ার হট্টমেলা' যার ভাষ্যকার ছিলেন তরুণ সাংবাদিক সমীরণ মুখোপাধ্যায় আর ছড়া বলেছে কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—সকল দর্শক-শ্রোতাদের মন ভরিয়েছে।

শিল্প সংস্কৃতির দুপুর শেষ হতে হতে শীতের বেলা গড়িয়ে গড়িয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে পড়ল।

এই সংখ্যায় লিখেছেন :

প্রবন্ধ : উশীনর চট্টোপাধ্যায়/ছই, কৃষ্ণসাধন নন্দী/তের

কবিতা : অমল দাস/সাত, সনৎ মান্না/সাত, বিশ্বনাথ গরাই/সাত, রাবেয়া রুস্তম/আট, নয়ন কুমার রায়/আট, রথীন্দ্রনাথ রায়/আট, অরুণ কুমার চক্রবর্তী/নয়, রাণা সিদ্দিক/নয়, মুহম্মদ জাকারিয়া/নয়, মোহাম্মদ মনির হোসেন/দশ, কবীর জাহাঙ্গীর/দশ, সুকুমার চৌধুরী/এগার, অসীম চট্টোপাধ্যায়/এগার, সুকুমার সেনাপতি/বার, কামাখ্যা সরকার/বার, শীতল চৌধুরী/বার

এছাড়া নিয়মিত বিভাগ :

প্রসঙ্গ : গোধূলি-মন/পনের, সংবাদ/ষোল

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়

২১শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যা ১৯৮২

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি মন

২৪ বর্ষ/২য় সংখ্যা/ ফাল্গুন ১৩৮৮

প্রতি সংখ্যা এক টাকা
বার্ষিক (সডাক) দশ টাকা

সম্পাদকীয়

একুশ মানে কি শুধু উৎসব, গান ?
একুশ কি শুধু বুকভরা অভিমান ?
একুশ মায়ের চোখের জলেতে রাঙা
একুশ মানেই বাঙালীর বুক ভাঙা।

প্রতি একুশেই নতুন শপথ নেওয়া
জাগুক বাঙালী, নতুন বহ্নি জ্বালা
প্রাণেতে আসুক শুদ্ধতা ভরা দীপ্তি
একুশে গভীর দুঃখ সাগরে মুক্তি।

আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলতে পারি ?

॥ সম্পাদক ॥
অশোক চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় কার্যালয় : নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর ॥ হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥ ভারত

কবিতার পাঠক ও পাঠকের কবিতা

উশীনর চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক কবিতাকে যদি কোনো বিশেষ উপসর্গে সনাক্ত করা যায়, যদি সেই উপসর্গকে আখ্যায়িত করা হয় 'দুরূহতা', তবে বোধহয় মনান্তরের কোন আশঙ্কা থাকে না—এমনতরো অভিযোগ সাধারণ পাঠকের, ক্ষেত্রবিশেষে বিদগ্ধ পাঠকেরও। না মেনে উপায় নেই, অভিযোগটি খুব ব্যাপক অর্থে হলেও সত্যের অংশ সমন্বিত। বস্তুত কবিতার আস্বাদন যদিও বাচ্যার্থ নির্ভর নয়, এবং তার ব্যঞ্জনার মায়াজাল অতিক্রম যথার্থই আগ্রহ, অভিনিবেশ ও অনুশীলনের সম্মুখদর্শী; আর কবির 'সচেতন আত্মবিলুপ্তি' এবং 'অভিমানীঅহং'—এ সূত্রেও যদি প্রাচীন কবিতার বিচরণভূমি থেকে আধুনিক কবিতা পৃথকীকৃত হয়ে থাকে, তথাপি তার ক্রমবিবর্তিত রূপের সম্ভোগ পাঠকের যে দুটি মৌলিক ও প্রধান যোগ্যতার পরিচায়ক, সেই 'কাব্যবোধ' এবং 'যুগবোধে'র মধ্যে দ্বিতীয়োক্তটির ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনজনিত ধ্যান-ধারণাতেই যে ক্রমশঃ কবিতার গতিবিধি অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত, তা বোধ করি বিশেষ ব্যাখ্যার অপেক্ষা নির্ভর নয়। ধারণাটির যাথার্থ এখানেই যে, সামাজিক অনুভূতির উত্তাপ বিজড়িত শব্দরূপে আমাদের যাবতীয় ইচ্ছা-কল্পনা ও অভিজ্ঞতা যখন সমাজ ও সভ্যতার একটা উৎপ্রেক্ষামাত্র, তখন একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হয়না যে কবিতার বিকাশ বিবর্তনের হেত্বাভাসের অংশবিশেষও বস্তু বা সমাজের বিকাশ-বিবর্তনে নিমজ্জিত।

এখন বস্তুর বিকাশেই যেহেতু সমাজের বিবর্তন নির্দেশিত, সুতরাং প্রথমোক্তটির বিকাশের ক্ষেত্রে যে রীতিনীতি দৃশ্য হয়ে ওঠে, দ্বিতীয়োক্তটির বিবর্তনেও সন্দেহাতীতভাবে তারই নামান্তর কল্পনীয়। ফলত ঐ বিকাশ বা বিবর্তনের যে নিয়মটি এক্ষেত্রে অধিকতর স্পষ্ট, তা হোল তার একটি পর্যায়ে কিয়ৎপরিমাণে 'উল্লম্ফন' সাধন, অর্থাৎ দীর্ঘকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতি যে ক্রমিক পরিবর্তন পরিমাণগতভাবে সাধিত হতে থাকে, তারই একটা চরম প্রকাশ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে এই গুণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। এই পরিবর্তনের পর্বটি চরম ও চূড়ান্ত প্রকাশ হিসাবেই একটু বিশেষধরণের, অভূতপূর্ব দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং যে কারণেই উল্লম্ফন, জাতীয়। বিজ্ঞানসম্মত পরিমাপকরণের সাহায্যে তরল পদার্থের বিকাশের ক্ষেত্রে এ জাতীয় দ্রুততা হয়ত সময়ের নির্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ হতে বাধ্য, কিন্তু সামগ্রীকভাবে সমাজ রূপান্তরের বেলায় এ ধরণের লগ্ন কয়েকটি দশক কিম্বা শতকেও ব্যাপ্তিলাভে সক্ষম। সমাজতত্ত্বের নির্দেশানুযায়ী সমাজবিবর্তনের এই দ্রুতগতিসম্পন্ন পর্যায়টিকেই আমরা ক্রান্তিলগ্ন আখ্যাত করি।

স্বভাবতঃ সমাজ-আর্থ-রাজনৈতিক সম্পর্কে প্রতিফলনের মত শিল্প সাহিত্যেও এ জাতীয় অভিজ্ঞতা কার্যকর; যার অন্তরে বিরাজ করে গুণান্তর ঘটার প্রক্রিয়ার ফলে একধরণের 'টেনসন' কিম্বা 'অস্থিরতা'। জীবনভাবনার চাঞ্চল্যে ও পূর্ব অনুসৃত জীবনের প্রতি ধীক্কারে, জীবনধারা পরিবর্তনের তাগিদে এবং সর্বোপরি শিল্প ও জীবনের সমন্বয় স্থাপনের উপলব্ধিতে এ জাতীয় পর্যায়গুলির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে লক্ষণীয় একটা সাদৃশ্য। মানবিকতার পূর্বঅনুসৃত দেহস্বভাবটি যেমন এ পর্যায়ে বিকৃত হতে থাকে, তেমি তার ভবিষ্যৎ স্থিতাবস্থাটিও হয় সম্পূর্ণতার পুষ্টিলাভে

বঞ্চিত। অর্থাৎ এই সমাজক্রান্তির যুগে লক্ষণীয় এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য, যা তার পূর্বে সমাজের ধীর বিকাশের ক্ষেত্রে ছিল কল্পনাতীত; আর আপাতদৃষ্টিতে এ লক্ষণকে অবান্তর, অর্থহীন চিহ্নিত করা গেলেও এর পরিণতি কিন্তু উন্নততর ভবিষ্যতের জয় জয়কারে।

এখন শিল্পীমননের সংবেদনশীলতা যেহেতু অধিকতর তীব্র এবং শিল্প সাহিত্যও আপন স্বভাব ও ঐতিহ্যের গুণান্বয়ে অভিজ্ঞতাকে বিশেষ বিশেষ রূপদানে সমর্থ, সুতরাং শিল্প সাহিত্যে এ জাতীয় পর্যায়ের প্রতিফলনের ক্ষেত্রে শিল্পী মননে আদর্শ আর বাস্তবের সংঘাতে তার আবেদন যে বিশেষত প্রকট, তা বোধ করি বিশেষ বিশ্লেষণের রঞ্জন রশ্মি সম্পাত সাপেক্ষ নয়। অতএব মানবিক সম্পর্কের এই দ্রুততার যুগে শিল্প-সাহিত্যের কেন্দ্রীভূত, বিষয় বা কনটেন্ট যেমন শীঘ্র ঋতু পরিবর্তনের অপরিহার্যতা লাভ করে, তেমি তাকে ধারণ ও বহন করতে তার ফর্ম বা আঙ্গিকও।

কবিতার বিকাশ-বিবর্তনের ক্ষেত্রেও দেখি এই ক্রান্তিলগ্নে উপনীত হয়েই তার রূপগত ও বিষয়গত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ভাবে। বাস্তবিক যে পর্যায়টিকে ঐতিহাসিকেরা 'রেনেসাঁস' আখ্যাত করেছেন, ইউরোপের সাংস্কৃতিক জীবনের সেই চরম রূপান্তর পর্বেও লক্ষ্যণীয় এ ধারনারই নামান্তর। অর্থাৎ দান্তে-চসার থেকে শুরু করে শেক্সপীয়র-মিল্টন পর্যন্ত যে দীর্ঘব্যাপ্ত ক্রান্তিকাল, একধারে ইউরোপের মানবিক সম্পর্কের পূর্বস্বীকৃত বিন্যাসটির প্রতি আঘাত এবং অপরপক্ষে তার নবমূল্যায়ন ও নব্যবিন্যাসের মাধ্যমে অন্য এক সামাজিক সম্পর্ক গঠনের তাগিদ অনুভবই ছিল তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। স্বভাবত রেনেসাঁসের শিল্প-সাহিত্য বাস্তবজীবনের সঙ্গে সমন্বয় স্থাপনের যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তা অবশ্যই তার যুগোপোযোগিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আর তৎপরবর্তী প্রায় চারশ বছরের বিশ্ববিস্তৃত মানবসভ্যতা প্রস্ফুটিত হওয়ার ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দুও সেই রেনেসাঁস, যার সাধনায় অনন্য নির্ভরশীলতা ছিল ব্যক্তির অনুশীলিত সত্যবুদ্ধি, যে প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল ব্যক্তির বিকাশ সাধনা। কিন্তু এই শতকের দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল ভয়ঙ্কর তাণ্ডবে ও অবক্ষয়ে সে বোধ ও চেতনা হয়েছে অবদমিত, উপেক্ষিত, জর্জরিত এবং কশাঘাতগ্রস্ত, উপরন্তু ব্যক্তির সার্বিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দর্শন-বিজ্ঞান-মনস্তত্ত্ব ও কলার অন্যান্য বিভাগের অকল্পনীয় অগ্রগতির প্রভাব যে দ্যোতনা যুক্ত করেছে, শিল্প সাহিত্যও যে তার ভাবধারাপুষ্ট, তা বোধকরি বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখেনা। কাজেই বিগত একশ বছরের অধিক সময়কালের এ জাতীয় প্রভাব ও সমস্যার চাপে যেমন মানবিকতার পূর্ব্ব অনুসৃত সাধনায় ঘটেছে কেন্দ্রচ্যুতি, তেমনি তার অন্তরু আত্ম রূপায়ণে অর্থযুক্ত জটিলতা বৃদ্ধির মূলে বিরাজমান এই কালান্তর চেতনার প্রগাঢ় বেদনা।

আধুনিক কবিতার ক্রমবিবর্তিত রূপে দুরূহ অনুসঙ্গজনিত দুর্বোধ্যতার প্রশ্নও বোধ করি এ সূত্রেই বিবেচ্য। কেননা ক্রান্তিলগ্নের যে টেনসনধর্মী স্বভাব এতে বিরাজমান, তার অভিষ্ট সংকল্পই হচ্ছে পূর্ব্ব অনুসৃত ও স্বীকৃত কাব্য বিষয় রীতির প্রত্যাখ্যান, ভবিষ্যৎ বিষয় ও রীতির গঠনমূলক প্রয়াসের তাগিদে। আবার এই দুই লক্ষ্যের মধ্যবর্ত্তী পর্যায়েও দৃশ্য হয়ে ওঠে এমন কিছু বিচিত্র ও বিক্ষিপ্ত প্রয়াস প্রচেষ্টা, যা অবশ্যই লালিত হতে থাকে এই দুটি প্রধান উদ্দেশ্যের পরিগ্রহণ ও পরিবর্জনের মাধ্যমে। সমালোচকেরা এই প্রচেষ্টাকে যেমন চিহ্নিত করেছেন 'আধুনিক কাব্য আন্দোলন' হিসাবে, তেমনি আবার 'সৃজনমূলক নিরীক্ষা' হিসাবেও। ফলত যে যুগযন্ত্রণার ছাঁচে ক্রমবিবর্ত্তিত আধুনিক মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করে, সেখানে তাকে ব্যক্ত করার উপযুক্ত ভাষার সন্ধানেও যে অগ্রণী হতে হয়,

তাতে আর সন্দেহ কি? বস্তুত যে প্রতীকি তাৎপর্যেই ভাষার সার্থকতা, তার আদি কিম্বা আত্মিক প্রয়োগ কৌশল বর্জন অথবা বিশেষণের ব্যবহারে অলঙ্কারের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি ও সর্বোপরী উপমার অভিনবত্ব প্রদর্শনের অর্থ এক্ষেত্রে এই নয় যে, এদের প্রয়োগ কেবলমাত্র ভাষার বৈচিত্র্য পরিস্ফুটনের তাগিদেই, কার্যত তা অবশ্যই কতকটা যুগোপোযোগী জীবনের অন্বয়ধর্মীতা প্রমাণে আগ্রহী। কবিকেও তাই তাঁর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বাহন শব্দকে আর শুধুমাত্র তার আভিধানিক অর্থেই ব্যবহার করলে চলেনা এবং সেই দাবী নিয়ে তার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়াও পাঠকের একধরণের বিড়ম্বনা মাত্র। কাজেই এই জাতীয় পর্যায়ে উপমেয় এবং উপমানের বোঝাপড়ার গণ্ডী যত প্রসারিত হতে থাকে, রূপক ও চিত্রকল্পের তির্যক বিচরণ ততই ভাষার ব্যবহারে জটিলতাবৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

অতএব বিশ-তিরিশ দশক থেকে এ দেশের মাটিতে যে প্রয়াস-প্রচেষ্টার যাত্রারম্ভ, তার বুক থেকে 'দুরূহতা' লেবেলটি সম্পূর্ণরূপে খারিজ করা যে যুক্তিযুক্ত নয়, তাতে বোধ করি সুবিবেচক মাত্রেই সায় দেবেন। কিন্তু তৎপরবর্তী দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আজ এই সত্তর দশক অতিক্রম করেও ('আধুনিক' মার্কাটির পরিবর্তে যখন 'চিরায়ত' শব্দটি স্থানান্তরিত করলে তেমন কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না) যখন কবিতার দিকে পাঠককে নির্দ্বিধায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে দেখি, উপরন্তু তার ওজর-আপত্তির খাতায় ক্রমশঃ 'দুর্বোধ্যতা' শব্দটিও সশরীরে উপস্থিত, তখন সমস্যাটাও একবার নতুন বিন্যাসে ভাবতে হয়না কি? যদিও একথা ঠিক যে মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের পর সৎ কবিতা কোনোকালেই আপামর সাধারণের মনোরঞ্জনের দাবীকে আপনচর্চার অঙ্গীভূত করে নিতে সক্ষম ও সমর্থ হয়নি এবং যে সীমিত পাঠক তার কল্পিত, সেই পাঠকের সুস্পষ্ট শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা অর্থাৎ 'নিজেকে নিজের বাইরে আনার' প্রচেষ্টাই তাকে সৎ পাঠকের স্বীকৃতি প্রদান করে, ক্ষেত্রবিশেষে তথাকথিত দুরূহতার বেড়াজাল উন্মোচনে সমর্থ পথস্থ। কিন্তু শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা—কারপ্রতি? সে কি কোনো সুস্পষ্ট ও অর্থপূর্ণ ঐতিহ্য রক্ষার দিকে নাকি অনুশীলিত এবং বিবেকবান কোনো বিশিষ্টতার প্রয়াসে? কথাটার কেন্দ্রবিন্দু যে সাম্প্রতিক কালের বিচ্ছিন্ন ও 'বিক্ষিপ্ত উদ্যম থেকে উদ্ভূত কবিতা', তা বোধ করি বিশেষ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই কবিতার দুরূহতার কেন্দ্রানুভূতিতে, কবি ও পাঠক—উভয়েরই সমস্যা নির্দেশ করে যে প্রশ্নের উত্থাপন করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে সেটাই কি পুনরায় বিবর্তিত আকারে উপস্থিত থাকছেনা? কেননা কবিতার দুরূহতার হেত্বান্বেষণে যখন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ, সেটা আধুনিক কবিতার নব্যপ্রয়াসের পদসঞ্চারের যুগ, আর আজ এই পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে দাঁড়িয়েও সমস্যা কিন্তু একই, রকমফের তার গণ্ডীর প্রসারে মাত্র। অথচ দীর্ঘ সময়কালের বলিষ্ঠ ও দীপ্ত পদক্ষেপে আধুনিক কবিতা 'দুরূহতা' উপাধি প্রাপ্ত হয়েও কিন্তু তার ব্যবহারও প্রয়োজনের সীমারেখাকে আকারে ও আয়তনে প্রসারিত করে চলেছে ক্রমাগত, অর্থাৎ কবিতার ভাগ্যদেবতা ক্রমশই সুপ্রসন্ন হাতে আশীর্বাদের পুষ্পবৃষ্টির মত ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু কবিকূলের উপর বর্ষণ করে চলেছেন আপন চর্চার অস্পেস উত্তরাধিকার, একথাই যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে কি বিষয়টা আমাদের এভাবেই ভাবিত করে না যে, তাহলে আধুনিক কবিতা কি যথার্থই দুরূহতা-দুর্বোধ্যতার ছত্রাশয়গ্রাহী, নাকি সেটা প্রায় 'মাংসখণ্ডে'র মতই বাইরের একটা আবরণ মাত্র, যার নির্যাসটুকু আসলে পাঠের সঙ্গে-সঙ্গেই অন্তরের অন্তস্থলে প্রবেশের স্বীকৃতি পেয়ে থাকে।

যদিও একথা ঠিক যে, সমসাময়িক-জীবিত কবি কূলের বিরুদ্ধাচরণ অনেক ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক নীতির পরিপোষণেরই নামান্তর, কিন্তু তবুও স্বীকার করতে বাধা নেই যে, কাব্যচর্চার এই সর্বোব্যাপী, অনায়স ও প্রাঞ্জল উদ্দীপনা কি পক্ষান্তরে একথাই স্মরণ করিয়ে দেয় না যে, আধুনিক কবিতা তুলনামূলকভাবে পাঠকহীন এবং কবিরাই তাঁদের কবিতার পাঠক, অথচ কাব্যচর্চায় মনোনিবেশকারীর সংখ্যা উত্তোরোত্তরই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এ কথনই শিরোধার্য হবার স্পর্ধা রাখেনা ; এবং প্রশ্নটা মোড় নিয়ে দাঁড়ায়, তাহলে কি পাঠকও ক্রমশঃই কবি প্রতিভার অধিকারী হয়ে উঠছেন, নাকি ভবিষ্যতে নিজেকে আরও পরিণত পাঠকে রূপান্তরিত করার জন্যই কাব্যচর্চায় তাঁর এই অবাধ বিচরণ? সমস্যাটাও বোধ করি সেখানেই। কেননা এটা আমাদের ভয় করতে শেখায় এই মর্মে যে, তাহলে দুরূহতার উৎপত্তি কি যথার্থই 'পাঠকের আলস্যে', নাকি তার হেত্বাভাষ কাব্যবোধ যুগবোধের জটিলতাজনিত কবির দ্বিধাদ্বন্দ্বে নিমজ্জিত ?

বস্তুতঃ যে অর্থে এলিয়ট বিশ্বাস করতেন যে, 'কবিতা কবির আত্মসংগ্রামেরই বাণীমূর্তি ; আত্মসংগ্রাম যত তীব্র হবে কবিতা ততই কথ্যরীতির দিকে ঝোঁকপ্রকাশ করবে, কবি প্রসিদ্ধির কুসুম শয়ন ছেড়ে গদ্যের কঠিনোজ্জ্বল ধর্মের মধ্যেই পাবে অন্বিষ্ট উৎসকে' এবং শব্দের যে আভিধানিক অর্থ বা বাচ্যার্থকে তিনি Mince-Meat চিহ্নিত করে তার অপর একটা তাৎপর্যগত ইঙ্গিত আরোপ বা ব্যাঞ্জনার্থ প্রকাশের পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে ছিলেন, আর যে ভাবধারায় দীক্ষিত আধুনিক বাংলা কবিতার নব্যপ্রচেষ্টার পদসঞ্চারের যুগ, তাকে অবশ্যই দুরূহতার একটা কারণ দর্শানো যেতে পারে কিন্তু দুর্বোধ্য আখ্যায়িত করা যায় না বোধ হয়। কেননা যুক্তিটির তাৎপর্য যে যুগোপোযোগী, তাতে সুবিবেচক অন্ততঃ স্বীকৃতি প্রদান করবেন বলে আশা করা যায়, কিন্তু এহেন ধারণার ক্রমব্যবহৃত রূপটি যে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার পক্ষে কি পরিমাণ ক্ষতিকর, সে সম্পর্কে স্বয়ং কবিরাও বোধ করি ক্ষেত্রবিশেষে অবহিত হবার সুযোগ বঞ্চিত। কেননা এমনও তো দেখা গিয়েছে যে যুক্তির তাৎপর্যের সুস্পষ্ট ঐতিহ্য রক্ষা অপেক্ষা তার অন্ধ অনুকরণের দিকেই আমাদের অনুভূতি ও প্রবৃত্তি অনেক ক্ষেত্রে সজাগ সতর্ক। আর সাম্প্রতিক কালের রসজ্ঞ অবশ্যই মেনে নেবেন যে, 'আধুনিক কবিতা' মানেই 'গদ্যধর্মিতার বিচরণভূমি', এবং 'শব্দার্থ কিঞ্চিত বিলোপে'র প্রচেষ্টাই 'আধুনিক কবিতা'—এমনতরো একটা উপলব্ধিকে নির্দ্বিধায় জাহির করা যায় কালি-কলমের মাধ্যমে। কেননা ছন্দোবিদ্যার স্বরবর্ণে হাতেখড়ির আগেই উদ্ভুত হতে পারে একটি সম্পূর্ণ কবিতা এবং আপন ভাষার শব্দের ভাণ্ডারে প্রবেশের চাবিকাঠি অতি সহজেই লভ্য। উপরন্তু আছে জীবনচর্চার অবাধ অধিকার, আর কম-বেশী একটা ঐতিহ্যের সঙ্গে উদ্বেলিত রক্ষা-নিষ্পত্তি। তদনুযায়ী কখনও বা সরাসরি, কখনও মর্জিমাফিক তৎপরতায় কিছু উপমা-উৎপ্রেক্ষার সংমিশ্রণে কয়েকটি পঙক্তির উপস্থাপন অথবা শুধুই কয়েকটি প্রতীক কিম্বা চিত্রকল্পের অনাড়ম্বর আহ্বান। কাজেই এহেন মানসিকতা যে শিল্পের (?) জনক তাকে সাদর সম্ভাষণে ভূষিত করা, সাধারণ পাঠক তো দূরের কথা বিদগ্ধ পাঠকের পক্ষেও কঠিন হয়ে পড়ে অনেকক্ষেত্রে ; এবং 'দুরূহতা'র শিরোপা প্রদানও অবান্তর কিছু নয়।

বাস্তবিক যুগবোধের জটিলতা বৃদ্ধি এবং তৎজনিত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির প্রতিফলনকেও বোধকরি স্বাগত জানানো যায় শ্রদ্ধা ও একাগ্রতার সাহায্যে, অভিনিবেশ ও অনুশীলনের দ্বার', ঐতিহ্য ও যুগোপযোগী যন্ত্রণা এবং দ্বিধাদ্বন্দ্বে পাঠগ্রহণের মাধ্যমে, যদি যথার্থই সেটি একটি সুস্পষ্ট কাব্যবোধের ধারক ও বাহক হয়। কিন্তু একধারে

উপলব্ধির অর্থহীন জটিলতাবৃদ্ধি এবং অপরপক্ষে পরিশীলিত কাব্যবোধের অভাব থেকে উদ্ভূত যে বক্তব্যের শিল্পরূপ, তাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায় কোন্ মেধা ও বুদ্ধির সংমিশ্রণে ? আধুনিক কবিতা তার একই পরিমণ্ডলে বিরাজ করেছে কিনা অথবা যথার্থই কোনো নতুন পথের সন্ধানে ব্রতী হচ্ছে—এ প্রশ্ন অপেক্ষাও পাঠকের কাছে অধিকতর তীব্র ও ব্যাপ্ত সমস্যা মাথাচাড়া দেয় যখন তার অপভ্রংশ রূপটিই প্রকট হয়ে ওঠে। আর এ প্রশ্নই কি পাঠককে সমগ্র আধুনিক কাব্য আন্দোলন অথবা যথার্থ সৃজনাত্মক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনে সক্ষম ও সমর্থ করছেনা ?

একথা ঠিক যে, 'যে দুরূহতার উৎপত্তি পাঠকের আলস্যে তার জন্য কবির উপর দোষারোপ অন্যায়। দর্শন-বিজ্ঞান-গণিতকে বাদ দিলেও, কলার অন্যান্য বিভাগে প্রবেশাধিকার যে আগ্রহ, অভিনিবেশ ও অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে, কবি যদি তার নিজের কলার বিভাগে সেই পরিমাণ শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা চায় তাহলে তার দাবী নিশ্চয়ই সঙ্গত। কিন্তু যে দুরূহতার উৎপত্তি অনুকম্পার অভাবে, যার মূলে কবির নিজের দ্বিধা নিহিত, তার কতকটার দায় যুগসন্ধির স্কন্ধে চাপানো গেলেও বেশীর ভাগটাই কবির বহনীয়।' (কাব্যের মুক্তি-স্বগত—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত) কেননা মস্তিষ্কের অহেতুক-অর্থহীন চর্চা থেকে উদ্ভূত যে কালির আঁচড়ের হেঁয়ালি, তা যথার্থই ক্ষমাহীনভাবে অক্ষম, এবং ভবিষ্যৎ পাঠকে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য অবশ্যই কবিতার বাতাবরণকে দুর্বিসহ করে তোলার প্রয়োজন নেই ; আর সাম্প্রতিক কালের বিচিত্র বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন উদ্যমে যে পাঠক যথার্থই দ্বিধাগ্রস্ত, নিরপেক্ষ সমালোচনার জন্য তাঁর বোধকরি মহাকালের দ্বারস্থ হওয়াই সবাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত ॥

প্রচ্ছদে ভুল/অমল দাস

শিশিরের আল্পনা মাড়িয়ে
একটা অদ্ভুত পাগল—
একটা বেদির ব্রহ্মতালু বরাবর
হাঁটু মুড়ে ছিল।
প্রদীপের কবন্ধ অন্ধকার ছুঁয়ে
পোড়া ব্যবচ্ছেদ।
ঠিক এই সব
এই রকমই এক এক অনুভবে
অরণ্যের ছায়া।
শুধু একটা আবর্ত—
বেদি মানে আরতির রমরমা
যথাযথ অবস্থান দোষে
সকালের প্রচ্ছদে ভুল।

তার হাতে ফুল ছিলো/সনৎ মান্না

তার সারা গায়ে লেগে আছে আঘাতের দাগ
তোমাদের বীভৎস আঙুল
তোমরা দিয়েছো তাকে ঠাণ্ডা ব্যবহার।

বন্ধুর মতো ছিলো তোমাদের হাসি, অস্ত্র ছিল গোপন পকেটে।
তার হাতে ফুল ছিলো, ছিলো না ইস্পাত।

সে আর কারুর মুখে তাকাবে না ফিরে।

তোমাদের সব খেলা এখন শিখেছে
বড় বেশী খুন নেয় হৃদয় না দিয়ে
নখের দু-কষ বেয়ে ঝ'রে যায় অবিরল হত্যার প্রমাণ।

দিনযাপন/বিশ্বনাথ গরাই

ভোরবেলা প্রতিদিন বাবার কাশির শব্দে ঘুম ভাঙে, আর
একটা জেট প্লেন ঠিক এসময়
আমার জানালার নিঃশব্দ আকাশ চিড়ে উড়ে যেতে থাকে—

অসমাপ্ত স্বপ্নের বাগানে যে ফুলগুলি সারারাত সুগন্ধ ছড়ায়
প্রাকৃতিক সূর্যের অশান্ত পৌরুষ
সারাদিন শুষে নেয় তাদের গোপন
পরাগের রেণু ও সুষমা—আমি
পিতার ওষুধ, মাতার উপোস, ব্রত আর আমার সম্পূর্ণ বোনের
বিদ্রোহী চোখের সামনে, ক্রমশ সমান্তরাল, মাটির ভিতর
মাটি হোয়ে মিশে যেতে থাকি—
কোথায় আমাকে যেন যেতে হবে, ভেবে সারাদিন ঠিকানাবিহীন
ঘুরিফিরি, নিজেকেই হত্যা করি অসহায় স্বপ্নের ভিতর ;

মধ্যরাত্রে কড়া নাড়ি, পুরোনো চিঠির বাক্সে অভ্যাসবশত
হাত রাখি, মনে পড়ে, কতোকাল কেউ চিঠি লেখেনি আমাকে !

উড়ন্ত বলাকা/রাবেয়া রোস্তম

দাঁড় কাক যেন ময়ূরী সেজে নগ্ন গায়ে পিচ রোডে হাঁটে—
ঘোড়া পেয়ে জুতা পায়ে ঠোঁটে মুচকি হাসি হাসে,
লোলুপ দৃষ্টিতে চায় বিরহের ছাপ দিতে—
কত ডিক্ষ সাহেব পিছু লাগে ললাটের জিজ্ঞাসা চিহ্নের জবাব পেতে
নগ্ন ডানা কাটা পরীর দল ভীড় জমায়—
ষ্টুডিও আর প্রেক্ষাগৃহে রাজ্জাক, ববিতার প্রেমের মালা গাঁথে
অভিভাবকের অজান্তে।
লাক্স, লিপিষ্টিক, নাম না জানা কত প্রশাধনীতে
রূপের জৌলুস ছড়াতে চাই আধুনিক আলেয়ার মত।
কত জড়াজড়ি, ঢলাঢলি, হাসাহাসি
সভ্য যুগের ষড়শীরা এটাই ভালবাসে।
কত প্রেমপত্র, এ্যালবাম ভরা স্থাকেট ছবির মত
আমি ভাবি, এরাও নাকি বোম্বে ফ্লিমের "ববি"।
হাতে ছুটা পায়ে বেড়ী পাবনা পাগলা গারদ যাবে ভরে
রাজা আর মায়া বড়ি, এ আশায় ভাসায় তরি
সভ্য যুগের যত নগ্ন পরী।

একুশে ফেব্রুয়ারী স্মরণে

নয়নকুমার রায়

ধূপের গন্ধ কুসুম জড়ানো
২১শে ফেব্রুয়ারী
বাংলা ভাষা রক্ষার ব্রতে
লাগাতার সংগ্রামী।

কবিতার কবি লেখনী শানায়
শপথের ময়দানে
অমর শহীদ একবার জাগো
বাংলা ভিয়েৎনামে।

শব্দের নুপুর/রথীন্দ্রনাথ রায়

কবিতা আর শব্দের নুপুর
সব এক
এই বুকে তার স্পর্শকাতরতা

ভারী ভারী পাথর
সব নামিয়ে রাখি
দিগন্তে একটিই কবিতা এখন

রোদ্দুর কি জ্যোৎস্নার জলস্নান
নিঃশব্দ আলোড়ন সব
শোকতাপের মুখে
কবিতা আর শব্দের নুপুর
কবিতা আর ঢেউয়ের উচ্চারণ।

এবার যদি পুড়ি/অরুণকুমার চক্রবর্ত্তী

চোখের সামনে গোপন গোপন শব্দ তোলে কুঁড়ি

আমি এখন নিজের মধ্যে নিজের কবর খুঁড়ি

হল্কা বাতাস পায়ের পাতায়,
হিস্‌হিসিয়ে উঠছে আগুন, এবার যদি পুড়ি
কে দোষ দেবে !

সাতমুখী সাপ জিভের ডগায় বাজিয়ে দিচ্ছে তুড়ি

আমি এখন নিজের মধ্যে নিজের কবর খুঁড়ি ।

প্রতিশ্রুতি/মুহম্মদ জাকারিয়া

কথা যদি দিতে হয় তোমাকেই দেবো
হে-নগ্ন-পদ মহাকাল—ঠিক এই ভাবে
হৃদয়ের সবটুকু সুন্দর সুখ
তোমাকেই দেবো—ফেরত নেবো না ।

যতোটুকু সম্ভব ধীরে ধীরে সব দেবো
আত্মা'র উন্মিলনে নিখুঁত বকুল
স্মৃতি'র সম্ভার থেকে ইচ্ছের মালা
ফুল-পাখি-সাদা চাঁদ—সকালের সোনা……

স্বাচ্ছন্দের সম্ভাবনা যদি কিছু দিতে হয়
তোমাকেই দেবো. হে-অন্তরঙ্গ মহাকাল—
শুধু এই জংধরা যৌবনের ক্ষয়, কিম্বা জীবনের ;
অনাবিল অস্বস্তিগুলো তোমাকে দেবোনা ।

তিনটি কবিতা/রানা সিদ্দিক

প্রশ্ন

প্রশ্ন ছিল, হে ঈশ্বর
দুঃখ জরা ক্লান্তির মাঝে
জন্ম দিলে কেন ?
বলল ঈশ্বর, কঠিন হাতে রুখতে হবে
দুঃখ জরা ক্লান্তিগুলো মুছতে হবে
এ জন্যেই জন্ম তোমার জেনো ।

রক্তচোষা

রক্ত আমার ঘামের ফোটা
আমার চোখের জল,
রক্ত আমার হালের লাঙ্গল
আমার হাতের কল,
রক্ত আমার এইখানেতে
যেথায় রাজার সিংহাসন,
আমার রক্ত চুষে খায়
সেই রাজারই প্রশাসন ।

স্বদেশ

ও আমার সোনায় মাড়ানো স্বদেশ
দারিদ্রতার কষাঘাতে তোমার স্বপ্ন শেষ ।
কাঁদছো কেন তুমি ?
আমরা কি সব হারামজাদা ? হারিয়েছি বল ?

আগুন লেগেছে/মোহাম্মদ মনির হোসেন

আগুন লেগেছে বুকের পাটাতনে
বস্তির উদরে কৃষকের সোনালী খামারে
শহরের রাস্তায় রাস্তায়—ফুটপাতে
নিরন্ন মানুষের এক মুঠো ভাতের থালায়
আগুন লেগেছে সবখানে।

মানুষ কেড়ে খায় আর একটা মানুষের সুখ,
মানুষ ছড়াচ্ছে মানুষের মধ্যে ক্ষুধার টস্‌টসে বীজ।
পল্লী বসতি ভেঙ্গে দেয় অজস্মার খর বৈশাখী দাহ,
আগুনে আগুনে ছেয়ে গেছে পৃথিবীর কোমল ছাদ।

বাস্তুহারা জননীর বসত ভিটেয়
অন্ধকার রাত্রিতে জ্বলে ওঠে ক্ষুধার্ত শেয়ালের চোখ।
আমাদের বুক থেকে
আমাদের চোখ থেকে
আমাদের মন থেকে
ভালবাসা তুলে নিয়ে গেছে করাল দুর্ভিক্ষ দানবের থাবা।

আগুন লেগেছে সবখানে, অগ্রাণের ফসলে
দুগ্ধবতী গাভীর ওলানে
আগুন লেগেছে, আগুন লেগেছে, সবখানে লেগেছে আগুন।
লাগুক
আগুনে পুড়ে পুড়ে শেষ হলে পোড়ার ক্ষমতা,
জ্বলে জ্বলে শেষ হলে দাহনের জ্বালা, একদিন

সকলেই এসে দাঁড়াবে দীর্ঘ রাত্রির সীমান্তে
একটা নতুন সূর্যদয়ের সামনে
সকলেই ফিরে যাবে ফেলে আসা বসতির কাছে।

একুশ মানে/কবীর জাহাঙ্গীর

একুশ মানে আমার চোখের জলে বুক ভাসানো
আমার বোনের লজ্জা নিয়ে নর পশুদের ক্রিকেট
একুশ মানে অর্থবিহীন ভুল বকা নয়,
ভুল বকা নয়।
একুশ মানে ভায়ের বুকের রক্ত যেনো
স্বাধীনতার লাল পতাকা।
একুশ আমার মুখের ভাষা।
বাপ দাদাদের প্রাণের কথা
ছেলে হারা লক্ষ মায়ের কান্না-কাটির
করুণ ভাষা।
একুশ আমার বুকের মাঝের
শ্যামল-সবুজ ভালোবাস।
একুশ-একুশ, একগুচ্ছ শিমুল-পলাশ
রক্ত জবা, রক্ত কমল!
আমার প্রাণের মোহন ভাষা
রঙিন একুশ।
একুশ তুমি; আমার স্মৃতি
চিরদিনের সোনার হরিণ।
একুশ আমার প্রাণের একুশ।

দুটি কবিতা/সুকুমার চৌধুরী

মরিচীকা

তোমার মাভৈঃ ধ্বনি স্তব্ধ হোলে আত্মঘাতী হবে সিসিফাস্
এই উক্তি তারও ছিল অন্যসব স্বপ্নভুক্ যুবকের মতো
মোহিনী প্রশ্রয়ে তারও ভরেছিল রিক্ত বুক ; সমর্পন ভেবে
সেও চেটেছিল স্ফীত বিষঠোঁট, কাগজকুচির মতো
অনায়াসে ছিঁড়েছিল ঝকঝকে ভবিষ্যৎ দূরযানি আলোর প্রভাত
নষ্টা রমণীর মতো

ভুলিয়ে ভালিয়ে তুই খেয়েছিস তাকে—
তার আক্রান্ত হৃদয়ে হু হু করে ঝুটো মরুদ্যান
সঙ্গোপন ধূসর কাগজে শুধু পড়ে আছে তার শব
রক্তবমি
নীল অনুভব

তোমার মাভৈঃ ধ্বনি নিভে গ্যাছে নিমন্ত্রণ, নিবিড় প্রশ্রয়

ভ্রূণ

স্বেচ্ছাবন্দী ভ্রমরের পিছু পিছু সেও আসে
অনাহুত ! সংলগ্ন ছায়ার মতো এঁকে বেঁকে আসে।
ভ্রমর তাকেও নেয় পরমের মতো শোকে তাপে
আপ্লুত সোহাগে তার ঋতুময় গর্ভখানি কাঁপে।

দূরত্ব/অসীম চট্টোপাধ্যায়

সজীব প্রাণের কাছে আত্মপরিচয়
আমি কি তফাত আছি
কিংবা দিন-দিন নিজস্ব নিয়মে
দূরবর্তী ব্যবধানে সরে যাচ্ছি
ভোররাত্তে তিনু গোঁসাই অভ্যাসমত গেয়ে যায়
'হরেকৃষ্ণ-হরেরাম'
তারপর সারাটা দিন অন্য পরিচয়
গাজনের মেলায় যে শিশু একদিন হারিয়ে যায়
বড় হ'য়ে সঠিক প্রাপ্য বুঝে নেয়
মানুষই জন্ম দেয় আর এক মানুষ
তবুও কেউ কারুর মত নয়
যেটুকু মিল প্রকৃতি অপরিবর্তনীয় বলেই
দিনে রাতে অনেক কীর্তি, অজস্র আতসবাজী
তবুও একসময় সবকিছু নিঃশেষিত
পড়ে থাকে স্মৃতির খোলস।

কালভার্টের নীচে হাঁটু জলে/সুকুমার সেনাপতি

যতই বাড়াওনা কেন হাত।
ব্যর্থ প্রেমিকের মতো ক্ষুধার্থ,
তবুও, সে ফিরে আসবে না আর কোনদিন।
কারণ ঃ
তোমার সমুখে প্রতিদ্বন্দ্বী এক যুবক
যুবকের হাতে খোলা তরোয়াল।
মাথার উপর মরা ডালে,
জোড়া জোড়া ক্ষুধার্থ শকুনীর পলকহীন চোখ
কালভার্টের নীচে হাঁটু জলে খেলা করে আসলে
কয়েক জোড়া মাছ।

বিজ্ঞপিত সফরের/কামাখ্যা সরকার

আমার মতো কোনো চিল কিংবা সমুদ্রের ঝড়
আকাশে বিক্ষুব্ধ কিছু পিংগল মিছিল
ধূমায়িত শ্বেত পাত্রে আকণ্ঠ তৃষ্ণা সূর্যের বলয়
আমি ঠিক হেঁটে যাই ক্ষত রঙ যন্ত্রণার স্রোতে

যথাযথ পুনর্জন্ম আছে তো বহাল।

আমার মতো আমি ক্ষুদ্র পাথরের জলাশয়ে
মুছে গেলে রোদ উড়ো চিঠি ফেলে রাখি
বিজ্ঞপিত সফরের সবুজ কালির কাটাকুটি।
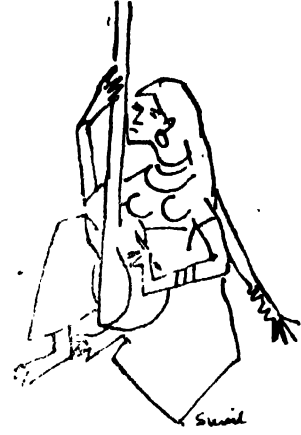
চতুর্দশপদী/শীতল চৌধুরী

কতকাল দেখা নেই, সেই যে রূপোর ঘোড়া হেঁকে
দাঁড়িয়ে মুকুট পরে আপন নিয়মে দুই হাতে
রূপে যে ঝরণা মেয়ে—হীরা জ্বালে, দীপ্য মহিমায় ;
সুরের বাদামী ঠোঁটে খুঁটে খায় পতঙ্গ ভ্রমর—
আঙুলে বাতাস খেলে, নখে থাকে অঘ্রাণের ধান
নীল চোখের পাতায় কাল কাল ঢেউ, সমুদ্রের······

তামা গলা হা হুতাশ পোড়া মুখে পথ ঘুরে ঘুরে
ছিঁড়েছি আমিই সব– তুরূপের তাস, গুপ্ত সুখ,
শুকনো মাটির গন্ধে কেঁদে কেঁদে বাউল পোষাকে
ফিরেছি নিশুতি রাতে দগ্ধ ঘরে কাটা-ছেঁড়া লাশ ;
স্বপ্ন গেছে হা হা চৈত্রের বাতাসে যেন ঝরাপাতা
টুপটাপ ডুবে গেছে অন্ধকার পুকুরের জলে —
সময় ঘড়ির কাঁটা চুরি করে একদল কাক
শুধু যায় উড়ে উড়ে 'কা-কা' ডেকে শ্মশান আকাশে।

একটি কবিতা ঃ বনলতা সেন

কৃষ্ণসাধন নন্দী

এক একটি কবিতা কবিকে চিহ্নিত করে রাখে। কবি তার জীবনে অনেক কবিতা লেখেন যা ব্যঞ্জনার ঐশ্বর্যে ব্যপ্ত, তবু ঐ বিশেষ কবিতাটি কবিকে এনে দেয় জনপ্রিয়তা, চরম সার্থকতা। তাকে ঘিরে কবি বেঁচে থাকেন। এম্নি সার্থক সৃষ্টি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন'। কেন এই কবিতাটি কালজয়ী হল, সাধারণ পাঠকের হৃদয়ে যাদুকাঠি ছোঁয়াল, তা নিশ্চয়ই ভাববার আছে। আর সেই অসামান্য সার্থকতার পিছনে কী এমন আছে যা তাকে এমন ভাবে চিহ্নিত করে, বিশিষ্ট করে ?

আঠারো পঙতির লিরিক কবিতা এটি। ছয়, ছয়, ছয়, তিন স্তবকে বিভক্ত। প্রতিটি স্তবক শেষে বনলতা সেন উচ্চারণে সংগীতমূর্চ্ছ্না সৃষ্টি করে। শব্দ ব্যবহারে কিছু ইতিহাস, ভূগোলের গন্ধ থাকলেও, নতুন কোন শব্দের ব্যবহার নেই। যা আছে, যা থাকলে কবিতা সুন্দর, সার্থক হয়ে ওঠে, তা হল প্রকাশ ও বক্তব্যের সাযুজ্যবোধ। এই সাযুজ্যবোধে, হরগৌরী মিলনে কবিতাটি সুন্দর হয়ে উঠেছে; মৃত্যুর সাতাশ আটাশ বছর পরেও বেঁচে আছেন কবি অংগে অংগে জড়িয়ে নামটির সংগে। এম্নি জনপ্রিয়তা চল্লিশ, পঞ্চাশ দশকের কোনোও কোনও কবির ভাগ্যেও জুটেছে। দিনেশ দাশের 'কাস্তে', নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর 'কোলকাতার যীশু', সুনীল গঙ্গোপাধ্যাধ্যায়-এর 'কেউ কথা রাখেনি', কিশোর কবি সুকান্তের 'রানার' প্রভৃতি এরকম জলন্ত উদাহরণ। সময়ের ঝাড়ুতে সব ঝাড়মোছ হয়ে যায়, থাকে দু'একটি। এম্নি দু'একটির একটি 'বনলতা সেন'।

একবাক্যে অনেকেই প্রশ্ন তুলতে পারেন, অনেক তো হয়েছে, আবার কেন ? কিন্তু একটা কথা মনে হয়, যা মহৎ – যা চিরন্তন তাকে নিয়ে মানুষের বলা ফুরোয় না। যদিও সব বলা জাতে ওঠাবার মতো কিছু হয় না। তবু তাঁকে ঘিরে কিছু শ্রদ্ধা, ভালোবাসা জানানো। এটুকুই বা কম কী !

শুরুতেই দেখি, 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'। কবির এই পথ পরিক্রমা প্রাচীন ইতিহাস ঘাঁটার পথ-পরিক্রমা। অতীতের দিকে, ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন কবি। সিংহল সমুদ্র, মালয় সাগর, বিদর্ভনগর, দারুচিনি দ্বীপ, বিম্বিসার অশোক প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে মনে হতে পারে কবিতাটি ইতিহাসের কিংবা ভূগোলের। মননের কোন গন্ধ এই স্তবকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু না—স্তবকের শেষ দু লাইনে এসে কবি চমকে দেন, বিস্মিত করেন আমাদের—

'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন আমারে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন' এই তো কবিতা। এতক্ষণ আমরা হয়তো এটুকু শোনবার জন্যই অপেক্ষা করছিলুম। এখানে ভূগোল নেই, ইতিহাস নেই নেই কোন তত্ত্বের কচকচি--যা আছে তা হ'ল প্রেম।

এই প্রেমে কোন শরীরী দেওয়া-নেওয়া নেই। একধরণের টান আছে আকর্ষণ আছে শুধু; যা ভূগোল কবিকে দিতে পারেনা, পারে না ইতিহাস—প্রকৃতি পারে, নারী পারে। এই নারীর প্রেমে জীবনের আশ্রয় খুঁজে পেতে চেয়েছেন কবি বনলতা সেনের মধ্যে। জীবনের বিচিত্র সংঘাতে ক্লান্ত কবি দু'দণ্ডের শান্তি পেয়েছেন। এটুকুই বা কম কী! তাই বলা যেতে পারে, 'বনলতা সেন' শুধুমাত্র তার কল্পলোকের মানবী হয়ে থাকেনি, রক্ত মাংসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

তারপর কবি নেমে আসেন, মেতে ওঠেন প্রেমিকার শরীরী বর্ণনায়। দ্বিতীয় স্তবকে তিনি খোলাখুলি বলে ওঠেন—

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা/মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য…………

বিদিশার কালোরাত্রির সংগে কবি ভ্রমরকৃষ্ণ চুলের ও শ্রাবস্তীর কারুকাজের সংগে মুখের তুলনা করেন। তখন মেনে নিতে দ্বিধাবোধ হয় না, তার এই প্রেমিকা রক্ত মাংসে জীবন্তই, যতোই তাতে অতীত সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি লুকান থাকুক। তবে কবি যার জীবনের রূপ অন্ধকার চেতনায় আচ্ছন্ন, বেশীক্ষণ এই ছবি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। একধরণের মানসিক যন্ত্রণা কবিকে কষ্ট দেয়, হতাশা, অসহায়তা যেন গ্রাস করে। তখন তাকে বলতে শোনা যায়, 'অতিদূর সমুদ্রের' পর হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা'। কবিও যেন এরূপ জীবনসমুদ্রে হালভাঙা নাবিকের মত দিশাহারা। সমস্ত আশা যেন চূর্ণবিচূর্ণ। কিন্তু এই দিশাহারা সময়ে বনলতা সেনের দেখা পান কবি, সাময়িক দুঃখবোধ ভুলে যান। 'পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে' কবিকে প্রশ্ন করে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' এরকম আন্তরিক টান—দীর্ঘ বিরতির পর দেখা হওয়ার অনুরাগ কবিকে রঞ্জিত করে রঙে বর্ণে। কতো সহজ কথা, কিন্তু কি আন্তরিক কি আকুতি। এম্নি করে কবি মোহিত করেন আমাদের। এক প্রবহমানতার টানে ঠেলে নিয়ে যান কবি ব্যঞ্জনাসৃষ্টির চমৎকারিত্বে, বাগভঙ্গির অভিনবত্বে। কবিতাটির শেষ স্তবকে এসে কবি যেন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েন। আগে থেকে যে সাময়িক হতাশা ছিল তা যেন আরও গাঢ় হয়। 'সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে'—এখানে মৃত্যুচিন্তা কবিকে গ্রাস করে। সন্ধ্যা তো মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র। কবি স্থির থাকতে পারেন না, সমস্ত প্রকার জাগতিক আনন্দবোধ তার সামনে শূন্যতায় পর্যবসিত হয়। এইভাবে আশাহতের বেদনায়—না পাওয়ার বেদনায় ভরে যায় অন্তর। পজিটিভ কিছু খুঁজে পান না তিনি। এই স্তবকের প্রতিটি পঙক্তিতে এম্নি হতাশাব্যঞ্জক ছবি দেখতে পাই আমরা। 'ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন'-এও তো সমাপ্তির কথা। নিঃসঙ্গ অন্ধকারে ডুবে যান তিনি। হারানোর ভয় পেয়ে বসে কবিকে। আবার হারানোর মাঝে—জমাট কালো মেঘের মাঝে বিদ্যুৎ আলো ঝলকানির মতো কবি দেখা পেয়ে যান 'মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন'কে। এই পাওয়া যেন কবির বড়ো পাওয়া। সাময়িক ভাবে কবি যেন আনন্দ পেতে পারেন, দু'দণ্ডের শান্তি লাভ করেন।

'বনলতা সেন'-এই ভাবে শুধু কবির নায়িকা মাত্র হয়ে থাকেনি, চিরন্তন মানব সমাজের নায়িকা হয়েছেন'।

সমগ্র কবিতাটিকে এইভাবে দেখার পর আমাদের মনে প্রশ্ন উঁকি দেয় 'বনলতা সেন' কবিতাটি কি ধরণের কবিতা ? বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে কবিতাটি। কেউ বলেছেন, ইতিহাসের কবিতা কেউ বলেছেন প্রেমচেতনা'ই কবিতাটির মূলকথা, কেউ বা মৃত্যুচেতনাকেই বেশী প্রশ্রয় দিয়েছেন। শ্রদ্ধাভাজন সেইসব আলোচকগণ নিশ্চিত করে আমাদের বলেননি কবিতাটি কোন পর্যায়ের। একধরণের দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে গেছে আমাদের। তবে 'সাতটি তারার তিমির' ও 'বনলতা সেন' কবির যে সময়ের রচনা, সেই সময় বিভিন্ন কবিতা থেকে বুঝতে পারি, মৃত্যু চেতনায় আচ্ছন্ন ছিলেন কবি। সেজন্য মনে হয় ইতিহাস নয়, প্রেম নয় মৃত্যু চেতনা সমগ্র চেতনার উর্দ্ধে থেকেছে কবিতাটিতে।

ঋণস্বীকার : কবি জীবনানন্দ দাশ—সঞ্জয় ভট্টাচার্য

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

O আপনাদের পাঠানো 'গোধূলি মন' নিয়মিত পাচ্ছি। অশেষ ধন্যবাদ। আপনাদের পত্রিকায় অনেক নতুন লেখকের দেখা পাওয়া যায়। এটা বিশেষ আশ্বাসের কথা। নতুন হলেও লেখার ঝাঁজে সতেজতা আছে। অরুণ চক্রবর্ত্তী, ফারুক নওয়াজ প্রভৃতির কবিতা যদিও বিষয়ে পুরনো তবু অনুভবের আন্তরিকতা হৃদয় স্পর্শ করে। প্রবন্ধের দিকে নজর দিলে ভাল হয়।

— বার্ণিক রায়/কলিকাতা-৪৮

O ....'গোধূলি-মন' পূজোর পর দু'টি সংখ্যা হাতে পেয়েছি। বইয়ের সমালোচনা বিভাগটি উন্নততর হওয়ায় খুশী। সংবাদ বিভাগটি আরও উন্নতমানের করা সম্ভব। অন্ততঃ সাহিত্য বিভাগের আরো কিছু খবরাখবর পরিবেশিত হোক। বাংলাদেশ আপনার পত্রিকা মারফৎ আমাদের আরো কাছে আসছে। এটা আনন্দের। —অজিত বাইরী/উদয়নারায়ণপুর/হাওড়া

O......গোধূলি-মন পৌষ ১৩৮৮ সংখ্যাটি পেয়েছি। এই মাসিক ধ্রুপদী সাহিত্য পত্রিকাটি নিঃসন্দেহে উন্নতমানের। মফঃস্বলের পত্রিকাগুলি থেকে 'গোধূলি মন' ভিন্ন ধরণের। এতে নানা ধরণের লেখা রয়েছে। প্রথমেই আকৃষ্ট করে সুবোধ দাশগুপ্তের আঁকা প্রচ্ছদ। অপূর্ব। পূর্ব বঙ্গের রম্য কথাশিল্পী সাহাদত আলী আনসারীর সঙ্গে ফারুক নওয়াজের মূল্যবান সাক্ষাৎকার। প্রবন্ধ তিনটি চমৎকার। পাঠকবর্গ দীর্ঘদিন মনে রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পূর্ব বঙ্গের সত্তর দশকের প্রশংসিত কবি সাঈদ সানাউল হকের ছবি ও পরিচিতি সহ গুচ্ছ কবিতা আমাকেও বেশ আকৃষ্ট করেছে। ফারুক নওয়াজ, মধুসূদন ঘাটী, মহসীন মুর্শেদ, অরুণ চক্রবর্ত্তী, যদুপতি মল্লিক প্রমুখের কবিতাও নাম করা যেতে পারে। তাছাড়া সম্পাদকীয়তে যা লেখা আছে বাস্তবে তা সম্পূর্ণ সত্য। পুস্তক সমীক্ষাও চমৎকার। সাহিত্য আসরের সংবাদ পাই। সাহিত্যের পথে নতুন নতুন পদক্ষেপে গোধূলি মনের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক.........। —নির্মল তেওয়ারী/বাঁশবেড়িয়া/হুগলী ৭১২৫০২

সংবাদ

খাজুটি এস্ এস্ ক্লাবের সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান ঃ

হাওড়া জেলার বাগনান অন্তর্গত খাজুটী স্পেলণ্ডীড স্পোর্টিং ক্লাবের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত ৩১শে' জানুয়ারী রবিবার অনুষ্ঠিত হল। বর্ণাঢ্য পরিবেশে ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন শ্রীনিতাই আদক মহাশয় (বিধান সভার সদস্য, কল্যাণপুর কেন্দ্র) বাইনান আজাদ হিন্দ সমিতির ৫০ জন শিশুর একটি সুসজ্জিত দল ব্যাণ্ড ও বাঁশির তালে তালে মার্চ পাষ্ট করল ১২০ জন প্রতিযোগীকে সঙ্গে নিয়ে। বিকালে খাজুটী ফুটবল মাঠেই অনুষ্ঠিত হল হাওড়া জেলার আন্তঃথানা ফুটবল প্রতিযোগিতা। হাওড়া জেলাশাসক আর, কে, প্রসন্নন ও প্রাক্তন খেলোয়াড় রতন সেন মহাশয় সহ বহু বিশিষ্ট অতিথি উক্ত খেলায় উপস্থিত ছিলেন। বাগনান থানা ৪-০ গোলে পাঁচলা থানাকে পরাজিত করে। গোলগুলি করেন যথাক্রমে মহম্মদ ইসমাঈল, জগদীশ মান্না, মাসুদ আলি, উমাকান্ত ভৌমিক। শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচিত হন বাগনান থানার মহম্মদ ইসমাইল এবং পাঁচলা থানার আতিবর রহমান। খেলার প্রারম্ভে জেলাশাসক মহাশয়কে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয় আজাদ হিন্দ সমিতির শিশুদল দ্বারা পুরস্কার বিতরণ করেন জেলাশাসক ও রতন সেন মহাশয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 'গীতাঞ্জলী' সংস্থার শকুন্তলা নৃত্যনাট্য দর্শকদের মুগ্ধ করে, একটি স্মারক পত্রিকাও ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়। শ্রীরতন সেন এবং কবি আব্দুস মুজিদ যথাক্রমে সভাপতি এবং প্রধান অতিথি ছিলেন।

পলসায় সাহিত্যবাসর ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

এক পরিচ্ছন্ন সকাল থেকেই কার্তিকচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গল্পকার দুলাল চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় —এক সাহিত্য বাসর বসেছিল গত ৩১শে জানুয়ারী। আসরে উপস্থিত কবি ও গল্পকারদের মধ্যে ছিলেন মতি মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল অধিকারী, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ চক্রবর্ত্তী, দীপক রায় চৌধুরী, অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দ চৌধুরী, রণজিৎ ভট্টাচার্য, শ্যামলচরণ সাহা, রাজকুমার চৌধুরী, রতনলাল দত্ত, বর্ধমানের মহিলা কবি গৌরী চট্টোপাধ্যায়, ধ্বনি সম্পাদক সুধীর অধিকারী, শক্তি হাজরা আরও অনেকে। কবিতার গানে শ্রোতাদের মন ভরিয়ে তোলেন ঋষিণ মিত্র। সুপ্রিয়া রায় ও সুস্মিতা রায়ের গান অপূর্ব্ব। সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান সন্ধ্যা সাতটায় শেষ হলো। উপস্থিত কবি সাহিত্যিকদের অভিনন্দন জানালেন মাণিক মাজিল্যা। শম্ভু বাইতির ঢাকের লহরী কবিদের মন জয় করেছে।

ফর্ম— ৪ (৮ ধারা অনুযায়ী) পুস্তক রেজেষ্ট্রিকরণ

আইন মোতাবেক গোধূলি মনের বাৎসরিক বিবৃতি

প্রকাশ স্থান—নতুনপাড়া, চন্দননগর, হুগলী, পঃ বঃ

প্রকাশ কাল—মাসিক

মুদ্রাকরের নাম রবীন্দ্রনাথ দে (ভারতীয় নাগরিক)

ঠিকানা—বারাসত, চন্দননগর, হুগলী, পঃ বঃ

প্রকাশক/সম্পাদক/সত্ত্বাধিকারী— অশোক চট্টোপাধ্যায় (ভারতীয় নাগরিক)

ঠিকানা—নতুনপাড়া, চন্দননগর, হুগলী, পঃ বঃ

উপরোক্ত তথ্যাবলী আমার জ্ঞান বিশ্বাস মতে সত্য

(স্বাঃ) অশোক চট্টোপাধ্যায়

২০/২/৮২

প্রবন্ধ

কবিতা

এছাড়া নিয়মিত বিভাগ

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

82/FM/B-346

FINANCE MINISTER
INDIA
April 26,1982

প্রীতিভাজনেষু,

'গোধূলি মন'-এর প্রতিলিপির জন্য ধন্যবাদ। বাংলা সাহিত্য প্রেমী মানুষের সামনে সুদূর গ্রামের প্রকৃত যোগ্য লেখককে তুলে ধরবার চেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

প্রীতি ও শুভেচ্ছান্তে,

বিনীত—
প্রণব মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাবরেষু

অশোকবাবু

আদাব

আশা করি আপনি ভালো আছেন,

'গোধূলিমন' একুশে সংখ্যা পেলাম— ভালো লাগলো ধ্রুপদী সাহিত মাসিক 'গোধূলিমন' একটু ব্যতিক্রমধর্মী বলেই—বরাবর ভালো লাগে। মাঝে মাঝে পাচ্ছি। উশীনর চট্টোপাধ্যায়-এর 'কবিতার পাঠক ও পাঠকের কবিতা' একটা সুন্দর সৃষ্টি বটে।

তরুণ কবিদের লেখাও বেশ সৌন্দর্য্যবহ। 'গোধূলিমনে 'ফারুক নওয়াজ ফ্যান্টাসী কিং।

—হাসান কামরুল/পায়গ্রাম/কশবা/খুলনা/বাংলাদেশ

প্রিয়বরেষু,

আপনার সম্পাদিত 'গোধূলি মন' নিয়মিতই পাই।

প্রতিটি সংখ্যাই চমৎকার শোভন। ছাপা ও কাগজ উচ্চাঙ্গের। লেখাগুলিও সমৃদ্ধ, উত্তীর্ণ হবার মন্ত্র শেখায় আমাদের। গ্রামবাংলা থেকে প্রকাশিত যে কোন সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে সমানে পাল্লা দেবে। নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য পত্রিকার মর্য্যাদা পাবে এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে। এর জন্য আপনাকে গভীর অভিনন্দন জানাচ্ছি।

—শান্তি রায়/হিজলডিহা/বাঁকুড়া

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি মন

২৪ বর্ষ/৫ম সংখ্যা/ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯

প্রতি সংখ্যা এক টাকা
বার্ষিক (সডাক) দশ টাকা

॥ সম্পাদক ॥
অশোক চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

আসলে যা করতে চেয়েছিলাম আমরা -- যে ধরণের একটি সুপরিকল্পিত 'কবিতা সংখ্যা,' তা করা হয়ে উঠল না। লেখার কথা দিয়েও নামীদের অনেকের সঙ্গেই শেষ পর্য্যন্ত যোগাযোগের অভাবে সংগ্রহ করতে পারা গেল না তাঁদের কবিতা। তবে এর ফলে লাভ হয়েছে অনেক তরুণ কবির।

বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন সময়ের, বিভিন্ন জেলার কবিতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে প্রচুর। শস্য শ্যামলা জেলার কবিদের কবিতায় যেভাবে সংরাগিত মূর্চ্ছনায় বেজে ওঠে শব্দাবলী, স্বভাবতই রুক্ষ - খরাদগ্ধ কোন জেলার কবির কবিতায় সে সুর বাজেনা। বাস্তব চিত্রকল্পের সুকঠিন শর, সরাসরি বিদ্ধ করে আমাদের। আবার একই সময় একই জায়গায় বসে একজন পঞ্চাশের কবি যে কথা যেমন-ভাবে বলতে চান কবিতায়— একজন সত্তরের কবি কিংবা আরও পরবর্ত্তী প্রজন্মের কবির কবিতায় অন্য সুর বাজতে থাকে। একজন পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) কবির কবিতায় মাটি যেভাবে প্রাণবন্ত হয়ে মাটির গন্ধ ছড়ায়— একজন পশ্চিমবঙ্গের তরতাজা কবির বুদ্ধিদীপ্ত কবিতায় সে গন্ধ মেলেনা, বোঝা যায় মেধার অনুশীলন হয়তো সার্থক হয়ে উঠেছে।

শব্দের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কবিতার ক্লাস নিতে আসিনি আমরা। কোন্‌টা কবিতা, কোন্‌টা কবিতা নয় – তার ধরা বাঁধা নিয়মাবলী প্রণয়ন ও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু বিভিন্ন ধরণের কবিতার মালা গেঁথে এনেছি আমাদের কবিতা-প্রিয় পাঠকদের দরবারে।

○ সম্পাদকীয় কার্যালয় : নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর ॥ হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥ ভারত

কবিতা

বোকে/গোপাল ভৌমিক

আসঙ্গের দৃপ্তি নয়,
নয় মহা প্রভাস-মিলন ;
সংগ্রামে কঠিন দিন
রূপোলি রেখায় যদি ওঠেই ঝিকিয়ে
তাই নিয়ে মেতে উঠে
জয়গান করি জীবনের।

যদি কোন কথা ভাবি অগ্রপশ্চাতের
তখন বিরাট ঝুঁকি
অকস্মাৎ দেয় এসে উঁকি
এবং বিব্রত হয়ে
খাতা নিয়ে করি আঁকি বুঁকি।

এ জীবন অঙ্ক নয়
কূটতর্ক দর্শনেরও নয়
ছড়ানো ছিটানো মুক্তা
সংগ্রামের পথে মহাভয়
প্রাসাদের দ্বারী হয়ে সদা জেগে থাকে।
যার ধনী হতে শখ
নির্মম তো হতে হয় তাকে
যা-খুশি বলুক লোকে
নায়কের কি আসে কি যায়
প্রজ্ঞা প্রার্থনীয় নয়
পেতে চায় করতালি, লোকে।

সুখের জন্যে/নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সুখের সন্ধান করি আমরা সবাই রাত্রি দিন,
পাই না ত দেখা তার। দুঃখের সুতোয় ক্রমাগত
নূতন নূতন জট পড়ে যায়, নানা অভাবিত
যন্ত্রণার কালো মেঘ চিত্ত করে বিবর্ণ মলিন!
শুয়ে শুয়ে সকলেই স্বপ্ন দেখি উজ্জ্বল রঙীন,
দিনের পাথার ভেঙে পারে যেতে চেষ্টা করে কত,
মাঝপথে ঢেউ এসে ঠেলে ফেলে দেয় অবিরত,
দূরবর্তী তটরেখা ধুয়ে মুছে হয়ে যায় ক্ষীণ।

এই ত জীবন, একে ভাল মন্দ বলুন যা চান,
দুঃখকে অব্যর্থ জেনে সুখকে রাখুন কল্পনায়,
ক্ষণিকের অবকাশে মাঝে চিন্তার ডানায়
উড়ে গিয়ে দিগন্তরে, যত খুসী করুন সন্ধান
সুখের ঠিকানা : ঠিক কোন কোণে তার অবস্থান
জানা গেলে, বলবেন আমি আছি তার প্রতীক্ষায়।

২

দেখেছি সুখের মুখ, ঘুমন্ত সে ছিল মর্মতলে,
দুঃখের মুখোস পরে চেয়েছিল ঘাবড়িয়ে দিতে,
আমি তাকে চিনেছি ত তাই নিজ বলিষ্ঠ সম্বিতে
একান্ত নির্ভর করে ধরেছি এবং বাহুবলে
আয়ত্তে এনেছি তাকে। আজ সে সহাস্যে কথা বলে,
বলে, আমি ছদ্মবেশে ঘুরি ফিরি সারা পৃথিবীতে
কখন কোথায় কারা সুখ খোঁজে তার বার্তা নিতে,
কেন না দুহাত ভরে দোব সুখ যথা কাল হলে।

৩

যারা শুধু পেতে চায়, ইচ্ছা নেই কিছুই দেবার,
কান্নার দুনিয়া থেকে চলে যায় খালি পিছু হঠে,
নিজেরা অস্থির হয় অণুমাত্র শংকায় সংকটে,
অথচ অন্যের ক্লেশ যদি হয় অসহ্য অপার,
তাকায় না একবারও, আত্মমগ্ন সেই ভ্রষ্টাচার
দুর্বৃত্তদের কারো আমি কোন দিন যাই না নিকটে!

চিৎপুরের রাস্তায় পালকি/অজিত বাইরী

হঠাৎ চিৎপুরের রাস্তায় নেমে এ'ল পালকি
শোনা গে'ল বেহারাদের হুম্ হুম্ শব্দ।
মন্ত্রবলে কি নেমে এ'ল সমস্ত ট্রাফিক-পুলিশের হাত
লাল বাতির নিষেধ নিভে গে'ল।
আর সমস্ত স্কাইস্ক্রেপার হুড়মুড় ক'রে ভেঙে
মধ্যদুপুরে
ঘন জঙ্গলে ঢেকে গে'ল চারপাশ।
কে চলেছেন ওই পালকিতে ? জোড় সাঁকোর
ঠাকুরবাড়ি কোন বউ
সঙ্গে পেয়াদা-পাইক।

আমি কি স্বপ্নে পিছু হটছি
কলকাতা কি রকম ছিল ?
গোবিন্দপুরের মাঠে পাওয়া যাবে
কৃষকের লাঙলের ফাল ?

আর কোন গোরা নাবিক গালে হাত রেখে
ভাবছে কোনখানে ফেলা যাবে তাঁবু ?
চিৎপুরের রাস্তায় পালকি, কারা যায়—
আমি নিবিড় এক চলচ্ছবির স্বপ্নে মগ্ন আছি।

সরোদে দেশ রাগের আলাপ/অজিত ভট্টাচার্য

সরোদে দেশ রাগের আলাপ।
একুশ বছরের সদ্য যুবক যুবতীরা
একাশীর বৃদ্ধ বৃদ্ধা নরনারীর সংগে
বারে বারে ফিরে ফিরে আসা সমে মাথা নাড়ে।
সরোদীয়ার সুরের নির্দিষ্ট বিরতিতে সম্মিলিত হাততালি।
কড়ি ও কোমল স্বরের ইন্দ্রজালে বিমুগ্ধ উচ্ছ্বাস।

সরোদীয়া আলাপের বিমুগ্ধ বিস্তারে
বিপুল শ্রোতৃমণ্ডলীর মুগ্ধতায় ঈশ্বরের
মহিমা অনুভব করে।
অদৃশ্য ঈশ্বর নিজেকে গুটিয়ে আনে
সরোদীয়ার সামান্য আঙুলে।
তারগুলো গণমানসের আবেগে আঘাতে আঘাতে বাজে
ঝাড়ের লণ্ঠনের মায়াময় আলোকে জলসার আসরে
মায়া……ভ্রম……বিভ্রম।

জলসার আসরে সরোদে দেশ রাগের আলাপ,
বাইরে অপ্রবেশ দর্শকের বন্ধ্যা হতাশা।

তুমি রবে নীরবে…/প্রণব মাইতি

সান্ধ্য আহ্নিকের মতো প্রতিদিন ঘুরে ফিরে আসো
বাচাল সত্তার মধ্যে ফিরে যাই ফিরে ফিরে যাই
তোমার স্মৃতির সর্গে সে মানুষ আছে কিংবা নাই
তবুও সে ফিরে আসে দেরী হয়, তবু ভালবাসে
তাকে নয় তার কথাবার্ত্তাময়-দৃপ্ত উপস্থিতি
সন্ধ্যায় সে কাছে এসে স্মারকলিপির মতো
স্মৃতিভারে সে তোমায় প্রতিক্ষণে করেছে আরতি

এখন বিদায় বেলা জ্যোৎস্নালোকে কোন প্রেম নেই
শুধু শুধু অর্থবহ আলোকস্পর্শী সব রাত
প্রতিদিন উদাসীন ঐ সব যুবকের তাসের প্রাসাদ
ভেঙ্গে যায় টোল খায়-অনুক্ষণ হৃদয় ছুঁতেই
ফিরে ফিরে বার বার নির্ঘিম্নে মাছি ও মমতায়
সে খোঁজে নিজের পদ্য, তোমাকেই প্রতিটি পৃষ্ঠায়

হৃদয় জানে না/রথীন্দ্রনাথ রায়

মদিরতা আমাকে খায়
পূর্ণগ্রাস থেকে বিচ্ছিন্ন আঁধার
তিয়াস মেটে না তার

চোরাবালিতে গেঁথে বসছে চটিজুতো
হাঁটু আর বুক

সে উদ্বেলিত
হৃদয় জানে না কি পেল
স্বচ্ছ জলে অপাপবিদ্ধ মুখ
ক্ষত আর দাগ।

দু'খণ্ড ঃ মা কে/বঙ্কিম চক্রবর্তী

এই গৃহ ছেড়ে, কবে যেন কথা দিয়েছি
আমিও নেমে যাবো রক্তের গভীরে
কথা দাও, কফিনের ভাই আমার—
ডেকে নেবে গানে গল্পে আজীবন
এই মাটির খুঁটে খাওয়া সংসার পরীকে
কর্ষণে কেউ ডেকে নাও একুশ তারিখে।

২

শাণিত ভাষায় কবরের ভিতর থেকে কথা বলে উঠছো-
ভাই আমার।
যা সহজে শেখা যায়, শিখে নিচ্ছে পাখ-পাখালি
ভাই আমার, দুঃখ জাগা দিনে
রৌদ্রে কাঁপে ছুরি।
নাচে, বাউলের দিগন্ত জয়ী হাওয়া
যাওয়া, আমারও তেমন করে যাওয়া।
ভাই আমার
আমাদের শস্যময় ফসল, ক্ষেত-খামার, তুমি
কি দেখছো পাষাণী ?
এপার ওপার জন্মদাত্রী, ভাগের জন্মভূমি ?

সুখ অ্যাসবেক ঢেঁড়রা পিটে/মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

হিলাগুলান কঁ্যাদে কঁকাই মারছে খালি ভাতের ল্যাগে—
ভাত নাই ভাত—টুক্‌রা ম্যাড়ের গন্ধ প্যালে হুদ্‌কে উঠে।
তিন দিন আজ ভয়েই আছে—চাল চুলা নাই—নাই বেসাতি
পড়শীরা সব দেখছে ভ্যালে আগুড় খুলে আড়ো ব্যসে।

কুথাও দাদন পাছি নাইক—শুধা দিতম আঘণ মাসে
গলা ঘরে ব্যল্‌লাম : "দাও পাঁচট টাকা আজের পারা
ছিলা গুলার প্যাটে দিব নুন লঙ্কি জোগাড় ক্যরে।"
ব্যল্‌ল গলা—"ও পেঁচির মা দম্‌তক তুই ধার ক্যরছিস
ইম্‌নি কারলি শুধ্‌বি কি সে? জানিস ত তুই ইবার থ্যাকে
টাকায় টাকা সুদ ল্যাগবেক—ধান ঠেঙালেই আঘন মাসে।"

বাপ্‌ ভাতারী গুলুনটাতেই বাদ স্যাধ্‌ল—ব্যল্‌ল রাগে—
"ধমক ল্যাগলে ধরকে আসিস—কাজ ফুরালেই লুকাঁই পালাস
ভোট দিয়েছিস যাকে—ইখন তার কাছে যা লেগা দাদন
তুদের গলা পেধান হ্যলে দুটা জি. আর লেখে দিতেক
বেগার খাঁটাই লিতম কি আর? আড় বুঝা সব ছহ্‌রা মাগী
না খঁ্যায়ে মর্‌—দেখলে তকে গটি আমার জব্‌কে উঠে।"

নাইক খ্যাটন—প কে গেলম—ভ্যাবে ভ্যাবে স্যায়াংটাতে
ঘুণ ধ্যরেছে। কুনুকালে সুখ হ্যল নাই—কপাল খারাপ :
ভাদুর পরব—ছাতার পরব সব পরবের হুড়াহুড়ি
কুটুম অ্যালে খাওয়াব কি? ঘরে ছিল কুঁখ্‌ড়া দুটা
কাশীপুরের হাটে বিকে মরদটাতে মদ গিলেছে।
অমন ভাতার কাজ কি হামার—খেদাড়ব আজ খাল ভরাকে
ব্যসে ব্যসে কেবল খাছে নাক ডাকাছে র‍্যাতের বেলা
ঘুঘি অ্যাড়ে মাছ অ্যানতে আক্কেল নাই—মাছ অ্যান্‌লে
হসের মুড়ি—চাল পুয়াটাক প্যাথম কুথাও বিক্রি কারে।

ছুটু লকের জনম কেনে? সারা জীবন ভখেই মরা?
ভখে শুকাই মারব কেনে? স্যায়াং আছে খ্যাটে খাব
ইমন দিন ট প্যারাই যাবেক—সুখ অ্যাসবেক ঢেড়রা পিটে।

ভালোবাসা আজ/ভাস্বতী চক্রবর্তী

কালো কফিনেতে মোড়া
মৃত ভালোবাসা
স্বজন হারানো শোকে
স্তব্ধ হয়ে আছে।

অজগর চোখে বন্ধ
হরিণ শাবক
করুণা জাগানো মুখে
অনন্ত জিজ্ঞাসা।

সভ্যতার শেষ রাত্রি
তাই বাসি হোয়ে গেছে
আজ ভালোবাসা।

উত্তরণ/শান্তি রায়

দীর্ঘ রাত্রির সীমান্তে এসে দাঁড়াই
নতুন সূর্যোদয়ের শপথে উজ্জীবিত হই
সবুজ বসতির কাছে অন্বিষ্ট সকালের গভীর প্রত্যয়ে :
আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার :

আমরা তো জানি : এখন চেতনায় আগুন
দাউদাউ হলুদ আগুন
আমরা তো জানি : এখন মড়কখোলার দিকে হেঁটে যায়
বিবর্ণ নিরন্ন মানুষ
—হীরা ও চুনির মতোন মূল্যবান ভালোবাসা বন্দক আছে
বেইমান কালের গুহায় !
জীবনের যতোসব মেকি ও পাপ আমাদের আচ্ছন্ন করে,
ঘিরে থাকে বিশাল অক্টোপাশের মতোন…

এসবের থেকে তাই উত্তরণ চাই
চাই ক্রমমুক্তির টকটকে হৃৎপিণ্ড-সকাল… ॥

অস্থিরতা/কৃষ্ণেন্দু বসু

অস্থিরতা বাড়ছে।
কারা যেন লেত্তির সূক্ষ্ম টানে আমায়
ছুঁড়ে দিয়ে গেছে পথের ওপর।
বন্ বন্ ঘুরছি লাট্টু।
স্থির হয়ে কোথাও বসতে পারছি না দু'দণ্ড।
কিছু একটা ভয়ংকর ঘটে যাবার অমোঘ আশংকায়
বুক ধড়ফড়, চোখের মণি নাচ্ছে।
চাবি দেবার বদলে আছড়ে ভাঙছি হাতের ঘড়ি
নিজের দাড়ি কামাতে প্রবল আক্রোশে
কেটে নামিয়ে নিচ্ছি
শত্রুর গাল ॥

ফিরে এসো, ফুলের বালিকা/দীপক রায়চৌধুরী

অলকানন্দার স্রোত কেড়ে নেবে সব, জেনে
বুকের মধ্যে পুষে রাখো তুরন্ত সমুদ্র, গভীর,
জুনপুটে ঝাউয়ের ছায়ায় ;

কেন এক পিয়াসা অস্থির বার বার তোমাকে তাড়ায়

এবার ফেরো, ফিরে এসো, প্রিয় ফুলের বালিকা !

জানে নদী, জানে গাছ/অমর ঘোষ

যাকে চিনি
খুব জানি
এবং বুঝি
হাতে তার তোড়া-তোড়া ফুল
সবুজ আবীর —

যাকে দেখিনি
কথা রাখিনি
অথবা ভাঙিনি জল
জলের কারণে তবু মধ্যযামে
অস্থির হৃদয় ;

মাটিতে শিকড়ে আসি নিপুণ ছাঁদে
গোপনতা ঢেলে দিই ছলে ও কৌশলে
আমার শহুরে ঘ্রাণ জানে নদী, জানে গাছ
তবুও কপাল গুনে অচেনার ভান
পারলে ভাঙোনা কেন ঝকঝকে কাচ !

পোষাক/স্বপন নন্দী

তার পোষাক ছিল
দ্বিধাহীন অহঙ্কার ছিল ধনবতী শিল্পের মত
ঈর্ষার সকল্লোল সমুদ্র, ছিল
উচ্চ ললাটে সৌভাগ্যের বলিরেখা,
তার পোশাক ছিল।

আমার পোশাক ছিল না।
লজ্জাবতী গাছের মত আমি কেবল ন্যুব্জ ভীরু
আগলে রাখি বুকের খাঁচায় একটি শুধু পরম পাখি
ভালবাসা।

ভালবাসাই আমার পোষাক
মাছের গায়ে আঁশটি যেমন
আঁকলো আমায় ভালবাসায়
চন্দ্রপ্রভা একটি নারী।
বেশ তো আছি ঈর্ষাবিহীন নিরাবরণ
রুপোর মোড়ক অহঙ্কারটি নাইবা পেলাম।

অরুণ কুমার চক্রবর্তীর কবিতা

বিবাহ

মিষ্টি সুরে ডাকলে দূরে

তুই পাহাড়ের ছাওয়ায়

পাহাড় তো নয়, জমাট মনন

জাল ফেলেছি হাওয়ায়

বিশুদ্ধ এক প্রোটিন পাব

এমনই কথা ছিল

উপত্যকায় মুখ রেখেছি

কান ছুঁয়ে তুই চুড়ো

এবং তুমি যখন খুশি

যেমন খুশি পুড়ো।

এবং মানুষ, তোমাকে

জলের নীচে ভাসছি এবং মানুষ, তোমায় ডাকছি

শুনতে পাচ্ছো··· ?

মাটির নীচে হাঁটছি

অন্ধকারে ভাঙছি এবং মানুষ, তোমায় ডাকছি

শুনতে পাচ্ছো··· ?

নীল বসন্তে

এখনও স্বপ্ন সূর্যের কাছাকাছি··· ?

লজ্জারঙের ওড়নায় খেলে হাওয়া

নীল বসন্তে তুমি নেই, আমি আছি

কৃষ্ণসাধন নন্দীর কবিতা

ভ্রমণের সুখে

বড়ো বেশী আকর্ষণ ছিলো।
দু'চার দিনে পালিয়ে এসে বাঁচি
আমাকে লেগেছে তবে হাওয়া।

তাই ফিরে চাওয়া
রবারের গন্ধ কালিঝুলি
এপাশে ওপাশে নোংরা
কলুষনাশিনী গঙ্গাস্নানে
টানে, আজকাল টানে।

মাদলের দ্রিমি দ্রিমি বোল
হৃদয়ে লেগেছে সোনা দোল
তাকেই ছেড়েছি আমি শেষে
পেতে চাই
শুধুমাত্র ভ্রমণের সুখে।

প্রকৃতি

এমনি নিজেকে বিলীন নিঃশব্দে
ফেরাতে চাইলে প্রকৃতি
সাদা জ্যোৎস্নায় আমার স্নান
স্বভাব ইতরবিশেষ
যায় না কখনো—

মহিমা ছড়ালে তুমি ধূপগন্ধ
আঁচড়ে কামড়ে নখদাগে শ্বাপদের মত তুচ্ছ হলাম।

হাসনুহানা

খুঁজি ইতঃস্তত আছে নাকি কাছাকাছি সেই গাছ
যে আমায় অফুরান আনন্দ দিয়েছে
শৈশবে দেখেছি যাকে, কতোকাল আবার দেখেনি
কুঁড়ি কুঁড়ি ফুলে কী তীব্র গন্ধ
সাঁঝবেলার হাসনুহানার।
ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা সোজা চলে গেছে—
দু'পাশে ছিন্নবিচ্ছিন্ন পাকাবাড়ি, আশশ্যাওড়া ঝোপ
এর মধ্যে স্মৃতিবিলাস নেহাত পাগলামি।

তবু খুঁজি আগে পিছে এদিক সেদিক
হয়তো একটু দূরে ছিলো
কিম্বা কাছে
আমার হাসনু
মিথ্যে তন্নতন্ন, অকারণ হয়রানি।

ফিরে আসি নিঃশব্দে, ক্ষতি নেই কিছু
ঘ্রাণ তো লেগেই আছে ভেতর ভেতর
ডিজেলের গন্ধে কোথায় একটু কমেনি।

বোধ থেকে বিপন্ন বিস্ময়ঃ মুক্তির আত্মহনন

উশীনর চট্টোপাধ্যায়

কোনো নারীর প্রণয়ে প্রতিহত হয়নি যে যুবক, বঞ্চিত হয়নি যে স্ত্রী-পুত্র-প্রেম এবং জীবনের আশা-আকাঙ্খা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকেও বিবাহিত জীবনের স্বাদ-আহ্লাদ যার মনের কোথাও কোনো ঘাটতি রেখে যায়নি, সেই যুবকই একদিন প্রবৃত্ত হল আত্মহননে। কিন্তু কেন? এর উত্তরে জানিয়ে দেন জীবনানন্দ তাঁর 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় যে, প্রেম-পরিণয় বা শিশুসন্তান কিম্বা গৃহের স্থিতিই জীবনের সমস্ত চাওয়া-পাওয়া বা আহ্লাদ-আকাঙ্খা অথবা কৌতূহল-ঔৎসুক্যের পরিতৃপ্তির শেষতম পরিচিতি নয়, অর্থ বা কীর্তি কিম্বা স্বচ্ছলতাই জীবনের সর্বশেষ কথা হিসাবে পরিগণিত হতে পারে না; 'আরো যে এক বিপন্ন বিস্ময় খেলা করে যাচ্ছে আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে, ক্লান্ত থেকে আরো ক্লান্ত করে তুলছে আমাদের সত্তাকে, সেই বিপন্ন বিস্ময়ই আন্দোলিত করে আমাদের সমগ্র অস্তিত্বকে আমূল ভিন্ন অভিজ্ঞতায়, যার তাড়নাতেই উদ্যত হয়েছিল ঐ যুবকটি আত্মহননের মাধ্যমে মুক্তির আস্বাদ পেতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কি প্রশ্ন বা সংশয় তাড়িত করে বেড়ায় না আমাদের যে, কী সেই বিপন্ন বিস্ময়, কীসের থেকে মুক্তির চেয়ে এই আকাঙ্খিত আত্মহনন?

হয়ত এ প্রশ্নেরও উত্তর কিঞ্চিত পেয়ে যাই আমরা ঐ কবিতার মধ্য থেকেই, যখন কবি প্রশ্ন করেন, 'ঘুম কেন ভেঙে গেল তার' এবং তার অব্যবহিত পরেই ফিরে আসেন আবার আত্মবিশ্লেষণে, 'অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল —লাসকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।' আর এই যে আপাত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অবগুণ্ঠনবাসী মানবিক অস্তিত্বের সঙ্কট উপলব্ধির এক সত্য উন্মোচন, এর সমর্থন পেয়ে যাই আমরা যুবকটির আত্মহননের মুহূর্ত বর্ণনায়। কোন্ সময়ে প্রবৃত্ত হয়েছিল সে আত্মহননে? ফাল্গুনের সৌন্দর্যময় উপাচারে পরিপূর্ণ যখন বসন্ত, যখন যৌবনোন্মাদনায় তাড়িত হওয়ার কথা তার, সেই সময়ে ঘনিয়ে আসা ফাল্গুনী-পঞ্চমীর অন্ধকারকেই বেছে নিল সে তার আত্মহননের প্রকৃষ্ট মুহূর্ত হিসাবে। এর থেকেও কি বুঝে নিতে পারি না আমরা যে, তার প্রেম, তার আশা, তার জ্যোৎস্নার সুখনিদ্রা, এ সমস্তই আপাত! আসলে এক গভীর অতৃপ্তি, এক তীব্র হতাশা, বহু অশান্তির দহন স্থায়ী হয়ে শিকড় গেড়েছে তার অন্তরে বহুদিন থেকেই! যার পরিসমাপ্তি ঘটাতে চায় সে মৃত্যুর মাধ্যমে লাসকাটা ঘরের টেবিলের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে থেকে।

যদিও রক্ত ফেনামাখা মুখে এই শুয়ে থাকা মড়কের ইঁদুরের মত অন্ধকারে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকারই নামান্তর, গভীর বিভীষিকাময় এই মৃত্যু। তবু মুক্তি তাতেই। কেননা যুবকটি জেনেছিল, ফড়িং বা দোয়েলের মত কেবলই জৈববৃত্তি চরিতার্থ করে বেঁচে থাকার মধ্যেই পরিতৃপ্ত থাকতে পারা যায় না। গভীর উপলব্ধির অধিকারী বলেই জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করেও অতৃপ্ত, অসুখী, নিঃসঙ্গতার শিকার হতে বাধ্য হয়েছিল সে। পেঁচার মত চাঁদ ডুবে যাওয়া অন্ধকারে কেবল ইঁদুর জাতীয় শিকার ধরে জীবন ধারণ করে থাওয়ার মধ্যেই যে সব মানুষ সন্তুষ্ট, যুবকটি তাদের থেকে আলাদা থাকার দরুণই, পেঁচা তার মৃত্যুর সময়ে জীবনের জয়গান গেয়েও মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারেনি তাকে। শুধু মৃত্যুর পরেও সে এসে শুনিয়েছে আবার তার জীবনের গল্প, চাঁদ ডুবে যাওয়া অন্ধকারে আবার ইঁদুর ধরার মত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বেঁচে থাকার কথা।

কাজেই আত্মহননকারী ঐ যুবকটি ধরে নিতে পারিনা আমরা বোধ হয় সকল যুবকের প্রতিভূ হিসাবে। কিন্তু তুলনা করতে পারি না কি বিখ্যাত সেই 'বোধ' কবিতার নায়কের সঙ্গে, যার মাথার ভিতরে, হৃদয়ের ভিতরে কোনো স্বপ্ন কিম্বা শান্তি অথবা ভালবাসা নয়, কেবলই এক বোধ জন্ম নেয়, কেবলই এক বোধ ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে; যাকে পারে না সে এড়িয়ে যেতে, তুচ্ছ মনে হয় যার জন্য সমস্ত কাজ, সমস্ত চিন্তা মনে হয় পণ্ড, শূন্য মনে হতে থাকে প্রার্থনার সকল সময়। অথচ অন্যান্য মানুষের মত বালতিতে জল টেনেছে সেও, মাঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কাস্তে হাতে করে, ঘুরে বেরিয়েছে মেছোদের মত নদীর ঘাটে ঘাটে। তবু ঐ বোধ ক্রিয়াশীল বলেই প্রশ্ন করে বসেন কবি, কোনো কি অবসাদ নেই তার, শান্তির সময় নেই কোনো, ঘুমোবে না সে কি কোনোদিনই? মানুষ-মানুষী বা শিশুদের মুখ দেখে সে কি কোনোদিনই আহ্লাদিত হবে না? পাবে না ধীরে শুয়ে থাকবার স্বাদ?

পার্থিব অনুভূতির যাবতীয় উপকরণ থেকে এই যে নির্লিপ্ততার আকাঙ্খা, প্রেম-প্রীতি-স্বপ্ন-শান্তি সমস্ত কিছু থেকে এই যে পলায়নবাদী মনোবৃত্তি, যার জন্য তুচ্ছ, পণ্ড, শূন্য মনে হতে থাকে সমস্ত কাজ, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত প্রার্থনার সময়, অন্তর্লোকের এই নিঃসঙ্গতার চেতনার জন্যই ওই নায়ক অনাত্মীয় হয়ে পড়ে সমাজ মানসের। সমাজেরই একজন মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নিজের ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমেই নিজেকে দেখেছে সে পৃথক ভাবে, সমাজমানস থেকে বিচ্ছিন্ন করে। সৃজনের আনন্দ তার তখনই যায় হারিয়ে, নিজের সমস্ত ক্রিয়াকর্মকে মনে হয় যখন একঘেয়েমির অবসাদ যুক্ত। এ যুগের মানুষ হিসাবে ক্রিয়া কর্মের আনন্দ থেকে যেহেতু বঞ্চিত সে, তার প্রেম যেহেতু পরিপূর্ণতা দান করতে পারেনি তাকে, বিকশিত করে তুলতে পারেনি তার সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে, যেহেতু মন সন্তুষ্ট নয় তার ক্রিয়াকর্মে, কাজে তাই উৎসাহ পায়না সে, অন্তরে ক্লান্তি বোধ করে, ছুটি চায়, বাঁচতে চায় পালিয়ে। এই যে বোধ, একেই কি সনাক্ত করে নিতে পারিনা আমরা 'বোধ' কবিতা থেকে!

মানতেই হয় 'বোধ' থেকে 'বিপন্ন বিস্ময়ে' রূপান্তরিত হওয়ার এই শূন্যতা বা নিঃসঙ্গতাই হেতু হয়ে ওঠে যখন পালিয়ে বাঁচার কিম্বা আত্মহননের, তখন বোধহয় এই নঙর্থক জীবন বোধের উৎস সম্পর্কে আসতে পারি আমরা এহেন ধারণায় যে, মানুষ জানেনা তার সত্তার সম্পূর্ণ পরিচয় কি, যে কারনে নিজের কাছেই সে হয়ে ওঠে অপরিচিত, পরিপার্শ্ব থেকে বিযুক্ত মনে করে নিজেকে। যদিও একান্ত ভাবেই সে পরিবেশ নির্ভর, তবু এক ধরণের মানসিক অনুভূতির সাহায্যেই সে মনে করতে পারেনা নিজের সত্তাকে নিজেরই আয়ত্তাধীন হিসাবে। নিজেকে তার মনে হতে থাকে সম্পূর্ণ একা, মনে হয় না যে সমাজ সংসার তার আত্মীয়, যার জন্য নিজের ভিতরেই নিজেকে সঙ্কুচিত করে নিতে বাধ্য হয় সে। তার বসবাসের জগৎ, তার বিচরণের ভূমি, দৃষ্টির সীমানার মধ্যের স্নিগ্ধ শ্যামল দৃশ্যাবলী—এ সবের সঙ্গে যে তার আত্মিক সম্পর্ক অতি তুচ্ছ, এ কথা ভেবে গুমরে ওঠে সে ভেতরে ভেতরে। সঙ্গত কারণেই মনে হয় তার, জীবনে লোকসানই ষোল আনা। যার ফলে তার নিজের অস্তিত্ব অপেক্ষাও সুন্দর-সমৃদ্ধতর অস্তিত্বের জন্য আকুলতা অনুভবের দরুণই তার ভিতরে মাথা চাড়া দেয় এক পলায়নী মনোবৃত্তি। প্রকৃতপক্ষে মানুষ যা পেয়েছে, তার চেয়ে আরো কিছু বেশী তার প্রার্থিত। আজকের জীবনের অতৃপ্তির বেদনাই তার কাছে প্রমাণ করে, তার যা হওয়া উচিত ছিল, আসলে তা সে হয়নি। এই অপূর্ণতা থেকে মুক্তি পাবার জন্যই তার এই পলায়নী বাসনা, কল্পিত তার এক পরিপূর্ণ পরিমণ্ডল, যেখানে পূর্ণতা পেতে পারে তার আশা-আকাঙ্খা সেই এক আনন্দময় জগৎই তার আকাঙ্খিত।

আর যেহেতু যে মানুষ একবার সংযোগহীন হয়ে পড়ে সমাজমানস থেকে, সেহেতু সমাজ সম্পর্কে উদাসীনতাই গাঢ় হয় তার ভিতরে। ভাবতে পারেনা সে যে, সমাজের কোনো উন্নয়ন বা পরিবর্ত্তনে তার কোনো ভূমিকা

আছে কিনা, আত্মবিশ্বাস আর আত্মপ্রত্যয় হারিয়ে এই মানুষ তখন সামাজিক আদর্শ বা লক্ষ্য অভিমুখে না এগিয়ে, নিজেকে সে সম্পূর্ণ একা বলে ভাবতে বাধ্য হয়।

বস্তুত একজন অস্তিবাদীর দৃষ্টিতেই ফুটে ওঠে বাস্তব জগতের আড়ালে এক পরাবাস্তবের জগৎ, যে দৃষ্টির ভিতর দিয়ে জগতের চেহারাটাকে তার মনে হয় উদ্ভট, যার প্রমাণ মেলে আত্মহত্যায়। তিনি দেখে নিতে পারেন যে, বর্তমান সমাজে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র নেই, গোষ্ঠীর ভিতরে ব্যক্তি নিমজ্জিত সম্পূর্ণরূপে। যেন মানুষ তার স্বাতন্ত্রকে হারাবার জন্য আত্মসমর্পণ করেছে নিজেকে গোষ্ঠী ও সমাজের কাছে, নানারূপ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর দাস হয়ে গেছে সে। তাই সে তার যুক্তি ও বুদ্ধির সাহায্যে প্রশ্ন করেছে, জীবনের অর্থ কি? কীসে তার Absolute Freedom বা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা? কেননা মানুষ পৃথিবীতে এসেছে ক্ষণিকের জন্য। কেমন করে এসেছে, কেনই বা এসেছে, এ প্রশ্নের জবাব সে দিতে পারেনা। কিন্তু পৃথিবীতে ক্ষণিকের এই জীবনে সে তার স্বাধীন ইচ্ছা রেখেছে অক্ষুন্ন। অন্যকেও সে ভোগ করতে দেবে স্বাধীনতা। অথচ পূর্ণ স্বাধীনতা যও মানুষের শান্তি আসেনা। শান্তি আসেনা কোনো কিছুতেই। একমাত্র মৃত্যুই হচ্ছে Absolute Freedom বা পূর্ণ স্বাধীনতার সাহায্যে শান্তি লাভের উপায়। তাই আত্মহননকেই বেছে নিতে বাধ্য হয় তাকে এই উদ্ভট জগৎ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় হিসাবে।

জীবনানন্দের ভিতরের এই বোধ আর বিপন্ন বিস্ময় তাই ক'রে তোলে তাঁকে এক অতিরিক্ত দৃষ্টিশক্তির অধিকারী। যে দৃষ্টির ভিতর দিয়ে এক লহমায় অপরিচিত হয়ে ওঠে পরিচিত জগতের চেহারাটা, যার মধ্যে দিয়ে তিনি টের পান জীবনের মধ্যেও মৃত্যুর নিঃশব্দ পদসঞ্চার, স্বাভাবিক দৃষ্টির ভিতর দিয়ে যে নারীর শরীরকে তার মনে হয়েছিল বরফ কুচির মত পিচ্ছিল, জলে ভিজে যাওয়া সুন্দর তার মুখ-বুক-স্তন, অতিরিক্ত সেই দৃষ্টির ভিতর দিয়ে তাকানো মাত্র এক নিমেষেই তা হয়ে ওঠে যেন খড়ির মত সাদা মুখ, থুতনিতে হাত দিয়ে মনে হয় বাসি সব, একেবারে মেকী। কেবল মনে হতে থাকে জীবনের চতুর্দিকে চুপিসাড়ে প্রেতের যাতায়াত। সমস্ত কিছুই যেন প্রেতের মত। বিচ্ছেদ, অসুস্থতা ছেয়ে আছে জীবনের পরিপার্শ্বকে।

এই অসুস্থ দৃষ্টিই হয়ত প্রমাণ করে যে, নিজের সত্তাকে তিনি কল্পনা করতে পারেননি সম্পূর্ণ পরিচিত হিসাবে। যে জগৎ তাঁর নিজের মানসিকতা দিয়ে গড়ে তোলার ইচ্ছা ছিল, তা যেন তাঁর পরিচিত নয়, কিম্বা স্বল্প পরিচিত, অথবা স্বপ্নে দেখা আবছা ও অস্পষ্ট এক জগৎ। সমাজ-মানসের সঙ্গে তাই শিথিল মনে হয়েছে তার সাযুজ্যবোধ বা সংযোগ পরিচয়ের সূত্র। একজন পরাবাস্তববাদী কবির মতই যে কারণে তাকে প্রকাশ করতে হয়েছে নিজের অসহায়তাদীর্ণ এই চেতনাকে। কেননা এই অনুভূতি, এই অসুস্থ দৃষ্টির ভিতর দিয়ে জগৎকে প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা আছে একমাত্র মানুষেরই। উদ্ভিদ, পতঙ্গ বা পাখী কারোরই নেই।

দেখা যাচ্ছে, বোধ হয় এখন আমরা বুঝে নিতে পারবো, এই যে 'বোধ' আর 'বিপন্ন বিস্ময়' তুলে ধরে আছে জীবনানন্দের একটি অধ্যায়কে, হয়ত এই বোধ আর বিপন্ন বিস্ময়ের নিঃসঙ্গ চেতনা, সামাজিক মানুষ হিসাবে আমাদের বদ্ধ করে রাখে নিজের কাছে, তবু কেন যে তার দুর্বিসহ প্রকাশকেই বেছে নিতে হয় একজন কবিকে তাঁর ধর্ম হিসাবে, কেন যে তাঁর অন্তরের আবেগ আর উপলব্ধিকে প্রকাশ না করে পারেন না তিনি, এ যুগের বিশিষ্ট চিন্তাশীল, অনুভূতিপ্রবণ মানুষেরই বা এই বোধ কেন, কেন এই বিপন্ন বিস্ময় স্পর্শকাতর, প্রকাশক্ষম মানুষেরই; আর কেনই বা বলতেন বুদ্ধদেব বসু, 'হয়তো না বললেও চলে, এই বিস্ময়ের নাম মন—মানুষের সবচেয়ে বিপন্ন ও বিপজ্জনক সম্পত্তি।

বাংলাদেশের কবিতা

উত্তর আছে দক্ষিণে সমুদ্র/সাঈদ সানাউল হক

(কবি আসাদ চৌধুরীকে)

তাহলে কি আমরা সবাই
এক পালকের পাখী হয়ে যাবো
হয়তো হতে পারে তাই
তবু কথা থেকে যায় বুলির ভিন্নতায়
নানা নামে সনাক্ত হয় পাখী :

পালকের ভিন্নতায় ডাকের ভিন্নতায়
নামের ব্যতিক্রম পাখীর সমাজে
নদীর দেশের মানুষ আসাদ চৌধুরী
পাশাপাশি কাছাকাছি আমারও ঠিকানা
অথচ আমি ভিন্ন মানুষ ভিন্ন স্বভাবী ॥

বন্ধ্যাত্বের মুখোমুখি চৌধুরী বলেন
প্রশ্ন নেই উত্তরে পাহাড়—বন্ধ্যাত্ব আমিও দেখি
ব্যতিক্রম এখানে আমার কাছে উত্তর আছে
দক্ষিণে সমুদ্র জেনে মূক হয়ে যাই
আসলে মূলের ভাবনা বন্ধ্যাত্বে।

তবু আমার অন্য কথা অন্য রকম
প্রশ্ন থাকতে হবে থাকনা উত্তরে পাহাড়
উত্তর দিতে হবে থাকনা দক্ষিণে সমুদ্র
এক পালকের পাখী হলেও সবাই
আমি ভিন্ন বাসর চাই– ডাকের ভিন্নতা চাই।

এখনো শেওলা জমেনি ভাবের স্রোতে
না হয় চলে যাবো ভেসে ঐ নোনা দরিয়ায়
সূর্য উত্তপ্ত করে বাষ্পীয় যানে মেঘ হয়ে
শূন্যতায় খুড়ে পাহাড়ে আঘাত লেগে
আবার বৃষ্টি হয়ে ফিরেতে আসবোই বাংলায় ॥
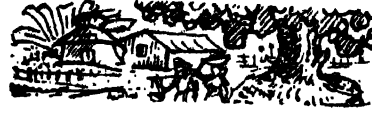
কোথায় সে অলীক ট্রাফিক/মহসীন মুর্শেদ

সন্ধ্যায়, গোধূলি-তিলক পরা সন্ধ্যায় একাকী চৌরাস্তায়
দাঁড়িয়ে থাকি প্রাগৈতিহাসিক ডাক বাক্সের মতো।
দেখি কতো লোক ছুটছে, পার হ'চ্ছে নগরী।
অথচ ট্রাফিক যেন ট্রাফিক নেই,
ট্রাফিক যেন ভিন্নতরো ট্রাফিক।
হাতে তার লাল ঝাণ্ডা তুলে অকস্মাৎ
সব যন্ত্রযানও মানুষকে থামতে বলে।

..........সব...থেমে......যায়।
ঝাঁক ঝাঁক রিক্সা, ট্যাক্সি, বাস, লাইন দিয়ে সারি সারি,
সব মানুষগুলো জড়ো হয় ট্রাফিক আইল্যাণ্ড ঘিরে,
আমি দেখি, সব দেখতে থাকি,
ভাবি "আরে আরে একি কাণ্ড হঠাৎ ঘটালো ট্রাফিক !"

সে এক দীর্ঘ বক্তৃতা......
যেন বা একটা সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সে
সব কিছু ধরে রেখেছে, রুদ্ধশ্বাসে,
এক হাতের মুষ্ঠিতে যেন চেপে ধরতে চায়
আজকের এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের গলা।

শতাব্দীর বিষাক্ত অনুভূতিগুলো/সেলিম চৌধুরী

বিকলাঙ্গ কুকুরের মতো উলঙ্গ অনুভূতি
মত্ত সমাজ কাঁদে, চেতনার স্বপ্ন ভাঁজে ভাঁজে,
নগ্ন বেশ্যার কোমরের সুতো দিয়ে বাঁধা কেনো পৃথিবী
ভিখারীর ঝুলন্ত স্তন থেকে
উড়ন্ত বাতাস বয়ে আনে আগুনের চক্‌চকে লাশ।
সৌখিন ফুলের টবে গোলাপের কুঁড়ির মতো
কিশোরীর দেহ ঝোলে মাতালের ভিভানেতে।
কক্‌টেলের পেয়ালায় জারজের ঠোঁট কাঁপে
হৃদয় এন্টেনায় বাজে মানুষের শাশ্বত রূপ।
নাইঞ্জু গ্লোবটা ঘোরে না কেনো ? তছবীহটা ছিঁড়ে গেলো,
টাইয়ের নটের মতো একটানে ভেংগে গেলো আমার প্রেম।
শুধু পুলিশের গায়ে এরারুট
কি দুর্গন্ধ কবিতার পাতায়
ধর্ম রাজনীতি করো ? কেনো ?
কেনো ইউফ্রেটাসের বুকে এতো জ্বালা
প্রশ্ন প্রশ্নই শুধু
অসংখ্য রাষভের মতো উত্তরগুলো।
ডিস্টিল ওয়াটারের সাথে যদি পুকুরের পানি খাই
উলঙ্গ পাগল বলে বিদ্রুপের ছুরি খাবো ;
এখন নক্ষত্রে আগুন ধরিয়ে কেউ যদি উৎসব করে
পৃথিবীর প্রেম পাবে, শান্তির দুধগুলো হাসি দেবে
উলঙ্গ পাগল কেউ বলে না আর
শুধু পিঁপড়ের মতো মারা যাবে
শতাব্দীর বিষাক্ত অনুভূতিগুলো।

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা

এতো জল কেন

ভাঙা ঘর পায়না আলো,
তোমার চোখেতে এতো জল কেন বলো ?
এ জল মোছাবো কিসে
কোন সে কোমলতর পরশ দিয়ে ?
এতো জল বলো কোন্ অভিমানে ঝরে
কিম্বা কোন্ বিরহেতে বিরহিনী হোয়ে ?
এ জল লাগে না ভালো—
এ জল বেদনা দেয় আমার প্রাণে,
এ জল শুকাবো বল কেমন কোরে ?

কৃষ্ণচূড়া ডাক দিয়েছে

সবুজ উত্তরীয় গায়ে
তোমার উচ্ছল লাল হাসি আমি দেখলাম,
পিছিয়ে গেলাম ফেলে আসা কুড়িটা বসন্তে।
তোমার হাসির আয়নায়
আমি নিজেকে নোতুন কোরে চিনলাম,
নিবিড় ভাবে অনুভব করলাম
স্নেহময়ী প্রকৃতির কোমল স্পন্দন।

আমি মুক্ত,
মুক্ত আমি সব কিছু ক্লান্তির বন্ধন থেকে,
মুক্ত আমি, মুক্ত বিহঙ্গের মতো।
তোমার হাসির রঙে রঙে
নিজের ধূসরতাকে সিক্ত কোরে
তোমার মতো উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দিই
প্রতিটি মানুষের মনের গভীরে।
বলি— কৃষ্ণচূড়া ডাক দিয়েছে
উন্মুক্ত করো নিজেকে
নির্মল আকাশের মতো।

লু সুন'এর জন্ম শতবার্ষে

তোমাকে দেখিনি আমি,
চিনেছি তোমাকে,
তোমারই সৃষ্টির মাঝে বারে বারে।
যেমন চিনেছি আমি সূর্যকে—
সূর্যের তাপে—
চাঁদের আলোর রূপে চাঁদকে,
ঠিক তেমনি তোমাকে।
সংখ্যাতীত শোষিতের চোখে
কালো রাত মুছে দিতে
সংগ্রামী-প্রভাতীতে কণ্ঠ দাও তুমি—
আমি শুনি, বিস্ময়েতে শুনি।
এ যেন বসন্তের মিছিলেতে
বসন্তেরই দূত।
পলাশ রঙেতে সিক্ত, তোমার মনের ছবি,
আমি শুধু দেখি,
দেখি আর ভাবি—
অপরিচিতের সাথে এতো পরিচয়
সার্থক সৃষ্টিতেই বুঝি সম্ভব হয়।

সমীর মণ্ডলের দু'টি কবিতা

অস্তনিলয়ে

ক্রমশ বয়স বেড়ে যায়
পরিচিত ঋতুর পাপড়ি খসে
শিশির বিন্দুর মতো ভয় কাঁপে ;
অন্তরে অব্যক্ত কথার দীঘল ছায়া

ক্রমশঃ অরণ্য অস্থিরতা, উদাসীন মুখ
সব আবরণ খুলে ছায় ;
পায়ে পায়ে রাত বেড়ে যায় ।
ধূপ-চন্দন অলৌকিক সৌরভ খোঁজে সুখ

কবিতা বিহীন অক্ষরের আর্তনাদ
ছুটে বেড়ায় বাদামী স্নায়ুর গভীরে
অস্তরাগে পাখি কর্কশ নিস্বনে ওড়ে ।

রাত বড় হয় শূন্যতায়

ধূপ ধূপ গন্ধ

ধূসর গোধূলি স্থবির, ধ্যান গম্ভীর
আকাশ মিশে যায় মাটির বুকে
ব্রহ্ম মায়া পবিত্র সংসারে
তীব্র সুগন্ধ ছড়ায়
ধূপ ধূপ গন্ধ বাতাসে

খই ওড়ে পায়ে পায়ে।
এক জন চোখ ঢেকে কেঁদে ওঠে
দু'জন জড়িয়ে ধরে
বুক ভাসে চোখের জলে
শাঁখা ভাঙ্গা শব্দ
সিঁথির সিঁদুর মুছে.
নিস্তব্ধ নদী তরঙ্গে ভাসে……

তুহিণ শংকর চন্দের দু'টি কবিতা

চিন্তা—১

আমার হৃদয়ে এখন অন্তঃশীলা নদী
কুলুকুলু বয়ে যায় বুকের গভীরে।
তুমি ভাবো—মৌসুমী ফুলের মতো
সব প্রেম ঝরে যাবে।
আমি ভাবি—সেই প্রেম—
একদিন মহীরুহ হবে।

—২

টি. ভি. র অনুষ্ঠান যতই ব্রাইট কর
সে শুধু তোমাদের ইন্দ্রানী!
আমার জীবন পাখীদের, ফুলেদের
মতো চঞ্চল
শিশিরে সিক্ত কোন সকালে আমি
ঠিক তোমারই মতো
ঝুল্ বারান্দায় বসে ভাবি
একদিন আমাকেও ধূষর পাণ্ডুলিপির—
মতো চলে যেতে হবে।

অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে ভয়
বুকের গভীর কন্দরে :
কি ভাবে সে করে নেবে জয়
পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে।

জয় মানে শুধুই কি পতাকা ওড়ানো ?
জয় মানে শুধুই উল্লাস !
ভয়ের শিকড় শুদ্ধ টেনে ওপড়ানো
জয় মানে রক্তিম পলাশ।

॥ পলাশ ॥

সবুজের সীমানায় কারা নাকি কাল রাতে
পুঁতে গেছে পলাশের বীজ
আজ সারাদিন ধরে বাতাস লালন করে তাকে

কাল সারারাত ধরে মেঘের ডোঙ্গায় চেপে
ঘুরেছিল কবি
সাক্ষী ছিল এন্টেনার একক পেঁচক।

ধূমায়িত অগ্নিতে ছেয়ে গেছে গ্রাম
সমস্ত পুরুষ ও নারী আজ যেন কোথাও উধাও
শুধু মাঝে মাঝে ভাসছে বাতাসে শিশুর কান্না।

কবির দরজা জানলা খোলা
সারি সারি সবুজের মধ্যে
কবি দেখছে পলাশের মেলা ?

॥ ছবি ॥

ঝুল বারান্দায় বসে/ছবি আঁকছে বিষণ্ণ বালিকা
কার ছবি ?

সফল পুরুষ/অমল দাস

দক্ষিণ সীমানা থেকে
ছুটে আসে আর্দ্র কিছু মৌসুমী স্রোত
ফুলটুসি মেঘের ঘরে
এক আকাশ কলঙ্কের ছুটন
এই বুঝি ভেসে যায়
সেদিনের সোনামুখি সুখ।

দক্ষিণ সীমানা থেকে ছুটে আসে
অন্য ভাবে নির্বান্ধব রাত
ঠিক সেই গোছ গাছ বিকেল পেরিয়ে
কৃষ্ণচূড়া মুড়ে নেয় আপন আবাস।

একজন বসে থাকে
ভেঙ্গে পড়ে বর্ষার ঐক্যতান
ভিজে ভিজে মন শুধু
ঘর থেকে চৌকাঠ ভাঙ্গে।

এবং গৃহযুদ্ধে বন্দী ডানায়
খুঁজে ফেরে সফল পুরুষ।

মানুষের পাড়া/সনৎ মান্না

মানুষের নিষ্প্রাণ বাড়ি জেগে থাকে খামার বাড়ির বহু দূরে
পাশে কোন নদী নেই, গাছ নেই, বর্ষায় ফোটে না কদম
বসে না ধবল পেঁচা উড়ে এসে কোজাগরী রাতে
ওদের বাড়ির ছাদে টিভির এ্যান্টেনায় বসে থাকে কাক।

ওদের পাড়ায় বাঁধে ঝামেলা ঝঞ্ঝাট, খুন হয় সকালে-বিকেলে
বারুদ ফাটার শব্দে মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে কেঁদে ওঠে শিশু
রমণীলোলুপ লোক ঘোরে ফেরে পথে, যুবতীর পায়ে পায়ে হেঁটে চলে ভয়
ওখানে সবার মুখ ম্রিয়মাণ, হাসি যেন ফাটা কাঁসরের মতো বেজে ওঠে কানে।

বাছা-অ্যাত্তো শক্তি পেলে কোথায়
তুষারকান্তি ব্রহ্মচারী

অ্যাত্তো রাত্তিরে কঁাদে কেন বাছা ?

বুকের উপরে আছে তো মায়ের হাত !
পাশে শুয়ে আছে তো নির্ভর পিতা !
কুঁজোয় শেষ হয়নি তো জল !
জামবাটিতে রুটি !

আশ-পাশের সমস্ত বাড়িগুলোর কোলে
লোকজন-গরু ছাগল-হাঁস তুলে দিয়ে
ঘুমের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে রাত।

একা শুধু বাছা
তলোয়ার ঘুরিয়ে যাচ্ছে সমানে
রাতের বিরুদ্ধে-তার যাদুদণ্ডের বিরুদ্ধে !

বাছা-অ্যাত্তো শক্তি পেলে কোথায় ?

জন্ম/শ্যামলী হালদার

পৃথিবীতে সবার মতো একদিন জন্ম নিলাম।
জন্মের পরেই সবাইকার মতো আমিও ভিখারী হলাম॥
তিলে তিলে মা বড় করলেন নিজের সবকিছু ফেলে।
কিন্তু কিইবা দিতে পারলাম তার মূলে॥
এই নিঃস্ব পৃথিবীতে নৃশংস অত্যাচারে মরছে সবাই,
আমাকে কেনই বা বারংবার বাদ দিতে চাও বল ভাই॥
তোমরা কি কোনদিন মানুষকে চিনতে পারো না ?
তোমাদেরইতো সঙ্গীসাথী হয়ে
আমি জন্ম নিয়েছি এই মায়েরই কোলে॥

পুস্তক সমীক্ষা

জলের সারল্যে - কৃষ্ণা বসু ; মহাপৃথিবী—১১, ঠাকুর দাস দত্ত প্রথম লেন, হাওড়া থেকে প্রকাশিত। দাম- ছ টাকা।

কবি হিসাবে কৃষ্ণা বসুর নিষ্ঠার তুলনা নেই। আধুনিক কবিতা বলতে যে ছবি পাঠকের মনে জেগে ওঠে, কৃষ্ণা বসুর 'জলের সারল্যে' গ্রন্থের কবিতাগুলি বলাবাহুল্য সেই ছবিরই সগোত্র। কবিতার প্রতি সমর্পিত প্রাণ বলেই কৃষ্ণা বসু যথার্থ আধুনিক কবিতার প্রতি এমন নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক কবিতাকে অনেকে প্রকরণ সর্বস্ব বলেছেন ; কেউ বলেছেন শব্দ নিয়ে উচ্ছৃঙ্খল খেলা, কেউ বলেছেন—খেয়ালী মনের চুটিয়ে আবোল-তাবোল বকা। এগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন তথা প্রকাশ্য ঈর্ষা ও উষ্মা আছে ; আধুনিক কবিতায় প্রকরণ অনেকখানি, শব্দকে বাদ দিয়ে প্রকরণের গুরুত্ব কমে যায়, কবির মননে যদি খেয়ালী সুর থাকে—তা ধ্বনিত হলে আধুনিক কাব্য দোষণীয় হয় না। কিন্তু সব মিলিয়ে রচনা যেন কবিতা হয়, শিল্প হয়। কোন্ গুণে তা হয়—তা বলা যায় না। কিন্তু কোন্‌টে কবিতা হলো, আর কোন্‌টা বকুনি হলো—তা যে কোনো পাঠকের কাছে ধরা পড়ে।

অর্থাৎ কবিতা বুঝতে গেলে কবিতার পাঠক হতে হবে। কবি জীবনানন্দ দাশ একটি মোক্ষম সত্য কথা বলে গেছেন—যা আজ প্রবচনের পর্যায়ে পড়েছে, যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁদের সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি। কেউ কেউ যেমন কবি, আর কেউ কেউ যেমন কবি নন, পাঠকের ক্ষেত্রেও এটি সম্প্রসারিত করে বলা যায়—সকলেই পাঠক নন, কেউ কেউ পাঠক। পাঠকের কবির সঙ্গে সহৃদয় হৃদয় সংবাদী হতে হবে, আধুনিক যুগ ও এই যুগের মনন ধারার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে, বিংশ শতকের ভাবাদর্শ ও বর্তমান জীবনযাত্রার জটিলতা প্রভৃতি সম্পর্কে নিষ্ঠা ও মনস্ক অনুশীলনের যোগ থাকা চাই, তবে আজকের জটিল কবিতা বোঝা যাবে। কবিতা পাঠকারী সব ব্যক্তির মধ্যে এই ধৈর্য ও অনুশীলন নেই, তাই সব পাঠক আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে সহনশীল নন।

কৃষ্ণা বসুর কবিতা প্রসঙ্গে এই জাতীয় মুখবন্ধের একটা প্রয়োজন আছে। জানি যে কৃষ্ণা বসু দুর্বোধ্য কবিতা লেখেন না, দুরূহতার প্রতিভাসেও তাঁর আস্থা নেই। তবু আধুনিক কাব্যভাষা প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত, সেইজন্যে তাঁর ব্যবহৃত শব্দাবলী নিজস্ব অভিধাশক্তির গণ্ডী ছাড়িয়ে ব্যঞ্জনালোকের ইঙ্গিত দেবার প্রবণতার স্বাক্ষর রাখে। তাই যথার্থ কাব্যপাঠকের পক্ষেই তাঁর কবিতার রসগ্রহণ সহজ হবে।

আজ দাবার ঘুঁটির থেকে অধিক জটিল ছক
পাতা আছে জীবন-ব্যাপারে। শুভংকরী আঁক থেকে
সরল বালক হঠাৎ এসেছে পড়ে ভয়ংকর গোলক-ধাঁধায়
অঙ্ক মেলে না তার চোখে বাঁধা,
সুকুমার চিবুকের খাঁজে লেগে আছে আহত বিস্ময়

(এই নির্বাচনে, শীতে)

কিম্বা,

এই চোখ তার তৃষ্ণা নিয়ে জেগেছিল খুব উপবাসে,
সংসারের ভাঙাচোরা লোকাল ট্রেনের পথে রোজ এক মুখ,

চেনা স্বাপত্যের কাছে ক্ষয়ে গিয়ে মরা চোখ, যেন মৃত
মাছের কংকাল, জেগেছিল, তার কোনো বিস্ময় ছিল না।

(উপবাস শেষে)

মনে হবে সহজ ভাষা, কিন্তু রূপকার্থে, তাৎপর্য প্রকাশে এই ভাষার নিহিতার্থ উদ্ধার করতে না পারলে কবিতার অনেকখানি আনন্দ নষ্ট হবে। তাই সৎপাঠকের নিষ্ঠা চাই জলের সারল্যের কাছাকাছি আসতে।

'জলের সারল্যে' গ্রন্থটি সৎ কাব্যপাঠকের হাতে উৎসর্গিত হয়েছে। কবি কবিতার সংসর্গ ছেড়ে অন্যখানে থাকতে চান না, কৃষ্ণা বসুর একথা খাটে, তিনিও কবিতার কাছ থেকে দূরে সরে গেলে ব্যথিত বোধ করেন—

কবিতার কাছ থেকে সরে গেছি বহু দূরে তাই তুই আমাকে চাস না আর
তোর একান্ত ভুবন দুলে ওঠে মোহন মুদ্রায়, নাচঘর, বাতাবি নেবুর গন্ধ,
পরাক্রান্ত মোহ নিয়ে জীবন রঙিন রেলের গাড়ি, নীল জ্যোৎস্নার বুক চিরে
ছুটে যায় গূঢ় এরোপ্লেন, সকাল বেলার নদী, টলমল নৌকার ওপর
অনারব্ধ সোনালী পিকনিক,—এই সব ফেলে আমি চলে গেছি দূরে
অনায়াস একা একা যাওয়া।

কিন্তু কবি যিনি, তিনি ত' কবিতার আকর্ষণ বিস্মৃত হতে পারেন না—

কবিতা মাকড়সা-ফাঁদ •

পাতা আছে জীবন-ব্যাপার জুড়ে কাঠামো অবধি
তাকে ফেলে, তাকে ভুলে কতদূর যাবি?

'আর এই তীব্র সংক্রমণ' কবিতাটিতে কবি লোকোত্তর এক অনুভূতিতে জর্জর হয়ে ব্যক্ত করেছেন—'আবার আমার মধ্যে জন্ম নিচ্ছে গান, গানের গুঞ্জন রীতি/অসম্বন্ধ উচ্চারণ : কবিতা আমার।' 'আসলে নিজেই সে' কবিতাটিও প্রকারান্তরে কবিত-বিষয়ক। কবিস্বভাব চেতনার মধ্যেই কবিতার অধিবাস—তাকে ফুল পাখি আকাশ বা নক্ষত্রের স্মৃতিতে কিম্বা সুরভিতে খোঁজ করার প্রয়োজন নেই।

কবিতা-বিষয়ক কবিতাগুলিকে কবির কাব্যপ্রাণতা লক্ষ্য করার বিষয়; আগেই বলেছি ভাষাও আধুনিক, কবির বিশেষণ ব্যবহারের মুন্সিয়ানাও উল্লেখযোগ্য, যেমন নৃপতিবিহীন তরবারি (ত্যক্ত মাস্তুলের পাশে সমুদ্রের স্মৃতি), প্রবীণা মমতা (এই হিরণ্ময় পর্যটনে), প্রত্যাখ্যাত আঁধার (আসলে নিজেই সে), স্বয়ংভরা স্মৃতি (আগুনে পোড়াব) জলছুঁই ভিজেপাতা (কালো জল) নবীন জল (এই নাও নবীন জল)। আবার দু একটি বিশেষণ লাগসই হয়নি—যেমন সমাচ্ছন্ন সমতল বা হাহা জানলা।

কোনো বৃহত্তর বাণী নয়, সাধারণ জীবনচর্যার গণ্ডীর মধ্যেই মানুষের সার্থক সঞ্চরণ—এর জন্যে বাস্তবাতীত কোন বাসনাকে লালন করার দরকার নেই; সীমাবদ্ধতার কাছেই মানুষের মেধার মহিমা ফুটে ওঠে—কৃষ্ণা বসু বেশ খানিকটা প্রত্যয় নিয়েই এমন কথা বলতে পেরেছেন। আর বলেছেন—স্মৃতিই জীবনের অনেকখানি। 'স্মৃতি মানে সর্বস্ব সে' শীর্ষক কবিতায় স্মৃতির সঙ্গে বিবিধ দ্রব্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের সাযুজ্য স্থাপন করেও স্মৃতি—মানবদেহে যেমন ক্লিন্নসংস্থা লোকচক্ষুর অন্তরালে আছে, তেমনি বোধ ও অনুভবলোকের অভ্যন্তরে সদাসর্বদা সমুপস্থিত।

শুধু স্মৃতি নয়, স্মৃতি-রোমন্থনে কবি কতকটা আনমনা, কতকটা বেদনাবিহ্বল।

এই গ্রন্থের অনেক কবিতাই স্মৃতিমূলক। ঠিক যে স্মৃতিচারণা বা স্মৃতিরোমন্থনের পূর্ণচিত্র ধরা আছে—তা নয়, স্মৃতিজনিত একটা প্রচ্ছন্ন আর্তি ধ্বনিত হয়েছে। সেটা কবির বিষাদমনস্কতা থেকে উদ্ভূত বলে মনে হয়।

কবির মধ্যে একটি অধরা বেদনার স্মৃতি আছে; কখনো তিনি সেই স্মৃতির দ্বারা চালিত হয়েছেন, কখনো তিনি মনের কোন্ এক অলৌকিক শক্তিকে সেই স্মৃতির স্বলাভিষিক্ত করে—তার কাছে বিবিধ প্রশ্ন রেখেছেন; —'এই হিংস্রর পর্যটনে' কবিতাটিও এই জাতীয় প্রশ্নের সমাহার। 'আগুনে পোড়াব' কবিতাটিতেও স্মৃতিমূলক কোন্ এক নিগূঢ় বেদনার ইঙ্গিত রয়েছে, স্মৃতিকে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করার জন্যে কবির ইচ্ছে, জলের সারল্যে স্মৃতিকে তিনি ভাসাতে চান।

কবির মনের মধ্যে একটা বেদনা বলয় রয়েছে। 'অনাত্মীয় হাওয়া' কবিতায় সেই অভিব্যক্তি।

> চুপি চুপি দরোজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনে গেছে
> ব্যক্তিগত চাপা কান্না গোঙানীর স্বর, চতুর সে আড়ালে রয়েছে; দরজা খুলে বেরোলেই
> 'কেন এলি'? 'কেন এলি'? এফোঁড় করে ওফোঁড় করে বিঁধছে আমায়,
> হু হু করে মুখে এসে ঝাপটা মারছে অনাত্মীয় হাওয়া।

পরিচিত পরিবেশ থেকে পালিয়ে একটু আরাম খোঁজার মধ্যেও সান্ত্বনা নেই, সুখ নেই। কবির কাছে এই নির্জনে চলে আসা হলো পরস্পরের গূঢ় একাকীত্বে ডুব দেওয়া, দুঃস্থ হৃদয়ের নিজস্বতা থেকে বহু দূরে ত' যাওয়া যায় না। (কেন এলি?)

জীবনের অবেলায় তাই ভুল স্টেশনে নেমে পড়ার বিমর্ষতায় আচ্ছন্ন হতে হয়, হাতে এক অনিচ্ছুক বোঝা ধরিয়ে দিয়ে কে যেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে আর আসে না, পথের মোড়ে বিষণ্ন বিকেলের হলুদ রোদ্দুর সঙ্গে নিয়ে বেলা কাটে, আর সারাক্ষণ বেজে যায় বিষণ্ন অন্তরা। ('আসছি' বলে কেউ যেন পথের মোড়ে) 'স্বর্গত নির্জনে' কবিতায় নানা ছবি আঁকা হয়েছে, কিন্তু কবির একাকীত্বে বাজে এক বিষাদের সুর, কেমন এক ধরণের অনন্বয়জনিত পীড়িত চেতনায় তিনি কাতর হন—

> শুধু একাকীত্ব ছুঁয়ে থাকে গোপন কক্ষের
> ভিজে শীতলতা, শুধু ঠাণ্ডা নির্জনতা গাল রাখে
> কক্ষের গরাদে,...আর কেউ না,...কেউ না...

এমনকি যৌবনরণিত জীবনচ্ছন্দেও কবির বেদনাবোধ। 'হাড়ের হলুদ' কবিতায় তিনি তা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন:

> শুধু প্রেম নেই,
> হাড়ের হলুদ জেগে আছে,
> এই ব্যথা পেয়ে গেছি যৌবনের গানে—

সংসার সমাজ এমন কি প্রকৃতিলোক থেকেও স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরামের খোরাক মিলেছে, তবু জীবনে যার আছে, হার আছে; জীবনকে সব দিয়ে তুষ্ট করতে চাইলেও জীবন আঘাত করে, যন্ত্রণা দেয়, বেদনার ঝংকার ঘটায়, কবি সেই বেদনার কথাও ভুলতে পারেন নি। বেদনার উষ্ণ উত্তাপ শান্ত নিরালা সন্ধ্যার কালোয় বসে তিনি অনুভব করেছেন।

শুধু একটি দুঃখ

একা জেগে উঠছে শান্ত নিরালা
সন্ধ্যার কালোয়। সে খুব চুপচাপ,
শয্যার নীচে যেন ভুল উপেক্ষায় পড়ে থাকা
কবেকার ম্লান চিঠি, দিনের আলোর চাবুকে
সে ভয়ে থাকে, ঘুমিয়েই থাকে ;
আজ এই শান্ত সন্ধ্যা, এই মন কেমন করার মতো
বৃষ্টিপাত আবার জাগিয়ে তুলেছে তাকে।

'জীবনযাপন জুড়ে' কবিতাটির ফলশ্রুতিও এই বেদনা। জীবনযাপন জুড়ে শুধু বিষাদ বোনাটাই স্পষ্ট হয়ে বেজেছে—

জীবনযাপন জুড়ে বিষাদ বুনেছ,
এক হাজার ভুল অঙ্কে বিঁধে আছে মেধা, স্মৃতি, শ্বাস ;
শিস শব্দের মত বোধি পারাবার থেকে হাহাকার ভেসে আসে।

এছাড়া কতগুলি সাধারণ কবিতা আছে—পড়তে বেশ ভালো লাগে, যেমন—এইভাবে ফিরে যায়, জনৈক মৃতের জন্যে একটি কবিতা, স্নান, এই রকমই, শোকান্তরে যাত্রা, প্রত্যেক দুপুর বেলা, কাক ডেকে উঠল প্রভৃতি। এইসব কবিতায় কোথাও ছবি, কোথাও স্কেচ, কোথাও বা ব্যক্তিগত বক্তব্যের টুকরো।

কৃষ্ণা বসুর কবিতা সম্পর্কে—বিশেষ করে 'জলের সারল্যে' গ্রন্থের কবিতাগুলি বিষয়ে একটা কথা না বলে পারছি না। কবি বেশীর ভাগ কবিতাতেই মধ্যম পুরুষকে সম্বোধন করে তুমিমূলক একজনকে খাড়া করেছেন এই 'তুমি' কখনো কবির অন্তর নিবাসী সত্তা, কখনো বোধি, কখনো বা তাঁর কবি-প্রতিভা, কখনো আবার তাঁর পরিপূরক দ্বিতীয় অস্তিত্ব বিশেষ। 'ব্যক্তিগত আদলে' কবিতায় যে তুমি নিশ্চয়ই 'এই নাও নবীন জল' বা 'ভেবেছ বলেই' কবিতায় সেই তুমি একেবারে এক বা অভিন্ন নয়।

কৃষ্ণা বসুর মধ্যে জীবনানন্দীয় প্রভাব খুব বেশী করে চোখে পড়লো, বিশেষ করে প্রকৃতি চেতনায় তিনি যে ইম্প্রেশনিস্ট কৌশল অবলম্বন করেছেন—তার অনেকটাই জীবনানন্দের কাছ থেকে নেওয়া বলে মনে হয়। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কয়েকটি জীবনানন্দীয় কায়দা লক্ষিত হয়েছে ; 'হায় সীমাবদ্ধতার কাছে' কবিতাটির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিম্বা, 'এই ভুল পোশাক' কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি স্মরণ করা যেতে পারে— 'সমস্ত আকাশ জুড়ে নক্ষত্রখচিত কাল পুরুষের মতো।' জীবনানন্দ দাস মহান্ কবি, তাঁকে অনুসরণ অন্যায় নয়, কিন্তু এখন সময় হয়েছে—তাঁর ভাষার সম্মোহনী যাদুর বাইরে চলে আসার, তাঁরই ছককাটা বৃত্তে আজো যদি আমরা ঘোরাফেরা করি—তবে অগ্রগামিতার বড়াই আমাদের থাকবে কি ?

'কাটালাশ' কবিতাটি প্রসঙ্গে দুটি কথা বলি। এটির সগোত্র আর একটি কবিতা লিখেছিলেন শ্রীসরিৎশেখর মজুমদার। সেটির সমাজ-সচেতনতা আরো তীব্র, কবিত্বও গভীর আবেগাশ্রয়ী। রেল লাইনের ধারে দুঃখিনী মেয়েটির কাটালাশে শকুনের ভিড় জমেছে, মেয়েটা যতদিন বেঁচেছিল—সেই দেহে ভিড় জমিয়েছিল মানুষ-শকুনের

দন। কৃষ্ণা বসুর কবিতাটির ইঙ্গিতও প্রায় এই জাতীয়, যদিও ইঙ্গিতটি পূর্ণভাবে রূপ পায়নি, এমনকি ব্যঞ্জনায় তা পরিস্ফুট হয়নি। কৃষ্ণা বসু লিখেছেন একটি আপাতসুন্দর (অথচ তাৎপর্যহীন) একটি পঙ্‌ক্তি—

মরণের কুৎসিত ইঁদুর দেখো, বসে আছে

জীবনের পূর্ণ গোলাঘরে।

পরম্পরিত রূপকের চেহারায় লাইনটি গড়া হয়েছে। 'জীবনের পূর্ণ গোলাঘরে' বলতে যদি সমৃদ্ধ জীবন-চিত্রের স্বাচ্ছন্দ্য দ্যোতিত হয়—তবে এর চিত্রধর্ম ও তাৎপর্যকে সুন্দর বলতেই হবে, কিন্তু 'মরণের কুৎসিত ইঁদুর' বললে তাৎপর্য অনেকখানি নষ্ট হয় মরণ ত' জীবনের অনিবার্য পরিণাম, তা অবাঞ্ছিত হতে পারে, কিন্তু কুৎসিত কেন? গোলাঘরের শেষ পরিণাম কি সর্বদা ইঁদুরের গর্তে যাওয়া—জীবনের শেষ পরিণাম যেমন সর্বদাই মৃত্যু? কবিতাটির মধ্যে ঈষৎ অনাবধানতার পরিচয় দিয়েছেন।

এই রকম অনবধান আরো দু একটি লক্ষ্য করেছি। 'কালো জল' কবিতায় আছে—'কপিন ফুলের ডাল'; কপিন রঙটা কি? (Copying pencil এর শিসের রঙ নিশ্চয়ই 'কপিন' শব্দটায় বোঝায় না), কপিন হলো কৌপীন বা অন্তর্বাস। 'ফিরে যাওয়া' কবিতায় একটি পঙ্‌ক্তি হলো—'সে ফিরে গেছে আবহমানতায় দিকে'। কোন দিক বুঝব? কবিতাটিকে অস্পষ্ট না করলেই কি চলতো না?

কৃষ্ণা বসুর ছন্দ সম্পর্কে অনবধান কিন্তু অসহ্য। জীবনানন্দের পয়ারের চাল তিনি কবিতার প্রকরণে ব্যবহার করেছেন। অথচ তাল প্রধানের মাত্রা বোধে তিনি সমতা রক্ষা করেন নি। জীবনানন্দের ছন্দে এই জাতীয় ত্রুটী অভাবনীয়, এবং নেই ও। আপাতদৃষ্টিতে কিম্বা মাত্রা গণনার দিক থেকে যদি বা ভুল বলে মনে হয়, কিন্তু গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়লে দেখা যাবে—ভুল ত' নয়ই, ছন্দ সম্পর্কে জীবনানন্দ কি বৈপ্লবিক কাণ্ড ঘটিয়েছেন, এবং পয়ারের ক্ষেত্রেও যুগ্মধ্বনির শোষণশক্তি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। কৃষ্ণা বসু অসংখ্য ছন্দপতন কেন—সেটাই ভাববার কথা। গদ্যছন্দেরও একটা তান থাকে, মাত্র মাত্রাসাম্য থাকে, তার চলন কখনোই উটকো নয়। কয়েকটি নমুনা দিই for ছন্দ পতনের—

(১) অরক্ষিত ঘর-দুয়ার, আলাভোলা উঠোনের শেষে (পৃঃ ১৯)

(২) বয়সকালে অনুরক্ত পুরুষের গায়ের গন্ধ (পৃঃ ২০)

(৩) বাঁদিকে শুয়ে থাকবে মোহন টিলার মতো কিছু (পৃঃ ২৪)

(৪) ছিনাল সারল্যের মুখে চড় মেরে লোভি ফিস দেখ (পৃঃ ২৮)

(৫) প্রান্তরে অপহৃত হয়ে বিক্ষত জ্যোৎস্নায় (পৃঃ ৪০)

এই রকম আরো উদাহরণ দেওয়া যায়। নিছক গদ্য হলে আপত্তির কিছু ছিল না, কিন্তু গদ্যছন্দের অনুসরণ করলে তার নীতি ও নিয়ম মানতে হবে বৈকি! পয়ারের ক্ষেত্রে ছন্দের তানটিই হলো আসল এবং তা জোড মাত্রারই বাহন!

MEMBER, All India Small & Medium News Paper Association, Delhi.
GODHULIMONE N. P. Regd. No.RN 27214/75 May '82
Vol. 24. No. 5 Postal Regd. No. Hys--14 Price Rupee One only

কবি/প্রবন্ধকার/সম্পাদক/অধ্যক্ষ
এমন একজন মানুষের নাম
ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু

তাঁকে নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে গোধূলি-মনের একটি বিশেষ সংখ্যা।

ঐ সংখ্যায় থাকছে ঃ—

১। এককালের গোলরক্ষক থেকে আজকের অধ্যক্ষ/সমীরণ মুখোপাধ্যায় (সাক্ষাৎকার)

২। শুদ্ধসত্ত্ব বসুর কবিতা (তাঁর এ যাবৎ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ থেকে বাছাই কবিতার সংকলন)

৩। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির আলোচনা। আলোচনা করবেন ঃ অমৃততনয় গুপ্ত, সম্মোহন চট্টোপাধ্যায়, উশীনর চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণা বসু।

৪। শুদ্ধসত্ত্ব বসুর গ্রন্থ তালিকা।

৫। জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী।

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পপুলার প্রিন্টার্স বারাসত, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও নতুনপাড়া চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

ই সংখ্যায় :

প্রসঙ্গঃ গোধূলি-মন

আপনার 'গোধূলিমন' নিয়মিত পাচ্ছি এবং এতে যে কতখানি তৃপ্তিলাভ— তা ভাষায় বোঝানো যাবে না। বাংলার লিট্‌ল ম্যাগাজিনের জগতে এর স্বকীয়তা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করবে চিরকাল। গত রবীন্দ্র সংখ্যা আমার সামনে খোলা। প্রতিটি প্রবন্ধের শরীরে প্রবেশ করে দেখেছি এক অনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার সোপান। শুনেছি উচ্ছলতার তীব্র করতালি। ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু 'মুক্তধারা,—কে আমাদের সামনে উন্মুক্ত করে এক নব চেতনার নিঃসর্গে পৌঁছে দিলেন। জীবেন্দু রায়ের দীর্ঘ প্রবন্ধটি পড়লে কিন্তু দীর্ঘ বলে মনে হয় না। এক নিশ্বাসেই পড়লাম। রবীন্দ্র ছোটগল্প সম্পর্কে সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনা আমাদেরও ভাবায়। তবে সুশীল রায় রবীন্দ্রনাথের গভীরের কথা বলছেন। সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধির কাছে আমরা নত হই বার বার। সম্মোহন চট্টোপাধ্যায় ও অমৃত তনয় গুপ্তর লেখাও পড়তে ভালোলাগে। শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়ের তুলির টানে যেন রবীন্দ্রনাথ অনেক অনেক গভীর থেকে উঠে এসেছেন।

মধুসূদন ঘাটী/রাজারামপুর

অশোকবাবু আপনার পাঠানো এবং আমার প্রিয় গোধুলি মন পাইয়াছি। আপনার সহানুভূতি এবং আন্তরিকতা আমায় মুগ্ধ করেছে। ভালো লেগেছে আপনার সহৃদয় সৌজন্য বোধ। অকৃত্রিম আপনার সাহিত্য অনুরাগ এবং ভালবাসা। পরিচ্ছন্ন চিন্তায় আপনি নির্ভীক। তাই দেখি মার্চের গোধুলি মন আপনার সম্পাদকীয় কলম বুকে নিয়ে চিন্তায়, আবেদনে স্বতন্ত্র এবং নির্ভীক। সৃষ্টির আন্তরিক প্রয়াস সব সময়েই নিঃশব্দ অভিমানে বেঁচে থাকে। যে বস্তুর যা নিয়ম, যে প্রয়াসের যে বন্ধন-নিয়মের আন্তরিকতা স্বস্ব ক্ষেত্রে বিরজিত। আপনার চিন্তা এবং সংগঠন আরো স্বার্থক এবং অভিনব উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। আপনার সব রকম কর্মকাণ্ডের সাথে আমাকেও টেনে নেবেন। আমাকে আপনি যে ভাবে চাইবেন সেই ভাবেই পাবেন। জানাবেন আপনার পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যত সংগঠনের পদ্ধতি।

প্রমথনাথ সিংহ রায়/কলিঙ্গনগর/উড়িষ্যা

"গোধুলি মন" নিয়মিত ভাবে পেয়ে যাচ্ছি। এ জন্য রইল আন্তরিক ধন্যবাদ। আজকাল মাঝে মধ্যে কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ ও আলোচনা পাঠকদের উপহার দিয়ে আপনি সম্পাদকের যথার্থ কর্তব্য পালন করেছেন। বিশেষ করে নতুন লেখকদের লেখা এবং বাংলা দেশের কবিতা—লেখক পরিচিতি ইত্যাদি স্থান পাওয়াতে "গোধুলি মনের" জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবে আশা করি।

বিশ্বনাথ দাস/কোচবিহার

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি মন

২৪ বর্ষ/৬ষ্ঠ সংখ্যা/ আষাঢ় ১৩৮৯

প্রতি সংখ্যা এক টাকা
বার্ষিক (সডাক) দশ টাকা
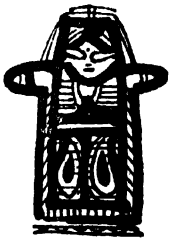
সম্পাদকীয়

এ বাংলার সাহিত্য পত্রিকার সত্যিই বড় দুর্দিন। তা বড় তা বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কথা বলা বাহুল্য এ প্রসঙ্গে টানছি না। কোলকাতার, মফস্বলের, প্রবাসের যে দিকেই তাকান না কেন বিগত দু তিন বছর আগেও যে সমস্ত পত্রিকা রমরমিয়ে চলছিল তাদের অনেকেই নিঃশব্দে মুছে গেছে, না হলে কচিৎ কদাচিৎ বিদ্যুতের মতো চমকে উঠে আবার অন্ধকারে, আর কিছু পত্রিকা ধুঁকছে। সহজেই বুঝতে পারা যায়, শেষ নিশ্বাস পড়তে আর বিশেষ দেরী নেই। কিম্বা মনে হয় এভাবে মৃতপ্রায় হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু অনেক শ্রেয়। বাঁশবেড়িয়ার 'সাহিত্য সেতু' চব্বিশ পরগণার শ্যামনগরের 'তৃণাঙ্কুর', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কৃত্তিবাস', সুশীল রায়ের 'ধ্রুপদী,' শুদ্ধসত্ত্ব বসুর 'একক', পাটনার 'সপ্তদ্বীপা,' মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কেতকী', নয়ন কুমার রায়ের 'ভুবন', মহাদেব নন্দীর 'লেখনী', সমরেন্দ্র রায়ের 'উষালোক', প্রভৃতি বহু পত্রিকার নাম বলা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে।

হয়তো আর্থ নৈতিক কারণই এই সমস্ত পত্রিকার বিপর্যয়ের জন্য মূলতঃ দায়ী। কিন্তু শুধুই কি তাই? ক্ষমতার লড়াই, ঈর্ষা পরায়ণতা, কর্মীর অভাব — এগুলিও কি অন্যতম কারণের মধ্যে পড়ে না? শুধু সরকারের সমালোচনা আর বিজ্ঞাপণের প্রত্যাশী হয়ে বসে থাকলেই কি পত্রিকা চলবে রমরমিয়ে? না। প্রকৃত নিষ্ঠাবান কর্মীর আজ সত্যিই দরকার এখনও জীবিত সাহিত্য পত্রিকাগুলি বাঁচাতে।

॥ সম্পাদক ॥
অশোক চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় কার্যালয়ঃ বক্সুরপাড়া । চন্দননগর । হুগলী । পশ্চিমবঙ্গ । ভারত

কবিতা

রক্ত পোড়া ধূপ/ইলিয়াস হোসেন

চুপ—রক্ত পোড়া ধূপ
অনেক কিছুই আছে জানা
কিন্তু বোলতে আছে মানা।

মেলায় এসেছিস খোকা
মৃত সৈনিক কিনবি কেন ?
মৃত্যুকে কেউ কেনে বোকা

কাঁদিসনা খোকা।

তোকে কি বোলবো বোকা
পৃথিবীতে যে যত বড় খুনি

সেই তত নামী

এইনে একটা রাইফেল কিনে দিলেম
যতন্ করে রাখিস
তুইও একদিন নামী হবি দেখিস।

Incense of burnt blood by Elyas Hossain

Hush ! Its incense of burnt blood !!
Many a things are known
But—not can be shown !

O lad ! strolling single in the fair
Why love to buy dead warrior ?
Who buys a dead and be fool
No dear ! Cry not be Cool ;

Whats to tell you fool
Amongst us he who is,greater murderous,
Is more famous !

You take this rifle
And keep it in care
And assure you to be a superior !

এ মুখ দেখো না/রমা ঘোষ

বরফ পাখির ঝাঁক খেলে গেল লেবুতলা ফুঁড়ে,
কি জানি কার্ত্তিক শেষে এত শীত কেন !
ভেঙে যেতে চেয়ে দেখি, মাটি নয়, কাঁচের পৃথিবী ।
কাঁচের জাহাজে চেপে ভুল পথে খুঁজেছি বন্দর,
শত্রুর তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ে চেয়েছি পানীয়,
বেকুব মেয়ের ছোটো আবদার শুনে
হেসে হেসে গড়িয়ে পড়েছে যত জঙ্গী সেনাদল,
দূরে নদী, খল খল জ্যোৎস্নায় পুড়ে যাওয়া মাঠ ।

আবার এসেছি ফিরে গ্রাম দেশে নিজেদের বাড়ি,
পাশ ফিরে শুয়ে আছি, এ মুখ দেখো না ।

আজও মনে পড়ে/জাহির আহমদ খান

একটি মেয়ে
কল্পলোকের সম্রাট নয়
মায়াবী চাঁদ নয়
দ্রুতগামী বিমান নয়
স্বর্গের অশরীরীও নয়
রক্তে মাংসে গড়া সে ।

উষার শিশিরে খয়েরি রং-এর ব্যাগ হাতে
বব্ কাট চুলসমন্বিত মাথা দুলিয়ে
তন্দ্রার আলস্যে মৃদু পায়ে হেঁটে আসত ।
তার—
কৃষ্ণবর্ণ আঁখিতে তৃষিত চাহনি
মধুর অথচ নিঃসঙ্কোচে ছান্দিক ভঙ্গীতে কথা বলা
ঝরনার মতো চঞ্চল গতিতে ছুটে চলা
একটু অভিমানে —
নীরব নিস্তব্ধতায় মুহ্যমান হয়ে
ব্যথাতুর মলিন বদনে দূরে সরে যাওয়া
মিথ্যে ছলনায় কপট রাগের ভুলে থাকা
গোলাপী ঠোঁটে না বলা কথার অব্যক্ত যন্ত্রণা
ক্রমবহমান শ্বাস প্রশ্বাসের উন্মত্ততা বিহ্বলতায়
প্রকাশে বেশ বদল আজও মনে পড়ে ।

অপূর্ণতা/বিশ্বনাথ দাস

রৌদ্রের মত ঝলমলে পোষাক খুলে ফেলে —
একদিন সে এসে বললো "পারবে গড়তে ?"
বললাম, 'কি ?'
সে বললো - "এমন একটি সংসার, যার
সারাটি পথ খুব শান্ত, নির্জন আর প্রতিটি মুহূর্ত থাকবে
ভালবাসার বিকল্পে পরিপূর্ণ, অদ্ভুত ।"

সে আরো বললো—
"শতকের জরা ব্যাধি যেখানে তুচ্ছ অথবা ম্লান,
ধুপধুনোর ধুঁয়োয় যেখানে সৃষ্টি হবে ছায়াপথ—
আর গল্পগুঞ্জনময় প্রাকৃতিক জীবনে গড়ে উঠবে
অবলম্বন, ফুটফুটে শিশুদের সজীব প্রাণ –

এ সব থাকা চাই,— এই নিখুঁত সংসারে ।"

আমি বললাম, স্বপ্নেই গড়া যেতে পারে ।'
শুনে সে বললো, "স্বপ্ন তো পোড়ানো যাবে না,
আমি যে তাকে পোড়াবো আগুনে ।"

একটি অভ্যাসের সনেট/ভাস্কর দাশগুপ্ত

সব কাজ করে যাই অভ্যাসের বশে
অভ্যাসের ক্রিয়া কিম্বা ক্রিয়ার অভ্যাস,
যে ভাবেই ব্যাখ্যা হোক্‌ ··ঘটনার শেষে
দ্বিতীয় ঘটনা নেই। যেন ক্রীতদাস··

নিজস্ব ভঙ্গীমা নেই দাঁড়বন্দী তোতা
দিনরাত কেটে যায় অবকাশহীন,
হাতের তালুতে কাঁপে রক্তলোলুপতা
হৃদয়ে রক্ত তার আকাঙ্খাবিহীন।

দিনগত পাপক্ষয় পাপের আকার
যদিও নেইক' জানা, করি প্রতিকার ॥

আশীর্বাদ/মধুসূদন ঘাটী

স্ফূর্তিমতী বালিকার কপাল জুড়ে চাঁদ নেচে যায়
আমি তার উড়ন্ত চুলের বিন্যাসে হাত ডুবিয়ে কিছুটা
আশীর্বাদের ভংগিতে বলেছিলাম : সুখী হও!
অথচ এখনও তার সুখ চেনা হল না ঠিক ঠিক—

সারাদিন পথে লোকজন হাঁটে ছেলেরা খেলার মাঠে
লাটাই হাতে রঙীন ঘুড়ি ওড়ায়। সে বালিকা
একাকী উঠানে চৌকি পেতে বসে থাকে চুপচাপ
শশুবেলাকার দিনগুলি যেন আঙুল উঁচিয়ে বলে :
সাবধান, এদিকে এসো না! এখানে ভীষণ তুঁষের আগুন
একটু ঘাঁটলেই দাউ ক'রে জ্বলে যাবে · বালিকা শুনেছে।

পুণ্যবতী হও মা—·ঈশ্বরও আশীর্বাদ করেছে তাকে
তবু; তার শরীরে, মনে, উদ্ভিন্ন চিন্তায় তীব্র অসুখ এখন
স্ফূর্তিমতী বালিকার কপাল-দিগন্তে বুঝি চাঁদ ডুবে গেছে—
আমি তার পবিত্রতা দেখেছি অনেক দিন অনেক সময়
কিন্তু এমন ছন্নছাড়া আত্মবিস্মৃতি দেখিনি কোনদিন।

বিস্ময়কর নাম : পাবলো পিকাসো

অমল হালদার

চিত্র-শিল্পের জগতে সব থেকে বিস্ময়কর নাম—পাবলো পিকাসো। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে ঝড়ের মেঘের মতো আকাশ জুড়ে ঘনিয়ে আসা এই নাম দূর ফরাসী দেশের উপকূল থেকে উত্থিত হয়ে সমস্ত পৃথিবীর ভাব ভাবনা, মননশীলতা এবং রক্ষণশীলতার রুদ্ধ দরজায় প্রচণ্ড আঘাত হানতে আরম্ভ করেছিল তাকে অভ্যর্থনা করবার মতো বলবান বুক কজনেরই বা থাকতে পারে। প্রত্যাখ্যান করার মতো সাহসই বা কজনার।

পিকাসোকে নিয়ে আলোচন, সমালোচনার অন্ত ছিল না। সেদিন এবং আজকেও…। যেমন………

A) "…What does it tell us about the Sitter except that she has long hair? What is all this drama about…' Unhappy, it is about being painted by Picasso. …

b) "His sucess, as we saw has little to do with his work it is the result of the idea of the genius which he Provokes.

C) …Picasso genius is of a type that requires inspriation from other People. He is the spokesman or seer for others.f পিকাসো একটি নাম এই শতাব্দীর শিল্প ইতিহাসের পাতায় অনেক কাল খোদিত থাকবে।

এই সব তাত্ত্বিক আলোচনা থেকে বুঝতে পারা যায় পিকাসো সম্ভ্রমপূর্ণ দূরত্বের অধিবাসী হলেও সমস্ত পৃথিবীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন প্রথম থেকেই।

পিকাসো একটি নাম এই শতাব্দীর শিল্প ইতিহাসের পাতায় অনেক কাল খোদিত থাকবে। বর্তমান শতাব্দীতে বহু শিল্পী জন্মেছিলেন কিন্তু পিকাসোর মতন কি অন্য কেউ এমন দাগ কাটতে পেরেছেন…?

এমন বিশ্বজোড়া কৌতূহল আর কেউ কি সৃষ্টি করতে পেরেছেন? জীবনভোর যেমন সংগ্রাম করেছেন তিনি তেমনি সঙ্গে সঙ্গে চালিয়ে গেছেন শিল্পচর্চা। অধিকাংশ শিল্পী একটি শিল্পশৈলী নিয়ে এক পথে চলেন। পিকাসো তাঁর ব্যতিক্রম। তাঁর শিল্প জীবন সুরু হয় প্যারিসে ১৯০০ সালে। সেই থেকে চলছে তাঁর শিল্প সাধনার জীবনে কত পরীক্ষা নিরীক্ষা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে তিনি দুবার চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি পাল্টেছেন। প্রথমে ছিলেন ক্ল্যাসিকাল ধর্মী। তারপর বিষাদনিষ্ঠিক। যার আরেক নাম ব্লু নিবিড় বা 'ব্লু পিরিয়ড'। ওই সময়ে তিনি মানুষের দুঃখ দুর্দশা নিয়েই এঁকেছেন। অধিকাংশ ছিল প্যারিসের জন জীবন। দ্বিতীয় ধাপ হল 'রোজ পিরিয়ড'। সার্কাসের কর্মী ও মানুষ ও জন্তু জানোয়ারদের ছবি আঁকা। তৃতীয় ধাপ হল পিকাসো ইজম্। এর নাম—'কিউবিজম'। এটি শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে। পিকাসো তার নিজের মনগড়া ইজম্ চালু করলেন আর্ট জগতে। যাকে পিকাসো ইজম্ ছাড়া অন্য কোনো নাম দেওয়া যায় না। থ্রী ডাইমেনশানকে চালু করলেন আর্ট-এ। ছবিগুলো দেখতে কেমন কেমন হলেও তার মধ্যে ছিল নতুনত্ব। তাই নিয়ে চলল আর্ট জগতে মহা-সমালোচনা। কেউ বলেন

সাংঘাতিক, কেউ বলেন দূর ছাই। তাই নিয়ে মত বিরোধ চলে বহুকাল। সেই থেকে হয়ে রইলেন বিস্ময়। সবার কৌতূহল··· !

পিকাসোর আর্ট-এর নিদর্শন ঘরে টাঙান হল ফ্যাশান। ধনীরা লাখ লাখ টাকায় একখানা পিকাসোর আঁকা ছবি তাঁর ড্রইং রুমে টাঙাতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতেন।

পিকাসোর ছবি বেচে বড়লোক হোলেন দালাল আর আর্ট গ্যালারীর মালিক। পিকাসোও বেশ কিছু পয়সা করলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাঁধল। ফ্রান্সে মুক্তি যোদ্ধাদের জন্যে লিথো প্রচার পত্রে তাঁর সৃষ্টি দিতে লাগলেন অকৃপণ হস্তে। সেই থেকে আরেক নতুন পিকাসোর জন্ম হল। গ্রাফিক আর্টের পুরোধায় এলেন পিকাসো। তারই চর্চা চলতে থাকে তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত।

১৯৫০-এর পরে তিনি নতুন পরীক্ষা শুরু করলেন মৃৎপাত্রের ওপর চিত্রাঙ্কনে সেগুলোর চর্চা তিনি রেখেছিলেন শেষের দিন পর্যন্ত। শিল্পী পিকাসোকে নিয়ে যত কৌতূহল, তাঁর চেয়েও বেশী কৌতূহল মানুষ পিকাসোকে নিয়ে।

জগতে আজ পর্যন্ত যত শিল্পী জন্মেছেন তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী আলোচনা লেখা ও বই বেরিয়েছে পিকাসোর ওপর, স্পেনে ফ্রাঙ্কোর—ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি আঁকলেন গুয়েরনিকা। প্রতিজ্ঞা করলেন স্পেনে ফ্যাসিবাদের বিদায় না হলে দেশে ফিরবেন না। হলেও তাই······।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্রান্স যখন নাৎসীবাদের কবলের তখন তিনি ফ্রান্সের মুক্তি যোদ্ধাদের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। সেই থেকে তিনি ফ্যাসিবাদ বিরোধী এবং আদর্শগত ভাবে কম্যুনিষ্ট। সে আদর্শে তিনি অটুট ছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

১৯৪৭ সালের পর প্যারিসে বিদেশী টুরিষ্টদের অন্যতম আকর্ষণ ছিল পিকাসো। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে ল্যাটিন কোয়াটারের সোপারনাস অথবা সাঁ জারমা দি প্রের'কাফে বারে তাঁকে দেখা যেত। তাঁকে ঘিরে চলত আলোচনা।

মানুষের ভীড়ে তিনি বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন দক্ষিণ ফ্রান্সের একটি ছোট গ্রামে, নাম তার ভালরুই। সেখানেই সারা দিন শিল্প সৃষ্টির কাজে ব্যস্ত থাকতেন। "১৯৫৬ পর্যন্ত তিনি প্যারিসের আড্ডার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। ওই সময়ে তাঁকে দেখা যেত। সাঁ-জারমা-দি-প্রিতে কয়েকটি কাফেতে জঁ ককতো ও জঁ-পল সার্ত্রের সঙ্গে। পিকাসো অনেক বছর প্যারিসে কাটিয়েছেন। কিন্তু তাঁর স্প্যানিস চরিত্র বদলাতে পারেননি। স্প্যানিসরা সাধারণত মুখে সাফ-সাফ জবাব দেয়। একটু রগচটাও বটে। মুখে এক ব্যবহারে আরেক রকম নয় স্পেনের প্রতি তাঁর আত্মীক টান ছিল বলেই শেষ জীবনে ৬০ দশকে তিনি অনেকগুলি লিথো গ্রাফী ছবি এঁকেছেন স্পেনের জনজীবন ও এর ওপর।"

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়ের

শীতে আরসিতে

যতদিন শীত ছিল বেড়ালীটা ঘুরতো-ফিরতো আর উনানের ধারে এসে গুটিয়ে বসতো। উনানেরও উত্তাপ ছিল। ভাত-ডাল-চচ্চড়ি, চুনোমাছ বেশিটা পচুই, এ সবই করতো সে ।এত করে সে যখন একটু জিরোতো, বেড়ালীটা এসে তার গা চেটে, পা চেটে সর্বাঙ্গ চেটেপুটে তাপ শুষে খেতো। শুধুই কি খেতো, বদলে কি কিছুই দিতো না? দিতো। নিশ্চয়ই দিতো। তা না হলে খা-খা বলে বেড়ালীকে লেলিয়ে দিয়ে, সারারাত এলিয়ে থাকতো নাকি মুখ পোড়া?

বেড়ালীর ইতিহাস আছে। মধুবাবু আধা-আধি জানে। পুরোটা জানতো এক মছলীবাবু। মধুবাবু মছলীবাবু নয়। মেছোবাজারে তাঁর যাতায়াত ছিল। আঁশটে গন্ধ তাঁকে নিশিপাওয়া মানুষের মত টেনে নিয়ে যেতো।

মছলীবাবুও খুব চাইতো তেনাকে। একথাটা বেড়ালীর। উনানের বুকের কোটরে শুয়ে সে তাকে মাঝরাতে এইসব হাবিজাবি গপ্পো শোনাতো। আর উনানও পারতো বটে! সারাদিন জ্বলে পুড়ে রাতেও আংরাবুকে দিব্যি ঘুমোতো।

উনানের ইতিহাস নেই। স্মৃতি, আছে কি বা নেই, ভালো জানা নেই। কি করে থাকবে? তবে হ্যাঁ, যদি মনে করা যায়, পাটনার মাটি গিয়ে ইট হ'ল কটকে পুরিতে, তারপর জোড়া-তাড়া লেগে জ্বলতে-নিভতে শেষে রয়ে গেল কোলকাতায়, তাহলে মোটামুটি ইতিহাস হয় বটে একটা।

তা সে যাই হোক। বলে রাখা ভালো, জায়গাটা কোলকাতা নয়। আশেপাশে কোনো একটা হবে।

বেড়ালীটা কোলকাতা চেনে। আর চেনে মেছুয়ার মছলীবাবুকে। চিনচিনে ব্যথা নিয়ে উনানটা ফ্যাকাশে তাকায়। ভাঁটিখানা ছাড়া যেন দুনিয়ার সকলই অচেনা। বেড়ালীও অচেনাই ছিল, সে গোড়ার দিকে।

সিনেমার ছবির মতন, প্রথম দিনের স্মৃতি ভেসে ওঠে আজো উনানের চোখে। মেছোব্যাগে বেড়ালীকে ভ'রে সেই যে যেদিন চুপিচুপি ঢুকে গেলো ঘরে মধুবাবু, নিঝুম দুপুরে। গিন্নি ছিলোনা সেদিন। গেসলো বাপের বাড়ী। জানলোনা তাই, কোলকাতাউলি এক নতুন বেড়ালী এল সেবারের শীতে।

মধুবাবু নামে মধু। কাজেতেও মধু। ব্যবহারে মধু-মধু ভাব থাকবেই। খুবই সজাগ লোক, খুব আঁটিশুটি। উঁকিঝুঁকি মেরে দ্যাখে, কেউ দ্যাখে কিনা। গিন্নি ফিরলে পরে কানে যাবে কিনা।

উনান মুচকি হাসে। সে দেখেছে ঠিক। আর সবই নুনখোর রা-কাড়বে না। তবে, উনানও কি পেরেছে তা, না পারতো কখনও? বেড়ালী সোহাগ দিয়ে ভাষা ছিনিয়েছে।

ছিনাল ছিনিয়ে নেবে এটাই তো ঠিক। দেবেন কিছুই। উনান বোঝে না। সে বোঝে ভাত-ডাল, সে বোঝে পচুই। জীবনের সার যেন খুব বুঝে গেছে।

মধুবাবু যে কদিন বাড়ীতে থাকে না, বেগমসাহেবা আসে হেলে দুলে রাতে। যেন তারই মহলে পোষা এক গোলামের কাছে। এলে বেগম আর বেগম থাকে না। বাঁদী হয়ে বান্দার সেবা করে খুব। বুক শোঁকে, মুখ শোঁকে। চেটে খায় তলপেট, পাছা। বুকের শূন্য খাঁচা জুড়ে শুয়ে থাকে।

এটুকুই চেনা-জানা। এটুকুই লেনা দেনা দু'জনের। ফাঁকা বুক, তবু সুখ। গোলামটা বোঝে। রাতটা বাড়লে রোজই বেগমকে খোঁজে। বেগমসাহেবা আসে নিয়মমাফিক। আর সেও বটে ইদানীং হয়েছে রসিক! এত জ্বলে এত পোড়ে তবুও সে হাসে।

মধুবাবুর এসবের জানে না কিছুই। ভাত খায়, মাছ খায়। বেড়ালী নাচায়। পিপেতে ভর্তি করে পাঠায় পচুই। গিন্নিকে চিঠি লেখে, কিছুদিন থাকো। শরীর সারিয়ে ফিরো বোকা কেন এত!

পুস্তক সমীক্ষা

বিবিন্ন অকিত এবং ভাইআালিন। অজিত বাইরী। অনন্ত প্রকাশন/৬৬ কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা—৭০০০৭৩
দাম : চার টাকা

কবি অজিত বাইরীর নাম ও কবিতার সঙ্গে গোধূলি-মন তথা বাংলা লিটিল ম্যাগাজিনের পাঠকবর্গের খুবই নিবিড় পরিচয় আছে। ইতিপূর্বে তাঁর চারটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ১) নৈঃশব্দ্য, সম্মোহন এবং বিষাদ, ২) উত্তর দক্ষিণ, ৩) অবেলার রোদ্দুরে তোমার মুখ, ৪) বিদায় কোতোয়াল, বিদায় সূর্যাস্ত। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে কবি অজিত বাইরী কবিতায় উত্তরোত্তর আরো গভীরতায় পৌঁছে যাচ্ছেন।

মাতৃহারা এক কিশোরের বিষন্ন একাকীত্বে একদিন ধীর পদে আগমন ঘটেছিল কবিতার। এবং ক্রমে কবিতার মায়াময় স্নেহাঞ্চলে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল প্রাত্যহিক জীবনের অনেক গ্লানি, বেদনা, যন্ত্রণা। তাই যে কোন বিষয় বস্তুর কবিতা হোক না কেন, এক ধরণের সংরাগী বিষন্নতা জড়িয়ে থাকে তাঁর কবিতায়।

কষ্টাশ্রিত চিত্রকল্পের মায়াজালে পাঠককে বিভ্রান্ত না করে অজিত পারিপার্শ্বিকতা থেকে তুলে আনেন সহজ সরল ছবি—যার কৃত্রিমতা বর্জিত কবিমন আশ্চর্য দক্ষতায় জন্ম দেন একেকটি নিটোল কবিতার। এদেশী, বিদেশী যে ধরণের ঘটনাই বিধৃত হোক না, পাঠক সহজেই একাত্ম হয়ে পড়ে তাঁর কবিতায়। কিছু কিছু টুকরো উদাহরণ তুলে দিচ্ছি :

১। উদম বুক, লু বইছে পশ্চিমে, পুড় যাচ্ছে গা; । পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, উগরে দিচ্ছে মানুষ-মিছিলে মেলাও পা। (খরা)

২। বুকে বসে মাংস ঠোকরাচ্ছে কাক/এই লাশটা তার বাবার, এই লাশটা তার মা-র/এই লাশটা তার ভাইয়ের, এই লাশটা ছোট বোনের/বুকে বসে মাংস ঠোকরাচ্ছে কাক। (কাক)

বর্তমান কাব্যগ্রন্থে বিচিত্রধর্মী ছত্রিশটি কবিতা নির্বাচন করে কবি অজিত বাইরী আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন একজন কবির গতি দেশকালের গণ্ডী ছাড়িয়ে সুদূরে প্রসারিত। পাবলো নেরুদা, হুইটম্যান, ইয়েটস যেমন এসেছেন তাঁর কবিতায়। আমাদের কাছের কবি সুব্রত চক্রবর্তীও তেমনি এসেছেন। তুলো চাষি, গ্রামের কৃষক, নিঃসঙ্গ বালক, খরাদগ্ধ বাঁকুড়া—পুরুলিয়া সব কিছুই ঘিরে রয়েছে তাঁর কবিতা। নিখিলেশ সেনের আঁকা প্রতীকী প্রচ্ছদটি ভাবায়। বাঁধাই মনোরম।

কবি শামসুদ্দিন আহমদের দু'টি বই

যশোরের কবি শামসুদ্দীন আহমদ ওপারের সাহিত্য পাঠকের কাছে পরিচিত মুখ। কবিতা, গান, ছোটদের ছড়া ও কবিতা সব কিছুই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখনী থেকে। এপার-ওপার বাংলার বহু পত্র-পত্রিকার তিনি বহুদিনের নিয়মিত লেখক। গোধূলি-মনেও ইতিপূর্বে তাঁর একাধিক লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

'মায়াপুকুর' ছোটদের জন্য লেখা চোদ্দটি কবিতার সংকলন। শুরু হয়েছে প্রচ্ছদ-নামের কবিতাটি দিয়ে। অন্যান্য কবিতাগুলি হোল—'আদাব' (আযান শুনিয়া কানে) 'মহৎ (আল্লার দেওয়া আলো.................)

'দৃষ্টিলাভ' (কবিবর শেখ সাদী······) 'বন্ধু' (কোরেশের হাতে লাঞ্ছিত নবী······) 'শাসক' (খলিফা উমার ইবনে আববাস সহচর লয়ে সাথে) 'সেবা' (গভীর রজনী নীরব নিথর চারিদিক আঁধিয়ার······) 'শ্রমের মূল্য' (কয়দিন হল' হে নবী দয়াল······) 'মা' (বালক বায়েযিদ······) 'আত্মজ্ঞান' (একদা সন্ধ্যাবেলা) 'রাখাল' (রোমক সৈন্য হ'লে পরাজিত ইয়ারমুক ময়দানে······) 'ক্ষমা' (মক্কা বিজয় পরে······) 'প্রতিশোধ' (একদা রাত্রিবেলা.. ..) 'সেবক' আমিরুল মুমেনীন.. ···)—পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এ কাব্যগ্রন্থের সমস্ত কবিতাই ইসলামধর্মীদের জন্য। আর যে হেতু ইসলামধর্ম গ্রন্থগুলির সমস্ত কাহিনী আমার জানা নেই, ও প্রসঙ্গে আলোচনা না করাই সঙ্গত। তবে ক্ষুদে পাঠকের কাছে তাঁর কবিতা অবশ্যই আদরনীয় হবে। আযন (আজান) নামায (নামাজ) ইত্যাদি বানান অপরিচিত লাগলো।

'খেলাঘর' নামে সম্ভবত: যশোরের কোন শিশুসংস্থা আছে এবং প্রবীণ কবি সামসুদ্দিন আহমদ ঐ সংস্থার সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত আছেন। 'খেলাঘর' নামে ছড়ার বইটিতে ত্রিশটি ছোট বড় ছড়া আছে। প্রচ্ছদ নামের ছড়াটি দিয়ে 'মায়ামুকুরের' মতো এটিরও শুরু।

জনাব শামসুদ্দিনের ছড়ার হাত খুবই দুর্বল। দু'/একটি উদাহরণ দিচ্ছি :—

'লেখাপড়া করবনা আর করবনা
খাবার কিছু খাবনা মা খাবনা।
জামা জুতো পরবনা আর পরবনা
খেলাধুলা ও আর করবনা মা, করব না॥
(আব্দার)

টুং টাং টিং টাং
রিকশা ছুটছে
ঘুম ঘুম খোকামণি—
ওই চোখ খুলছে।'

—দুটি গ্রন্থেরই প্রচ্ছদ এবং বাঁধাই সুবিধের নয়

মায়ামুকুর/শামসুদ্দীন আহমদ/সাহিত্য ভবন, যশোর, বাংলাদেশ/ছয় টাকা
খেলাঘর/শামসুদ্দীন আহমদ/সাহিত্য ভবন, যশোর, বাংলাদেশ/আট টাকা

—অশোক চট্টোপাধ্যায়

সংবাদ সমীক্ষা ৪

বৈদ্যবাটীতে লিট্‌ল ম্যাগাজিন "রূপান্তর-এর আত্মপ্রকাশ

বৈদ্যবাটী ১১ই মে ৮২ ॥......(১) দৈনিক স্বপ্ন ছুট হয় কত.........বিপ্লবী দেওয়ালে গোপন সংগতি (২) রবীন্দ্রনাথ হোক আমাদের একমাত্র ব্লাড্‌-গ্রুপ্‌। এই দুটি মারাত্মক বক্তব্য নিয়ে সেদিন হাজির হয়েছিলেন একটি মনোজ্ঞ কবিতা-সাহিত্য আসরে বৈদ্যবাটীর দুটি লিট্‌ল ম্যাগাজিন গোষ্ঠী। প্রথম বক্তব্যটি ''রূপান্তর" এর প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়র অংশ বিশেষ। দ্বিতীয়টি ',শাব্দিক" পত্রিকার পক্ষে একটি অসাধারণ দেওয়াল-লিপি। আসর বসেছিল গত ৮ই মের সুর্যদগ্ধ সন্ধ্যায়, স্থানীয় প্রখ্যাত কবি শিল্পী-নাট্যকার অশোক মুখোপাধ্যায়ের বাস-ভবনে, যিনি সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিচালকও ছিলেন বটে। উপলক্ষ্য ছিল "রূপান্তর" এর জনগণের দরবারে প্রথম প্রবেশ এবং ''শাব্দিক"-এর রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীর প্রাক্‌কালে কবিকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন। নানান বর্ণময় পোষ্টার, ছবি, পুষ্পসজ্জা, পত্রিক'-প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে সেদিন উদ্যোক্তারা যে শুচিশুভ্র পরিবেশ রচনা করতে পেরেছিলেন তার জন্য সত্যিই প্রশংসার দাবীদার তাঁরা। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় ও বহিরাগত বহু সাহিত্য-সংস্কৃতি অনুরাগী ও বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশ ঘটে। উদয়শংকর ব্যানার্জী বিপ্লব নাগ, কিংশুক ভাদুড়ি, অলক ভড়, সুবীর চট্টোপাধ্যায়, ব্রজ অধিকারী, এবং রূপান্তর সম্পাদক অমলেন্দু কুমার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

△ সাহিত্যের খবর

১১ই মে ১৯৮২ রসকলি ও আবৃত্তি পরিষদের পরিচালনায় ও ডঃ অনন্ত চট্টোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনায় বর্ধমানের রবীন্দ্রভবনের মঞ্চে একটি মনোজ্ঞ সাহিত্য বাসর হোয়ে গেল। মানুষ যে কবিতা বা আবৃত্তি সত্যিই ভালবাসে তারই প্রমাণ করলেন সেদিন। উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় জগন্নাথ বসু। অমিয় চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে জীবন্ত হোয়ে উঠল জীবনানন্দ। সৌমিত্র মিত্র আবৃত্তি করলেন বিষ্ণু দে, রবীন্দ্রনাথ আর শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা। দেবদুলাল ও নীলাকরের কর্ণ কুন্তি সংবাদ শ্রোতাদের ভীষণভাবে মুগ্ধ করে। কবিতা পাঠ করলেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও কবি অরুণকুমার চক্রবর্ত্তী। শ্রোতাদের মতে ঠিক এই ধরণের মনোরম অনুষ্ঠান রবীন্দ্রভবনে নাকি আগে হয়নি। কবিকণ্ঠে 'অ-তুই লালপাহাড়ীর দেশে যা' গানটি দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

△ এবারের রবীন্দ্র জয়ন্তী

প্রতি বছরের মতো এবারের অত্যুৎসাহী মানুষের ভীড় ভেঙে পড়েছিল ২৫শে বৈশাখ সকালে জোড়াসাঁকো ও রবীন্দ্রসদনে। গান, আবৃত্তি আর পরিচিত/অপরিচিত/অল্প পরিচিত—কবি/সম্পাদকদের আলাপ আলোচনায় জমে উঠেছিল রবীন্দ্রজন্মোৎসব। প্রতিভাস, কবিকণ্ঠ, ২৫শে বৈশাখের কবিতা, মহাপৃথিবী, ক্ষমা, মাঝি, অতিথি রবিবাসরীয় জনতা প্রভৃতি পত্রিকা তাঁদের বিশেষ সংখ্যা নিয়ে এসেছিলেন। আর বলাবাহুল্য গোধূলি-মন গোষ্ঠীর প্রায় সকলেই হাজির ছিলেন সেদিন। স্বভাবতঃই ভালই বিক্রী হয়েছে।

এবারে রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন কবি বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ২৫শে বৈশাখ বিকেলে রবীন্দ্রসদনে এক অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

△ প্রধান শিক্ষক সমিতির রাজ্য সম্মেলন :

পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির চব্বিশতম রাজ্য সম্মেলন আগামী ১৫ই, ১৬ই ও ১৭ই জুন-বর্ধমান টাউন স্কুলে অনুষ্ঠিত হল। ১৫ই জুন বেলা ৩টায় বিদ্যালয়ে (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) ইতিহাসের বিষয়বস্তু ও স্বদেশপ্রীতি জাতীয় সংহতি, বৈদেশিক সম্পর্ক ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধিকার সম্বন্ধে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। এই আলোচনাচক্রে ঐতিহাসিক, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যসেবী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিক ও বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক সংগঠকরা অংশ গ্রহণ করলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক সুধীর অধিকারী পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শিক্ষক, সহ-প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

বাংলাদেশে প্রথম দর্শনীর বিনিময়ে ছড়া পাঠের আসর :

গত ১৬ই মে রোববার বিকালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীস্থ জিয়াউর রহমান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশে প্রথম দর্শনীর বিনিময়ে ছড়া পাঠের আসর। আসরটির আয়োজন করেছেন শিশু সাহিত্য পরিষদ। দর্শনীর বিনিময়ে এই চমৎকার ছড়া পাঠের আসরে ছড়া পড়েন দেশের বিশিষ্ট প্রবীণ ও তরুণ ছড়াকার।

প্রথম ছড়া পড়েন, মুসলেমউদ্দিন, সামসুর রহমান, আল মাহমুদ, আতোয়ার রহমান, রফিকুর হক, আহমদ উল্লা, আবু থায়ের, অকু হাসান, আবু সালে, আবদার রশীদ, ফারুক হোসেন, আবু জাফর, দু ওবায়েদুল্লাহ প্রমুখ।

△ কলিকাতা সাহিত্যিকার উদ্যোগে কলিকাতায় প্রথম ব্যঙ্গ কবিতা সম্মেলন :

নিজস্ব সংবাদদাতা গত ১৩ই মার্চ শনিবার ষ্টুডেন্টস্ হলে কলিকাতা সাহিত্যিকার ৪২ বর্ষের তৃতীয় অধিবেশনে ব্যঙ্গ কবিতা সম্মেলন হয়। অভিনব মঞ্চসজ্জা এবং মঞ্চের একপার্শ্বে একটি টবে ক্যাক্‌টাস্ ও ফুলের তোড়া রঙ্গ-ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হয়।

কলকাতা সাহিত্যিকার সভাপতি শ্রীকুমারেশ ঘোষ অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণে বলেন, আজ অশুভ ১৩ তারিখ এবং শনির শেষ। তাছাড়া সর্বকালে সর্বত্র ষ্টুডেন্টরাই সমাজের অন্যায় অনিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, তাই এই অনুষ্ঠান হচ্ছে এই ষ্টুডেন্টস্ হলে। আর মার্চেই শুরু হোক্ ব্যঙ্গ কবিতার মার্চ। ব্যঙ্গ মানেই ভেংচি কাটা। সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। যখন সকলে ভয়ে চুপ করে থাকে বা জেগে ঘুমোয় তখন ব্যঙ্গ কবিতার কবি তাঁর কলমের খোঁচায় তাদের জাগিয়ে তোলেন। সেদিক দিয়ে ব্যঙ্গ কবিতার কবি একাধারে যোদ্ধা, বোদ্ধা এবং ইতিহাসবেত্তা বা ঐতিহাসিক।

অনুষ্ঠান সভাপতি ডঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত এই অভিনব ব্যঙ্গ কবিতা সম্মেলনের জন্য কলিকাতা সাহিত্যিকার সভাপতি শ্রীকুমারেশ ঘোষ ও সকল উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, আলঙ্কারিকদের বিভাগ অনুসারে নব রসের মধ্যে আদি রসের দ্বিতীয় রসই হাস্যরস।

ব্যঙ্গ কবিতার বিভিন্ন দিক ও সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গভীর আলোচনা করেন ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন, ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু। সভার শুরুতেই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে তাঁদের ব্যঙ্গ কবিতা পাঠ করা হয়। ৮৯ বৎসরের যুবক কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত স্বরচিত ব্যঙ্গ কবিতার সঙ্গীত পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক পর্ব শেষ হয়। সভায় দ্বিতীয় পর্বে সরিৎশেখর মজুমদার প্রবীণ কবিদের প্রেরিত ব্যঙ্গ কবিতা পাঠ করেন।

রাতের অনেক সামাজিক অনুষ্ঠান অনেকে দিনেই সেরে ফেলছেন

★ এটা ভালোই। অনাবশ্যক আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? বিয়ে বাড়ীতে যেমন আলোকসজ্জা। যৌতুকের চাপে কনের বাপ-মা যখন অস্থির তখন আলোর মালাও বিছের কামড় হয়ে দাঁড়ায়।

★ যৌতুক ও পণপ্রথা সামাজিক কলঙ্ক। তাই এর আদান-প্রদান চলে চোখের আড়ালে। এই কু-প্রথা আর আনুষঙ্গিক আড়ম্বর বন্ধ করা দরকার। দেহের জন্য রক্ত যেমন অপরিহার্য সামাজিক প্রগতির জন্য বিদ্যুৎও তেমনি। এই অত্যাবশ্যক বস্তুটির অপচয় করা অন্যায়।

★ ১৯৮০-৮১তে ১১৮·৫ বিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছিলাম। ১৯৮১-৮২-র উৎপাদন লক্ষ্য ১৩০ বিলিয়ন ইউনিট এখনও অনায়ত্ত।

কুপ্রথাগুলিকে প্রশ্রয় না দেওয়া এবং দেশের উন্নয়নে প্রয়াসী হওয়া সকলের কর্তব্য

বিশদ বিবরণের জন্য নীচের কুপনটি ভরে পাঠিয়ে দিন

ডেপুটি ডিরেক্টর,
মাস মেলিং ইউনিট,
ডি.এ.ভি.পি.,
বি—ব্লক, কস্তুরবা গান্ধী মার্গ
নিউদিল্লী—১১০০০১

নাম
ঠিকানা
পিন

আমি নতুন বিশ দফা কর্মসূচী সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানতে আগ্রহী। অনুগ্রহ ক'রে এই সম্বন্ধে আমায় বাংলা/ইংরাজী পুস্তিকাটি পাঠিয়ে দিন।

নতুন বিশ দফা কর্মসূচী

DAVP/81/383.

MEMBER, All India Small & Medium News Paper Association, Delhi.
GODHULIMONE N. P. Regd. No.RN 27214/75 June '82
Vol. 24. No. 6 Postal Regd. No. Hys—14 Price Rupee One only

কবি/প্রবন্ধকার/সম্পাদক অধ্যক্ষ
এমন একজন মানুষের নাম
ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু

তাঁকে নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে গোধূলি-মনের একটি বিশেষ সংখ্যা

ঐ সংখ্যায় থাকছে :—

১। এককালের গোলরক্ষক থেকে আজকের অধ্যক্ষ/সমীরণ মুখোপাধ্যায় (সাক্ষাৎকার)

২। শুদ্ধসত্ত্ব বসুর কবিতা— (তাঁর এ যাবৎ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ থেকে বাছাই কবিতার সংকলন)

৩। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির আলোচনা। আলোচনা করবেন: অমৃতময় গুপ্ত, সম্মোহন চট্টোপাধ্যায়, উশীনর চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণা বসু।

৪। শুদ্ধসত্ত্ব বসুর গ্রন্থ তালিকা।

৫। জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী।

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পপুলার প্রিন্টার্স বারাসত, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও নতুনপাড়া চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

সংখ্যায়

নিয়মিত বিভাগ ঃ

প্রচ্ছদ ঃ পান্না গোস্বামী

প্রসঙ্গ গোধূলি-মন

△ সুজনেষু,

নিয়মিত কাগজ প্রকাশ করে লিটিল ম্যাগাজিনের সম্পাদক হিসেবে আপনি ঈর্ষনীয়! এবং ধন্যবাদ আপনার দুঃসাহসিকতার জন্য। তবে পত্রিকাটি প্রকাশে আরও পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। লিটিল ম্যাগাজিনের চরিত্র রক্ষা করে এই পরিকল্পনা না নিলে আগামীকালে এর জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়বে। প্রয়োজনে লেখকদের জন্য সামান্য কিছু আর্থিক সাহায্য (যদি সম্ভব হয়) দিতে পারলে কাগজও আকর্ষণীয় হতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

রাজকুমার পণ্ডা
মেদিনীপুর

△ কবিতা সংখ্যা হাতে পেয়েছি। যে রকমটি প্রতিনিধিত্বের কথা ছিল; সে রকমটি হয় নি। সম্পাদকীয়তেই রয়েছে সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি। কাজেই এ প্রসঙ্গের অবতারনা অবান্তর।

শ্রীযুক্ত শুদ্ধসত্ত্ব বসু যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে নবীনা কবির কাব্যগ্রন্থের আলোচনা করেছেন। এ প্রশংসা কার প্রাপ্য—কবির? সম্পাদকের? না সমালোচকের? এর আগের সংখ্যায় সমালোচনার বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম। এর জন্যও বিজ্ঞাপন? হ্যাঁ, নতুনত্ব আছে। পত্রিকাটির পক্ষে আলোচনাটি দীর্ঘ এবং ভারি হয়ে গিয়েছে এবং পাঠকের প্রতি কিছুটা পীড়নও।

অজিত বাইরী
বাগনান/হাওড়া

△ গত সংখ্যার 'গোধূলি-মন' পড়লাম। ভালো লাগল। পত্রিকাটি অবয়বে ছোট হ'লেও চরিত্রে অনেক বড়। আপনার সম্পাদনা, আপনার কবিতার মতোই সুন্দর। নমস্কারান্তে—

গৌতম দত্ত
সম্পাদক—'বোধি', প্রিন্স রোড
পোঃ ও গ্রাম— মানবাজার
জেলা— পুরুলিয়া (পঃ বঃ)

△ শুভেচ্ছা জানবেন। "গোধূলি মনের" প্রতি সংখ্যার উন্নততর শ্রীবৃদ্ধি এবং ব্যতিক্রমধর্মী উপস্থাপনা ভালো লাগছে। এপ্রিল '৮২ সংখ্যার বঙ্কিম চক্রবর্তী, সাঈদ সানাউল হক, বীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায়, সমীর মণ্ডল, সনৎ মান্না এবং আপনার 'পলাশ" কবিতা ভালো লেগেছে।

তবে একটি গল্পের অভাব বোধ হয়েছে প্রচণ্ডভাবে। উশীনর চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ না থাকলে "গোধূলি মন" শুধুমাত্র কবিতারই হয়ে যেত।

গোধূলি মনের ২৫ বছর পূর্তি সংখ্যার জন্য অধীর অপেক্ষায় রইলাম।

আলী ইদরীস
যশোর/বাংলাদেশ

২৪ বর্ষ/৭ম সংখ্যা/ শ্রাবণ ১৩৮৯

প্রতি সংখ্যা এক টাকা
বার্ষিক (সডাক) দশ টাকা

॥ সম্পাদকীয় ॥

অনেক পাঠকের কাছ থেকে অনুযোগ আসছে আমরা কবিতাকে যতটা প্রাধান্য দিই, গল্পকে তার তুলনায় কিছুই না। এ অভিযোগ আমরাও অস্বীকার করি না। যাঁরা ছোট পত্রিকা চালান তাঁরা সকলেই জানেন এর কারণ কি। তাছাড়া আরও একটি কারণ ইদানীং খুবই প্রকট হয়ে উঠেছে তা হোল ভাল ছোটগল্পের অভাব। মফঃস্বলের তরুণ গল্পকারেরা যাঁরা ইতিমধ্যে দু/একটি ভাল ছোটগল্প লিখে অনেকের চোখে পড়েছেন তাঁরা ভাল গল্পগুলিকে সযত্নে ধরে রাখেন বড় পত্রিকার জন্য। যাতে প্রচার এবং পারিশ্রমিক দুই-ই পাওয়া যায়। আমাদের মতো ছোট পত্রিকা যেখানে বিজ্ঞাপণের অভাবে সম্পাদকের পকেট থেকে কাগজওলা, প্রেসওয়ালা প্রমুখের ধার মেটাচ্ছে, তাদের স্বপ্নের মধ্যে থাকলেও বাস্তবে কোন লেখককে পারিশ্রামিক দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠছে না। তবু পূজোর মাস দুয়েক আগে মোটামুটি যাঁরা ছোট পত্রিকায় গল্প লিখে থাকেন এমন পাঁচজন গল্পকারের পাঁচটি ছোটগল্প নিয়ে এই 'গল্প সংখ্যার' আত্মপ্রকাশ ঘটল। প্রিয় পাঠক, এ সংখ্যার লেখার ওপর নির্মমভাবে আলোচনার জন্য আপনার সাদর আমন্ত্রণ রইল।

॥ সম্পাদক ॥
অশোক চট্টোপাধ্যায়

○ সম্পাদকীয় কার্যালয় : নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর ॥ হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥
○ [illegible] [illegible] : [illegible] জি নাজিরলেন, কলিকাতা— ৭০০০২৩

নব বন্দ্যোপাধ্যায়ের একজন কেউ

গুণে গুণে তেরখানা সিঁড়ি বেয়ে চৌদ্দ নম্বরে পা দিয়ে অনুতোষ বুঝল কিছু গোলমাল। বারান্দার আলো জ্বলছে না। বাকী সিঁড়িগুলো পার হয়ে বারান্দার শেষে এসে ডাকল, "সুদীপা—এ্যাই সুদীপা!" কোন সাড়া পেল না।

বারান্দার অন্ধকার আরো ঘন। আষাঢ় মাসের সন্ধে সাড়ে সাতটার সময় যতটা হওয়া উচিত আর কি! এই এলাকায় এখন লোডশেডিং নয় অথচ সিঁড়ি থেকে শুরু করে, ঘর বারান্দা কোথাও আলো জ্বলছে না। কারণ ভেবে পেল না অনুতোষ। সাধারণত সুদীপা সন্ধ্যে হলেই আলো জ্বালিয়ে রাখে। আলো জেলে ঘরে খিল দিয়ে টেলিভিশন দেখে কিংবা ছোট্ট করে রেডিও খুলে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনে। আজ আলো জ্বালা দূরের কথা এখনো পর্যন্ত ওর অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাচ্ছে না অনুতোষ।

হাতের প্যাকেটটা এদিক ওদিক করে হাত পালটাল অনুতোষ. ডানদিক চেপে ক'পা হেঁটে হাতে গ্রীলের স্পর্শ পেল। ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে বেশ। মুঠোর মধ্যে তবু কিছু একটা রয়েছে ভাবতে জোর পেল একটু। কিন্তু সুদীপার কি ব্যাপার? অন্তত মিনিট খানেক হলো এসেছে তবু কোন শব্দ নেই ভেতর থেকে। অথচ ঘরের দরজা খোলা পরিষ্কার দেখতে পেল অনুতোষ। পরিষ্কার মানে অবশ্য ঐ অন্ধকারে যতটুকু দেখা সম্ভব—এই আর কি! গ্রীল পার হয়ে আসা হাওয়া কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ওদের ঘরের পর্দা তাও নজরে এল ওর; শুধু সুদীপাই নজরে আসছে না এখনো।

নিচের তলার ভাড়াটেদের ঘর থেকে হৈ চৈ'এর শব্দ, টুকরো টাকরা কথা ভেসে আসতে থাকে। সুদীপা কি ওদের ওখানে গেল? কিন্তু এভাবে সবকিছু অন্ধকারে রেখে সুদীপা কি সত্যিই নিচে যাবে? নাকি ওর অবর্তমানে অন্য কেউ এসেছিল ঘরে তারপর সবকিছু লুঠপাট করে, তছনছ করে রেখে গেছে—! নাহ্ আর ভাবতে পারছে না অনুতোষ। গলার মধ্যে শুখনো শুখনো লাগছে পরিষ্কার অনুভব করল। ঘরের মধ্যে ঢুকতে ভয় করছে ওর।

আজকের কাগজেই অন্তত তিনটে এই রকম ডাকাতির ঘটনা আছে। একটা রিষড়ার এক ফ্ল্যাটে; স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীকে হাতুড়ি দিয়ে মেরে সমস্ত গয়না টাকা পয়সা লুঠ করে নিয়ে গেছে। বাকী দুটো কলকাতায়। দুপুরবেলা বাড়ির পুরুষদের অনুপস্থিতিতে ছুরি দেখিয়ে সর্বস্ব নিয়ে গেছে মেয়েদের কাছ থেকে।

'সামুদ্রিক হাওয়া' বলে সন্ধেবেলার যে হাওয়া ওঠে, সেটাও কপালের ঘাম শুকোতে পারছে না বুঝতে পারল অনুতোষ। অন্ধকার বারান্দায় ফাঁকা (!) ঘরের খোলা দরজার সামনে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল খেয়াল ছিল না। নিচের থেকে হাসির একটা হর্‌রা উঠে আসতে নিজের অজান্তেই একটু একটু করে করে দরজার দিকে

এগিয়ে গেল অনুতোষ। প্যাকেট ধরে থাকা হাত ঘামছে এখন। ঘরের মধ্যে কী অন্ধকার! ঢোকার মুখেতেই বুক দুরদুর।

অনুতোষ প্যাকেট সামলে এক হাত দিয়ে দরজার পর্দা সরাল। অন্ধকারে সিল্কের পর্দায় আঁকা শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জলীলা পিছলে যায়। হায়, এই পর্দা সুদীপার-ই পছন্দ!

প্রায় ফিসফিসিয়ে ডাকে অনুতোষ, 'দীপা—এই দীপা!' অন্ধকার ঘর ঘরের মতোই চুপচাপ। জানলা দিয়ে হাওয়া সরাসরি বেরিয়ে যায়, বয়ে নিয়ে যায় অনুতোষের কথাগুলো। বুকের মধ্যে ফাঁকা ফাঁকা লাগে। এক ধরণের কষ্ট উঠে আসতে থাকে নিজের ভেতর থেকে। সুদীপা কি বোঝে এসব? অনুতোষ জানে না।

আন্দাজে আন্দাজে পরিচিত ঘরটার চারধারে তাকিয়ে সুইচবোর্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। পিয়ানোর টুংটাং বেজে ওঠে না। বদলে যান্ত্রিক একটা খুট্ শব্দ হয়। শিউরে ওঠে অনুতোষ। মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে যেতে থাকে। কোন সন্দেহ থাকে না ওর ঘরের মধ্যে অন্য কেউ আছে, নিশ্চিতভাবেই আছে।

প্যাকেট রেখে হাতড়ে হাতড়ে বেরিয়ে যাবার জন্য দরজা খুঁজতে থাকে অনুতোষ, পায় না। একবার, দু'বার, তিনবার—একবারের জন্যও দরজাটা ঠেকে না হাতে। কপালে, ঘাড়ে ঘাম ফুটে ওঠে। রুমাল বের করে নিঃশব্দে মুছে নেয় অনুতোষ। রুমাল আবার পকেটে চলে যায়।

একটু আগে অন্ধকার বারান্দা থেকে খোলা দরজাটা দেখতে পায় সুদীপার কাছে আসবার জন্য ভেতরে এল অথচ কী আশ্চর্য, এখন বেরিয়ে যাবার জন্য সেই দরজাটাই অদৃশ্য! ব্যাপারটা রীতিমত হেঁয়ালি মনে হয়। অবশ্য ঘরের মধ্যে অন্য আর একজনের অস্তিত্ব ইতিমধ্যেই মেনে নিয়েছে অনুতোষ এবং সে বা তিনি নিশ্চিতভাবেই সুদীপা নয় বা নন। সুদীপার মৃতদেহের ওপর বসে বা দাঁড়িয়ে কোন নব্য-তান্ত্রিক।

চিৎকার করার ইচ্ছাটাকে অতি কষ্টে থামাল অনুতোষ, কেন না চিৎকার করলেই শব্দ লক্ষ্য করে ঝলসে উঠবে এক ঝলক মায়াবী আলো আর তারপরই সুদীপার পাশাপাশি কিংবা একটু তফাতে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়বে ও। বরং তার থেকে জরুরী এই ঘর থেকে বের হওয়ার রাস্তাটা খোঁজা।

অনুতোষ চোখ বুজে ঘরের ছকটা মনে করতে চেষ্টা করে। আচ্ছা, দরজা দিয়ে ঢুকেই যদি বাঁ হাতে সুইচবোর্ড হয় তাহলে তো খুব কাছাকাছিই আছে দরজাটা। কেননা, একটু আগেই ও বাঁ হাত দিয়েছিল সুইচ-বোর্ডে। ইউরেকা, চিন্তাটা করেই ও লাফ দিল একটা। ধুপ্ করে শব্দ হতেই সতর্ক হয়ে গেল। যদি ঘরের অন্য লোকটা শুনে ফেলে তাহলেই সর্বনাশ। সুদীপা তো গেছেই, ও নিজেই ফিনিশ। ব্যাঙ্ক কেরানী অনুতোষ 'ফিনিশ'এর অন্য অর্থ জানে। সুদীপা জানত না; হয়ত বাধা দিতে গিয়েছিল, হয়ত স্বামীর জিনিসে হাত দিতে দেয় নি—ব্যস্ ফিনিশ!

বিড়ালের মতো নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে ওর পুরনো জায়গা ছেড়ে সামনের দিকে এগোয় অনুতোষ। এক এক মুহূর্ত এক এক যুগ মনে হয়। সময়ের কথা মনে আসতেই হাতের দিকে তাকিয়ে স্থির গেল এক জায়গায়। সুদীপার বাবার দেওয়া এইচ-এম-টি অটোমেটিক রেডিয়াম দেওয়া চোখে ওর দিকে তাকিয়ে। ছোট কাঁটা আটটা আর বড়টা প্রায় ওরই কাছাকাছি।

এক দৃষ্টিতে ঘড়িটা দেখতে দেখতে ঘাড়ের কাছটা শিরশির করতে লাগল অনুতোষের। এক্ষুণি ছুটে

অন্ধকার-ফোঁড়া আলোর ঝলক কিংবা ইস্পাতের ধারালো দাঁত। কোনান ডয়ালে আছে রেডিয়াম ডায়াল .াংঘাতিক। অনায়াসে মানুষ খুন করা যায় অন্ধকারে। নাহ্, অনুতোষ খুনীটিকে সে সুযোগ দেবে না। দ্রুত হাতে বেনটেক্স ব্যাণ্ড খুলে হাত আর ঘড়ি আলাদা করে ফেলে তারপর ছুঁড়ে দেয় সামনের অন্ধকার লক্ষ্য করে। কাঁচ গুঁড়িয়ে যাওয়ার ক্ষীণ শব্দ হয়।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার দরজাটা খুঁজতে থাকে অনুতোষ। প্রতি ইঞ্চি, ইঞ্চি, ফুট, ফুট, গজ, গজ করে, কিন্তু দরজা পায় না। পিঠ বেঁকে যেতে থাকে যন্ত্রণায়। জিভ বের হয়ে আসে ; রগের শির টনটন করতে থাকে। দরজা পাওয়া যায় না। হা-ক্লান্ত অনুতোষ দেওয়ালে পিঠ দিয়ে ধুঁকতে থাকে জানোয়ারের মতো। ওর মনে হয় এখান থেকে জীবনে আর বেরিয়ে যেতে পারবে না। এই অন্ধকারে, সম্পূর্ণ অদৃশ্য একটা খুনীর অনুকম্পার ওপর নির্ভর করে থাকবে ওর জীবন। এর পাশেই কোথাও পড়ে আছে সুদীপার মৃতদেহ। আর যাই হোক, মৃতদেহ ঘর-বসত কিংবা সহবাস জানে না।

অনুতোষের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। সিঁড়িতে হাল্কা পায়ের শব্দ উঠে আসতে থাকে। অনুতোষ টের পায় না। দুহাত মাথার ওপর তুলে কুঁকড়ে পড়ে থাকে দেয়াল ঘেঁষে। পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতে থাকে কাছ থেকে কাছে ক্রমশ আরো কাছে।

অশোক চট্টোপাধ্যায়ের দুই অবিনাশ

অবিনাশ হাই তুললো। পিছন দিকে হাতদুটো ছড়িয়ে দিয়ে আড়মোড়া ভেঙে নিতে নিতে মনে হোল আজকাল প্রায়ই এক ধরণের ক্লান্তি জড়িয়ে ধরছে শরীরের অনুতে অনুতে। তবে কি সে একটু একটু করে প্রৌঢ়ত্বের দিকে এগিয়ে চলেছে। অর্থাৎ মৃত্যুর দিকে। সে হিসেবে তো প্রতিটি মানুষই এক একটা দিন মৃত্যুর দিকে এক এক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছে। আসলে এ ধরণের দার্শনিক তত্ত্ব ভাবতে গেলেই অবিনাশের কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে যায়। অবিনাশ আরো ক্লান্ত, আরো দিশেহারা হয়ে পড়ে। অথচ আপাত স্বাচ্ছন্দের মধ্যে লালিত এই মধ্য বয়স্ক অবিনাশকে দেখে বাইরে থেকে অনেকেই ঈর্ষা করে। আড়ালে-আবডালে অবিনাশ শুনেছে—যোগ্যতা ছাড়াই নাকি তার এত টাকার মাইনের চাকরী, সুন্দরী স্ত্রী, ফুটফুটে ছেলে মেয়ে, ছবির মতো বাড়ী। অবিনাশ কারোকে ঈর্ষা করে না। সকলের প্রতিই ওর কেমন যেন একটা মায়া মেশানো ভালবাসা। ও চায় পৃথিবীর সব প্রেমিক-প্রেমিকাই যেন পরস্পরকে পায় এবং সুখে থাকে। এর কারণ আছে। সদ্য কৈশোরে যে মেয়েটি তার স্বপ্নের পরতে পরতে মিশে গিয়েছিল, সেই মেয়েটি অবিনাশের রক্তাক্ত-হৃদয় দু'পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে অবিনাশের চেয়ে আকারে যোগ্যতায় অনেক বড় একজনের হাত ধরে নতুন জীবনের পথে পা বাড়িয়েছিল। আসলে এ ধরণের ঘটনাই স্বাভাবিক। কৈশোরের অপরিণত বয়সের প্রেম প্রায়শই পরিণতি পায় না। আসলে অবিনাশ ছিল খেয়ালী এবং ভাবুক। তখন থেকে একটু-আধটু কবিতা লিখছে। কিছু কিছু ছাপা হচ্ছে পত্র-পত্রিকায়। এ হেন অবিনাশ গোপা নামক প্রেমিকাটিকে হারিয়ে উদভ্রান্ত হয়ে গেল। আশপাশের মানুষ, তথা-কথিত প্রিয়জন, বন্ধুবান্ধব—সবকিছুই তার কাছে মূল্যহীন হয়ে দাঁড়ালো। নিজের অস্তিত্বও তার কাছে প্রচণ্ড ভারী মনে হতে লাগলো। দু'একজন খুবই ঘনিষ্ঠ এবং নাছোড়বান্দা বন্ধু প্রতিমুহূর্তে সঙ্গ দিয়ে দিয়ে অবিনাশকে বোঝাতে চাইলো। অবিনাশ যে মেয়েটিকে এত গুরুত্ব দিতে চাইছে, আসলে সে একটি খুবই সাধারণ মনের সুযোগ সন্ধানী। এ কথা বুঝতে এবং মেনে নিতে ইতিমধ্যে বেশ কিছুটা সময় গড়িয়ে গেছে।

পরবর্তী ক্ষেত্রে অবিনাশের মন একেবারে পাল্‌টিয়ে গেল। মেয়েদের সম্পর্কে অবিশ্বাস আর ঘৃণা তাকে ঘিরে ফেললো। সাময়িক আলাপের পরই অবিনাশ ছোটখাটো শারীরিক সুখস্পর্শের হাত বাড়াতো। মনের মধ্যে আর কারোর জন্যে কোন জায়গা ছিল না।

উত্তর তিরিশে এসে হাঁফিয়ে উঠল অবিনাশ। ওর মনে হোল। যে কোন নারীর ছায়ায় আশ্রয় পেলেই বোধ হয় শরীরের এবং মনের সমস্ত দাহের শান্তি মিলবে। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার! চেহারায়, বংশগরিমায়, অন্ত-তর যে কোন ধরণের যোগ্যতায় অবিনাশকে যারা স্বপ্নেও আশা করতে পারেনা, তারাও এড়িয়ে গেল অবিনাশকে।

প্রথম প্রেমের আঘাত খাওয়া সদ্যযুবক অবিনাশ ইতিমধ্যে জীবনের চড়াই উৎরাই পথ পেরিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে অর্থে, সম্মানে। তবু এহেন ব্যর্থতায় আবার মুসড়ে পড়লো অবিনাশ।

তখনই ঘটনাচক্রে ডাঃ নন্দীর সঙ্গে আলাপ। প্রথমে রোগী হিসেবে। পরে বন্ধু। আলাপের বয়স তখনও মাস দু'য়েকও বোধহয় গড়ায়নি মিসেস নন্দী এক সন্ধ্যায় নানান খাবার দাবার সহ আলাপ করিয়া দিলেন ছোট বোনের সঙ্গে। ছোট মানে একমাত্রই বোন। ডাঃ নন্দী খোলাখুলিই বলে দিলেন—কি অবিনাশবাবু, ভাইরাভাই হতে আপত্তি আছে? যদিও একমাত্র শালীটিকে আমি হাতছাড়া করতে রাজী ছিলাম না। মালতী, ডাঃ নন্দীর শ্যালিকা সপাটে একটি কিল বসালো ডাঃ নন্দীর পিঠে। মিসেস নন্দী সশব্দে হেসে উঠলেন। তথা কথিত ভাবে মেয়ে দেখানোর মতো ব্যাপার না থাকায় অবিনাশ খেয়াল করেনি কথায় গল্পে ঘড়ির কাঁটা কখন ইতিমধ্যে কয়েক ঘন্টা পথ পে'রয়ে এসেছে।

বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েকটা বছর স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কেটে গেছে। দু' বছরের মাথায় টুনটুন এসে মালতির সঙ্গে অবিনাশের বাঁধন আরো নিবিড়তায় জড়িয়ে দিল। ছ' বছরের মাথায় এল বাবুল। ছেলে মেয়ে ভাগ হয়ে গেল তখন থেকেই। অবিনাশের ধ্যানজ্ঞান তার মেয়ে, মালতির প্রাণ তার বাবুল। কখন অজান্তে বিরোধের বীজ বোনা হয়েছিল, কেউ জানেনা। টুনটুনকে নিয়ে মালতির সঙ্গে আজকাল প্রায়ই ঝগড়া লেগে যায়। মালতির ধারণা মেয়েকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়ে মাথা খাচ্ছে অবিনাশ। পরে সামাল দিতে পারবে না! অবিনাশের ধারণা — বাচ্চারাতো দুষ্টুমী করবেই। ভাঙচুরও স্বাভাবিক। সেটাইতো ওদের ধর্ম। দু'জনেই দু'জনের ছোটখাটো ভুল-ত্রুটিকেও মেনে নিতে পারেনা সহজে। অবিনাশ চেঁচায় না। ওর প্রকৃতিতে বাধে। ভেতরে ভেতরে রক্তাক্ত ক্ষরণ শুরু হয়। শরীরের অন্যান্য অংশের রক্তস্রোত মনে হয় অবিনাশের মস্তিষ্কের মধ্যেই জমায়েৎ হচ্ছে। অবিনাশ একটু একটু করে নিজস্ব দ্বীপের মধ্যে নির্বাসিত হয়ে গেল। যে মেয়ে অবিনাশের সমস্ত দিনের ক্লান্তি মুছে দিতে পারতো এক নিমেষে শুধু আধো আধো কথায় আর মিষ্টি হাসিতে; আজকাল সেও ঢুকতো পারে না অবিনাশের সেই নিজস্ব দ্বীপে। যেখানে গাছপালা, পাখী, বহতা নদী, সব কিছুই আছে— নেই শুধু অন্য মানুষ। শুধু অবিনাশ।

ঠিক এমনি সময় যখন অবিনাশের পাশের লোক কি কথা বলছে, অবিনাশের কানে আসেনা; ব্যাণ্ডেল লোকালে জানলার ধারের সিট পেয়ে অবিনাশ বাইরে তাকিয়েছিল। দেখছিলনা কিছুই। ও তখন ওর নিজস্ব স্বপ্নের জগতের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছিল। ইতিমধ্যে কতগুলো ষ্টেশন পেরিয়ে গেছে সে খেয়াল অবিনাশের নেই। কে যেন হাতের ওপর হাত রাখলো।

এক আশ্চর্য শিহরণ অবিনাশকে টানতে টানতে হাজির করলো সেখানে, যেখানে অবিনাশের প্রথম প্রেম থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। অবিনাশ ধীরে ধীরে বাস্তবে ফিরে এল। তাকাল। অবিকল সেই মুখ, সেই হাসি। শুধু বয়স কিছুটা ছোটখাট চিহ্ন ফেলে গিয়েছে চোখে মুখে। গোপাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। অবিনাশ হাসলো ম্লান হাসি। যা শুধুমাত্র ঠোঁট দু'টোকে সামান্য কাঁপিয়ে গেল। গোপাও হাসির চেষ্টা করল। যে চেষ্টাকে কান্নার নামান্তর ছাড়া আর কিইবা বলা যেতে পারে। সারামুখে চোখ ঘুরতে ঘুরতে গোপার সিঁথিতে দৃষ্টি আটকে গেল অবিনাশের। সে চমক দৃষ্টি এড়ালনা গোপার। গোপার পক্ষে বোধহয় সহজ হয়ে গেল সব কথা গুছিয়ে

বলার। অবিনাশ শুনছিল। সব কথাই যে পুরোপুরি কানে ঢুকছিল তা নয়। তবু তারই মধ্যে যতটুকু জানার জেনেছে অবিনাশ। আরো অনেকগুলো ষ্টেশন পেরিয়ে এসেছে গাড়ী। অবিনাশদের এদিকটায় একজন মাত্র উল্টোদিকের জানালার মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে। জানালার বাইরে চোখ রেখেছিল অবিনাশ কে যেন একটা অদৃশ্য অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেছে তার পিঠে। অবিনাশ কি পারতোনা সারাজীবন একজনের ধ্যানে কাটাতে? তাহলে কিসের ভালবাসা? কত কমজোরী! অবিনাশের একটা হাত টেনে নিয়েছে গোপা। দুই হাতের ছোঁয়ায় আবার সেই যাদুস্পর্শ। যে ছোঁয়ায় কয়েক যুগ পেরিয়ে সময় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায় সেই মায়াবী কৈশোরের স্বপ্নলোকে।

দু'চোখেই ধীরে ধীরে কয়েকফোটা তপ্তজল গড়িয়ে আসছিল গাল বেয়ে ঠোঁটের পাশে। অবিনাশ বুঝতে পারছিল সব কিছুই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার শেষ মুহূর্ত এসে দাঁড়িয়েছে ও। স্বগোতোক্তির মতো গোপা বলে চলেছে—অবিনাশদা, সব কিছু ফেলে তুমি আমাকে নিয়ে কোথাও পালাতে পারোনা, দূরে—অনেকদূরে। যেখানে আমাদের কোন পরিচিতজনের ছায়াও থাকবেনা। অবিনাশ নিরুত্তর রইল বাইরের দিকে তাকিয়ে। ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে বহুদিন পরে। অবিনাশ ভেতরে ভেতরে ভেঙে যাচ্ছে। টুকরো টুকরো হচ্ছে। আবার একটা ষ্টেশন এল। অবিনাশ নাম পড়ার চেষ্টা কোরল। হুগলী। ওদের ষ্টেশন নিঃশব্দে কখন পেরিয়ে এসেছে। আমরা চুঁচুড়া পেরিয়ে এসেছি—অবিনাশ দরজার দিকে এগুতে এগুতে বললো। গোপাও উঠলো। যেন খুব অসুস্থ এবং ক্লান্ত এমনি ধীরে পায়ে। ওভার ব্রীজ পেরিয়ে নির্জন প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে বসল দু'জনে। খুব স্বাভাবিকভাবেই অবিনাশ পুরানো দিনের গল্প বের করে আনছিল স্মৃতির স্তূপের মধ্যে থেকে গোপা শুধু নির্বাক শ্রোতা। সবুজ আলোর সংকেত বুঝিয়ে দিল ওদের গাড়ী আসছে। তুমি এখন তাহলে বাপের বাড়ীতেই আছো? অবিনাশের কথার উত্তরে হাসলো গোপা—আর দাঁড়াবার জায়গা কোথায় বল।

ঠিক সেই সময় শঙ্খধ্বনির মতো শব্দ তুলে প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়লো ডাউন ব্যাণ্ডেল লোকাল।

আলী ইদরীসের গল্প কাপুরুষ

॥ এক ॥

খুব দ্রুত হাটছে রহমত। জ্যোৎস্না ঝরা সোনা রাত্রে ঝড়ের মতো বাতাস বইছে। ঝড় বইছে ওর অন্তরের নিভৃত কোনেও। ওর লম্বা লম্বা চুলগুলো বাতাসের ঝাপ্‌টায় বার বার মুখ ঢেকে দিচ্ছে।

কিন্তু না রহমত এক মিনিটও সময় নষ্ট করতে চায় না। সংসারের অভাব নামের এই বন্দী-শালা থেকে সে মুক্তি চায়। সে বাঁচতে চায়—বাঁচাতে চায় তার প্রিয়তমা সাইদাকে, আর তিনটি নিষ্পাপ ছোট্ট-কচি প্রাণ অপু, দীপা আর তপুকে।

ওর মানসপটে বার বার ভেসে উঠছে—শুকনো রুটির সামনে অপুর করুণ চাহনি, দীপার অভিমানী শুক্‌নো মুখ আর তপুর কংকাল সার দেহটা। নিজের কথা সাঈদার কথা সে এখন ভাবতে চায় না। সাঈদা তো কর্তৃত্বের ওকে কাপুরুষ, অকর্মণ্য-অযোগ্য বলেছে।

হ্যাঁ, রহমত কাপুরুষ ছিল। অকর্মণ্য-অযোগ্য ছিল। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে?

কোমরে গোঁজা ছুরিটার অস্তিত্ব অনুভব করলো সে।

॥ দুই ॥

নক্‌ করতেই দরজাটা খুলে গেল। এতরাতে আবিদ সাহেব তার অফিসের কেরানীকে সামনে দেখে একটু যেন অবাক হলেন। বললেন: কি ব্যাপার রহমত! তুমি এত রাতে?

: বাইরে থেকে ফিরছিলাম স্যার। পথের ধারেই আপনার বাড়ী তাই ভাবলাম স্যারের সাথে একটু দ্যাখা করেই যাই।

: তা বেশ তো। এসো বসো।

বসে বসে রহমত অনেক কিছু আলাপ করলো তার স্যারের সাথে। কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পারলো না। ওর মাথায় দ্রুত চিন্তা চলছে—বলবে কি বলবে না।

না, আর নয়। এবার তাকে বলতেই হবে। এতদূর এসে পিছিয়ে গেলে চলবে না। মনের সমস্ত দ্বিধার অবসান ঘটিয়ে এক সময় রহমত বলেই ফেলল: স্যার, আমাকে কিছু টাকা দিয়ে এই মুহূর্তে একটু সাহায্য করুন।

: টাকা! তুমি তো জানো রহমত মাসের শেষ। এখন টাকা কোথায় পাবো?

: কয়েকটি টাকা আমি আপনার কাছে ভিক্ষে চাইছি স্যার। আমার তিনটি সোনার টুকরো আজ কয়েকদিন উপোষে আছে।

: আমি দুঃখিত রহমত! এই মুহূর্তে তোমাকে সাহায্য করতে পারছিনে।

হঠাৎ করেই আগুন হয়ে উঠলো রহমত। ওর রক্তে কে যেন পেট্রোল ঢেলে দিল। আর ধৈর্য মানছে না। দ্রুত হাতটা চলে গেল কোমরে গোঁজা ছুরিটার হাতলের উপর।

: টাকা আপনাকে দিতেই হবে। তার জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

রহমতের কণ্ঠস্বর হঠাৎ পরিবর্তনে অবাক হলেন আবিদ সাহেব। ওর হাতের দিকে তাকাতেই চমকে উঠলেন।

রহমতের শক্ত হাতের মুষ্টিতে ছুরিটা চক্ চক্ করছে। এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন আবিদ সাহেব। ঠোঁটের কোনে এক টুকরো হাসি ঝিলিক দিয়ে গেলো। চট্ করে বালিশের নিচ থেকে পিস্তলটি বের করে রহমতের দিকে তাক্ করলেন। ব্যঙ্গ করে বললেন: তোমাদের মতো সমাজের এই সব রাবিশদের জন্যে আমরা সদা প্রস্তুত থাকি।

ঘটনার পরিবর্তনে রহমত মূক হয়ে গেল। পৌরুষত্বের সমস্ত আলো তার যেন দপ্ করে নিভে গেছে।

আবিদ সাহেব তখন ফোনে থানার সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। রহমত যেন বাঁচার আলো দেখলো। ওর বলতে ইচ্ছে করলো—আমাকে একা নয় স্যার সাঈদা পাপা, অপু সবাইকে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। অন্তত: কিছুদিন খেয়ে সবাই এক সঙ্গে মরতে পারবো।

কিন্তু সে তা পারলো না। এক সময় সত্যি সত্যিই পুলিশ এলো। আর তাকেই শুধু নিয়ে গেল জেল হাজতে।

গৌর বৈরাগীর

বৃষ্টির মধ্যে শীতের মধ্যে
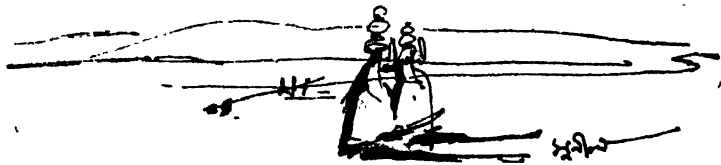
তিনি এইখানে বসেন। ইজি চেয়ারে আধশোয়া হয়ে। শুতে গেলে মট করে একটা শব্দ হয়। প্রথম যেদিন শব্দটা হয়েছিল, খুব চমকে উঠেছিলেন তিনি। দু' চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করেছিলেন শব্দের উৎস কোথায়। মনে মনে শরীর বেয়ে হাঁটতে শুরু করেছিলেন। না কোথাও কোন যন্ত্রনার অনুভব টের পান নি। শরীর নয়, শরীরের বাইরে কোথাও রয়েছে ঐ শব্দটা। অথচ ঠিক আবিষ্কার করতে পারেন নি। তারপর যেমন সব কিছু ভুলে যান। দ্বিতীয় দিন শব্দটা হতেই গতকালের কথা মনে পড়েছিল। এবার আর ভয় হয় নি। মনে মনে একটা সন্দেহ তৈরী হয়েছিল। আর তাই কষ্ট করে চেয়ার ছেড়ে দ্বিতীয় বার বসতে গিয়েই হাতে নাতে ধরে ফেলেছিলেন।

এইমাত্র আজ বসলেন তিনি। এসময়টা বসেন না। এখন সেই পার্কটার বেঞ্চে। হাতের সরু লাঠিটা পাশে। সামনে টলটলে লেকের জল। কাকভোরে মানুষজন দেখা যায় না। শুধু সেই কাকটা। কাকটা কৃষ্ণচূড়ার আড়াল থেকে নেমে আসে। ডাকে না। বোধ হয় বোবা। শুধু জুল জুল করে তাকায়। কৃষ্ণচূড়ার আড়াল থেকে ওটা নেমে এসে তাঁর দিকে ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তিনি মৃদু হাসেন।

আশেপাশে কেউ থাকে না তখন। খুব আবছা নরম আলো। পূব দিকটা ফ্যাকাশে হচ্ছে। আর চারদিক খাঁ খাঁ। শুধু পার্কের বেঞ্চে তিনি। আর ঐ বোবা কাকটা। ওটার দিকে তাকালে খুব মায়া হত ওঁর। চোখ দুটো খুব অসহায়। চাইবার মধ্যে একটু বিস্কুটের টুকরো, কিংবা রুটির। এটাকে দেখে মনেই হয় না কেড়ে খেতে জানে। বড় গোবেচারী কাক। খুব মায়া হয়।

দ্বিতীয় দিন কাকটা কৃষ্ণচূড়ার আড়াল থেকে নামতেই তিনি চোখ রাখেন ওদিকে। এইমাত্র বোধহয় ঘুম ভাঙল ওটার। তবু চোখের কোণে ক্লান্তি, আর বিষণ্ণতা। থুপ থুপ করে চোখের পাতা পড়ছে। আর তাকিয়ে আছে।

তখন তিনি মেরজাই-এর পকেটে হাত দিলেন। একটা বিস্কুট। ভেঙে ভেঙে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন। ওটা খেতে লাগল। সেই থেকে ঐ কাকটা—তিনি এইখানে বসেন। এই ইজি চেয়ারে। আধশোয়া হয়ে। আধশোয়া হলে আকাশ দেখতে পান সামনা সামনি। আকাশে রঙ বদলায়। সকালের তরতাজা সবুজ রঙ-এ সোনার ছোপ লাগে। ঝকঝক করে আকাশ। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজে কোথাও। রাস্তা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাড়ি। তিনি তাকিয়ে থাকেন তখনও। আকাশে মেঘ। নৈঋৎ কোণের সেই সাদা মেঘটা আকার পায়। তারপর সার্কাসের খেলা দেখাতে দেখাতে এগিয়ে আসে। সেটা উট হয় তারপর জলহস্তী। ঠিক তারপরই হাতি হয়ে

শুঁড়ে করে জল ছিটিয়ে দেয় নিজের চারদিকে। শেষে অবাক, হাতিও নেই জলও নেই। নীল তৃণক্ষেত্রে একপাল ফুটফুটে হরিণ। তিনি চুপচাপ তাকিয়ে থাকেন। হরিণেরা ঘাস খায়। ওরা ছুটে ছুটে খেলা করে। ঠিক এর পরেই কোথা থেকে ধোঁয়া রঙের সেটা এসে যায়। বড় বড় নীল ঘাসের আড়ালে হয়ত লুকিয়ে ছিল কোথাও। হরিণেরা চোখের পলকে নীলে হারিয়ে যায়। আর সে, সেই বনের রাজা খুব স্লথ পায়ে হেঁটে যায়। যেখানে হরিণেরা ছিল। পশুরাজ একবার তাকায়। সেদিকে হরিণেরা। কিন্তু শুধু তাকায়। হাঁটতে গেলেই বোঝা যায় ওটা অসহায়। ছোটার ক্ষমতা নেই আর।

ঠিক সেই সময় শব্দ হয় পাশে। কেউ কিছু বলে চলে যায়। একটু পরেই তিনি হাত বাড়ান। হাতে উঠে আসে কাপ। ডিসে বিস্কুট। টুপ করে একটা বিস্কুট চায়ে ফেলে ভিজিয়ে নেন তিনি।

আজ খুব বৃষ্টি হচ্ছে। সকাল থেকে শুধু ঝম ঝম শব্দ। জলে ভেসে যাচ্ছে উঠোন। রাস্তা ডুবে গেছে।

তিনি যেখানে বসে আছেন সেখান পর্যন্ত বৃষ্টির ছাট। আজ তাই রুটিনের হেরফের হয়েছে বেশ কিছুটা। ভোরের পার্কে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ঘুম ভেঙে মন কেমন করা নিয়ে অন্ধকার একঘেয়ে আকাশ দেখতে দেখতে ইজি চেয়ারে এসে বসেছেন। তারপর শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। সেই বোবা কাকটা আজ কোথায় কে জানে। শুধু বোবা নয়। খুব বোকাও বটে। হয়ত গাছের ডালে বসে একা একা ভিজছে।

পাশে খুট করে শব্দ হয়। তিনি বোঝেন এ সময় কাজের লোক তার কাপ ডিশ নিয়ে যেতে এসেছে। সঙ্গে করে কাগজখানা আনে। তিনি তাকান না। ওর চলে যাওয়ার সময় পার করিয়ে দিয়ে হাত বাড়ান। হাতে কাগজ। তাঁর একটা বদনাম আছে। হাতে কাগজ পেলে ছাড়েন না। তাই সবশেষে বেলা দশটায়।

তিনি কাগজ মেলে ধরেন চোখের সামনে। আজ মেঘলা। বাদল দিন। মরা আলো। কাগজের অক্ষরে দৃষ্টি পৌঁছয় না। কাগজকে এগিয়ে আনেন চোখের দিকে। আরও কাছে। আরও কাছে। আরও কাছে। অদূরে গাড়ির একটানা হর্ণ বাজে কোথাও।

দুপুরের খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নেবেন। ডাক্তারের কথা মত। তাই এ সময়টা চেয়ারে মেলে দেন নিজেকে। পান খেতেন। এখন আর খান না। একটু মশলা রাখেন মুখে। খুব বৃষ্টি। আজ সারাদিন যা বৃষ্টি হল। ভাল ফসল হবে এবার। ভাল ফসল হলে দাম কমবে। এখনও গাঢ় মেঘ। চাপ বেঁধে রয়েছে। আবার তুমুল নামবে বুঝি। আজ এই বৃষ্টির জন্য সে বোধহয় এল না। এখন কোথায় কে জানে। অথচ অন্যদিন কত আগে আসা হয়। এক একদিন ত' চানের আগে আগেই। এসেই একটা ছোট্ট ডাক। 'কি হল এখনও বসে কেন, চান টান কখন হবে।'

ওটার চোখ মুখে সুন্দর স্বচ্ছ অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। যেদিন প্রথম এল; আহা যেন কিছু জানে না। উনি তখন খাচ্ছিলেন। ডাল দিয়ে ভাত কটা মেখে একটু একটু করে মুখে তুলছিলেন। এইভাবে খান উনি। মাথা নীচু করে চুপচাপ। একসময় খাওয়া শেষ হয়ে যায়। প্রথম দিনই ব্যাপারটা আন্দাজ করেছিল ওটা। 'মিউ' করে ডাকটা দিয়ে হালচাল দেখতে চুপ মেরে গেছল।

তিনি চমকে তাকিয়েছিলেন। কি আশ্চর্য ওটা কখন এল। সাদা রংটা কটা। মুখটা ফুলো ফুলো। তিনি তাকাতে ওটা পুট পুট করে চোখের পাতা ফেলল কবার। 'দেখো কিন্তু বসে আছি। সবটা যেন খেয়ে ফেলো না আবার।'

প্রথম দিনই ওর চাউনি থেকে এটা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন উনি। কটা ভাত, একটু কাঁটা এসব রেখে দিয়েছিলেন। সেই থেকে রোজ। ঠিক খাবার সময় সামনে। পুট পুট করে চোখের পাতা ফেলা। মাঝে মাঝে প্যাবড়া মুখে হাই। বড় হাই ওঠে ওটার। হাই উঠলে দেখা যায় ওর কটা দাঁত নেই।

ভাবতে ভাবতে তাঁর নিজেরই একটা ছোট্ট হাই উঠল। ইজি চেয়ারে শরীর। চোখ মেঘলা আকাশের দিকে। আজ কিরকম ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। সকাল বেলার সেই বোবা কাকটা, দুপুরের হুলো কারো সঙ্গেই আজ......।

চমকে উঠলেন তিনি। নিঃশব্দ ঘুমটা এসে গেছল তার। কিন্তু তার নাম ধরে কে যেন ডাকল না। এভাবে বার বার। পরিষ্কার শুনলেন কিন্তু কে ডাকছে তাঁকে। এখন ত' তাঁকে কারও দরকার নেই। এখন তিনি চুপচাপ ইজি চেয়ারে। বারান্দায়। বৃষ্টির মধ্যে। শীতের মধ্যে।

আজ ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে। একটা আস্ত বাদল দিন। সারা আকাশ সারাদিন মুখ ভার করে রইল। এখনও বৃষ্টি। শুধু বৃষ্টির একটানা শব্দ। ঝম ঝম। ঝম ঝম। সাদা সাদা মুক্তো দানা বৃষ্টি। এই তুমুল বৃষ্টির মধ্যে একটা বোবা কাক।

এখন কটা। আকাশ দেখে বোঝার উপায় নেই। আকাশের গায়ে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। তিনি ঘাড় ফেরালেন। এখান থেকেই ঘরের দেওয়াল ঘড়ি। কিন্তু আজ এখনই অন্ধকার। অন্ধকার নামছে আরও। বৃষ্টির গায়ে পা দিয়ে আকাশ থেকে অন্ধকার নেমে আসছে। আশে পাশে পুট পুট করে আলো জ্বলে উঠল। সেকি এত তাড়াতাড়ি দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা। তাহলে কি আজ বিকেলটাও।

বড় মন কেমন করল তাঁর। একটা মূল্যবান বিকেল অসাবধানে হাতের ফাঁক দিয়ে গলে গেল। আর কটা বিকেল বাকী থাকে তাহলে। কটা? খুব কম। খুব কম। এতক্ষণ হয়ত গিয়ে আবার চলেও আসা যেত। কিংবা শঙ্খ যদি বলে—আর একটু বসে যান ঠাকুরপো। তাহলে না হয়। অবশ্য কোন দিনই সন্ধ্যা গড়িয়ে রাতকে নামতে দেন নি তিনি। তার আগেই উঠে পড়েছেন—আমি চলি। সন্ধ্যা নামছে।

—যাবেন যাবেন। এই বয়সেও চোখের মধ্যে আবছা রঙিন পরত শঙ্খের। যাবেন বইকি। তবে এত তাড়া কিসের। শাসন করার যিনি ছিলেন—

এরকম কথা শুনলে বুকের মধ্যে কেমন শব্দ হয়। অদৃশ্য কাড়া-নাকাড়া বেজে ওঠে। যিনি ছিলেন। হ্যাঁ শাসন ছিল বৈকি। বড় কড়া শাসন। কিন্তু সে কতদিন আগে। এক যুগ কি। তার কথার মধ্যে কেমন এক নেশা। বিকেলের মত শান্ত নরম।

তিনি ইজি চেয়ারে বসে আছেন। বসে থাকা ঠিক নয়। আধশোয়া। বারান্দার আলোয় বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। মাঝে মাঝে হাওয়া আসে। তাঁর রুপালী চুলে বৃষ্টির কুচি। হাতেরই। বই-এর মাঝখান বরাবর একটা আঙুল রেখে বইটা মোড়া। এটা বাঁ হাত। ডান হাত চেয়ারের হাতলে চুপচাপ শুয়ে। তাঁর দু'চোখ বন্ধ। বন্ধ চোখের ওপরে তারারা বিশ্রামে এখন। বাইরে তুমুল বৃষ্টি।

হঠাৎ চোখ মেললেন। আধশোয়া থেকে বসায় এলেন। হাতের বই খুলে চোখের সামনে। তারপর হঠাৎই বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। হাতলের ওপর বইটা রেখে। মস্ত ঠাণ্ডা পুরনো দালানে পায়চারী শুরু করলেন উনি। অভ্যাসবশে হাতদুটো পেছনে চলে গেল। দেহটা ঝুঁকে এল সামনে। একটু কুঁজো হয়ে গেলেন। দু'চোখ মেঝেয়। তিনি হাঁটছেন।

হঠাৎ আবার ঘরে। পুরনো দেরাজে আয়না ফিট করা। সামনে দাঁড়ালেন উনি। আয়নায় তিনি। আয়নায় তাঁকে একমনে দেখলেন, ডান হাত দিয়ে ওঁর চুলটা ঠিক করে দিলেন। তারপর একটানে দেরাজে। ভেতরে হাত দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাত বাইরে। হাতে ডায়েরী। পাতা ওল্টালেন। পড়তে পড়তে ঠোঁটের কোণে হাসি। পরের পাতায় মুখ থমথমে হল তাঁর। তারপরের পাতা খুলতেই মাথার কাঁটা। কাঁটাটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে হাসলেন। তারপর যেখানে ছিল—। ডায়েরী রাখলেন দেরাজে। বন্ধ করলেন দেরাজ। বৃষ্টির মধ্যে, একটানা শব্দের মধ্যে বাতাসের মধ্যে তিনি আবার এসে বসলেন। বসতেই শব্দ হল। বসার পর আধশোয়া হলেন। সেই ইজি চেয়ার। বর্ষার মধ্যে। শীতের মধ্যে।

—বাবা, বাবা। বাবা শুনছেন।

—কি হল। হন্তদন্ত হয়ে উঠে এল সোমনাথ।

—কি জানি বুঝতে পারছি না। জয়ন্তীর গলায় উদ্বেগ। কোন সাড়া পাচ্ছি না আমি।

সোমনাথ হাত বাড়াল। হাতের ওপর হাত রাখল। তারপর ডাকল—বাবা। গলা কেঁপে গেল ওর। তারপর চাপা গলায় ফিস ফিস করে বলল—বিকাশকে একবার।

জয়ন্তী সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত। ফিরে এল শুধু বিকাশ নয়। মন্দাও সঙ্গে। মন্দা বলল—কি হবে। ওর কথার কেউ কোন উত্তর দিল না। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল ইজি চেয়ারের ওপর। কেউ একটাও কথা বলছে না। বিকাশ স্থির অচঞ্চল ভঙ্গিতে নাড়ী দেখছে ওঁর। পাশ থেকে মুন্নি বলল—কি হয়েছে মা দাদুর।

বিকাশ হাত ছেড়ে দিয়ে বলল—ডাঃ ব্যানার্জীকে একবার।

ঠিক সেই সময় উনি চোখ মেললেন। খুব ধীরে ধীরে। পিট পিট করে তাকালেন চারদিক। হয়ত ঠোঁটের ফাঁকে হাসি। ফিস ফিস করে বললেন—আমার জন্যে তোমাদের ব্যস্ত হতে হবে না। অনেক রাত হল। তোমরা যাও।

তখনও তুমুল বৃষ্টি আকাশে। একটানা বৃষ্টির মধ্যে। বৃষ্টির শব্দ।

গোধূলি-মন প্রসঙ্গে

△ শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়, নমস্কার:

আপনার দ্বারা প্রেরিত 'গোধূলি-মন' আমাদের কালো আগুন পত্রিকার সম্পাদকের নিকট পেয়ে খুব আনন্দিত হলাম, এই শ্রেণীর পত্রিকার প্রকৃত অর্থ অনুভব করার মানুষ যদিও খুবই কম তথাপি এই পত্রিকায় আশা রাখি এনে দিতে পারে মানুষের মনে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ও ভাবের পূর্ণ বিকাশ। আমি জানি গ্রাম বাংলা থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকা এনে দিতে পারে প্রতিটি মানুষের মনে নিত্য নূতন উদ্দীপনা ভাবাভাবির সংঘর্ষের সমাধান, এই পত্রিকার দীর্ঘজীবন বটবৃক্ষের ন্যায় চতুর্দিকে প্রভাব বিস্তার করুক এই আমার কাম্য।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী

ম্যানেজার, পারিজাত মুদ্রণালয় পাবলিকেশন

হীরাপুর, তেলিপাড়া

ধানবাদ

শতভ্রু মজুমদারের গেরস্তের বাড়ি

সন্ধ্যেবেলা ডাল সেদ্দ দিয়ে রুটি খেতে খেতে দিবাকর শুনল, বাইরে কে তার নাম ধরে ডাকছে। তখন ঠোঙার কাগজ কাটছিল মেনকা। নিয়মমাফিক সে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। এবং একই কথা, সকলকে যা বলে থাকে, এই লোকটাকে তাই বলে দিয়ে, আর উত্তরের অপেক্ষা না করেই দরজা বন্ধ করে দিল।

'এই পাড়াটা এবার ছাড়ো।'

'কোথায় যাবে', এক ঘটি জল ঢকঢক করে গলায় ঢেলে দিবাকর বলল, 'পাওনাদারের ছাড়া পাবে?' 'রোজ রোজ আমি মিথ্যে কথা বলতে পারবো না।'

'তাহলে সত্যি কথাটাই বলে দিও।'

'তুমি তো বলেই খালাস। সন্ধ্যের পর আমাকে একা থাকতে হয়। সেদিন তো একটা লোক ঘরেই ঢুকে পড়তে চাইছিল। বলে—একটু বসে যাই তাহলে—এমন পাড়ায় ভদ্রলোক থাকে?'

'আমি কি ভদ্রলোক?

'সেটা কি আগে জানতুম?'

'জানলে কি করতে? বিয়ে করতে না?'

মেনকা আর কিছু বলে না। রাগে গজ গজ করতে করতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

গত জুন মাসে বাণীপুর জুটমিলের যে ক'জন লোককে বসিয়ে দেওয়া হল, দিবাকর তাদের মধ্যে একজন। কোম্পানি অবশ্য বলেছে, পরে খবর দেওয়া হবে। কিন্তু আট মাসেও কোনো খবর পাওয়া গেল না। এখন, দিবাকর জানে, তার নামটা ছাঁটাইয়ের খাতায়।

হাটখোলায় ভাড়া থাকত আগে। তিনমাসের ভাড়া বাকি রেখে রামচন্দ্রপুরে চলে এসেছে। ৩০ টাকায় একটা টালির ঘর পেয়ে গেল। জায়গাটা খারাপ। রাস্তার দুধারে সারি সারি বেশ্যা বাড়ি। দু'একটা গেরস্তের বাড়ি। ছোট ছোট টালির ঘর। অল্প ভাড়ায় কয়েকটা গরীব পরিবার থাকে। উট্‌কো লোকের জ্বালাতনের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে এবং মান-সম্মান বাঁচাতে, বাড়ির সামনে একটা করে সাইনবোর্ড টাঙানো থাকে—'গেরস্তের বাড়ি।' আশে-পাশের বাড়িগুলো থেকে আলাদা থাকতে চায়।

এখানে বলে রাখা ভাল, এসব বাড়ি গুলো পরবর্তী কালে বেশ্যাবাড়িই হয়ে যায়। তবে পার্থক্য এই, স্বামী-স্ত্রী ছেলে-মেয়ে নিয়ে এরা ঘর-সংসার করে। সেজে-গুজে রাস্তায় দাঁড়ায় না। তখনো 'গেরস্তের বাড়ি' সাইন বোর্ডটা থেকে যায়।

'আটা নেই একদম—রাত্তিরে খাবে কি?' ঘরের ভেতর থেকে মেনকা হুংকার দিল।

দিবাকর কিছু বলল না। একটা বিড়ি ধরিয়ে উঠোনে পায়চারি করছিল। খানিক পরে মেনকা এক বাণ্ডিল ঠোঙা তার হাতে দিয়ে বলল, 'যাও এগুলো নিয়ে যাও—।'

ঠোঙার বাণ্ডিল নিয়ে দিবাকর বেরিয়ে পড়ে, অগত্যা। তার চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। অনেকের কাছেই প্যাচেন ধরাধরি করেছে। চাকরি একটা পাওয়া গেল না।

'ধূপের ব্যবসা কর না—ঘরেতে ঠিক লক্ষ্মী আসবে', বলেছিল পরিচিত এক ভদ্রলোক। করেও ছিল। যে, যা বলেছে। অনেক কিছু। কাঁচা আনাজের ব্যবসা, জমির দালালি, গুঁড়ো মশলার সেলস্‌ম্যান এবং শেষে লটারির টিকিট বিক্রি। এখন অব্দি সেটাই আছে। এতেও চলে না। অজস্র দেনা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ঘরের চৌকাঠ পেরোলেই পাওনাদার।

'কী দাদা ওষুধের দামটা এখনো দিলেন না—'

দ্রুত সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল একটা ছেলে। দিবাকরকে দেখতে পেয়েই সামনে এসে দাঁড়ায়।

'দোবো ভাই দোবো—'

'আর কবে দেবেন, একটু কঠিন গলায় ছেলেটা বলে.

'বলেই দিন না—দোবো না।'

দিবাকর কিছুই বলতে পারলো না।

'ভদ্রলোক হয়েছেন কথার দাম নেই কেন?' আরো রুক্ষ ভাবে কথাটা বলে ছেলেটা সাইকেলে উঠে পড়ে। দিবাকরের মনে হলো, ছেলেটা বোধ হয় হাল ছেড়েই দিয়েছে। স্টেশনের কাছে নতুন ওষুধের দোকান। মেনকার টাইফয়েডের সময় কিছু টাকার ওষুধ কিনেছিল। হয়তো নতুন বলেই বাঁচোয়া।

কাজের জন্যে মেনকার চেষ্টা ছিল অন্তহীন। দিবাকরকে নিয়ে গিয়েছিল ভাট পাড়ায় তার এক মামার কাছে। মামার বিরাট ছাপাখানা। সেখানে যদি দিবাকরের 'যে কোনো একটা কাজ' জোটে। জোটে নি। দুর্দিনে আত্মীয়রাও দূরে সরে যায়। তবে অনেক চেষ্টায়, রাজগঞ্জের তাঁতকলে মেনকা নিজের একটা কাজ যোগাড় করেছে। ৭০ টাকা মাইনে।

একটা বাদামওলার কাছে ঠোঙাগুলো বিক্রি করল দিবাকর। তার থেকে দশ পয়সার ছোলা ভাজা কিনে গালে ফেলতে ফেলতে বাজারে ঢুকল। সন্ধ্যের দিকে বাজারটা একটু ফাঁকা। বেশির ভাগ আনাজওলা বসে না। এখানে দু একটা ছোট মুদির দোকান আছে। সেখান থেকেই আটা কিনবে দিবাকর। বড় দোকানে যাওয়া মুশকিল। বেশির ভাগ দোকানেই ধার। অবস্থাগতিক ভাল নয়। এবার পিঠের চামড়া তুলে ফেলবে।

'আরে দিবাকর না—'

না শোনার ভান করে সে চলে যাচ্ছিল। লোকটা তার সামনে এসে দাঁড়ায়। এক পলকে দেখে নিয়ে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দিবাকর। মিলের বন্ধু। ওরা কথা বলে। চা খায়। সময় কাটে তারপর বন্ধুটা চলে গেল। দিবাকর আটা কিনে বাড়ির পথ ধরে।

বাড়ির সামনে, প্রায়ান্ধকারে, একটা লোককে দেখতে পেয়ে দিবাকর চমকে উঠল 'কে ?'

'এটা কি কনকের ঘর ?'

দিবাকর গম্ভীর ভাবে বলল, 'না এটা গেরস্তের বাড়ি।'

'অ—' বলে চলে যায় লোকটা।

মেনকা বলল, 'ওঃ মহা জ্বালাতন— এখান থেকে না গেলেই নয় দেখছি।'

অনেকদিন পর দিবাকর আজ তার বউয়ের মুখ ভাল করে দেখছিল। তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'ভয় কি—তুমি তো গেরস্তের বউ।'

স্বামীর বুকে হাত বুলোতে বুলোতে মেনকা বলে, 'সবাই তো গেরস্তের বউ-ই থাকতে চায়।'

দিবাকর কিছু বলে না। নিবিড় ভাবে সে বউকে কাছে টেনে নেয়।

লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক সমিতি

লিটল ম্যাগাজিনের নানাবিধ সমস্যা যৌথ উদ্যোগে সমাধান করে গঠিত হয়েছে 'লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক সমিতি'। বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা সাহিত্য-সৃষ্টির পরিবেশ সৃষ্টি, বিপণন ব্যবস্থা ও ডাকমাশুলে সুবিধা আদায়, নিয়মিত ও নীতগতভাবে সরকারী বিজ্ঞাপন পাওয়ার ব্যবস্থা, সুলভ মূল্যে ছাপার কাগজ পাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি কার্যকর ও ফলপ্রদ করার জন্যই এই সমিতির প্রতিষ্ঠা।

গত ২৫শে জুলাই উত্তর কলিকাতায় ত্রিসপ্তক কার্যালয়ে লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকদের একটি সভা হয়। সভায় লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক ও তাদের পরিচালন সমিতির কয়েকজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় সমিতির প্রস্তুতি-কর্ম সংগঠিত করার জন্য নবকুমার শীলকে আহ্বায়ক করে এগার জন লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক ও তাদের পরিচালন সমিতির প্রতিনিধিকে নিয়ে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়।

২২শে অগাষ্ট ও ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৮১ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭ রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটির রথীন্দ্রমঞ্চ সংলগ্ন কক্ষে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সভা হয়। সভায় সমিতির সদস্যপদভুক্তির জন্য রেজিষ্টার্ড পত্রিকার সম্পাদকদের আহ্বান জানান হয় ও সেইসঙ্গে নন রেজিষ্টার্ড পত্রিকার সম্পাদকদের প্রথম দু'বছরের মধ্যে রেজেষ্ট্রী-করণের সর্ত সাপেক্ষে সভ্যপদভুক্ত হতে পারার প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

১৪ই নভেম্বর ১৯৮১ রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির রথীন্দ্রমঞ্চ সংলগ্ন কক্ষেই চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সমিতির কার্য পরিচালনা ও নির্বাহের জন্য ১৯৮১-৮২ সালের জন্য যে কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়, তা এই রকম :

সভাপতি—শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সম্পাদক—নবকুমার শীল (কোষাধ্যক্ষ ও)।

কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য—অপূর্বকুমার সাহা, অসিতকৃষ্ণ দে, অনিলকুমার দত্ত, দীনেশচন্দ্র সিংহ, জগৎরঞ্জন মজুমদার, হেনা চৌধুরী, সুনীলকুমার রায়, খতীশ চক্রবর্তী, দিলীপকুমার বাগ, ধীরাজকুমার দে, তাপস সাহা, আভাস চন্দ্র মজুমদার, কেয়া তরফদার ও আবদুর রব খান। প্রয়োজন বোধে কার্যনির্বাহক সমিতিতে আরও উৎসাহী সভ্যদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

ইতিমধ্যে সকল লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা চলেছে। বহু সম্পাদকদের কাছ থেকে সক্রিয় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গিয়েছে। সমিতির কার্যক্রম ও তার সাংগঠনিক দিকটা শক্তিশালী করে এই ঐক্যবদ্ধ শুভ প্রচেষ্টায় সামিল হতে আহ্বান জানাই।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সভাপতি
নবকুমার শীল, সম্পাদক

১লা জানুয়ারী ১৯৮২

সভ্যপদের আবেদনপত্র পূরণ করে বার্ষিক চাঁদা ১০ টাকা মণিঅর্ডার যোগে নবকুমার শীল, সম্পাদক, লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক সমিতি, ১০/২ টেগোর ক্যাসল ষ্ট্রিট, কলকাতা—৭০০০০৬ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

পুস্তক সমীক্ষা

আকালের ঈশ্বরগঞ্জ ও অন্যান্য ছোটগল্প/সুখেন্দু ভট্টাচার্য/সমন্বয় প্রকাশন/কলকাতা—৬/দাম—৪.৫০ টা

—গোপাল সান্যাল কৃত শ্রমজীবি মানুষের ভাঙাচোরা জীবন যন্ত্রণার মধ্যেও দারুণভাবে বেঁচে থাকার এই প্রচ্ছদ গল্পের বইখানিতে এক বিশেষ চরিত্র আরোপ করেছে। প্রতিটি গল্পেই শোষিত মানুষের প্রতি লেখকের সহানুভূতি টের পাওয়া যায়। চরিত্রদের খুব কাছ থেকে দেখা ও জানা। অভিজ্ঞতায় কোন ফাঁকি বা চালাকী নেই বোঝা যায়। আধুনিক গল্পের ভাষা, ভঙ্গি এসব লেখকের করায়ত্ব—তবু, সংকলনের ন'টি গল্পের মধ্যে ছ'টি যে কিছুই হয়ে উঠল না। জোরালো কণ্ঠে বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করলেই ত' গল্প হয়ে ওঠে না। যেকারণে অসার্থক হয়েছে 'পিতা', 'শ্মশান যাত্রী' গল্প। এই ২টি গল্পে ভাল গল্প হওয়ার সবগুণই ছিল কিন্তু গল্পের ল্যাজে একটা করে জোরালো বক্তব্য জুড়ে দিতে গিয়েই গল্পের গল্পত্ব নষ্ট হয়ে গেছে। 'গ্রামে চলো' গল্পের প্রতাপচন্দ্র গ্রামে না যাওয়া পর্যন্ত বেশ। কয়েকটি মুহূর্ত মাঝে মাঝে উজ্জ্বল। কিন্তু কি এমন হল প্রতাপচন্দ্রের—একটি বারো বছরের ছেলের অনাহার থেকে আত্মহত্যার ঘটনায় তার মতটি বদলে গেল—মোটেই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে নি। 'মাংস' গল্পটি সেই তুলনায় ভাল। 'আকালের ঈশ্বরগঞ্জ' গল্পে না ঈশ্বরগঞ্জ না আকাল কোনটাই নেই। খুব বাজে বস্তাপচা বক্তব্য এবং সেটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। গল্প পড়তে পড়তে মনে হয় এই গল্পে শোষক শোষিতের ভূমিকায় মেকআপ নিয়ে দু'জন আপ্রাণ অভিনয়ের চেষ্টা করে গেছে। সবচেয়ে হাস্যকর লাগে গল্পের শেষ লাইনে শ্যামাচরণের মায়ের ডায়লগ 'একা লড়াই করা যায় না। শ্যাম্ একা যাসনে।' অথচ 'সহদেব সুমিতা সুবোধ সন্টু' পড়লে অবাক হয়ে ভাবতে হয় এটা কি একই লেখকের লেখা। আধুনিক মননশীল গল্প বলতে যা বোঝায় গল্পটি সত্যিই তাই। পুরনো বক্তব্য কিন্তু বলার ভঙ্গি ভাষা আমাদের অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। আমাদের অন্যভাবে ভাবায়। এখানে নিখুঁতভাবে এই সময়কে ধরতে পেরেছেন লেখক। এই সময়ের রাগ কুরে কুরে খেয়েছে সুবোধকে এবং আমাদেরও। সুবোধের রাগ দুঃখ বিমূর্ততার ব্যবহারে যথার্থ পরিস্ফুট। আমার মতে সংকলনের সবচাইতে উজ্জ্বল গল্প 'আত্মহত্যার কাছাকাছি' শুধু ভঙ্গি দিয়ে মন ভোলান'র গল্প নয় এটি। একটি টলটলে গভীর বক্তব্য গল্পটিতে প্রচ্ছন্ন। পরিত্যক্ত মন্দিরে এক আত্মঘাতিনীকে দেখার বাসনায় একদল মানুষ আসছে। তাদের মধ্যে এক বৃদ্ধ। এখানে দর্শকদের কথাবার্তা, আচার আচরণ আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন লেখক। পরিমিতি বোধকে তিনি কখনও নাগাল পেরিয়ে যেতে দেন নি। মৃত্যুকে দেখার পর বৃদ্ধও অসুস্থ হয়ে পড়ে। এবং অচৈতন্য। অথচ একদল মানুষ এই মৃত্যু, এই অসুস্থতার কাছে কি নির্মম উদাসীন। তারা আত্মঘাতিনীর সামনে দাঁড়িয়ে তার অসংযত পোষাকের আড়ালে তখনও নারী শরীর খোঁজে। এই মানুষেরা ব্যক্তিগত ভোগ এবং বসবাস ছাড়া পৃথিবীকে অন্যভাবে ভাবতে চায় না। মৃত্যু এবং অনাহারে বা শোকে অচেতন বৃদ্ধকে সামনে রেখে তারা হাস মুরগীর কথা, গরুর কথা, তুলসী গাছ এবং পিতামাতার কথা ভাবে—এ ভাবে প্রত্যেকেই পৃথিবীর ব্যক্তিগত কোটরে......কোটরে......। রাত নামছে। ভয়াবহ অন্ধকার। মানুষেরা মৃত্যুকে এড়িয়ে অচৈতন্য বৃদ্ধকে ফেলে রেখে যে যার কোটরে ফিরে আসতে উদগ্রীব। লেখকের ত' ক্ষমতা নেই তাদের ওখানে আটকে রাখার।

...ন্দের শুশ্রূষার সময় দেবার চে' পোলট্রি থেকে তারা একটা জুটো করে ডিম গুণে গুণে বার করে আনবে। তারা আবার ফিরে আসে। কিন্তু লেখক ফিরতে পারেন না। কেননা তিনি লেখক এবং মানুষের জন্তে লেখেন। অথবা মানুষের জন্তে তাঁর বুকের মধ্যে গন্ধরাজ ফুল। তাই দেবদূতের মত তিনিই বালক হয়ে অচৈতন্য বুদ্ধের দিকে এগিয়ে যান। একা। তাঁর হাতে বুক থেকে তুলে আনা টাটকা গন্ধরাজ ফুল।

—গৌর বৈরাগী

সংবাদ

॥ গল্প মেলার গল্প ॥

কিছুদিন থেমে থাকার পর 'গল্পমেলা' আবার শুরু হল রবিবার (১০-৭-৮২) থেকে। এবারের 'মেলা' বসেছিল গল্পকার শ্রীদেবব্রত চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। ঠিক বিকেল চারটেয়। সবাই যে গল্পকার ছিল তা নয়। কেউ কেউ অতি সচেতন পাঠকও ছিলেন। যেমন আশিস ভট্টাচার্য, আবীর মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতি সরকার (অরুণ সরকারের বামাকণ্ঠ) অশোক চট্টোপাধ্যায় (গোধূলি-মন সম্পাদক) ও আরো অনেকেই।

প্রথম গল্প পড়ে শোনালেন নব বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর গল্পের নাম 'সুতপার প্রেমিক', অরুণ সরকারের মতে এ গল্পে নব মুন্সীয়ানা দেখাতে পারেনি। অতীশ চট্টোপাধ্যায়ও এ গল্পের কঠোর সমালোচনা করেন। দ্বিতীয় গল্পকার প্রদীপ মিত্রের গল্প 'রক্ত'। তাঁর পড়ার পর আলোচনা করেন গৌর বৈরাগী। গল্পের দোষ বিবৃতিধর্মী এবং অতিকথন। তৃতীয় যিনি গল্প পড়ে শোনান তিনি সুখেন্দু ভট্টাচার্য। গল্পের নাম 'গ্রামে চলো' পিনাকী রঞ্জন চক্রবর্তী ও অশোক চট্টোপাধ্যায়ের মতে গল্প ভাল হলেও আসরের সবাই গল্পের শেষ দিকটায় এমন কিছু খুঁজে পেলেন না যাতে গল্পটা গল্প হয়। এরপর চার নম্বর গল্পকার অরুণকুমার সরকার। গল্প—'টিভি'। সভার সবাই এই গল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এটা যে একটা দুর্দান্ত আধুনিক গল্প একথা বলে গেলেন অমল দাস, উশীনর চট্টোপাধ্যায়, অমৃত তনয় গুপ্ত এবং সবাই। মাঝখানে একটু বিরতি। একটু চা টা খাওয়া। বিরতির পর গল্প পড়ে শোনান গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'সংক্রান্তি' তেমন সাড়া জাগাল না। তাঁর গল্পে হতাশা আছে এ নিয়ে বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু বললেন। আর সকলের মতে তাঁর পড়ার দোষে গল্প অনেকেই বুঝতে পারে নি। অন্যান্য গল্পমেলায় এরপর আর গল্প পড়া হয় না। দূরের যারা তারা চলে যায় এবং ৩/৪ ঘণ্টা বসে থাকায় মনোযোগ থাকেও না। কিন্তু ঐদিন আরও দুজন গল্প পড়ে শোনান। ছ নম্বর গল্পকার অলোক চক্রবর্তী। গল্পের নাম 'স্বপ্ন ও দিনপঞ্জী'। কেউই এ গল্পের তারিফ করল না, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌর বৈরাগী ও গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এটাও বিবৃতিধর্মী এবং অতিকথন দোষে দুষ্ট। এই মেলার শেষ গল্পকার অতীশ চট্টোপাধ্যায়। তিনি তাঁর 'ড্রাই ডে' গল্প পড়েন। তাঁর গল্প অনেককেই নিরাশ করলেও কেউ কেউ বিশেষ প্রশংসা করেন কারণ অতীশ চিরাচরিত ভঙ্গি থেকে বেরিয়ে এসে নতুন আঙ্গিকে একটা ভাল গল্প উপহার দিয়েছেন।

প্রায় রাত আটটায় গল্পমেলা শেষ হল। পরবর্তী গল্পমেলা বসছে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি লক্ষ্মীগঞ্জ, চন্দননগর, হুগলীতে ৮ই আগষ্ট রবিবার দুপুর তিনটেয়।

—অমল দাস

কবি/প্রবন্ধকার/সম্পাদক/অধ্যক্ষ
এমন একজন মানুষের নাম
ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু

তাঁকে নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে গোধূলি-মনের একটি বিশেষ সংখ্যা

ঐ সংখ্যায় থাকছে :—

১। একালের গোলরক্ষক থেকে আজকের অধ্যক্ষ সমীরণ মুখোপাধ্যায় (সাক্ষাৎকার)

২। শুদ্ধসত্ত্ব বসুর কবিতা— (তাঁর এ যাবৎ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ থেকে বাছাই কবিতার সংকলন)

৩। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির আলোচনা। আলোচনা করবেন : অমৃততনয় গুপ্ত, সম্মোহন চট্টোপাধ্যায়, উশীনর চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণা বসু।

৪। শুদ্ধসত্ত্ব বসুর গ্রন্থ তালিকা।

৫। জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী।

দাম : একটাকা

MEMBER, All India Small & Medium News Paper Association, Delhi.
GODHULIMONE N. P. Reg. No. RN 27214/75 July '82
Vol. 24. No 7 Postal Regd. No. Hy.—14 Price Rupee One only

জানুয়ারি ১৯৮৩তে

গোধূলি-মন

পদার্পণ করছে ২৫ বছরে ; সেই উপলক্ষে বিগত ২৪ বছরের
লেখা নিয়ে একটি বিশেষ সংকলন বের হবে।

অনুষ্ঠান

২৩শে থেকে ৬শে জানুয়ারী

চারদিনব্যাপী এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান :
চলচ্চিত্র নাটক বাউল গান, কবিতার গান গণ সঙ্গীত
কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি আর সেমিনার
বইমেলাও হবার কথা আছে।

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পপুলার প্রিন্টার্স বারাসত, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও
চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

এই সংখ্যায়

১৫ই আগষ্ট/১৯৮৯ সংখ্যা

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

△ প্রীতিভাজনেষু,

দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদে 'গোধূলি মনে'র আষাঢ়, সংখ্যা ১৩৮৯ পেয়েছি। সম্পাদকীয় কলমে 'সাহিত্য পত্রিকার দুর্দিন' উল্লেখকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারলাম না। মন্তব্যটি অন্যভাবে করা যেতো পারিপার্শ্বিকতার পরিপ্রেক্ষিতে। সাহিত্য পত্রিকা বরাবরই এক সংগ্রামের মধ্যে নিষ্ঠা নিয়ে চলে। পত্রিকা চালনা ও সম্পাদনার মধ্যেই লুকিয়ে আছে নির্ভেজাল সৃষ্টির আনন্দ ও পরম তৃপ্তি। যারা ইতি-মধ্যে প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছেন অথবা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁদে ক্ষতি হয়েছে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের। কালের গহ্বরে তারা হারিয়ে গেলেও চিরকালের ভাণ্ডারে তারা নিজ দীপ্তিতে উজ্জল হয়ে থাকবে। সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে 'ভারতবর্ষ' ও 'প্রবাসী' আজও আমাদের কাছে সম্পদ।

দিনের বদলের পালায় সব পাল্টায় কিন্তু পাল্টায় না ধ্রুপদী বিষয়বস্তু। আজ সেই মূল উৎসটিকে লালন করতে হলে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বিনিময় আর পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একে অপরের অসুবিধাগুলোকে দূরীভূত করতে এগিয়ে আসতে হবে। সেখানে অর্থ সমস্যা নয় আন্তরিকতা আর সৎ প্রেরণাই সমস্যার সমাধান।

লিটল ম্যাগাজিনগুলি সম্পাদক সর্বস্ব না হয়ে নিষ্ঠাবান কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হলে অনেক সমস্যাই সহজেই সমাধান হওয়ার পথ পাবে।

নিয়ত দুর্দিন এলেও লিটল ম্যাগাজিনের গতি দুর্বার। আজও ভাল লেখা লিটল ম্যাগাজিনে পাওয়া যায়। কিন্তু তার সংখ্যা ইদানীং অল্প। নতুন লেখক সন্ধানের কাজেও লিটল ম্যাগাজিনে সম্পাদকের সচেষ্ট হতে হবে। ইলিয়াস হোসেন, মধুসূদন ঘাটি, রমা ঘোষের কবিতা পড়ে ভাল লেগেছে। দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়ের গল্প 'শীতে আরসিতে' ও অমল হালদারের 'বিস্ময়কর নাম ঃ পাবলো পিকাসো' অল্প পরিসরে পরিবেশিত হলেও পাঠকের মন ভরায়।

পত্রিকার সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি ও সরকার সহযোগিতায় প্রয়াসী।

সপ্রীতি শুভেচ্ছান্তে— নবকুমার শীল

আপনার গোধূলি মন' নিয়মিত পাচ্ছি। পপ্ সংগীত শুনতে শুনতে মানুষ যখন বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখনই মানুষ লোকসংগীতের ছায়ায় আশ্রয় নেয়। তাই আজ লোকসংগীত সমস্ত রকম গানকে ছাপিয়ে হু হু শব্দে গতিশীল হয়ে উঠছে।

তেমনি বাজারের কর্মাশিয়াল কাগজগুলো পড়তে পড়তে মানুষ যখন বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়বে, তখনই এই 'গোধূলি-মন' এর মত পরিচ্ছন্ন, উজ্জল, নির্ভীক, আবেদনে স্বতন্ত্র কাগজগুলোর ছায়ায় ভীড় করতে বাধ্য হবে।

তাই 'গোধূলি মন' এর বাঁচার প্রয়োজন। প্রতিটি সংখ্যা নিয়মিত পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

— সুভাষ চক্রবর্তী
বেলিয়াতোড়/বাঁকুড়া

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

২৪ বর্ষ/৮ম সংখ্যা/ ভাদ্র ১৩৮৯

প্রতি সংখ্যা এক টাকা
বার্ষিক (সডাক) দশ টাকা

সম্পাদকীয়

১৫ই আগষ্ট ও ৩১শে ভাদ্র

দেখতে দেখতে আবার একটি স্বাধীনতা দিবস এসে গেল। ভারতের ৩৬ তম স্বাধীনতা দিবস। বিগত এতগুলো বছরে ভারতের রাজনীতিতে কত বড় বড় উত্থান-পতন ঘটে গেছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক সব দিকেই ১৯৪৭ সালের সেই ভারতবর্ষ আর আজকের এই ভারতবর্ষের মধ্যে কোথাও কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না, পৃথিবীর অন্য কোন গণতান্ত্রিক কিংবা সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে তবু তুলনা চলে না ভারতের। আমাদের আশেপাশের ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি যখন প্রচণ্ড রকমের অস্থিরতার মধ্যে কাল কাটাচ্ছে— সিংহল, বর্মা, পাকিস্থান, বাংলাদেশ যে দিকেই চোখ ফেরান না। মোট মুটি একই দৃশ্য। সামরিক শাসনের রক্তচক্ষু তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে রয়েছে জনগণের দিকে। সেই তুলনায় চৌত্রিশ বছর স্বাধীনতা পাওয়া এই ভারতবর্ষের মানুষের অন্ততঃ স্বাধীনভাবে চলাফেরা, কথাবলা, লেখার স্বাধীনতা রয়েছে। এই টুকুই যা সান্ত্বনা।

৩১শে ভাদ্র অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মদিন। সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ নিয়ে আজীবন লিখে গেছেন তিনি গল্প উপন্যাস। সক্রিয়ভাবে রাজনীতিও করেছেন একসময়। তাঁর সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে এসেছি আমরা—এখন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পঞ্চায়েতরাজ কোন কোন গ্রামে বিদ্যুৎও পৌছে গেছে। তবু আজও তাঁর উপন্যাসে বর্ণিত অনেক চরিত্রকেই আমরা খুঁজে পাই অন্য নামে, অন্য পোষাকে।

॥ সম্পাদক ॥
অশোক চট্টোপাধ্যায়

○ সম্পাদকীয় কার্যালয় : নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর ॥ হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ ভারত

○ কলিকাতা কেন্দ্র : ৩৩/৬ জি নাজিরলেন, কলিকাতা - ৭০০০২৩

নেহেরু ঃ তাঁর গনতন্ত্র ও ভারতবর্ষ

অমল হালদার

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট বৃটেন ও মুসলিম লীগের সঙ্গে আপোষরফা ও ভাগ বাঁটোয়ারার পর ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, গত ৩৬ বছর উহার চেহারা, চরিত্র গতি ও পরিণতি কোন্ দিকে ঝুঁকিয়াছে—এই তথ্যের আলোচনা নিশ্চয়ই রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের গভীর আগ্রহ উদ্রেক করিবে।

এজন্য স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গী, লক্ষ্য এবং পদ্ধতি ইত্যাদি জানা যেমন আবশ্যক, তেমনি জানা দরকার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি কি করিয়াছেন এবং তিনি কি করিতে চাহয়াছিলেন। কারণ, ভারতবর্ষের মেজরিটি সংখ্যক লোকের কাছে এখনও কেবল কংগ্রেস ও নেহেরুই এক নয়, ভারতবর্ষ ও নেহেরুও প্রায় এক!

কিন্তু ভারতের বৃহত্তম সংখ্যক জনগণের এই আশা, বিশ্বাস ও ভরসাকে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু (তখনকার সময় ১৯৬১) কোন্ অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়া ছিলেন এবং তাঁর সোস্যালিষ্ট প্যাটার্নের সমাজ ও ওয়েলফেয়ার ষ্টেটের পরিকল্পনা কিরূপ ধারণ করিয়াছিল তাহা গভীর বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। সৌভাগ্যক্রমে এই বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও তথ্যসমৃদ্ধ একটি সুবৃহৎ ইংরাজী গ্রন্থ ২৩ বছর আগে প্রকাশিত হইয়াছে, যার নাম 'Nehru : His Democracy And India', গ্রন্থকার শ্রীঅতুলানন্দ চক্রবর্তী ইতিপূর্বে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তাঁর চিন্তাশীলতা ও মনীষার জন্য।

এই পযন্ত রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, রাধাকৃষ্ণণ প্রভৃতি ভারতবর্ষের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিগণ অতুলানন্দের রচনাবলীর (১৯৩৪ সাল হইতে অনেকগুলি গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছেন) ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, কারণ তাঁর রচনার মধ্যে যেমন গভীরতা আছে, তেমনি কোন বৃহৎ সমস্যার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য তাঁর নিজস্ব একটা চিন্তাধারা আছে। সুতরাং তিনি গতানুগতিক নন। তাঁর সঙ্গে সর্ববিষয়েই আমরা একমত কিংবা পাঠকবর্গ একমত হইবেন, তা নয়; কিন্তু তাঁর বক্তব্যের ও চিন্তাধারার স্বকীয়তা এবং যুক্তি ও তথ্য অন্তত কিছুকালের জন্যও গভীরতর জিজ্ঞাসার উদ্রেক করে। এখানেই গ্রন্থকার হিসাবে অতুলানন্দ চক্রবর্তীর সার্থকতা।

'নেহেরু : তাঁর গনতন্ত্র ও ভারত।' একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ এবং গ্রন্থটি আবার চার পাঁচটি অংশে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অংশের আবার মুখবন্ধ ও বিভিন্ন আলোচ্য বিষয় আছে। প্রত্যেকটি অংশ অত্যন্ত যত্ন, পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্য সহকারে রচিত হইয়াছে এবং লেখক আধুনিক ও প্রাচীন ইতিহাস, রাষ্ট্রদর্শন, অর্থনীতি রাজনীতি এবং সমসাময়িক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া নিজস্ব একটি পথ কাটিয়া লইয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন কি ভাবে নেহেরু এবং তাঁর ভারতীয় গণতন্ত্র ব্যর্থ হইতেছে।

এই ব্যর্থতার সূত্রপাত ভারতবর্ষের 'পার্টিসান' বা খণ্ডন হইতে এবং লেখকের মতে খণ্ডন করিয়াছেন "তিনজন ইংরেজ" মিলিয়া—মাউন্ট ব্যাটেন, নেহেরু ও জিন্না। শেষের দুইজন ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও চিন্তায়, কর্মে আচারে ও আচরণে, এমন কি ভাষার দিক হইতে পর্যন্ত ইংরাজ! (লেখকের মতে নেহেরুর ইংরাজী ভাষার উপর আশ্চর্য দখল ভারতীয় শিক্ষিত সমাজকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।)

গান্ধীজীর প্রতি গ্রন্থকারের ভক্তি অসাধারণ। কারণ, গান্ধীজী কেবল ভারত আত্মার মূর্ত প্রতীক নন, তিনিই ভারতবর্ষ ও মনুষ্য সমাজের সত্যকার পথ প্রদর্শক। সেই পথ আত্মিক সম্পদ ও আধ্যাত্মিক আদর্শ বঞ্চিত আধুনিক রাজনীতি ও অর্থনীতির বিকৃত প্রয়োগ মাত্র নয়। "জাতির এই জনক"কে নেহরু এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে দিন হইতে উপেক্ষাও পরিত্যাগ করিয়া মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে একত্রে ভারত ব্যবচ্ছেদ মানিয়া লইলেন (গান্ধীজী তীব্র আপত্তি জানাইয়াছিলেন।) সে-দিন-হইতেই ভবিষ্যৎ বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হইল। আজ নেহরুর খণ্ডিত ভারতবর্ষে প্রদেশ, ভাষা ও সম্প্রদায় ইত্যাদি নিয়া আরও বহু খণ্ড উপখণ্ড দেখা গিয়াছে। সুতরাং একমাত্র ভারত খণ্ডনের সব বিভেদ ও বিচ্ছেদের প্রশ্ন মিটিয়া যায় নাই।

কিন্তু লেখক বর্তমান ভারতীয় পরিস্থিতির আরও দূর গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি গণতন্ত্রেও লোক কল্যাণ রাষ্ট্রের স্বরূপ ব্যাখ্যায় প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা সুরু করিয়াছেন এবং অজস্র রেফারেন্সের ভিতর দিয়া দেখাইয়াছেন যে, নেহেরু গণতন্ত্রকে কলুষিত করিয়াছেন। সোস্যালিস্টিক প্যাটার্ণ ও প্ল্যানিং এবং প্রাইভেট সেক্টর ও পাবলিক সেক্টর নামক বিচিত্র অর্থনীতির রাজনৈতিক গোঁজামিল, আর সেকুলার ষ্টেট নামে একটি ভ্রান্তিজনক ধাপ্পা দ্বারা!

কারণ, তিনি দেখাইয়াছেন যে, যে দিন হইতে রোম্যান চার্চের সর্বাত্মক আধিপত্য ভাঙ্গিয়া গেল, সেদিন হইতেই ধর্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের যুদ্ধ ও সংঘর্ষ শেষ হইয়া আসিল। অর্থাৎ সেকুলার ষ্টেট এবং ওয়েলফেয়ার ষ্টেটের ধারণা আদৌ নতুন নয় এবং নেহেরুজীর ইহা কোন অবদানও নয়। বরং তিনি গণতন্ত্রকে সমাজতন্ত্রের গোঁজামিল দিতে গিয়া তাকে কীলকবিদ্ধ করিয়াছেন, ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে কোন উৎসাহ ও আশা সঞ্চার করতে পারেন নাই, এবং প্রশাসনিক অযোগ্যতা ও ব্যাপক দুর্নীতি ভারত রাষ্ট্র ও সমাজকে প্রতিদিন বিষজর্জর করিয়াছে।

ইতিহাসখ্যাত মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন বর্ণিত জনগনের পরিচালিত গণতন্ত্রকে ভারতবর্ষে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্যদিকে ক্রমাগত ট্যাক্স বৃদ্ধি, দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি, বৈদেশিক ঋণের বৃদ্ধি (প্ল্যানিংয়ের কল্যাণে) এবং বেকার সমস্যার বৃদ্ধি ভারতীয় জনজীবনকে জর্জর করিয়াছে।

যে পররাষ্ট্রীয় নীতির জন্য নেহেরু এত খ্যাতি, গ্রন্থকার সেই নীতিরও নিজস্ব ভঙ্গীতে বিচার ও বিশ্লেষণ পূর্বক অসারতা প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, কাশ্মীর, গোয়া ও লাডাক কিংবা পাকিস্থান, পর্তুগাল ও চীনের প্রশ্নের ভারতবর্ষ ও নেহেরু কত অসহায়। অথচ পররাষ্ট্রীয় নীতির প্রথম লক্ষ্য হইতেছে জাতীয় স্বার্থও জাতীয় রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি করা।

কিন্তু পণ্ডিত নেহেরুর সুবিখ্যাত 'নিরপেক্ষতা' ভারতবর্ষকে বন্ধুহীন ও সহায়হীন করিয়া তুলিয়াছে। জাতির মেরুদণ্ড খর্ব হইতেছে। সদা অতীত বর্তমান ভারতবর্ষের ব্যবস্থা লেখক অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও গভীর মণীষার দ্বারা বিচার করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তিক্ত তীব্র সমালোচনার মধ্যে তিনি নেহেরুজীর মহত্ব, তাঁর অনন্য সাধারণ প্রতিভা এবং ভারতবর্ষ তাঁর অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতি কোন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই। বরং

নেহেরুর "গ্রেটনেসের" (মহত্বের) কাছে লেখকের যে সুগভীর প্রত্যাশা ছিল, তার ব্যর্থতাই যেন অভিমান ক্ষুব্ধ লেখককে এক বড় সমালোচক করিয়া তুলিয়াছে। অসংকোচে বলা যায় যে, লেখক তাঁর নিজস্ব চিন্তা ও বিদ্যাবত্তার আলোকের দ্বারা 'নেহেরু এবং তাঁর গণতন্ত্র ও ভারতবর্ষের" উপর যেন সার্চলাইট ফেলিয়াছেন এবং এই গ্রন্থ শেষ করার পর পাঠকের মনে হইবে যে, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ বিপন্ন। তাঁর এই সমালোচনা ও বিশ্লেষণ সত্য-সত্যই চিন্তার উদ্রেক করে।

তথাপি যাঁরা বামপন্থী মতবাদে বিশ্বাসী তাঁরা নেহেরুজীর ব্যর্থতা স্বীকার করিলেও (এবং সেই দিক হইতে এই সমালোচনা বামপন্থী রাজনীতিকদেরও সহায়ক) গ্রন্থকার বর্ণিত ব্যর্থতার সেই কারণগুলি স্বীকার করিবেন না।

কারণ, লেখক গণতন্ত্রকে একটা "বিশুদ্ধ বস্তু" বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, যাহা আজিকার দিনে অবাস্তব।

কারণ, এই গণতন্ত্র আসলে ধনতন্ত্রকে পাহারা দেওয়ার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক হাতিয়ার মাত্র এবং এই প্রকার গণতন্ত্রে একমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণী ছাড়া "গণমানুষের" জীবন বিকাশের কোন সম্ভাবনা নাই। গ্রন্থকার আগাগোড়া ডেমোক্রেসি ও সোসিয়েলিজম্ এই দুইটি বাবদ ব্যবহার করিয়াছে। কিন্তু তাঁর উচিত ছিল ক্যাপিটালিজম্ ও সোসিয়েলিজম্, এই দুইটি সংজ্ঞা ব্যবহার করা।

কারণ, এই দুইটি বিপরীত সিষ্টেম্ই গণতন্ত্রের দাবীদার। অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র এবং সমগ্র সমস্যা ও ব্যাধির মূল্য আছে। এই দুইয়ের সংঘর্ষ, যদি তিনি ডেমোক্রাসির এই দুই স্বতন্ত্র রূপ উপলব্ধি করিতেন, তাহলে সম্ভবতঃ পাঁচ শত পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখিবার পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রম তাঁকে স্বীকার করিতে হইত না।

জাতীয়তাবাদী যে সঙ্কীর্ণ রাজনীতির জন্য (যাহা জনগণের সর্বাত্মক বিপ্লবকে কখনও স্বীকার করে নাই) হিন্দু মুসলিম বিচ্ছেদ ও ভারতবর্ষ খণ্ডিত হইয়াছে এবং গান্ধীজী সর্বজন বরেণ্য অধিনায়ক হওয়া সত্ত্বেও যে সমস্ত কারণে পার্টিশানে বাধা দিতে পারেন নাই, সেই কারণগুলিই আজ নেহেরু শাসিত ভারতবর্ষে অধঃপতন ঘটাইয়াছে। ইহার জন্য একা নেহেরু নহেন…গোটা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজই দায়ী।

তথাপি অতুলানন্দ চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ যে, তিনি ভারতবর্ষের ক্রমাবনতির চেহারাটা চমৎকার তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং অনেক তত্ত্বকথায় গহন অরণ্যের মধ্যদিয়া আমাদিগকে এমন এক জায়গায় ফেলিয়া দিয়াছেন সেখানে শুধু অন্ধকার!

Nehru : His Democracy and India : by Atulananda Chakrabortty. Published by Thaker's Press & Directories Ltd. 6-B Bentinck Street, Calcutta-1 Price 75/—
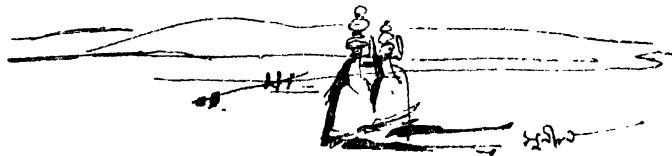
পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী রাজের পক্ষে/বিপক্ষে

এ, আত্রী

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকেই গ্রামীণ উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সব পরিকল্পনা কাগজে কলমেই থেকে গিয়েছে, বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি। তার একমাত্র কারণ, এই সব পরিকল্পনা রচনা করার সময় প্রশাসনে সাধারণ নাগরিকের সংযুক্তির কথা চিন্তা করা হয়নি।

১৯৭৭ সালে জুন মাসে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলেন। এসেই তাঁরা চিন্তা করলেন ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ ছাড়া এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যে গ্রামের গরীব মানুষের জন্য কিছু করা সম্ভব হবে না। যদি না গ্রামাঞ্চলে কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পে উৎপাদনে একটি সমন্বয় রক্ষা করতে পারা যায়, তাহলে গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণ উপকৃত হবেন। কারণ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে মোট পরিবার সংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দেশ্য সফল হল, ১৯৭৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকার জয়ী হলেন। এখন পঞ্চায়েতকে যে সব কাজের দায়িত্ব দেওয়া হল, তা বাস্তবে রূপায়িত করার সময় কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল তাহাই আলোচ্য বিষয়।

ভাগচাষীর ক্ষেত্রে দেখা গেল ধনী চাষীদের গায়ে বেশী হাত পড়েনি। তার একমাত্র কারণ, প্রত্যেক ধনী চাষীদের নিজের হাল লাঙল, লোকজন সবই ছিল, সেইসব গরীব খেটে খাওয়া মানুষ তাদের মনিবের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবার সাহস করেনি, এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ছোট চাষীরা। সামান্য জমি যারা ভাগ চাষে দিয়ে রেখেছিল তাদের গায়েই হাত পড়েছে বেশী। সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে সামাজিক সম্প্রীতি। গ্রামাঞ্চলে যে সাধারণ মানুষ মিলেমিশে বসবাস করত, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সে সামাজিক সম্প্রীতি আর নেই। একে অপরের অভাব অনটনে এগিয়ে আসছে না। এতে গরীব চাষীরা বেশী ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে।

ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত কর্তৃক কিছুটা সফল হয়েছেন। বহু বেনামী জমি সাধারণ গরীব চাষীদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। গৃহহীনদের বসবাসের স্থায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, বাড়ী ঘর তৈরী করার জন্য কিছু অর্থও মঞ্জুর করা হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে বর্গাদারকে কাজের স্থায়িত্ব দিলেই কি শুধু চলবে? উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে সব উপকরণ দরকার তাহা আজও সুলভে দেওয়া সম্ভব হয়েছে কি? সেচের জল, সার আজও ব্যয়বহুল। কালর্ভাট তৈরী করে কি হবে, যদি নদী থেকে খাল কেটে জল আনার বন্দোবস্ত না করা গেল। কোথাও হয়েছে কিনা আমার জানা নেই কিন্তু বাগনান গোপালপুরের যে রিভার লিফ্‌টিং পাম্প বসাবার কথা ছিল, আজও তাহা সম্ভব হল না।

পঞ্চায়েত গুলি বেশী করে ক্ষমতা দেওয়ার মধ্যে কাজের বদলে খাদ্য এবং গ্রামীণ সমস্যা উন্নয়ন কর্মসূচী রচনায় ও রূপায়নের চেষ্টা, গ্রামের গরীব মানুষকে শ্রমে নিযুক্ত করে সামাজিক সম্পদ তৈরী করা, পুষ্করিণী খনন,

রাস্তা ঘাট মেরামত ও নির্মাণ ইত্যাদি। এই সব প্রকল্পগুলির কিছু ব্যয় ভার বহন করেন রাজ্য সরকার টাকার মাধ্যমে, কিছু কেন্দ্রিয় সরকারের খাদ্য সামগ্রী দ্বারা।

যে সব চিন্তা করে পঞ্চায়েতরাজ গঠন করা হয়েছিল, তাহা আদৌ বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়েছে কি? ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ ছাড়া শুধু মহাকরণে বসে মন্ত্রী মশাইরা দেশ শাসন করবে না, গ্রামের দরিদ্র ব্যক্তিরা নিজেরাই নিজেদের উন্নয়ন পরিকল্পনার দায়িত্ব নিবে, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, বিধান সভায় গ্রামের গরীব মানুষদের জন্য যে টাকা পয়সা খাদ্য সামগ্রী মঞ্জুর করা হল, তাহা ঐ বিধান সভা থেকে পঞ্চায়েত প্রতিনিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণ এতটুকু জানতে পারেনি। শুধু তারা জেনেছে, কিছু টাকা, খাদ্য সামগ্রী তাঁদের জন্য এসেছিল, এবং তা থেকে কিছু খরচ হয়েছে, কিন্তু কোন খাতে কত টাকা এল তাহা কি ভাবে খরচ হল এখন সবই অগোচর রয়ে গেছে।

উদাহরণ স্বরূপ বাগনান থানার অন্তর্গত খাজুটী গ্রামের পঞ্চায়েতের কাজকর্ম দেখাশুনা করার জন্য জন-প্রতিনিধি ছাড়াও ২২ জনের একটি বেনিফিসিয়ারী কমিটি গঠন করা হল। উদ্দেশ্য জন প্রতিনিধি ছাড়াও এরা কাজকর্ম দেখাশুনা করবেন, কাজ যখন শেষ হল, আমরা সেইসব বেনিফিসিয়ারী কমিটির লোকজনকে প্রশ্ন রেখেছিলাম কি খরচ হল তাহা জানবার জন্য। তারা কেউই কোন জবাব দিতে পারেনি। দেখা গেল, গ্রামের অঞ্চল প্রধান তাঁর কয়েকজন মনঃপুত লোকদ্বারা সমস্ত খরচা করিয়েছেন। সেইজন্য গ্রামের যুব সমাজ ও জন প্রতিনিধি একদিন গ্রামের এই অঞ্চল প্রধানের কাছে প্রস্তাব রাখল, কি পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী এসেছে এবং তাহা কোন কোন খাতে কত খরচ হয়েছে, তথা সাধারণ গ্রামের সমস্ত সাধারণ মানুষকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য। তারা হিসাব তো দিলেন না, উপরন্তু কিছু দরিদ্র মানুষকে এই শিক্ষিত যুবকদের উপর লেলিয়ে দিলেন, প্রাণ ভয়ে তারা সেদিন যেখানে পারে পালিয়ে ছিল। এসব ঘটনাতো কল্যাণপুর বিধান সভার এম, এল, এর সামনেই ঘটেছে নিরুপায় হয়ে উনিও সেদিন কিছু না বলে চলে গেলেন।

সামাজিক অর্থ-নৈতিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতা উপর দাঁড়িয়ে বামফ্রন্ট সরকার গ্রামের দরিদ্র মানুষদের জন্য কিছু করার চেষ্টা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের জন প্রতিনিধি কতখানি সরকারের এই সুচেষ্ট সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছে, এখন সেটাই বামফ্রন্ট সরকারের খতিয়ে দেখার সময় এসেছে।

প্রসঙ্গ : গোধূলি-মন

গোধূলি মন পত্রিকা নিয়মিত পাচ্ছি। 'গোধূলি-মনে'র গল্পের দিক এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে। গল্পের এতো অভাব হচ্ছে কেন? গৌর/নব অরুণ কি লিখছে না? ওদের দিয়ে লেখাও।

কৃষ্ণসাধন নন্দী
বাঁশবেড়িয়া/হুগলী

তুষারকান্তি ব্রহ্মচারীর রূপান্তর

মিনিট দশেক অপেক্ষা করতেই একটা মিনিবাস এসে দাঁড়াল। মণি একটু তাড়াহুড়ো করে দু-চারজনকে ঠেলে প্রথমে ঢোকে। সামনেই একটা ফাঁকা সীট। পুরোটাই ফাঁকা। দুজনের বসার জন্যে। মণি প্রায় ধপ্ করে বসে পড়ে। জানালার দিকে সীটের ডানপাশে নিজের ডানহাতটা ফেলে রাখে। ও জায়গাতে মালা বসবে। মণি দরজার দিকে তাকায়। চার-পাঁচজন প্যাসেঞ্জার ওঠে। সবশেষে মালা। কোলে বছর তিনেকের তিরি। তিরি নামটা মণিই দিয়েছে। তিরি হোল মণির পরিবারে তিন নম্বর মানুষ।

মালা কাছে আসতেই মণি হাতটা তুলে নেয়। মালা জানালার দিকের সীটে বসে পড়ে। যাবার সময় মণির হাঁটুতে ওর হাঁটু ঘসড়ে যায়।

সীটে বসেই মালা তিরিকে মণির কোলে চাপিয়ে দেয়। ওর মুখে-চোখে একটু বিরক্তির ভাব। মণি সেটা লক্ষ্য করে, বলে—কী হোল? মালা ফিস্‌ফিস্ করে রাগতস্বরে বলে—হবে আর কি! মেয়েটাকে সেই বাড়ি থেকে নিয়ে আসছি—বাসে ওঠানোও আমার দায়িত্ব? মণি একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। পরে বলে—তিরিকে ওঠাতে গেলে এই সীটে বসতে পেতে? যা ভীড়!

মালা কোন উত্তর দেয় না। ছোট্ট পায়রার মতো শাদা রুমালে মুখটা মুছতে থাকে। মণি তিরির মুখের দিকে তাকায়। রোদে-রোদে গরমে মেয়েটার মুখ আপেলের মতো লাল হয়ে আছে। চুলগুলো ঝাঁপিয়ে নেমেছে কপালের উপর। মণি মালার হাত থেকে রুমালটা নিয়ে মেয়ের মুখ মুছে দেয়। এবং একটু বেশী করে মোছানর জন্যে তিরির শ্বাসকার্যে একটু জ্যাম ধরে যায়। মুখ দিয়ে উঁ-উঁ শব্দ করতে থাকে। দুটো কচি হাত দিয়ে রুমালসমেত বাবার হাতকে সরাতে চায়। মালার সেটা নজরে পড়তেই মণির হাত থেকে একটু যেন জোর করেই রুমালটা কেড়ে নেয়। মণি কোন কথা বলে না। মেয়ের মাথার নরম কালো চকচকে চুলগুলো আঙুল দিয়ে সাজিয়ে দিতে থাকে। একবার মুখ নিচু করে মেয়ের মুখের দিকে তাকায়। ছোট্ট তিরির বড়ো বড়ো চোখ দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। সাঁ-সাঁ করে বড়ো বড়ো বাড়ি-দোকানপাট-গাছ-বাস পেরিয়ে যাচ্ছে। তিরির মুখে একটু কমলা রঙের হাসি।

বাসটা একটা স্টপেজে এসে দাঁড়ায়। দুজন বয়স্ক নেমে যায়। সেদিকে মণি তাকায়। এমনিই। বাইরে কিছু দেখার নেই। এইসব পথঘাট ওর সেই চুষিকাঠির বয়স থেকেই চেনা। বাস আবার চলতে শুরু করে। মণির নজরে পড়ে একটা লোক—মণির বয়েসীই হবে—গেটের রড ধরে কোনরকমভাবে ঝুলতে ঝুলতে উঠল। লোকটার শাদা পাঞ্জাবী, শাদা পাজামা। চোখে সরু ফ্রেমের চশমা। চুল একগাদা। কোঁকড়ানো।

লোকটা ঠেক্কেঠুলে ভেতরে এল। ভেতরে চারদিকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে কী দেখল। তারপর মণির সীটের কাছে এসে রড ধরে একটু ঝুঁকে দাঁড়াল।

মণি শুনতে পায় লোকটি একটু হেসে হেসে বলছে—আর একটু দেরী করলে এটাও যেত।

মণি ঘাড় ঘুড়িয়ে লোকটির দিকে তাকায়। না—তাকে উদ্দেশ করে বলেনি। পাশের লোকটিকে বলছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর শুনল লোকটি আবার কথা বলছে—এই মিনিবাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া মানে কিছুক্ষণ অন্ধকূপে বন্দী থাকা। বসতে তো পাবই না—উল্টে ঘাড় নিচু করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। ভাড়াও নেবে ডবল।

মণি বোঝে লোকটির প্রচণ্ড বিরক্তি ধরে গেছে। মণি একটু আড়চোখে তাকায়। লোকটি মালার দিকে তাকিয়ে আছে। মালা যদিও বাইরের দিকে তাকিয়ে। তবুও মণির রাগ ধরে যায় লোকটির উপর। প্রথম থেকেই লোকটির উপর মণির অসন্তোষের রঙ যেন সামান্য ছড়ানো ছিল। এবার যেন সেই রঙ জীবন্ত হয়ে উঠল। মণির মনে হল লোকটি যেন আগের চেয়ে একটু বেশী ঝুঁকে রয়েছে। এত ঝুঁকে থাকার কারণ কী? মণি একটু ফুলে ওঠে। মনে মনে অজস্র অশ্রাব্য শব্দের ঝড় বইয়ে দেয় লোকটির দিকে। ঘেন্নায় তার মুখের আকৃতি পাল্টে যায়। বিড়-বিড় করে বলে—পোষাক-আশাক তো ভদ্র ভদ্র, আচার ব্যবহারে হ্যাংলামি কেন?

দাদা—মেয়েটি আপনার?

মণি মাথা তোলে। লোকটি তার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখে মৃদু হাসি। মণি বোঝে যে লোকটি এভাবে তাদের মধ্যে সাপের মতো ঢুকতে চাইছে। আসল লক্ষ্য মালা। এসব ধরণের লোককে মণির আর চিনতে বাকি নেই। মণি সংক্ষিপ্ত রূঢ় উত্তর দেয়-হ্যাঁ। আমারও এরকম একটা বোন……। মণি মালার দিকে মুখ করে দূরত্ব অনুপাতে গলার জোর একটু বেশী বাড়িয়ে বলে তিরিকে ধরো তো। মালা তিরিকে কোলে চাপিয়ে নেয়। মণি পকেট থেকে চারমিনার বের করে ধরায়। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে লক্ষ্য করে—লোকটা চুপ করে গেছে। ওকে চুপ করিয়ে দেওয়ার জন্যই মণি এই এতসব কাণ্ড করল। নইলে সিগারেট খাওয়ার এখন মোটেই ইচ্ছে ছিল না। মণি যদি লোকটার কথা শুনত তবে লোকটা তাকে পেয়ে বসত। আর এক সময় মালার দিকে হাত বাড়াত।

মণি মালার দিকে তাকায়, মালা তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে কিরকম একটা অবাক বিরক্তি মেশানো।

দাদা—নামবেন কোথায়?

মণির গায়ে যেন গরম বালি পড়ে। উঃ—এরকম নাছোড়বান্দা লোক দেখেনি! যেচে কথা বলতে চাইছে। লোকটা ভেবেছে কি? সারাটা রাস্তা এভাবে বিরক্ত করতে করতে যাবে? মণি আরোও শুকনো কর্কশ উত্তর দেয়—অনেকদূর—অনেক দূর যাবো। লোকটা হে-হে করে একটু হাসে। হয়তো হাসি ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। তারপর নিঃশব্দ। মণি মনে মনে খুশী হয়। এবার ঠিক ঠিক ওষুধ পড়েছে। বাছাধনের মধ্যে যদি সামান্যতমও মনুষ্যত্ব থাকে—তবে আর টু শব্দটি করবে না।

স্টপেজ আসে। বাসটা দাঁড়ায়। এ স্টপেজে বাসটা মিনিট দশেক দাঁড়াবে। মণি হঠাৎ দেখে লোকটি নেমে যাচ্ছে। মনে একটু আরামদায়ক বাতাস বয়ে যায়। যেন একটা শক্ত ক্যাচ্ ধরে প্রথম সারির ব্যাটস্ম্যানকে আউট করল।

গোধূলি-মন, শ্রাবণ-১৩৮৯, দশ

তোমার কী হয়েছে বলো তো?

মালার দিকে তাকায় মণি। মালা তার দিকে আগের মতোই তাকিয়ে আছে?

কী আবার হবে?

তাহলে ভদ্রলোকের সাথে অমনভাবে কথা বললে কেন? উনি তো কোন কুকথা বলেননি। তুমি না দিনকে দিন কেমন হয়ে যাচ্ছ! মণি থমকে যায়। মালার বিরক্তি কেমন যেন ঘেন্নায় রূপান্তরিত হতে চলেছে। মণির গোড়া ধরে কে যেন ঝাঁকুনি দেয়। চোখের উপর থেকে একটা পর্দা সরে যায়। উজ্জ্বল রোদ পড়ে মনের উঠোনে। তাই তো! লোকটা তো সেরকম না-ও হতে পারে! তাহলে কি ওর উপর বিরক্ত হয়েই লোকটা এই বাস থেকে নেমে গেল! তার এই ব্যবহার দেখে গোটা বাসের লোক হয়তো তাকে ছিঃ-ছিঃ করছে। সে তো এতটা তলিয়ে দেখেনি।

মণি বাস থেকে নেমে গেল। লোকটির কাছে সে এই অমার্জিত ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেবে।

লোকটির খোঁজ না পেয়ে নিজের বাসের দিকে ফিরতে ফিরতে মণির নিজেকে খুব অপরাধী-অপরাধী লাগতে থাকে। মালার কাছে গিয়ে কী উত্তর দেবে—সেকথা ভাবতেই তার কিরকম একটা ভয়ও করতে লাগল।

নজরুল সম্পর্কে বিপ্লবী নেতা সিরাজুল হকের বক্তব্য

শীতল দাস

কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। পূর্ব্ব ইউরোপে যে নূতন সমাজ সৃষ্টি হয়েছিল, স্বাগত জানিয়ে তার জয়ধ্বনি করে তিনি বিশ্ব শ্রমিক মৈত্রীর "আন্তর্জাতিক" সঙ্গীতের অনুবাদ এবং "সাম্যবাদী" কবিতা রচনা করে ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে সংগ্রামী কাজী নজরুল ইস্‌লাম আমাদের প্রেরণা। কবি ও শিল্পী নজরুল আমাদের কাছে সংগ্রামী নজরুল।

হুগলী চক্ বাজারের অনতিদূরে কাটঘরা গলির ভিতরেই বাস করেন অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতা শ্রীসিরাজুল হক্। বয়সে প্রবীণ। হুগলী চুঁচুড়ায় বিপ্লবী মানুষ গুলির মধ্যে তিনিও একজন, হক সাহেব ছিলেন কবি নজরুলের সহচর। একত্রে গান গেয়েছেন আবার বিপ্লবের মধ্যেও জড়িয়ে রেখেছেন। কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের সংস্পর্শে ছিলেন দীর্ঘদিন। কত ইতিহাস আজও তাঁর মনের পাতায় লেখা আছে।

তাই একটি সংস্থার পক্ষ থেকে আমি হাজির হই "রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা" অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত হওয়ার আব্দার নিয়ে।

প্রথম সাক্ষাতেই সিরাজুল হক আমায় ভালবেসে ফেলেছিলেন। তাঁর চরণে প্রণাম জানিয়ে আমার নিবেদন রাখতেই তিনি রাজী হয়ে গেলেন, দিন, ক্ষণ, সময়, তারিখ এবং স্থান তাঁর ডায়েরীতে লিখে রাখলেন। আর খুশী হলেন এই জেনে যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভুচরণ ঘোষ এবং হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্তকুমার ঘোষ। এরপর আমি শ্রীসিরাজুল হককে নানা প্রশ্ন করি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম সম্পর্কে। তিনি একবার করে ভাবছিলেন এবং আন্তরিকতার সঙ্গে উত্তর দিচ্ছিলেন।

আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল—"কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম প্রথম হুগলীতে কি ভাবে এলেন?"

উত্তরে সিরাজুল হক জানালেন "সারা বাংলা দেশে তখন স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ বয়ে চলেছে। নজরুলের জ্বালাময়ী লেখনী অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত সারা দেশের বিপ্লবী মনভাবাপন্ন যুবকদের প্রেরণা ও ইন্ধন যুগিয়ে চলছে। ভূপতিবাবু বরাবরই কবির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা হোল কবিকে হুগলীতে নিয়ে আসা। কারণ, হুগলী জেলার আন্দোলনের কাজে কবির উপস্থিতি বিশেষ কাজে লাগবে। ভূপতিবাবু ১৯২৩ সালে রাজবন্দী হয়ে জেলে গেলে আমরা কবিকে নিয়ে খুবই অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ি। অবশেষে কাটঘরা গলির বিশিষ্ট কর্মী খগেন ঘোষের বাড়ীতেই কবি কিছুদিন ছিলেন। পরে হুগলী ধারের মোক্তার মোগলপুরা নিবাসী জনাব হাকিমে নবী সাহেবের সহায়তায় বিদ্যামন্দিরের পাশের মোগলপুরা গলির ভিতরে শ্রীভোলানাথ স্বর্ণকারের একতলা বাড়ীতে ভাড়াটে হিসাবে কবি আশ্রয় পেলেন। এই বাড়ীতেই কবির প্রথম পুত্র কৃষ্ণমহম্মদ জন্মগ্রহণ করে। কয়েক মাস পরে ছেলেটি মারা যায়। এরপর মোগলপুরা বাড়ী ছেড়ে চকবাজারের কাছে রোজ ভিলার সন্নিকটে একটি দোতলা বাড়ীতে উঠে আসেন।"

পরের প্রশ্ন :—"কবির সান্নিধ্যে তখন আর কোন কোন কবি সাহিত্যিক আসতেন?"

সিরাজুল হক উত্তরে বললেন—"এই বৃদ্ধ বয়সে হয়তো সকলের কথা মনে পড়বে না। হয়তো কারও কারও কথা বাদ পড়ে যাবে। তবু ঠিক এই মুহূর্ত্তে যাঁদের কথা মনে পড়ছে—তাঁরা হলেন কবি সুবোধ রায়, সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়; 'বিপ্লবী' নলিনী গুপ্ত ও নিবারণ ঘটক এবং আরও অনেকে।"

প্রশ্ন করলাম—"কবির গানের গলা কেমন ছিল?"

প্রশ্ন শুনে হক সাহেব হাসলেন। বললেন "উত্তরটা পরে দিচ্ছি। আগে আপনি একটা গান শুনুন। কবির সঙ্গে আমরা তো অনেক গানই গেয়েছি। কখনও সভায়, কখনও পথে, আবার কখনও বাড়ীর ছাদে বসেও।" বলে গান ধরলেন—

"খোলো মা দুয়ার খোলো"
প্রভাতেই সন্ধ্যা হলো
দুপুরেই ডুবলো দিবাকর গো—

প্রায় প্রতিদিন কবি সুবোধ রায় আসতেন ও আরও অনেকে এ বাড়ীতে আসর জমাতেন। নজরুলের আবৃত্তি ও গান পুরোদমে চলতো। কবিকণ্ঠে যে একবার গান শুনেছে সে কখনও ভুলতে পারবে না। জানিনা কবির কণ্ঠের কোন গান রেকর্ড করা আছে কিনা। তবে কবির কণ্ঠের সুখ্যাতি ছিল দিকে দিকে, গান-বাজনা, হৈহল্লা, হাসি ঠাট্টার ভিতরে কবির ঘরটি জমজমাট হয়ে উঠতো। বিদ্যামন্দিরে শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায় কবির বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁর গানের গলা খুব দরাজ ছিল। কবির কাছে তিনি অনেক গান শিখেছিলেন।"

এরপর সিরাজুল হক কবি নজরুলের বিপ্লবী জীবনের অনেক কথা শোনালেন। ১৯১৯ সালের জালিয়ান-ওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের কথা, ইংরাজদের দেশছাড়ার আন্দোলনের কথা, "ধুমকেতু" পত্রিকার কথা, ১৯২১ সালের হুগলী-চুঁচুড়ার ছাত্র-যুবকদের দেশের জন্য ঝাঁপ দেওয়ার কথা, একটি স্মরণীয় সভায় কবি কণ্ঠে বিদ্রোহী' কবিতাটি আবৃত্তি করার কথা, বর্ত্তমান এম-পি (M P.) শ্রীবিজয় মোদক, হামিদুল হক ও অন্যান্যদের 'ধুমকেতু' পত্রিকায় যাতায়াতের কথা, চুঁচুড়ার ষড়ৃয়াবাজারের নিকট একটি শোকসভায় নজরুলের নিজকণ্ঠে "ইন্দ্রপতন" কবিতাটি আবৃত্তি করার কথা, ১৯২৩ সালে দেশদ্রোহের অপরাধে কারাদণ্ড হওয়ার কথা এবং কতশত ঘটনা।

কবির কাছে জাতপাতের বিচার ছিল না। তাই নজরুল নিজেই গেয়েছেন—

জাতের নামে বজ্জাতি তোর
জাত জালিয়াত, খেলছ জুয়া।"

আর শুধুমাত্র বিপ্লবী নেতা সিরাজুল হক নন—বহু কবি, সাহিত্যিক, সমাজসেবী, নেতা ও মানব প্রেমিক এই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সংস্পর্শে এসেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত এ হেন কবির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন।

আমরা হুগলী-চুঁচুড়ার মানুষ হিসাবে গর্ববোধ করতে পারি এই কথা ভেবে যে, তিনি এই শহরে বাস করে একদিন আমাদের দেশের কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তিনি আমাদের গৌরব।

মনে পড়ে কবি ও সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন—"নজরুল ইসলাম চির-বিদ্রোহী সত্য, কিন্তু সে বিদ্রোহের আসল পরিচয় উগ্র উচ্ছ্বাস নয়। সমস্ত উদ্দাম তরঙ্গ-আন্দোলনের তলায় কোথায় সে বিদ্রোহ যেন গভীর সমুদ্রের মত শান্ত, সমস্ত ঝটিকা আন্দোলনের উর্দ্ধে তুষার শিখরের মত স্থির।"

মানবতার পূজারী নজরুল ইসলামের সঙ্গে বিপ্লবী সিরাজুল হক একদিন যে গান গেয়েছিলেন—আজ আমরা সেই সুরটি বজায় রেখে গান গাই—

"ভিক্ষা দাও গো, ভিক্ষা দাও
ফিরে চাও গো পুরবাসী
সন্তান দ্বারে উপবাসী
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও।"

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

△ পত্রিকা নিয়মিত পাই। লিটল ম্যাগের ঠুনকো প্রাণ। গেল যে ভেঙে পড়ে···তবু দুঃসাহসী তোমার ঘোড়া ছুটছে টগবগ করে······

আনন্দে বুক ভরে ওঠে যখন দেখি নিত্য নতুন প্রসাধনে হাজির হচ্ছে 'গোধূলি-মন' চোখ ভরে মন ভরে, ভরে বুক······

স্বপ্নের ভিতর যারা লালন করে কবিতা দূরত্ব, ব্যবধান, পিছুটান কিছু নয়···সীমানা অসীমকে মুহূর্তেই টেনে আনে কাছে একেবারে অন্তঃপুরে···আমাদের সংক্ষিপ্ত সময় ভেসে যাক সপ্ত ডিঙার পাল তুলে······দীর্ঘস্থায়ী অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখুক 'গোধূলিমন'···

প্রফুল্ল অধিকারী
আসানসোল/বর্দ্ধমান

'এই তার পুরস্কার'

উশীনর চট্টোপাধ্যায়

সৎ ও সচেতন শিল্পী মাত্রেরই লক্ষণীয় সামান্যতম একটি বৈশিষ্ট বোধ হয় এই যে পাঠকের অভ্যস্ত চৈতন্যকে পরিতৃপ্ত করা কোনোভাবেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনা, এবং যথার্থই তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপার। কেননা প্রথাসিদ্ধ ভাবার সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর চিরদিনই বিষমানুপাতিক। উপরন্তু মৌলিক সৃজনক্ষম প্রতিভা যেহেতু খেতাবের স্বীকৃতিসন্ধান কিম্বা প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে বিরত থাকেন, সুতরাং দেশ কাল ভেদে মৌল শিল্পীর আবির্ভাবে পাঠকবর্গ হয়ে ওঠেন অসি ধারাব্রত গ্রহণেই বাধ্য, এবং জনপ্রিয়তার সুলভ করতালি কোনো প্রকারেই তাঁর আসনকে উর্দ্ধমুখী করে তুলতে সক্ষম ও সমর্থ হতে পারেনা। আর সৎ শিল্পীর মত সৎপাঠক ও যেহেতু হামেশাই জন্ম নেন না তাই লিখতে হয় কিছুটা তাকে ভাবীকালের পাঠকেরই জন্য। এহেন ধ্যান ধারণা আজ যখন নিতান্তই একটা প্রায় অভিধায় নিবদ্ধ তখনই বোধ করি তার প্রযুক্ত হওয়ার কিছুটা সূক্ষ্ম অথচ দীর্ঘব্যপ্ত, নিঃশব্দ কিন্তু গভীর অনুরণনময় নিদর্শন গোপনে রেখে গেলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। বাংলা কথাশিল্পে তাঁর আসন নির্ণয় অবশ্যই আজ এ আলোচনার অভীষ্ঠ নয়, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের দীর্ঘপ্রসারিত 'ঘর-উঠান' থেকে তাঁর এই হঠাৎ প্রস্থানে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের পাশাপাশি তাঁর নিষ্ঠা ও সংযমের কথাটাও একবার স্মর্তব্য না করলে, সেটা বোধহয় হয়ে ওঠে এই মৃত শিল্পীর প্রতি খানিকটা অবিচার প্রদর্শনের নামান্তর। অবিচার, কেননা পাঠকের মন তিনি যোগাতে চান নি কখনই, চেয়েছিলেন তাকে জাগাতে; গদ্য সাহিত্যের বিপুল পণ্যসম্ভারের মধ্যে প্রবেশ ঘটেনি তাঁর মনভোলানো কোনো বয়স্ক শিশু পাঠ্যোপযোগী সুবৃহৎ পাচালী নিয়ে, হামেশা বেস্টসেলার'-এ স্থান প্রাপ্ত কোনো সুখপাঠ্য কাহিনী নিয়েও নয়, লিখেছিলেন 'বারো ঘর এক উঠোন' বা 'প্রেমের চেয়েও বড়' কিম্বা 'সূর্যমুখী' অথবা 'এই তার পুরস্কার' জাতীয় উপন্যাস, দাবী করেছিলেন তাঁর বিশিষ্টতা, 'গিরগিটি' বা 'গন্ধ মুষিক' কিম্বা 'মতি ডাক্তারের গল্প'-এর ছোট গল্পদিয়ে।

লিখতে শুরু করেছিলেন কিছুটা পিতার অনুপ্রেরণায় সেই ছাত্রজীবন থেকেই। শৈশবে ঝোঁক ছিল কবিতা লেখা, আবৃত্তি ও অভিনয়ের দিকে। কিন্তু মনঃপূত হোল না সেসব। পরবর্ত্তীতে সরিয়ে নিলেন নিজেকে। লিখলেন গল্প—উপন্যাস। প্রথম চাঞ্চল্যকর ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর জন্মস্থান ওপার বাংলার ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় সেই ১৯৩০ সালে। কলেজ জীবনে নিয়মিত লেখক ছিলেন ঐ 'বঙ্গবাণী' এবং 'সোনার বাংলা'পত্রিকার। এছাড়া কোলকাতার 'সংবাদ' ও 'আত্মশক্তি'তেও সেই সময় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর একাধিক লেখা। প্রকাশিত হয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'নবশক্তি' এবং নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত 'কলেজ ক্রনিকল'-এও। তারপর ১৯৩৬ সালে স্থায়ীভাবে কোলকাতায় এসে 'পরিচয়'-এ লিখলেন 'নদী ও নারী' যা রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সে যুগের বিদগ্ধ পাঠক মহলে। এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিয়মিতভাবে লিখেছেন 'দেশ' 'অমৃত' ও 'যুগান্তর' পত্রিকায়।

স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে গ্রেপ্তার ও কারাবরণ থেকে শুরু করে সাংবাদিকতা এবং বিচিত্র পেশা ও

ক্রিয়াকর্মে নিযুক্ত থেকে এবং শেষের দিকে প্রায় লেখার আয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে নিয়ত দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় জ্যোতিরিন্দ্র মানুষের জীবনটাকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে, ঘনিষ্ঠভাবে, ভেঙে চুরে, উল্টেপাল্টে। তিরিশ ও চল্লিশ দশকের মধ্যবর্তী সময়ের বাংলা গদ্য সাহিত্যে যাদের নাম সবার আগে আসা উচিত জ্যোতিরিন্দ্র নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম। জগদীশ গুপ্ত থেকে শুরু করে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের যে বিচিত্র ধারাটি চলে এসেছে তাকেই আরো এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। তাঁর প্রায় সমসাময়িক সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন মিত্র, সন্তোষ ঘোষ, সমরেশ বসু বা বিমল কর কিম্বা কল্লোল গোষ্ঠীর অন্যান্য লেখকদের পাশাপাশি তাঁর স্বাতন্ত্র্য বোধহয় এখানেই যে, নাগরিক গ্রামীণ বিচ্ছিন্নতাই চিত্রিত করেছেন তিনি তুলির নিপুণ টানে। একধারে তাঁর লেখা যেমন হয়ে উঠেছে মেট্রোপলিটন কালচার বিরুদ্ধ আলোছায়াহীন বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবন শূণ্যতার প্রতীক, তেমনি গ্রামীণ পটভূমিতেও ফুটে উঠেছে ভাঙনের এক ভয়াবহ দৃশ্য।

জীবনের অবক্ষয় এবং মৃত্যুর ব্যাভিচার মানুষকে নিয়ে যেতে পারে কোন্ অসহায়-পঙ্গু পরিণতির মধ্যে তারই অগ্নিদাহটিকে জ্যোতিরিন্দ্র যেন প্রত্যক্ষ করেছেন নিষ্করুণ ও নিষ্পালক দৃষ্টিতে এবং পরিশেষে ভস্মের অবশেষটুকুকেও রেহাই দেননি, দেখেছেন নেড়েচেড়ে, কোথাও আর এক কণা প্রাণবিন্দু থাকল কিনা, যে অগ্নিকুণ্ডে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় আমাদের প্রাগুক্ত কালের শুনে আসা সুন্দর সুকুমার কথা ও স্মৃতিগুলো। 'বারো ঘর এক উঠোন'-এ দেখিয়েছেন আজীবন শিক্ষাব্রতী পিতা Dignity of Labour শ্লোগানে কন্যাকে তুলে দিচ্ছে ম্যাসেজ ক্লিনিকে। পুত্রকে নিয়োগ করছে ঐ ক্লিনিকেরই দালালিতে। স্ত্রী বহুবল্লভা হয়ে উঠছে জেনেও স্বামী পরিণতিটাকে ধরে নিচ্ছে একান্ত স্বাভাবিক বলে। শিক্ষিতা সুন্দরী তরুণী পিতামাতার জ্ঞাত সারেই গৃহত্যাগ করছে উপপত্নী হিসাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য। অথবা 'সিদ্ধেশ্বরের মৃত্যু'র নায়ক সিদ্ধেশ্বর নামধারী এক অধ্যাপকের অতৃপ্ত বাসনা মুকুলিত হচ্ছে পুত্রবধূকে কেন্দ্র করে এবং উত্তরোত্তর তা সর্বব্যাপী এক আচ্ছন্নতায় এমনভাবে তার অণুপরমাণুতে ছড়িয়ে পড়ল যে পুত্রবধূর অন্বেষণে এক পতিতাপল্লীতে এসে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হল।

মাণিকের মতো তিনি রাজনীতি—সমাজনীতি সচেতন শিল্পী নন, বরং Introvert কিছুটা, বাস্তবদৃশ্য ছাড়িয়ে অন্তর্লোকে তাঁর উত্তরণ। তবু মনন ধর্মিতায়, জীবনের জটিলতায় শিল্প রূপায়ণে, ব্যক্তি মানুষের স্বভাব বিশ্লেষণে, ভাববিলাসের বিরুদ্ধতায় ও নির্মোহ বিজ্ঞান দৃষ্টির প্রতিষ্ঠায় তিনি মাণিকের মতোই নিপুণ শিল্পী। তাঁর চরিত্রেরা অন্তঃসন্ধানী, সমাজ থেকে বিশিষ্ট করে দেখতে চায় নিজেকে, অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক সম্পর্ক ও পরিবেশ থেকে সরে দাঁড়িয়ে মূল্যবোধকে যাচাই করে। শ্রেণীভুক্ত মানুষ অপেক্ষা স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্ব সম্পূর্ণতায় বিশিষ্ট মানুষদেরই যেন তিনি প্রত্যক্ষ করতে ও করাতে আগ্রহী বেশী। কাজেই তথাকথিত বাস্তববাদী লেখক তিনি নন, কিছু বেশী তার চেয়ে, কতকটা অন্তর্লোকে উন্মোচনকারী শিল্পী। এদিক থেকে তাঁর সঙ্গে কাফ্‌কা, সার্ত্রে বা স্টেইনবেকের সাদৃশ্য কিছুটা যেন পরিলক্ষিত হয়ে ওঠে।

আসলে সৃষ্টির আদিরহস্য নরনারীর দেহজ কামগত সম্পর্ক জ্যোতিরিন্দ্রের শিল্পী সত্তাকে তীব্রতম আকর্ষণে আসক্ত করেছে। কিন্তু কখনই সৌন্দর্যের সামগ্রিকতা বা ব্যক্তি নিরপেক্ষতাকে অতিক্রম করে নয়। প্রকৃতিকে

বাদ দিয়ে নারীর রূপ বর্ণনা অকল্পনীয় তাঁর কাছে। তাঁর শৈল্পিক চেতনায় নারীর শরীর ভোগের উপাদান নয় কখনই, সৌন্দর্যের আধার তারা। যে সৌন্দর্য দর্শনের কথা পাওয়া যায় তাঁর প্রায় সব গল্পেই, যে সৌন্দর্য সামগ্রিক, নিগূঢ় সম্পূর্ণ। অর্থাৎ প্রকৃতির পটভূমিতে অন্তর্লোকের উন্মোচনই তাঁর গল্পের বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে এবং যে কারণই তাঁর সৃষ্ট নরনারী নিসর্গ বিচ্ছিন্ন নয় একেবারে। অথচ তাঁর অনেক গল্পই যে আমাদের বাইরের সত্তাকে ভাবিয়ে বা চমকিত করে কিম্বা ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত করে প্রবেশ করতে পারে অন্তর্সত্তায়, 'সোনার চাঁদ,' 'গিরগিটি,' 'বনের রাজা' 'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা,' 'আলোর পাখী' 'শালিখ কি চড়ুই' বোধ হয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একটি কিশোর, বাচ্চা এক চাকর এবং একটি পেঁপে গাছ অথবা নির্জন কুয়োতলায় স্নানরতা এক যুবতী, একটি বৃদ্ধ আর কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্যপটেও যে গড়ে ওঠে গল্প 'চোর' ও 'গিরগিটি'ই তার প্রমাণ। কিন্তু সব জায়গাতেই যৌনবাসনা ছাপিয়ে ওঠে এক সৌন্দর্য দৃষ্টি। আবার জগদীশ-মাণিকের মত তিনি যে জটিলতাকে শিল্পরূপ দিতে ভালোবাসেন 'ঝড়' উপন্যাসে চারটি নরনারীর চরিত্রচিত্রণে তার প্রমাণ মেলে, 'নিশ্চিন্দিপুরের মানুষ' ও 'প্রেমের চেয়ে বড়, এই দুই উপন্যাসে তাঁর শিল্প সামর্থ কি নিপুণভাবে প্রজ্জ্বলিত অথচ স্বতন্ত্র দুই প্রধান চরিত্র, দুজনের আশ্রয়হীনতার মধ্যে ব্যবধান কি দুস্তর। 'নিশ্চিন্দিপুরের মানুষ'-এ শিয়ালদা স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম থেকে তুলে নেওয়া উদ্বাস্তু মেয়েটি বহু লাঞ্ছনা-দুর্দশার পথ পেরিয়ে নিশ্চিন্দিপুরের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে পৌঁছল আর 'প্রেমের চেয়ে বড়'-এ জেল খাটা আসামী লর্ড সামাজিক—পারিবারিক ও ব্যক্তিগত প্রেমের অভিজ্ঞতা পেরিয়ে উপনীত হোল সাংসারিক ইতরতা-স্থূলতা বঞ্চিত এক শান্ত সৌন্দর্যের জগতে। এই হোল জ্যোতিরিন্দ্রের জীবনদর্শন বা বিশ্ববীক্ষা।

প্রশ্ন ওঠে কি পেলাম আমরা তাঁর কাছ থেকে? চূড়ান্ত সমীক্ষায় আমাদের লাভবান হবার সম্ভাবনা কি আছে কিছু? সমাজতাত্ত্বিকেরা হয়ত বলবেন যে, নিঃসঙ্গতা বা বিচ্ছিন্নতা বিষাদময়তা ঘিরে আছে তাঁর গোটা কর্মকাণ্ডকে, এক বিবিক্ততার সাধনা আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাঁকে; বলবেন, এ বিবিক্ততা জীবনোপলব্ধির কোনো অনিবার্য আকর্ষণে উদ্ভূত নয়, বক্তব্যের শূন্যতাকে আচ্ছন্ন করার জন্যই এর জন্ম। মানবিক ও সামাজিক এই মূল্যহীনতা বা বিচ্ছিন্নতা জাতীয় Anguish থেকে পরিত্রাণের জন্য কয়েরবাখ, মার্কস, সার্ত্র প্রমুখেরা ব্যক্তির যে দায়িত্বের কথা বলেছিলেন তাকে তিনি স্বীকার করলেন না। ফলে কোনো উত্তরণ নেই তাঁর লেখায়, তারা যেন Value free art হয়ে উঠেছে।

কিন্তু আমরা তাঁকে জীবনশিল্পীই বলব। জীবনের গভীর থেকে গভীরতর সত্যানুসন্ধানী তিনি। হয়ত সমসময় তাঁর সৃজনশীল সত্তাকে কেবল ছুঁয়ে গেছে, মুখ্যত সামাজিক সমস্যাগুলো তাঁর ভিতরে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, তবু পরিপার্শ্বের এমন রসদ তিনি সংগ্রহ করেছেন যাতে সমকালীনতার একটা স্বাক্ষর থেকেই যায়। দার্শনিক দৃষ্টির অধিকারী সমাজ প্রবক্তা তিনি নন, দ্রষ্টা মাত্র। তাই অপরাজেয় মানুষের আদিমতা নিয়ে প্রকৃতিই তাঁর কাছে বারেবারে এসেছে ঘুরেফিরে যা অংশতই শঙ্কিত করে আমাদের, তুচ্ছ করে দেয় দৈনন্দিনের সমস্ত আশা-আকাঙ্খা। কাজেই দীর্ঘ সাহিত্য সাধনার পরিসরে একটি সংবাদপত্র গোষ্ঠীর পুরস্কার এবং একটি মাত্র উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণ ছাড়া আর কোনো স্বীকৃতিই যার আপাতদৃশ্য লাভের ঘরে জমা পড়েনি সেই বিরল দৃষ্টান্ত প্রতিভা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নিষ্ঠাও সংযমই আজ ভাবীকালের পাঠকের হয়ে তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারে তাঁরই কয়েকটি কথা 'এই তার পুরস্কার।'

গোধূলি-মন/ভাদ্র/১৩৮৯/সপ্তম

সংবাদ

"কবিকণ্ঠ" কর্তৃক সৈয়দ আলী আহসানকে সম্বর্ধনা :

"কবিকণ্ঠ" কবি সৈয়দ আলী আহসানের ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে ৬ই জুন রোববার বিকালে ঢাকায় একটি হোটেলে সম্বর্ধনার আয়োজন করে। কবির নিজের ভাষায় 'অনেক রাতে গাছের পাতায় বৃষ্টির শব্দের মত গুরু গম্ভীর' পরিবেশে এ সম্বর্ধনার জবাবে সৈয়দ আলী আহসান কবিতায় অনুজ কবিদের নিজস্ব ভুবন নির্মাণের স্বাতন্ত্র্যে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন, বর্তমান তরুণ কবিদের কবিতায় একটি তাৎপর্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এখানে আমার নিজেরই সার্থকতা। আমরা যে ধারায় বিচরণ করিয়াছি আজকের তরুণ কবিরাও সেই অব্যাহত রাখিয়াছেন।

হোটেলের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, দৈনিক বাংলাদেশ অবজারভারের সম্পাদক জনাব ওবায়দুল হক। প্রবন্ধ পাঠ করেন, আলাউদ্দিন আল-আজাদ, আল মাহমুদ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ। বক্তৃতা করেন, ডঃ মুহম্মদ মনিরুজ্জামান ও ফজল শাহাবুদ্দিন। আলোচনা করেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দীকী, অধ্যাপক মোস্তফা নুরুল ইসলাম, কবি তালিম হোসেন ও অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। কবির কবিতা আবৃত্তি করেন, ক্যামিলিয়া মোস্তফা ও মুজিবুর রহমান খান। কবিকে নিবেদিত করে কবিতা পাঠ করেন, মুহাম্মদ জানিরুজ্জামান, ত্রিদিব দস্তিদার ও ডঃ করিম সাসারীব (ফরাসী)।

অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সৈয়দ আলী আহসানকে একাধারে কবি ও সমালোচক বলিয়া উল্লেখ করেন। চিন্তায় শব্দে তিনি এক নিজস্ব পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন। জনাব ওবায়দুল হক ও অধ্যাপক নূরুল ইসলাম মন্তব্য করে করেন, আমাদের দেশে জীবদ্দশায় গুণিজনের স্বীকৃতি বিরল ঘটনা।

সংবাদদাতা : জাহির আহমদ খান

ঢাকায় প্যালেস্টাইনী কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান :

বাংলাদেশ আফ্রো-এশীয় লেখক ইউনিয়নের উদ্যোগে গত ১৩ই জুলাই (মঙ্গলবার) বিকালে বাংলা একাডেমী মিলনায়তনে প্যালেস্টাইনী কবিতা পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। প্যালেস্টাইনী মুক্তিপ্রেমী ও সংগ্রামরত জনগণের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে কবিতা পাঠের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ আফ্রো এশীয় লেখক ইউনিয়নের সভাপতি অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ পি এল ও'র (প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা) প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ কিওয়ান বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে প্যালেস্টাইনী কবিদের অনূদিত কবিতা পাঠ করেন বেলাল চৌধুরী, মহম্মদ রফিক, আসাদ চৌধুরী, রবিউল হোসেন, হায়াত মাহমুদ, আবদুল্লাহ্ আব্বাস, (পি এল ও সদস্য) তানভীর মোকাম্মেল, মোহবার হাসান, হাসান ফেরদৌস, মুজাহিদ শরীফ, আক্তার হোসেন, মেহেদী আল-আমিন প্রমুখ।

সংবাদদাতা : জাহির আহমদ খান

△ জেলা তথ্য দপ্তরের রবীন্দ্র জয়ন্তী

বিগত ৬ই আগষ্ট চুঁচুড়ার রবীন্দ্রভবনে রবীন্দ্র সন্ধ্যার আয়োজন করেছিলেন জেলা তথ্য দপ্তর। রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন দুই প্রখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ও স্বপন গুপ্ত। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন প্রদীপ ঘোষ ও ডঃ প্রমোদ মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র ভারতী শিশু বিদ্যালয়ের হুগলীর ছাত্রছাত্রীরা 'বর্ষামঙ্গল' নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। ছোটখাট কয়েকটি ত্রুটি (আলোক সম্পাৎ প্রভৃতি) ভিন্ন অনুষ্ঠানটি সুন্দর হয়েছে।

△ অগ্রঃ তৃণাঙ্কুর সংবাদ

২৪ পরগণার শ্যামনগরের সাহিত্য পত্র 'তৃণাঙ্কুর' দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর আবার আগামী পূজাসংখ্যা থেকে নিয়মিত প্রকাশের তোড়জোড় চলছে। তাছাড়া আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর শ্যামনগরের ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগারে গল্পমেলা ও ১৯শে কবিসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। দু'দিনই বেলা ১টা থেকে শুরু হবে অনুষ্ঠান।

△ গল্পমেলা—৭

গোধূলি-মন সম্পাদকের বাড়ীতে ৮ই আগষ্ট অনুষ্ঠিত হোল গল্পমেলা ৭। গল্প পড়লেন—কৃষ্ণা বসু, সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য, গৌর বৈরাগী ও দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়। পঠিত গল্পগুলির উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেন—গৌরাঙ্গদেব চক্রবর্ত্তী, উশীনর চট্টোপাধ্যায়, অমল দাস, আশীষ ভট্টাচার্য ও অশোক চট্টোপাধ্যায়

MEMBER, All India Small & Medium News Paper Association, Delhi.
GODHULIMONE N. P. Regd. No. RN 27214/75 August '82
Vol. 24. No. 8 Postal Regd. No. Hys—14 Price Rupee One only

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পপুলার প্রিন্টার্স বারাসত, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও নতুনপাড়া, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি মন

২৪ বর্ষ/৯ম-১০ম সংখ্যা/আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩৮৯

॥ সম্পাদকীয় ॥

এবারের পূজো নিয়ে খুব হৈ-হৈ হয়ে গেল। কোন্ সরকার কোন্ পঞ্জিকার মতকে মানবেন, তাই নিয়ে অনেকদিন ধরেই জল ঘোলা হোল। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য কেন্দ্রিয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার উভয়েই গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার শর্তকেই প্রাধান্য দিয়েছেন—অর্থাৎ অক্টোবরেই পূজো। ১৬ই আগষ্ট থেকে যদিও আমাদের পূজাসংখ্যার ছাপার কাজ শুরু হয়েছিল। তবু ভয় ছিল সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি পূজা হলে—শেষ পর্য্যন্ত একটা সুন্দর পূজাসংখ্যা পাঠককে উপহার দিতে পারবো কিনা। আর দুই সরকার দুই পঞ্জিকার মতানুসারে আলাদা দু'মাসে পূজো নির্দিষ্ট করলে, সেইভাবেই তাঁদের বিজ্ঞাপন নীতিও স্থির করতেন। আর সেক্ষেত্রে আমরাও হয়তো 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারী পূজা সংখ্যা' এবং 'গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা মতানুসারী পূজাসংখ্যা' হিসাবে দু'টি পূজাসংখ্যা প্রকাশ করতাম। অবশ্যই সে ক্ষেত্রে পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা ভাগাভাগি হয়ে বর্ত্তমান পূজাসংখ্যার অর্ধেক হয়ে দাঁড়াতো। আগেই বলেছি দুই সরকারই শেষমেষ একই সময়ে পূজার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাই আমাদের প্রিয় পাঠকদের হাতে সাধারণ সংখ্যার প্রায় চারগুণ আয়তনে বড় এই সংখ্যা তুলে দেওয়া সম্ভব হোল।

○ সম্পাদকীয় কার্য্যালয় : নতুনপাড়া । চন্দননগর । হুগলী
পশ্চিমবঙ্গ । ভারত

○ কলিকাতা কেন্দ্র : ৩৩/৬ জি বাজিয়ালেন,
কলিকাতা ৭০০০২৩

সূচীপত্র

৩টি প্রবন্ধ :

৮টি ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের গল্প :

১টি ফিচারধর্মী রচনা :

কবিতা :

১টি আলোচনা

শিল্পী : সুবোধ দাশগুপ্ত

দুর্গা পূজার প্রাচীনত্ব

ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

বাঙালী হিন্দুর সর্বপ্রধান জাতীয় উৎসব দুর্গোৎসব। পূজার মাসাধিক পূর্ব থেকে গৃহে [illegible] চলে প্রস্তুতি পর্ব। দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে চারদিন যে আনন্দের প্লাবন বয়ে যায় বাংলাদেশে তার তুলনা মেলে না। ভিক্ষুকের কণ্ঠের আগমনী গানে মাতৃ আবাহন, ও বিজয়ার গানে মাতৃবিরহের [illegible] [illegible] আন্দোলিত করে বঙ্গবাসীর চিত্তকে। এই যে সার্বজনীন উৎসব, এর ইতিহাস জানতে [illegible] হয় কৌতূহলী মন? এই পূজা কত দিনের, কত প্রাচীন তা জানার আকাঙ্খা অনেকেরই মনে। কিন্তু [illegible] উত্তর দেওয়া কি সম্ভব?

দুর্গাপূজা আজ যেমন পাড়ায় পাড়ায় বারোয়ারীতে, পঁচাত্তর বছর আগে তা ছিল না। তখন দুর্গাপূজা হোত ধনী ও জমিদার বাড়ীতে। ধনীর আনন্দের অংশ নিত ছোট বড় সকল মানুষ। দুর্গাপূজা ছিল ব্যয়বহুল,—অশ্বমেধ যজ্ঞের সঙ্গে তুলনা করা হোত। প্রসিদ্ধি আছে যে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গে তাহিরপুরের জমিদার রাজা কংসনারায়ণ সাড়ম্বরে লক্ষাধিক অর্থব্যয়ে প্রথম আধুনিক রীতিতে লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ সহ দুর্গাপূজা করেছিলেন। তৎপরে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র অনুরূপ আড়ম্বর সহকারে দুর্গাপূজা করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে আধুনিক প্রথায় দুর্গাপূজা হয়ত প্রবর্তিত হতেও পারে। কিন্তু মহিষাসুর মর্দিনী দুর্গাপূজার একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে।

অনেকে মনে করেন মোহেন্-জো-দাড়োতে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র নারীমূর্তিগুলি এবং উদ্ভিদ্‌গাত্র নারীমূর্তিটি প্রাগৈতিহাসিক মাতৃপূজা বা শক্তিপূজার নিদর্শন। কিন্তু এ অনুমান মাত্র, কোন নিশ্চিত তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত নয়। অনেকের ধারণা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে দেবীসূক্তই শক্তিপূজার মূল। দেবী সূক্তে অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ [illegible] আত্মোপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেছেন। পুরুকুৎস বামদেব প্রভৃতি ঋষিগণও অনুরূপভাবে আত্মোপলব্ধির আনন্দে আনন্দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে একাত্মতার কথা ঘোষণা করেছেন। সুতরাং দেবীসূক্তকে শক্তিপূজার উৎস মনে করার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দুর্গ মধ্যে অপরাজিতার মূর্তি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। অপরাজিতা দুর্গার নামান্তর। কিন্তু অপরাজিতার আকার প্রকারের কোন বিবরণ অর্থশাস্ত্রে না থাকায় অপরাজিতা সম্পর্কে কিছুই বলা সম্ভব নয়: কেবলমাত্র অনুমান করা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতে শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল। কুষণ সম্রাট হুবিষ্কের (খ্রীঃ ১ম শতাব্দী) একটি মুদ্রায় একটি নারীমূর্তি ও একটি পুরুষমূর্তি নীচে OESO এবং NANA লিখিত আছে। OESO অবশ্য ভবেশ বা শিব এবং NANA উমা বা পার্বতী। মূর্তি দুটি হরপার্বতী পূজার ইঙ্গিত বহন করলেও মহিষাসুরমর্দিনী সিংহবাহিনী দশভুজা দুর্গার সঙ্গে [illegible] নেই। পাঞ্জাব মিউজিয়মের মুদ্রা তালিকায় একটি পদ্ম ও বজ্র হস্তে দেবীমূর্তি এবং কানিংহামের মুদ্রা তালিকায় একটি অনুরূপ দেবীমূর্তির নিম্নে খোদিত নামটি Rapson-এর মতে OMMO বা উমা। কুষণ ও গুপ্ত যুগের মুদ্রায় লক্ষ্মী পদ্ম ও রত্নভাণ্ড হস্তে উপবিষ্টা। উল্লিখিত দেবীমূর্তি দুটি যদি উমা হন তাহলে [illegible] সাদৃশ্য

উমার মূর্তি পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করা যায় না। এই দুটি মুদ্রা থেকে অনুমান করা যায় যে দশভুজা দুর্গার পরিকল্পনা খ্রীঃ প্রথম শতাব্দীতে হয়নি। ভারহুত স্তূপে (খ্রীঃ ১ম শতাব্দী) লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্তি অংকিত আছে। কিন্তু দুর্গার মূর্তি নেই।

সিংহবাহিনী দেবীমূর্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কুষাণ যুগেই। কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক ও হুবিষ্কের মুদ্রায় সিংহবাহিনী লক্ষ্মীর মূর্তি অংকিত আছে। মূর্তির নীচে লেখা আছে OMMO বা উমা। সিংহবাহিনী উমার এই প্রথম সাক্ষাৎ পাই। কেনোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যারূপিনী যে উমার সাক্ষাৎ পাই, তাঁর কোন আকৃতির বর্ণনা নেই। গুপ্ত সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের এবং সমুদ্রগুপ্তের সিংহবধকারী রাজার মূর্তি অংকিত (Lion Slayer Type) স্বর্ণ মুদ্রার বিপরীত দিকে সিংহবাহিনী লক্ষ্মীর মূর্তি অংকিত আছে। ডঃ আলতেকর এই মূর্তিগুলিকে সিংহবাহিনী দুর্গার মূর্তি বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। তিনি মনে করেন, গুপ্তরাজারা কুষাণমুদ্রা থেকে দেবীমূর্তিটি গ্রহণ করেছেন এবং সম্ভবত সিংহবাহিনী দুর্গা লিচ্ছবিদের উপাস্য ছিলেন। লিচ্ছবিদের সঙ্গে গুপ্তরাজাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। গুপ্তরাজাদের মুদ্রায় সিংহবাহিনী দেবী যদি উমা হন তবে গুপ্তরাজাদের রাজত্বের প্রথম ভাগে উমা-দুর্গা মূর্তি লক্ষ্মীমূর্তির আদর্শে নির্মিত হয়েছে, এ সত্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যজুর্বেদে রুদ্রের ধ্বংস কার্যের সহায়িকা রুদ্রস্বসা অম্বিকার উল্লেখ বারংবার পাই। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত নারায়ণোপনিষদে অগ্নিবর্ণা দুর্গার নাম পাই। বৈদিকযুগের শেষ ভাগেই রুদ্রাণী-দুর্গা-উমার আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু দেবীর রূপ কল্পিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। মহাভারতে অনুশাসন পর্বে শিবজায়া শৈলসুতা উমা দ্বিভুজা মানবীয় আকৃতি বিশিষ্টা। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডী গোটা মূর্তি ধারণ করেছিলেন। চতুর্ভুজা গোধা বাহিনী চণ্ডীমূর্তি অনেক পাওয়া গেছে।

মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা মূর্তির পরিকল্পনা গুপ্তযুগেই হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশে ভিলসার নিকটবর্তী উদয়গিরির বরাহগুহায় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী ১ম বা ২য় বৎসরে নির্মিত দ্বাদশভুজা মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এটিই দেবীর প্রাচীনতম মূর্তি। আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায়ের মতে মার্কণ্ডেয় পুরাণ বিন্ধ্য অঞ্চলে খ্রীঃ ৫ম শতাব্দীতে রচিত এবং দুর্গা পূজার প্রবর্তক সুরথ রাজা কোল দেশের অধীশ্বর ছিলেন।

দুর্গা-মহিষমর্দিনীর মূর্তি কল্পনা পঞ্চম শতাব্দীতে হলেও দুর্গাপূজা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল খ্রীঃ ১৪ শতাব্দীতে। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি (খ্রী. ১৫শ শতাব্দী) দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী নামে দুর্গাপূজা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। জীমূতবাহন (১২শ শতাব্দী) শূলপাণি (১২শ শতাব্দী) ও ভট্ট ভবদেব (১১শ শতাব্দী) দুর্গাপূজা পদ্ধতি রচনা করেছিলেন। ১৬শ শতাব্দীতে রঘুনন্দন দুর্গোৎসবতত্ত্ব রচনা করেছিলেন। সুতরাং মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার পূজা বাঙালা দেশে খ্রীঃ একাদশ দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই প্রচলিত হয়েছে এবং জনপ্রিয় হয়েছে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে। বিদ্যাদেবী সরস্বতী, ধনসম্পদের দেবী লক্ষ্মী। সিদ্ধিদাতা গণেশ ও দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে মহিষমর্দিনী দুর্গার সঙ্গে সংযুক্ত করে জগজ্জননীর পুত্রকন্যারূপে বাঙালীর গৃহে তিনদিনের অতিথি হয়ে পূজা পাচ্ছেন। আগে যিনি ছিলেন ধনীর পূজামণ্ডপে বন্দিনী তিনি এখন সর্বসাধারণের মধ্যে সার্বজনীন পূজামণ্ডপে।

অসুখী শহর/কৃষ্ণ ধর

একটা শহরের জন্য লক্ষ লক্ষ শব্দ
খরচ হয়ে গেছে
অথচ তার সব কথার অর্থ বুঝতেই পারিনি
শহরময় স্বার্থপর দৈত্যের বাগানবাড়ী
তার ভেতরে ঢোকার দরজায় কারা যেন তালা লাগিয়ে দিয়েছে ।
তবু এই শহরের হাতছানি নদীজল পাহাড়ের
চমক ভেঙেছে বারবার ।

তার ভেতরে ভেতরে চিরকাল রেনেসাঁস নিজেকে গড়েছে ভেঙেছে
যদিও মুৎসুদ্দি বেনিয়া এসে বড় বাজারের অলিতে গলিতে
ব্যবসাও প্রচুর করেছে লাখপতি কোটিপতি হবার ফিকিরে ।
তাতেও শহরটাকে ফুসলানো যায়নি
তার কাছে অন্য এক সরলতা প্রণয়ের আবেদন চিরকাল ছিল ।

এখন সে বড়ই অসুখী
তার শরীরের সব কিছু খুঁটিনাটি পরীক্ষা হয়ে গেছে
রমণীর নিজস্ব অসুখের ঠিকানা মেলেনি ।

আপাতত তার ঠিক বুকের কাছটিতে আমি
এক সুরভিলতার চারা লাগিয়ে রেখেছি
আগামী বসন্তে তাতে ফুল ফুটবে তুমি দেখে নিও ।

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ভাস্কর্য্য : ঝাঁপ

রাত জাগা পাখী/অশোক চট্টোপাধ্যায়

চোখের পাতায় ঘুম নামে
ঘুম নামে
নারকেল ঝরোকা-ফাঁকে
ক্লান্ত চাঁদের।

শুধু তার চোখে ঘুম নেই ;
সে শুধু দেখতে থাকে
এণ্টেনা ছুঁয়ে ছুঁয়ে
পেঁচকের ওড়া।
তরল সোনালী সোনা
পেয়ারা পাতায় আঁকে
জাফরীর ছক।

তবে তাই হোক/গৌরাঙ্গ ভৌমিক

এতদিন এত দেখাদেখি হল, ভুল ?

চোখ এঁকে দিতে চাও, দাও নির্ভুল,
পুনরায় দেখাদেখি শুরু হোক।

ভুল চোখে দেখা মানুষেরও তুমি একজন।

দেখি ঠিক চোখে তোমাকে আবার দেখে
লাগে কিনা সেরকম ?

নিজের আঁকা ছুইবোর সহ পিকাসো শিল্পী : দিলীপ কুণ্ডু

ছড়া/সনৎ মান্না

ছবি/অমল চক্রবর্তী

অবাক হয়ে দেখছি চেয়ে রাজীবলোচন গান্ধীকে,
টিকারে জ্যোতি জ্বলছে যেন ইন্দিরাজীর ডান দিকে।
সবার ঘরে ঢুকছে আলো ছাদের ফুটো টিন দিয়া,
আলোয় আলোয় যাচ্ছে ভেসে সবার রাণী ইনডিয়া।
হজ্জা পেতে দেখছি সবাই চাঁদের বুড়ী ঠানদিকে

খুন ডাকাতি নারীধর্ষণ
চাপা পড়ছে ধামা,
পুলিশ আমার মাসতুতো ভাই
মন্ত্রী আমার মামা।

গিন্নী বাঁধেন এ্যাটম খোঁপা
মাথার চুলে ফাঁপানো,
দেখলে ভীষণ ঘাবড়ে যাবেন
চীন রাশিয়া জাপানও।

ধুমধাড়াক্কা সবাই কবি, আসল কবি নগণ্য
কুটকচালে সত্যি কথা শুনতে লাগে জঘন্য।
অনেক দাদা, অনেক গুরু, পালন করেন দায়িত্ব.
হুলুসথুলুস দাপিয়ে বেড়ান বাংলা দেশের সাহিত্য।
চামচা চেলায় পরিবৃত আজকে তারাই অনন্য।

ঢাকায়—ইতিহাস সম্মেলনে

বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১৯৪৭ আর ১৯৭৩-এর মে, দু'টির মধ্যে ব্যবধান ২৬ বছর। ব্যবধান ১০ বছর বয়স থেকে ৩৬ বছর বয়স। কৈশোরের সেই দেশ ভাগ পড়ে বৈকি! সে স্মৃতি ভাল-মন্দ'র সমাহার, আনন্দ-বেদনায় ভরপুর। সময় গড়িয়ে চলে, বয়স বাড়ে। এই দেশ ও তার মানুষ সম্পর্কে সার্বিক জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা জাগে। জাগে আমার পূর্বসূরীর অতীত তৎপরতার বিবরণ জানার আকাঙ্ক্ষা। তাই অনুশীলন করি মানুষের ইতিহাস। বিশেষ করে বঙ্গ-জনের। ওপার বাংলার নব-আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্য'র খবর কানে আসে মাঝে মাঝে। তদ্বিষয়ে বিশদ তথ্য সংগ্রহে মন হয় আকুল। কিন্তু রাজনৈতিক জগৎ হয়ে দাঁড়ায় এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। তারপর সময় আরও হয় নিকটবর্তী। বাংলা-ভাষা'র মর্যাদা রক্ষা'র আন্দোলন থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের উত্তরণ—সে পর্যায়ও অতীত হয়। নতুন আশা মনে জাগে, সুযোগ বোধ হয় এবার পাবো।

সেই সুযোগ-ই অপ্রত্যাশিত ভাবে আসে '৭৩-এর মার্চ-মাসে 'বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের' সম্পাদক আব্দুল আলিম মহাশয়ের আমন্ত্রণ-ক্রমে। উপলক্ষ্য—ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য তৃতীয় বার্ষিক ইতিহাস-সম্মেলন। চলবে ১২ থেকে ১৪ই মে '৭৩ পর্যন্ত। তারপর পাশপোর্ট, ভিসা হতে আরম্ভ করে কর্মক্ষেত্র থেকে ছুটি নেওয়া পর্যন্ত ঘটনা দ্রুততায় সমাধা হয়।

১০ই মে যখন পূর্বাহ্নে বৃক্ষচ্ছায়া-সমন্বিত যশোর রোড, ধরে পেট্রাপোল অতিক্রম করে বেনাপোলে প্রবেশ করি—সে এক বিচিত্র অনুভূতি! যেদিকে চোখ যায়—দৃশ্যমান সব কিছুকে যেন স্থায়ীভাবে মনে গেঁথে নিতে চেষ্টা করি। আমার জন্মস্থান থেকে আজ ২৬ বছর এই বর্তমানের বাংলাদেশের সীমান্ত, যা কিনা বন্দুকের গুলির আওতার মধ্যে—আমার কাছে ছিল অপরিচিত! অপরাহ্ন তথা রাত্রি যশোরে অতিবাহিত করে ১১-ই মে ন'টার মধ্যেই যশোর-বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত। বিশ মিনিট বিলম্বে ৪০টি আসনযুক্ত বিমানে প্রথম আরোহণ আর বিশ মিনিটের যাত্রা শেষে বাংলা দেশের হৃৎপিণ্ড ঢাকায় অবতরণ। এই স্বল্প সময়ের যাত্রাপথে জানালার ধারে বসা যাত্রীর দৈত্য-সদৃশ কালো মেঘের মধ্য দিয়ে উড়ে যাওয়া বিমানের বারে বারে ওঠা-নামার দৃশ্য দর্শন অবশ্যই সুখপ্রদ নয়।

এই বাংলাদেশ ভারত ইতিহাসে সুপরিচিত "বঙ্গ" নামেই। নামটি এক নৃগোষ্ঠীর পরিচায়ক। বঙ্গ-আল অর্থাৎ বঙ্গবৎ 'এমন একটি দেশ যেখানে বঙ্গ'রা বাস করে। দ্বাদশ শতকে সাধারণতঃ 'বঙ্গ' বলতে পূর্ববঙ্গকেই বুঝাত। কেশব সেনের ইদিলপুর তাম্র-লিপিতে এবং বিশ্বরূপ সেনের মদনপাড়া তাম্র-লিপিতে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলকে এই 'বঙ্গে'র অধীন বলা হয়েছে। প্রাচীনকালে ভৌগলিক সীমা ছিল খুবই স্থিতিশীল। ক্রমাগত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনা প্রবাহের চাপে সেই সীমা আবার সর্বদা পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই অঞ্চলের অন্যান্য সামগ্রিক ভৌগলিক নাম যখন ব্যাপক অনুসন্ধান ও অনুশীলনের বিষয়—তখন সব বাধা অতিক্রম করে "বঙ্গ" নামটি আদিম নৃগোষ্ঠীর পরিচয়কে সার্বিকরূপে এক বৃহত্তর ভূভাগে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই প্রথমে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপীয় অঞ্চলকে

"বাঙালা" নাম দিয়েছে যা বিহারের তেলিয়াগড়ি থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরকালে রাজনৈতিক স্থিরতার সূত্রে এর সীমা আরও পূর্বদিকে বিস্তৃত হয়েছে। এমন কি, বিহার ও উড়িষ্যার কিয়দংশও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমি পশ্চিমবঙ্গ-বাসী, কিন্তু স্বাধীন ভারত-বাসী রূপেই আমার পরিচয়। তাই স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের রাজধানীতে প্রথম পদার্পণ চেতনাকে আন্দোলিত করবে বৈকি।

বেলা এগারটার মধ্যেই রিক্সার বিমানঘাঁটি থেকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবৃহৎ কলাভবনের ৩০১৪ নম্বর ঘরে আমি উপস্থিত। পরিচয় দেওয়ার সাথে সাথে প্রথমেই আব্দুল আলিমের উষ্ণ আলিঙ্গন এই অধিবেশনের আন্তরিকতাকে প্রকাশ করলো। কলাভবনের একটু পশ্চাতে বিশ্ববিদ্যালয়েরই সুবৃহৎ 'ইন্টারন্যাশন্যাল' হোস্টেলের' একতলে'র ১০৮ নম্বর ঘরে অবস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। দু'টি পুরু গদীযুক্ত বিছানা, শুভ্র বস্ত্রখণ্ডে আবৃত। মাথায় পাখা, ঘর-সংলগ্ন পায়খানা যুক্ত স্নানাগার। ঘরে প্রবেশের পাঁচমিনিটের মধ্যেই প্রথমেই খোঁজখবর করে গেলেন বর্ষীয়ান যুবক সদৃশ বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্। ভারতীয়দের মধ্যে আমিই সর্বাগ্রে পৌঁছেছি। স্নানান্তে কিছু খেয়ে ইতিহাস পরিষদের কার্যালয় ঘুরে এসে দেখি—বিশ্বভারতীর অধ্যাপক মোহন চক্রবর্তী এলেন। আমার ঘরেও নিয়ে নিলাম। ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধুর ছেলে শেখ কামাল-ও এসে দেখা করে গেলেন। তারপরে আর আমাদের অবস্থানকালে সাক্ষাৎ হয়নি। রাজনৈতিক জীবনের খ্যাতি স্বাভাবিকভাবে চলাফেরাকে এইভাবেই নিয়ন্ত্রিত করে বটে!

অপরাহ্ন দেড়টাতে 'ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তন'-এ মধ্যাহ্ন-ভোজ। অপূর্ব সুন্দর অট্টালিকা। ভোজন কক্ষের চারিপাশে জাল দিয়ে ঘেরা। বৃষ্টির মুহূর্তে তার মধ্য দিয়ে বাইরের দৃশ্য বেশ একটা আমেজ সৃষ্টি করেছে। সন্ধ্যার বেশ কিছুক্ষণ পূর্বে স্থানীয় ব্যক্তির সহায়তায় গেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের আবাসে। মোহনবাবু ইতিহাসের অধ্যাপক, পড়ান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়। কিন্তু ঢাকায় অবস্থানকালে প্রধান লক্ষ্য হল সাহিত্যিক ও কবিদের সাথে পরিচিত হওয়া; আর মুক্তিসেনাদের কাছে তথ্যনিষ্ঠ সংগ্রামের কাহিনী শোনা। তিনি নজরুল ইসলামের বিপ্লবাত্মক কবিতার ঐতিহাসিক ভূমিকার ওপর এক প্রবন্ধ পড়বেন। তাই বাংলাদেশে নজরুল—সম্পর্কীয় শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ রফিকুল ইসলামের কাছে জানতে এবং নিজের কত তথ্য যাচাই করতে চান—'কারার ঐ লৌহকপাট'—নামক সুবিখ্যাত কবিতার প্রথম প্রকাশ বিষয়ে। তিনি জানালেন গ্রামোফোন রেকর্ডেই প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বভাবতই আলোচনা কেন্দ্রীভূত হল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ে। রফিকুলের ভাই-ও উপস্থিত। তিনি নিক্সইয়র্কে কিভাবে সংগ্রামের সাফল্যতায় ভিন্ন তৎপরতা দেখিয়েছেন, তাও শোনা হল।

রাতেই দেখা গেল বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় প্রাচীনলিপিতত্ত্ব বিশারদ ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, বাংলাদেশের প্রাচীন লিপিতত্ত্ববিদ্ কমলাকান্ত গুপ্ত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ডঃ অমলেন্দু দে প্রমুখের সাথে। ইতিহাস পরিষদের তরফ থেকে সুদৃশ্য রেক্সিনের ব্যাগের ভিতরে অধিবেশনের সূচী, ঢাকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-পুস্তিকা ইত্যাদি দেওয়া হল। প্রচণ্ড বর্ষণ ও ঝড়ের ফলে সামগ্রিকভাবে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছিন্ন হলে মোমবাতি সরবরাহের ক্রততা-সহ স্বাধীন জাতির নিয়মানুবর্তিতাকে যেভাবে প্রকাশ করলো তার মধ্যেই এই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব প্রচ্ছন্ন।

বর্ষণ মুখর রাত। চোখে ঘুম নেই, অতএব ঢাকার অতীতকে একবার রোমন্থন করি। বঙ্গ-ইতিহাসের কোন্ অজ্ঞাত পর্বে যে এতদঞ্চলে মানুষের জনবসতি গড়ে উঠেছে, তার ইতিবৃত্ত আমাদের আজও অজ্ঞাত। তবে সাভার, ধামরাই, সুয়াপুর প্রমুখ প্রান্তের প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রাক্-ইসলাম পর্বেই সমৃদ্ধ জনপদের অস্তিত্বকে প্রকাশ করছে। ঢাকা নগরীর অবস্থিতিও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ব্রহ্মপুত্র ও বুড়িগঙ্গার মিলিত জলপ্রবাহ উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এবং মেঘনার প্রবাহ উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে যে ত্রিভুজাকৃতি রূপকে প্রকাশ করেছে তার নীচে এই ঢাকার অবস্থান। বাংলাদেশের এই হৃৎপিণ্ডে বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্থান-পতন হয়েছে। পাল-পর্বে এর নিকটবর্তী বিক্রমপুর ছিল বিদ্যার্জনের এক সমৃদ্ধশালী কেন্দ্র এবং সাভার ছিল বৌদ্ধ সংস্কৃতির এক পীঠস্থান। শেষোক্ত স্থানেই তিব্বত-যাত্রার আগে সুবিখ্যাত বৌদ্ধ-পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান শিক্ষালাভ করেছিলেন। সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতকের সপ্তম দশকে দিল্লীর শাসক তুঘ্রিল খানের গৌড় থেকে আরও পূর্বদিকে অভিযানের সময়েই ঢাকা সর্বপ্রথম মুসলমানদের অধিকারে এসেছে। আর ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অর্থাৎ বঙ্গের প্রথম স্বাধীন মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপয়িতা সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ'র আমলেই রাজধানী কখনো গৌড়, কখনো সোনার গাঁও। অতএব দক্ষিণ-পূর্বে সতের মাইল দূরে অবস্থিত সোনার গাঁও-এর সমৃদ্ধির কালে ঢাকা তারই অধীন ছিল। পাঠান শাসক শের শাহ'র আমলে বর্তমানের চকবাজারে এক শক্তিশালী কারাগার নির্মিত হয়েছিল। মোগল আমলে প্রথমদিকে বারো ভুঁইয়া ও মগদের বিরুদ্ধে এখানে এক শক্তিশালী সেনানিবাস ছিল। অবশ্য বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী থেকে বাণিজ্য সমৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে জনপদ রূপে খ্যাতিও তার ইতিমধ্যে বিস্তৃত হয়েছে। আর এই মোগল পর্বেই অতি সাম্প্রতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে যেমন জন-জীবন আতঙ্কিত ও অত্যাচারিত হয়েছে, তেমনিই মগদের একাধিক অভিযানে লুণ্ঠিত ও বিপর্যস্ত হয়েছে। সে কাহিনী আধুনিক পর্বের মতো বড়ই মর্মান্তিক ও দুঃখবহ। অতএব জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ঢাকা অঞ্চলের নাগরিক জীবনের ওপর মানব-ইতিহাসের যেন এক অভিশাপ আছে, সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে তার পরিবর্তন হয় নি। যাই হোক, সুবাদার ইসলাম খানের বারো ভুঁইয়াদের বিরুদ্ধে সার্থক আক্রমণের প্রস্তুতিকল্পে রাজমহল থেকে ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করার কাল থেকেই আধুনিক ঢাকার জন্মলাভ ঘটলো। প্রথমে এর নামকরণ হল 'জাহাঙ্গীরনগর'। আর সুদীর্ঘ ১০৭ বছর ধরে সে পালন করলো বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানীর কর্তব্য। মোগল-পর্বেই ঢাকা সুলতানী আমলের সোনার গাঁও-এর সমৃদ্ধিকে অতিক্রম করলো। তার ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয়ের অর্থই হল এতদঞ্চলের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে নবাব ইব্রাহিম খানের (১৬১৮-২৪) আমলে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ঢাকা। চক ওরফে বাদশাহী বাজার, বাংলাবাজার (যার খ্যাতি মোগল-পূর্ব পর্যায় থেকে), শাঁখারী বাজার, তাঁতি বাজার এবং কুমারটুলী সুদীর্ঘকাল তাদের নিজ বৈশিষ্ট্য অপ্রতিহত রেখেছে।

* * *

১২ই মে, ইতিহাস সম্মেলনের প্রথম দিন। প্রাতঃভোজের সময়ে সাক্ষাৎ হল ভারতপ্রেমিক ব্যাশম্-এর সাথে। জানা গেল, ভারতের জাতীয় মহাফেজখানার ডাইরেক্টর ডঃ এস, এন্, প্রসাদ, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শ্রীমতী

দেবলা মিত্র, অধ্যাপক গ্রোভার, ভারত কলাভবনের ডঃ আনন্দকৃষ্ণ এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিরুদ্ধ রায় ও অরুণ দাশগুপ্ত এসেছেন। পূর্বাহ্ণ ৯-৩০-এর মধ্যেই সকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অডিটোরিয়াম্'-এ উপস্থিত। পাশে দক্ষ বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার সহকারী অধ্যাপক মনসুর মুসা। ভদ্রলোকের কথায়, আচরণে এবং তিন-চারদিন সর্বক্ষণ অবস্থানে মুগ্ধ। বুঝতে পারি সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে বাংলাদেশের প্রকৃত শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান জনের যে মনের জানালা এতদিন বন্ধ ছিল, আজ রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লব্ধ সার্বভৌমত্বের অস্তিত্বে সেই জানালার মানস-কপাট উন্মুক্ত। রাজনৈতিক প্রতিকূলতা আজ অপসারিত। আপনজনের সাথে সুদীর্ঘকাল ব্যবধানে সাক্ষাৎ ও মিলনের এই আনন্দের যেন তুলনা নেই। মুসার সাথে সেই প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক উত্তরকালে আরও নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়েছে। বলছিলাম 'অডিটোরিয়ামের' কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্বের জিনিস বটে! ধীরে ধীরে এবারে রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বর্ষীয়ান ঐতিহাসিক হবিবুল্লাহ্ ও মুহম্মদ এনামুল হক এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও উপাচার্য ডঃ আব্দুল মতিন চৌধুরীর যথাযথ স্থানগ্রহণ। শুরু হল অধিবেশন। প্রথমেই রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী ভাষণ। ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট ঋজু স্বরে আমাদের জানা সুপণ্ডিত ও বাগ্মী বিচারপতি চৌধুরীর এই ভাষণ মনকে স্পর্শ করে। তিনি যে কতখানি চিন্তাশীল ও ঐতিহাসিক চেতনার অধিকারী তা তাঁর ভাষণের প্রথমেই বুঝা গেল। বললেন—বাঙ্গালী হিসাবে আমাদের সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা এবং তা থেকে নিঃসৃত সংহতিবোধ আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি শক্তি উৎস। এরই বলে বলীয়ান হয়ে আমরা সুদীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে বর্বর বিজাতীয় শাসকশক্তিকে পরাভূত করে স্বাধীন জাতি হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছি। কিঞ্চিদধিক দু'শো বছরের পরাধীন যুগে আমার ইতিহাসকে উপনিবেশিক স্বার্থের তাগিদে বিকৃত করা হয়েছে। তাই আমাদের জাতীয় সত্তার ঐতিহ্যিক রূপ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার জন্য ও তাকে বিশ্বসমক্ষে উদ্ভাসিত করার উদ্দেশ্যে আমাদের ঐতিহাসিকবৃন্দকেই প্রয়োজনীয় গবেষণা ও সত্যানুসন্ধান করতে হবে। আর দায়িত্ব বিষয়ে বললেন—অনাগত কালের মানুষ নিশ্চয়ই অবাক বিস্ময়ে ফিরে তাকাবে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের দিকে আর ভাববে কি করে একটি নিরস্ত্র জাতি মরণপণ করে একটি আধুনিক মারণাস্ত্র সজ্জিত ও মধ্যযুগীয় হিংস্রতামত্ত শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। এর উত্তর রয়েছে বাঙালীর সংগ্রামমুখর অতীতে, তার আত্মমর্যাদা বোধে এবং তার সংস্কৃতি-চেতনায়। তাই আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সুদূর অতীতের অধ্যায়গুলিকে সত্যের আলোকে প্রকাশিত করার সাথে সাথে করতে হবে এই অতি সাম্প্রতিক গৌরবময় অধ্যায়টির পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ ও উত্তরপুরুষের জন্য সংরক্ষণ। ইতিহাসের দেয় সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও তাঁর একথা ঠিক যে বিশ্বজনীনতার যুগে ব্যক্তিগত জীবনে পারিপার্শ্বিক প্রভাবের ভূমিকা থাকায় সামগ্রিক মূল্যায়নের মাধ্যমেই ইতিহাসের ধারা উপলব্ধি করা যায়। এককথায় সামগ্রিক জীবনধারায় জ্ঞানবান, সত্যসন্ধ, তথ্যনিষ্ঠ ও কার্যকারণ বিশ্লেষণ-ক্ষমতাসম্পন্ন বিদগ্ধজনই কেবল ইতিহাস রচনা ও অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত। আর ইতিহাস শুধু আমাদের অভিজ্ঞতার নির্যাস-ই নয়, প্রজ্ঞারও আকর। ঘটনার ও পরিণামের পুনরাবৃত্তি এড়াবার জন্যই ইতিহাস রচনা, পঠন ও অনুশীলন প্রয়োজন। ইতিহাসলব্ধ প্রজ্ঞাই হবে জনজীবন ও জাতীয় জীবনের পাথেয়।

আমাদের জাতীয় জীবনের এই ক্রান্তিক্ষণে তাই ব্যাপকভাবে ইতিহাস পাঠ ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সকল রাজনীতিক, চিন্তাবিদ, সাংবাদিক, প্রশাসক ও কৃষক শ্রমিক-নেতৃবৃন্দের পক্ষে আজ তা অবশ্য কর্তব্য। এ যে আমারও মনের কথা! বিশ্বের আঞ্চলিক রাজনৈতিক জীবনে ও তদীয় জনজীবনের মাথায় যেসব তথাকথিত দেশপ্রেমিক খ্যাতিমান নেতাদের প্রত্যক্ষ করি, তাঁদের কিন্তু ব্যক্তিক জীবনের আচরণ এর ঠিক বিপরীত। দল-প্রেম আজ ইতিহাসের শিক্ষাকে উপেক্ষা করে দেশ ও জন-প্রেমে নিবেদিত হতে আর দেখি না বলেই দেশে এত অনাচার, অন্যায়, বিশৃঙ্খলা। সন্ত স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির এই সুস্পষ্ট জনক্ষোর বিষয়ে বক্তব্য এক স্মরণীয় দিশারী-রূপে চিহ্নিত।

অবশ্য রাষ্ট্রপতির আগে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডঃ আব্দুল মতিন চৌধুরী এই বিষয়ে আরও বিশদ-ভাবে বলেছেন। তিনি তো প্রথমেই বলেছেন যে ইতিহাস মানবজীবনের এক জীবন্ত আলেখ্য। অতএব ইতিহাস ও জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। অর্থাৎ ইতিহাস বিগর্হিত জীবন যেমন অর্থহীন, ঠিক তেমনি যে ইতিহাস জীবনকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠেনি তাও কল্পনাতীত ও অর্থহীন। বহিঃশত্রুর আক্রমণ বাঙালীকে বারবার ব্যস্ত করেছে, তা সত্ত্বেও স্বাধীনতার দৃঢ়কামনা আত্মপ্রকাশ করেছে নানাভাবে। দু'শো বছর সে নিরঙ্কুশ-ভাবে স্বাধীন থেকেছে, আবার স্থানীয় নেতাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অনৈক্যের ফলে প্রায়ই মাঝে মাঝে রাষ্ট্রজীবন বিপন্ন হয়েছে। কিন্তু জাতীয় মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েনি কখনও এবং দিল্লী থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার অদমনীয় প্রচেষ্টা চলেছে প্রতিনিয়ত। তাই দেখা গেছে বাংলা সুদূর অতীতে যেমন দিল্লীর শাসন মানেনি নিকট অতীতেও তেমনি ইসলামাবাদের শাসন শৃঙ্খল ছিন্ন করেছে। মতিন চৌধুরীও স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত মাটিতে অনুষ্ঠিত এবং বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই প্রথম ইতিহাস সম্মেলনে স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থ ইতিহাস লেখার ওপর জোর দিলেন। রাষ্ট্রপতির মতোই তিনি বললেন অতীতের ব্যর্থতা এবং ত্রুটির জন্যে আমরা নিঃশ্চেষ্ট হয়ে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করতে পারিনা, অন্ততঃ তার পুনরাবৃত্তি রোধ করতে পারি। এখানে ইতিহাসের একটা সৃষ্টিশীল কল্যাণমুখী ভূমিকা আছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য আরও সুস্পষ্ট—তথ্যের বিশদ সংগ্রহ, তথ্যের নিরাসক্ত বিশ্লেষণ, অতঃপর বিশ্লেষণ—নির্ভর তথ্যের বিন্যাস ও সমন্বয়করণ—এই হবে ঐতিহাসিকের সুলভ কাজ এবং এ ব্যাপারে তিনি দেশপ্রেমেরও উপরে ইতিহাস ও সত্যকে স্থান দেবেন। তিনিই সত্যসন্ধ আদর্শ ঐতিহাসিক। ইতিহাস রচনায় ক্ষেত্রে গোঁড়ামির, উগ্র জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর বা ভাবাবেগে পরিচালিত হবার কোন অবকাশ নেই। কেননা তাতে করে আর যা হোক ইতিহাস রচনা করা যায় না। নিজের আগ্রহে এবং এখানকার কর্তৃপক্ষের সেই আগ্রহকে স্বীকৃতি দেওয়ার উপস্থিত আমার এই নতুন উপলব্ধি ঘটলো যে বাংলাদেশেও মানব-ইতিহাসের মহাস্রোত ধারার সাথে সংযোগ স্থাপনের মতো উপযুক্ত ধারক কিছু অন্তত আছেন। এ পরিচয় পূর্বে আমার অজ্ঞাত ছিল।

উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের শেষ ভাষণ খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ও এই সম্মেলনের সভাপতি ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের। প্রথমেই তাঁর ভাষণ থেকে জানা গেল, এই ইতিহাস-পরিষদের বয়স দু'বছর অথচ বার্ষিক সম্মেলন হচ্ছে তৃতীয়। ব্যাপারটা অসাধারণ, দেশের রাষ্ট্র-বিপ্লব তার মূলে। তিনি জানালেন, আমরা ধর্মে হিন্দু, মুসলমান

বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান যাই হই না কেন, জাতিতে যে বাঙালী এবং ভাষায় যে বাংলাভাষী, সে বিষয়ে কোনদিন আমাদের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না। তাইতে, বাঙালী হিসেবে মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস-চর্চার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই পরিষদের মধ্যস্থতায় বিষয়টির অনুশীলন করবো—এটিই ছিল আমাদের মূল উদ্দেশ্য ও করণীয় কাজ। রাজনীতির সাথে আমাদের সম্বন্ধ কোন কালেই ছিল না—এখনও নেই। কিন্তু তাতে পার পাওয়া গেল না। ১৯৭১ সালের রাষ্ট্রবিপ্লবে দেশের যে বাঙালী নিধন তথা বুদ্ধিজীবী হত্যালীলা চলেছিল, তারপর আবার কখনও যে আমরা মিলিত হতে পারবো, তেমন আশা ছিল না। দেশ আজ স্বাধীন। জগতের একটি নৃশংসতম যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ 'সোনার বাংলার' ভগ্নস্তূপে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে এখানকার মৃত্যুদ্বার প্রত্যাগত বুদ্ধিজীবীরা কি ভাবছেন, জানি নে। হয়তো দেশের শাসকগণ 'সোনার বাংলার' স্বর্ণভস্মকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে আবার নিখাদ স্বর্ণপিণ্ডে পরিণত করার চিন্তায় নিমগ্ন। আমাদের মত নির্যাতিত, নিপীড়িত ও নিষ্পিষ্টরা এই দুঃস্বপ্নের কথা ভুলবেন না। কিন্তু আমাদের ভাবী বংশধর, যারা এই অমানুষিক ঘটনা দেখলো না, তাদের পূর্বপুরুষদের শৌর্য বীর্য ও আত্মত্যাগের কথা জানলো না, আমরা তাদের জন্য শুধু জনশ্রুতি ও কিম্বদন্তী ছাড়া আর কিছুই কি রেখে যাবো না। নিশ্চয় রেখে যাবো—সে হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। এ ইতিহাস তাদের মাথায় যোগাবে ক্ষুরধার বুদ্ধি, বাহুতে দান করবে অফুরন্ত শক্তি ও হৃদয়ে দেবে দেশপ্রেমের অনন্ত প্রেরণা। ইতিমধ্যেই ২৬শে মার্চ, ১৯৭১ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লিখিত হচ্ছে ও হয়েছে বলে শুনেছি। তার সবগুলো দেখি নি; যা দেখেছি তার একখানাকেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বলা যায় না। বরং এগুলো এই ইতিহাসের বিপুল উপাদানের ক্ষুদ্র এক-একটি অংশের বিবৃতি বলে উল্লেখ করা চলে। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে শ্রদ্ধেয় হকের পরবর্তী মন্তব্য সঠিক। তা হলো—এখনও সেই ইতিহাস রচনার সময় আসে নি, এসেছে শুধু একটি সুযোগ। 'সময়' ও 'সুযোগ' সমার্থক নয়, সমব্যাপারও নয়। সময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, আর পরিস্থিতি সুযোগ গ্রহণের দ্বার অবারিত করে। প্রকৃতপক্ষে, এখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার জন্য 'উপাদান'—সংগ্রহের এক সুবর্ণসুযোগ সমুপস্থিত। কিন্তু সেই সুযোগ গ্রহণে আমরা এখনও একরূপ উদাসীন। তিনি উপাদান বিষয়ে জানালেন—দেশ-বিদেশের সাংবাদিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, মুক্তিযোদ্ধা, গেরিলা-বাহিনী, বন্ধু রাষ্ট্র, শত্রুরাজ্য এবং দেশের গণমানবের কাছ থেকে; যুদ্ধের পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক, চিত্র, ছবি, নক্সা প্রভৃতি দেশ-বিদেশে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে তার থেকে; দেশের যে সব জল-স্থল-অন্তরীক্ষে সংঘটিত প্রকাশ্য ও গুপ্ত-যুদ্ধের অংশ থেকে এবং দেশের যে-সব এলাকায় অগ্নি-সংযোগ, লুঠতরাজ, গণহত্যা, নারীধর্ষণ প্রভৃতি অবলীলাক্রমে চলেছিল, সে সমস্ত অঞ্চল থেকে এ-উপাদান সংগ্রহ করতে হবে। আমরা বাঙালীরা এই সংগ্রামে এক পক্ষ মাত্র। অপর পক্ষ পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও তাদের তাঁবেদার 'খানসেনা'। আমাদের নিষ্ক্রিয়-প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা, আমাদের বিভীষণ, বন্ধু-বান্ধব, রণকৌশল, শৌর্যবীর্য প্রভৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি অবহিত হলেও, সঠিকভাবে ও বিস্তৃতরূপে তার কিছুই এখনও আমরা অবগত নই। আমরা ত্রিশলক্ষ বাঙালী এই যুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়েছি বলে একটা আন্দাজ করে নিয়েছি ও ঘোষণা করেছি।

আদমশুমারির মতো কোন বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থার দ্বারা আমাদের আন্দাজ আজও সমর্থিত হয় নি। ইতিহাস কি আমাদের কথা বেদবাক্যের মতো মেনে নেবে? কি কারণে পাকিস্তানী শাসকচক্র বাঙালীকে ধরাপৃষ্ঠ হতে নিশ্চিহ্ন করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে, কি কারণে পাকিস্তানের বেসামরিক গণমানব তো দূরের কথা, বুদ্ধিজীবীরাও বাংলাদেশে গণহত্যার জন্য কোন উচ্চবাচ্য করেন নি, কি কারণে পাকিস্তানী ষড়যন্ত্রের, পাকিস্তানী বিশ্বাসঘাতকতার, পাকিস্তানী জনবল-অর্থবল প্রভৃতির কোন সঠিক খবর আমাদের কাছে পৌঁছাল না, তার কিছুই এখন পর্যন্ত আমাদের জানা নেই। এই অবস্থায় আমাদের রচিত ইতিহাস কিছুতেই ইতিহাস হবে না,—হবে একটি এক-তরফা বিবৃতি। কারণ আত্মপক্ষের মতো পরপক্ষেরও সঠিক সংবাদ, নির্ভরযোগ্য দলিল—দস্তাবিজ প্রভৃতির সংগ্রহও প্রকৃত ইতিহাস রচনার অতি মূল্যবান উপাদান। প্রবীণ ঐতিহাসিক দৃঢ়কণ্ঠে স্মরণ করিয়ে দিলেন—আধুনিকতম বিশ্ব ইতিহাসের সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংযোগ যে কোন উপায়ে ও যে-কোন মূল্যে রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন। নইলে, এ ইতিহাস স্থানীয় ইতিহাস বলে বিবেচিত হবে। সতর্ক করলেন—যতই দিন যাচ্ছে ততই এই উপাদান সংগ্রহের সুযোগ ক্রমশই দুর্লভ হয়ে উঠেছে। আর দেশ-বিদেশের ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে এই ইতিহাস রচনার জন্য অকৃপণ সহযোগিতা কামনা করে তাঁর ভাষণ শেষ করলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই স্বাধীনতা—সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস রচনা বিষয়ের প্রাধান্য খুবই স্বাভাবিক, বিশ্বের কাছে এর গুরুত্ব বিষয়ে এইসব প্রস্তাব খুবই মূল্যবান, সন্দেহ নেই। নিঃস্তব্ধ 'হল্' ডঃ হকের এই আবেদন সকলের মনকে আর একবার সেই দুঃসময়কে মনে করিয়ে দিয়ে ভারাক্রান্ত করেছে।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে পরিষদের পক্ষ থেকে স্বদেশীয় তিন-জন ঐতিহাসিককে পুরস্কৃত করা হল তাঁদের উল্লেখযোগ্য রচনার জন্য। প্রথমেই 'চাকমা জাতির ইতিহাস' রচয়িতা বিরাজমোহন দেওয়ানকে। তারপরে 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম' রচয়িতা সদ্য পরলোকগত পূর্ণেন্দু দস্তিদারকে। তাঁর পত্নী অনুপস্থিতহেতু পুরস্কার দেওয়া গেল না। সর্বশেষে, পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি'র লেখক বদরুদ্দীন ওমরকে। জানা গেল—উনি পুরস্কার প্রত্যাখান করেছেন। শেষ হল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এইরকম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এতদিন সমস্ত কর্মসূচী, বক্তৃতাদি বিদেশীয় ভাষায় শুনে এসেছি। আজ কিন্তু আমার মাতৃভাষায় সেইসব শোনার পর মনে হচ্ছে, এমন সুযোগ প্রত্যক্ষ করার ঘটনাও আমার জীবনে একটা ইতিহাস হয়ে রইলো।

মধ্যাহ্নভোজে 'হল্' থেকে বেরিয়ে আসার মুখেই দেখি 'বাঙালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব)—রচয়িতা ডঃ নীহার-রঞ্জন রায় ও রোমিলা থাপা সবে এলেন। খাওয়ার টেবিলেই শ্রীহট্টের তথা বাংলাদেশের বিখ্যাত প্রাচীনলিপি—বিশারদ অগ্রজপ্রতিম বন্ধুবর কমলাকান্ত গুপ্ত পরিচয় করিয়ে দিলেন সুবিখ্যাত সাহিত্যিক এ-বঙ্গের 'পঞ্চতন্ত্রের স্রষ্টা ও সদ্য পরলোকগত সৈয়দ মুজতবা আলি'র অগ্রজ মূর্তাজা আলি'র সাথে। তাঁর নিজস্ব একটা পরিচয় আছে। অবসরপ্রাপ্ত ডিভিশাস্তাল কমিশনার আজ এদেশীয় একজন শীর্ষস্থানীয় ঐতিহাসিক সাহিত্যিক ও সমালোচক। সত্তরের উপর বয়সেও তিনি যেভাবে তরুণের মতো আমাকে আলিঙ্গন করলেন—তাতে আমি অভিভূত। আমি যেন তাঁর কত আপন জন। লক্ষ্য করেছি ঢাকায় স্বল্পকালীন অবস্থানকালে আমার প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও স্নেহকে।

---

* ২রা নভেম্বর, ১৯৮১ লেখা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র 'সৈয়দ মহবুব আলি'র চিঠি থেকে জানতে পারি যে সৈয়দ মূর্তাজা আলি (শেষরাত্র ২-৬০মিঃ) ৯ই আগষ্ট, ১৯৮১তে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছেন।

* এতক্ষণ আমরা আধুনিক এক ইতিহাসের মধ্যেই চিন্তাচেতনাকে আবদ্ধ রেখেছিলাম। এবার অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেরাবার পালা। প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হলো অপরাহ্ণে অ.ডাই-.টতে। সভাপতি প্রফেসর এ, এম, ব্যাশম। লক্ষ্য করি, তিনজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় বর্ষীয়ান ঐতিহাসিক উপস্থিত। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার এবং ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ। প্রথমেই কমলাকান্ত গুপ্ত মহাশয় পাঠ করলেন "শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্র শাসনে বিরাট ভূমিদান সম্বন্ধীয় বিষয়াদি।" উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তিনিই এই তাম্রশাসনের আবিষ্কারক এবং ঢাকা মিউজিয়ম প্রকাশিত ইংরেজীতে লেখা নলিনীকান্ত ভট্টশালী-স্মারক গ্রন্থে তার পাঠ সর্বপ্রথম প্রকাশ করে পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রশংসা অর্জন করেছেন। বিশেষ করে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার তো এই অধিবেশনেই তাঁর এই প্রকাশকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করলেন। ডঃ সরকার অনুমান করেছেন যে সম্ভবতঃ রোহতাসগড়বাসী চন্দ্র বংশীয়েরা পালরাজ্যের সামন্তরূপে বাংলাদেশে এসেছিলেন (দ্র° সাঃ পঃ পঃ, ৭৬ বর্ষ, পৃঃ ২)। কিন্তু রমেশচন্দ্র মজুমদার ডঃ ভট্টশালীর এই যুক্তি উপস্থিত করে বলছেন যে রোহিতাগিরি 'লাল-মাটি'র সংস্কৃত রূপ যা কুমিল্লার নিকটবর্তী লালমাই পাহাড়কে নির্দেশ করেছে; অতএব চন্দ্রদের বহির্বঙ্গ থেকে আগমনের সপক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই, বরং বাংলাদেশের চন্দ্ররাজগণের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যকে স্মরণ করলে কুমিল্লা অঞ্চলেই তাঁদের প্রথম আবির্ভাব বলে মনে হয় (দ্রঃ History of Ancient Bengal, Vol. I, p. 200-201)। যাই হোক পশ্চিমভাগ তাম্রলি° থেকে জানা যাচ্ছে যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র সমতট জয় করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে এই চন্দ্রবংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি শ্রীচন্দ্র প্রায় অর্ধশত বছর রাজত্ব করেন (আনুঃ ৯২৫—৯৭৫ খ্রীঃ)। কমলাকান্তবাবুর আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে জানা গেল যে এটি ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট জেলার মৌলভীবাজার মহকুমার রাজনগর থানার 'পশ্চিমভাগ' গ্রামের ভূগর্ভ থেকে উদ্ধার করা হয়। আর শ্রীচন্দ্রের তারিখযুক্ত তাম্রশাসনগুলির মধ্যে ৫ম রাজ্যাঙ্কের ৫ই বৈশাখ তারিখের এই লি°টিই প্রাচীনতম। দশম-একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী চন্দ্র রাজারা পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ আধুনিক বাংলাদেশে যে রাজত্ব করতেন তা বর্তমানে সুবিদিত। কিন্তু এই তাম্রশাসন খানি বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুনর্গঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রবন্ধকার তথা এই লিপির আবিষ্কারক কেবলমাত্র রাজকীয় দানের বিষয়বস্তু ও আনুষঙ্গিক কয়েকটি দিকমাত্র আলোচনা করলেন।

এই তাম্রশাসন দ্বারা মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র রাজধানী বিক্রমপুর হতে তাঁর রাজ্যের পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রদেশের অন্তর্গত শ্রীহট্ট বিভাগের অধীন গরলা, পুগার ও চন্দ্রপুর নামক তিনটি পরস্পর-সংলগ্ন জেলার প্রায়সাকুল্য ভূমির বিলিব্যবস্থা করেছিলেন। এবং ৫ম রাজ্যাঙ্কের ৫ই বৈশাখ তারিখের পূর্ববর্তী কোন এক শ্রাবণ-রবিসংক্রান্তি দিনে তিনি ভগবান বুদ্ধ ভট্টারকের নামে যথারীতি (হাতে) জলগ্রহণ করে পিতা, মাতা এবং নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধি হেতু বিরাট পরিমাণ ভূমিদানের ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন। ঐ তিনটি বিষয়ের মোট ভূমি হতে কেবলমাত্র ত্রিরত্ন-ভূমি (বুদ্ধ ধর্ম ও সঙ্ঘের ভূমি) এবং ইন্দ্রেশ্বরে (শ্রীহট্ট জেলার মৌলবীবাজার মহকুমার বর্তমান ইন্দ্রেশ্বর অঞ্চল) অবস্থিত একটি নৌবন্ধ (boat-anchorage) সম্পর্কিত দশদ্রোণিক ৫২ পাটক বা ৫২০ দ্রোন (প্রায় ৭৮০০ বিঘে) পরিমিত ভূমি বর্জিত ছিল। কমলাকান্ত গুপ্ত মহাশয় 'নবেড়িকা' শব্দে

উপকূলীয় দ্বীপ বুঝিয়েছেন। অবশ্য ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার ও স্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর কেউ কেউ এই অর্থকে গ্রহণ করেন নি। যাই হোক, লেখক আরও জানালেন যে মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র ঐকালে একই চতুঃসীমার অন্তর্গত তিনটি বিষয়ের ভূমি সমবায়ে একটি ব্রহ্মপুর (যে পুরের বা আবাসভূমির অধিবাসীগণ মূলতঃ ব্রাহ্মণ) সৃষ্টির পরিকল্পনা করে 'শ্রীচন্দ্রপুর' নামকরণ করেন। এই চতুঃসীমায় অবস্থিত মণিনদী (মনুনদী), জজ্জুখাতক (জোজনাছড়া), বেত্রমন্থী নদী (বেতারি মুখী নদী), কোসিয়ার নদী (কোসিয়ারা নদী) অত্যাপি শ্রীহট্ট জেলায় বর্তমান এবং এই চতুঃসীমার অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ প্রায় এক হাজার বর্গমাইলের মত হবে। মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রের এই তাম্রশাসন দ্বারা বন্টনের প্রথমভাগে উল্লিখিত তিনটি বিষয় সমবায়ে শ্রীচন্দ্রপুর সংজ্ঞা প্রাপ্ত নবভাবে গঠিত ব্রহ্মপুর হতে দশদ্রোণিক ১২০ পাটক বা ১২০০ দ্রোণ (প্রায় ১৮০০ বিঘা) পরিমিত ভূমি ব্রহ্মাকে দানক্রমে ঐ ভূমি উক্ত শ্রীচন্দ্রপুরে অবস্থিত স্থানীয় একটি মঠ (প্রধানত আবাসিক বিদ্যায়তন) সংশ্লিষ্ট চন্দ্র (চন্দ্রগোমী ব্যাকরণ) ব্যাখ্যাতা উপাধ্যায়ের দশজন ছাত্রের অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত, পাঁচজন অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণের প্রাত্যহিক আহারের নিমিত্ত, ইহার ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণের, গণক, কায়স্থ, মালাকার, তৈলিক প্রভৃতি বিভিন্ন সংখ্যার বিভিন্ন বৃত্তিজীবি লোকের জন্য বিভিন্ন নিয়মে নির্দিষ্ট হয়েছিল। বন্টনের দ্বিতীয় ভাগে শ্রীচন্দ্রপুরে দশদ্রোণিক ২৮০ পাটক বা ২৮০০ দ্রোণ (প্রায় ৪২,০০০ বিঘা) পরিমিত ভূমি বৈশ্বানর, যোগেশ্বর, জৈমিনি ও মহাকালকে দানক্রমে দেশান্তরীয় (ভিন্নদেশীয়) চারটি মঠে ও বঙ্গাল (বঙ্গালভূমির) চারটি মঠে। এই উভয় প্রকারের মঠ সংশ্লিষ্ট ঋক্, যজুস্, সাম্ ও অথর্ববেদের আটজন উপাধ্যায়, প্রতি মঠে পাঁচজন হিসাবে ৮টি মঠে মোট ৪০ জন ছাত্রের এবং প্রতি মঠে বা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতি চারটি মঠে মালাকার, নাপিত, তৈলিক, রজক, কায়স্থ, মহত্তর ব্রাহ্মণ, গণক, বৈদ্য প্রভৃতি বিভিন্ন সংখ্যার বিভিন্ন বৃত্তিজীবি লোকের জন্য বিভিন্ন নিয়মে নির্দিষ্ট হয়েছিল। আর বন্টনের তৃতীয় ভাগে অর্থাৎ মূল দানটিতে বাবুস দত্ত, হর্ষ, শেখর, ভানু দত্ত, বৎস নাগ, মহীন্দ্র সোম, শান্তি দাস, রবিকর, শিববন্ধু, গর্গ শর্ম্ম, ধবল, গর্গ গুপ্ত, হরি, জয় দত্ত প্রভৃতি ৩৬ জন ব্রাহ্মণের নামোল্লেখক্রমে দানগ্রহীতা সকল ব্রাহ্মণগণকে একত্রে গর্গ প্রভৃতি নানাগোত্রের নানা প্রবরের, চতুর্ব্বেদের নানা শাখাধ্যায়ী ছয় হাজার ব্রাহ্মণগণ উল্লেখে অবশিষ্টভূমি (ত্রিরত্নভূমি ও ইন্দ্রেশ্বর নৌবন্ধ সংশ্লিষ্ট ৫২০ দ্রোণ বা ৭৮০০ বিঘা পরিমিত ভূমি ব্যতীত) সামান্যভাবে দান করা হয়েছিল। অবশ্য তিনটি দান সংক্রান্ত ভূমিই ইতিপূর্ব্বে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবান্ বুদ্ধভট্টারকের নামে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। লক্ষণীয় যে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের দান দু'টি অনেকটা ন্যাস—ব্যবস্থা (trust) পর্যায়ে পড়ে। একজন বৌদ্ধ নরপতির এই দান প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার তুলনাহীন নজীর। সম্ভবতঃ ত্রিরত্নভূমি ইতিপূর্বে কোন নরপতি (সম্ভবতঃ শ্রীচন্দ্রের পূর্বপুরুষ) কর্তৃক উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। এককথায় এই বিরাট ভূমিদানের পর শ্রীহট্টমণ্ডলের অধীন গরলা, পোগার ও চন্দ্রপুর বিষয়সকল মধ্যে কেবলমাত্র ইন্দ্রেশ্বর নামক সরকারী একটি নৌবন্ধ-সম্পর্কীত ৫২০ দ্রোণ পরিমিত স্থান ব্যতীত উপকূলীয় দ্বীপসমূহ সঙ্গে ঐ তিনটি বিষয়ের সকলভূমিই নিষ্কর অবস্থায় ত্রিরত্ন, নয়টি মঠ এবং গগর্গ-প্রভৃতি ছয় হাজার ব্রাহ্মণের (প্রত্যেককে অনধিক ১০০ একর হিসাবে) ভোগাধীকারে চিরস্থায়ীভাবে চলে যায়। শ্রীচন্দ্রের বিপুল পরিমাণ এই ভূমিদান ভারতীয় উপমহাদেশের ভূমিদানের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক বিরল ঘটনা। প্রবন্ধকার সঙ্গত প্রশ্নই করেছেন—শ্রীচন্দ্র প্রত্যন্ত এই রাজ্যখণ্ড গর্গের নেতৃত্বাধীন ছয় হাজার ব্রাহ্মণের এক বিশেষ দলকে সমভাবে নিষ্কর দান করলেন

কেন? এর পরবর্তী ইতিহাস কি? এর সঙ্গে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ জড়িত আছে কি বিষয়গুলি ব্যাপক গবেষণার অপেক্ষা রাখে। প্রসঙ্গতঃ কমলাকান্তবাবু স্মরণ করিয়ে দিলেন যে বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ শ্রীহট্ট জেলায় বিশেষভাবে প্রাক্তন গয়লা, পোগার ও চন্দ্রপুর বিষয় এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য নিষ্কর মহল ও ভূম্যধিকারীগণের অস্তিত্বের বিশেষ কারণ হিসেবে শ্রীচন্দ্রের এই নিষ্কর ব্যাপক ভূমি বন্টনের ঘটনার দিকেই যেন অঙ্গুলী নির্দেশ করেছে।

তিনটি অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের মধ্যে এইটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। অনেকেই প্রবন্ধকারের অনেক শব্দ-ব্যাখ্যার সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তবুও এর সার্বিক গুরুত্ব এবং পরিবেশিত অজ্ঞাত তথ্য আমাদের তদানীন্তন জনজীবনকে অনুশীলনে প্ররোচিত করছে। পরবর্তী প্রবন্ধ পাঠ করলেন বিশ্ব-খ্যাত ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার। "মহীপাল (আনুঃ ১৩০৫-৫০ খ্রীঃ)-এর রাজত্বের বিষয়ে নতুন তথ্য", ইংরেজীতে। সমালোচনার কোন সুযোগ নেই। বরং ডঃ জিয়াউদ্দিন আহ্‌মদ দেশাই প্রশংসাই করলেন। পরবর্তী প্রবন্ধ 'বঙ্গের দ্বিতীয় মাহ্‌মুদ শাহ-এর (১৪৭০-৭১ খ্রীঃ) তথাকথিত শিলালিপি" পাঠ করলেন ডঃ জিয়াউদ্দিন আহ্‌মদ দেশাই। ইনি ভারতের মুসলিম ও পার্শিয়ান লিপিতত্ত্ব বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ। মধ্যযুগীয় ইতিহাসের জট ছাড়ানোর ক্ষেত্রে এর কিছু মূল্য অবশ্যই আছে। বঙ্গদেশের দ্বিতীয় মাহ্‌মুদ শাহ'র অতীত সম্পর্কে রহস্য আজও দূরীভূত হয়নি, এবং আবিষ্কৃত মুদ্রাসমূহও নতুন কিছু এ বিষয়ে আলোকপাত করে নি। ডঃ দেশাই তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে দেখালেন যে এই নৃপতির নামে যে তিনটি শিলালিপি প্রচলিত ছিল তার দু'টি অন্যের আমলে রচিত। যেটি মালদহ জেলার হজরত পাণ্ডুয়ায় পাওয়া গেছে তাতে সুস্পষ্টভাবে প্রথম নাসিরউদ্দিন মাহ্‌মুদ শাহের তারিখ উৎকীর্ণ আছে; আর যেটি বর্ধমান জেলায় প্রাপ্ত বলে অনুমিত সেটিতে মোগল-সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নাম সুস্পষ্টরূপে লেখা। ডঃ দেশায়ের মতে মুর্শিদাবাদ জেলার চুণাখালিতে প্রাপ্ত তৃতীয় শিলালিপিটিও সম্ভবতঃ দ্বিতীয় নাসিরউদ্দিন মাহ্‌মদ শাহ'র নয়। অর্থাৎ দ্বিতীয় মাহ্‌মুদ শাহ'র অস্তিত্ব বিষয়েই তিনি প্রবল সন্দেহ পোষণ করেন। ঐতিহাসিকদের কাছে এই মত অবশ্যই একটা আপত্তি-রূপে আবির্ভূত এবং এর মীমাংসা নতুন তথ্য আবিষ্কার ভিন্ন বোধহয় সম্ভব নয়।

প্রথম অধিবেশনের চতুর্থ ও শেষ প্রবন্ধ বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রজতানন্দ দাশগুপ্ত'র "মধ্যযুগীয় বঙ্গদেশে পাণ্ডুলিপি-চিত্রণ।" লেখক অনুপস্থিত কিন্তু বিষয়ের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে রঙীন স্লাইড্ সহযোগে প্রবন্ধটি পাঠ ও ব্যাখ্যা করে দেখালেন ভারতীয় কলাভবনের ডঃ আনন্দকৃষ্ণ। অন্যান্য উপস্থিত-জন তো বটেই, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ও বিষয়গুলি খুব মনোযোগ দিয়ে প্রদর্শিত স্লাইডের সাথে মিলিয়ে নিচ্ছিলেন। এটি তাঁর প্রিয় বিষয় এবং চিত্রণকলা-বিষয়ে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ-ও। আলোচনায় জানা গেল যে পাল ও সেন আমলের চিত্রকলার ভাবধারা ও চিত্রাঙ্কণ-পদ্ধতির অবসান, মধ্যযুগীয় বঙ্গদেশে পাণ্ডুলিপি চিত্রণ ক্ষেত্রে নবদিগন্তের উন্মোচন করে। তুর্কী আক্রমণের প্রাথমিক ধাক্কা স্তিমিত হওয়ার সাথেই, এদেশে চারুশিল্প চর্চার ক্ষেত্রে নতুন কর্মপ্রবাহ লক্ষ্য পড়ে। কিন্তু এসময় থেকে তালপত্র চিত্রণ ও পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা চিত্রণ-করণ অপেক্ষা 'পট-অঙ্কণ' এবং দারু নির্মিত 'প্রচ্ছদ-পট' চিত্রণের প্রবণতা অধিকতর লক্ষ্যণীয়। শ্রীচৈতন্যদেবের

নেতৃত্বে নব্য বৈষ্ণববাদের উত্থান পাণ্ডুলিপি চিত্রণ ও পট-অঙ্কণ-শিল্পে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। বহু বৈষ্ণব পাণ্ডুলিপি রচিত হতে থাকে। উড়িষ্যা-সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ সুপ্রাচীনকাল থেকে চিত্রণ-শিল্পে ঐতিহ্যবাহী এবং উপরি বর্ণিত চিত্রের প্রারম্ভিক নমুনা আবিষ্কৃতও হয়েছে। বৈষ্ণব ধর্মের অন্যান্য কেন্দ্র যথা শ্রীহট্ট ও উত্তরবঙ্গে বিশদভাবে বিধৃত পট-চিত্রের মূল্যবান নিদর্শনের সমাহার ঘটেছে। এই সব নিদর্শন আশুতোষ মিউজিয়ম, ভারতীয় কলাভবন, কোচবিহার স্টেট লাইব্রেরী, ঢাকা মিউজিয়ম, বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি প্রভৃতিতে সংগৃহীত হলেও অধিকাংশই আজও অনাবিষ্কৃত এবং পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পণ্ডিত ও পুরোহিতদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আত্মগোপন করে রয়েছে।

বাংলা পাণ্ডুলিপির আকৃতি সাধারণভাবে অনুভূমিক ও দারুনির্মিত চিত্রিত প্রচ্ছদপট দিয়ে বাঁধানো। মধ্যযুগে পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা অপেক্ষা প্রচ্ছদপটই চিত্রিত হতো বেশী। আর আভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠার প্রয়োজনে কেবল 'আলেখ্য-স্থান' চিহ্নিত নির্দিষ্ট স্থানেই চিত্রাঙ্কণ করা হতো। পাণ্ডুলিপি-লেখক ও চিত্রকর সাধারণত ভিন্ন ব্যক্তি। অর্থকরী বৃত্তি হিসেবে চিত্র অঙ্কণ-বিদ্যার চর্চা মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পাণ্ডুলিপি চিত্রের প্রাচীন কেন্দ্রসমূহ বিষ্ণুপুরে অবস্থিত এবং সেগুলি উড়িষ্যার নিকটবর্তী হেতু তার ভাবধারার প্রভাব এতদঞ্চলীয় চিত্রকলায় বিশেষভাবে প্রতিফলিত। অবশ্য উড়িষ্যার রীতি মূলত পশ্চিম ভারতীয় এবং ইলোরা-ঐতিহ্যের অনুসৃত রূপ। অষ্টাদশ শতকে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গীয় অঞ্চলে মেদিনীপুর থেকে 'সচিত্র রামায়ণ'-এর পাণ্ডুলিপির সাক্ষাৎ মিলেছে। উত্তর-বঙ্গের চিত্রকলায় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের 'কোচবিহারী'-রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। আবার এই 'কোচবিহারী' আঙ্গিক, গ্রন্থ-চিত্রণের অহমিয়া রীতি ও নেপালী 'তোরানা' রীতি দ্বারা প্রভাবিত। বঙ্গে চিত্রিত প্রচ্ছদপটের ব্যবহার উনবিংশ শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, যদিও এসময় অর্থাৎ মোটামুটি অষ্টাদশ শতক থেকে প্রাদেশিক রাজধানী মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে উচ্চ-শৈলীর ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রবিদ্যা ও চিত্র অঙ্কণ-পদ্ধতির চর্চা ও প্রসার ঘটতে থাকে। মুর্শিদাবাদ-পদ্ধতি মোগল-শৈলীর প্রাদেশিক রূপ হলেও স্বল্পকালের মধ্যেই বঙ্গজন বিশেষত্ব অর্জন করে স্বতন্ত্র ভঙ্গীতে পরিগণিত হয় ও চিত্র শিল্পে তা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এর সমালোচনা করলেন তাঁর অপূর্ব বাংলা-বাচনভঙ্গীর মাধ্যমে। তার মধ্যে প্রধান হলো যে এইভাবে এটা রাজস্থান-শৈলী, ওটা গুজরাটী শৈলী—এমন নামকরণ বর্তমান অনুশীলনের পরিপ্রেক্ষিতে অসার্থক এবং এই ধরণের গণ্ডীবদ্ধকরণ অনুচিত। তাঁর এই প্রাসঙ্গিক আলোচনা শুনে এখানকার তরুণরা পরিচয় জানতে উৎসুক হয়ে উঠলো। বাস্তবিকই এই তরুণ বংশধারা তো সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের ভিতরে তাঁর মতো ঐতিহাসিক ও কলা-সমালোচকের সাক্ষাৎ পায় নি। তাঁকে শান্ত চিত্তে তরুণ ছাত্রের এক এক প্রশ্নের উত্তর দিতে দেখা গেল।

বিশ্রাম নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিদিকে প্রচণ্ড উদ্দীপনা। প্রথম অধিবেশন আশ্চর্যরকম জমজমাট, যা অন্য দু'টিতে প্রত্যক্ষ করি নি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ডঃ রায় বাংলা ভাষাতেই সর্বদা তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। এটা তাঁর বঙ্গ-জন ও ভাষাপ্রীতির জন্যই। অপরাহ্ন গড়িয়ে চলেছে। এবার গন্তব্যস্থল বিখ্যাত ঢাকা মিউজিয়ম। উপলক্ষ্য স্বাধীনতা সংগ্রামের নিদর্শনাদির এক বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন। উদ্বোধন করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন। সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বললেন, আমরা আমাদের জাতীয় ইতিহাস লেখার

অধিকার অর্জন করেছি, আর পৃথিবীতে যে সব জাতি সত্যের প্রতি বিমুখ হয়েছে, অতীতকে বিকৃত করেছে, মিথ্যাচারণার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে চেষ্টা করেছে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তারপর সংক্ষিপ্ত প্রদর্শনী দেখা। সংগ্রামের বেশকিছু দলিল, মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ত রঞ্জিত পোষাক, টিকাখানের চিঠি, আল বদরের পরিচিতি-পত্র' কোলকাতার বাংলাদেশ মিশনের পতাকাসহ বেশকিছু প্রচারপত্র পোস্টার, ছবি ও গোলাবারুদ প্রত্যক্ষ করলাম। রয়েছে ১৬ই ডিসেম্বরে রেসকোর্সে যে টেবিলে নিয়াজী আত্মসমর্পণে দস্তখত দিয়েছিলেন, সেই টেবিল। ছবিগুলি আর একবার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুললো। এখানেই কমলাকান্তবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পরিচালক ডঃ নাজিমুদ্দীন আহ্‌মেদ ও অধীক্ষক ডঃ গফুরের সাথে। এঁদের বিভাগীয় কর্মীদের কাছেই দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত মৌজা ফতেহপুর মারাসে ৭ম-৮ম শতকের সীতাকোট বৌদ্ধবিহার খনন-কার্যের বিবরণ শুনলাম ও কিছু ফটো দেখলাম। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এটিই প্রথম খনন-কাজ। এ প্রসংগে যথাস্থানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে। —তবে এই সম্মেলনে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে একদমই স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি, একটি নিবন্ধও পঠিত হয় নি। অথচ বংগ-জনের অতীত ইতিহাস উদ্ধার প্রত্নতত্ত্বকে বাদ দিয়ে কিছুতেই সম্ভব নয়। ঘড়ির সংগে পাল্লা দিয়ে কর্মসূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে হচ্ছে। অতএব আজ আর মিউজিয়ম দর্শন নয়। একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। হোস্টেলে ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম-অন্তে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের 'জনতা ব্যাঙ্কের' আমন্ত্রণক্রমে হোটেল 'পূর্বানী'তে রাতের আহার-পর্বে উপস্থিত হতে হলো। অতি আধুনিক আড়ম্বর পূর্ণ হোটেলের সামগ্রিক পরিবেশ দর্শনে এ প্রতীতি জন্মাবে না যে বাংলাদেশের বৃহত্তম 'জন' কোনরকম দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে আছে, তারা কখনোও প্রচণ্ডরকম ভয়াবহ নিকটতম অতীতকে প্রত্যক্ষ করেছে। এই বৈষম্য মনকে আচ্ছন্ন করায় আহার পর্ব হলো আমার নাম-কা-ওয়াস্তে। ক্লান্ত দেহ। সম্মেলনের প্রথম দিনটি এই ভাবে নিরবিচ্ছিন্ন কর্মব্যস্ততায় অতিবাহিত হলো। কখন যে সুষুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছি জানি না।

* * *

১৩ই মে'র সকাল। আকাশে মৌসুমী মেঘের আনাগোনা, মাঝে মাঝে বর্ষণ। স্নানাদি ও প্রাতঃভোজ অন্তে ন'টার মধ্যেই ছাত্র শিক্ষক মিলনকেন্দ্রে উপস্থিত; আরম্ভ হলো দ্বিতীয় অধিবেশন। সভাপতি—ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার। প্রথমেই প্রবন্ধ পাঠ করলেন শ্রদ্ধেয় সৈয়দ মুর্তাজা আলি। বিষয়—'ত্রিপুরার রাজাদের কালক্রম।' তিনি জানালেন—এই অতি প্রাচীন রাজবংশের ইতিহাস 'রাজমালা'র বিভিন্ন খণ্ড একাধিক ব্যক্তি রচনা করেন। অনেক কিছু অত্যুক্তি থাকলেও তাতে প্রামাণিক বিবরণ লিপিবদ্ধ। আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রাজাদের প্রীতিার্থে অনেক রাজার কাল্পনিক নামের উল্লেখ করেছেন। পূর্বে তাঁদের নামের শেষে কাছারী ও ফা উপাধি থাকতো পরে পণ্ডিতরা রাজাদের বংশগৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই রাজবংশকে চন্দ্র-বংশীয় বলে উল্লেখ করেছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে আবার সূর্য-বংশীয়ও বলা হয়েছে। টিপরা বা তিপ্রা ও কাছাড়ী জাতির একই বংশ থেকে জন্ম। 'ত্রিপুরা' শব্দ 'টিপরা' শব্দের সংস্কৃত রূপ। তাদের ভাষায় তুই শব্দের অর্থ 'জল', তার সঙ্গে প্রা যোগ করে 'তিপ্রা' বা 'টিপরা' শব্দ হয়েছে। প্রা, ফ্রা ও ফা শব্দের অর্থ পিতা। রাজমালার ছেংথুমফ গৌড়েশ্বরকে যুদ্ধে নিহত করেন। এরপর শ্রদ্ধেয় আলি ত্রিপুরার রাজাদের কালক্রম বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা প্রসঙ্গে এই মত দেন যে

O ইতিহাস সম্মেলনে 'বঙ্গবন্ধু' দেশী-বিদেশী প্রতিনিধিদের সাথে। কাল ১৪ ৫-১৯৭৩ (অপরাহ্ণ) স্থান—ছাত্র-শিক্ষক মিলন কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ফটো : বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

O ঢাকার ইতিহাস সম্মেলনে (১৪ ৫-১৯৭৩) চা-চক্রে বামদিক থেকে—প্রথম —ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ (বর্তমানে মৃত) মাঝে—ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, (জীবিত) একেবারে ডান ধারে—ডঃ নীহাররঞ্জন রায় (বর্তমানে মৃত) ফটো : বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

○ গত শতাব্দীর ধনকুবের জমিদারের গৃহের প্রবেশ দ্বারের গাত্রে মিনা ও পঙ্খের কাজ সোনার গাঁও ১৫-৫-৭৩

○ ঢাকেশ্বরী মন্দিরের বামপার্শ্বে অবস্থিত শিবমন্দির—ঢাকা ১৪-৫-৭৩

ধর্মমাণিক্যের ১৩৭০ শকাব্দের তাম্রশাসনখানি জাল। মুদ্রা প্রসঙ্গে জানালেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রত্ন মাণিক্যের পরবর্তী ১৫ জন রাজার মুদ্রা পাওয়া গেছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে তাম্রমুদ্রার প্রচলন ছিল না। শ্রীহট্ট জেলা ও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানের মতো ছোটখাট কেনাবেচার কাজে কড়ি ব্যবহৃত হতো। ৫১২০ কড়িতে এক টাকা হতো।

এই প্রবন্ধের আলোচনা-প্রসঙ্গে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বললেন—মুক্তবা আজি'র দাদাকে এইসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে দেখে খুবই আনন্দ অনুভব করছি। সে বহুদিন আগের কথা। বয়সের ব্যবধান আমাদের মধ্যে অল্পই। আমি তখন বি, এ, পড়ি, তিনি আই, এ, পড়েন। তিনি অবশ্যই আমার শ্রদ্ধেয়। উভয়ের জন্ম একই অঞ্চলে, সেদিক থেকে যেন তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করি। কথা হচ্ছে যখন আমরা ত্রিপুরার কথা বলছি, তখন নিশ্চয়ই ভারত ও বঙ্গ-প্রসঙ্গেই বলছি। কিন্তু ত্রিপুরার রাজবংশ তো বাঙালী নয়। অন্তত নরতত্ত্বের দিক থেকে। বরং মিল রয়েছে উত্তর থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে। আর এই বংশ তো ১১-১২ শতকেই ব্রহ্মদেশীয় রাজার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে, এমন প্রমাণ তো আছে সংস্কৃতিকরণের জন্যই ধনমাণিক্যদের চন্দ্রবংশীয় ইত্যাদি দাবী। কাজেই ত্রিপুরার রাজাদের বিষয়ে আলোচনা করতে হলে ব্রহ্মদেশ ও থাইল্যাণ্ডের কিছু ইতিহাস অবশ্যই জানা দরকার। বলা বাহুল্য, ডঃ রায়ের ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস প্রসঙ্গে এই সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত খুবই মূল্যবান।

এরপর এক বেদনাবিধুর পরিবেশ সৃষ্টি হলো যখন ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের হাত থেকে পরলোকগত পূর্ণেন্দু দস্তিদারের পত্নী শান্তি দস্তিদার পুরস্কার গ্রহণ করলেন। গতকাল তিনি এসে পৌঁছাতে পারেন নি। প্রথমে শ্বেতশুভ্র থান পরিধান করে ধীর পায়ে মঞ্চে উঠলেন এবং পুরস্কার নিয়ে কান্নায় ঢলে পড়লেন। পূর্ণেন্দু দস্তিদার স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে চট্টগ্রাম থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে এদিকে আসার সময়ে কলেরায় মারা যান।

পরবর্তী প্রবন্ধ পড়লেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস, এম, ইমামুদ্দিন "মুন্সী সলিমুল্লাহ'র তারিখ-ই-বংগালাহ"। তিনি এই বহুল প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশে ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের আরবী ও ফার্সী ভাষা শেখার আগ্রহ ও তাদের প্রশাসনিক তৎপরতা সম্পর্কেই বিষদ আলোচনা করলেন এরপর বি, আর, গ্রোভার পড়লেন "বংগে (১৫৭৬-১৭০৭) জমিদারী ও তালুকদারী প্রথা" বিষয়ে। অযথা বেশী সময় নেওয়ায় সভাপতি ডঃ সরকার থেকে আরম্ভ করে অনেকেই বিব্রত। আঞ্চলিক নামগুলোর যথাযথ উচ্চারণ না হওয়ার বিষয়ে ডঃ রায় প্রবন্ধকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। যেমন 'বানিয়া চঙ্গ' হয়েছে 'বাইচুঙ' পরের প্রবন্ধ ডঃ অনিরুদ্ধ রায়ের "১৭৭০-এর সংগে তুলা ও সুতিবস্ত্র ক্রয়—একটি ফরাসী দলিল"। বেশ কিছু নতুন চিন্তার প্রকাশ তাঁর রচনায় প্রত্যক্ষ করা গেল। তিনি জানালেন—প্রাক্ পুঁজিবাদী যুগে বংগে তুলা ও সুতিবস্ত্রের চাষ ও উৎপাদন বিষয়ে অনেক লিখিত বিবরণ রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লেখকই ঢাকা জেলার উৎকৃষ্ট ধরণের তুলার প্রশংসা করেছেন বা ঢাকায় এর উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ফলে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে এগুলোর চাষ ও উৎপাদন কেবলমাত্র পূর্ববংগেই হতো। আবার অন্য যারা, কোন একটা নির্দিষ্ট সময় সীমার জন্য এর চেয়ে বিস্তৃততর বিবরণ দিয়েছেন তারাও শুধু একটা অঞ্চলের হিসাবই ধরেছেন। এই বিবরণী ক্রয় ও

ব্যবসার বিভিন্ন পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধা আলোচিত হয়েছে। ইংরেজদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের ও নমুনা দেখে চুক্তি সম্পাদনের কালে এক-চতুর্থাংশ অগ্রিম দানের কথাও এতে আছে, যার থেকে ফরাসী কোম্পানীর স্থায়ী আর্থিক দৈন্যের কথা বোঝা যায়। তুলার দাম কিভাবে তুলার উৎপাদন ও উৎকৃষ্ট তুলার সরবরাহের উপর নির্ভরশীল ছিল তার উল্লেখ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁতী ও দরজীরা জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তুলা সংগ্রহে সে সময়ে প্রস্তুত সুতীবস্ত্র উন্নত মানের হতো না। ইউরোপগামী জাহাজ জানুয়ারীতে ভারত ত্যাগ করতো বলে ব্যস্ত থাকতো, সমগ্র জানুয়ারী মাসে এর খুব চাহিদা থাকতো। তাই ফেব্রুয়ারী মাসে কেনাকাটা করাই ছিল সমীচীন। এ উদ্দেশ্যে জানুয়ারীতে যোগাযোগ করতে হতো, একাধিক ব্যক্তির সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হতো, যাতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দাম কম রাখা সম্ভব হয়। এ পরিস্থিতিতে 'অবাধ ব্যবসাতে' ইংরেজদের হস্তক্ষেপ এবং পাটনা ইত্যাদি স্থানে ফরাসীদের ব্যবসার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে এবং আসন্ন ইংগ ফরাসী যুদ্ধের সম্ভবনার পরিপ্রেক্ষিতে গোমস্তা ও দালালদের উপর চাপ দিয়ে বেশী লাভ করার জন্য রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করার ইংগিত ও এই দলিলে রয়েছে যা পরবর্তী শতাব্দীতে নতুন তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছিল।

শেষ হল দ্বিতীয় অধিবেশন। দ্রুত মধ্যাহ্ন ভোজ সমাধা করে ঢাকা মিউজিয়ামে উপস্থিতি। ঢাকা মিউজিয়াম প্রসংগে প্রথমেই মনে আসে নলিনীকান্ত ভট্টশালী'র নাম। তিনি ছিলেন এর রূপকার। সুদীর্ঘ তেত্রিশ বছর ধরে তিনি এখানে আর্থিক দৈন্যকে উপেক্ষা করে অবস্থান করেছেন, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহ সংগ্রহ ও তালিকাভুক্ত করেছেন। বর্তমান কর্তৃপক্ষ সে কৃতজ্ঞতাকে সশ্রদ্ধ ভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন মিউজিয়ামের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের কালে এবং ভট্টশালীর জন্মশত বর্ষে একখানি অত্যন্ত মূল্যবান "স্মারক গ্রন্থ" প্রকাশ করে। কিন্তু আজ আর মিউজিয়ামের সে কার্যকরী তৎপরতা নেই। নেই যে, তা প্রত্নবস্তু দর্শন কালে প্রত্যক্ষ করা গেল। দ্বাদশ শতকের কাঠের খোদাই করা ভাস্কর্য—স্তম্ভ উইতে খাচ্ছে। মাটি ভাংগতেই সাদা বড় বড় উই বেরিয়ে এল। মিউজিয়ামের কর্মীদের দেখাতেই তাঁরা জানালেন—আট দিন আর দেখা হয়নি। এ রকম অবৈজ্ঞানিক-ভাবে রক্ষণাবেক্ষণের দৃষ্টান্ত দেখে কষ্ট হলো। প্রথমেই এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিল্প সুষমা মণ্ডিত ও মূর্তিতত্ত্বের দিক থেকে খ্যাত একাধিক বৌদ্ধ ও ব্রহ্মণ্য ভাস্কর্য—নিদর্শন। এগুলি প্রাচীন বংগ, সমতট ও বরেন্দ্র বা আধুনিক পূর্ব ও উত্তরবংগ থেকে সংগৃহীত। মনে হলো, রাষ্ট্র বিপ্লবের সুযোগ বেশ কিছু নিদর্শন অপসৃত। একটি একাদশ শতকের কৃষ্ণপ্রস্তরের মহাযান বৌদ্ধদের দেবী মহাপ্রতিসরা। উর্দ্ধাংশ ভগ্ন, অষ্ট ভুজা দেবীর তিনটি মুখে চরম প্রশান্তি। পদদ্বয় আড়াআড়ি ভাবে যুগ্মকমলে উপবিষ্টা। বাহুতে অসি, চক্র, তীর, ধনুক, আদি ধারণ করে আছেন। সম্ভবতঃ ইনি চতুর্মুখা, পিছনেরটি মনে হয় খোদিত প্রস্তরের সঙ্গেই মিশে আছে। পাল যুগের অবশ্যই এটি একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। প্রাপ্তিস্থান বিক্রমপুর। আর একটি দ্বাদশ শতকের খদিরবনি বা শ্যাম তারা'র প্রস্তরমূর্তি ও দর্শনীয় বস্তু। এটি ঢাকা জেলা থেকে সংগৃহীত। তারার অষ্ট রূপ এর চার পাশে ক্ষুদ্রাকৃতিতে ক্ষোদিত ও একটি বজ্রসত্ত্ব বেদীর একেবারে দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। এই ভাবে ত্রিবিক্রম বিষ্ণু, বৌদ্ধদের জ্ঞানের দেবী মঞ্জুশ্রী, বিষ্ণুর বরাহ অবতার। বংশী ধারী-কৃষ্ণ (কৃষ্ণ প্রস্তর, ১০শ শতক) প্রভৃতির মূর্তি দর্শন-অন্তে পাহাড়পুর, সাভার, বিক্রমপুর প্রমুখ প্রান্ত থেকে সংগৃহীত পোড়ামাটির ভাস্কর্য সম্বলিত কিছু নিদর্শন ও দেখা গেল।

একটি নিবেদন—মোহর, রঘুরামপুর থেকে প্রাপ্ত, বিশেষ আকর্ষণীয়। ৫ ইঞ্চি × ৩ ইঞ্চি'র এই মোহরে (Seal) 'ভদ্র'—ধরণের এক মন্দির-অভ্যন্তরে ভূমিস্পর্শ—আসনে বুদ্ধদেব উপবিষ্ট, চতুষ্পার্শে ছোট ছোট ছ'টি বুদ্ধমূর্তি। প্রস্তরের স্তম্ভগুলি এক নজরে দর্শন করে সেই সব তাম্রশাসন প্রত্যক্ষ করলাম যেগুলির অভাবে প্রাচীনবঙ্গের জনজীবনের বহু তথ্য আমাদের কাছে চিরকালের মতো অজ্ঞাত থাকতো। এই রকম কয়েকটি তাম্রশাসন হচ্ছে বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর লিপি, সমাচারদেবের ঘুগ্রাহাটী ও কোটালিপাড়া লিপি, চট্টগ্রামের নিকটবর্তী বড় আথড়াতে প্রাপ্ত এবং অসম্পূর্ণ কান্তিদেবের তাম্রশাসন, শ্রীচন্দ্রদেবের কেদারপুর ও ধুল্লা (রাধানগর) লিপি, ভোজবর্মার বেলাব লিপি, সামলবর্মার বেলাব লিপি, হরিবর্মার সামন্তসার লিপি, বিশ্বরূপ সেনের মদনপাড়া লিপি এবং দশরথদেবের আদাবাড়ী লিপি। এগুলির অধিকারী হয়ে ঢাকা মিউজিয়ম অবশ্যই সমৃদ্ধশালী। এতদ্ ভিন্ন বেশ কিছু আরবি ও ফার্সী শিলালিপি প্রত্যক্ষ হলো যেগুলি বঙ্গে মুসলিম সুলতানদের তৎপরতা অনুশীলনে অপরিহার্য। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের চিত্রকলা এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বঙ্গের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাদি দর্শন করেই সংগ্রহ করলাম 'নলিনীকান্ত ভট্টশালী স্মারক গ্রন্থ'। সময় সংক্ষেপ, উত্তর কালে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্নবস্তুসমূহ দর্শনের প্রত্যাশা নিয়ে তৃতীয় অধিবেশনে উপস্থিত হতে হলো। অধিবেশনের তখন অন্তিম লগ্ন। কেবলমাত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ডঃ অমলেন্দু দে'র রচনা পাঠ-ই শোনার সুযোগ হলো। এ অধিবেশনের সভাপতি প্রবীন ঐতিহাসিক পরমাত্মাশরণ। ডঃ দে পাঠ অপেক্ষা বক্তৃতা-ই দিলেন, তা মনোগ্রাহী। বিষয়টাও বিতর্কতা-মূলক—"বাংলাদেশে বিচ্ছিন্নতাবাদের পটভূমি-রচনায় সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক জীবনের প্রভাব'। তিনি উনবিংশ শতকের মুসলিম মননের ক্রমবিকাশের দু'টি পর্ব নিয়ে যে আলোচনা করলেন তা প্রধানতঃ রেজারেণ্ড লঙ্ ও আব্দুল লতিফের এবং তৎসহ সৈয়দ আমীর হোসেন ও আমীর আলীর কর্মপ্রবাহকে অবলম্বন করেই।

সময় যেন দ্রুত গড়িয়ে চলে। এবার এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বাংলাদেশ-এর গৃহপ্রাঙ্গণে অন্যান্য সদস্যদের সাথে চা-চক্রে মিলিত হওয়া। ক্রমাগত মানুষের উষ্ণ সান্নিধ্য ও ভোজন। কথা আর কথা। কিছু প্রাপ্তব্য বইয়ের সংগ্রহও করা গেল সেখান থেকে। আবার গত রাতের মতোই জনতা ব্যাঙ্কের আমন্ত্রণে হোটেল পূর্বাণীতে আহার পর্বে যোগদান। এই দু'দিনেই যেন এত উদ্দীপনা ও আতিথেয়তায় তথা গুরুভোজনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আগামীকাল অধিবেশনের শেষ দিন। সন্ধ্যাকে বন্ধুবর মুসার সাথে তাঁদের ক্লাবে উপস্থিতি ও কিছুক্ষণ গল্প করা।

* * *

১৪ই মে, অধিবেশনের শেষ দিন। সকলেই মনে হলো ইতিমধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। সকাল ন'টার বেশ কিছুক্ষণ পরে অধিবেশন আরম্ভ হলো। সভাপতি—এ দেশের প্রবীণ ও খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ডঃ হবিবুল্লাহ্। একজন পূর্বজার্মানীর তরুণ অধ্যাপক পিয়াজে প্রথমে একপ্রস্থ বই ইতিহাস পরিষদকে দান করে তাঁর ছোট প্রবন্ধ পাঠ করলেন, যাতে কূটনৈতিক চিন্তাধারার প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল। ডঃ রায় ও ডঃ সিংহ প্রাচীন নদী বিষয়ে বেশ কিছুক্ষণ কর্মসূচীর বাইরে আলোচনা করলেন, ফলে বর্তমান লেখকের 'ইতিহাস রচনার পদ্ধতি ও সমস্যাবলী'—আলোচনা সংক্ষিপ্ত করতে হলো। পরবর্তী গুরুত্বহীন এক প্রবন্ধ পাঠ-অন্তে সমাপ্তি হলো ইতিহাস সম্মেলন। ডঃ হবিবুল্লাহ্ সকলকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানালেন—যাঁরা বিদেশ থেকে এসে এই সম্মেলনে অংশ

নিয়েছেন। ডঃ হবিবুল্লাহ্'র অনুরোধক্রমে রোমিলা থাপার ভারতে ইতিহাস রচনার বিভিন্ন তৎপরতা বিষয়ে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিলেন। বর্ষীয়ান ভারত প্রেমিক ডঃ ব্যাশম আশাতীত সাফল্যের জন্য এই অধিবেশনের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানালেন। বলতে ভুললেন না যে আগামী বছরে এসে তিনি বাংলাভাষায় বক্তৃতা করবেন। এখানে একান্তভাবে উল্লেখযোগ্য যে ডঃ হবিবুল্লাহ্'র বাইরে অপ্রকাশ্য কঠোর পরিশ্রম ও অসামান্য তৎপরতা এত বড় এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনকে এতখানি সাফল্য মণ্ডিত করেছে।

মধ্যাহ্নভোজের নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ প্রায়। দ্রুততালে আহার সমাপন্তে হঠাৎ দেখি শ্রদ্ধেয় মূর্তজা আলি মহাশয় আমাকে একপাশে ইশারায় ডাকছেন। কাছে গেলে তাঁর রচিত 'শাহ্‌জালাল ও সিলেটের ইতিহাস' বইখানি উপহার দিলেন। আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রতি এই স্নেহে আমি অভিভূত। সিলেটের এই সৈয়দ পরিবারের বহু কথিত বিদগ্ধতা ও উদারতা আর একবার প্রত্যক্ষ করে আমি কিছুক্ষণ স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে থাকলাম। পাশে বন্ধুবর কমলাকান্তবাবু হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের এঁরাই দিশারী, তারা এঁদেরই হাতে গড়ে উঠবে—তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সময় তো আর বসে থাকে না। ইতিমধ্যে তাগাদা এসেছে ঢাকার অবশ্য দর্শনীয় কিছু ঐতিহাসিক স্মৃতি প্রত্যক্ষ করার। অতএব পরিদর্শক সমেত বহিরাগত আমরা সকলে বের হলাম। প্রথমেই গন্তব্যস্থল—লালবাগ দুর্গ।

বুড়িগঙ্গার উত্তর তীরে উনিশ একর জমি নিয়ে মোগল-দুর্গ এই লালবাগ পুরাতন ঢাকারই অন্তর্গত। শায়েস্তা খাঁর প্রত্যক্ষ তদারকে এটির নির্মাণ আরম্ভ, আর ঔরঙ্গজেবের পুত্র আজম শাহ এখানকার "হামাম ও দরবার হল্" নির্মাণ করেন। এটি এখন মিউজিয়ামে রূপান্তরিত। চারিপাশে পরিকল্পনানুযায়ী ফুলের বাগান দর্শককে সহজেই আকৃষ্ট করে। আজম শাহ্ ১৬৮০তে বঙ্গদেশ ত্যাগ করলে পুনরায় দুর্গটি নির্মাণের দায়িত্ব শায়েস্তা খান পান। কিন্তু চার বছর পরে কন্যা বিবি পরীর অকালমৃত্যুতে শোকগ্রস্ত পিতা (শায়েস্তা খান) এটি অসমাপ্ত রেখে দেন। বাইরে থেকে এর সৌন্দর্য আজ আর প্রত্যক্ষ করা যায় না। পার্শ্ববর্তী বুড়িগঙ্গারও সে যৌবন আর নেই। কচুরিপানা, অগভীরতা, অপরিচ্ছন্নতা তার প্রাচীন জৌলুসকে হীনাবস্থায় এনেছে। অতএব প্রথমেই আমরা দেখি জাদুঘর। দুর্গের পূর্বাংশে এর অবস্থিতি। ভূমিতলে মোগলকালীন অস্ত্রশস্ত্র—বর্ম, ছোরা, ভূজালি, তীর ধনুক, বন্দুক, পিস্তল। দ্বিতলের প্রথম ঘরে হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহ্‌জাহান ও ঔরঙ্গজেবের রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রার এক উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ। রয়েছে দারা শিকোর লেখা প্রবন্ধ 'মাজমাই-উ-বাহ্‌রেন।' দ্বিতীয় ঘরে পাত্র, প্রাচীন ক্ষুদ্র চিত্র, শিকারের দৃশ্য সম্বলিত কার্পেট। তৃতীয়টিতে প্রাচীন লিপির নিদর্শন, একটিতে পরিচয় লেখা আনুমানিক ১২ শতক। কি করে সম্ভব—ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার প্রশ্ন রাখলেন। নয়নাভিরাম পোর্সিলেন-এর পাত্রগুলি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

এখান থেকে সোজা পশ্চিমে রয়েছে বিবি পরীর মকবরা। এঁর পরিচয় একটু রহস্যাবৃত; অনুমিত হয় ইনি শায়েস্তা খানের কন্যা। মৃত্যু ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। একটি চতুষ্কোণ বেদীর মধ্যস্থলে এঁর কবর-গৃহ অবস্থিত। চন্দনকাঠের দরজাগুলি যেন হিন্দুরীতির স্মারক। আর ছাদের কার্নিশের কাল পাথরের ভঙ্গিটাও তেমনি। মূল কবর যে প্রকোষ্ঠে—তার দেওয়াল শ্বেত মর্মরের। মকবরার দক্ষিণে রয়েছে লালবাগ মসজিদ, সম্রাট ফারুক শিয়র নির্মিত।

এরপর পুরাতন ঢাকার পশ্চিম-প্রান্তে সুবিখ্যাত ঢাকেশ্বরী মন্দির ও দেবী দর্শন করা গেল। মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতেই প্রথমে নহবৎ-খানা। তার উত্তরাংশে চারটি মঠ বা শিবমন্দির বেশ অর্বাচীন কালের। পূজারী জো. জানালেন ঢাকেশ্বরী মন্দির হাজার বছরের পুরাতন। কিন্তু প্রকৃতই এর অতীত ইতিহাস রহস্য বৃত। বল্লাল সেন বা শ্যামল বর্মা থেকে রাজা মানসিংহের আমল পর্যন্ত কালে মন্দিরটি নির্মিত বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু ঢাকার 'হোসেনী' দালানের ইট ও এই মন্দিরের ইট অবিকল একরকম হেতু অনেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুজরি আমলে এটির নির্মাণ কাল নির্দেশ করেন। শ্রীমতী দেবলা মিত্র'র মতে মন্দিরটি এই রকম সময়েই নির্মিত। 'ঢাকা' নামকরণ 'ঢাকেশ্বরী' থেকে হয়েছে বলেও প্রচলিত ধারণা রয়েছে। আর চারটি মঠ কোলকাতার মল্লিক বংশের কোনও কৃতীপুরুষ প্রতিষ্ঠা করেন, এমন ধারণাও প্রচলিত। প্রসঙ্গত মঠ নির্মাণের আদি পর্যায়কে চিহ্নিত করা সুকঠিন। এ বিষয়ে একটা প্রচলিত বিশ্বাস হচ্ছে বৌদ্ধদের অনুকরণে তান্ত্রিকযুগে (৭—৮ম শতক) হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত তান্ত্রিকদের প্রধান উপাস্য দেবতা লিঙ্গমূর্তি স্থাপনের জন্য মঠ নির্মিত হয়েছিল। মঠের পশ্চিমাংশে এক সুবৃহৎ পুষ্করিণী, বাঁধানো ঘাটের অধিকাংশই ভগ্ন। পূজারী জানালেন যে সাম্প্রতিক রাষ্ট্রবিপ্লবের কালে খান সেনারা এখানে বহুবার এসেছে, কিন্তু কোনও বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর মানুষকে না পেয়ে কিছু বলে নি বা করেনি, চলে গিয়েছে। অষ্টধাতুর দশভূজা মূর্তিটি কিন্তু বড়ই সুন্দর।

ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা ছাড়িয়ে দেড়মাইল আরও উত্তরে গিয়ে বুড়িগঙ্গার তীরে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত সাত গম্বুজ মসজিদটি দেখে শায়েস্তা খানের আমলের স্থাপত্য বিষয়ে কিছু ধারণা করা গেল। এতে তিনটিই গম্বুজ, চারকোণে চারটি গম্বুজ-শীর্ষক স্তম্ভ, সেকারণে বলা হয় সাত গম্বুজ।

সময় সংক্ষেপ। অধিবেশন শেষ হয়েছে। অপরাহ্নে বাংলাদেশের অবিসংবাদী নেতা বঙ্গবন্ধু আমাদের সঙ্গে চাচক্রে মিলিত হতে আসছেন। অতএব সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই ছাত্র-শিক্ষক মিলন কেন্দ্রে প্রত্যাবর্তন। যথাসময়ে বঙ্গবন্ধু এলেন ও ভারতীয় তথা বিদেশীয় প্রতিনিধিদের সাথে একে একে পরিচয় করিয়ে দিলেন শ্রদ্ধেয় ডঃ হবিবুল্লাহ্। সে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। 'কেমন আছেন, ভাল আছেন তো'। এ তো সেই বজ্রকণ্ঠ নয়! বেশ কিছুক্ষণ আচরণে জড়তা থেকে গেল। পরবর্তী পর্যায়ে ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীসুবিমল দত্ত'র ভারতীয় প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ অনুষ্ঠানে যখন ঢাকা থেকে বেশ কিছুটা দূরে আমরা চলেছি তখন সুপ্রসিদ্ধ লিপিতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিক ডঃ সরকার আমাদের মাঝে বঙ্গবন্ধু'র উপস্থিতিকালের একটি ঘটনা জানালেন। ডঃ হবিবুল্লাহ্ তাঁকে জোর করে এগিয়ে দিয়ে বললেন—আপনি অন্তত ভারতীয় প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুকে কিছু বলুন। তিনি কি যে বলবেন—তা ভেবে পান না। কোন কিছু চিন্তা না করে হঠাৎ তিনি বঙ্গবন্ধুকে বললেন—আমি ডঃ সরকার। তা অনেক দিন আগে একজন ছিলেন 'দেশবন্ধু'। আর আপনি 'বঙ্গবন্ধু'। আপনি একমাত্র এই উপমহাদেশের নেতা যিনি বলিষ্ঠকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—আমার দেশে সংখ্যালঘু সমস্যা বলে কিছু নেই। আর কেউই এদেশে এই রকম কণ্ঠে এই কথা বলতে পারেন নি।" একথা শুনে উপস্থিত আমরা দ্রুতগামী যানের ভিতরেই ডঃ সরকারকে সাধুবাদ দিলাম।

উপাচার্য কর্তৃক শেষ নৈশভোজে সকালে উপস্থিত ছাত্র-শিক্ষক মিলন কেন্দ্রে। এমন

আড়ম্বর হোটেল পূর্বাণীতেও প্রত্যক্ষ করিনি। মহুমিয়া বাবুর্চি'র রান্নাও কখনো বিস্মৃত হবো না। উপাচার্য যে আদর-যত্নের অপ্রতুলতার কথা বললেন—তার বিপরীত কিন্তু সর্বক্ষণ প্রত্যক্ষ হয়েছে। আমাদের পক্ষ থেকে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বললেন—আমার সঙ্গে কিন্তু এ বাংলার তরুণ লেখক ও কবি'র যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল ও আছে। এখনও আমি নিয়মিত তাদের লেখা ও কবিতা পড়ি। এমন কি মুখস্ত বলতেও পারি। প্রথমেই বলি—যে আতিথেয়তা আমরা পেয়েছি, তার তুলনা নেই। তবুও বলি—এতখানি পাওয়া এবং যা পাইনি তাও পাওয়া বা চাওয়া অন্যায়। যেখানে হাজার হাজার মানুষ সাধারণ খাদ্য পায় না, সেখানে এতখানি সমাদর করা উচিত হয়নি আমাদের। যে যৌবন একদা আমার ছিল, তা আজ প্রত্যক্ষ করলাম এখানের যৌবনের সাথে পরিচিত হয়ে। অতি উন্নতমানের চিন্তাধারা প্রকাশিত এমন রচনাও প্রত্যক্ষ করলাম। তা উপাচার্য মহাশয়কে, ঢাকা—রাজসাহী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল উপাচার্যকে এবং সরকারকে অনুরোধ করবো—এই নবযৌবনকে দেশ বিদেশে পাঠান—গবেষণা, অনুসন্ধান ইত্যাদির জন্য। সে যেন তার চিন্তাচেতনাকে প্রসারিত করতে পারে, স্বাধীন বাংলার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির সহায়ক হয়। আমিও এই বঙ্গের মানুষ, জন্মেছি পূর্ববঙ্গে। এটা আমার মাতৃভূমি, কিন্তু বিধাতার অভিশাপে আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে ছিটকে গিয়েছি দূরে ওদিকে এবং নিজের আত্মাকে ভারত-আত্মার সংগে মিলিয়ে দিয়েছি। কিন্তু যে ভাষার প্রেম থেকে এই স্বাধীন বাংলার উদ্ভব—কামনা করবো, তা যেন দীর্ঘজীবি হয়, আপনাদের সমৃদ্ধি যেন উত্তরোত্তর বাড়ে, দিগ্বিদিকে যশ ছড়িয়ে পড়ে'। এই কামনা আমাদের সকলেরই। মন ভারাক্রান্ত। এত আগ্রহ, এত প্রীতি-ভালবাসা—যদি মুহূর্তগুলি চিরস্থায়ী হতো, তাহলে কতোই না ভাল হতে !

* * * *

১৫ই মে'র সকাল। প্লাবনে সড়কপথ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ময়নামতীর বিকল্প স্থান হিসাবে আমাদের সোনারগাঁ দর্শনে যাত্রা। এই সেই তথাকথিত মধ্যযুগের সোনারগাঁ যার সমৃদ্ধির কথা আজ কিম্বদন্তীর পর্যায়ে। এই সেই সোনারগাঁ যার মহাজনদের কাছে বাংলাদেশ বন্ধক ছিল। সাড়ে দশটাতে আমাদের মূল প্রাচীন সোনারগাঁর প্রবেশ পথে উপস্থিতি। ডানপাশে গত শতাব্দীর জমিদারের ভগ্নদশা প্রাপ্ত গৃহের কাঠামো দাঁড়িয়ে। ছাদ-হীন, থামযুক্ত দেওয়াল ও প্রবেশমুখে মিনেকরা অপূর্ব নক্সা আজও তদানীন্তন সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দিচ্ছে। ইটের বাঁধানো রাস্তা দিয়ে 'পানাম'-এ যাত্রা। ডানপাশে দু'টি পরিত্যক্ত বিদ্যালয়তনের বাড়ী, একটি কানাই পোদ্দারের বলে জানানো হলো। পানামের ভিতর বাড়ীর সুউচ্চ থামের মিনেকরা নক্সাদি ধনকুবেরদের এককালীন প্রতাপকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু সবই আজ হতশ্রী। অপরের দখলে, কিন্তু তাদেরও সামর্থ ও সাধ্য নেই তার পূর্ব জৌলুস ফিরিয়ে আনার। এই পানাম-ই প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন সোনারগাঁ। এ অতীত ইতিহাস অনেকটা রহস্যাবৃত। যেমন বলা হয় পানামেই প্রথম মুসলমান-শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যা ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত মগ্গাদেও (মকরদের, বগদের কোন রাজা?) নামক জৈনক হিন্দুরাজা বর্তমান মগ্গাপাড়ায় স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করতেন এবং সম্ভবতঃ হিন্দুস্থাপিত সুবর্ণগ্রামের শেষ নরপতি। আরও অনুমান যে কদে-সাহের (১২৮১-৮৭ খ্রীঃ)

আমলে পানাম থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়ে মগ্রাপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৮৬তে রাল্‌ফ্‌ ফিচ দেখেছেন যে এখানেই ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র উৎপন্ন হয়। ভারতের অন্যান্য অংশের মতো এখানকার মানুষের ঘরগুলি ছোট ও খড়ে আচ্ছাদিত। এখানকার অধিকাংশ মানুষই অত্যন্ত ধনী। আজ কিন্তু প্রাচীনের নিদর্শন যা কিছু আছে বা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হলো তা চিনতে কষ্টসাধ্যই হবে। নতুন বসতি, রাস্তা অপেক্ষা সাধারণ ভূমি বেশ নীচু, নতুন নতুন আম্রাদি বৃক্ষের সমারোহ—এই হচ্ছে অতীতের সোনারগাঁর বর্তমান সংক্ষিপ্ত চিত্র।

পানামের কিছু প্রাচীন ইঁটের ভগ্ন প্রায় কিন্তু যানবাহানাদি চলার যোগ্য সেতু দর্শন করে আমাদের একটি দলের যাত্রা হলো প্রায় চার মাইল দূরবর্তী গোয়াল-দী অভিমুখে। সঙ্গে যুবক সদৃশ ডঃ ব্যাশম্‌ ডঃ আনন্দকৃষ্ণ (ভারতীয় কলাভবন, বারাণসী), ডঃ দেশাই এবং জনৈকা ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের পত্নী। বহুদিন বাদে গল্প করতে করতে শ্রীমতীর সাথে গাঁও-এর পথে পথে, নড়বড়ে সেতু পার হয়ে, বৃক্ষছায়ার আড়ালে আড়ালে একটা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করলাম। মাঝে মাঝে জাম-লিচু খাওয়া, ব্যাশমের বারে বারে কিছু উপহার দেওয়া, সে এক অবশ্যই স্মরণযোগ্য ভ্রমণ।

হঠাৎ সামনে দেখি ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে (১৭০৫ খ্রীঃ) আব্দুল হামিদ কর্তৃক নির্মিত এক-গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ, গায়ে সর্বত্র আধুনিককরণের চিহ্ন। কিন্তু এই মসজিদে পৌঁছাবার কিছুটা আগে বামপাশে জঙ্গলের ভিতর ভগ্নস্তূপ প্রায় একটি আরও প্রাচীন মসজিদই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। কোন প্রকারে দক্ষিণ দিক দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করা। ইঁট-পাথরের স্তূপ চারিদিকে ছড়িয়ে। কার্নিশ তথা কোণ ভিন্ন গম্বুজের চিহ্ন নেই। মসজিদটি পূর্বদ্বারী। পশ্চিমদিকে 'ইমামের' কারুকার্যখচিত সুমসৃণ প্রস্তরের আসনটি মহাকালের সাড়ে চারশ' বছর অতিক্রম করে আজ আমাদের বিস্মিত করছে। বেলেপাথর ও বেসল্ট-এর নক্সা-খচিত উত্তর দেওয়ালের ফ্রেমটি হিন্দুস্থাপত্যের সুস্পষ্ট নিদর্শন। জীর্ণ মসজিদ গাত্রের সসংবদ্ধ ইঁট সিমেন্ট-হীন পর্যায়ের স্থাপত্যবিদ্যার অন্যতম উৎকৃষ্ট কৌশলকে প্রকাশ করছে। মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা গেছে যে ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট সুলতান হুসেন শাহের রাজত্বকালে মোল্লা হিজাবর আকবর খাঁ কর্তৃক এটি নির্মিত হয়েছিল।

সোনার গাঁর অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে ক্লান্তপদে তপ্ত রৌদ্রতাপে দগ্ধ হয়ে আমাদের পূর্বস্থানে প্রত্যাবর্তন মুহূর্তেই আলিম সাহেবের কাছে শুনি—ডঃ ব্যাশম হারিয়ে গেছেন বলে এদিকে প্রচার চলছে। যাই হোক, ১৯৩৪তে প্রতিষ্ঠিত মোগরাপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও জলাদি আহারান্তে অপরাহ্নে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন ও মধ্যাহ্ন-ভোজ সমাধা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এই মোগরাপাড়া নামটি এতদঞ্চলে একদা মুর্দ্ধা মগদের জনবসতির পরিচয়কে প্রকাশ করছে।

অপরাহ্নে বাঙলা একাডেমীর তৃণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে বৃহৎ বৃক্ষতলে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের সম্বর্দ্ধনা সভায় যোগদান। সভাপতি সৈয়দ মুর্তাজা আলী। প্রথমে খ্যাতিমান কথাশিল্পী শওকত ওসমান ডঃ রায়ের রচনাশৈলী ও ইতিহাস-রচনা কতখানি সাহিত্যের গুণসম্পন্ন তার বিষয়ে স্বল্পভাষণ দিলেন। পরে ডঃ রায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—অনেক সময় বুদ্ধি বন্ধ্যা হয়, দৃষ্টি অন্ধ হয়। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি কখনো অন্ধ হতে পারে না। ভালবাসাই মানুষের পরম ধন। আমি এই অমূল্য ধন সারাজীবন খুঁজে বেড়িয়েছি। আজ বাংলাদেশের

মানুষের হৃদয়ের স্পর্শে আমি অভিভূত। তাদের এ ভালবাসা আমাকে ঐশ্বর্যময় করে তুলেছে। কেবল বুদ্ধিবৃত্তি বা জ্ঞানচর্চা দিয়ে মানুষকে জানা যায় না। এর জন্য জীবনের অনুভূতি দিয়ে জীবনকে স্পর্শ করতে হয়। আপনারা বলেন আমি ইতিহাস করি, সাহিত্য করি। আসলে আমি কিছুই করি না। আমি শুধু মানুষকে স্পর্শ করি, তার জন্য কখনো ইতিহাস, কখনো সাহিত্য ও সমাজতত্ত্বের আশ্রয় নিই। আমি পেশাগত পণ্ডিত নই। সেই নবীন জীবনেই সঙ্কল্প ছিল—ভালবেসে জীবন্ত বাঙালীকে স্পর্শ করবো। আজ আমার সে সঙ্কল্প সার্থক হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। কিছুদিন ধরেই তাই চিন্তা হয়েছে, অন্তরে তাগিদ অনুভব করছি যে 'বাঙালীর ইতিহাসের' দ্বিতীয় পর্ব লিখে যাওয়া আমার উচিত। এ কাজ অত্যন্ত প্রয়োজন। যত শীঘ্র সম্ভব এ কাজে হাত দেওয়া উচিত। বাংলাদেশের মানুষই এই কর্তব্যবোধ জাগিয়ে দিয়েছে। সঙ্কল্পকে করেছে দৃঢ়তর। সুখ্যাতি চাই না, আপনারা আশীর্বাদ করুন, বিধাতা যেন আরও কিছুদিন জীবিত রাখেন। বাঙলা একাডেমীর মহাপরিচালক ডঃ মযহারুল ইসলাম এই দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশের দায়িত্ব পালন করবেন ঘোষণা করলেন। কিন্তু কথা হচ্ছে ডঃ রায় আদৌ রচনা করবেন কিনা তা একান্ত সন্দেহের বিষয়। তাঁকে এর আগে অন্ততঃ তিনবার এ বিষয়ে আবেদন করে ভিন্ন উত্তর পেয়েছি।

সূর্য অস্তাচলগামী। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। দু'খানি মাত্র প্রাপ্তব্য বই 'বাংলা একাডেমী' থেকে কিনে আবার ছাত্র শিক্ষক মিলনায়তনে উপস্থিত। অডিটোরিয়াম বেশ জনপূর্ণ। লক্ষ্যণীয় যে ছাত্রদের সংখ্যাই বেশী। প্রথমে উপস্থিত হতে মন চায় নি, কিন্তু অন্তে এই উপস্থিতির পূর্ণ যৌক্তিকতা উপলব্ধি করলাম। কবীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বাংলাদেশ আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে 'বাঙালীর ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্বের' কাঠামো সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে উঠলেন। শব্দহীন পরিবেশ। তিনি বললেন—"সভামুখ্য মহাশয়, বহুদিন বাংলাদেশকে দেখি নি। তা আজ পঁচিশ বছর হয়ে গেল। সেই বাংলা, যে আজ স্বাধীন বাংলাদেশ। বাল্যের, কৈশোরের ও যৌবনের কিছু নেশা আজও লেগে আছে। সেই নেশা হাতছানি দেয়। দেখবো—সেই দেশকে দু'চোখ ভরে খুব কাছে থেকে আর একবার দেখবো। দেশকে দেখা মানে তো মানুষকে দেখা। সারা জীবন আমি মানুষকে দেখবার চেষ্টা করেছি! সেই দেশকে দেখতে ইচ্ছা করে মাঠে, ঘাটে, গঞ্জে। একটা সময় আমার কেটেছে মেঘনার মত নদ-নদীর তীরে তীরে, সাধারণ মানুষের মাঝে। তখন আমি রাজনীতি করতাম। সেই সব সাধারণ মানুষের জীবন এক রকম। আবার নাগর মানুষের পরিচয় অন্য রকম। প্রথমোক্তরাও স্বপ্ন দেখে, ভালবাসে।"

"বাঙালীর ইতিহাসের মধ্যপর্বের কিছু কিছু কথা আগে এখানে বলেছি। আপনাদের ভাল লেগেছে কিনা জানি না। এই বলার অন্যতম কারণ নিজের সেই অতীত ধ্যানধারণাকে আর একবার যাচাই করে নেওয়া। বাংলা দেশের, বাঙালীর মধ্যপর্বের কথা বলতে যাচ্ছি। অনেকে অনুযোগ করেন, দীর্ঘদিন হয়ে গেল, কেন প্রথম খণ্ড (আদি পর্ব) বের হচ্ছে না। এখানে এসে জানলাম—ময়নামতী থেকে বেশ কিছু তাম্রশাসন পাওয়া গেছে, এর থেকে নতুন তথ্য আমরা পেয়েছি। আরও প্রকাশিত নতুন তথ্যগুলি সবই বাংলাদেশে। আগে এ সবের কোন খবরই জানতাম না। এগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আদিপর্বের অনেক কিছুই পরিবর্তন করতে হবে।

এখন বেশ কিছুদিন যাবৎ ভাবছি, কর্মক্ষমতা তো আর বেশীদিন নেই। দ্বিতীয় পর্ব লিখতে হবে, এই ভাবনা জেগেছে গত এক বছর থেকে।

এই দ্বিতীয় পর্বের ইতিহাস লিখতে হলে কি কাঠামো হবে? প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে—আমি রাজা-বাদশা'র, যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস লিখি না; লিখি বা লিখতে চেষ্টা করি সাধারণ মানুষের ইতিহাস। রাজা-বাদশা আমার ইতিহাসে মুখ্য নয়—তাঁদের ভূমিকা গৌণ। ইতিহাস লিখতে হলে তা হবে একটা দেশের এক বিশেষ কালের। কাল হলে তা তুর্ক থেকে আরম্ভ করে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। Settlement-এর কাজ প্রথম আরম্ভ হলো কোম্পানীর আমলে ১৭৯৩তে; এই সময় থেকেই প্রাচীন রাজস্ব, ভূমি ব্যবস্থা ইত্যাদি পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক যুগের (Modern Age) শুরু। অতএব মধ্যপর্বের সময় সীমা হচ্ছে মোটামুটি ১২০০ খ্রীঃ থেকে ১৭৯৩ খ্রীঃ পর্যন্ত। এবার দেশটি হচ্ছে বাংলা ভাষাভাষী দেশ। পাত্র—মানুষ, মানুষের জীবন। প্রথমেই দেশের কথা জানতে হয়। জানতে হবে নদ-নদী, খাল ইত্যাদির কথা। জানতে হবে পদ্মা, মেঘনা প্রভৃতি নদীর ইতিহাস। এই সব নদ-নদীর গতি পরিবর্তনের খবর না পেলে কখন কোন্ স্থানে নতুন বসতি স্থাপিত হয়েছে, তা জানতে পারবো না। বাঁওড়-এর চূড়ায় চূড়ায় মৎস্যজীবীরা বাস করে, মাছ ধরে। প্রসঙ্গতঃ বলি—এদেশের মাটি একরকম নয়, দু'রকম—পুরাতন ভূমি (old alluvium) ও নতুন ভূমি (new alluvium)। লালমাই, রাঙামাটি, রংপুর, সাভার—সবই পুরাতন ভূমি। আবার ফরিদপুর জেলা, ঢাকার কিছু কিছু অঞ্চল, চাঁদপুর—এগুলি নতুন-ভূমি। মধুপুরের গড়ে খুব বেশী দিন বসতি স্থাপিত হয় নি, বড় জোর তা চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে। আবার যেখানে, সেখানে মধ্যযুগে স্থির কৃষিজীবী মানুষের বসতি হয়েছে। এবার হাট বাজারের খবর নিতে হয়। ভৈরব—বাজার না গঞ্জ? পুরাতন নথীতে কিন্তু 'গঞ্জ'। বাজার ও গঞ্জের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, তা দেখতে হবে। যেখানে হাট বসে সেখানে কয়েকটি গ্রামের মানুষ আসে এবং সেই হাটকে কেন্দ্র করে অর্থনীতি গড়ে ওঠে; ও এই economy'র পরিধি কতখানি ব্যাপ্ত, তাও দেখতে হবে। বাংলাদেশের মৌসুমীর একটা বিশেষ ধর্ম আছে। এসবই তো দেশের পরিচয়।

এবার মানুষের কথা। নৃতত্ত্বের দিক থেকে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ কথাগুলি জানা আছে। বাংলাদেশের পীর, দরবেশের দরগাহ মোকাম, আখড়া, মন্দির-মসজিদ ও গীর্জার একটা সুষ্ঠু নক্সা প্রণয়ন করা দরকার। এখানে মঠ প্রতিষ্ঠা হলো কেন? বাংলাদেশে বেশ কিছু সংখ্যক আদিবাসী বাস করে। এদের বিষয়ে গভীরতর পরিচয় দরকার। এদের সমাজ-জীবনের পরিচয়ও জানতে হবে। এদেশে পর্তুগীজরা অনেকস্থানে আড্ডা গেড়েছে। আমি জানি, বরিশালের পর্তুগীজরা গীর্জায় যায় আবার তার সামনে কালিপূজার পাঁঠাবলিও দেয়। এর কারণ কি? চট্টগ্রাম ছাড়া আরব-রক্তের সংমিশ্রণ আর কোথাও দেখি নি। বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমানই এদেশী। আরব, তুর্কী মুসলমানরা কিন্তু কোনদিন বাঙালী মুসলমানদের খাঁটি মুসলমান বলে মনে করতো না।

এবার কৃষিকর্মের কথা বলতে হয়। বাঁচার জন্য তার একান্ত প্রয়োজন। মধ্যযুগে ধান ছাড়াও এদেশে তিল, সরসে জন্মাতো। আজ তা হয় না কেন? কোথায় কোথায় তা হতো, তা জানতে হবে। তুলো কোথায় হতো, সন্ধান নিতে হবে। সোনারগাঁর প্রধান আয় কি? তা তো তুলোই। পাটের চাষ কবে থেকে এদেশে

ব্যাপক হলো? মনে রাখতে হবে, বস্ত্রশিল্পই তখন বিদেশী মুদ্রা আনতো। একটা কথা, মাছ যারা ধরে—সেই জেলেরা হিন্দু। কিন্তু তা যারা বাজারে নিয়ে যেত, বিক্রী করতো—তারা মুসলমান। এর কারণ কি? এককালে তেজপাতা বাইরে যেত। যেন তাঁতজাত দ্রব্যাদি।

রঘুনন্দনের 'স্মৃতি' লেখার পর হিন্দু সমাজ নিজেকে গুটিয়ে নিলো। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতো—তাদের ওপর কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো না। যেমন—সাহা সম্প্রদায়। এরা বণিক, বিত্ত-সম্পন্ন। ওই যে সোনারগাঁ-এ বড় বড় পরিত্যক্ত এদের বাড়ী দেখে এলাম—এরাই ছিল প্রকৃতপক্ষে এদেশের অভিভাবক। এদেশ ওদের কাছে বিক্রীত ছিল। একটা কথা। পীর-দরবেশ, আউল বাউল—এরাই মুসলমানকে মুসলমান করেছে। আজও মুসলমানদের মধ্যে বাহান্নটি শ্রেণী রয়েছে, এদের সম্পর্কে জানতে হবে।

আশ্চর্যের কথা, বঙ্গে urban centre গড়ে ওঠে নি, অথচ ইসলামিক সভ্যতাটাই urban। 'কসবা', 'আবাদ', 'সরাই'—নামগুলো এরই ইঙ্গিতবহ। জানতে হবে 'গড়' ও 'ভাঁটি'র কথা মধুপুরের গড়ে জয়দেবপুরের যে জমিদাররা এলো তারা কি বাঙালী? আমি যা জানি, তাঁরা তা নন।

খাওয়া-দাওয়ার কথা কিছু বলতে হয়। মধ্যযুগে মানুষের অবস্থা ভাল নয় অথচ মঙ্গলকাব্য ইত্যাদিতে খাওয়ার খুব খবর রয়েছে। বিষয়গুলোকে জানতে হবে। বাঙালী মুসলমানের ধর্ম সম্পর্কেও কিছু বলা দরকার। সে ধর্মে লোকাচার যথেষ্ট মিশেছে। বাংলার বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কও জানা দরকার।

কিন্তু মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য নিয়ে আমার গর্ব নেই। বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার স্থান প্রায় নেই, মূল্য নেই। এর একমাত্র ব্যতিক্রম "পূর্ববঙ্গ গীতিকা"। পূর্ববঙ্গ-গীতিকার মানবিক আবেদনকে যিনি ধারণ না করবেন, তিনি বাঙালীর মধ্যপর্বের ইতিহাস লিখতে পারবেন না। বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই পর্বের সাহিত্যের দৈন্যতা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নি। এটা তাঁকে বেদনা দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে মধ্য যুগে বাঙালী জীবন ছিল শান্ত, স্নিগ্ধ। তাতে সংগ্রামের কোন চেতনা ছিল না। তাই—

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুয়িন!
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন।
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি
জীবনস্রোত আকাশে ঢালি,
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি
চলেছি নিশিদিন।"

শেষ হলো ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তৃতা। ক্ষণিকের তরে অডিটোরিয়ামে শব্দহীন নিস্তব্ধতা। তার পরমুহূর্তেই সমবেত-জনের এক মিনিট ধরে হাততালি। এ রকম অভিজ্ঞতাও এক নতুন জিনিষ। শেষ হলো আমাদের সমবেত উপস্থিত-জনের অনুষ্ঠানে যোগদানের বাধ্যবাধকতা। সূচী-অনুযায়ী চলার বাঁধন এখন আর

নেই। রাত গভীর হয়, আহারান্তে নির্দিষ্ট ঘরে উপস্থিত হয়ে চিন্তা জাগে—এবার বাঁধা অনুষ্ঠানের শেষ অতএব আগামীকালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে উপস্থিত হয়ে ৪৭'—উত্তর পর্বে আবিষ্কৃত তথ্যাদি সংগ্রহ করা।

১৩ই মে। আমাদের মাঝে কিছুটা ক্লান্তি, মনটাও বিষণ্ণ। এমন আতিথেয়তা ও উষ্ণ ভালবাসা যেন এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে স্বপ্ন। আহা, যদি তা কালোত্তীর্ণ হয়ে চেতনায় সর্বক্ষণ বিরাজিত থাকতো! যাক, বন্ধুবর মুসা'র সাথে নির্দিষ্ট সময়ে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে 'নতুন বাজারের' কাছে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মক্ষেত্রে গেলাম। অধীক্ষক ডঃ গফুর ও পরিচালক ডঃ নাজিমুদ্দীন আহ্মেদ-ও রয়েছেন। ইতিমধ্যে শ্রীমতী দেবলা মিত্র প্রমুখও উপস্থিত। ডঃ গফুরের কাছ থেকে '৪৭ উত্তর-পর্বে আবিষ্কৃত বাঙলার নতুন ঐতিহাসিক উপাদানের তথ্যাদি সংগ্রহ করা গেল। এবং এই তথ্যাদির মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ ও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নিম্ন বনানী শোভিত কুমিল্লা জেলার পার্বত্য অঞ্চল তথা ময়নামতীর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি। ময়নামতী খননকার্য-অন্তে তাম্রশাসন প্রাপ্তিতে আজ চন্দ্র-বংশীয় রাজ-বংশ তালিকা যেমন সুপ্রকাশিত, তেমনি লালমাই ময়নামতী অঞ্চলে তাদের সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধধর্মীয় ও রাজনৈতিক তৎপরতার পরিচয় বেশ কিছুটা উদ্ঘাটিত। এসমস্ত উল্লেখ্য যে লালমাই-এর সাথে চন্দ্র রাজাদের রাজধানী "রোহিতাগিরি" বা "লাল পাহাড়"-এর সামঞ্জস্য রয়েছে এবং ইহা ময়নামতীর রাজা গোবিন্দচন্দ্রের মাতা ময়নামতী'র নাম স্মরণ করায় যিনি আজও এতদঞ্চলীয় লোকগীতি ও গাঁথায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। পুরাতত্ত্ব-নিদর্শন এগার মাইল দীর্ঘ ও একমাইল প্রশস্ত লালমাই-ময়নামতী পাহাড়ের চারিপাশে পরিব্যাপ্ত। উচ্চতা এর পঞ্চাশ ফুট, স্থান বিশেষে আরও বেশী। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে হঠাৎ-ই এখানে এক বিশাল বৌদ্ধ-কৃষ্টির কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়। বহু প্রত্নস্থল ঠিকাদারদের তৎপরতায় চিরতরে বিলুপ্ত হয়। আর মাত্র তিনটি কেন্দ্র খননকার্যের জন্য নির্বাচিত হয়। সেগুলি হচ্ছে শালবন বিহার, একটি বৃহদাকার মঠ, কোটিলামুড়ার তিনটি স্তূপ, চারপত্র মুড়া ও একটি ছোট মঠ।

লালমাই-ময়নামতী পাহাড়ের মধ্যবর্তী উচ্চভূমিতে বর্তমান কুমিল্লা শহরের ছ'মাইল পশ্চিমে বৃহত্তম খননকার্যে উদ্ঘাটিত প্রান্তর হচ্ছে শালবন বিহার। এখানে এক বৃহদাকার মঠ (বিহার) মোটামুটি এক চতুষ্কোণ-নক্সার অনুকরণে নির্মিত। কেন্দ্রীয় মন্দিরের চতুষ্পার্শে ১১৫টি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এই বিরাট সৌধ ৫৫০ ফুট দীর্ঘ। বহির্ভাগের প্রাচীর ১৬·৫ ফুট পুরু। ৮·৫ ফুট প্রশস্ত বারান্দা যুক্ত প্রকোষ্ঠগুলি সমগ্র মঠটিকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। প্রবেশদ্বার একটি। উত্তর দিক হতে ১৭৪ ফুট দীর্ঘ ইট নির্মিত পথ, প্রশস্ত সোপান বিযুক্ত ৭৪ ফুট প্রশস্ত প্রধান তোরণের মধ্য দিয়ে চৌকি প্রকোষ্ঠ পরিবেষ্টিত এক বৃহৎ হল-ঘরের (৩৩ফুঃ×২৩ফুঃ) সঙ্গে যুক্ত। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ সাংসারিক আসবাবপত্রে সজ্জিত, অভ্যন্তরভাগে তিনটি হাতকল দ্বারা দেওয়ালের সংগে সংযুক্ত কাঠ-নির্মিত দরজা। এই মঠে চারটি যুগে অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং তা দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত টানা যায়। প্রথম যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যাদিই সর্বাধিক। যেমন তাম্রশাসন, ব্রোঞ্জমূর্তি, স্বর্ণপিণ্ড, রৌপ্য মুদ্রা, দগ্ধমৃত্তিকার সীল ও সীলমোহর, তৈল-প্রদীপ, সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ মৃৎপাত্র, ছাই-মিশ্রিত চুল্লী, কাঠ-কয়লা ও

ও রন্ধন-পাত্রের ভগ্নাংশ। প্রতীতি জন্মাচ্ছে যে এই পর্বে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরেই রান্নার কাজ সমাধা করতেন, স্বতন্ত্র রান্নাঘরের ব্যবস্থা ছিল না। তাম্রশাসন, খোদিতচিত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা ও সীলমোহরের প্রমাণ থেকে আমরা জানতে পারি যে এই সুদৃশ্য ধর্মপ্রতিষ্ঠানটি 'দেব'-বংশীয় নরপতি ভবদেব সপ্তম শতকের শেষার্ধে বা অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে নির্মাণ করেন। দ্বিতীয় পর্বে দেখা যায় যে শ্রমণগণ মূল দ্বার-পথ ইঁট দিয়ে ভরাট করে ওপরে নতুন ইমারত ও কার্নিশ নির্মাণ করেছেন। তৃতীয় পর্বে মানুষে নতুন নির্মাণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে। যেমন প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে পিছনের দেওয়ালে কুলুঙ্গি, ইঁটের বেদী, কোণাকার সোপান। আর প্রথম পর্বের বিহার নির্মাণপদ্ধতি বিস্ময়কর। ভিত সুশোভিত, সূক্ষ্ম ও ক্রম বিভক্ত কোণে সজ্জিত। কেন্দ্রীয় বিহারটি দুইপার্শ্বে ১৭০ ফুট হিসাবে দীর্ঘ এবং তদানীন্তন কালে যথেষ্ঠ উঁচু ও একাধিক তলবিশিষ্ট ছিল। এখানে আবিষ্কৃত কারিগরী ভাস্কর্যশিল্পের তথা অন্যান্য নমুনা পাহাড়পুরের বিহারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উভয় স্থানের প্রাপ্ত বিহারের বর্গক্ষেত্রাকার নক্সা, সৌধের ক্রুশাকার প্লান (সর্বতোভদ্র) ও দগ্ধমৃত্তিকার ফলকের আশ্চর্যজনক মিল রয়েছে। এদের নির্মাণকালের পার্থক্য থাকলেও সম্ভবতঃ তা বেশী নয়।

যথেষ্ঠ পরিমাণে আজ ধ্বংসাবস্থায় থাকলেও এই বিহারটি যে ৭ম-৮ম শতাব্দীর বঙ্গে বৌদ্ধ স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষতার এক পূর্ণ-রূপ-তাতে সন্দেহ নেই। এমন সর্বতোভদ্র সৌধের সাথে এই উপমহাদেশের স্তূপ-স্থাপত্য শিল্পের মিল দেখি না। তাই প্রশ্ন জাগে—বঙ্গে কোন পর্যায়ে এমন প্রথাবিরুদ্ধ রীতির প্রচলন হয়? কেনই বা হয়? এর আদি কি? প্রসঙ্গতঃ উত্তরকালীন জাভার ও ব্রহ্মের স্থাপত্য নিদর্শনকে স্মরণ করা যেতে পারে। আর উল্লেখ করা যায় চন্দ্রকেতুগড়ের গুপ্ত-কালীন আবিষ্কৃত মন্দিরের নিদর্শন। তবে কি এই রীতি বঙ্গের নিজস্ব উদ্ভাবন? এবং তা চতুর্থ অষ্টম শতকের হিন্দু-বৌদ্ধ শিল্পীদের দ্বারা উদ্ভাবিত স্থাপত্যশিল্পের সংমিশ্রণ ও বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের সাথে সাথে এই রীতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রয়োগ করা হয়? এ বিষয়ে আজও শেষ কথা বলার সময় আসে নি।

শালবন বিহারের তিনমাইল উত্তরে কোটিলা মুরা'র তিনটি প্রধান স্তূপের নক্সা উদ্ঘাটিত যা বৌদ্ধধর্মের ঐতিহ্যানুসারী ত্রিরত্ন-বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতীক। আর কোটিলামুরা'র উত্তর-পশ্চিমে দেড়মাইল দূরে উচ্চ সমতল ভূমির উপর হচ্ছে 'চারপত্র মুরা', অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির ও মধ্যস্থলে ৩৫ ফুট উঁচু। এখানে চারটি তাম্রশাসন ও একটি ব্রোঞ্জের কৌটার অবশেষ প্রাপ্তি খুবই মূল্যবান। ময়নামতী অঞ্চলের এইসব তাম্রশাসন আবিষ্কার থেকে এযাবৎ অজ্ঞাত এক নতুন রাজবংশ 'দেব' দের বিষয়ে প্রথম তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে যাঁরা ৭ম-৮ম শতকে এতদঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। চন্দ্র, দেব ও খড়্গ রাজবংশের সাথে পালদের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে এখন এইসব লিপি বহু বিতর্কের অবতারণা করেছে যার জট ঐতিহাসিকেরা এখনও ছাড়াতে পারেন নি।

এখানে প্রাপ্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাগুলিও বহু নতুন তথ্য পরিবেশন করছে। আর শালবন বিহারের প্রথম প্রাপ্ত বুদ্ধের ধ্যানস্তিমিত মূর্তি, বোধিসত্ত্ব, তারা ও সর্বাণী প্রভৃতি প্রায় এক ডজন ক্ষুদ্রাকৃতি ব্রোঞ্জের মূর্তি ৭ম-৮ম শতাব্দীর বৌদ্ধধর্মের মহাযান হতে তান্ত্রিক পর্যন্ত অবস্থার ক্রম পরিবর্তনে পট-শিল্পের ক্রমোন্নতির বিকাশ প্রমাণ করছে। এই সব মূর্তি স্থূল ও অমসৃণ হেতু পর্যাপ্ত সংখ্যায় উৎপাদনের ইঙ্গিতবাহী এবং বৃহদাকার ও উন্নতমানের। আর ভাস্কর্যের সূক্ষ্ম নৈপুণ্য ও চরম উৎকর্ষতার বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ হেতু অনুমিত হয় যে এগুলি প্রস্তর

ভাস্কর্যের নকল ও পাল শিল্পকলা দ্বারা অনুপ্রাণিত। আবিষ্কৃত পোড়ামাটির ফলকগুলিতে অতীত কালের মানুষের সামাজিক ও কৃষ্টিগত জীবনধারার সঠিক চিত্র প্রতিফলিত। পাহাড়পুরের সৌধের ন্যায় এর দৃষ্টিআকর্ষণকারী গতিশীলতা লক্ষণীয় এবং প্রত্নতাত্বিকের মতে বর্ণনায় উৎকর্ষে ও শিল্প চাতুর্যে এই ফলকগুলি পাহাড়পুর-নিদর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। গ্রাম্য মানব-জীবনধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সব কিছুই, নর-নারী পশু-পাখী, স্বর্গীয়-অনৈস্বর্গীয় অস্তিত্ব, সংমিশ্রিত জীব, বৃক্ষ-উদ্ভিদ ও পুষ্প বিভিন্ন ভঙ্গিমায় এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এক কথায় ময়নামতীর খননকার্যে প্রাপ্ত বাস্তব নিদর্শনাদি ৭ম থেকে ১২শ শতাব্দীর অন্তর্বর্তী কালের এতদঞ্চলীয় মানব-তৎপরতার এক নির্ভরযোগ্য চিত্র উদ্ঘাটিত করেছে যার বিষয়ে পূর্বে আমাদের কোন ধারণাই ছিল না।

অপর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্বিক প্রান্তর হচ্ছে দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত মৌজা ফতেহপুর মারাসে অবস্থিত সীতাকোট স্তূপ, বৌদ্ধসভ্যতার অপর কেন্দ্র। ১৯৬৮ তেই প্রথমে এখানে খননকার্য চলে। তারপর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ১৯৭২এতে নভেম্বরে চলে দ্বিতীয় পর্যায়ে খননকার্য। এখানকার প্রধানতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হচ্ছে বৌদ্ধ বিহারের নিম্নতম স্তরে উত্তরাঞ্চলীয় কাল মৃৎপাত্র বা N. P. B. প্রাপ্তি। বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় ভিন্ন বাংলাদেশের এটিই দ্বিতীয় প্রান্তর যেখানে এই N. P. B. পাওয়া গেল। প্রতিটি নিদর্শন উজ্জ্বল ও মসৃণ, সূক্ষ্ম দানা বিশিষ্ট, চক্র-নির্মিত ও গঠন তার পুরু। সীতাকোট ও মহাস্থানগড় ছাড়াও অহিচ্ছত্রা, নালন্দা, চন্দ্রকেতুগড় (বেড়াচাঁপা), বাণগড়, তাম্রলিপ্তি প্রমুখ গাঙ্গেয় অববাহিকান্তর্গত প্রাচীন প্রান্তর সমূহে এই ধরণের মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। সাধারণতঃ N, P, B, মৌর্য ও সুঙ্গ যুগের সমকালীন বলে ধরা হয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিত এই সীতাকোট বিহারের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত মিললেও প্রাপ্ত বাস্তব নিদর্শনাদি কিন্তু ৭ম-৮ম শতাব্দীর বহুল তৎপরতাকে প্রকাশ করেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এই N, P, B, নির্মাণের বিশেষ পদ্ধতি প্রথম শতাব্দীর পরবর্তীকালে হয় অদৃশ্য হয়েছে বা বিলুপ্ত হয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু সীতাকোটের স্তর বিশ্লেষণ এবং মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত N, P, B,-র নিদর্শন থেকে বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সুস্পষ্ট অভিমত হচ্ছে যে উত্তরাঞ্চলীয় কাল পালিশ করা মৃৎপাত্র'র অদৃশ্য হওয়া বা পতন হওয়া ধীরে ধীরে ঘটে এবং তার বিবর্তনও ঘটে একেবারে পাল-রাজবংশের আগমনের পূর্বাবস্থায় ভঙ্গির পরিবর্তনে ও নিকৃষ্ট ধরণের নির্মাণ পদ্ধতি এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে একে কাল পালিশ করা ধূসর বর্ণের মৃৎপাত্র'র সঙ্গে পৃথক করাও কঠিন। এই মন্তব্য অবশ্যই বিতর্কের বিষয়।

যাই হোক, সীতাকোট স্তূপটি আকার ও আয়তনে চতুষ্কোণিক, তার প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ২১৩ ফুট। স্তূপের বিভিন্ন অংশে খননে উন্মুক্ত শ্রমণদের বাসকক্ষ বা সমকালে ব্যবহৃত প্রকোষ্ঠগুলির আকার ও আয়তন ভিন্নরকম। অধিকাংশ কক্ষ ১২ ফুট বর্গাকার যেগুলিতে ভিক্ষুক-ভিক্ষুণী বাস করতেন। কক্ষ-সংলগ্ন টানা বারান্দা, বারান্দায় উঠবার জন্য ইটের সোপান। দেয়ালগুলির অধিকাংশেরই প্রশস্ততা ৮ ফুট থেকে ৯ ফুট। সুরকি ও কাদার সমন্বয়ে কাঁচাভাবে দেওয়াল গাঁথা। লোহের ব্যবহার এখানে অনুপস্থিত। কিন্তু ছাদের ঢালাই-এ কাঠের কড়ি ব্যবহৃত হয়েছে। হয়েছে ছাদের ভার বহনকারী মেঝের ওপর কাঠের দণ্ড'রও ব্যবহার। আর বিস্ময়কর হচ্ছে বহু শতাব্দীর ব্যবধানে অম্লান থাকা ইটের মৌলিক রঙ ও অক্ষত গাঁথুনি বিন্যাসের স্বরূপ।

প্রত্নতত্ত্বের অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি মূলক। ব্রোঞ্জের বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি মূর্তি, মঞ্জুশ্রী'র মূর্তি,

দগ্ধমৃত্তিকার ভাস্কর্য-আদি থেকে সন্দেহাতীতরূপে বলা যায় যে আদিতে এটি একটি বৌদ্ধবিহার ছিল। সাধারণতঃ দেখা যায় কোনও বৌদ্ধ বিহারের চত্বরের কেন্দ্রে তার প্রধান মন্দির অবস্থিত। সীতাকোট বিহার এক্ষেত্রে ভিন্ন ধরণের। বিহারটি চতুর্দিক থেকে ইট দ্বারা সারিবদ্ধভাবে নির্মিত প্রাচীরাকারভাবে সম্প্রসারিত বহু ছোট ছোট কক্ষ ও প্রকোষ্ঠ দ্বারা পরিবেষ্টিত। মধ্যস্থলে বর্গাকার সমতল বিশিষ্ট বাঁধানো উন্মুক্ত চত্বর। আকারে ছোট হলেও এর স্থাপত্য পরিকল্পনা সহজ ও সরল, অতএব অপেক্ষাকৃত প্রাচীন।

এখানকার অন্যতম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আবিষ্কার হচ্ছে চত্বরের মধ্যস্থলে এক ক্ষুদ্রাকার পাতকুয়ো। ৩ ফুট পরিধি বিশিষ্ট ক্রমহ্রাসমান পরিকল্পনায় এটেঁল মাটির কাদায় তৈরী দগ্ধ পাট নির্মিত কুয়ো বাণগড় ভিন্ন বাংলাদেশের অন্য কোনও প্রাচীন কেন্দ্রে অনাবিষ্কৃত এবং অনুমিত হয়, বিহারের শ্রমণদের দৈনন্দিন সার্বিক ক্রিয়াকাণ্ডে এর জল ব্যবহৃত হতো। একটা বিষয় আজ নিঃসন্দেহে বলা চলে যে বিহারটি প্রাচীনত্বে পুণ্ড্রনগর, বাণগড় প্রমুখের উত্তরকালীন কিন্তু পাহাড়পুর, নালন্দা ও শালবন বিহারের পূর্বকালীন। তবে মূল পরিকল্পনার কাল, রাজ-অনুগ্রহের যথাযথ পরিচয় ইত্যাদি লিপি বা অনুরূপ প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত সঠিকভাবে প্রকাশ করে এর পরিচয়কে পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করা যাচ্ছে না। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়েছে যে এই বিহার হঠাৎ-ই আকস্মিকভাবে পরিত্যক্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি, বেশ কালের ব্যবধানে পর্যায়ক্রমে ও পরিকল্পিত ভাবে এটি পরিত্যক্ত হয়েছিল।

অপরাহ্নের অন্তিমকাল উপস্থিত। ইতিমধ্যে কালবৈশাখীর প্রচণ্ড দাপটও প্রত্নতত্ত্ববিভাগে অবস্থানকালে প্রত্যক্ষ করা গেল। হোস্টেলে ফিরেই দেখি—দেবলা মিত্র প্রমুখ স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষামান। ডঃ ব্যাশম প্রথমে অস্থায়ী আবাস ত্যাগের মুহূর্তে হাত জোড় করে বললেন—ডিডি, নমস্কার, আবার দেখা হবে (শ্রীমতী মিত্রকে)। আপনাদের সকোলকে নমস্কার।" বর্ষীয়ান ভারতপ্রেমিক ইতিহাসবিদ চলে গেলেন। পরে গেলেন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ। নিজের ১০৮ নম্বর ঘরে ফিরে প্রস্তুত হই আগামীকালে ঢাকা ত্যাগের জন্য জিনিষপত্রাদি একত্র করতে। একই ঘরে অবস্থানকারী বিশ্বভারতীর অধ্যাপক মোহন চক্রবর্তী আগামীকাল এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়ে উঠবেন। রাত সাড়ে দশটায় শেষবারের মতো বন্ধুবর মুসা এসে সাক্ষাৎ করে ও কোলকাতায় সাক্ষাৎ হবার কামনা জানিয়ে আলিঙ্গনান্তে বিদায় নিলে নিজেকে বড় একা, বিষণ্ণ মনে হলো। ক'টি দিনের মুহূর্তগুলোকে সেই মুহূর্তে যেন মনে হলো—এক স্বপ্ন।

১১ই মের প্রায় সুষুপ্ত ঢাকাকে আর একবার প্রত্যক্ষ করে কমলাপুর বাস-ডিপোতে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে উপস্থিত ও ছটাতে কষ্টকর রকেট-সার্ভিসে যাত্রা। একে একে মীরপুর, সুপ্রাচীন মানুষের আবাসভূমি সাভারের গৈরিক মৃত্তিকা, শালবৃক্ষ, রুক্ষ ভূ প্রকৃতি দর্শন, পৌনে আটটায় কালিগঙ্গার ফেরী অতিক্রম। আর সওয়া ন'টাতে আরিচার ঘাটে পদার্পণ। মধ্যাহ্নে কাল বৈশাখীর প্রচণ্ড দাপটে প্রমত্তা পদ্মাকে দর্শন ও অতিক্রম করাও জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা বৈকি! গোয়ালন্দ অতিক্রম অপরাহ্ন সাড়ে চারটেতে। চারমাইল কেবল ইঁটের উঁচু-নীচু পথ অতিক্রম অন্তে ফরিদপুরে। শহরের মধ্য দিয়ে চলেছি। দত্ত ব্রাদার্স', দে জুয়েলারী'র দোকানও দেখা গেল। সন্ধ্যা ছ'টাতে কামারখালী, অধিকাংশ টিনের ঘর এর বিশিষ্ট না নিয়ে দাঁড়িয়ে। এই ভাবে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে দেখতে দেখতে সাড়ে চৌদ্দ ঘণ্টার যাত্রা শেষ হলো রাত ৮-৩০তে যশোরে। আর

পরের দিনেই সেই নাভারন, বেনাপোল অতিক্রমকালে বাসের মধ্য থেকে সতৃষ্ণ নয়নে জনারণ্যে খুঁজতে থাকি একজনকে যে শৈশবে আমাকে স্নেহ-ভালবাসায় লালন করেছে, বাড়ীর কোন নতুন ফল সর্বাগ্রে আমাকে না দিয়ে নিজে গ্রহণ করেনি, '৬৪-র পূর্বক্ষণে কালোবাজারীদের উৎপাত ও ভীতিপ্রদর্শনে আমারই (ভারও) জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে এতদঞ্চলে আশ্রয় নিয়ে আজ দুরারোগ্য রোগে মৃত্যুর পথ চেয়ে আছে। কিন্তু না, তাকে খুঁজে পেলাম না।। ইতিমধ্যে সীমান্তও অতিক্রম করলাম। পরিচিত বাংলাকে এখানে যেন হারিয়ে এলাম। যে প্রিয়জনের সন্ধানে শেষ মুহূর্তে দহমন আকুলতাকে তো পাই নি। পেয়েছি নতুন প্রজন্মের বহুজনের সুনিবিড় ভালবাসা। উত্তরকালের ইতিহাসই প্রমাণ করবে, তা চিরস্থায়ী হবে কিনা।

প্রসঙ্গ : গোধূলি-মন

O নমস্কার। খুবই আনন্দিত যে আপনারা আজও ১২৯৮নং ক্রমিকতালিকানুসারে কবি বন্দেআলী মিয়ার নামে বেতারভবন, রাজশাহীর ঠিকানায় 'গোধূলি মন' পাঠাচ্ছেন এবং যোগাযোগ রক্ষার্থে সচেষ্ট রয়েছেন। আর তাই চিঠি লিখবার প্রয়োজনবোধ করেই লিখছি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন কবি বন্দে আলী মিয়া গত ২৭শে জুন ১৯৭৯ সালে ইহলীলা ত্যাগ করেছেন। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

আমিও রাজশাহী রেডিওর সাথে কিছুটা জড়িত। সেই সুবাদে বন্দেআলী মিয়ার সাথে আমার একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা শেষাবধি আমরা পরস্পর পিতাপুত্র-এর মতো বন্ধুর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁর মৃত্যুতে আমি যেন দ্বিতীয়বার পিতৃহারা হয়েছি। যাক সেসব ব্যক্তিগত কথা। এবার কাজের কথায় আসি। দীর্ঘদিন পূর্বে আপনাদের পত্রিকায় আমার একটি কবিতাও ছাপা হয়েছিল। বর্তমান আষাঢ়/১৩৮৭ সংখ্যায় আপনার পুস্তক সমালোচনা ও 'বিস্ময়কর নাম : পাবলো পিকাসো' প্রবন্ধটি বেশ ভালো লেগেছে। আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করবেন। এই সংখ্যাতেই 'গোধূলি-মন' প্রসঙ্গে মধুসূদন ঘাটীর মতামত পড়ে বিগত রবীন্দ্র সংখ্যাটি পড়বার খুব লোভ হচ্ছে এবং আগামীতে প্রকাশিতব্য কবি প্রাবন্ধিক ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসুকে নিয়ে যে সংখ্যাটি বাজারে বেরুবে সেই কপি পেতে আমিও বিশেষ আগ্রহী। এ ব্যাপারে আপনার সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু মহাশয়ের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের ঠিকানাটি আমার দরকার। অতএব এ ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা স্মরণীয়। আরেকটি বিষয়ে আপনার সানুগ্রহ মতামত কামনা করছি। আমি কবি বন্দে আলী মিয়ার জীবন ও কর্মের উপর ইত্যাদি বিষয়ে দু'একটি প্রবন্ধ আপনার পত্রিকায় পাঠাতে চাই। এতে করে ওপার বাংলার মানুষ বন্দেআলী মিয়াকে আরো বেশী করে জানতে পারবেন আশা করি। আমার মনে হয় এবং তা ইতিহাসগত স্বীকৃত যে সাতচল্লিশোত্তর দেশ ভাগাভাগির পূর্বে বিশেষত মুসলমান কবিদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্দীন এবং বন্দে আলী মিয়ার নাম সমধিক পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিল। সেই কারণে তাঁর সৃষ্টির মূল্যায়নের নিমিত্তে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে পড়েছে। এক সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বন্দেআলী মিয়ার 'ময়না মতির চর' কাব্যগ্রন্থখানি পড়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

এমনিভাবে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে পরস্পর মত বিনিময় ও একে অন্যকে জানার জন্য বিস্তারিত জানিয়ে অনুগ্রহপূর্বক নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ রক্ষা করলে বাধিত হবো। অভিনন্দন জানিয়ে শেষ করছি। গুণমুগ্ধ। —তসিকুল ইসলাম, আখতারী ম্যানসন, শাহমখদুম রোড, রাজশাহী ॥ বাংলাদেশ ॥

কবিতা

দেখিনি সে রূপ/আরতি দত্ত

আমি দেখেছি ফুল
ফুলের বাগিচায়
সাজান গাছে থরে থরে
মুগ্ধ ভাবনায়, ভাললাগায়
মনকে নাচিয়েছি সোনালী শান্তিতে।

সে ফুল দেখেছি যখন
ফুলের কেয়ারীতে, ফুলদানীতে
উৎসবে, আনন্দে, সাজান বাসরে
ভরেছে দু'চোখ তবু
পাইনি সেই সোনালী শান্তি
যে রূপ দেখেছি আমি
বাগিচায় জীবন্ত গাছে।

যখোন প্রেমিক আমি/মুহম্মদ জাকারিয়া

কথায় কথায় অনেক কথা-ই হয়েছে যখন বলা
এইখানে তবে এসোনা দাঁড়াই
এক হয়ে পাশাপাশি,
অনেক না হোক অল্প হলেও
কিছুটাতো ভালোবাসি।

এখনো আকাশে কিছু কিছু প্রেম
ছড়ায় সবুজ পাখি,
পাতার আড়ালে দু'একটি ফুল
এখানে কাঁপায় আঁখি।

আর কতো এই চোখে গুঁজে নেবো
উজান নদীর জল —
আর কতো ঝড়, আর কতো ঢেউ—এই বুকে দেবো ঠাঁই
অনেক না হোক, অল্প হলেও কিছুটাতো প্রেম চাই।

সুখ চাইনা আমি/তসিকুল ইসলাম

জীবন বিধৃত আনন্দফলকে
লিখে রেখেছি আমার সমস্ত অক্ষমতা
বাঁধহীন লোনা জলে আমার সমস্ত পাপ
ধুয়ে ফেলেছি হে সুখ তোমাকে পাওয়ার আশায়

আমার সমস্ত দুঃখ গুণে গুণে গেঁথেছি মালা
আজ আমি শূন্য।
ফণিমণসার কাঁটায় জড়িয়ে রেখেছি জীবন
ভেতরে বাইরে সবখানে শুধু ফাঁকা।
গভীর ঘুমে ক্লান্তিতে ক্ষয়ে যাওয়া ভালোবাসা ঃ
হে সুখ, তোমাকে আর চাইনা আমি।

অন্তিম রোদের পর/অমল দাস

এখন আলোর বিবেচনায়
অন্ধকার ধুলে
তির্যক শব্দ ঘিরে বিষণ্ণতা—
এই বিষণ্ণতাও চলে গেলে
প্রত্যহ সর্তকতায় অন্য এক উপছায়া।

সাদাটে অভাব থেকে
অনিষ্ট ক্রম আসে
অতএব দিনের সেই অন্তিম
রোদের পর
জমে যায় পাপ।

জীবনের পরমায়ু বেচে
মানুষ কি-ই-না করে
মানসিক ক্ষত পুষে
কি করে যে নীলের উচ্ছ্বাস—

বুকের ভেতরে বাজে
অনাগত করুণ আলাপ।

জেনে গেছি/আবীরবরণ মুখোপাধ্যায়

কোন একদিন,
শব্দ প্রতিশব্দ হয়ে ফিরে এলে
জেনে নেবো, তুমি নেই ;
অথবা কোনো এক বধির ষড়যন্ত্র
মাতাল করেছে বাতাস— উড়ে গেছে
শব্দশ্লোক— ভীমগর্জনে ঢেউ ভাঙে
ইতস্ততঃ, তাই জেনে গেছি শব্দ আছে,
তুমি নেই।

জেনে গেছি তুমি থেকেও কোন শব্দ নেই,
কোনো কোনো থাকা, না-থাকারই অর্থ
ফিরিয়ে দেয়।

থেকে যায় উদ্বেল হাসি, প্রান্তর ভেদ করে
ক্রমাগত অগ্রগতির পদযাত্রা,
শুধু মুক্তোর দানার মতন সেই ঠিনঠিন
শব্দ ওঠে অন্য কোনখানে—
এখানে তুমি আছ—তবু শব্দ নেই॥

ম্যুরাল/নির্মল বসাক

নারী মানে স্বৈরিনী নয়   স্থায়ী ম্যুরালের রঙ তার বুকে
যেমন ধূসর শস্যের মাঠ একদিন সবুজ হবেই
এই সব আবছা আবছা জেনে পা বাড়িয়ে ছিলাম চৌকাঠ মাড়িয়ে

বালক কামারশালায় গিয়েছিল একটা অস্ত্র বানাতে
তার ধারণা ছিল এমন একটা অস্ত্র সে বানিয়ে নেবে   যা দিয়ে
শেয়াল থেকে বাঘ অবধি সে অনায়াসে মেরে ফেলতে পারে
বালক জানে না প্রগলভতায় চিত্রল হরিণ এলে
সে কী ভাবে করবে অস্ত্রের অমোঘ ব্যবহার

জ্যামিতিক খিলান থেকে আমি পা বাড়িয়েছিলাম
শস্যের মাঠে যাবো বলে   আমি মাঠ চিনি মানুষের মাংসপেশী চিনি
আমি জানি নারী মানে স্বৈরিনী নয়

বালক জানে না   বন্যা এলে মাঠ সমুদ্র হয়ে যেতে পারে
বালক জানে না   সন্ধ্যার মেঘলা আকাশ ভুলিয়ে ভালিয়ে
কোনদিকে নিয়ে যায়
অভিজ্ঞ নাবিকেরও দিশেহারা পর্যটন থাকে
এই ম্যুরালের মায়াবী রঙে   এই আলোয় জাফরীর ভিতরে
তুলির কিংবা অস্ত্রের ব্যবহার কীভাবে করবে অমোঘ
বালক জানে না

বালক জানে না   হয় মৃত্যু নয় অভিজ্ঞতা
মৃত্যুও কী অভিজ্ঞতা নয়
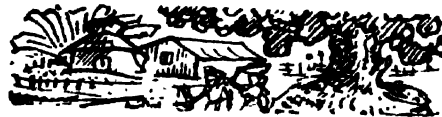
টেংরা খালী/হাসান কামরুল

আমরা তিনজন বেড়াতে টেংরাখালী গেছিলুম ।
জলি'বু অনেক করে সেদিন যেতে বলেছিলো
কথা দিয়েছিলাম—
দেখে-শুনে মাস-ক্ষণ-দিন – রবিবার ।
লক্কর-ঝক্কড় 'মুড়ির টিন' জাতীয় বাসে চড়ে
অতিক্রম, মাইল চারেক পথ ঘণ্টাখানেকে 'মোয়া' প্রায়
বাদালে কোনো বান্দাল নেই, তবে
হেলিকপ্টর যোগে টেংরাখালি পৌঁছুলাম । ওখানে—
খাল নেই নদী আছে, কিন্তু যৌবন জোয়ার নেই
টেংরা মাছও বহুদিন নাকি ওখানে যায়না পাওয়া ।
নাকে সিয়েন মাথা নেংটা ছেলে মুত্ছিলো মুষলধারে
চঞ্চল কিশোরী মিস্ রীণা ক্যামেরায় আটকে নিলো
সযত্নে তাকে,
চৌচীর ফেটে যাওয়া ধানক্ষেত, উপরে বেশ্যা রৌদ্র
দু'টো বকশিশু একপায়ে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ বাউল সুরে
ঝটপট ধরতে যেয়ে বোকাপ্রায় আমি
পেছনে খিল্খিল্ হাসির বন্যা সম্বিত ফেরায় ।
বিভিন্ন পোজে সেদিন ছবি নিয়েছিলো রীণা— অনেকগুলো ।
সৌন্দর্য্যপ্রিয় মিস হাফিজা শুধু হাসে মিটি মিটি
আর, কি যেনো কি নোট করে 'হারুণ ডায়েরীতে'
শুধু মাঠ আর মাঠ, তাল নারকেল সুপারীবৃক্ষ
মেঠালী সুরে গায় গান ; মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে এক পায়ে ঠায়
ছুটাছুটি, দুটোপুটি—বেড়ানো স্বল্পসময়ে যথেচ্ছা
ডাব-নারকেল-রস পিঠে মনভরে খাওয়া
জলি'বু খুব যত্ন করলো
চমৎকার মধ্যাহ্নে ভোজে সকলে আপ্যায়িত ।

বুড়ীদাদী আভিজাত্য আর সেকেলে পুরানো কাহিনী
নতুন করে শোনাবার শ্রোতা (ত্রিরত্ন) পেলেন
সাময়িক লাগলো ভালো ; তারপর বিদায় গোধূলি
সাহিত্যের ছেলে বলে ভীষণ ভালো লেগেছে আমার—
বললো, সঙ্গীনী মিস হাফিজা ।
পরের ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, তবে মনে রাখার মতো ;
রিজার্ভ নৌকায়—সেই আমরা তিনজন (বৈঠায় মাঝিবুড়ো)
অর্ধকুমারী মিস হাফিজা হৃদয়ের সোনালী মাছি খুঁজছিলো
কিশোরী মিস রীণা জ্যোৎস্নার আকাশে তারার কান্না দেখছিলো
আবার যাবো গুন্ গুন্ গাই আমি
হৃদয়ের শোভন ক্যাসেটে টক্-ঝাল-মিষ্টি ভ্রমণটা আর
নদীর দুকূল দেখতে দেখতে চলে এলাম পীর খানজাহানের পবিত্র চত্বরে

শেষ বিদায়/জাহির আহমদ খান

একদিনও স্পর্শ করেনি আমার কলমে
করার কথাও নয় ।
একান্ত আপন হয়েও
তুমি ঢাকা আসনি ।
বিমান বন্দরের লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে হাত তুলে
শেষ বিদায় জানালে ;
আমি কলকাতার কোলাহল ছেড়ে প্রস্থান ।
এভাবে বিচ্ছিন্নতা ।

তুমি আবার ধরা দিলে
রক্তাক্ত দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের লগ্নে
যুদ্ধ শেষ হলো ;
বিমানবন্দরে গেলেই মনে হয়
তোমাকে ঘিরে গেলেই মনে হয়
তোমাকে ঘিরে আমার মধুর স্মৃতি
শেষে বিদায়ে আমাকে আজও ডাকে ।

শ্বাস হীন বিশ্বাসে বসবাস/ইলিয়াস হোসেন
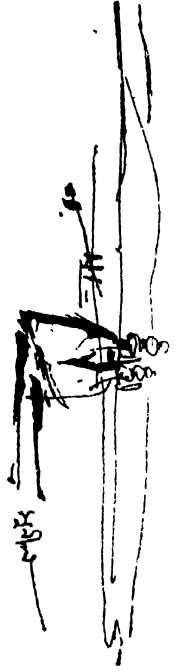
একটা মানুষ মানেই
শান্তির কাজল কোন
তন্দ্রা মাখা তন্বি তরুণী
অথবা পাপের ঘষায় ঘষায়
ক্ষীণ চক চকে সুতীক্ষ্ণ
হয়ে যাওয়া ছুরি
তারপর
আস্তে আস্তে
নেমে আসা
রক্তের নেশায়
নিজের অজান্তে
প্রথম নিজেকে
পরে অপরকে
জীবন নিয়ে বাঁচার
নামে আত্মঘাতি খেলা
এতো পচা শেকড়কে
বিশ্বাস করে আজীবন
জল ঢালা আর ঢালা
জন্ম মানেই দাসখৎ
দিয়ে আসা
মৃত্যুর কেরালি মেহুলায়
ধর্ম মানেই
ধারণ করা
শুধু মানুষের শান্তির

স্বচ্ছ জলে স্নান করা
যেন
আমাদের পাশ দিয়ে
মরালগুলো ভেসে বেড়ানো
কল্পনায় অশান্তি মানেই
পঙ্গু স্বাধীনতা
এখানে ক্ষুধা
সেভ করেনা, দাঁত মাজেনা
তবুও বলতে হবে
তুমি সুন্দর, তুমি সুন্দর
অ-বিপ্লবী হওয়া মানেই
প্রেম প্রেম খেলা
গভীর রাতে ডাকাতি-ধর্ষণ
কালো বাজারীর আতস বাজীর মেলা
এবং এবং
কালমার্কস-লেনিনের
লাশকে টেনে টেনে আনা
কোন অলৌকিক
সমাজতান্ত্রিক ষ্টেশনে
মরা মাছের চোখের মতন
হওয়া।

একটা মানুষ/ফারুক নওয়াজ

একটা মানুষ এই শহরেই আপন মনে হাঁটতে গিয়ে খিলখিলিয়ে শুধুই হাসে;
শুধুই হাসে আপন মনেই, আপন মনেই কিসব বলে, কেউ জানে না, কারণটা কি?
হয়তো সবার হয় ধারণা—ব্যপার স্যপার অন্যরকম।
কেউবা ভাবে, লোকটা বুঝি ব্যর্থ প্রেমিক কিংবা পাগল;
কিংবা হবে লোকটা কোন গোপন পার্টির গুপ্তচর-ই।

ধার্মিকেরা ভাবতে পারে হয়তো হবে লোকটা ঠিকই—জিন, ফেরেস্তা, সাধক-সুফী
ঝোঝা পোষাক, বাবরী মাথায়, ডান হস্তে লোহার পলা, গলায় চিকোন রূপার চেইন,
টায়ার কাটা পায়ের জুতো, চার আঙ্গুলে অঙ্গুরীয়—
পান্না, আকীক সোলাইমানী, পদ্মনীলা হরেক রকম।

এই শহরে আপন মনেই লোকটা শুধু গান গেয়ে যায়, ঠোঁটের মাঝে বর্মী চুরুট,
হস্তে খাতা লাল মলাটের, কখন বসে রেস্তোরাতে কখন আবার শ্রমিক-সভায়
কখন তাকে যায় দেখা যায় কাব্য-পাঠের আসর-মেলায়।

লোকটা যখন পথেই হাঁটে হাজার মানুষ দেখতে থাকে—
রিক্সাওয়ালা, ট্রাকচালক, বাসের কুলি, পথের ফকির টাউন-লোফার মোল্‌বী ঠাকুর,
আর্মী, পুলিশ, উকিল, হাকীম, হাসপাতালের চীপ ডাক্তার।
ছাত্র এবং অধ্যাপকে তাকিয়ে থাকে অবাক হয়ে।

অবাক হয়ে রিক্সা থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখতে থাকে—
কলেজগামী হাজার মেয়ে—হলদে শাড়ী, শুভ্র শাড়ী, নীল-আকাশী, হালকা সবুজ;
কিংবা কারো চশমা চোখে রঙিন গগল্‌জ ডিম গ্লাসের।
তা ছাড়াও আশীর বুড়ী হ্যাবলা ছুঁড়ি, ক্যাবলা ছুঁড়ি, বারবণিতা ডোমের মেয়ে
ফ্যালফ্যালিয়ে এরাও তাকায়।

এই লোকটা সত্যি একা, সত্যি বড় ব্যর্থ মানুষ।
তার সঙ্গে এই জগতে করলো সবায় প্রতারণা;
ঘরের মানুষ, পরের মানুষ, দেশের মানুষ, শেষের মানুষ, দলের মানুষ, কলের মানুষ,
রাজার মানুষ, হাজার মানুষ তার শত্রু সবাই এখন।

শারদীয়া গোধূলি-মন/১৩৮৯/বিয়াল্লিশ

এই লোকটা বড্ড বেভুল — বড্ড ভাবুক লোকটা এখন কারোর সাথে নেই পরিচয় ।

ঘরের খবর, পরের খবর, হাঁড়ির খবর, গাড়ীর খবর, নারীর খবর, শাড়ীর খবর,

কোনো খবর আর রাখে না ।

তার চোক্ষে সাধ্বী সতী সবায় এখন অন্য রকম ;

স্বার্থবাদী, মিথ্যাবাদী, খানকি মাগী, পথের মেয়ে, বারাঙ্গনা, হারাম জাদী

দক্ষ খারাপ, পষ্ট প্রসুন...

তার চোখেতে সবায় তারা এই রকমই এক রকমই,

কেউ চেনেনা, তবুও তাকে — অনেক মানুষ তবুও চেনে ;

পত্রিকাতে বোল্ড টাইপে তার নামটা প্রায়ই ওঠে—

সাত অক্ষর, দুই শব্দ, উচ্চারণে সহজ খুবই ।

একলা হাসে, একলা চলে, নিজের মনে কিসব বলে, বড্ড একা, ব্যর্থ মানুষ

সবায় ভাবে বড্ড দুখী !

কিন্তু এটা মিথ্যা কথা ।

কেউ রাখেন তাহার খবর ।

তাহার বুকে নেইকো মোটে এক বিন্দু কান্না জমা

কেউ দেখেনি তাহার চোখে একটি ফোঁটা অশ্রু-কণা

এই লোকটা বড্ড সুখী, দুঃখ ব্যাথা বন্ধু তাহার ;

দুঃখ ব্যথা আছে বলেই প্রাণটা খুলে হাসতে পারে

হাসতে পারে

হাসতে পারে

হাসতে পারে জীবন ভরে ।

একগুচ্ছ রুবাই/সাঈদ সানাউল হক

(১)

কালকে না হয় আমার মুখে মদের দারুন গন্ধ ছিলো
তাই বোলে কি আজকে ওরা এমনি কোরে ফাঁকি দিলো
সকাল বেলা আসতে বলেও আসলো না কেউ রং মেলায়
এখান থেকে তাহলে কি ভণ্ডগুলো এমনি কোরে বিদায় নিলো।

(২)

লোক দেখানো নামাজ পড়ে কপালেতো করলি দাগ
গত রাতে লুটের মালের তুইতো নিলি সমান ভাগ
এমনি কোরে ফাঁকি দিয়ে লাভ হবে না একটুও
ভণ্ডামী সব ছেড়ে দিয়ে খোদার কাছে ভিক্ষা মাগ।

(৩)

ভণ্ডামী সব ছেড়ে দিয়ে হৃদয় করো সতেজ পুর
বিশ্ব পিতার বন্দনাতে সব কালিমা করবে দূর
হৃদয় তোমার ফুল্ল হবে শান্তি পাবে মন পাখী
জীবন নদীর তীরে তীরে বাজাও বাঁশী সুর মধুর।

(৪)

সময় তোদের হয় না জানি বিশ্ব পিতার বন্দনার
নাচ গান আর হাসির মেলায় থাকিস তোরা বন্ধদ্বার
বিদ্যুতেরই আলোর নীচে সুখে করিস রাত্রি ভোর
সামনে তোদের ডাকছে মরণ গাঢ় কালো অন্ধকার।

(৫)

লক্ষ্মী প্রিয়া আজকে তুমি করলে কেন অভিমান
মান কোরলে চলবে না হায় তুমিই যে মোর সুখের গান
মান কোরোনা লক্ষ্মী ওগো এখান ভীষণ দুঃসময়
তোমার মাঝেই উঠবে বেজে আমার বীণার সূক্ষ্ম তান।

তুমি শুধু থেকো/ভাস্কর দাশগুপ্ত

যার যেথা ইচ্ছা চলে যাক্
তুমি শুধু থেকো
বন্ধুহীন বিজন প্রান্তরে
বৈশাখের রুক্ষ তপ্ত দিনে
বহতা নদীর মত
জলের শরীর দিয়ে
মুছে নিও রৌদ্রের গ্লানি
ঊষর মরুর বুকে
একগুচ্ছ শ্যাম তৃণদল
তুমি থেকো শীতল আশ্রয়।

যার যেথা ইচ্ছা চলে যাক্
তুমি শুধু থেকো
অকরুণ পাহাড়ী বর্ষায়
ঢল নামে তীব্র খরস্রোতা
পরিচিত দৃশ্যের পট
মুছে দেয়
বনের আড়াল দিয়ে
পাথরের অদৃশ্য গোপনে
সুরক্ষিত নিরালা কুটির,
তুমি থেকো নিবিড় আশ্রয়।

ঝড় হোক্ জল হোক্
হোক বন্যা-খরা-মহামারী
প্রকৃতির রুদ্র রোষে
মুছে যাক্ দৃশ্যপট
জ্বলে যাক্ পুরানো পৃথিবী,
অনুপম বন্ধুর মত
তুমি থেকো চিরদিন
হৃদয়ের নীল নির্জনে॥

সেদিনের পৃষ্ঠা থেকে/শ্রীকান্ত পাল

দ্রুত ঘরে ফিরেছে গেরস্থরা
ঘরে থেকেছে আতঙ্ক, জ্বরভাব বিবশ শরীর
রুক্ষ চুল ঋতুমতী রমণীরা ফুল ছোঁয়নি সেদিন
অলঙ্কার তুলে দিয়েছে আবেগে
বিষণ্ন সময়, জল তুলসী প্রসাদের গন্ধহীন ঘর
কৃচ্ছতা চারিদিকে, বাইরে ঠিকরে পড়েনি আলো

তোমার পাশ দিয়ে অতিক্রমই সার হোল

আলাপ হোল না :
গর্তে পাহারায় ছিল সশস্ত্র সৈনিক
ধূসর ছাউনি
দড়ির জাল
সারসিতে কাগজ আঁটা, দরজায় বালির বস্তা
থরে থরে সাজানো

সীমান্ত শহর নিষ্প্রদীপ

আকাশে মহড়া
থেকে থেকে বুক কাঁপা সাইরেন
কান পেতে শব্দের ব্যাখ্যা

চারিদিকে থমথমে ঐক্যের মধ্যে স্বস্তি
প্রশান্তি—ঋতুমতীর মতো অস্পৃশ্য সুন্দর শৃঙ্খলা
—সব বন্দী পচে যাচ্ছিল
অলঙ্কারের বাটখারায় ওজন হচ্ছিল কেউ।

অভ্যাসের পোষাকে/কামাখ্যা সরকার

অনেক দিন ঘড়ি ঘরে যাইনি, অভ্যাস
তাও নাড়া চাড়া করিনি, রোদ ধুলো বাতাস
উড়ানো হয়নি।
হাতের পাঞ্জার ঘুড়ি যার আকাশের সংগে
মুগ্ধতা ছিল, সময়ের সুতো খুলে তাকেও
উড়তে দিইনি। এসব না হওয়ার দরুণ
চান করার জলে পাতা পড়লে ঘরকন্নার ছায়া
নির্বিঘ্নে ঘুমোয়। বাদামের খোসার মধ্যে
সাদা ফেনার লোভ ময়দানে ফেরিওলা সাজে।
মানুষের দেহের খোলে আশ্চর্যগন্ধ শহরের অন্ধকারে
পাখির মত কাঁদে।

অনেক দিন পুরানো অভ্যাসের পোষাকে
নিজের মাপ নেয়া হয়নি।

কৃষ্ণা বসুর এই জটিলতা

"আপনার মায়ের কথা আপনার মনে পড়ে না ?"

"না একটুও না। আমার মা আমার দু বছর বয়সে আত্মহত্যা করেছিল, দুবছরের বাচ্চার মুখ মায়ের মনে পড়েনি নিশ্চয়ই। স্বার্থপর সেই মহিলাটিকে আমি মনে রাখিনি।"

অমলের এই কথার উত্তরে শেফালীর নিরুত্তাপ বসে থাকা এবং 'আসছি'—বলে রান্না ঘরের দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কীই বা করার ছিল। সান্ধ্য আড্ডায় অপরেশ এই অদ্ভুত ছেলেটিকে ধরে এনেছে। শেফালীর বাড়ীর কারোর সঙ্গে রক্ত-সম্পর্কে যুক্ত না হয়েও অপরেশ তাদের বাড়ীরই একজন। গত পরশু কথায় কথায় অপরেশ বলেছিল 'বৌদি ভাই একটা অদ্ভুত ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। আমাদের অফিসে নতুন এসেছে। মা বাপ কেউ নেই। কোন ফ্যামিলিতে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকতে চায়। আপনার বাইরের দিকের ঘরটায় তো দিনতিনেক সন্ধ্যের সময় গানের ক্লাস হয়। আমি বলছিলাম কি—'

'দেখ, অপা চেনা নেই শোনা নেই কোথাকার একটা ছেলেকে হুট করে পেয়িং গেস্ট রাখার কথা তোর মাথায় এল কি করে?'

'না বৌদি ভাই দেখলেই বোঝা যায় ভালো ঘরের ছেলে। আচ্ছা আলাপই তো করুন একদিন।'

শেফালী বুঝতে পারে না তার স্বামী নিশীথের ব্যবসা মন্দা যাওয়ার খবর জানে বলেই অপরেশ এই এই পেয়িং গেস্ট রাখার প্রস্তাব এর আগেও তুলেছিল কিনা। শেফালীর প্রায় সারাদিনই কোনো কাজ নেই। তার স্বামী খুব সকালে উঠে বেরিয়ে যায় দোকানে, ছোটাখাটো একটা বই-এর দোকান আছে নিশীথের, দুপুরে একবার ফেরে খেতে, যৎসামান্য খাওয়া, অজীর্ণের রুগী, বছরখানেক আগে গ্যাসটিকের ধাক্কায় বিপর্যস্ত, এখন একটু ভালোর দিকে। শেফালীর সময় কাটে গানের স্কুল, সংসারের কাজ আর একলা নিজের ভাবনা নিয়ে। এই দূর মফঃস্বলের রেল কলোনিতে গানের স্কুল মোটে ভালো চলে না, কে-ই-বা গান শেখাতে মেয়ে পাঠায়। নিতান্ত বিয়ের দেখাশোনার একটা অপরিহার্য পর্যায় গান গাইতে পারা, তাই আজো শেফালীর দু'চারটে করে ছাত্রী জুটে যায়। নিশীথের বই-এর দোকানে বছরের প্রথমে স্কুলের বই কিছু কাটে আর সারা বছর ম্যাগাজিনই ভরসা; কাছাকাছি একটা কলেজ পর্যন্ত নেই। এই নির্বান্ধব পুরীতে এসে শেফালী প্রথম প্রথম হাঁফিয়ে উঠত। মাঝে মাঝে সন্ধ্যেবেলা নিশীথের দোকানে গিয়ে বসত, তাতে এই রেল কলোনি সংশ্লিষ্ট গঞ্জ গুঞ্জনে ভরে গেল কদিনের মধ্যেই। তাই আজকাল শেফালী সন্ধ্যায় বাড়ীতে বসেই কাটায়। ঠিক সেই সময় এই প্রতিবেশী যুবক খুব সহজেই জায়গা করে নিয়েছিল নিশীথ-শেফালীর জীবনে। আর কিছু কিছু ছেলে থাকে না,—কেমন ভাই ভাই ভাব, খুব অনায়াস, দ্বিতীয় আলাপের দিনই বৌদি ভাই কিম্বা দিদিভাই বলে ডাকে, কখন চোখের দিকে ঘন হয়ে

তাকায় না, সব সময় আনুগত্যে আত্মীয়তায় সহজ হয়ে থাকে, তাই এই অপরেশকে নিয়ে নিশীথ-শেফালীর কোনো ভাবনা ছিল না। সেই অপরেশের উদ্যোগে শেফালীর গানের স্কুল, এখন আবার এই পেয়িং গেস্টের প্রস্তাব।

রান্নাঘর থেকে চা আর পাঁপর ভাজা নিয়ে শেফালী বসার ঘরে এসে দেখল সেই নতুন ছেলেটি অমল একলা বসে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে। অপরেশ নেই। নীচু টেবিলে চা রাখতে রাখতে শেফালী কোন সম্বোধন না করে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল 'অপরেশ কোথায় গেল ?'

'সিগারেট আনতে'—খুবই সংক্ষিপ্ত এবং চাঁছাছোলা জবাব। 'অপরেশের তো ওসব পাট নেই—' বলতে গিয়েও শেফালী কথাটাকে মাঝপথে আটকে দিল, তার সঠিক অনুমান এই উদ্ধত ছেলেটি এই ক'দিনেই অপরেশের আনুগত্য সংগ্রহ করেছে এবং নিজে বসে থেকে অপরেশকে সিগারেট আনতে পাঠিয়েছে। কিংবা স্বভাব-অনুগত অপরেশ নিজেই আনতে ছুটেছে। অপরেশের এই অকারণ সর্বত্র আনুগত্য শেফালীর একদম সহ্য হয় না। কিসের যেন অভাব আছে অপরেশের মধ্যে।

'আপনি চা নিলেন না ?' —চমকে তাকায় আত্মমনস্ক শেফালীর চোখ। তাকিয়েই আর-ও একবার চমকাল সে। ছেলেটির চোখের দৃষ্টিতে সাধারণের চেয়ে কিছু বেশি উজ্জ্বলতা,—নাক ধারালো, ঠোঁট পাতলা এবং একটু বাঁকা। এমন অদ্ভুত নিখুঁত মুখ সহজে চোখে পড়ে না তবু কিসের যেন অভাব আছে ঐ মুখে। শেফালীর চা না-নেওয়ার উত্তরে একটা আচমকা প্রশ্ন করে বসে অমল, 'আমাকে পেয়িং গেস্ট রাখার ব্যাপারে আপত্তি কোথায় ? আমি কি খুব খারাপ ধরণের ছেলে বলে মনে হচ্ছে আপনার ?' —ছেলেটির কথায় বিনয়ের ছিটে ফোঁটা নেই, এই উদ্ধত অবিনয়ের একটা আকর্ষণ আছে, সেই আকর্ষণে সংক্রামিত হচ্ছিল বোধহয় শেফালী ভেতরে ভেতরে। অথচ ছেলেটিকে খুব যে ভালো লাগছিল তার,—তা নয়। বয়সে শেফালীর চেয়ে কিছু ছোট-ই হবে, নিজের সম্পর্কে প্রথম আলাপে যেমন দ্বিধাহীন তার উচ্চারণ তেমনি নিঃসংকোচ তার প্রস্তাব। বস্তুত তারা স্বামীস্ত্রীতে গত দুদিন ধরে এ ব্যাপারে আলোচনা করেও কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। এই মন্দার বাজারে প্রতিমাসে থাকা খাওয়ার জন্য আড়াইশো টাকা তাদের কাছে খুব তুচ্ছ করার মতো ব্যাপারও নয়। ছেলেটি কোনো পরিবারে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকবার জন্য অপরেশকে যে কারণ দেখিয়েছে, তা-ও শেফালীর কাছে বেশ কৌতূহলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুব ছোটবেলায় মা মারা যাবার পর থেকে পারিবারিক পরিবেশ নাকি সে পায়-ই নি। তার বিপত্নীক বাবা আর বিয়ে করেন নি বটে কিন্তু পুত্র অন্ত-প্রাণ-ও তিনি ছিলেন না, অন্যত্র ছিল তার আকর্ষণ, আবার বিবাহিত হতে বাধা বোধহয় সেখানেই ছিল, তাই তার বড় সখ হোস্টেল মেস জীবনের পরে কোথাও পেয়িং গেস্ট থাকে,—কোন একটা নিটোল পরিবারে।

অমলের কথায় উত্তরে বিমূঢ় সে বসে থাকে। কিছুটা বিপন্ন গলায় বলে,—"দেখুন, আপনাকে খারাপ ভাববার কোনো কারণ নেই। ভাববই বা কেন ? কতটুকু চিনি আপনাকে ?" —ছেলেটির স্বভাবই বোধহয় অদ্ভুত, একথার উত্তরে বলে, "গৃহকর্তার সঙ্গে আলাপ করা হল না তো !"

"না উনি তো দোকান বন্ধ করে আসতে আসতে সাড়ে আটটা ন'টা বাজবে।" —এ কথার পিঠেও

অপ্রত্যাশিত উত্তর, "আপনি বোধহয় জানেন না অপরেশ আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় হয়।" "ও মা! তাই নাকি? কী অন্যায় বলুনতো, অপা আমায় কিছু বলেই নি!" "আমি আবার কী অন্যায় করলুম বলতে বলতে অপরেশ চৌকাঠে পা দিল। হাতে সিগারেট এবং পাউরুটির কাগজে মোড়া পান। সিগারেটের প্যাকেট অমলের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে শেফালীর উদ্দেশ্যে বলল, "অমল সম্পর্কে আমার ভাগনে হয় জানেন তো? আমার জ্যাঠতুতো দিদির ছেলে—সেটা অবশ্য আজ দুপুরে আবিষ্কার করেছি আমরা। বর্দ্ধমানে মামার বাড়ী শুনে মামাদের নাম জিজ্ঞেস করতেই বেরুল। অবশ্য সেই জ্যাঠার সঙ্গে আমাদের তেমন যোগাযোগ নেই। আমার বাবার মাসতুতো ভাই" —শেফালী একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,—"আচ্ছা আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলে কালকে ভাই তোমাকে অপার মুখ দিয়ে জানিয়ে দেব, তুমিই বললাম। —তুমিই আমার থেকে অনেক ছোট"—

অমলকে কিছু বলতে না দিয়ে অপরেশ গলগল করে বলে গেল, "একশোবার হাজার বার 'তুমি' বলবেন 'তুই' করে বলবেন, অমল আমার চেয়ে-ও ছোট।" শেফালী কিন্তু বেশ বুঝে গেছে অপরেশের মতো অনায়াস তো নয়ই, বরং বয়সের থেকে বেশি অহংকার, রোখা পৌরুষ ছেলেটিকে একধরণের অনমনীয়তা দিয়েছে, যার কারণে কিছুটা দূরত্ব সে সব সময় তার আচরণের মধ্যে বহন করে। সেদিনের মতো ওরা উঠে গেলে শেফালী রান্না ঘরের কাজ সারতে গিয়ে এই অদ্ভুত সমস্যাটির কথা ভাবতে ভাবতে ভাত বেশি গলিয়ে ফেলল, তার দুধ ওথলালো এবং ঝোলে নুন দিল বেশি।

রাত্রে নিশীথকে খেতে দিয়ে শেফালী হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে-ছিল। মুখে গ্রাস তুলতে তুলতে নিশীথ ব[illegible]ত ভাববার কী আছে? আড়াইশোটা টাকার জন্য তো মরে যাচ্ছ না। তাছাড়া ২৪ ঘণ্টার লোক নেই, একটা [illegible]ঝি নিয়ে তুমি পারবে কেন সামলাতে?

[illegible] াটির দিকে চোখ,—শেফালীর বসে থাকার ধরণটা এই রকম,—খুব আস্তে আস্তে থেমে থেমে [illegible] া নয়, আমি ভাবছি অপা এই ক্ষ্যাপা ছেলেটাকে ধরে আনল কি বলে?" তোমার মনে হচ্ছে [illegible] া কালকে অপাকে বলে দাও। আর গোবিন্দর মাকে নাহয় দু চারটে টাকা বেশি দিয়ে দিও.

এক[illegible] লায় নিজের সুটকেশটি স্থাপিত করে সেই চৌকির ওপর-ই বসে পড়ে অমল স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল,—"বাঃ চমৎকার।" অপরেশ বলল—"তোমার পছন্দ হলেই হল,—বাইরের এই ঘরটাতে বৌদি তিন দিন সন্ধ্যেবেলা গান শেখায়, তাছাড়া তো পড়েই থাকে। তুমি নিজের মতো থাকতে পেলে আবার বাড়ীর মতো যত্ন আত্তি"—নিশীথ এল ঘরে। —পেছন পেছন গোবিন্দর মা, তার ডান হাতে ছোটো জলের কুঁজো বাঁ হাতে কাঁচের গ্লাস। জানলার পাশে সেটিকে রেখে একবার অমলের দিকে তাকিয়েই ঘর থেকে চলে গেল। ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিশীথ একটু হেসে বলল—"ফ্যান নেই কিন্তু, কষ্ট হবে—।" "নানা,—এখন তো তেমন গরম-ও নেই। আমার অভ্যাস আছে"—বলতে বলতে অমল উঠে দাঁড়িয়ে নিশীথকে আপ্যায়নের ভঙ্গিতে বলল—"বসুন।" 'বটে? —আমারই বাড়ীতে আমাকে আপ্যায়ন করা হচ্ছে?" —বলে হঠাৎ একটু অদ্ভুত রকমের হাসল নিশীথ আর ভাবতে থাকল ছেলেটির মধ্যে কী এমন ক্ষ্যাপামি দেখল শেফালী। অপরেশ হচ্ছে সর্ব অবস্থায় এই পরিবারটির মুস্কিল-আসান, বলল—"ফ্যানের জন্য ভাবনা কিসের? আমাদের

একটা পুরানো টেবিল ফ্যান আছে, তেমন কাজে লাগে না। পুরানো হলেও হাওয়া খুব মিঠে, সেটা দিয়ে যাব এখন।" "দেখো অপরেশ, একটু বুঝে সুঝে উদার হও—তুমি তো দেখছি আমাদের জন্য সবই দিতে পারো!" —জিভ কেটে মাথা নেড়ে নিজের স্বাভাবিক ভঙ্গিতে অপরেশ হৈহৈ করে ওঠে, "ওরে বাপ্‌রে একে দাদাবৌদি আবার এদিকে ইনি স্বয়ং ভাগনে। না করে যাব কোথায়?" —তার হাসি শেষ হওয়ার আগেই, —"নিশীথবাবু বাড়ী আছেন"—বলতে বলতে বাড়ীওয়ালার কণ্ঠস্বর সদর দরজায় সোচ্চার হয়ে উঠল।

অমলের আসার প্রথম দিন ছিল রবিবার, সেদিন শেফালী একটু স্পেশাল রান্না করেছিল। সাধ্যের প্রায় অতীত করে একটু মাংস এবং মাছ দুইই রেঁধে-ছিল সে। তারপর থেকে টানা তিনদিন নিরামিষ খেয়ে হাঁফিয়ে উঠেছে অমল। বৃহস্পতিবার অফিস থেকে দুপুরে এসে খেতে বসেছে অমল, পাশে নিশীথ, শেফালী বার বার ভাত নেবার জন্য অনুনয় করায় মরীয়া অমল বলে বসে "বৌদি এখানে মাছটাছ কি তেমন পাওয়া যায় না?" —মুহূর্তে শেফালীর ফরসা মুখ লাল হয়ে যায়, উপকরণের দৈন্য হঠাৎ যেন প্রকট হয়ে ওঠে। নিশীথ চকিতে স্ত্রীর দিকে তাকায়। নিজের কাঁধে দোষ টেনে নেয়। —"আরে আর বলো না। সকাল বেলা বাজার যাবার সময় পাই কোথায়? সাত সকালেই তো দোকান ছুটতে হয়। শেফালী তুমি গোবিন্দর মাকে দিয়ে সন্ধ্যের সময় সাউবাবুর বাজার থেকে মাছটাছ আনিয়ে নাও না কেন?" হাতায় করে ডাল তুলছিল শেফালী, আগাগোড়া কথাবার্তায় সে নীরবই ছিল, নিশীথের কথার উত্তরে সে অমলের দিকে স্পষ্ট চোখে তাকায়, —"দেখুন ভাই আমরা বড়লোক নই, —নই বলেই আবার এতখানি আত্মসম্মান-হীনও নই যে একজন অনিচ্ছুক লোককে টাকা আদায়ের ধান্দায় পেয়িং গেস্ট করে রাখব। আমি বুঝতে পেরেছি আপনার খাওয়ার কষ্ট হচ্ছে। অপাকে বলে দিও ওনার অন্যত্র ব্যবস্থা করতে" —শেষ কথাগুলো নিশীথের উদ্দেশ্যে বলে শেফালী। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো বিমূঢ় অমল চুপ করে বসে ছিল। সে এতটা আশা করেনি। মনে মনে একটা হিসেব যে ছিল না তা নয়। কিন্তু তাই বলে এইরকম ভাবে কথাবার্তা! এ যেন সরাসরি বলে দেওয়া এই আমাদের ব্যবস্থা, —না পোষায় চলে যাও! সে বুঝে নেয় এবার তার আপার হাত নেবার পালা, খুব শান্ত ভঙ্গিতে সে বলে থাকে। ভাত মাখা নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে অনুচ্চ স্বরে বলে, "দেখুন বৌদি আমি খুব স[illegible] ভাবে কথাটা বলেছিলাম, আপনি এরকম আহত হবেন জানলে! যাক্, আপনাদের অসুবিধে হলে আ[illegible] রাজ হোটেলেই যাব।" —"ছিঃ ছিঃ কী করছ তোমরা। অপরেশই বা ভাববে কী? ভাই অমল, তো[illegible]র বৌদির একটু গরম আছে। কিছু মনে করো না। নাও, নাও খেয়ে ওঠো। টিফিন আওয়ার্স তো শেষ হয়ে গেল [illegible]মার!"

খাওয়ার পর অমলের হাতে মশলা দিতে গিয়ে চোখ নিচু করেই ছিল শেফালী, অমল খুব নিচু স্বরে ডাকল "বৌদি!" শেফালী চোখ তুলতে অমল সেখানে চিক্ চিক্ করা জল দেখতে পেল, —জীবনে প্রথমবার তার বুকের মধ্যে মেঘ ডেকে উঠল; —যে কারণেই হোক তার জন্য একজন রমণীর চোখে জল! না তার জন্য কেন? সে তো উপলক্ষ্য। দারিদ্র্য কিম্বা আহত আত্মসম্মানের জন্য জল চোখে একজন সুন্দরী রমণী তার খুব কাছে দাঁড়িয়ে; —অমল খুব আস্তে বলল—"বৌদি ক্ষমা করে দিও।" —ওপরের ঠোঁট দিয়ে নিচের ঠোঁট চাপা শেফালী বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অফিস থেকে কয়েকজন বন্ধু মিলে মাসানজোর গিয়েছিল অমলেরা দিন তিনেকের জন্য, ফিরল গা-ভর্তি জ্বর আর মাথা ভর্তি যন্ত্রণা নিয়ে। তখন সন্ধ্যে সাতটা, গুটি পাঁচেক মেয়ে নিয়ে একটা গানের সুর তোলাচ্ছিল শেফালী। দরজায় সাইকেল রিক্সা থামার শব্দ এল। দুবার ভেঁপু বাজাল রিক্সাওয়ালা, অমলের গলা পাওয়া গেল। সাধারণতঃ যে তিনদিন শেফালীর গানের ক্লাস থাকে, সেই দিনতিনেক একটু দেরী করে তাসের আড্ডা থেকে ফেরে অমলেরা। অপরেশ অমল নিশীথ এরা কজনে মিলে বই এর দোকানটাকে তাসের আড্ডার আদর্শ জায়গা হিসেবে আবিষ্কার করে ফেলেছে। গানের মধ্যে থেমে গিয়ে শেফালী উঠে এল। বলল, 'তোমরা সুরটা তোলো, আমি আসছি।' ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ত্যাখে উঠোনের পাশে সিঁড়িতে মাথায় হাত দিয়ে অমল বসে সামনে তার সুটকেশ জলের বোতল ক্যামেরা এটা ওটা ছড়ানো। কাছে গিয়ে অমলের বসে থাকা কেমন অস্বাভাবিক লাগল তার, জিজ্ঞাসা করল 'কি হলো শরীর খারাপ নাকি ?' 'মাথায় বড় যন্ত্রণা !'—অমলের অসহায় বসে থাকা, মাথায় হাত রাখার ভঙ্গিতে গলার স্বরে এমন কিছু ছিল, যাতে শেফালীকে কিছুটা আলোড়িত করে, সে উদ্বিগ্ন বুকে বলে 'জ্বর নাকি ?

'হু একটু শুতে পারলে ভালো হত।' —বেশতো আমি ছাত্রীদের বাড়ী যেতে বলছি।'

মিনিট পনের পরে অমলের ঘরে এসে শেফালী প্রথমে অমলের কুঁকড়ে মুকড়ে শুয়ে থাকা দেখে কাছে গিয়ে তার কপালে হাত রাখতেই মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'জ্বরে যে গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে !' লাল চোখে অমল তাকাল। বলল, 'বড় শীত করছে।' শেফালী নিচু হয়ে অমলের সুটকেশ টেনে বার করল, ডালা খুলে চাদর বার করে আনল, তারপর অমলের গায়ের ওপর বিছিয়ে দিয়ে খুব শান্ত ভাবে জিজ্ঞেস করল—'মাথায় কী খুব যন্ত্রণা হচ্ছে ? টিপে দিই ?' —'নাঃ নাঃ আপনার কত কাজ! শুধু শুধু বিব্রত করছি।' —মুহূর্তে এই অনাত্মীয় ছেলেটির প্রতি কেমন মায়া হয় শেফালীর। আহা বেচারা ছোটবেলা থেকে মা নেই। ভেতরে ভেতরে নিশ্চয়ই স্নেহ কাঙাল। খুব মমতায় শেফালী তার মাথায় হাত রাখল। মাথা দিয়ে হল্‌কা বেরুচ্ছে আগুনের, মুখের রঙ যেন তামায় পোড়ানো, শেফালী কিছুটা বিপন্ন বোধ করে। মনে মনে প্রায় অশ্রুত স্বরে বলে, 'অপরেশটা থাকলেও ভালো হত, ডাক্তারকে খবর দেওয়া দরকার এত জ্বর কেন হল ?' —'অসময়ে চান করে রোদ্দুরে বেড়িয়ে, আঃ মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে আমার।' বাড়ীতে অ্যাস্পিরিন জাতীয় কোন ওষুধও নেই। দ্বিতীয় এমন একটি মানুষ নেই যাকে দিয়ে দোকানে খবর দেওয়া যায়। বিপন্ন শেফালী বলে—'খুব কড়া করে আদা দিয়ে চা করে দিই ?' না, কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না—অস্থির অমলের হাত এসে পড়ে শেফালীর হাতের ওপর, দুমুহূর্ত স্থির থাকে সেই হাত ; শেফালী ভেতরে ভেতরে এক অদ্ভুত অনুভূতি টের পায়,—এই জ্বরে তপ্ত হাত যেন তার অভিজ্ঞতায় একেবারে নতুন বলে মনে হয়, এ হাতের যেন স্বতন্ত্র, এবং অভিমানী এক দাবী আছে। নিশীথের হাত অন্যরকম তা যেন কাতর এবং নির্ভরশীল, হাসি ঠাট্টায় কথাবার্তার মাঝে প্রয়োজন অপ্রয়োজনে অপরেশের হাতও অনেকবার ধরেছে শেফালী কিন্তু সে যেন কেমন সখা-সখা, ভাই-ভাই ভাব, কত সহজ আর শিহরণ হীন। কিন্তু এই হাত। প্রবল দাবীদাবের হাত। এই হাত যেন পুরুষের অন্যরকম অস্তিত্বের হাত। —এসব যে খুব সচেতন ভাবে ভাবছিল সে, তা নয়। বরং হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মাথায় জলপটি দেওয়াতে মনস্ক ছিল সে

তখন। কিন্তু ভাবনারা খুব চতুর এবং ধীর পোকার মতো তার মাথার মধ্যে ঢুকে তাকে অন্যমনস্ক করতে তৎপর ছিল।

যদিও পৃথিবীটাকেই খুব প্রবাস বলে মনে হয় অমলের, তবু-ও চেনা-পরিচিত পৃথিবীর বাইরে এই নতুন জায়গায় এই অসহায় অসুস্থতায় অমল খুব কাতর হয়ে পড়েছিল। যদি-ও অপরেশের কোনো তুলনা হয় না ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা পথ্য করানো সব ব্যাপারে সে শেফালীর ডানহাত হয়ে কাজ করছে। নিশীথ-ও মাঝে মধ্যে এসে দিনে দু একবার তো বটেই খোঁজ খবর করে যাচ্ছে। তবু খুব ছোটবেলা থেকে যখনি অসুস্থ হয়েছে অমল তখনি তার মধ্যে একটা কাতরতা খুব ধরা পড়ে, এমনিতে সুস্থ সে। কারোর এমন কি কোনো শুশ্রূষার-ও পরোয়া করে না, গোটা দুনিয়াকে নস্যাৎ করে দেয় বার বার। মানুষের নরম অনুভূতি সেন্টিমেন্ট কেন্টিমেন্ট নিয়ে ব্যঙ্গ করে। অথচ যখনি অসুখ, তখনি সে ভেতরে ভেতরে এক ধরণের কাতরতা বোধ করে। কোনো নারীর সেবার জন্য সে তৃষ্ণা বোধ করত কি? সচেতনভাবে তো নয়, তবে এবার শেফালীর সেবায় সান্নিধ্যে সে এক ধরণের জোর পায়, তৃপ্তি পায়, তার ভালো লাগে।

জ্বর ছেড়ে এসেছে। বেলা এগারটা সাড়ে এগারটা হবে। একটা বালতি করে জল আর গামছা নিয়ে শেফালী অমলের মাথা ধুইয়ে দেবার জন্য এল। শেফালী ঘরে আসতেই একমুখ আলোকরা হাসি হাসল অমল। শেফালী এসে ডান হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে অমলের কপালের তাপ নিল, জ্বর অল্পই আছে। "একি হরলিক্সটা পড়ে আছে কেন? এ মা এতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এরকম করলে তুমি সারবে কি করে?" —"আপনার কাছে থাকলেই সেরে যাব" —বলে অমল আধ শোওয়া অবস্থা থেকে শুয়ে পড়ে। শেফালী মেঝেয় নামিয়ে রাখা বালতির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—"মাথাটা কে ধোবে শুনি?" অমল উঠে বসে বলে, —"জানেন বৌদি আপনার মধ্যে একটা মা মা ভাব আছে, যদিও আপনি আমার চেয়ে সামান্যই বড়!" "হয়েছে আর তেল দিতে হবে না ওঠো", —বলে শেফালী তার মাথা ধোওয়াতে তৎপর হয়। শুকনো গামছা দিয়ে খুব যত্নে শেফালী অমলের মাথা মুছিয়ে দিচ্ছিল, এমন সময় অমল একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। চৌকিতে বসা অবস্থায় সে দুই হাত দিয়ে শেফালীকে আচমকা জড়িয়ে ধরে শেফালীর বুকে খুব শান্ত ছেলের মতো মাথা রাখল, ব্যাপারটা ঘটতে তিন সেকেণ্ড সময় লাগল। অসম্ভব ভাঙচুর হচ্ছে নিজের মধ্যে বুঝে শেফালী এক ঝটকায় অমলকে সরিয়ে দিল। প্রায় হাত তিনেক দূর থেকে চোখে তিরস্কার ফুটিয়ে বলল, —"অমল এসব ভালো নয়।" —"কী ভালো নয়?" বলে অমল তার বড় ব্যথিত চোখ তুলে তাকাল—"এর মধ্যে তুমি পাপ দেখলে কোথায়?" "জানি না" —বলে শেফালী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। "শোনো আমার কাছে এসে", —বলে অমল দুর্বল হাত নেড়ে শেফালীকে ডাকল,—"কথা-টা যদি এরকম ভাবে বলি যে তুমি আমার জীবনে এত কাছের থেকে পাওয়া প্রথম পরিপূর্ণ নারী, তাহলে নাটকের মতো শোনাবে না? আমার কাছে এসো, আমার মাথায় হাত রাখো একবারটি, রাখো" —তার সেই ডাকে এমন কিছু ছিল যাতে সম্মোহিতের মতো শেফালী কাছে এসো এবং আচ্ছন্ন স্নেহে তার মাথায় হাত রাখো। এ ধরণের স্নেহের সঙ্গে কামনার সম্পর্ক বোধহয় বড় কাছাকাছি। শেফালী এবার নিজেই অমলের মাথা বুকে টেনে নেয় এবং প্রথমে কপালে পরে তার গালে, ঠোঁটে

নয়, চুমু খায়। —চোখ বুজে যেন বহুকাল ধরে তৃষ্ণার্ত মানুষ বৃষ্টির জলে স্নান করছে, সেই আরামে অমল সমস্তটা গ্রহণ করে তারপর বলে, "বৌদি, তাড়িয়ে দেবে নাতো?" কোনো উত্তর না দিয়ে অমলের মাথার চুলে হাত বোলায় শেফালী।

সন্ধ্যে তখন সাতটা সাড়ে সাতটা হবে। লোড শেডিং চলছে, শেফালী খোলা রোয়াকে মাদুর বিছিয়ে বসে একটা সুর গুণ গুণ করে ভাঁজছে, বাড়ীতে কেউ নেই, হঠাৎ দরজায় খট্ খট্ করে কড়া নড়ে উঠল। এ সময় তো কারোর আসবার কথা নয়। নিশীথ, অমল এদের ফিরতে রাত সাড়ে নটা বাজে আজকাল। "কে?" —বলে উঠে গিয়ে দরজা খুলল শেফালী, দরজার বাইরে অমল দাঁড়িয়ে। "কি ব্যাপার এত তাড়াতাড়ি?" —তোমার সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছে করল বলে পাশ দিয়ে অমল বাড়ীতে ঢুকল। "চা খাবে?" "যদি করো তো খাই।" —"এই একটু বসলাম, বড্ড জ্বালাও বাপু"—বলতে বলতে শেফালী রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। চা নিয়ে এসে দেখে অমল তার পাতা মাদুরে হাতে মাথা দিয়ে চিৎ হয়ে আকাশের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে। "এই নাও তোমার চা"—বলে শেফালী তার চায়ের কাপ মাটিতে রেখে নিজে তার থেকে কিছুটা দূরত্বে বসল। বসে জিজ্ঞেস করল, "আজ তোমাদের তাসের অ ড্ড র কী হল?" "হল না নিশীথদা মধুকুণ্ডায় গেল নতুন একটা স্কুল হয়েছে না তার হেড্ মাষ্টারের সঙ্গে আলাপ করতে বইটই এর ব্যাপারে আর কী? অপরেশ তো ওর জ্যাঠতুতো বোনের বিয়েতে গেছে। পার্টি ভালো ছিল না অমল না—।" "তোমার দাদা দোকান বন্ধ করে গেছে?" "হ্যাঁ।" চা-য়ে লম্বা চুমুক দিয়ে অমল স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে বলল "আঃ—বৌদি তোমার কাছে আমার জন্মান্তরের ঋণ রয়ে গেল।" "ঋণ কেন? শোধ দাও"—হাসল শেফালী। শেফালীর সুন্দর ফরসা পা দুটি ছিল শাড়ীর পাড়ের ঘের দেওয়া। অমল আচমকা সেই পায়ের ওপর মুখ রাখল। খুবই চমকে উঠে শেফালী রেগে গিয়ে বলল "কী হচ্ছে কী অমল। ওঠো, পাগলামোর একটা সীমা থাকা উচিত।" "না, তুমি দেবীর মতো, তোমার পায়ে মুখ রাখলে দোষ নেই!" —"দেখো অমল তুমি আমাকে এভাবে অভিভূত করে দিও না! আমার কষ্ট হয়। "হোক্",—বলে দ্বিধাহীন অমল শেফালীর কোলে মাথা রাখে। কতক্ষণ খেয়াল নেই শেফালী চুপ করে বসে ছিল, রোয়াকে কার ছায়া নড়ে উঠল। শেফালী পেছন ফিরে নিশীথকে দেখে প্রথমে খুবই অবাক্ হল "কখন এলে? এই অমল ওঠো—" বলতে গিয়েও নিশীথের অমন ভয়ংকর মুখ শেফালী কখনো দেখেনি। "উঠবে কেন? আরো খানিকটা সোহাগ করো—" বলে নিশীথ ঘরে চলে গেল। রাত্রে যথারীতি নিশীথ—'খিদে নেই,' অমল 'ইচ্ছে করছে না—' বলে শেফালীর রান্না করা ভাত তরকারি নষ্ট করল। শেফালীও না খেয়ে রইল।

পরের দিন সকালে উঠে অমলকে কোথায় দেখা গেল না বেলা এগারটা নাগাদ ফিরে এসে জানাল—সে এখান থেকে উঠে যাচ্ছে হোটেলে। শেফালী খুব ধীরে স্বরে জিজ্ঞেস করল—"কালকের ঘটনার জন্য?" "না, ঠিক তা নয়, আমি অন্য জায়গায় বাড়ী দেখব। তোমাকে ভুলতে পারব না, তোমার সঙ্গে দেখা করব।" "না দেখা করো না। তোমার দাদা আজ সকালেও কোনো কথা না বলে না খেয়ে বেরিয়ে গেছে বাড়ী থেকে। অশান্তি আমার সহ্য হয় না।"—"তুমিই তবে চলে যেতে বলেছ?" "তুমি অত করে জড়ালে কেন আমায়, অমল?" —এ কথার উত্তরে এগিয়ে এসে অমল শেফালীর হাত তুলে নেয় নিজের হাতে, বলে, —"চলো তুমি আমার

সঙ্গে! ঐ নিশীথ তোমায় কী দিয়েছে? এ বিয়ে ভেঙে দাও…" "তোমার মাথাটা সত্যি পুরো খারাপ হয়ে গেছে। প্রথম থেকেই তাই কেমন অস্বাভাবিক লাগত তোমাকে। যাও তুমি। ঢের কাজ আছে আমার!"

বিকেলে ফিরে নিশীথ শুনল অমল চলে গেছে। খুব সন্ধানী দৃষ্টি মেলে সে স্ত্রীকে জরিপ করে, বলে "কতদূর এগিয়েছিলে তোমরা?" "মুখ সামলে কথা বলো। ও আমাকে সেভাবে দেখত না।"

"জানি জানি, কী ভাবে দেখত জানি"

শেফালীর খুব অবাক লাগে, এই পৌরুষ, আকাংখার এই তীব্রতা নিশীথের কোথায় ছিল এতদিন? ঈর্ষাতে প্রকৃত প্রেম এল তার তবে এতদিনে? —এ কথা ভেবে শেফালীর প্রকৃত আনন্দ হয়। বেদনায়, আনন্দে সে খুব ব্যাকুল ভাবে বলে, "ওগো শোনো"—

মাস ছ'য়েক পরে। এক সকালে মনিহারী দোকান থেকে টুকিটাকি সওদা করছিল শেফালী। রাস্তার দিকে পেছন ফেরা ছিল তার। হঠাৎ দেখল অমল এল সেখানে। সঙ্গে নতুন বিয়ে-করা বৌ, অপরেশের মুখে সবই শুনেছে সে। হঠাৎ উদ্ভাসিত হাসিতে সে সহজ হবার চেষ্টায় ডাকল,—"এই যে অমল, বেশ তো ফাঁকি দিলে বিয়েতে!" —শেফালীকে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত করে অমল তার দিক থেকে পুরো পেছন ফিরে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, "রুনু তোমার কী যেন দরকার বলছিলে?" —কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল শেফালীর। চেনা দোকানীর সামনেও অপ্রস্তুতের একশেষ। দ্রুত দাম চুকিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এসে সামনে একটা সাইকেল রিক্সাকে ডেকে চেপে বসল। খুব রোদ্দুর তখন চারপাশে, গরম হলকা লাগছে চোখে মুখে, চোখ জ্বালা করে জল এল শেফালীর চোখে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট টিপে সমস্ত ঘৃণায় উচ্চারণ করল, "নেমকহারাম!"

কুমারেশ ঘোষের বনানী শুয়েছিলো

[লেখকের গল্প]

হ্যাঁ, শোবার ঘরের দরজাটা সে খোলাই রেখেছে, তবে ভেজিয়ে।

মানস আস্তে আস্তে ঘরের সামনে এলো। পায়ের রবারের জুতো জোড়া বাইরে খুলে রেখে নিঃশব্দে দরজা ঠেলে সে ঘরে ঢুকলো।

মানস দেখলো ঘরের মধ্যে একটা সবুজ আলো ঘরখানাকে মোহময় করে রেখেছে। আর—আর বনানী ঘুমুচ্ছে।

শারদীয়া গোধূলি-মন/১৩৮৯/ত্রিপুরা

নরম গদীতে তার তনুলতা এলিয়ে দিয়ে ঘুমুচ্ছে। নিঃশ্বাসের তালে তালে তার বুকের যৌবন ওঠানামা করচে। মানসের মনে হলো—কামদেব যেন যুদ্ধ জয় করে তার দুন্দুভি জোড়া বনানীর বুকের উপর উপুড় করে রেখে গেছে। প্রাণভরে দেখতে লাগলো সে।

পরে ভিতর থেকে দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে মানস আস্তে আস্তে খাটের কাছে এসে দাঁড়ালো। দেখলো, বনানীর শাড়ীখানা হাঁটু পর্যন্ত উঠে থমকে থেমে গেছে। নিটোল রাঙা পা দুখানা মসৃণ থোড়! পায়ের পাতা দুখানা আলতা-রাঙা।

মানস পায়ের ডগা থেকেই চোখ দিয়ে চাটতে লাগলো বনানীর দেহলতাকে হাঁটু উরু জংঘা নাভি কোমর স্তন গলা ঠোঁট গাল চোখ—আর কুঞ্চিত কেশরাশির কবরী। সোনার চুড়িপরা হাত দুখানি যেন মৃণাল।

মানস একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবলো, ঐ শাড়ীর আবরণের তলায় পুরুষের স্বর্গ বিরাজ করছে। যেন ঢাকনির তলায় রাবড়ি।

মানস এবার তাঁর গায়ের পাঞ্জাবী খুলে ফেললো, গেঞ্জি খুলে ফেললো, প্যাণ্টটা খুলে ফেললো। তারপর ঘরের সবুজ আলোটা দিলো নিভিয়ে।

তবে ঘরের আবছাআলোয় দেখা গেলো, মানস খাট উঠে বনানীর পাশে শুয়ে পড়লো।

এবং একটু পরেই না, প্রায় তখনই তার নাক ডাকার শব্দ হতে লাগলো।

মানস ঘুমুচ্চে।

[মদনদেব ও লেখকের কথোপোকথন]

—এত কাণ্ডের পর এটা কী হলো হ্যাঁ হে ?

—কী আবার! যা হবার তাই হলো।

—মেয়েটাকে অমন করে এলিয়ে-মেলিয়ে শুইয়ে রাখলো, আর লোকটাকে ঘরে এনে মেয়েটার পাশে শুইয়েও ঘুম পাড়িয়ে দিলে ?

—তা আমাকে বুঝি যৌন বুভুক্ষু লেখকদের মত দুজনকে শুইয়ে দিয়ে কাঁচা খিস্তি লিখতে হবে ?

—নাঃ, তুমি সত্যিই ব্যাক-ডেটেড লেখক।

—তুমি থাম তো মদনদেব। লোকটা বলে সারাদিন অফিস ঠেঙিয়ে ওভার টাইম খেটে এলো, রান্নাঘরে ঢাকা-ভাত খেয়ে একটু ঘুমতে এলো—আর এখন ওকে লক্ষ্য করে তোমার তীর না ছুঁড়লে হচ্চে না ? আহা, বেচারী বৌটা সংসারের ঘানি টেনে ঘুমুচ্চে একটু অমনি তোমার গা কড়কড় করচে বুঝি ?

—আমি কিন্তু দেবো একটা তীর ছুঁড়ে।

—বটে! মেরে ছ্যাখো তোমার ঐ তীরের চাইতে আমার কলমের জোর অনেক বেশি!

পাঁপড়ওয়ালী

(সিন্ধী গল্প)

রচনা : সুন্দরী উত্তমচন্দানী
অনুবাদ : রোমানা বিশ্বনাথম

'আমার বাড়িতে এভাবে ঢুকতে যাচ্ছ তোমার সাহস তো কম নয়।'

'বোন, আমি পাঁপড়ওয়ালী আর...'

'যেই হও না কেন, কেউতো কাপড়চোপড়ও পাল্টাতে পারে, তোমার কি কোন জ্ঞানগম্যি নেই ?...এহে, কানে ঢুকেছে আমার কথা ? দরজার 'পৈটেতে বসে পড়লে কেন ? ...আর তুমি অমনভাবে পাঁপড়ওয়ালীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছ কেন ? কাপড়চোপড় বদলাতে ভুলে গেছ ?'

'তুমি নেমু, তাই না ? আমাকে চিনতে পারোনি তো ?' পাঁপড়ওয়ালী জিজ্ঞেস করে।

নেমুর মুখে কোন রা সরে না।

'আমাকে পাঁপড় বেচতে দেখে তুমি অবাক হচ্ছ, তাই না ?'

'এস, এস, বসো। আমি তো অবশ্যই নেমু। কিন্তু তোমাকে ঠিক বুঝতে পারছি না, তুমি বুড়ি না রুকি ?'

'না, আমি রুকি নই। ও আমার দিদি। আমি বুড়ি...কি সুন্দর চেয়ার...এই তো তোমার বউ, তাই না ?

নেমু মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানায়।

'তোমার কি শরীর ভালো যাচ্ছে না নেমু ? হায়দরাবাদে (সিন্ধের হায়দরাবাদ) যখন ছিলে তখনকার মত মুখের চকচকে ভাব আর নেই।'

'বুড়ি, তোমাকেও কেমন যেন...'

'বলে যাও, আটকাচ্ছে কেন ?'

নেমু স্ত্রীর দিকে ফেরে। 'সুশীলা, এই হচ্ছে বুড়ি, আমাদের পাড়ার সুন্দরী, এরই কথা তোমাকে মাঝে মাঝে বলি।'

'তাই নাকি ? ও, এই তোমার বুড়ি ? হায়দরাবাদের পাড়ার এই সেই সেরা সুন্দরী ?'

এই কথা বলে সুশীলা মুখের ওপরে এসে পড়া চুলগুলো প্রতিদ্বন্দ্বীর ভঙ্গিতে ঝট্ করে পেছনে সরিয়ে দিল বটে, তবে তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

বুড়ি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ঘরের জিনিসপত্রগুলোর দিকে চোখ বুলোতে লাগল...বিশেষত, ছবিগুলোর দিকে। ছবিগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ সে বলল, 'তিন সন্তানের জননী হলে দেহে রক্ত বলতে কিছুই থাকে না আর। আর চিরকালতো কেউ এরকম থাকে না। তাছাড়া রোদে বৃষ্টিতে ঘুরে ঘুরে ফেরি করা...আচ্ছা নেমু, তোমার ছেলেমেয়ে কি ?

নেমুর চোখে জল টলমল করতে থাকে, সামলানো যেমন কষ্টকর তেমনি কোন পুরুষের পক্ষে চোখের জল ফেলা তার চেয়েও কষ্টকর। গভীর দুঃখে সে জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু বুড়ি, তোমরা চেহারা এরকম বদলে গেল কি করে ?

'ওর প্রশ্নের জবাব দাওনি, জবাব দিয়েছ কি? সে জানতে চায়, তোমার কটা ছেলেমেয়ে…মেয়েলোক আমাদেরও তিনটি ছেলে-মেয়ে…কিন্তু তুমি তো পাপড় বিক্রি করতে এসেছ, তোমার ছেলেমেয়ে নেই?' …সুশীলা আর কিছু বলতে পারল না, রাগে তার ঠোঁটদুটো কাঁপতে থাকে।

'ধীরু! এতক্ষণ কোথায় ছিলি? দাঁড়িপাল্লাটা নিয়ে আসবি এখানে।' বুড়ি চিৎকার করে বলে।

'ছেলেটাকে রাস্তায় রেখে এসেছিলে?' সুশীলা জিজ্ঞেস করে।

'কোথায় আর ওকে রেখে আসব? …হারামজাদার পাটা একবার দেখুন। কি নোংরা। সারাদিনে ফুটি ভেঙে ছুটি করে না…দাঁড়িপাল্লাটা মেঝেতে রাখ খোকা। মেঝেতে বসে পাঁপড় ওজন করা সুবিধা হবে।'

'কিন্তু মেয়েলোক, কত করে রত্তল?*

'সুশীলা, ওকে মেয়েলোক বলে ডাকছো!' নেন্টু উত্তেজিত হয়ে মাথা নাড়িয়ে বলে, 'মেয়েলোক' কথাটা তার কানে খুব খারাপ শোনাল।

'এ্যাঁ!' সুশীলা ভ্রু কুঁচকে বিস্মিত হয়ে বলে। বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে বলে, 'তাহলে কি বলব? ওকে কি মেহেরের রূপবতী প্রাণসখা মোহিনী বলে ডাকব?**

নেন্টু এমনভাবে তাকাল যেন তেতোপাতা গিলেছে। ভ্রু কুঁচকে সে ধপ্ করে সেই চেয়ারে বসে পড়ল, যে চেয়ারটা থেকে বুড়ি মিনিটখানেক আগে উঠে গেছে।

বুড়ি মেঝেতে বসে পাঁপড় ওজন করে, স্বামী-স্ত্রীতে কি কথাবার্তা হচ্ছে সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। 'একসের, দু-সের, তিন আর আধসের। আর এই চারটে পাঁপড় বাড়তি, এগুলো নিতে পার, দাম দিতে হবে না। খেয়ে দেখ প্রথমে, তাহলেই বুঝতে পারবে যে বুড়ি পাঁপড়ের চেয়ে ভালো জিনিস পাঁচা***দিয়েছে।

'কিন্তু আগে বলতো, এক রত্তলের দাম কত পড়বে?'

'এগারো আনা করে। আপনাদের কাছ থেকে বেশি দাম নেবো ভাবছেন? এক রত্তলে আমার লাভ মাত্র আধ আনা, তার ওপরে এক পাইও নয়।'

'মিথ্যে কথা বলো না মেয়েছেলে। এত কম লাভে তিন তিনটে ছেলেকে মানুষ কর কি করে?'

'তাতে চলে না দিদি, স্বামী আমার বেঁচে থাকুক। উনিও দিনে দুটাকা রোজগার করেন।'

'মাত্র দু-টাকা?

'তোমার স্বামী কি কাজ করে, বুড়ি?' নেন্টু জিজ্ঞেস করে।

আগে আমরা বরোদায় ছিলাম। সেখানে ওনার একটা কাপড়ের দোকান ছিল। দোকান ভেঙে দেওয়ার পর, বিড়ি বাঁধার কাজে লাগে। খুব অল্প রোজগার করে। আর তাই আমাকে পেডডার রোড, কোলাবা

---

* ২ পাউণ্ড

** সিন্ধি লোককথার নায়ক নায়িকা

*** চাল ময়দার উৎকৃষ্ট পাঁপড়

ও দাদারের রাস্তায় দু-তিনবার ফেরি করে দিনে ত্রিশ সের পাঁপড় বিক্রি করতে হয়। দিনে দেড় টাকার মত হয় আর আমরা খুব সুখেই আছি—আর এই সুখে হারামজাদাটাকে দেখুন। কাঁচা পাঁপড় চিবোচ্ছিস কেন?...শোন তাহলে, হারামজাদা দুদিন পরে আজ এসেছে, নেমু?'

'এ দুদিন ও কোথায় ছিল, মেয়েলোক?' সুশীলা ছোট্ট প্রশ্ন করে।

'ওতো বলছে দাদার ষ্টেশনে ছিল।'

'ওকে খেতে দিল কে?'

'ও কুলির কাজ করেছে।'

'তোমাদের মত মেয়েছেলেরা অদ্ভুত প্রকৃতির। আমাদের ছেলেমেয়েরা একটু বাড়ির বাইরে হয়েছে কি আমরা ভয়ে মরি...কিন্তু কি ভয়ঙ্কর অবস্থায় তোমার ছেলেকে রেখেছ। তা না হলে ছেলেটা বেশ সুন্দরই দেখতে, ওর ঠোঁটদুটোতেই যা দুষ্টুমি মাখানো কিন্তু চোখদুটো কি সুন্দর! বেশ কয়েকদিন ওকে স্নান করাওনি। গায়ের ওপরে চিট ময়লা জমেছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা এক্ষুনি বাগান থেকে আসবে, দেখ কত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গায়ে এতটুকুও ময়লা নেই।'

'তা তো বটেই, ওদের গায়ে ময়লা থাকবে কেন, দিদি। আমি যদি সারাদিন বাড়িতে থাকতাম তাহলে আমিও আমার ছেলেমেয়েদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারতাম। আর আমার হচ্ছে দুমুঠো কোনরকমে গিলে ফেরি করতে বেরিয়ে পড়া। তা সত্ত্বেও আমার দুটো মেয়েকে স্কুলে দিয়েছি। কিন্তু এই ছোঁড়ার পড়াশোনায় একটুও মন নেই। সে আমার সঙ্গে ঘুরতে চায়। বলে, সেও উপায় করতে চায়। একদিন ওকে সঙ্গে নিয়ে আসতে চাইনি বলে ও পালিয়ে গেল। কিন্তু আসছে কাল ওর মাষ্টারকে দিয়ে এমন মার মারাবো যাতে ওর হাড় ভেঙে যায় আর ও স্কুলে থাকে।'

'একেবারেও বাড়িতে আটকে রাখলেও তো চলবে না, মেয়েলোক। আসলে তোমার রোজগার তো মোটে দু-টাকা; তুমি তো আর শয়ে শয়ে কর না।'

'দুটো টাকাই আমাদের কাছে অনেক। আর যাই হোক, আমরা তো কারোর ওপর নির্ভর করে নেই।'

'তোমাদের কাছে অনেক! মেয়েলোক, শোন তাহলে, আমার স্বামীর আয় তিনশ টাকা, ওতেই আমার চলে না।' সুশীলা গর্বের সঙ্গে কথাগুলো বলে যাতে বুড়ির ঈর্ষা হয়। কিন্তু বুড়ি এমন ভাব করল যেন তিনশ টাকা তার ঐ সামান্য আয়ের সমান। 'আচ্ছা দিদি, এই তোমার সাড়ে তিনসের পাঁপড় রইল। যদি নাও তো কাল আবার বেশি করে এনে দেবো।'

'কাল আবার নিয়ে কি করব? কিছুদিন বাদে নিয়ে এসো...এই নাও তোমার পয়সা।'

'আচ্ছা নেমু, আসি তাহলে', বুড়ি বলে...এই ধীরু, দাঁড়িপাল্লা ওঠা, চল এবার। সন্ধ্যে হয়ে এল।' বুড়ি চলে গেল।

'তুমি জামাকাপড় বদলালে না কেন? এখনও পাজামা পরে আছ?' সুশীলা তার স্বামীকে বলে।

'ওহো, আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু...কেন এই উত্তেজনা?

'আচ্ছা, আমি উত্তেজিত. কিন্তু তুমি তো খুশী, তোমার হৃদয়টাতো আনন্দে নাচছে, তাই না?'

দুই

'এত রাত হয়ে গেল তুমি এখনও ঘুমোওনি।' সে বলে। কোন উত্তর নেই।

'আজ রাত্রে তোমার কি হল?' তাতেও কোন জবাব নেই।

'সত্যি, কথাটা আমায় বলবে। এপাশে ফের, ফিরবে কি? তুমি এখনও বুড়ির কথাটা ভাবছ, তাই না?

'সত্যি, আমি বুড়ির কথাটা ভাবছি। কিন্তু তুমি তাতে অত ভেঙে পড়ছ কেন?'

'বুড়ির সম্পর্কে কি ভাবছ তা আমি জানি।'

'তুমি জান না, আর তুমি বুঝতেও চাইবে না'

'না বোঝালে বুঝব কি করে? ... কিন্তু আমার পক্ষে প্রশ্ন করার কত লজ্জার। বেশ তোমাকে কিছু বলতে হবে না। বরঞ্চ আমি এখন ঘুমিয়ে পড়ি।'

সুশীলা মুখ ঘুরিয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করে।

'যাকগে, বলতো কি ভাবছ তুমি!'

'ও, আমাকে একা থাকতে দাও।'

'কিন্তু বুড়ি, তোমাকে মুগ্ধ করেছে, তাই না।

'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে!'

'বেশ, আমি পাগল। তুমি এমন অভিনয় করছ যেন আমি কি বলছি তা তুমি বুঝতে পারছ না...সব সময়েই বলে এসেছি কবিকে বিয়ে করা ভুল। তাদের মনে সর্বদা সুন্দরী মেয়ের মুখ ভাসে।'

বুঝেছি, আমি বুঝেছি। পুরুষের কাছে তার স্ত্রী হেরি-এর মত সুন্দরী হলেও তার কাছে বাড়ির মুরগীর মতই মনে হয়—ডালভাতের চেয়ে উপাদেয় নয়।'

'বাজেবাজে বকো না। প্রত্যেক মানুষই সুন্দরের তারিফ করে। শুধু কবি কেন! বাগানের সুন্দর ফুল দেখে তুমি কি চোখ বুজে থাকতে পার? প্রকৃতির সৃষ্টি মানুষ।'

'বুড়ির মধ্যে কি সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছ!' সে প্রশ্ন করে...'ওর দিকে তাকিয়ে থাকার মত কিছু নেই। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি তুমি ওর চলার ভঙ্গি দেখে বিমোহিত হয়ে পড়ছিলে।'

'সুশীলা!' রেগে গিয়ে বেনু বলে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি সত্যি কথাই বলছি। তাতে তুমি চটে যাচ্ছ কেন!'

কিন্তু কি সব বোকার মত বলছ, সে একটা বিবাহিত স্ত্রীলোক, তিনটি ছেলের মা!'

'তাতে কি হয়েছে? সে যখন অবিবাহিত ছিল, তখন তাকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হওনি? তোমার বাবা তোমাকে বুঝিয়ে রাজি করাতে হয়েছিল যে তোমার মত শিক্ষিত লোকের পক্ষে আমার মত একজন শিক্ষিত মেয়েকেই বিয়ে করা উচিত তা কি আমি জানিনা? আর তার জন্য পস্তাচ্ছ!'

'পস্তাচ্ছি!' তুমি কি পাগল হয়ে গেলে! তখন সবে আমি কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি, বাবা বাধা দিয়ে ভালোই করেছিলেন।'

'ভালো যদি করেই থাকেন তাহলে তুমি বুড়ির দিকে ওভাবে সবসময় তাকিয়ে ছিলে কেন! তার চেয়েও বেশি কি জান, তাকে দেখে তুমি প্রায় কেঁদেই ফেলেছিলে। তুমি কি মনে করছ তোমার চোখের জল আমার নজরে পড়েনি, চুল ধরে রাখার জন্য কি আপ্রাণ চেষ্টাই না করছিলে! ওগো, নারীর পুরুষের মনে কথা বুঝতে দেরি লাগে না!'

'ও, যাও, যাও, ক্ষ্যাপা মেয়ে। তুমি যে আমার কথা বুঝবে না সে কথা বলিনি?'

'তুমি তো ঘুরে ফিরে সেই একই কথায় আসছ। কেন আমাকে বোঝাতে পারছ না?'

সুশীলা বুড়িকে যদি আটবছর আগে দেখতে, হয়ত তার এই হাল দেখে তুমিও কেঁদে ফেলতে⋯একসময় তার মুখ ছিল ভরাট গোলাকার কিন্তু আজ তার চোয়াল ঠেলে বেরিয়ে আসছে। তখন গাল ছিল গোলাপী রঙের আর তার মসৃণ চামড়ার নিচে রক্তের ধারা দেখতে পেতে—সেই গাল আজ শুকিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তখনকার চোখ যদি দেখতে তাহলে তোমারও জলজলে তারা বলে মনে হত। কিন্তু সেই জলজলে তারাগুলো দারিদ্র্যের নিপীড়নে কোটরাগত। দুধের মত সাদা গায়ের চামড়া রোদে ঘুরে ঘুরে এখন তামাটে রঙের হয়ে গেছে। একটা মনোরম লতা যখন সূর্যের প্রখর উত্তাপে শুকিয়ে যেতে দেখি তখন আমার বুকটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।'

'বুকটা কেমন করে টুকরো টুকরো হয় আবার রক্তই কেমন করে ঝরে?'

'সুশী, যখন তোমার সরোজের তুলতুলে মুখে বসন্তের দাগ হয়েছিল তখন তুমি কত কেঁদেছিলে! বলতে পার, কেন কেঁদেছিলে?'

'এমন কি আজও আমার গোলাপের কুঁড়ির বিকৃত সৌন্দর্য দেখে ব্যথা পাই।

'সুশী, সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর, ভালো ভালো রাস্তাঘাট এবং ফুলের বাগান জাতির গর্বের বস্তু, ঠিক সেই রকমই সুন্দর সুন্দর মুখেও দেশের গর্বের সামগ্রী। বুড়ির সেই ভরা যৌবনের রূপের পাশে আজকের তার চোখমুখ, চেহারা শুকিয়ে যেতে দেখে ব্যথা পাব না।'

'কিন্তু একজন পরদেশীকে দেখে তোমার এত ব্যাকুল হওয়ার কোন অর্থ আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

'পরদেশী! আমার নিজের লোক কেমন করে আমার কাছে পরদেশী হতে পারে।' সুশী, আমরা আমাদের ঘরবাড়ি, জমিজায়গা, খালবিল সব ফেলে চলে এসেছি। সিন্ধু থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসার সময় যে জিনিসটা সঙ্গে আনতে পেরেছি সেটা হচ্ছে মানুষের মুখের ঔজ্জ্বল্য, আর সেই ঔজ্জ্বল্যটুকুও যদি ক্ষুধার জ্বালায় মুছে যায় তাহলে কি ব্যথা পাবো না।

'কিন্তু বুড়ি চলে যাওয়ার পর তোমাকে উৎফুল্ল দেখাচ্ছে।'

'ঠিক তখনই উপলব্ধি করেছিল তার মধ্যে এক নতুন ধরণের সৌন্দর্য।

'তাই বুঝি। আর সেই নতুন ধরণের সৌন্দর্যটা কি?⋯⋯কবি তোমরা, আমাদের মত সরল লোকেদের মাথা গোলমাল করে দাও।'

'সুশী, লক্ষীটি, তুমি যদি আর একটু ভালো করে লক্ষ্য করতে তাহলে বুড়ির নতুন সৌন্দর্য ধরা পড়ত।

সেই পুরানো চপলমতি বুড়ির বদলে এক নতুন কষ্টসহিষ্ণু, আত্মবিশ্বাসী বুড়ি জন্ম নিয়েছে। লক্ষ্য করেছিলে কি তার সাধাসিধে কথা বলা, নির্বিকার ভাব ?'

'মেয়েটির মনের দৃঢ়তা—তার চলে যাওয়ার এবং চেয়ারে বসার ধরণ।'

'ঐখানেই তার সৌন্দর্য, আর তাতেই আমার মনটা আনন্দে ভরে উঠেছে। ওর মানসিক দৃঢ়তা জগতের কারোর কাছেই মাথা হেঁট করতে দেবে না। আর কেনই বা সে মাথা হেঁট করবে? তার কাছে যখন দুটাকা রোজগারও যা আর মাসে তিনশ টাকা রোজগারও তাই। সে কারোর কাছে ঋণী নয়। সে পরিশ্রম করার ফলে সে অল্প বয়সেও বুড়ি হয়ে পড়েছে, তবু সে কিছু মনে করে না। তার স্বামী দুটাকা আয় করে-দশ টাকা নয়, সে বিষয়ে তার কোন অভিযোগ নেই।'

'সে বিষয়ে তোমার বিরুদ্ধে আমারও তো কোন অভিযোগ নেই।'

'কত সরল তুমি। নিজের ভেতরটা একবার ভালো করে দেখ, সুশীর ভেতরটা অভিযোগে অভিযোগে কানায় কানায় ভরা। ছেলেমেয়ের কনভেন্ট স্কুলে পাঠাতে পারছ না, রোজ দোকানবাজার হয় না, তোমাকে কাশ্মীর ছুটি উপভোগ করতে নিয়ে যেতে পারিনি। বাড়িতে কোন রেডিওও নেই, ফ্যান ছাড়া বাস করতে হচ্ছে, প্রত্যেক মাসে তোমাকে নিয়ে বাপের বাড়ি যেতে পারছি না—কি করে সবসময় তুমি একা একা ঘুরতে পার। অপরদিকে, ঐ যে বুড়ি, নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়, একাই এই শহরে চলাফেরা করে। তার স্বাধীন মনোভাব তাকে সবদিক থেকে রক্ষা করে। কারণ বিশাল আকাশের নিচে, খোলামেলা রাস্তাঘাটে তার জীবন, স্বাধীনচেতা সে, তার নির্ভীক এবং বলিষ্ঠ মনোভাবের জন্য মেকি আত্মসম্মানবোধ তাকে কাবু করতে পারে না। সে কাজের মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবে গেছে আর তাই সে সত্যিকারের রাণী··· আরে তুমি কাঁদছ!'

নেল্লু দুহাত দিয়ে তার মুখটা ধরে শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করে, 'চোখের জল ফেলছ কেন, লক্ষ্মীটি।'

'কারণ আগাগোড়া তোমাকে বুঝতে পারিনি। এখন বুঝেছি।' তার দেহে অশ্রুসজল মুখটা চেপে ধরে উত্তরে সুশীলা কথাগুলো বলে যায়।

যুধিষ্ঠির মাজীর **গল্প** নেশা
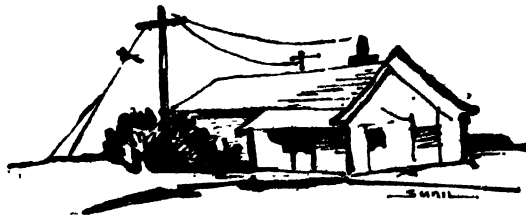
শিবেশবাবুকে চেনেন? রেল দপ্তরের কেরানী শিবেশ রায়। আমাদের শিবেশদার কথা বলছি। ভদ্রলোক বড় কৃপণ। আছে তো একমাত্র মেয়ে অরুণা তার জন্যে শিবেশবাবু এক জোড়া জামা এক জোড়া জুতো আর দু-জোড়া ধুতিতে এক জোড়া বছর কাটিয়ে দেন। টাকার কদর আছে ভদ্রলোকের কাছে।

খবরের কাগজ কেনেন শিবেশবাবু। অবশ্য রোজ নয়; রবিবার আর বিশেষ কোন দিনের কাগজ। লোকে বলে রবিবারের কাগজটাতে নাকি কাগজের পরিমাণ বেশি থাকে ঐ বেশি কাগজের লোভেই তিনি কাগজ কেনেন। তা নইলে অমন হিসেবী লোক বাজে খরচ করতে যাবেন কোন দুঃখে?

সেদিন শিবেশবাবু রবিবারের কাগজটা কিনেই মাঝের একটা পাতা মন দিয়ে পড়ছিলেন। প্রথম পাতায় কি আছে না আছে ও দিয়ে শিবেশবাবুর কোন লাভ নেই। লাভের অঙ্ক যেখানে থাকে শিবেশবাবুর চোখ সেখানেই থাকে।

আমি তার পাশে গিয়ে বসলাম। সত্যি বলতে কি কাগজ কেনার ক্ষমতা আমার নেই। তাই কাউকে কাগজ পড়তে দেখলেই তার কাছে গিয়ে বসে পড়ি বিনি পয়সায় কাগজের কিছুটা অংশ পড়েনি।

শিবেশবাবুর কাছে বসেই কাগজের সম্পাদকীয় রচনার পাতাটা চেয়ে নিলাম। তারপর একটা সিগারেট বার করে ধরালাম। শিবেশবাবুর দিকে চেয়ে বললাম—চলবে নাকি দাদা?

শিবেশবাবু আমার চাইতে বয়সে অনেক বড় হলেও পদমর্যাদায় আমরা দুজনেই সমান। তাছাড়া শিবেশ বাবুর মেয়ে অরুণাকে আমি কয়েকটা বছর পড়িয়েছি। তাই শিবেশবাবুর সঙ্গে কিছুটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। আমার কথা শুনে শিবেশবাবু এক গাল হেসে বললেন,—তুমি তো জান ভায়া, আমি কোন নেশা করি না!

শিবেশবাবু নেশা করেন না এটা আমিও জানতাম। পান, বিড়ি, সিগারেট চা প্রভৃতির নেশা শিবেশবাবুর নেই। মদ গাঁজার নামই উনি হয়তো শোনেন নি। তবু অভ্যাস বশতঃ কথাটা বলে ফেলেছিলাম।

বসে বসে সিগারেটটা পুড়িয়ে কাগজটা পড়ে আমি উঠে আসছিলাম। হঠাৎ শিবেশবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, আচ্ছা, ভায়া, উত্তর প্রদেশের খবর কি?

আমি বললাম,—শুনেছি, বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়ছেন!

আমার কথা শুনে বিরক্ত হলেন শিবেশবাবু। বললেন,—তোমাদের ঐ এক দোষ; তোমরা যখন তখন রাজনীতির চিন্তা কর। আমি বলছি টাকার কথা!

—টাকার কথা! শিবেশবাবুর কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। তিনি এবার মুখে হাসি টেনে বললেন, হ্যাঁ হে, ভায়া, টাকার কথা! লাখ্ লাখ্ টাকা একদিনে গাড়ি বাড়ি……!

বুঝলাম শিবেশবাবু উত্তর প্রদেশ-লটারীর খবর জানতে চাইছেন। কিন্তু আজকের কাগজে ও খবর নেই!

বিকাল বেলায় অফিস করার পর আবার দেখা হল শিবেশবাবুর সঙ্গে। তিনি রাস্তায় এক সাধুবাবার কাছে হাত দেখাচ্ছিলেন। আমি তাঁর কাছে এসে বসলাম। বললাম,—কি দাদা ভাগ্য পরীক্ষা করাচ্ছেন?

শিবেশবাবু হেসে বললেন,—হ্যাঁ, তোমরা ছেলে ছোকরারা তো এসব বিশ্বাস করবে না। কিন্তু ভায়া, হাতের রেখা আর বিধাতার লেখা দুটোই সমান। একটা জানতে পারলেই আর একটা জানা যায়।

তারপর সাধুবাবার দিকে চেয়ে বললেন,—কি দেখলেন সাধুবাবা?

সাধুবাবা বললেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বহুত কুছ দেখা! আপকো বহুত বড়া নোকরি মিলেগা!

—আরে, ধ্যাত্ তোর নিকুচি করেছে নোকরীর! এত বয়স হল আমার নোকরী মিলবে শ্মশানে ঘাটে! টাকা মিলবেকিনা এটাতো বলুন? শিবেশবাবু প্রায় ধমক দিয়ে কথা কয়টা বললেন। সাধুবাবা নিজের ভুল ঠিক করে নিয়ে বললেন, —জী হাঁ, রুপয়া ভি মিলেগা। লেকিন থোড়াসা তকলিফ্ হোগা! —তকলিফ্। ভেংচি কাটলেন শিবেশবাবু।

তারপর জানতে চাইলেন,—তকলিফ্‌টা কেমন করে দূর হবে ও ভিতো বোলনা পড়েগা সাধুবাবা!

সাধুবাবা খুশি হয়ে বললেন—জরুর!

তারপর তাঁর লাল কাপড়ের ঝোলা থেকে একটা মাদুলি বার করে বললেন, ইয়ে লিজিয়ে, রতন হ্যায়; রতন! শিবেশবাবু হাত দুটোর দিকে একবার তাকালেন। দুটো হাতেই গোটা দশেক করে মাদুলি বাঁধা রয়েছে। হয়ত একবার ভেবে নিলেন যে এই বস্তুটা রাখবার জায়গা হবে কিনা। তারপর মাদুলিটা হাতে নিয়ে শিবেশবাবু বললেন—কত লাগে গা সাধুবাবু?

সাধুবাবা বললেন,—সীর্ফ এক রুপয়া!

একটা টাকা দিয়ে উঠে পড়লেন শিবেশবাবু। রাস্তায় চলতে চলতে এক সময় আমাকে বললেন, দেখলে ভায়া, এদের কাছ থেকে আসল মাল বার করা দায় হয়ে পড়ে!

আমি হাসতে হাসতে বললাম—ও.ত কাজ হবে? শিবেশ বাবু জবাব দিলেন—দেখা যাক্। এক টাকা বৈতো নয়।

এদিক দিয়ে শিবেশবাবু কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান মানুষ! হাতের দশটা আঙুলের মধ্যে আটটা আঙুলকেই বেঁধে রেখেছেন নানা জাতের রত্ন আর মূল্যবান পাথরের বন্ধনে!

শিবেশবাবুর একমাত্র মেয়ে অরুণা দেখতে শুনতে বেশ ভাল। পড়াশুনাতেও ও'খুব ভাল ছিল কিন্তু শিবেশবাবু বেশি পড়ালেন না। কিছুদিন আগে শিবেশবাবুর স্ত্রী মারা গিয়েছেন। তখন থেকেই স্কুল ছেড়েছে অরুণা। এখন শিবেশবাবুর রান্নাঘরে আশ্রয় নিয়েছে। একদিন শুনলাম পাড়ার ছেলে বিমলের সঙ্গে অরুণার বিয়ে হতে চলেছে। বিমল বি-এ পাশ করে একটা স্কুলে কাজ করে ছেলে মন্দ নয়। বিমলের সঙ্গে অরুণাকে মানাবেও ভাল। সবাই বলে শিবেশবাবুর ভাগ্যটা ভাল পাত্র খুঁজতে হল না। শিবেশবাবু অনেকগুলো মাদুলি হাতে বেঁধেছেন। হয়ত তারই একটা তাঁর ভাগ্যকে ফিরিয়ে দিয়েছে। মানুষের ভাগ্যকে কখন আর কি বস্তুতে যে ফেরায় তা কে বলতে পারে বলুন?

একদিন রাস্তায় অরুণার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমাকে দেখে খানিকটা লজ্জা পেল ও। মুখেও খানিকটা রক্তের আভা ছড়িয়ে পড়ল। আমি বললাম কেমন আছ?

অরুণা মাটির দিকে চেয়ে বলল,—ভাল!

আমি চলে যাচ্ছিলাম। কিন্তু অরুণা আমার পেছনে ডাকল—মাস্টার মশাই! পিছন ফিরে বললাম, কিছু বলবে?

অরুণা বলল,—আপনি তো শুনেছেন আমার কথা।

আমি বললাম,—হ্যাঁ শুনেছি, আর শুনে খুব খুশি হয়েছি!

অরুণা বলল,—কিন্তু বাবা বলছেন যে টাকা নেই! এমন কি কোন গয়নাও গড়িয়ে দিতে পারবেন না!

আমি হেসে বললাম,—বলকি? তোমার বাবার টাকা নেইতো কার টাকা আছে এখানে? অরুণা কথা না বলে মুখ লাল করে মাটির দিকে চেয়ে থাকল।

আমি বললাম,—তুমি ওসব ভাববে না, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু সময়ে কিছুই হল না। শিবেশবাবু আমাদের অবাক করে দিয়ে মাথা নাড়লেন,—টাকা নেই। অবশ্য আশার কথা তিনি বললেন যে কিছু দিন পরে ভগবানের কৃপায় যদি লটারীর টাকা হাতে এসে যায় তবে মেয়ের বিয়েতে টাকার খেল দেখিয়ে দেবেন।

শিবেশবাবুর কাছে টাকা নেই এ কথাটা বিশ্বাস করতে মন চাইল না। টাকাই যদি নেই তবে মাসে মাসে মাইনের টাকাগুলো করেন কি ভদ্রলোক? ঘরে একটা মাত্র মেয়ে। বাড়িতে ঝি চাকর নেই! তবে কি তিনি সব টাকা পোস্ট অফিসে ফিক্সড্ ডিপোজিট্ দিয়ে রেখেছেন? শুনেছি এই জগতে এমন কতকগুলো মানুষ আছে যাঁরা ছেলে মেয়েদের না খাইয়েও টাকা জমায়—কি জানি শিবেশবাবু ঐ ধরণের লোক কিনা।

বিমলের বাবা রমানাথবাবু ছেলের বিয়েতে হাজার চারেক টাকা চেয়েছিলেন। হয়তো দাবিটা অসঙ্গত ছিল না। আজকাল বিনি পয়সায় কেইবা ছেলের বিয়ে দেয়? কিন্তু শিবেশবাবু হাজার খানেক টাকাও মেয়ের বিয়েতে খরচ করতে পারবেন না। অগত্যা রমানাথবাবুকে বোঝান হল যে শিবেশবাবুর কোন ছেলে নেই; একটা মাত্র মেয়ে। সুতরাং জমান টাকার সবটাই বিমল একদিন পাবে। শিবেশবাবুর জমান টাকার পরিমাণটা নিশ্চয়ই কম হবে না। তাই বিনা পয়সাতেই শেষ পর্যন্ত ছেলের বিয়ে দিতে রাজি হলেন বিমলের বাবা।

বিয়ের সব কিছুর ব্যবস্থা করা হল। শিবেশবাবুর প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে ধার নেওয়া হল তিন হাজার টাকা। এই টাকাটায় বিয়ের খরচ চালান হবে।

বিয়ের দু দিন আগে অরুণা আমার কাছে এল। এসে চোখের জল মুছে বলল,—মাষ্টার মশাই! আমি বললাম,—কি হল আবার?

অরুণা বলল,—সেই তিন হাজার টাকাটা আমিই রেখেছিলাম। কিন্তু বাবা লুকিয়ে দু'হাজার টাকা বার করে নিয়েছেন?

আমি অবাক হয়ে বললাম,—টাকা নিয়ে কি তোমার বাবা ব্যাঙ্ক বা পোষ্ট অফিসে জমা দিয়েছেন?

—না! মাথা নাড়ল অরুণা।

—তোমার বাবা বাড়িতে আছেন ?

—না, কোথায় যেন সকালে গিয়েছেন এখনও ফেরেন নি !

—আচ্ছা তুমি যাও আমি দেখছি কি করতে পারি !

আমার কথায় কিছুটা শান্ত হয়ে অরুণা চলে গেল। আমি অবাক হয়ে শিবেশবাবুর কথা ভাবতে লাগলাম। উনি কি চান ? উনি কি অরুণার বিয়ে দিতে চান না ? না ভদ্রলোকের অরুণা প্রসঙ্গে কোন কমপ্লেক্স আছে ?

বাজারে যাওয়ার পথে শিবেশবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। শিবেশবাবু সেই সাধুবাবাকে এক হাতে ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছেন। আর বলছেন, —তুমকো হাম মার ডালেগা শালা !

সাধুবাবা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন শিবেশবাবুর হাত থেকে ছাড়া পাবার। আমাকে দেখে তিনি বললেন,—বাঁচাইয়ে বাবু সাব, জান বাঁচাইয়ে। শিবেশবাবুর হাত থেকে সাধুবাবাকে ছাড়িয়ে দিলাম। সাধুবাবা তাঁর ঝুলিটা নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে বাঁচলেন।

শিবেশবাবু বললেন,—শালা চোর, আমি দু হাজার টাকা দিয়েছি তবু আসল মাল দেয়নি।

আমি বুঝতে না পেরে শিবেশবাবুকে বললাম, —সে কি শিবেশদা, সাধুবাবাকে দু'হাজার টাকা কি ভাবে দিলেন ?

শিবেশবাবু জবাব দিলেন, —বুঝলে ভায়া, আশ্চর্য কবচ ! যা ধারণ করলে লটারীর লাখ লাখ টাকা ঘরে আনতে কষ্ট হয় না ! ও শালা দু হাজার টাকা নিয়েও আমায় নকল মাল দিয়েছে তাই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারীর ফার্স্ট প্রাইজের টাকাটা আমার ফসকে গেল !

ওখান থেকে শিবেশবাবু ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন। আমি আবার পথে বেরুলাম সেই সাধুবাবার সন্ধানে। কিন্তু তাঁকে আর কোথাও দেখা গেল না।

বিকেল বেলায় এক সময় অরুণা বলল, —মাষ্টার মশাই !

আমি ওর দিকে চাইলাম।

অরুণা বলল—বাবার একটা গোপন বাক্স আছে। হঠাৎ যেন অকুলে কূল পেয়ে গেলাম।

বললাম,—ওতেই বুঝি টাকাকড়ি রাখেন তোমার বাবা ?

অরুণা বলল,—টাকা আছে কিনা জানি না। তবে কি সব রত্ন টত্ন নাকি আছে।

অসম্ভব নয় ! মহা বুদ্ধিমান শিবেশবাবু। মাইনের সমস্ত টাকা দিয়ে হয়ত সোনা আর হীরা,—মুক্তা প্রভৃতি কিনে রেখেছেন !

আমি অরুণাকে বললাম,—কোথায় সেই বাক্স ?

অরুণা বলল,—আমাদের লক্ষ্মীঠাকুরের পিছনে।

আমি লক্ষ্মীঠাকুরের পিছন থেকে একটা ছোট বাক্স নিয়ে এলাম। তারপর সেটা নিয়ে শিবেশবাবুর ঘরে গেলাম।

শিবেশবাবুকে বললাম, —বাক্সের চাবি কোথায় ?

—ওতে টাকা নেই ! জবাব দিলেন শিবেশবাবু।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, —চাবি চাচ্ছি !

শিবেশবাবু অসহায় ভাবে তাকিয়ে রইলেন। অরুণা একটা শাবল নিয়ে এসে বলল, —মাষ্টার মশাই, এটা দিয়ে ভাঙুন বাক্সটা।

বাক্সটা ভাঙা হল।

চোখ বড় করে দেখলাম ওতে রয়েছে লাল নীল সবুজ সাদা মনিমুক্তা ! সব নকল পাথর ! সারা জীবন ধরে শিবেশবাবু নকল পাথর কিনেছেন ভাগ্য ফেরাবার জন্ম।

বাক্সে আরও আছে লাখ লাখ টাকার ছাপমারা কাগজ। উত্তর প্রদেশ-বিহার-উড়িষ্যা-পশ্চিমবাংলা-আসাম-তামিলনাডু-কেরালা-অন্ধ্র কোনটাই বাদ দেন নি শিবেশবাবু। লাল নীল হলদে কাগজে বাক্সটা ভর্তি। আজ শিবেশবাবু দশ বছর ধরে যে ভাগ্যের খেলা খেলেছেন তারই নিদর্শন। অরুণার দিকে চেয়ে দেখলাম। তার চোখ জলে ভরে গিয়েছে। সে চোখ মুছতে মুছতে বলল—মাষ্টার মশাই ! বিমলদের বলে দিন ; বিয়ে আমাদের হবে না !

সব জেনে শুনেও না জানার ভান করে বললাম, —কেন ?

—হ্যাঁ, জুয়াড়ির মেয়ের বিয়ে হয় না ! কাঁদতে কাঁদতে ভিতরে চলে গেল অরুণা।

অবশ্য বিমলবাবুদের আমাকে কিছু বলতে হল না। ওঁরাই পরের দিন জানিয়ে দিলেন—এ বিয়ে আর হবে না !

সনেট/শুদ্ধসত্ত্ব বসু

জলের রঙীন মাছ কি দুর্মর বাসনা-বাহারে
সাঁতরাবে, কাঁচের দেওয়াল-ঘেরা অগভীর জলে
নিকৃত নুড়ির দ্বীপে, সামুদ্রিক লতার আদলে-
রাখা কিছু ঘাসে, উল্টে পাল্টে পাক খায় বারে বারে,
আবার কখনো ভাসে উদাসীন, কিম্বা ডানা নাড়ে।
কাঁচের খাঁচায় কিছু জল দিয়ে অপূর্ব কৌশলে
নকল শৈবাল দামে ছক কাটা সমুদ্রের ছলে
মাছকে ভোলায়, —বুঝি সব মানুষকেও, —আহারে!

এম্নি এক জলাশয়ে খেলা করি— কখনো গভীরে
ডুবি, কখনো বা জলের উপরে পরিমিত ভাসি,
বৈদ্যুতিক বাতির ছটায় ডানা নাড়ি সুখে ও উল্লাসে
আবার কখনো মগ্ন বর্ণহীন ঘাসের তিমিরে
কখনো পাখনা নাড়ি, স্বল্প জল না বুঝেও হাসি
চৌকো বাক্সে ঘুরি—তাই বুঝি না কোথায় ভুল ভাসে!
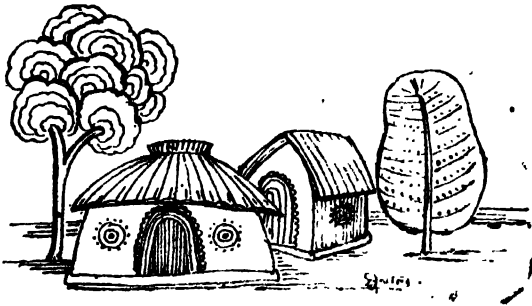
খুঁজি পলে পলে/বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

এখনো তো সেই সূর্য ওঠে
সে-ই চাঁদ।
আকাশের বুকে নক্ষত্রের মেল।
প্রতিদিন এখনো তো বসে।,
পাখি গায়—
ফোটে ফুল গাছে গাছে
তবু ক্লান্ত হই কেন?
কেন ক্লান্ত হই
মানুষের সেই মুখখানি খুঁজে।
বাধা দেয় এই পথে
অবিরাম নিঃসঙ্গতা কাঁটা।

খুঁজি ভালোবাসা,
প্রতিদিন প্রতি পলে পলে
প্রেম প্রীতি মাখা এককোঁটা শুধু ভালোবাসা
মিছে খোঁজা।
ভালোবাসা সেজে আছে
বহুরূপী সাজে।

পবিত্র সকালের দিকে/গৌরাঙ্গদেব চক্রবর্তী

আলোকিত হওয়ার অভিজ্ঞান ছোঁয় না ধ্রুপদ
শ্যামাপোকার মত বার বার মৃত্যু হয় আমার।
ইমন কল্যাণ ছুঁয়ে দেখি বুকের ভেতর থেকে
চোখের কোটরে কিছুক্ষণ খেলে হরিদ্রা শ্যামলে
তারপর হয়তো কোথাও বৃষ্টিনামে কোথাও......
উচ্ছিষ্ট দিন হেঁটে যায় পবিত্র সকালের দিকে।

চোখের ভেতরে আরেকটা চোখ কি ভাবে যে চেয়ে আছে
মোহণর ভেতর আর একটা মোহনা যে দেখাই যায় না !
তবু তার স্রোত দু'বেলাই আমাদের ধুয়ে যায় নিরালা
মেঘে মেঘে কি প্রচণ্ড ঘর্ষণ অসম্ভব প্রলয়ের মত।
ক্ষণিকেই পবিত্র হই ভুলে যাই যে সমস্ত ক্ষত
ভুলে যাই যেটুকু বৃষ্টিতে ধুয়ে গিয়েছিল।
আমরা তো ফসলের দিকেই চেয়ে থাকবো
জেনেছি সমস্ত ভিক্ষার ঝুলির অসংখ্য ছিদ্র !

অগাধ সমুদ্র মনে রেখেছি জানি তার বিশাল বিস্তার
তবুও খুশীর ডিঙ্গা স্পষ্ট বেয়ে যাবো গেয়ে যাবো মেঘ-মল্লার
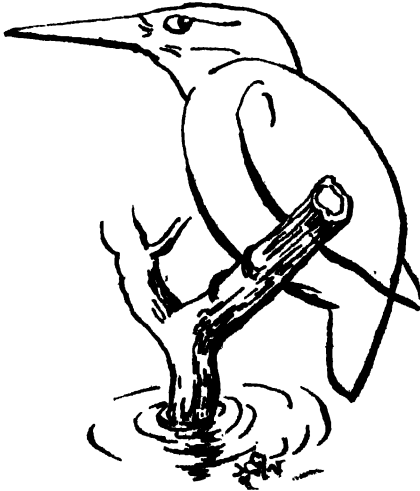
কিশোর/সুকুমার সেনাপতি

আমি দেখেছিলাম এক ক্লান্ত কিশোর,
বর্ষার দুপুর যেন বিকালের শেষ।
সামুদ্রিক লোনা স্বাদ, বাতাস
সবেতেই অনিশ্চয়তা
তবুও সে খুঁড়ে যায় ধরিত্রীর প্রাণ
কিশোর। আমি দেখেছিলেম এক কিশোর,
রূঢ় বাস্তব সত্যের মুখোমুখি এক কিশোর
বর্ষার দুপুর যেন বিকেলের শেষ।
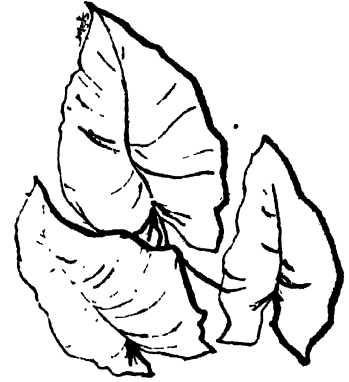
একটুকরো/রথীন্দ্রনাথ রায়

যদিই বুকের শক্ত জমিন
ঝাপান সেরেই কি প্রকৃত ভাঙা ?
একটু শরম লাগে—
যখন শুধুই লাজনম্র রাঙা
নিবিড় অনুরাগে

আজকাল স্বপ্ন দেখাও এক যন্ত্রণা/
জীবনময় দত্ত

আজকাল স্বপ্ন দেখাও এক যন্ত্রণা।
বড় বিশ্রী আর বিদঘুটে ;
জীবিকা নিয়ে
উদয়াস্ত কি কম খাটা খাটুনী !
এমন মধ্যবিত্ত আঁটসাট জীবনযাপনে
তোমাকে নিয়ে
স্বপ্ন দেখাটাই এক ব্যতিক্রম—
তাই স্বপ্ন দেখতে চাই রোজ।
গতরাতেও চেয়েছিলাম :
কিন্তু কি সব সাংঘাতিক খাপছাড়া ঘটনা
ওঃ ভাবতেই মাথা গরম হয়ে যায়
মেজাজ যায় বিগড়ে
অথচ কতদিন তোমায় দেখিনি বল তো !
টেলিফোন তো সব সময়ই খারাপ
ডাকের গোলমালে চিঠি বেপাত্তা
বল এভাবে কি ভাল লাগে !
শুধু মনে পড়ে
সেদিন তোমার চলে যাবার ভঙ্গীটুকু
আর উড়ে যাওয়া আঁচল
স্মৃতির স্মরণ থেকে নিঙড়ে এনে
সেই আঁচলের টুকরো দিয়ে
রুমাল বানাব ঠিক করেছি এখন, কারণ,
স্বপ্ন দেখাও এক যন্ত্রণা আজকাল।

দেখা/কঙ্কণ নন্দী

তোমার মুখটা গতকাল দেখলাম
হরিৎ রঙ আপেলের মতো
ট্রামের প্রথম শ্রেণী কামরায় গোধূলি বেলায়

তোমার মুখটা গতকাল দেখলাম এক নিমেষ
অতঃপর বৈদ্যুতিক তার
তোমাকে টেনে নিল সুদূরের দিকে
ঠিক তখনই আমার বাস এলো হাওড়া গামী
তোমার ধারালো চিবুক গেঁথে নিলো আমার হৃদয়

তারপর আমার বিষণ্ণ বাস ছুটে গেলো অভিমানে
হাওড়া ষ্টেশনে।
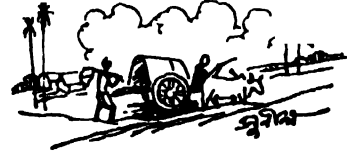
এরপরে হয়তো/ঈশিতা ভাদুড়ী

কাল হৃদয়ে মুঠো মুঠো সুখী ভাল-লাগা এসেছিল,
আজ লুটোপুটি ফুলে ভ্রমরের মুগ্ধ গুঞ্জন।
এরপরে হয়তো বিমূঢ় লজ্জা।।

কাল এসরাজে সুরের খেলা চলেছিল,
আজ হিমে ভেজা পলাশে রঙীন বোধ।
এরপরে হয়তো অনাদৃত অভিমান।

কাল শিরায় শিরায় দু'টি নূপুর নেচেছিল,
আজ গোপন আড়ালে লাল হলুদ ইচ্ছে, চোখে সুর্মা
এরপরে হয়তো নোনাধরা শিখা।

এই সময়/মতি মুখোপাধ্যায়

কারো হাত রাখা আছে অন্য কারো হাতে :
কালীঘাটের পটের চেয়ে প্রাচীনতর এই পট
হয়তো বা প্রাচীনতম ছবি
নাকি হাজার দুয়ারীর হারিয়ে-যাওয়া অয়েল পেন্টিং
চর্যাপদের চেয়ে মূল্যবান
কোন কিউরিও দোকান কি সুভো ঠাকুরের সংগ্রহ-শালা
কি পিকাসোর ছবিতে যা অলভ্য
ফ্লুরোসেন্ট বাতির মত যার উজ্জ্বলতা
অন্ধের যষ্টির চেয়ে যা আরো বেশি নির্ভরতা আনে।

কারো হাত রাখা আছে অন্য কারো হাতে :
পুরনো পুকুর ঘাটের পৈঠার মত যার ওপরে জমেছে
আদ্যিকালের শ্যাওলা
রোদ জল মাথায় নীলকণ্ঠ পাখী খোঁজার মত যাকে খুঁজতে হয়
জনারণ্যে
মর্গের টেবিলে শুয়ে-থাকা ক্ষতবিক্ষত মানুষটির শরীরে
কি ধর্ষিতা নারীর লজ্জার ভেতরেও
এবং যার ক্ষয়
প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে টাকার মূল্যহ্রাসের সমতুল্য ক্ষিপ্রতায়।

হাজার বছর পরে একদিন, হয়তো বা তারও ঢের পরে
নালন্দার মত তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

স্বভাব/দেবাশিস্ প্রধান
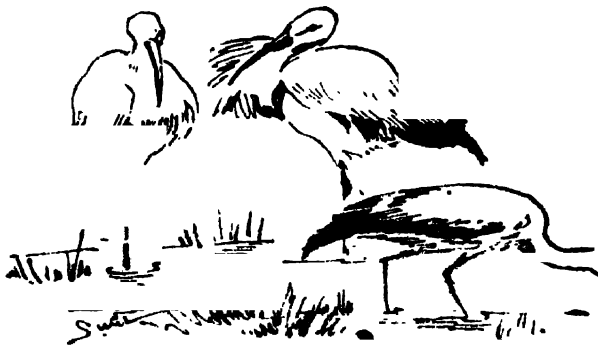
ফলন্ত সময় ধরে চলে যায়
হি জি বি জি অফিসফেরৎ লোক,
সময়ের কাছে নতজানু হ'য়ে
জীবন যন্ত্রনার বন্ধুর সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে সবাই

তারপর অনড় অটল গৃহীর ঘরে
অকস্মাৎ ভীড় করে রাতের আঁধার
পাখীর ক্লান্ত ডানায় লেগে থাকে অভিমানী কথা :

রাত ক্রমে বেড়ে যায়, বেড়ে যায় সভ্য মানুষের ক্রমোন্নতি
ক্লেদাক্ত শরীরের গোপন চাতুরী—
সারা গায়ে লেগে থাকবে কাদা ছড়িয়ে ছিটিয়ে
অভিনয় হবে আজ রাতে প্রিয় প্রতিবেশীর সাথে
নখের আঁচড়ে খোঁড়া হবে হিংস্র নদী স্রোতস্বতী,
অভাবেই স্বভাব নষ্ট হবে স্বাভাবিক অসুস্থতায়

আশে পাশে গলির বাসিন্দা
অই মোড়ের ভজু মিঞা
ঘিঞ্জি বস্তির পুরোনো দেবালয়
ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকবে
অভিনয় শুরু হবে, অভিনয় শেষ হবে চোখের পলকে
সময়ের চটুল হাওয়ায় গড়িয়ে গড়িয়ে
স্বভাব হবে বেপরোয়া, কি সাংঘাতিক !

পাপ, বড়ো পাপ/কৃষ্ণসাধন নন্দী

অনেকদূর যেতে পারে সে। তবু
গুটিয়ে থাকে, সন্তর্পণে হাঁটে আজকাল
স্বাদুজলের হ্রদ বেশী নেই
নোনা সমুদ্র
ভুলে যায় প্রিয় গান
যায় দিন এভাবে দিন যায়।

সে কী অরণ্যে যাবে
নির্বিকার সন্ত এক মুখ লুকাবে গুহায়
দূরে থেকে মরুভূমি ;

পাপ, বড়ো পাপ এই বিশ্বাস হারানো
এই সরে যাওয়া।

অথচ সুন্দর/জহরলাল বেরা

রহস্যময় সুন্দরী হেসে ওঠে
বলে—'তাই'
বিস্মিত সেই তুমি দিতে পারো প্রত্যয় ;
সেতু ও মিলন মুহূর্তের নির্যাস।
এ তোমার সাবলিল বৃত্ত—
স্ব-রচিত পাণ্ডুলিপি, ভূখণ্ড।

কাঠ্‌বিড়ালী তোমারই মতন
দিয়ে যায়—'চিক্'
কিশোরীর স্মৃতি ; সে সময়
বুকের জমাট অন্ধকারে আমারি মুখ
ছিঁড়ে খায়-স্তন,
যৌবনে অর্জিত ব্রণের কষ্ট।

অজ্ঞাতবাস/বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়

কাছে কেউ থাকবে না, শুধুই পাথর
হৃদয়ে জড়িয়ে রাখতে হবে—
পাথর তো তোমার মতো মঞ্জুবাক নয়
তোমার আঙুলের মতো পাথরে কার্পাস নেই
নতুবা সে সান্ত্বনার চোখে
আমার যন্ত্রণাগুলি রোদ্দুরে বিছিয়ে দিয়ে
চাঙ্গানো শালের মতো তুলে রাখতো ঘরে

তুমি দূরে আছো, শব্দও নিকটে নেই
জন্মনাড়ির মতো কথামালা
বিস্মৃতির শীতের চত্বরে শুয়ে আছে
সহোদর, সহচর কেউ কাছে নেই
ছন্দও সমীপবর্তী নয়—
এখন আমার থেকে আমি বহুদূর……

মাঝে মাঝে মানুষের বুকের গভীরে
অজ্ঞাতবাসের পাখি ওড়ে॥
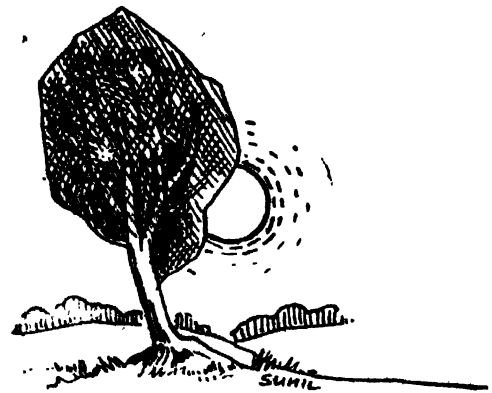
ইচ্ছে করে/বাপী চক্রবর্তী

আমার ভীষণ ইচ্ছে করে তোমার কাছে যেতে
যেতে যেতে পথের পাশে পাথর এবং তাতে
তোমার নামের খোদাই এবং তোমার ভালোবাসার ঘ্রাণ
আতর করে মেশাবো জলে এবং সারবো আমি স্নান
বনের মধ্যে নদীর জলে তোমার মুখের ছবি
তুমি আমায় বলেছিলে—কাছে এসো কবি।

এখন আমার কলম জুড়ে শুধু ভালোবাসার খেলা
হেলা ফেলায় সময় বিকোয় সকাল সন্ধেবেলা
এখন আমি প্রভাত কালের সূর্যি হয়ে হাসি
বৃষ্টি হয়ে গ্রীষ্মকালে তোমার কাছে আসি
ছাখো, কেমন রূপ হয়েছে আমার বুকের ছবি
তুমি আমায় বলেছিলে—কাছে এসো কবি॥

নীল পোকা/জীবন গঙ্গোপাধ্যায়

অস্ফুটে
দুটো কথা তার সঙ্গে হল কি হল না—
একটি নরম নীল ভাবনার পোকা
মরে মাথা কুটে !

বুকের ভিতর
তবু এক শাদা ঘোড়া—ভারি এক রোখা
কিছু শুনল না
খুরের দাপটে তাপে নিজেই ঈশ্বর !

বোকা
একা নীল পোকা
উড়ে উড়ে
ঘুরে ঘুরে
কুরে কুরে
মরে
পাশ ফিরে কুঁকড়ে থাকে ভ্রূণের অক্ষরে।

হাত/শীতল চোধুরী

বাল্যকাল এসে দাঁড়ায় প্রতিদিন বিকেলে। একত্রিশটা
বাজপাখি উড়ে যায় পাহাড়ের দিকে। ঘন জঙ্গলের ভেতর
থেকে বেরিয়ে আসে কালিদাসের ময়ূর !

বন্ধ দরজায় ঘা দেয় গৈরিক বাউল। উত্তর দিক থেকে
ঠাণ্ডা হাওয়ায় ছিঁড়ে যায় হাতের শেকল। চুলের ভেতরে।
বিলি কাটে দুটো শীতল হাত।

সুনন্দার কাছে আর ইচ্ছে করে না চিঠি লিখতে।

শারদীয়া :গোধূলি-মন/১৩৮৯/লাহাবুর

পাঁচ বছর/রবীন সুর

শ্লেট ভাঙছে বারংবার হাত ফস্কে, ছেঁড়া ধারাপাত
মলাটের প্রতিরক্ষা ভুলে ছাখো মেঝেয় গড়ায়
দশগণ্ডা জললেত্তি, একডজন রঙিন কলম
দরকারে পাবে না — তবু যাবতীয় সম্পত্ত বোধের
দখল, খবরদারি ব্যাগভর্তি, টলমলে অক্ষর
ধাবন্ত ইচ্ছার সঙ্গে পাল্লা দিতে বেদম হাঁপায় ;
ছড়া ঘুরছে মুখে মুখে এলোমেলো নামতার ঝড়—
ঢ্যাড়া গুণে কর রেখা টালমাটাল যোগবিয়োগের
আঁককষা সংখ্যাতত্ত্বে। সূর্য মানে চতুষ্কোণ শ্লেটে

গোল্লার চারধারে আঁকিবুকি, দাঁড়ি কেটে একদিকে
হিজিবিজি হচ্ছে গাছ, রসগোল্লা ছুঁয়ে ছুটি রেখা
ইতিহাসপূর্ব কোনো গুহাগাত্র থেকে মানুষের
প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠছে দ্রুত চকখড়ির ডগায় ;
এখন আকাশ মানে রোদ বৃষ্টি জ্যোছনার রাত্তির
বাবা আব্দারের ঘাঁটি, ঘুমেজাগা মা হচ্ছে আদর।
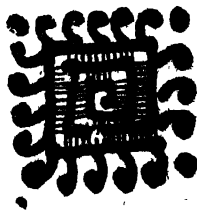
কাছে দূরে/প্রদীপ রায়চৌধুরী

কতটা ভিতরে ঘর বেঁধে আছো বুঝতে পারি
সঠিক অর্থে যখন তুমি বাইরে যাও
পাকা ঘোড়সওয়ার হয়েও এসময় আমার
ঘোড়ার মুখ থেকে খুলে পড়ে যৌবনের রশি
বাড়ী ফিরে ক্লান্ত শরীরে বৈদ্যুতিক আলোয় পাখায়
নিরবিচ্ছিন্ন চলে লোডশেডিং এর দাপট
অথচ যখন পাশে থাকো মাটির ঘড়া হয়ে
যেমন থাকার তখন তুমি তেমনই
বৈশিষ্টহীন থাকো

দূরের তোমাকেই তাই মাঝে মাঝে
আরও বেশী কাছে মনে হয়
আর ছাখো এভাবেই দূরে গিয়েই আমরা
ভীষণ রকম কাছে আসতে পারি নিজেরই অজান্তে

আধুনিকের দুরূহতা ঃ এলিয়টীয় অভিমতের আলোকে

প্রদ্যুম্ন মিত্র

আধুনিক কাব্যজগতের পুরোধা শিল্পী হিসাবেই টি, এস, এলিয়ট চিহ্নিত হয়ে আছেন আজও। সেই এলিয়ট তাঁর সমালোচনা-কর্মকে কাব্যসৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনারই এক বিস্তার বলে ঘোষণা করেছেন (সমালোচনার সীমানা : নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী)। যে সব শিল্পী বা মনীষী তাঁর নিজের সৃষ্টিকর্মকে প্রভাবিত করেছেন তাঁদের সম্পর্কেই নাকি তিনি সবচেয়ে ভাল লিখেছেন, যথা পাউণ্ড : দান্তে কিম্বা বোদলেয়র। সাহিত্যজীবনের শেষপর্যায়ে এসে ১৯৬১ সনে তিনি যখন লেখেন তাঁর প্রথম পর্যায়ের সমালোচনা নিবন্ধগুলির সাধারণ বা কোনও শিল্পীর রচনা বিষয়ক মন্তব্যাদিতে, তিনি নিজে সমালোচক এবং শিল্পী হিসেবে তাঁদের রচনা বা ভাবনার প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন, তখন আমাদের মন্তব্যটিই সমর্থিত হয়। সে সময় এলিয়ট এবং তাঁর প্রাণিত পূর্বসূরী পাউণ্ড চাইছিলেন নতুন সৃজ্যমান কবিতার বৈদগ্ধ্য, সূক্ষ্মতা ও মহাদেশীয় অনুষঙ্গ প্রবণতার উপযোগী এক সচেতন পাঠকমণ্ডল গড়ে তোলা যাঁরা শুধু আধুনিক কবিতার বোদ্ধা পাঠকই হবেন না, আধুনিকতার ঐতিহ্যের সচেতন প্রতিপালক হয়ে উঠবেন।

এলিয়টের কাব্য-সমালোচনা কর্মের এই বিশিষ্ট চরিত্রটির কথা মনে রেখেই সন্ধান করা উচিত স্বকালের কবিতা (বা সাহিত্য) নিয়ে তাঁর সাধারণ তাত্ত্বিক অবস্থান তথা বিশিষ্ট কাব্যগত অভিমত কেমন ছিল। আধুনিক কবিতা নিয়ে বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে যে অভিযোগ সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ ছিল, তা হল তার দুরূহতা ও দুর্বোধ্যতার প্রসঙ্গে। এলিয়ট উনিশশো একুশে (১৯২১) লিখেছেন, বিশশতকী সভ্যতার পরিধিবাসী যে কোনও কবির পক্ষে দুর্বোধ্য হওয়াই স্বাভাবিক। একালের জীবন, তার অস্তিত্বরক্ষা ও অন্তস্তর চর্চার সম্ভাব্যতা নিয়েই যেমন বিচিত্র তেমনই জটিল ও নিগূঢ়তাপ্রবণ ; কবির সত্তা-সূক্ষ্ম সংবেদনার ওপর সেই জটিল বৈচিত্র্যের ক্রিয়া অভিব্যক্তির মাধ্যম ভাষাকে তার অভ্যস্ত যুক্তিশৃঙ্খলা থেকে বিচ্যুত করেছে তাৎপর্য সঞ্চারের স্বার্থে। (মেটাফিজিকাল কবিকুল, ১৯২১) এলিয়টের মতে আধুনিকের দুরূহতার কারণ একাধিক। প্রথম, একান্ত ব্যক্তিক অভিপ্রায় কবিকে উচ্চারণের প্রথাসুগম সড়কটি থেকে অপরিচিত রাস্তাঘাটে নামিয়ে দেয় ; সে অবরোহন প্রথমদিকে নিন্দনীয় মনে হলেও সচেতন পাঠককে খুশি করে তোলে এই ভাবনায় যে শিল্পী বা কবি অভিব্যক্তির যা হোক একটা পথ খুঁজে নিতে পেরেছেন। দ্বিতীয়, নতুন ভাব, চেতনার অসনাক্তপূর্ব উপকরণগুলিও প্রায়শই দুরূহতা এনে সঞ্চার করতে পারে রচনায় ; কে না জানে একদা ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীটস, শেলী ব্রাউনিঙ্‌ সকলকেই সে জাতীয় নিন্দা স্পর্শ করেছিল ; নিজ নিজ কালের সাহিত্য বোদ্ধাদের কাছে তাঁদের কাব্যে নতুনরীতির উদ্যম নির্বুদ্ধিতার নামান্তর বলে মনে হয়েছিল। তাই, নতুন কাব্যশৈলীর উদ্যম স্বাগত হলেও নতুনত্বের ফ্যাশনও দুরূহতার কারণ হয়ে উঠতে পারে অনেক ক্ষেত্রেই। তৃতীয়, পাঠকের পূর্বনির্দিষ্ট মানসতাও দুরূহতার জনক হয়ে ওঠে যখন পাঠক একালের কবিতা দুরূহ বা জটিল ধরে নিয়েই পাঠ শুরু করেন। সাধারণ পাঠককে দুরূহতার বিরুদ্ধে সতর্ক করা হলে তিনি কবিতাকে গ্রহণ করবার অনুপযুক্ত কাঠিন্যের মধ্যে নিজের মনকে নিক্ষেপ করেন। ফলে হয় তিনি চাতুর্যের সঙ্গে খুঁজতে থাকেন কোথায় সেই প্রাগভাবিত দুরূহ নয় নিজের অজান্তে কবিতার

থাকুতে ধরা পড়বার ভয়ে সিঁটকে থাকেন। আরও খাতস্থ পাঠক যিনি মনের এসব ব্যাপারে অনেক নির্ভয় তিনি অন্তত প্রথমেই দুর্বোধ্যতার প্রসঙ্গ নিয়ে এত মাথা ঘামান না। এলিয়ট নিজে অনেকসময়ই প্রথমপাঠে বুঝে উঠতে পারেননি এমন অনেক কবিতার কথা বলেছেন যাঁর মধ্যে রয়েছে শ্বয়ং শেক্সপীয়রের রচনা। চতুর্থত, আধুনিকের রচনা আরেকটি উৎস, এলিয়টের মতে, অনেক কিছুই না বলে ছেড়ে দেওয়া বা আভাসে বলে দেওয়া। যেটা পাঠক চিরদিনই খুঁজতে অভ্যস্ত সেই সরল অভিধার অনুপস্থিতি এবং ব্যঞ্জনা ধর্মের প্রাধান্য সাবেকি কবিতার পাঠককে আধুনিকের প্রতি বিরূপ করে রাখে।

কবিতার ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজন কি তা নিয়ে (অবশ্যই এলিয়ট এক্ষেত্রে বিশেষ কিছু কবিতা বা তার ছাদ মনে রেখেই বলেছেন) বলতে গিয়ে এলিয়ট পাঠকের মনকে ব্যস্ত বা শান্ত রাখা, তার অভ্যাসকে পরিতৃপ্ত রাখার কথা উল্লেখ করেছেন, কারণ সেভাবেই কবিতা তার নিজের কাজ করতে, পাঠকের যুক্তি বা সংস্কারবাদী প্রতর্কচালিত চেতনার ওপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে থাকে ; এই ব্যবস্থার মধ্যে তিনি গল্পের দুর্বৃত্তের বাড়ির পোষা কুকুরের জন্য মাংসের টুকরো যোগানোর প্রতি তুলনা দেখেছেন। সব কবিই যে একভাবে কাজ করেন এমন নয় ; এমন অনেকেই আছেন যাঁরা অর্থের জবরদস্তি সম্পর্কে শিক্ষিত পাঠক সচেতন ধরে নিয়ে অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় অভিধা-নির্ভরতাকে বাদ দিয়ে সংবেদের বিচিত্র তীব্রতার বিশ্বাস্য প্রতিলিপিই ধরে রাখতে চান কবিতায়। সমালোচক এলিয়টের কাছে এ ধরণের মনোভাব সর্বাংশে কাম্য নয় ; তবে তিনি এ-ও মানেন যে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের কোনও কোনও পর্যায়ে রচনারীতিতে সংহতির চেয়ে কিছুটা শ্লথ-শিথিল অনায়াস ভ্রমণ কাম্য হতে পারে।

আধুনিকের রচনায় প্রাণ ও সংহতিসন্ধানে এলিয়ট বারবার মেটাফিজিক্যাল কবিগোষ্ঠীর (১৭ শ শতক) দৃষ্টান্ত এনেছেন। কবির মন যখন কবিতা নির্মাণের জন্য সম্পূর্ণভাবে তৈরী, তখন তা' নানা বিরুদ্ধ অভিজ্ঞতাকে একত্রিত এবং অন্বিত করে নেবার শক্তি অর্জন করেছে। ১৯১৭ সনে লেখা 'ঐতিহ্য ও ব্যক্তিপ্রতিভা' নিবন্ধে তিনি কবিমনকে অগনন অনুভব শব্দ ও বাকচিত্রের আধার বলে বর্ণন করেছেন। নতুন কোনও সংগঠিত রূপে এই আধার থেকে বেরিয়ে আসার আগে পর্যন্ত ওই মানস আধারের মধ্যেই সব উপকরণের অবস্থান। ১৯২১ লিখছেন আবার বিচিত্র, জটিল, ভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতা সমূহ কবির মনের মধ্যে সবসময়ই নতুন চেহারা নিচ্ছে। বিষয়টি বিশদ্ করার প্রয়োজনে তাঁকে লিখতে হয় সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি বা অনুভবগুলো খণ্ডিত বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকে বা আসা যাওয়া করে ; সে প্রেমে পড়ে আবার স্পিনোজাও পড়ে এবং তার এই দুই আপাতভিন্ন উপলব্ধির মধ্যে পারম্পরিক সংযোগ নেই। মনের গতিকে বিশ্বস্তভাবে ধরতে গিয়েই আধুনিকের শিল্পনির্মাণে ঘটে আপাতবিরুদ্ধের সন্নিবেশ যা অনেক সময়ই মনে হতে পারে উদ্ভট বা অপ্রাসঙ্গিক তাই দুরূহতাসঞ্চারী। শিল্পীর ব্যক্তিত্বের নিজস্ব সংহতিই সেক্ষেত্রে রচনার মধ্যে সঞ্চার করতে পারে এমন এক প্রাণিত সংহতি যা আপাত বিরুদ্ধ ও পারম্পর্যহীন উপকরণের মধ্যে নিয়ে আসবে অন্তর্লীন একাত্মতা। এলিজাবেথান নাট্যকবিদের কবিতায়, মেটাফিজিক্যাল কবিগোষ্ঠীর নতুন ছাঁদের রচনায় এলিয়ট পেয়েছেন বিরুদ্ধ উপকরণের এই শিল্পিত অভেদ ; শব্দ সেখানে অনুভববেদী অনুভব শব্দ পরিবাহিত।

কাব্যের যথার্থ অর্থ'বা তাকে সঠিকভাবে বোঝার দুরূহ প্রয়াস যে সৎ ও সার্থক কবিতার সঙ্গে পাঠকের মানস সংযোগের অন্তরায় হয় না এমন একটি অনুভাবনা বোধহয় এলিয়টের মনে সক্রিয় ছিল ; কারণ, তাঁর বিক্রান্ত

নিবন্ধ 'দান্তে'-তে এলিয়ট লেখেন যে ফরাসি কাব্য ভালভাবে তর্জমা করার মত জ্ঞানের অধিকারী হবার আগেই তিনি কোনও কোনও ফরাসী কবির রচনার বিশেষ ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন, আর দান্তের মত নিগূঢ় কবিদের ক্ষেত্রে রসাস্বাদন ও সঠিক অর্থ অনুধাবণের মধ্যকার ফারাক বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। মহৎ কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে অর্থবোধের ব্যাপারটি যে কতবড়, কত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হয় তার কথা উল্লেখ করতে গিয়েই এলিয়ট জুলে লাফর্গ, বোদল্যের কথা উত্থাপন করেছেন। লাফর্গ তাঁকে কথা বলতে শিখিয়েছেন, কথ্যভাষার কবিতাপ্রবণ সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন করেছেন; অন্যদিকে বোদল্যের স্বভাষার কোনও কবি তাঁকে যা দিতে পারেননি সেই আধুনিক নাগরিক জীবনের দুর্বহ বাস্তব এবং অলৌকিকের সঙ্গে তাঁর কবি আত্মার অন্বয়কে কিভাবে কবিতা-সম্ভব করে তুলতে হয়, তাই শিখিয়েছেন। এসব কবিরা ছিলেন তাঁর কাছে অনুকরণীয় অগ্রজের মত; তাঁর কাছে মহৎ পূর্বসূরীরা তখনও ঐশ্বরিক দূরত্বে রয়েছেন। মহাকবিদের রচনার গূঢ় অগোচর প্রভাবের (যে কোনও সচেতন কাব্যশিল্পীর রচনার ওপর) কথা বলতে গিয়ে এলিয়ট লেখেন, শেকসপীয়র, দান্তে, হোমর বা ভার্জিলের সৃষ্টিকর্মের রসাস্বাদনের কাজ সারাজীবনের, কারণ আত্মপরিণতির প্রত্যেক পর্যায়ে তাঁদের আরও ভাল করে নতুন করে আবিষ্কার করা যায়। আমাদের দেশে উত্তরবৈদিক কবিগোষ্ঠীর রবীন্দ্রঐতিহ্যের বিরুদ্ধে যূথবদ্ধ বিদ্রোহ এক-কালে আধুনিকতার দিকনির্দেশক মনে হয়েছিল; তখন রবীন্দ্রানুসারী হওয়ার চেয়ে 'রবীন্দ্রেতর' হওয়াও আমাদের আধুনিক অগ্রজদের কাছে শ্রেয় ছিল। জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে সকলেই কিন্তু পরিণতির পথে অগ্রসর হয়েই রবীন্দ্রঐতিহ্যের মহিমা ও সপ্রাণতার নবতর উপলব্ধিতে প্রত্যাবর্তিত হন।

আধুনিক কবিতার দুরূহতার একটি উৎস ইঙ্গিত ও উল্লেখ প্রচ্ছন্ন দূর প্রসৃতি। ফিলিপ ম্যাসিঞ্জার সম্পর্কে লিখতে গিয়ে এলিয়ট প্রায় মজা করেই বলেন, অপরিণত কবি অনুকরণ করেন, পরিণত কবি করেন অপহরণ; কিন্তু নিকৃষ্ট কবি যেখানে চৌর্যবস্তুকে কলঙ্কিত করেন উৎকৃষ্ট কবি সেখানে তাকেই উৎকৃষ্টতর চেহারায় বা অন্য আকারে হাজির করেন তাঁর কাব্যে। আর উৎকৃষ্ট কবির ঋণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কাল কিম্বা ভাষার বিচারে দূরবর্তী কোনও বিশাল বা বিচিত্র প্রতিভার কাছে। অন্যদিকে, কবিতায় প্রাণ যে চিত্রকল্প তা যে সবসময় অধীত বস্তু থেকে সংগৃহীত হবে তা নয়; প্রথম শৈশব থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত কবির সংবেদনশীল জীবন থেকেও তা জেগে উঠতে পারে। এলিয়টের মতে স্মৃতিবাহিত উপকরণগুলির প্রতীকীমূল্য থাকলেও তার যথার্থ চেহারাটা আমাদের বুদ্ধিগোচর হয় না কবিতায় চিত্রকল্পের এই রহস্যমণ্ডিত উৎসারণও দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি করতে পারে।

অধীত বিষয় এবং উপলব্ধির বস্তু-উপকরণগুলি থেকে কবির চেতনায় এমন একটা কিছু জন্ম নেয় যার জন্য তাকে একাংশমাত্র শব্দরূপে ধরা পড়ে তার অর্থ তখন এই বুঝতে হয় যে কবি চেতনার সীমান্তরেখায় বিচরণ করছেন যার বাইরে শব্দবন্ধও অকেজো, অর্থাভাস অনেকটাই সংকেত নির্ভর। একটি কবিতা ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তুলে ধরতে পারে যেগুলির কোনোটির হয়ত লেখক যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তেমন ছিল না। ধরাযাক লেখক হয়ত কোনো অদ্ভুত ব্যক্তি অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন যার সঙ্গে বাইরের কোনো কিছুরই তেমন যোগ নেই; পাঠকের কাছে তাই কিন্তু কোনো সাধারণীকৃত ভাবের বা তার নিজের ব্যক্তিক অভিজ্ঞতারই অভিব্যক্তি হয়ে দাঁড়াল। পাঠকের ব্যাখ্যা লেখকের অভিজ্ঞতা উপলব্ধির বাইরে হয়েও বেশি গ্রহণযোগ্য হতে পারে; লেখকের নিজস্ব সচেতনতার বাইরে কবিতার মধ্যে থাকতে পারে আরও অনেক কিছুরই ইঙ্গিত; দুরূহতার উৎস সেখানেই

যে সাধারণ ব্যাখ্যা বা দিতে পারে তার কম তো নয়ই অনেক বেশি কিছু নিহিত হয়ে আছে আধুনিকের যথার্থ শিল্পিত সৃষ্টিকর্মের মধ্যে।

এই প্রসঙ্গ থেকে এলিয়ট পাঠককে নিয়ে আসেন আর একটি বিভ্রান্তির নিরাকরণে—কবি বা শিল্পীর সম্পর্কে জ্ঞান বা তাঁর সাহায্য কবিতা বা শিল্পকর্ম বোঝার পক্ষে কতটা জরুরি। এলিয়ট মনে করেন, পাঠক নিজেই ঠিক করে নেবেন এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর বিশেষ বিশেষ উদাহরণ বা ক্ষেত্রের দিকে নজর রেখে কোনো প্রাক্‌নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত এ সব প্রসঙ্গে অংকমাত্র হাত পারেনা। কবিতার রসাস্বাদনে জটিল উপলব্ধি, তার সংযোগ বা পরিতৃপ্তির নানারূপ ও স্তর থেকে যায় যেখানে বিভিন্ন পাঠকের বিচিত্র চাহিদার ব্যক্তিরুচিগত নানাধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

শেষপর্যন্ত এলিয়ট যা বলতে চান তার অর্থ দাঁড়ায় বৃত্তান্তের কবিতার ক্ষেত্রে সবসময় হিসেবের বাইরে অনেককিছু থাকে যা লেখকের সম্পর্কে আমাদের সব জ্ঞান, কবিতাটির সৃষ্টিক্রিয়ার আগে পরের সবকিছুর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞাতব্য যা কিছু তা দিয়ে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না। কবিতাসৃষ্টি হয়ে যাবার পরে যা পাঠকের হাতে আসে তা' আগে যা কিছু ঘটেছে তার থেকে সম্পূর্ণ নতুন জিনিস। একালের সমালোচনার রীতিপদ্ধতি তাই কোনো কবিতার উৎসমুখের নিরীক্ষায় আগ্রহী নয় যদিও সে ধরনের কাজ বহু বোদ্ধা পাঠকের পছন্দসই একটা উদ্যম; তাঁরা যার জন্য তাঁকে সঠিক শব্দ খুঁজতে হয়; মজার ব্যাপার এই যে যতক্ষণ না সে সব শব্দ পাওয়া গেল কবি নিজেও জানেন না কোন কোন শব্দ বা কিরকম বাণীরূপের প্রতীক্ষায় ছিল অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ কবি তাঁর ভাবনার জ্রণকে নিজেও সনাক্ত করতে পারবেন না যতক্ষণ যথার্থ বিন্যাসে যথার্থ শব্দগুলি সেই ভাবনাকে চিহ্নিত করছে। কবিতা যেখানে নীতিপ্রবণ, কাহিনী কেন্দ্রিক বা প্রচার মুখী নয়, যেখানে তা কেবল কবির নিজের চেতনার অন্তঃশীল প্রার্থনার ভেতর থেকে জন্ম নিচ্ছে সেখানে কবিতাসৃষ্টি করে কবি একধরণের অনবোত্তর তৃপ্তি পান, ভারমুক্ত হন, কিম্বা বলা যেতে পারে যে দানবের হাতে তিনি অসহায় শিকার তাকে বশ করবার মত শব্দ বা মন্ত্রের উচ্চারণই কবিতা। কিন্তু শ্রেষ্ঠ শব্দাবলীর শ্রেষ্ঠ সন্নিবেশে তুষ্ট কবিআত্মা, এলিয়টের মতে, একধরণের অবসাদ বা নির্বাণে অভিভূত হয়ে পড়েন, তার সৃষ্ট কবিতার সম্বন্ধে আর কোনও বিশেষ কৌতূহল বা আগ্রহ তাঁর থাকে না। স্রষ্টার এই অনবোত্তর নিরাসক্তি কবিতার প্রকৃত তাৎপর্যকে আবৃত করে রাখে রহস্যে এবং যেক্ষেত্রে কবির কৌতূহল পরিপার্শ্বের তাগিদে জেগে ওঠে সেখানেও সৃষ্টির আগের মুহূর্তের উপলব্ধি বা অনুভূতিকে স্পর্শ করা তাঁর পক্ষে দুরূহ। কারণ, আগেই যেমন বলা হয়েছে, বাণীরূপে বাঁধা না পড়া পর্যন্ত কবির চেতনার যে আলোড়ন সৃষ্টিশীল হয়ে উঠতে চায়, তা উপলব্ধ কোনও স্পষ্ট আবেগ বা অভিজ্ঞতার ছকে সনাক্ত করা যায় না। এবং নির্মাণের পরে কবির হাতে থাকে অবসাদ বা পরিতৃপ্তির বোধ, আত্ম-অবলোপের অস্পষ্ট স্মৃতিরেখা।

প্রায়, এরকম একটি অবস্থান থেকেই 'কবিতার সুর' (১৯৪২) নিবন্ধটিতে এলিয়ট লেখেন, কবির সচেতন অভীপ্সা, কবিতার অভিধা অনেক বড় ব্যাপার যা তার উৎসের থেকে ঢের দূরস্থ। কবিতা যখন আমাদের নাড়া দেয় তখন আমাদের সে নিশ্চয়ই কিছু বলে; আর যখন নাড়া দেয় না তখন কবিতা হিসেবে তা আমাদের কাছে অর্থহীন। যে ভাষার একটি শব্দও বুঝি না, সেই ভাষায় লেখা কবিতার আবৃত্তি শুনেও অভিভূত হতে পারি তখন যদি জানানো হয় যে আবৃত্ত কবিতাটি অর্থহীন শব্দোচ্ছ্বাস, আমরা নিজেদের প্রতারিত বলে মনে করি,

ভাবি কবিতাটি যন্ত্রধ্বনির অনুকৃতিমাত্র। যদি কবিতাটির সম্পর্কে আমাদের সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে বুঝি যে তার অর্থবিস্তারে চান কবিতার অর্থ কবিতার বাইরে অন্যকিছুর সাহায্যে পরিষ্কারভাবে সনাক্ত করে নিতে। কবি এলিয়ট অকুণ্ঠভাবেই স্বীকার করেন, পাঠকবর্গের যে অসংখ্য চিঠি তাঁর কাছে কবিতাবিশেষের ব্যাখ্যা দাবী করে তা তিনি স্বভাবতই দিতে অক্ষম। ব্যাখ্যার ব্যাপারে যে ধরণের বিভ্রান্তি, সংশয় বা পরস্পর বিরুদ্ধতা নির্দেশের অভাবে দেখা দিতে পারে, সে সম্পর্কে সচেতন থেকেই এলিয়ট বলেন—কাব্য ব্যাখ্যার নানা উদ্যম অনেক সময় স্বয়ং স্রষ্টাকেও চমৎকৃত করে দিতে পারে, যেমনটি তাঁর নিজের বেলায় হয়েছিল কোনো রচনায় এরকম মন্তব্য দেখে যে 'প্রুফ্রক' কবিতাটির প্রথমাংশে বর্ণিত বাইরের কুয়াশা শেষ পর্যন্ত ড্রইংরুমেও ঢুকে পড়ে। এ জাতীয় ব্যাখ্যা কবিতার উৎস নিরুক্তি চাইছেনা, স্রষ্টার একান্তিক জীবনকে উন্মোচিত করতে চাইছেনা, চাইছে কবিতাটির তাৎপর্য প্রস্তুতি ধরতে। অনেক সময় এরকম ক্ষেত্রেও স্রষ্টাও সমালোচকের কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করেন। মুস্কিলটা হয় তখনই যখন আমরা পাঠক হিসেবে ধরে নিতে চাই একটি কবিতার সামগ্রিকভাবে একটিই ব্যাখ্যা থাকবে, সেটা হবে যথার্থ ও অনুমোদন ধন্য। কিন্তু, কোনো ভালো কবিতাই একটি বা যে কোনো একটি ব্যাখ্যার দ্বারা নিঃশেষিত হতে পারে না; সংবেদনশীলের জন্য তা বহন করে বিচিত্র তাৎপর্যের দ্যুতি। যে কোনো যুগের বড় বড় সৃষ্টিগুলির সম্পর্কে যেমন তেমনই আধুনিক কালের সাহিত্যের মানব চেতনা নানা প্রত্যন্তস্পর্শী শ্রেষ্ঠ ফসলগুলির সম্পর্কেও তেমনই এলিয়টের এ বক্তব্য প্রণিধান ও সমর্থন যোগ্য। মোট কথা দাঁড়ায়, পূর্বরীতি ও পাঠকমানসের সংস্কার আধুনিকের শিল্পকর্মের আন্তরিক জটিলতার পাশাপাশি প্রায় সমান ভাবেই দুরূহতার অভিযোগে মদত যোগায়। অথচ সহৃদয় হৃদয় সংবেদের পুরোনো নির্দেশ এহেন মানসিকতা কাটিয়ে নিতে অনেকটাই সাহায্য করতে পারে।

গৌর বৈরাগীর মুখোশের মুখ

তপু বলল—বাব, ঐ দেখ !

তপু যেদিকে আঙুল আর মুখ সেদিকে তাকাল তপুর বাবা। বলল—কি ?

—বাঃ তুমি দেখলে না। তপুর গলায় রাগ। এইমাত্তর সামনে ছিল। এখন আর দেখতে পাচ্ছি না বাবা।

তপুর বাবা হাসতে হাসতে বলল—চল ওদিকে। ছোট্ট সার্কাসটা দেখেই এবার বাড়ি যাব।।

—না আমি দেখব না।

—বারে এতক্ষণ ত' সার্কাস দেখার জন্তেই বায়না করছিলি। দেখবি না সার্কাস ?

—না। তপু গম্ভীর গলায় বলল। এখন ত' আর দেখতে পাচ্ছি না। কোথায় গেল।

তপুর বাবা ওর কথার কোন জবাবই দিল না। ও ছেলেটা ঐ রকমই। এক কথা থেকে আর এক কথায় চলে যায়। এক জিনিস থেকে আর এক জিনিসে। প্রথমে ঠিক ছিল মেলায় এসে সার্কাস দেখবে। কিন্তু মেলায় ঢুকতে ঢুকতেই ওর খেয়াল হল্ ওকে ডিম ভাজা খেতে হবে। এত ভিড় নোংরা ধুলো। যে লোকটা ওমলেট ভাজছে তার সসপ্যানের ওপর থিকথিকে ধুলো। জেনেশুনে কি তপুকে এসব দেওয়া যায়। ডিম ভাজাকে চাপা দেওয়ার জন্তে একটা ছোট্ট ক্রিকেট ব্যাট কিনে দিতে হল ওকে। তারপর একটা সাদা বল ! তপুর বাবা ব্যাটটা ওর হাতে দিয়ে বলটা নিজের কাছে রাখল। তপু বলল—না বলটাও তার চাই।

—এটা আমার কাছে থাক। তুমি এটা হারিয়ে ফেলবে।

—না হারাব না। জিদ ধরল তপু।

শেষমেষ বলটা নিয়ে ও ছাড়ল। ইতিমধ্যে মেলায় আরও লোক বেড়েছে। বেলা শেষের আলোটুকু শীত তাড়াতাড়ি শুষে নিচ্ছে। এত লোক সত্ত্বেও বেশ শীত শীত করছে। এখানে রাত করার কোন মানে হয় না। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চেয়ে তপুর বাবা একজনকে জিজ্ঞেস করল আচ্ছা সার্কাসটা কোন দিকে বসেছে।

বেশ বড় মেলা। ছোটবেলায় এখানে কত আসত তপুর বাবা। এখন আর আসা হয় না। এখন মেলা মানেই ত' ভীড়, নোংরা, আজে বাজে খাবার। ছিনতাই এইসব। সেই ছোট মেলাটা এখন গায়ে গতরে কতটা বেড়ে গেছে।

লোকটা হাত বাড়িয়ে বলল—ঐ যে, ঐ দিকে।

ঠিক সেই সময় তপু বলল—বাবা আমি নাগড়দোলা চাপব।

—ভয় পাবি না।

তপু ঘাড় নেড়ে বলল—একটুও না।

নাগরদোলা থেকে হাসতে হাসতে নেমে এল তপু। সারা মুখখানিতে শুধু সাহস। তপু হাসতে হাসতে বলল—আমার একটুও ভয় করেনি বাবা।

—ভেরি গুড। ওর বাবা ওর কাঁধে একটা ছোট্ট চাপড় মেরে বলল! এতে ভয়ের কি আছে রে। এরপরই তপুর হাতের দিকে তাকিয়ে ওর বাবা অবাক হয়ে বলল—তোর বল।

তপু শূন্য হাতটা চোখের সামনে মেলে ধরল। নাগরদোলায় ওঠার সময় ওর বাবা বলটা নিতে চেয়েছিল। ও সেবারও দেয় নি। বলেছিল—হারাবে না। হাতের মধ্যে এটা ধরে বসে থাকব বাবা।

বাবার কথায় খেয়াল হতেই তপু দৌড়ে নাগরদোলার ভিড়ের মধ্যে ছুটতে যাচ্ছিল। ওর বাবা খপ্ করে ওর হাতটা ধরে ফেলল। বলল ওটা কি আর ওখানে আছে নাকি।

এর পরেই তপু তাকে দেখতে পেল। ভিড় চিরে বাবাকে টানতে টানতে এগিয়ে যেতে লাগল ও। তপুর বাবা বলল—ওদিকে সার্কাস ত' নেই। সার্কাস এদিকে।

—বারে আমি সার্কাসে যাচ্ছি নাকি। ভিড়ের মধ্যে তপুর বাকি কথাগুলো শোনা গেল না। এতক্ষণ তপুর বাবার হাতের মধ্যে তপুর হাতটা ধরা ছিল। এখন তপুর হাতের মধ্যে ওর বাবার হাত। এতক্ষণ ওর বাবাই তাকে নিয়ে যাচ্ছিল এখন তপু।

ও এবার একটু ফাঁকা মত জায়গায় এসেই থেমে গেল। বলল—যাঃ এদিকেই এল মনে হল। অথচ—

তপুর বাবা মুখে মজা নিয়ে বলল—কি হল তপু বাবুর হঠাৎ।

—ও তুমি বুঝবে না। তপু গম্ভীর হয়ে বলল।

এতেও বেশ মজা পেল তপুর বাবা। ছেলের কাছে ছেলে হয়ে যেতে সব বাবাদের যে কি ভাল লাগে।

—আমি কিন্তু তাকে ঠিক চিনতে পেরেছি। একেবারে ঠিক সেইরকম। তপু গম্ভীর হয়ে বলল। এইমাত্তর এখানে ছিল, জান বাবা।

—কে, তোমার স্কুলের কোন বন্ধু বুঝি?

—স্কুলের নয়। বাবার কাছে পুরোটা না ভেঙে বেশ মজা পেল তপু। কিন্তু সে আমার খুব বন্ধু।

—বেশ। তপুর বাবা এবার ওর হাতটা ধরল! এত ভিড়ে কি তাকে খুঁজে পাওয়া যায়। চলো তপু এবার আমরা সার্কাসটা দেখে বাড়ি যাই।

তপু লক্ষ্মী লক্ষ্মী গলায় বলল—বাবা এধারটা শুধু আর একবার দেখে নোব। তুমি একটু দাঁড়াও।

কিন্তু তপুর বাবা দাঁড়াল না। তপুর সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল। তপুর বাবা জানে এখানে তপুর পক্ষে ওর বন্ধু না কে তাকে খুঁজে পাওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। তপুর বাবা ইচ্ছে করলেই ওকে এখান থেকে জোর করে সার্কাসের দিকে নিয়ে যেতে পারত। বাইরে এসে যন্তসব আজে বাজে বায়না। একথা বলে ওকে নড়া ধরে ভিড়ের বাইরে নিয়ে আসতে পারত। কিন্তু তাতে কোমল মনের ওপর চাপ পড়ার আশঙ্কা আছে। কৌতূহলকে থামিয়ে দেওয়াটা নাকি স্বাস্থ্যকর নয়। আজকের তপুদের বাবারা সেটা জানে। তাই কৌতূহল বাড়তে বাড়তে ভিড়ের মধ্যে হেঁটে বেড়াতে লাগল।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে একটা হৈ হৈ শব্দ উঠল। ঠিক তপুদের সামনেই ব্যাপারটা ঘটল। যুবতীটি ঘুরে দাঁড়িয়ে মোটা মত ভাল চেহারার লোকটাকে বলল—ছিঃ অসভ্যতা করছেন কেন। বাড়িতে মা বোন নেই।

ঐ লোকটা দাঁত বার করল—এত যদি শুচিবাই ভিড়ের মধ্যে না এলেই হয়। ভিড়ের ভেতর অমন হয়ই।

—এটাকে অমন বলছেন। মেয়েটার ফরসা মুখখানা রাগে লাল। থর থর করে কাঁপছে মেয়েটা। বুকের ওপর হাতদুটো আড়াআড়ি। ছোটলোক কোথাকার।

—চোপ্। চিৎকার করে উঠল লোকটা। ন্যাকামী করবেন না। যেন সব সতী। মেয়েটা কাঁপতে কাঁপতে এবার একটা হাত তুলল।

খপ্ করে সে হাতটা ধরে ফেলল লোকটা। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল—হাতটা মুচড়ে ভেঙে দোব।

চারদিকে হো হো হি হি হাসি। টুকটাক মন্তব্য। তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল তপুর বাবা। তার খুব রাগ হচ্ছিল ঐ লোকটার ওপর। লোকটা নিশ্চয়ই মেয়েটার শরীরে হাত দিয়েছে। অথচ তার পরেও কি গলা লোকটার। কিন্তু লোকটাকে কেউ কিছু বলল না। বরং বেশ মজা উপভোগ করল সবাই। তপুর বাবার আর একটু থাকার ইচ্ছে ছিল ওখানে। কিন্তু তপু, ওর জন্যেই চলে আসতে হল। আসতে আসতে বলল—চল, এবার সার্কাসটা দেখেই—

—না। তপু দাঁড়িয়ে পড়ল। এখন যে ওকে খুব দরকার বাবা। খুব দরকার।

—কে? হাসল তপুর বাবা। সেই বন্ধু বুঝি?

ঘাড় নাড়তে নাড়তে তপু বাবার হাত ধরে টানল। খুব তাড়াতাড়ি তাকে খুঁজে পেতে হবে। একটানে আর একটা স্রোতে মিশে গেল তপু।

—আমি তাকে স্পষ্ট দেখেছি, জান বাবা।

—সে'ত নাও হতে পারে। ভিড়ের মধ্যে কাকে দেখতে কাকে।

—বারে। তপু বাবার বোকামিতে হাসল। আমি তাকে চিনতে পারব না। তার হাঁটা দেখে বলে দোব। শুধু হাঁটা নয়, সে যদি এক জায়গায় দাঁড়িয়েও থাকে তাহলেও। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাও যে একেবারে আলাদা।

—কিন্তু সে যদি চলে গিয়ে থাকে।

—বারে এত তাড়াতাড়ি সে যাবে কোথায়। সে নিশ্চয়ই আছে। ঐ ভিড়ের মধ্যেই আছে। বলতে বলতে ভিড়ের মধ্যে থমকে দাঁড়াল তপু। উল্টো দিক থেকে আর একটা স্রোত এসে থমকে দাঁড়াল।

এখন শীত বিকেলের সব আলোটা শুষে নিয়েছে। অথচ এত ভিড় যে একটুও শীত করছে না। চারদিকে আলো জলে উঠেছে। বাতাসে মেলার গন্ধ ভাসছে ম'ম'। চারদিকে কি শব্দ। একটা শব্দকে আলাদা ভাবে চেনা যাচ্ছে না। সব শব্দ গায়ে গায়ে লেগে এক তালগোল পাকানো শব্দের জটলা। সেই শব্দের মধ্যে একটা কচি কণ্ঠের চিৎকার। ভিড়। লোকজন। উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। এইসব ভেদ করে তপুর বাবার চোখ গেল সেদিকে। মায়ের কোলে সেই ফুটফুটে মেয়েটা। চার পাঁচ বছরের রেশম রেশম চুল। কচি কচি কোমল হাত পা। টোপর টোপর দুটো চোখ। সেই চোখে অঝোরে কান্না। সারা মুখখানাতে কষ্ট।

তপুর বাবা বলল—কি হয়েছে এর।

সেই ডাগর ডাগর চোখওলা মেয়েটার মা এবার তার হাতটা সরিয়ে নিল। এতক্ষণ হাতটা সেই মেয়েটার কানে চাপা দেওয়া ছিল। চমকে উঠল তপুর বাবা।

—ইশ্ সারা কান রক্তে লাল। কানের লতিটা আধখানা ছিঁড়ে ঝুলছে। সেখান দিয়ে টুপটাপ করে রক্ত ঝরছে এখনও।

—কি করে হল এমন। কে যেন বলল।

—কি করে আবার। পাশ থেকে কে বলল একজন। পেছন দিক থেকে ওর কানের দুলটা ছিঁড়ে নিয়েছে কেউ।

তপুর বাবা ভিড় ঠেলে বাইরে এল এবার। বলল—আর সার্কাসে কাজ নেই। এবার বাড়ি চলো তপু।

—বাঃ এখন বাড়ি যাব কি। ওর মুখে একটুও হাসি নেই। গম্ভীর গম্ভীর মুখে বলল—এখনই যে তাকে দরকার বাবা।

—কিন্তু সে ত' নেই। বিরক্ত হল তপুর বাবা।

—আছে। নিশ্চয়ই আছে। তাকে পেলেই দেখো আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। এই বলে আর একটা ভিড়ে ঢুকল তপু। আর তারপরেই বলল—বাবা ঐ দেখ।

—কোথায় আমি ত' কিছু—

—বারে, তুমি না কি। এবার মুখটা হাসি হাসি তপুর। ওকে ত' দেখলেই চেনা যায়। ঐ যে ভিড়ের মধ্যে। সব চাইতে লম্বা।

—ঐ যে যার পোষাকটা কি রকম যেন। চোখে চশমা—

এবার হি হি করে হেসে ফেলল তপু। লোকটা যেন চেনা চেনা কোথায় ওকে দেখেছে তপুর বাবা। অথচ মনে করতে পারছে না। ঐ লোকটাই কি তপুর বন্ধু। কিন্তু ঐ অতবড় লোকটা। অত সুন্দর স্বাস্থ্য। এবারে তপুকে মৃদু আকর্ষণ করল ওর বাবা।

—বারে, ওকে দেখেই চলে যাব।

—আর দরকার নেই তপু। এবার চলো। দেখছো না ভিড়ের মধ্যে কত গোলমাল হচ্ছে।

—এবার আর হবে না। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথাটা বলল তপু। এবার সব গোলমাল ঠিক হয়ে যাবে। ও থাকলে এর'চে কত বড় বড় গোলমাল ঠিক হয়ে যায়। এটা ত' চুনো পুঁটি। বলে খিল খিল করে হাসল তপু। তারপর বাবাকে টানতে টানতে ঐ দিকে নিয়ে যেতে লাগল—ও নিশ্চয়ই এ সব গণ্ডগোলের খবর পায় নি। খবর পেলে ঐ মোটামত যাচ্ছেতাই লোকটাকে এক ঘুঁষিতে ঠাণ্ডা করে দিত।

তপুর বাবা ভেবেছিল ঐ মেয়েট আর লোকটার মধ্যে যা হল সেটা বুঝতে পারেনি তপু। সে যা'তে বুঝতে না পারে তাই তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে এসেছিল অথচ—

—ঐ যে বাবা, আমাদের ঠিক সামনে। এবার চিনতে পেরেছ ত'।

লোকটাকে সত্যি চেনা চেনা লাগল তপুর বাবার। একেবারে টান টান হয়ে দাঁড়ানো। শরীরে একটুও মেদ নেই। মুখটা কি গম্ভীর আর দুর্ধর্ষ। অথচ মনে হয় শিশুদের জন্যে ঐ মুখেই ভরাট প্রশ্রয় খেলা করছে।

—কে রে তপু।

—বারে, তুমি কি বোকা। তপু হেসে বলল—ঐ ত' ওয়াকার কাকা।

—ওয়াকার কাকা!

—হ্যাঁ, রাজা ত' অরণ্যদেবকে ওয়াকার কাকাই বলে।

—তাইত, এবার খেয়াল হল তপুর বাবার। তাই চেনা চেনা মনে হচ্ছিল তার। এখন ত' তার আর অরণ্যদেবের সঙ্গে দেখা হয় না। তপুদের হয়। এখন নাকি ঘরে ঘুরে অরণ্যদেব। তপুদের খেলায়। তপুদের পড়ায়। তপুদের স্বপ্নে।

—ওয়াকার কাকা। বলে ছুটে গিয়ে তপু অরণ্যদেবের একটা হাত আঁকড়ে ধরল। —আর কোন ভয় নেই জান বাবা। বলে হাসি মুখে বাবার দিকে তাকাল তপু। তারপর ঘাড় উঁচু করে অরণ্যদেবের মুখে।

ঠিক সেইরকম আগের মত মুখ। পাথরের মত শক্ত পেশব। গ্রানাইটের মত লাবণ্য। দু' চোখে কি গম্ভীর। দু' চোখে কি প্রশ্রয়। চোয়াল দুটো কি অসম্ভব শান্ত আর দৃঢ়।

—ওয়াকার কাকা তুমি এখানে! বিস্ময় এখন তপুর চোখে। অথচ ওদিকে—

অরণ্যদেব কি একটু মাথা নোয়ালো? কান পেতে কিছু শুনল? হাত বাড়িয়ে তপুর হাতটা…?

—ওদিকে ঐ বদমাইশ লোকটা নোটন দি'কে না—

অরণ্যদেব একটু নড়ল না? চোখের পাতা পড়ল কি? চোয়ালদুটো ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠছে কি? দৃঢ়?

—টুনির কান থেকে সোনার রিং ছিঁড়ে নিয়েছে, জানো ওয়াকার কাকা। পাশ থেকে অন্য এক তপু বলে উঠল।

—টুনির কান রক্তে লাল। ডান দিক থেকে আর একজন।

কি আশ্চর্য, এত তপু কোথায় ছিল। সবাই মিলে ওয়াকার কাকার চারদিকে। চারদিক থেকে ভেসে এল—'ওয়াকার কাকা, ওয়াকার কাকা।'

এবার কি মাথাটা নোয়ালো অরণ্যদেব? মন দিয়ে শুনছে বোধহয়। এবার সত্যি সত্যি রাগ আসছে শরীরে। চোখের কোলে আগুন। এক্ষুনি পা বাড়াবে অকুস্থলে। কিন্তু ঠিক আগের মত—

—ওয়াকার কাকা, ওয়াকার কাকা! চারদিক থেকে টুকরো টুকরো বিস্ময়।

—ওয়াকার কাকা তুমি থাকতে, ঐ বদমাইশ লোকটা……তুমি থাকতে টুনির….. তুমি থাকতে……

আশ্চর্য এর পরেও অরণ্যদেব দাঁড়িয়ে। যাবার কোন তাড়াই নেই। চুপচাপ ঠিক আগের এক জায়গায়। অথচ—

দারুণ হতাশ হয়ে শেষে একজন তপু অরণ্যদেবের হাতটা ধরে মৃদু আকর্ষণ করল। আর তারপরেই সবাই অবাক। এ কি করে সম্ভব! অরণ্যদেবের গ্রানাইট পাথরের হাতটা খুলে এল তপুর হাতে। তাতে করোটি চিহ্ন সমেত সেই আঙুলগুলো। দেখাদেখি আর একজন বাঁ হাতটা টেনে খুলে ফেলল। তার দেখাদেখি অন্য এক তপু লাফিয়ে উঠে একটানে খুলে ফেলল মুখ থেকে সেই আশ্চর্য মুখোশটা। অবাক হওয়ার বদলে হি হি করে হেসে উঠল তপুরা। কেউ কেউ হাততালি দিয়ে উঠল। ততক্ষণে সেই ঢ্যাঙা লম্বা লোকটা মুখোশ থেকে বেরিয়ে এসেছে। সরু লিকলিকে শিরাওঠা হাত। ভাঙা চোয়াল। কোটরে ঢোকা চোখ। সেই চোখের কোলে টলটল করছে দু ফোঁটা। গলায় অনুনয় ঢেলে সে বলল—ওগুলো নিয়ো না। সত্যি বলছি আমার আর কিছু নেই। ওগুলোই আমার শেষ সম্বল।

নব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেউ আসে নি

"আচ্ছা, কণাদ নামটা সম্পর্কে তোর আইডিয়া কী?"

"—ফাইন। বেশ আধুনিক, অথচ আসলে পৌরাণিক।"

"—বাহ্ তোর আর আমার বউয়ের আইডিয়া একই।"

"—মানে?"

"—মানে আমার বউও মনে করে কণাদ নামটা বেশ আধুনিক, অথচ ওটা আসলে পৌরাণিক।"

"—তো, কী হল?"

"—হল আমার মাথা আর তোর মুণ্ডু" অভিজিৎ গম্ভীর হল এবার, "আসলে বুলা কণাদ নামে এক ছোকরার প্রেমে পড়েছে। শী ইজ ইন ডীপ লভ্।"

শুভ অবাক হ'ল একটু। যেভাবে বলছে অভিজিৎ বিশ্বাস করতে মন চায় না। বছর পাঁচেক হল অভিজিৎ বিয়ে করেছে বুলাকে। রীতিমতো বাড়ির থেকে দেখে টেখে বিয়ে, প্রচুর খাওয়া দাওয়া করিয়েছে বন্ধুদের সকলকে। মাত্র গত বছরই একটি মেয়ে হয়েছে ওদের। পিংকি। এর মধ্যে অন্য আর একজন লোক আসচে কোথা থেকে! শুভ ভেবে পায় না কিছু।

ওদের বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে চটকদার দেখতে অভিজিৎকে। নামী কোম্পানীর ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ার, বাবাও ঐ কোম্পানীর সিনিয়র এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হিসেবে এখন অবসরে, নিজেদের বাড়ি এই ছোট্ট শহরটাতে, অন্ততঃ কোন চিন্তা-ভাবনার অবকাশ নেই—এর মধ্যে কে একজন কণাদ নামের লোক কিংবা ছেলে এসে গেছে ওদের দুজনার মধ্যে। ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হয় শুভর কাছে। চায়ের কাপ সরিয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে শুভ। চোখে মুখে পরিষ্কার উত্তেজনা। ওপাশ থেকে অভিজিৎ ঝুঁকে আসে। এতক্ষণ যে গন্ধটা একটু একটু পাচ্ছিল শুভ, সেটা এবার তীব্রভাবে নাকে আসে। অভিজিৎ ড্রিংক করে এসেছে।

শুভ উঠে বাড়ির ভিতর দিককার পর্দা টেনে দিয়ে ফিরে এল। বসতে বসতে বলল, "অফিস থেকে কোথায় গিয়েছিলি?"

অভিজিৎ উত্তর দিল না। হাসল শুধু।

শুভ জিগ্যেস করল, "কী হল, বললি নাতো!"

রুমাল দিয়ে জোরে জোরে মুখ মুছল অভিজিৎ তারপর অল্প হাসল, "জানিস-ই তো!"

শুভ চুপ করে রইল। ব্যাপারটা ওদের বন্ধুমহলে প্রায় সবাই জানে। অফিস থেকে ফেরার পথে "সঙ্গম" এর বিখ্যাত কিংবা কুখ্যাত পানশালায় একবার ঢুঁ মেরে আসবেই অভিজিৎ। আজও কোন ব্যতিক্রম হয় নি।

অভিজিৎ'এর গলা ক্রমশ নিচু খাদে নেমে আসে, "তোর কাছে একটা উপকার চাইতে এসেছি।"

অবাক হল শুভ। কী বলতে চাইছে অভিজিৎ, ধরতে পারল না। মাতালের মাতলামি বলে ভাবতেও মন চাইছে না। অভিজিৎ'এর গলায় এমন কান্না জুড়ে আছে কেন? চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে জিগ্যেস করল, "উপকার আবার কী?"

"—তুই কর্ণাদকে সরিয়ে দে।"

কথাটা শুনে চমকে উঠল শুভ। তবু আর একবার না বোঝার ভান করে হাসল, "কী করে সরাব, উড়ো চিঠি লিখব?"

আরো ঝুঁকে, প্রায় টেবিলের সঙ্গে মাথা মিশিয়ে দিল অভিজিৎ, "নাহ ওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দে!"

"—তোর সত্যিই নেশা হয়ে গেছে অভি!"

এবার উঠে শুভর হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিল অভিজিৎ, "শুভ তোকে কী করে বোঝাব বল—আমার একটুও নেশা হয় নি আজ। তুই তো শালা বিয়ে-থা করিস নি; কী করে বুঝবি নিজের বউ অন্যর সঙ্গে প্রেম করলে কেমন লাগে?"

হায়রে ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ার! এখন ওকে দেখে কে বলবে এর দাপটে একটা গোটা ফ্যাক্টরি কাঁপে! শুভ হাসবার চেষ্টা করে, "আমিই যে উপযুক্ত লোক, কে বলল তোকে?"

"—বলার দরকার হয় না রে, বলার দরকার হয় না।" বলতে বলতে চেয়ারে বসল অভিজিৎ, "তোকে তো সেই স্কুল লাইফ থেকে চিনি। তোর মধ্যে একটা স্পিরিট আছে, বিপদ এলে অন্তত পালিয়ে যাস না অন্য বন্ধুদের মতো। অবশ্য ওদের আমি কাওয়ার্ড বলছি না, কিন্তু তোর ব্যাপারটা আলাদা।"

চেয়ারে শরীর এলিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল শুভ। কোন্ ঘটনাটা মাথায় রেখেছে অভিজিৎ বুঝতে পারল।

কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়বার সময় ইন্টার কলেজ নক্-আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চলছে। কলকাতার দিককার কোন কলেজের সঙ্গেই হবে সম্ভবত, এতদিন বাদে সঠিক মনে পড়ে না শুভর। মাঠে আগুন ঝরাচ্ছে ও-পক্ষের দুরন্ত পেস বোলারটি। যখন তখন বল তুলছে পিচ থেকে। বোর্ডের দিকে তাকাতে পারছে না কেউ। কুড়ি পার হবার আগেই তিনজন ইনজিওর্ড। নামবার সময় নেহাতই বাচ্চা শুভ'র কানের কাছে হাতে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা থার্ড ইয়ারের অভীকদা ফিসফিস করল, "দেখে খেলো ভাই মার খেও না যেন।"

শুভ'র সামনে তখন সবুজ চাদরের ওপর সাদা সাদা কতগুলো বিন্দু। কানে বাজছে নেটে টেকো ব্যাঙা-দা'র ব্যাটিং'এর টোটকা, "বোলারকে পেয়ে বসতে দিবি না। বো ডর গিয়া উও মর্ গিয়া।" কথাগুলো আসলে একটু উলট পালট করা ছিল কিংবা এগুলোই আসল। ভাববার অবকাশ ছিল না।

আশপাশের ছুঁকছুঁকে হাতগুলোকে এড়িয়ে প্রথম বল চোখ বুজে ফরোয়ার্ড খেলতে গেল। সারা মাঠে আর্তনাদ। শুভ দেখল বল উইকেটকিপারের হাতে। দ্বিতীয় বল দেবার জন্যে নিজের জায়গায় ফিরে চলল বোলার। শুভ ব্যাট হাতে ঝুঁকল। গুডলেংথ স্পট থেকে বিদ্যুতের মতো হঠাৎ উঠে এল লাল আপেলটা।

মাথা নিচু করে'ছিল, কিন্তু সেকেণ্ড'এর কত ভগ্নাংশ দেরিতে আজ আর মনে পড়ে না। সারাজীবনের মতো বাঁ চোয়ালে দাগ রয়ে গেল। কিছুক্ষণ সবকিছু ঝাপসা দেখেছিল শুভ। মাঠ, লোকজন, প্লেয়াররা—সব আবছা হয়ে গিয়েছিল। মা, বাবা আর মোহিনী'র মুখ ভেসে উঠেছিল চোখের ওপরে।

তারপর সকলের নিষেধ না শুনে আবার খেলতে শুরু করেছিল। সে খেলা কলেজে ইতিহাস। শুভ ভেবে পায় না সেদিন কি কোন কিছু ভর করেছিল ওর মধ্যে! কে জানে! নিশুত রাতে আদিগন্ত আকাশের দিকে একা একা চেয়ে থাকলে ভেতর থেকে যে ওকে ডাকে, সেদিন মাঠেও নিশ্চয়ই সে ডেকেছিল। ভাবতেও শরীরে কাঁটা ওঠে। নাহলে, ঐ ইনজুরি নিয়েও খেলল কী করে। ঐ প্রচণ্ড পেসের বিরুদ্ধে কাট, গ্লান্স, হুক আর ড্রাইভের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। খেলার শেষে মাটিতে পা পড়েনি সেদিন।

"—তুই এখনো মেনে রেখেছিস খেলাটা!"

"—মনে রাখব না! বলিস কী রে, কী ব্যাটিং-টা করেছিলি সেদিন! এত মিঠে হাত ছিল তোর, কত বড়ো প্লেয়ার হতিস!" অভিজিৎ'এর গলায় আক্ষেপ ঝরে পড়ে। একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে "কত কিছুই তো হওয়ার ছিল, বল! এখন আবার কণাদ না কে, তাকে খুন করতে বলছিস!"

শেষের কথাটায় হেসে ওঠে অভিজিৎ। জোরে, বেশ জোরে। তারপর উঠে দাঁড়ায়, "কিছু মনে করিস না শুভ। আমার এখন মাথার ঠিক নেই।"

"—শোন্ বললিই যখন, একবার চেষ্টা করে দেখি!"

'উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অভিজিৎ'এর মুখ, "তুই কণাদকে মারবি!"

"ধুস্ তাই হয় নাকি! স্কুল মাষ্টার মানুষ খুন করতে পারে শুনে'ছিস কখনো!"

"তাহলে?"

"অন্তত ওর টাইটেল কাইটেলগুলো বল্। কী করে ছোকরা?"

অভিজিৎ পুরো ঘুরে এল শুভ'র মুখোমুখি "কিস্যু করে না। অ্যাবসলিউটলি নাথিং। আমি ভেবে পাচ্ছি না এমন একটা বাগারকে বুলা মন দিল কী করে?"

"—মেয়েদের মন ভাই, বোঝবার চেষ্টা করিস না। কণাদ না কী, ওর টাইটেলটা বলতো!" শুভ টুকরো কাগজ আর পেন তুলে নেয়, "আসলে কী জানিস পাঁচ কাজে থাকি। নাম, ঠিকানাটা লেখা থাক তবু"

"—উ—উ—কণাদ মজুমদার, বি, কম।"

শুভ হাসল। অভিজিৎ থুতনিতে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, "কী হল, হাসলি যে?"

"বি কম মানে?"

নাহ্ তোকে দিয়ে কিস্যু হবে না। কি করে পড়াস স্কুলে? বি, কম মানে ব্যাচেলর অব্ কমার্স। অর্থাৎ আমার বউ এক শিক্ষিত বেকারের প্রেমে পড়েছে।"

শুভ'র কলম হাতসুদ্ধ কাগজে খসখসে।

"হ্যাঁ, ঠিকানাটা!"

"আমার পাড়ায় যেয়ে খোঁজ করলেই হবে। আজ উঠি। যদি কাজটা করতে পারিস চিরকাল তোর গোলাম হয়ে থাকব রে।"

অভিজিৎ উঠে দাঁড়ায়। শুভ চেয়ার ছেড়ে উঠে বাইরে আসতে আসতে ওর অ্যামবি মসৃণ গতিতে গলিয় বাইরে।

আচ্ছা, কে এই কণাদ মজুমদার? শুভ নিজেও অল্পদিন যাতায়াত করছে না অভিজিৎ'এর পাড়ায়। ইদানীং হয়ত বহুদিন পর পর যায়, কিন্তু এমন কিছু নজরে পড়েছে কী? ভেবে পেল না। ঠিক। অবশ্য ওদের পরের অনেক ছেলেকেই এখন আর চিনতে পারে না, কিন্তু তাহলে তো বুলার থেকেও ছোটই বলতে হবে ছোকরা অথবা তুলনাই সমবয়সী। এক্ষেত্রে কী করা উচিত বুঝতে পারেনা শুভ। কণাদকে সরিয়ে দেওয়ার কথা যা বলল অভিজিৎ সেটা একটু বাড়াবাড়ি। এসব ব্যাপারে কেলেঙ্কারি তাহলে আরো বাড়বে।

সন্ধেবেলা টিউশনী সেরে ফেরবার পথে রাস্তাটা একটু বাড়িয়ে নিল শুভ। দিনকাল খারাপ। আটটা বাজতে না বাজতেই রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। সাইকেলের পেছনের চাকাটাও যেন বিট্রে করছে আজ। স্কুল থেকে বেরিয়ে হার্ড পাম্প করিয়ে নিল অথচ এখন কেমন ন্যাতনেতে। পাছা ব্যথা হয়ে যায়। বুক ব্যথা হয়ে ওঠে, চিনচিনে একধরণের ব্যথা। কাল একবার মাণিক ডাক্তারকে দিয়ে চেক্-আপ করিয়ে নেবে। উত্তমকুমার মারা যাবার পর থেকে খুব সতর্ক শুভ। অতবড় আর্টিষ্ট বুকের ব্যাপারেই তো গেল! নয় নয় করে নিজেরও পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হল। এখন কী আর মানুষ খুন করা পোষায়!

রাস্তার বাঁক ঘুরতেই কন্ট্রাকটার গুরুদাস ভট্চাযের বাড়ি। এরপরই অভিজিৎদের রাস্তা থেকে একটু উঁচু করে তোলা বাড়ি। পর পর কটা সিঁড়ি টপকে দরজা পেতে হয়।

আস্তে আস্তে বাঁ হাতের ব্রেক চাপল শুভ। মাটিতে পা ঠেকিয়ে সিঁড়ির নিচে এসে দাঁড়াল। বাইরের আলোটা কম পাওয়ারের, দেখলেই বোঝা যায় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারের বাড়ি।

সাইকেল ষ্ট্যাণ্ড দিয়ে একপাশে রেখে সিঁড়ির সবচেয়ে ওপরের ধাপে উঠে দরজার পাশের কলিংবেল বাজাল। রাস্তার মোড়ের জটলা থেকে জোর গলায় কেউ খিস্তি দিল কাউকে। কণাদ কি ওদের মধ্যেই আছে! তাড়াতাড়ি আশপাশে নজর চালাল শুভ।

হঠাৎ দরজা খুলে অভিজিৎ বেরিয়ে আসতেই চমকে উঠল শুভ। পেছনে টিউব লাইটের দুধ-আলো নিয়ে অভিজিৎ দেবদূত যেন। ওকে দেখে হাসল। পরণে কাজ-করা পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা। দুহাত দরজার দুপাশে। ঠিক উত্তম (আহ্, এত উত্তম আসছে কেন)!

"—জানতাম তুই আসবি!"

"—জানবি বৈকি, নিশ্চয়ই জানবি।" শুভ নিচে থেকে সাইকেল তুলে নিয়ে এল। অভিজিৎ বারণ করছিল, তবু তুলল। রিভাইজ্ড স্কেলের এরিয়ারের টাকা এখনো হাতে আসেনি। হয়ত আসবে কোনদিন।

অন্যবারের মতো হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়তে যাচ্ছিল শুভ, অভিজিৎ হাত ধরল, "বস এখানে।"

শুভ অবাক হল। কিছু না বলে অভিজিৎ'এর সঙ্গে সোফায় যেয়ে বসল। ঘরের একদিকের দেওয়ালে

কিম্ভূত একটা 'সাঁওতাল-দম্পতি'র ফটোপ্রিন্ট। মিহি সুগন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে ঘরে; ধূপের কি! ধূপের হলে নামটা জেনে নেওয়ার কথা মনে হল শুভর। এখন নয়, একটু পরে জিজ্ঞেস করবে। ভেতরে মিষ্টি গলায় কেউ গান গাইছে। অকস্মাৎ অহিলায়। বুলার গলা এত মিষ্টি! অভিজিৎ-টার সত্যিই কপাল খারাপ।

সোফায় শরীর এলিয়ে অভিজিৎ ফিসফিস করে বলল, "ভেতরে কণাদ আছে।"

"মানে?" শুভর কাছে ব্যাপারটা ধাঁধার মতো অভিজিৎ'এর মাথার গোলমাল হয়েছে মনে হল। ভেতরে বসে ওর স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করছে একটা ছেলে আর ও বাইরের ঘরে বসে! আশ্চর্য ব্যাপার!

খেলার মাঠের শুভ পাগলামি শুরু করেছে ভেতরে টের পায়। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। পাঞ্জাবির কোণায় হাতের টান অনুভব করে। জোর করে ছাড়িয়ে নেয়। পিছু ফিরে দেখার কোন তাগিদ অনুভব করে না। ঘাড়ের কাছ থেকে মুখ পর্যন্ত গরম হয়ে উঠেছে এখন। অভিজিৎকে এত প্রচণ্ড ঘেন্না করে! ব্যাটা কাওয়ার্ড! চোয়ালের আহত জায়গাটা সুড়সুড় করে ওঠে। আস্তে আস্তে সুরের উৎসে এগিয়ে যেতে থাকে শুভ।

আলো-আঁধারি প্যাসেজটার শেষে একটা ভারী পর্দা ঝোলান। দু'হাত দিয়ে সেটা সরাতেই আরো স্পষ্ট হল গান। বুলা গাইছে, "আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই।" শুভ স্তব্ধ হয়ে শুনতে থাকে। ঘরের ভেতর থেকে চেনা সুগন্ধের সাথে জারিত হয়ে আসছে পৃথিবীর পবিত্রতম শব্দসমূহ। সম্মোহিতের মতো হাত বাড়িয়ে দরজার পর্দা সরাল শুভ। জানলার দিকে মুখ বুলার। পাশে শোয়ান পিংকি। ঘরের মধ্যে শুধু সুগন্ধ; ধূপের কি! আস্তে আস্তে পর্দা ছেড়ে দিল শুভ।

অন্ধকার প্যাসেজে দেয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে ছিল অভিজিৎ। বিমূঢ় শুভ ওর দিকে তাকাল শুধু।

"কণাদকে দেখলি?"

"না।"

আসলে কি জানিস, এত একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছিল সব! সেই ফ্যাক্টরি, বোনাস, লেবার ট্রাবল। সকালে ওঠা, বাজার। দিনের শেষে সেই একই বুলা। হরিবল! একটা নতুন খেলা বার করতে চেয়েছিলাম। প্রেম-প্রেম খেলা। বেশ থ্রীলিং লাগছিল! বিশ্বাস কর!"

শেষের দিকে গলা ধরে আসছিল অভিজিৎ'এর। এখন ওকে দয়া করা যায়। সব দিয়ে দেওয়া হাসি হাসল শুভ, "তুই খেলাটা চালিয়ে যা।"

অন্ধকারে একটু কেঁপে উঠল মুঠোর মধ্যে ধরে থাকা অভিজিৎ'এর হাত। আলতো হাতে ওর হাতটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল শুভ তারপর বলল, "পরের নামটা আমি সাজেষ্ট করছি বুঝলি!

অভিজিৎ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর কাঁধে শুভ মৃদু চাপড় দিল, "পরের ছোকরার নাম দিস শুভ। আমি কিছু মনে করব না।"

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল অভিজিৎ। শুভ দাঁড়াল না। সাইকেল বের করে রাস্তায় নেমে এল। শুনসান রাস্তায় বেশ খানিকটা চালিয়ে আসার পর খেয়াল হল নিজেকে বেশ হালকা লাগছে এখন। বুকের মধ্যে ব্যথাটা জানান দিচ্ছে না আর।

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়ের বিছে

কথা ছিল অফিস থেকে ফেরার পথে, বন্দনার বাবা কেমন আছেন খবরটা নিয়ে সে উত্তরপাড়ায় যাবে। উত্তরপাড়ায় হীরকের বাড়ী। এ্যাপয়েন্টমেন্ট যখন করা নেই, তখন একটু দেরী করে, মানে সাড়ে সাত বা আটটা নাগাদ যাওয়াই ভালো। আরো দেরী করলে হয়তো আড্ডা দিতে বেরিয়ে পড়বে। ব্যাচেলার ছেলে। খেটেখুটে এলেও, বাড়ী ফিরে দু'মগ জল গায়ে ঢালার পর একটু ধীরে সুস্থে বসে যদি এক কাপ চা আর দুটো রুটি-সুটি চালান করে দিতে পারে, ব্যাস! একেবারে ফিট। ঘণ্টা দুয়েকের দায়ে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত। তারপর কোথায় সে বেপাত্তা—। সুতরাং বাড়ীতে পেতে হলে সাত থেকে আটের রেঞ্জে পৌঁছানো চাই। খুবই যে দরকার ওর সঙ্গে তা নয়। আবার নিছক দেখা করার মতও—। মোট কথা, এসবেরই তাগিদে সে বেরিয়েও এসেছিল অফিস থেকে ঠিক চারটেয়। তারপর গুটি গুটি হেঁটে শ্বশুরবাড়ী। রাস্তা—সে নেহাত্ কম নয়। তিরিশ মিনিট তো বটেই। তবু পায়দল। বন্দনা হিসেব ক'রে তিনটে টাকা হাতে দেয় রোজ। নেহাৎ আজ তার বাবার খবর নেওয়ার কথা। তাই তিরিশ পয়সা এক্সট্রা। দেয়ার সময় বলেছিল, একপিঠ হেঁটো।

এক পিঠের বদলে সে দু'পিঠই হেঁটেছে। তাবলে তিরিশ পয়সা বাঁচেনি। না বাঁচুক। বন্ধুকে চা খাইয়ে তিরিশ পয়সার বিনিময়ে সে ঢের বেশি তৃপ্তি পেয়েছে।

বন্ধু বলতে হীরক নয়। শঙ্কর। শ্বশুর বাড়ীর পথে, ফুটপাতে দাঁড়িয়েই গল্প হ'ল খানিক। দোকানের আগুনে দড়ি থেকে সিগারেট ধরাচ্ছিল শঙ্কর। দেখতে পেয়েই, আরে সন্দীপ যে—। তারপরই দোকানদারকে, আর একটা চারমিনার ভাই।

সিগারেট ধরিয়ে সবে একরাশ ধোঁয়া ছেড়েছে সন্দীপ, অমনি উচ্চারিত হ'ল সেই চিরন্তন অমোঘ প্রশ্নটি, একেবারে ভুলে গেছিস বল?

কি উত্তর দেবে? এর কি সঠিক কোনো উত্তর হয়? সামলে-সুমলে কিছু বলে নিয়েই বলতে হ'ল, চল্ চা খাই। আর সেই মুহূর্তে আভ্যন্তরীণ ক্যালকুলেটর বলল, ওয়ান এইটি মাইনাস সিক্সটি ইজ ইকোয়াল টু ওয়ান……

সোমনাথের খবর শুনেছিস? শঙ্কর বসেই গেল বেঞ্চে। মাস আষ্টেক আগে একবার দেখা হয়েছিল সোমনাথের সঙ্গে। সন্দীপের মনে পড়লো। আ-ট মাস আগে। আট ঘণ্টায় যেখানে ভূগোল পাল্টে যাচ্ছে পৃথিবীর, দুশো পাতা যোগ হয়ে যাচ্ছে ইতিহাসে, সেখানে আটমাসের ব্যবধানে কি ঘটতে পারে একটি ধনীর দুলালের। ভেবে উঠতে পারলো না সে। চুপ করে থাকার বদলে সে লয় পাল্টালো চায়ের চুমুকে। ক্রত

থেকে বিলম্বিতে। দীর্ঘ দুটি চুমুকের শেষেরটিকে দেখতে দেখতে শঙ্কর বললো, বুঝেছি। শঙ্কর কিছুই রাখিস না। সোমনাথ কি দিকে ছেড়ে দিচ্ছে তা জানিস? ছেড়ে দিচ্ছে মানে। সন্দীপ অবাক না হয়েও অবাক। ধরেছে তো সবে এক বছর কি দু'একটা মাস—

ধরেছে বলিস না বল বিয়ে করেছে। ধরেছিল আরো বছর খানেক আগে। শঙ্কর চায়ের গ্লাসটা পায়ের ফাঁক দিয়ে বেঞ্চের তলায় পাচার করে দিল।

হ্যাঁ ওই-ই, মানে বিয়ের কথাই—। সন্দীপ বললো। ভালোও তো বাসতো খুব।

রাখ্ আর ন্যাকড়া করিস না। মুখ বিকৃত করলো শঙ্কর।

আর কিছু না বলে, গ্লাসটা জায়গামত রেখে দাম মিটিয়ে দিল সন্দীপ। বললো, অফিস থেকে ফিরছিস তো? বাড়ী যাবি না?

তাছাড়া যাবো কোথায়? তোমার মতো তো আর মিষ্টি টানের শ্বশুরবাড়ী নেই যে—। তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়লো, হ্যাঁরে বন্যার খবর কিরে? ভালো আছে?

শঙ্কর চিরকালই এইরকম। রাজ্যের খবর বিলোতে পারে ও। নিতেও ওস্তাদ। আর না নিলে বিলোবেই বা কোত্থেকে। বন্ধুরা সবাই মিলে একদিন ওর নাম ঠিক করেছিল, রয়টার। ও শুনে আপত্তি করেছিল। বলেছিল, উহুঁ। কক্ষনো না। পি. টি. আই. বললে চলতে পারে। তোমাদের ন্যাসানালিজমে ঘাটতি আছে। কথার শেষে অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করেছিল। ঠোঁট টেপে ফুল ফুটিয়ে হেসেছিল সবাই।

শঙ্করকে বিদায় জানিয়ে সন্দীপ যখন ফের হাঁটা শুরু করলো, তখন পৌনে পাঁচটা বেজে গেছে। তা যাক। শঙ্করের সঙ্গে দেখাটাতে তবু হল। কতদিনের বন্ধু। ওঃ, বকবক করতে পারে বটে! আর এত কথার মধ্যেও ওর সেই জলের থিয়োরীটা ঠিক বেচে গেছে। সেই কোন্ ক্লাস এইটে শিখেছিল, জলের অপর নাম জীবন। ব্যাস, তারপর থেকেই শুরু হল ওর থিয়োরী। একটার পর একটা। আজ যেমন বললো, পদার্থের চারটে অবস্থা সেতো জানিস। কিন্তু জলের অবস্থা হ'ল পাঁচটা। এবং পঞ্চম অবস্থার নাম হল গিয়ে প্রেম। জল যদি জলে থাকে তো নো ডাউট শুদ্ধ। কিন্তু একটু তাপ-তাপ পড়লেই দেখবি লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে একেবারে পঞ্চমে। আর প্রকৃতির ভাঙা গড়া খেলা তো দেখোনি, তাপ যে কোথা দিয়ে শুষে যায়। ব্যাস, জমতে জমতে একেবারে বরফ।

কথাটা শোনার সময় হাসেনি সন্দীপ। কিন্তু ভাবার পরেই হাসি এসে গেল। সত্যি, বেশ আছে শঙ্কর। ভালো চাকরীও করে। ভালো বউ-ও পেয়েছে একটা। ছেলে-পুলে বলতে মাত্র দুটো। আবার বড়টাই ছেলে। বেশ আছে।

কে? সন্দীপ এসেছো? কথা কটা বলতে গিয়ে এত কষ্ট পেলেন শ্বশুরমশাই, যে সন্দীপ না বলে পারলো না। আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে। থাক, কথা বলবেন না। আমি বসছি। স্বপ্নের মধ্যে কোনো মানুষের আর্ত চিৎকার যেমন শব্দরূপ পাওয়ার আগে অনেক কষ্ট পার হয়, শ্বশুরমশাইকে তেমনভাবে কথা বলতে দেখে বড় দুঃখ পেলো সন্দীপ।

একটু চা খাও বাবা। কি আর দেবো, ঘরে কিছু—

দাদা কোথায়? বাড়ী নেই বোধহয়? বন্যার মায়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল সন্দীপ।

অভাব-অনটন-অবহেলা তারি দক্ষ পেইন্টার, এক মেকআপ মাস্টার বিশেষ। সন্দীপের মনে হলো। তা না হলে এই যে ভদ্রমহিলা, যাঁর বয়স কত হবে পঞ্চাশের কাছাকাছি, দেখাচ্ছে যেন ষাট-পঁয়ষট্টির কম নয়। পোষাক-আশাক খুবই মানানসই। যেখানে যেটুকু ছেঁড়া, যেটুকু সেলাই, যেটুকু ময়লা দাগ থাকা দরকার তা নাই—। সহ্য হয় না। একেবারে সহ্য হয় না এসব।

চিন্তায় ডুবে থাকলেও সাইকেল চালাতে কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না সন্দীপের। বাড়ীর রাস্তা। আর মিনিট পাঁচেক। তারপরই বাড়ী। হীরকের কাছে আজ আর যাওয়া হ'ল না। ভাবতে ভাবতেই যে স্টেশনটা পেরিয়ে গিয়েছিল সে, তা নয়। আসলে মনটাই—। সময়ও যায় যায় করছিল। ফলে স্বেচ্ছায় টপকে গেল সে উত্তরপাড়া।

এভাবেই হীরক দূরে থাকে। দূরে থাকে প্রবীর, শঙ্কর, অনন্ত, বৈশাখী, শিপ্রা…।

দরজায় কড়া নাড়তেই মুনমুনের গলা, মা বাপি এলো। দরজা খুলেই প্রথম প্রশ্ন বন্যার, কেমন দেখলে?

একই রকম। বললো সন্দীপ। বন্যা আর কিছু বলল না। সন্দীপ সাইকেলটা রেখে জামা-প্যান্ট খুলে একটা লুঙ্গি পরলো। তারপর একটা গামছা নিয়ে কলঘরে।

কলঘর থেকে আজ আর কোনো গুন গুন শুনলো না বন্যা। খানিক পরে জলখাবার নিয়ে এল সে। চাটখাটো কি বলা যায় সেটাকে, দেবা? সেটারই মাথায় রেখে, বললো, আমাকে একদিন নিয়ে চলো। দেখে আসবো বাবাকে। সন্দীপ তখন পাজামা-গেঞ্জি পরে চুল আঁচড়াচ্ছে। বললো, যেদিন যাবে বলবে।

ক্যানসারের রুগী, কবে কোনদিন—

তোমার দাদা তো এদিকে বাবা হ'তে চলেছেন। খবরের মত করে জানালো সন্দীপ।

সত্যি? আর একথা বলার পরই বন্যার মনে পড়লো, বছর তিনেক আগে একটা সামান্য ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছিল। দাদার সঙ্গে। তারপর থেকে দাদা-বৌদি কেউই আর মাড়ায় না এ বাড়ী।

বৌদি কি হাসপাতালে? বললো বন্যা।

তাইতো শুনলাম। সন্দীপ রুটি ছিঁড়ে মুখে পুরলো।

কখন গেছে?

গতকাল সন্ধ্যায়।

সেকি! অবস্থা?

একই রকম।

অবস্থা একই রকম। তফাৎ শুধু এই যে, একজন যাবে আর একজন আসবে। মধ্যখানে স্থবির কিছু মুহূর্ত। ভাবতে গেলে কেমন সব গোলমাল—খাওয়া শেষ করে হাত-টাত ধুয়ে ফেলল সন্দীপ। ঘরে ঢুকে এতক্ষণে মুনমুনের দিকে নজর দিলো সে। মুনমুন বইপত্র মেঝের ছড়িয়ে কি একটা ছবির দিকে ঝুঁকে পড়ে দেখছে।

তুমি কি করছো মামণি?

ছবি দেখছি। মুনমুন বললো।

ছবি দেখছো? বেশ। কি ছবি দেখছো যায়?

হাতির। বলে হাসলো মুনমুন। সন্দীপও হাসলো। তাই বুঝি?

বাপি, হাতিটার লেজ দেখতে পাচ্ছি না।

ভালো করে খোঁজো, পাবে। বলল সন্দীপ। বড় জিনিসগুলো তো আগেই চোখে পড়ে। ছোটখাটো জিনিসগুলোকে খুঁজে দেখতে হয়।

বলার পরই সন্দীপের মনে হল কথাটা বোধহয় ডাইমেনসন পেয়ে গেল। বন্যা বিছানাটা ঠিক করে রাখছিল। তক্তাপোশটা নড়ছে দেখে পায়ার তলার কাঠের টুকরোটা ভালো করে সেট করে দিলো। সন্দীপের কথাটা তার মগজে ঢেউ তুলেছিল কিনা কে জানে। বলল, আজ আবার সেই বিছেটা বেরিয়ে ছিলো জানো?

বিছে! কোনটা? সন্দীপ অন্যমনস্ক ছিল। সে ভাবছিল। কমোন কিছু সমস্যার কথা বাদ দিলে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীর মধ্যে অনেকেই তো বেশ রয়েছে, দিব্যি রয়েছে। অর্থ-সম্মান, সুখ-শান্তি কিছুতেই ঘাটতি আছে বলে তো—

শংকরের কথা মনে পড়ছিল। একে তো ভালো চাকরী করে, তার ওপর নিশ্চয়ই দু'হাতে লুটছে। ঘুষের পয়সা না হ'লে অমন বাড়ী হাঁকায়, এই বাজারে!

হীরকটা বিয়ে-টিয়ে করেনি। স্বাধীন। কত ফুর্তি ওর মনে! পিকনিক করছে, প্রেম-ট্রেমও। যখন যা মনে হচ্ছে—

বলা কওয়ার কেউ নেই। পিছুটান কিছু নেই। বেশ আছে! চাকরীটা নিশ্চয়ই ওর কাকা করে দিয়েছে। ওরকম ছেলের না হলে ওরকম একটা চাকরী—

কোন্ বিছে আবার, যেটা দেখা যায় প্রায়ই এই ভেতরের ঘরে। বলল বন্যা। ও, তাই নাকি। বিশেষ পাত্তা দিলো না সন্দীপ। বন্যা মুনমুনের জামা, নিজের শাড়ী-টাড়ি গুছিয়ে রাখছিলো দেওয়ালের ধারে টাঙানো দড়িটায়। বলল, সন্ধ্যে বেলায় তখন মমতাদি এসেছে। বসে একটু কথা বলছি। হঠাৎ দেখি বিছেটা—

মেরে ফেলেছো তো?

উ—মারা কি অতই সোজা! যেতে না যেতেই—

বন্যার কথার মধ্যেই সন্দীপ বললো, মমতাদি যে হঠাৎ, কি মনে করে?

কালার টি.ভি কিনেছেন। শুনিয়ে গেলেন। ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো বন্যা। জানোই তো সব।

হুঁ। চুপ করে গেল সন্দীপ।

খাওয়া দাওয়ার পর ওরা যখন শুয়ে পড়েছে, মুনমুন যখন ঘুমিয়েও পড়েছে, ঠিক সেই সময় একটা খসখসানি শব্দে ওরা কথা থামালো।

কিসের একটা শব্দ হচ্ছে না? বলল বন্যা।

হ্যাঁ, টিনের কৌটায় কিছু একটা আঁচড়াচ্ছে যেন। সন্দীপ বলল নীচুস্বরে। কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে গেল ওরা। কিন্তু বেশিক্ষণ ধৈর্য্য রাখতে পারলো না বন্যা। বললো, আমাদের ভাঙা তক্তাপোশে বসে টি.ভি. স্ক্রিনের গল্প না করলে সুখ হয় না মমতাদির। সন্দীপ হিসহিসে স্বরে বললো, তুইফোড় বড়লোকেরা ওরকমই। আবার খানিকক্ষণ চুপ করে রইল ওরা। আশপাশের সবাই কি করে যে এত উন্নতি করছে! কথাটা ভাবছিলো কিন্তু বললো বন্যাই। সন্দীপ কিছু বললো না আর। চুপ করে শুয়ে রইল। আর এ সময় আবার খস্‌খস্।

কি বলোতো ?— ইঁদুর বোধহয়। যদি সেই বিছেটা হয় ?— চলো উঠে দেখি। তক্তাপোশ থেকে নামার জন্য অগত্যা তুললো সন্দীপ। বন্যা যখন নেমে এসে দাঁড়ালো, সন্দীপ ততক্ষণে আলোটা জ্বেলে ফেলেছে।

তক্তাপোশের তলায় বাজের জিনিস জড়ো করা আছে। কোনটা সরাতে কোনটা সরাবে ভেবে পেল না সন্দীপ।

একটা টর্চ থাকলে—বন্যা ফিসফিস করলো।

শব্দটাও তো হচ্ছে না আর। বললো সন্দীপ।

চারদিক তাকিয়ে খুঁজছিল সে। এ সময় বন্যা হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গীতে খানিকটা এগোলো। আবার পিছিয়েও এল। এরকম আলো-আঁধারে কিছু কি আর—

সেকি ! অন্দরমহলে আস্ত একটা চাঁদ থাকতে—। হাসলো সন্দীপ। আর এ সময় বন্যার মুখ দিয়ে মৃদু একটা আর্তনাদ—উ মাগো। চমকে উঠলো সন্দীপ। কি হ'ল ? কামড়েছে ?

ফরফর করে উড়ে একটু তফাতে পড়ল একটা আরশোলা। বন্যা হাসলো। সন্দীপ হাসলো না। বরং একটু রাগ দেখিয়ে তক্তাপোশের তলার দিকে এগোলো।

হাঁড়ি-কলসি, বাক্স-পেঁটরা, ছেঁড়া-ন্যাকড়ার পুঁটলি, ভাঙা হারিকেন, কেরোসিনের টিন, ঠাকুরদার কাচ-ভাঙা ছবিখানা কত কী-ই যে রয়েছে। সরিয়ে-নড়িয়ে দেখতে লাগলো সে। বন্যা বললো, বিছে বেরোলে নাকি আরশোলা ওড়ে। কথায় আছে। সন্দীপ কিছু বললো না। খোঁজা শেষ করে সে বেরিয়ে আসছিল। হঠাৎ 'ওইতো' বলেই চুপ করে গেল।

কি ? বিছেটা ? বন্যা সরে এল বুকের কাছে। দুজনে বসে আছে হাঁটুতে ভর রেখে। মাথা নীচু করে দেখছে। কই ? কোথায় ? বন্যার ফিসফিস।

বোধহয় লুকিয়ে পড়েছে। স্ফুবরে বললো সন্দীপ। মনে হল দেখলাম যেন !

পাশাপাশি শুয়েও অনেকক্ষণ ওরা কোনো কথা বললো না। এক সময় বন্যা বললো, বড় জঞ্জাল আর আজেবাজে জিনিসে ঘর ভরে গেছে।

দারিদ্র্যের চিহ্ন। অভাবের ফল। বিড় বিড় করলো সন্দীপ।

অভাবের সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক কি ? বলল বন্যা। ইচ্ছে থাকলেই পরিষ্কার করে গুছিয়ে...

ফুরসৎ কোথায় ? মাঝখানে কথা বলে উঠলো সন্দীপ। একটা দিন কি গেছে, যেদিন সংসারের চিন্তা—

বন্যা বলল, আসছে রবিবার আমরা দু'জনে মিলে...

রবিবারে ওভার টাইম আমার।

তাহলে তারপরে কোনো একদিন—এমনভাবে বলছে বন্যা, যেন কোনো স্বপ্নের কথা শোনাচ্ছে—সবরমত সাফ ক'রে ফেলবো। কেমন ? তাহলে তো আর—।

বিছে-টিছে থাকবে না, হ্যাঁ ঠিকই। বললো সন্দীপ। বাইরের ঘরটা কেমন সাজানো; অথচ—

ভেতরের ঘরটাও হবে। বললো বন্যা। সন্দীপ বললো, হুঁ। আর তারপর অবর্গত কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই বন্যার দুই ঢেউয়ের মাঝে মাথা রাখলো সে। দিনটা সত্যিই কোনোদিন আসবে কিনা, তা নিয়ে আর মাথা ঘামালো না।

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ঘুণ পোকা
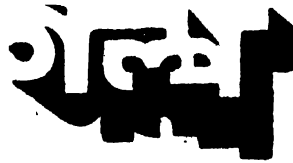
ঠিক দশটায় !

ঠিক দশটায় ?

হাঁ। ঠিক দশটায় করিডোর দিয়ে হাটতে হাঁটতে বেরিয়ে গেল !

কেমন দেখছি ? খুব আপসেট ?

সেইটাই তো ট্র্যাজেডি। যাবার সময় শুধু বলে গেল "গেলাম বুঝলে !" আমি তো হাঁ ! চলতে চলতে প্রশ্ন করলাম "একেবারে" ? কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "সিয়োর !"

ঠিক সকাল আটটায়। আমি দেখলাম ও এলো। ড্রয়ার খুলল। এক গ্লাস জলে ফ্রিজ থেকে একটু বরফ পানচ করে খেলো।

খেল ! তারপর ?

তারপর ? আমি ছিলাম না। এই তো শুনছি তোর কাছে—ঠিক দশটায় করিডোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে......

কি ব্যাপার এখানে এতো জটলা কেন

না মানে......এই একটু !

"মিষ্টার মুখার্জি, আমি আপনাদের সবাইকেই বলছি আমি এই রকম ইনডালজেন্স কারদার এলাউ করব না !"

মচমচ জুতোর শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলেন মিষ্টার মিত্র।

মুখার্জির মুখখানা ফ্যাকাসে। জমাটবাঁধা সাসপেন্সের আসরে একেবারে কট্ রেড হ্যানডেড।

—কট্ রেড হ্যাণ্ডেড ! কি বলছ মুখার্জি ?

মুখার্জির পাংশু মুখখানা খানিকটা রক্তিম হল। বলল, ডেসপ্যাচের ইয়ার এণ্ডিং ফিগার এখনও পুরোটাই বাকী ভাই। আর কি মারসি হবে !

—তা যা বলেছ। মিটার এবার তোমার পিণ্ডি চটকাবে।

—কি হল লোকটার। নিজের ইচ্ছেতেই নাকি চাপে প'ড়ে !

—আরে না না খুনটুনের ব্যাপার আছে।

—ফালতু বকিস না। চৌধুরিদার মেরুদণ্ড অত ঘুণ ধরা নয় !

—হাঁ-হাঁ চৌধুরি তোদের কাছে দেবতা। ভেতরে ভেতরে কত কি যে……। অন্ততপক্ষে আজকালকার যুগে তো ওসব বিশ্বাস টিশ্বাস……! কিছুই বলা যায় না বুঝলি-কিস্সু না!

লাঞ্চে ক্যান্টিনে জটলা। ডিউটি টাইমে মিষ্টার মিটারকে আড়াল করে জটলা।

—আসলে ওই রকম মানুষ টেঁকে এই জায়গায়! রাবিস্!

—হ্যাঁ তা যা বলেছিস। প্রতিবাদ ট্রতিবাদ ওর মুখেই যা একটু শুনতাম।

—কটা মামলা ঝুলিয়েছে কম্পানীর নামে!

—যতদূর জানি আপাতত চারটেতো বটেই।

—আসলে আমার মতে লোকটার পার্টস প্রচুর! মেন্টালি খুব ব্যালেন্সড্!

—আমারও ওই একই মত। সবচেয়ে বড় জিনিস হল ওর চোখ। কনসেনট্রেটেড অন্ড সেরিয়াস আইটেম।

—হুঁ তবে আর কি। ওসব বেটার বুজরুকি! একটু মাতব্বরি করার সখ এই আর কি।

—সেই কথাই তো বলছি। মামলা ঝুলিয়েছে! তোদের দেখিয়েছে যে মামলা ঝুলিয়েছে?

—কেন কেন আমার অ্যাকটিংএর ব্যাপারে কম্পানীর নামে এপ্লিকেশন দিয়ে তো পাঠিয়েছে লেবার কমিশনারের কাছে।

—তুই দেখেছিস?

—চিঠিটার কপি চৌধুরিদার ফাইলে আছে।

—চৌধুরীদার ড্রয়ারের ঐ ফাইলে তো দুনিয়ার জিনিস আছে শুনি! চোখে একবার পরখ করেছিস।

—আসলে তোর চৌধুরীদার প্রতি একটু জেলাসি আছে! ভোটে তো এবারেও হারলি!

এ্যাই এ্যাই!

—আরে যা…যা…………

সোরগোলে কথা ডুবে যায়। মিটারের ঘরে পর্দা নড়ে উঠল। শাব্দিক উপদ্রবগুলো হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেলে আবার স্বাভাবিক মূল সুরে পৌঁছে যায়।

প্রতিদিন সকাল আটটার অ্যালার্ম সাইরেন বাজার আগেই দেখা যেত ইমপোর্ট পারচেসের চেয়ারটায় উনি বসে আছেন। খানিক জিরিয়ে একগ্লাস জল। গরমে একটু বরফ পাঞ্চ করে। তারপর ফাইল ঝাড়তে ঝাড়তে অফিস ঘরে লোকজনের যাতায়াতের শব্দ উঠত। ইমপোর্ট পারচেসের টেবিলে ক্যাসিট ঝড় তুলত। ন-টায় মিটার না আসা অবধি সে ঝড় অফিস কলিগস্দের আলাপের প্রস্তাবনায় ডুবে যেত

চিঠিখানা হয়েছে মিষ্টার চৌধুরী? চৌধুরী ড্রয়ার থেকে বার করে নিঃশব্দে হাত বাড়ায়। মিষ্টার মিটার ইমপোর্ট পারচেসের এই টেবিলটার সামনে এসে কেমন যেন চুপসে যান।

—চৌধুরীদা, ব্যাঙ্ক থেকে ইমপোর্ট ডিউটি কত? তিন নম্বর টেবিল থেকে উচ্চগ্রামে প্রশ্ন।

—চৌধুরীদা, দুটো ক্যাজুয়ালের পর একটা সিক দেওয়া যাবে?

—দেখলেন তো চৌধুরীদা তিন নম্বর লেদের ব্যাপারে কোম্পানীর এগ্রিমেন্টটা। ইউনিয়ন যে কী করছে!

—আচ্ছা চৌধুরীদা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটপ্রার্থীর মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন কত হওয়া উচিত?

—চৌধুরীদা, আচ্ছা আপনিই বলুন কপিলের রেকর্ড ভাল-না বোথামের রেকর্ড ভাল।

প্রায়ই ইমপোর্ট পারচেসের চেয়ারে বসা লোকটার মাথাটা ফাইল থেকে উঠত, ঘুরতো এধার ওধার। আর ছোট ছোট উত্তর বেরিয়ে যেত জনে জনে।

দেখুন মিষ্টার মিটার আপনার দেওয়া ক্রমাগত মেন্টাল চাপ আমাদের অফিস কলিগস্‌দের ক্রমশ অ্যাবনরমাল করে দিচ্ছে। আপনি যদি নিজেকে পরিবর্তিত না করেন,—দে উইল হ্যাভ ট্যু এগ্রেসিভ আর্জ।

মিষ্টার মিটার দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, কাজ করতে বলাটা কি মানসিক চাপ সৃষ্টি করা বলবেন মিষ্টার চৌধুরী!

ঘাড়ে কাজ চাপানোর একটা সীমা আছে মিষ্টার মিটার।

ঘর থেকে বেরোতেই কি হল চৌধুরী? কি বললে তুমি মিটারকে? মিটার কেমন ট্রিট করল তোমায়।

বললাম—চাপ সৃষ্টি করে পেন ডাউন চলবে!

থ্যাঙ্ক ইউ দাদা-থ্যাঙ্ক ইউ! দাদা তুমি না থাকলে যে কি হত!

কি হত মানে? তোমরা কি জান মিটার পারচেসিং এ কমিশন খায়।

কমিশন খায়?

তবে আর বলছি কি। বলে এলাম মিটারকে; না মানলে ব্যাপারটা নিয়ে হৈ-চৈ বাঁধিয়ে দেব।

বলেছ দাদা? তারপর কি হল?

কি আবার হল—এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল ঢকঢক করে গলায় ঢালল!

খিক-খিক, হো-হো, ক্যাস ক্যাস হাসির শব্দ।

চৌধুরীর টেবিলে ক্যাসিটে ঝড় ওঠে। এক নম্বর-দুই নম্বর-তিন নম্বর চেয়ার থেকে একেবারে লিগ্যাল ডিসপুট সেকসান অবধি একটা ঠাণ্ডা আমেজ বয়ে যায়।

মিটারের পাশের ঘরে ওর পি-এ আজ পর্দা সরিয়ে একবারও বেরোয়নি। পি-এর টাইপিষ্ট মাঝে মাঝে পর্দা নাড়িয়ে ঢুকছে বেরোচ্ছে। মুখে কুলুপ আঁটা। চৌধুরীর টেবিলে এখন কোন লোক নেই।

বুঝলি বরেণ সেদিন তো বলেছিলাম তোদের মিটার সাহেব পারচেসিং-এ মোটা টাকা কমিশন খায়। একদিন দেখিস ঠিক ফাঁসাব।

—ফাঁসাও না দাদা। বেশ প্রমাণ পত্র নিয়ে একদিন ভালভাবে ফাঁসাও।

—হ্যাঁ তারপর ধর তোদের ঐ গোডাউনের সান্যাল, স্ক্র্যাপ মেটিরিয়ালের সিনহা, স্পেয়ার পার্টস পারচে-সিং-এর তেওয়ারী—সব ব্যাটা মোটা টাকা কমিশনে ডুবে ডুবে জল খায়।

—সব কটাকে টাইট দাও দাদা। একটু একটু করে কব্জাকে দাও। বড্ড তেল ব্যাটাদের।

—তোদের কথায় নাচলেই তো হল আর কি!

কেন? সেকি!

আরে ঠিক লাইন বুঝে না এগিয়ে গেলে এই চৌধুরীদাকে তো ওরা সবাই মিলে খাপে ফেলবে। তখন তো তোদের আর কোন পাত্তাই পাওয়া যাবে না।

—কি যে বল চৌধুরীদা। আমরা হলাম গিয়ে তোমার মানে···ইয়ে আর কি! লড়ে যাও না—তুমি লড়ে যাও। বাকী সামলাব আমরা।

—এই যে ড্রয়ারের ভেতরে এই ফাইলটা দেখছিস—এই এতে সব রেডি। সমস্ত প্রমাণ পত্র একেবারে হাতের মুঠোয়। সময় হোক সব দেখবি। মিটারের ঘরে পর্দা নাড়া দেখে বরেণরা হঠাৎ মাঝপথে থেমে যায়।

* * * * *

ঠিক পাঁচটায় ছুটির সাইরেণ বাজবে। এখন ঠিক সাড়ে চারটে। এক নম্বর-দুই নম্বর-তিন নম্বর চেয়ার থেকে সিগ্যাল ডিসপুট সেকসান অবধি সবাই ব্যস্ত। চৌধুরীর ড্রয়ার সকালেই সিল্ করা হয়েছে। মিটার বলে গেছে ঠিক পাঁচটায় সবাইকে সাক্ষী রেখে ড্রয়ারের তালা ভাঙা হবে। ঝড়ের গতিতে আজকের কাজের উপসংহার চলছে। পি-এর টাইপিষ্টের ব্যস্ত আনাগোনা।

—এই যে শ্যামলবাবু এদিকে শোন।

—কি ব্যাপার? তাড়াতাড়ি।

—না বলছিলাম যে—হঠাৎ রেজিগনেশান? কোম্পানী ভিকটিমাইজ করল নাকি চৌধুরী বাধ্য হল। একটু হাসির ঝিলিক দেখিয়ে শ্যামল বলল। প্রায় দেড় লাখ কামিয়ে নিয়েছে চৌধুরীদা। ভেতরে ভেতরে মোটা টাকার কমিশনের লেনদেন ছিল।

—কিন্তু প্রমাণ?

প্রমাণ হাতে নাতে। জেরোক্স কপি কাল নোটিশ বোর্ডে ঝোলান হবে।

টাইপিষ্ট ছোকরা পি-এর ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বুঝলে বরেণ তোমার চৌধুরীদা তো দুনিয়া'র লোকের খুঁত ধরত আর একে ফাঁসাব ওকে ফাঁসাব করে প্রমাণ পত্র তৈরী করত আর ঐ ড্রয়ারের ফাইলে রেখে দিত। এখন তো দেখছি নিজেই ঘুণ ধরা। পৌনে পাঁচটা। এখন ঠিক পৌনে পাঁচটা। কাজের উপসংহার দেওয়া শেষ। কুলিং ওয়াটারের ট্যাপের সামনে বেশ ভীড়। কারও চোখে মুখে জলের ঝাপটা। কারও মুখে রুমালের মৃদু প্রলেপ চলছে। কেউবা নিজস্ব ব্রাণ্ডের সিগারেটের সুখটানে ব্যস্ত। অ্যাটেণ্ডেন্স রোলের টেবিলের কাছাকাছি ভীড়ের ঘনত্ব সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। মিটারের ঘরে পি-এ ঢুকল। একটু আগে ঢুকল জেনারেল ম্যানেজারের পি-এ।

পাঁচটার সাইরেণ বাজতেই মিত্রের পি-এ পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলো।

একটু দাঁড়িয়ে যান। মিটার মিটার আসছেন। চৌধুরীবাবুর ড্রয়ার খোলা হবে আপনাদের-সবার সামনে।

অ্যাটেনডেন্স রোলের কাছ থেকে ভীড় এখন চলমান মিছিল। চৌধুরীর টেবিলের সামনে এখন উৎকণ্ঠিত ভীড়। মিষ্টার মিটার বেরিয়ে এলেন তাঁর ঘর থেকে। সময় এখন খুব ভারী হয়ে উঠছে। মিটার এখন চৌধুরীর ড্রয়ারের কাছে। অফিস পিয়ন সোমনাথ তালাটাকে ভাঙছে। চৌধুরীদার ড্রয়ার একটা কিংবদন্তী। অনেকের মরণকাঠি আবার অনেকের নাকি জীয়নকাঠি। ড্রয়ার খুলে গেল। বেশ কয়েকজোড়া চোখ জুলজুলে দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে একটা কাগজের মোড়ক। তাতে কিছু হিসেব। মিটার প্রত্যেকটা খুলে খুলে দেখলেন! নিতান্ত সাদা মাটা কিছু যোগ এবং বিয়োগ। গুণ নেই ভাগও নেই! ভুটো রাবার একটা পেনসিল। আবার একটা গোল কাগজের মোড়ক। সোমনাথ মোড়ক খুলল। কতকগুলো সাদা ধবধপে পাতা। একটা মাঝারি আকারের ফাইল। ফাইল ওল্টাতে শুরু করলেন মিষ্টার মিটার। কিছু বাজে চিঠি। কয়েকটা পাতায় কিছু বিখ্যাত কবির কবিতার কয়েক লাইন করে ছত্র। ওল্টাতে ওল্টাতে একটা জায়গায় মিটার থমকে গেলেন। লেখা কয়েকটা লাইন, "আমার গোপন অন্ধকারে আমার মেরুদণ্ডে ঘুণ পোকে: বাসা বাঁধে।" ফাইলটা রেখে দিলেন মিষ্টার মিটার। খানিকক্ষণ ড্রয়ার হাতড়ে পাওয়া গেল একটা আইডেনটিটি কার্ড। কার্ডে একটা ফটো। চৌধুরীদার সেই প্রথম জীবনের ফটো। ফটোর বাঁ পাশটা কেমন যেন জীর্ণ-হলুদ হয়ে গেছে। সেই হলুদ রং ডান পাশের উজ্জ্বলতাকে গ্রাস করতে এগোচ্ছে। কার্ডটা ওল্টালেন মিষ্টার মিটার। হঠাৎ চোখে পড়ল ফটোর পেছনে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন, "বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই—বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে। এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন ভরে।" মিটার চমকে উঠে সবাইকে দেখিয়ে বললেন, দেখুন লেখাটা মাত্র কয়েকদিন আগেকার বলে মনে হচ্ছে না? এমন কি আজকে সকালেরও হতে পারে! সবাই কেমন যেন অদ্ভুত রকম চুপচাপ। মিটার ড্রয়ার বন্ধ করে সোমনাথকে তালা ঝোলাতে বললেন। তারপর সবার দিকে মুখ তুলে বললেন, মিষ্টার চৌধুরীকে আমি বাধ্য করেছি রেজিগনেশান দিতে। ওনার অপরাধের প্রমাণ চাইলে দেখতে পারেন। মচ্‌মচ্‌ জুতোর শব্দ তুলে মিটার চলে গেলেন।

চলমান মিছিল এখন করিডোর দিয়ে এগোচ্ছে, কাল সকালে চৌধুরীর টেবিলে ক্যাসিট ঝড় তুলবে না। এক নম্বর-দুই নম্বর-তিন নম্বর সেকসান থেকে একেবারে লিগ্যাল ডিসপুট সেকসান অবধি প্রত্যেকটা টেবিলে ক্যাসিট ঝড় তুলবে হিসেব মেলানোর অপেক্ষায়।

কবিতা

তরী/সমীর মণ্ডল

চলতে চলতে ভাঙ্গাচোরা সময় পার হয়ে এসেছি
এখন দক্ষিণে বসে
উত্তরে হাওয়া বইছে, পাল তুলেছি,
রহস্যের সমুদ্রে দুলে দুলে চলে এ তরী।
ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঢেউয়ে ভেঙ্গে পড়ে মানবী ...
প্রাকৃতিক অঙ্গ, বসন ভূষণ
অলৌকিক পরমায়ু, ধ্যান গম্ভীর সন্ন্যাসী।

তাড়িত দুঃখের মধ্যে খুঁজি মুক্তি
পরিচিত নির্যাতন হাস্যকর খেলা
একান্ত ইচ্ছায় তারুণ্য, সংলাপ
সুসজ্জিত উদ্যানে বিষণ্ণ বালক, রমণী।
আমি আর কাঁদিনা, বেদনা ভুলে যাই
চলে এ জীবন তরী, ধ্যান গম্ভীর সন্ন্যাসী।

আত্মহত্যা-৫/বিশ্বনাথ দাস

ভোর হয়ে এলো, বাইরে হিমেল হাওয়া
নিশ্চিত আনন্দ

কাল সারারাত আমার গলায় ঝুলেছিল—
যন্ত্রণার ফাঁস
রাতের সীমানা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল
অতন্দ্র প্রহরী অন্ধকার

না! আমার ঘুম হয় নি।
নিঃসম্বল এই যুগে কারো কি ঘুম হয়!
চারদিকে যন্ত্রণার ফাঁস, মাথার উপর—
রজ্জুতে ঝুলে থাকে অবিশ্বাস
কেউ কি ঘুমোতে পারে?
নিঃশব্দ, রাত-ভাঙ্গা ঘুম?

জলছাপ মুছে যায়/অমর ঘোষ

রেয়াত করিনা তবু মুদ্রা জানি নির্ভার রূপকল্প মূর্চ্ছনা

জলছাপ মুছে যায় নিসর্গ বেতসলতা চাঁদ আতপ আর্দ্র কণা
নির্জন বাতাস শুধু স্মৃতি কাটা ঘুড়ি রিবন শিকল নামে
শিকড়ে অসহ ঘুণ ক্রমান্বয়ে দ্রুত অশ্ব সমুদ্র সবুজ গান
জীর্ণাকাশ ফালা ফালা সার্কাসের তাঁবু—

জল ছাপ মুছে যায় রৌদ্র অনাবিল স্বপ্ন ভ্রষ্ট সাহসী সখ্যতা
লতা ফুল ফেরার পতঙ্গ ওড়ে তাগিদ স্পষ্ট অনুভব

আমি-না আমি-না—
রেয়াত করিনা তবু মুদ্রা জানি নির্ভার রূপকল্প মূর্চ্ছনা॥

তুমিও দেখেছ বুঝি/শেখ মহরম আলি

চশমার আড়াল হতে তুমিও দেখেছ বুঝি ভালোবেসে
খোলামেলা উদার আকাশ,
গোধূলি স্বপ্নে ডুবে ছিল বিপুলা পৃথিবী।
সারা মাঠ জুড়ে অঘ্রাণের হিম,
উঠতি ফসলের সুঘ্রাণ আর বিমল হাসি
জোয়ান কৃষকের উজ্জ্বল দু'চোখে
নিষ্কলুষ শিশিরের মত লুটোপুটি খেলেছিল রৌদ্র!

প্রসন্ন দু'টি চোখ হিরণ্য আলোয় হেসেছিল বিনম্র স্বভাবে
মানুষের কণ্ঠে কী মায়ার স্বর,
সুরে ডেকেছিল সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে চৌকাঠে।
উঁকি দিয়ে দেখেছিলে নীলাকাশ
সুখের পালকে ঢাকা বুকের গভীরে সন্তাপ
সেই মুগ্ধ বিস্ময়ে চশমার আড়াল হতে তুমিও দেখেছ বুঝি ভালোবেসো
ঘিরে প্রিয় মুখের চারপাশে চকচকে লাবণ্য
জাত ভিখারীর বাস্তুহীন প্রণয়।
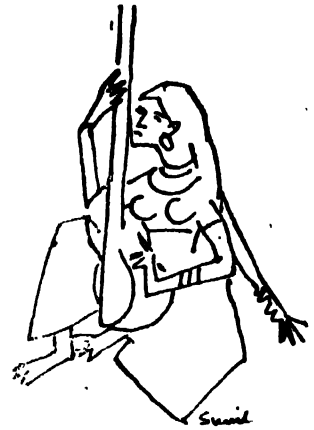
সময়/রীণা চট্টোপাধ্যায়

মোহন সিনেমা পেরিয়ে
বাঁদিকে রিক্সা বাঁকে নিলেই
মিলিয়ে নিতে থাকি

সেই বিনুনী ঝোলানো
বালিকা—জুতো মোজা পরা
কিশোরী—সে কোথায়?

আমার কোলের উপর
নরম জ্যান্ত একটা পুতুল
নিজস্ব ভাষায় কত ক
বলে যাচ্ছে আপন মনে॥]
ও-ও একদিন মিলিয়ে
দেখে নেবে আজকের সঙ্গে,—
অনেক – অনেকদিন পরে।

মুক্তির গান গাই/গোপাল চক্রবর্ত্তী

বন্ধু.

তুমি বলেছিলে, শোনাবে বিপ্লবের গান—
আর আমি এ'নে দেব, মহামুক্তির স্বাদ।
যেখানে ক্ষুৎ পিপাসু মানুষ বলিষ্ঠ পদক্ষেপে—
এগিয়ে চলবে, স্ফূর্তি আর প্রাণ প্রাচুর্যতা নিয়ে,
বিভেদ আর বিচ্ছেদ কুরে কুরে খাবে না শার্দ্দুলের মত।
ভোরের রক্তাভ সূর্য, যেমন আপামোর সবার জন্য—
পৃথিবীর জন্য, কীট পতঙ্গ, পশু, পাখী, ফুল, ফল, লতাপাতা,
পুষ্টির স্বাদ পাবে, নির্জীব সজীব হ'বে, প্রাণ পাবে রূপ।
তোমার গান, একটি মৃত প্রায় জাতীর জীবনে মহৌষধী,
বিশল্যকরণী সেকি পর্ব্বতের আড়ালেই লুকোন থাকবে?
আর সমুদ্রের গভীরে অমৃতের ভাণ্ডার তবে কি এই—
মৃতপ্রায় মানুষগুলো জীর্ণ কঙ্কালসার মানুষগুলো;
কোনদিনও কি মুক্তির আস্বাদ পাবে না বন্ধু?
তুমি শুনতে চেয়েছিলে—একটা বিপ্লবের গান; আমি···
তোমায় শোনাতে পারি, তুমি যদি শপথ নিয়ে বলতে পার;
দেশের প্রতিটি মানুষ, মানুষের মত প্রাণ প্রাচুর্যতা নিয়ে—
বাঁচবে, সত্যই সেদিন জানব, তুমি আমার বিপ্লবের গানের
শরীক। মর্যাদা রেখেছ জেনে আমি সেদিনের অপেক্ষায়
থাকব; ভীরুতা, কাপুরুষতা দুপায়ে দলে মুঁছে ফেলে;
বলতে হ'বে, বীরের মত; এ পৃথিবীর কাছে; স্বাধীন দেশের
কাছে আমরাও তোমার মত একটা স্বাধীন জাত, এবার
তবে বিপ্লবের গান শোন, বিশ্বের পরাধীন যত মানুষ
মুক্তির জয়গান গাইবে, শৃঙ্খল ছিঁড়বেই ছিঁড়বে
সেদিন আর বেশী দূরে নয়, ঐ রক্ত সূর্য উঁকি দেয়।

নদী তুমি ঃ ভালোবাসার শেকড়টান/প্রফুল্ল মিশ্র

নদীর জলের হাতছানিতে আকৈশোর ছুটে গেছি নদীর কাছে
সমস্ত বুক উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে
বুকের আধার নদীর ঘাটে
নদী তবু হাতছানিতেই চিরটাকাল কী যে বলে, ভাষা পাইনা
নদী তুমি কবে শেখাবে কলতানে নিতল হবার
তোমার ভাষার বর্ণমালা অক্ষরজ্ঞান

প্রেমের তাতে চেপে বসা গায়ের জামার
শ্বাসকষ্টে আকুল হয়ে
নদীর গহীন হৃদয় দিয়ে আমার হৃদয় ছেনে রাখতে
তল খুঁজতে ডুব দিতে যাই নদীর জলে
নদী শুধুই জল-চাবুকে জামা সাপটায়
ঢল নেমে যায় কোন বহতায় তল পাই না
নদী তুমি কবে শেখাবে তোমার চোখের কাজল মায়ার
হাতছানিতে কী ভেসে যায় আবহমান

নদী আমায় ভালোবাসা শিখিয়ে দেবে বলেছিল
ভালোবাসার ঝুল শেকড়ে নদীর বুকে মুখ বাড়ালে
নদী কিন্তু বুক ভাসায় না
কূল ভাসাতে ঝুল শেকড়ে কোন তালে যে ঘাই মেরে যায়···
কী ভাবে যে ভালোবাসা···জীবন নামক ভালোবাসা, বুঝে পাইনা
নদী তুমি কবে শেখাবে ভালোবাসার জমাট মাটির শেকড়টান।
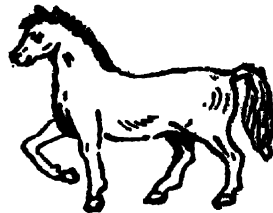
অলীক-আন্তরিক/দ্বিজেন আচার্য

মাঝরাতে সবাই অলীক ঘুমে, যেন কিছু পাশাপাশি
দ্বীপ। মনে হয় যেন ওরা কেউ কারো নয়। কোন স্বপ্ন-
স্মৃতি কিংবা কোন গূঢ় আত্মীয়তা সনির্বন্ধ
ছিল না কখনো।

পরস্পর এই নির্জনতা, এই ব্যর্থ স্মৃতি, স্মৃতির আড়ালে
এতক্ষণ জেগেছিল যেই দীর্ঘ আলিঙ্গন—
এসব দুঃস্বপ্ন তবে ?
গভীর বিস্ময়ে দেখি : অব্যাহত শোক, তৃষ্ণা, জীবন—
যন্ত্রণা নিয়ে শুয়ে আছে রতিক্লান্ত হিম অজগর।
শর্তহীন। গানহীন। নিঃস্ব—অসহায়।

গভীর প্রত্যয়ে ফের আমি চোখ রাখি ছায়ায় মায়ায়
স্নিগ্ধ হাত রাখি ফের অতলান্ত জলে—জলের আতস—
নীলে অতিক্রান্ত পালটে যায় প্রিয় চেনা মুখ
মুখের আদল ঘিরে অসহায় বোবা কান্না নামে ;
আমার শরীর ছোঁয় আন্তরিক সুর…

পৃথিবীর শোক, তাপ, যাবৎ-যন্ত্রণা—সমস্ত সংগীত হয়
আশ্চর্য সংগীত হয়ে, সমস্ত আমার বুকে
শিল্প হয়ে যায়…

তবুও মানুষ পোড়ে/প্রবাল কুমার বসু

কেমন যেন পেয়েছিল সে এক জীবনের করণিকতা
অতঃপর সারাক্ষণই পুড়তে পুড়তে শেষ
জলজ্যান্ত

দিনযাপনের হিসাব নিকাশ সব ভ্রান্ত
এমনি পুরো পোড়ার পড়েও আর কি পোড়া যায়
হোক না মৃত

করণিকতায় জীবনযাপন অনর্থ সঙ্কেত

তবুও মানুষ পোড়ে
এবং এমনি করেই…।

মাছির ডিমের মতো ফুল/অমিয় কুমার সেনগুপ্ত

মাছির ডিমের মতো শব্দহীন ফুলগুলি অনায়াসে
মাথায় জমেছে—
কে
বলেছে
এখন এই অসময় দু'পা ভেজা-কৃষ্ণমৃত্তিকায় ধরে রেখে
দাঁড়িয়ে থাকতে হবে বিশ্বজুড়ে বীক্ষ্যমান বৃক্ষের তলায় ?
শূন্য এ বুকে পা
রেখে
মাছির ডিমের মতো শব্দহীন ফুল দেখে দেখে
বীক্ষ্যমান বৃক্ষের তলায়
দাঁড়িয়ে কাটাবি বোকা অনন্ত জীবন ?

জীবন মাছির মতো ক্ষিপ্রমেধা-অশ্বগতি নয় —
খই-রঙা অনাদৃত ফুলের মতন
বিলম্বে বিরস ক্ষোভে তাই
পিঙ্গল চুলের জটে কখ্খনোই সংসার পাতে না !

মাছির ডিমের মতো রক্তহীন ফুলগুলি চুলে ঝরে,
হৃদয়ে ঝরে না !

সুখে থাকো, প্রেম/অরুণ কুমার চক্রবর্ত্তী

হাওয়ার কাঁধে মেঘের পাল্কী চাঁদ হোয়েছে যাত্রী
কেন তুমি প্রশ্ন করছো এখন কত রাত্রি··· ?
দিন কাটে না রাত কাটে না শেকড়বাকড় কাঁপছে
ঘরের মধ্যে চারটে দেয়াল উল্টো দিকে হাঁটছে
কাঠ-বরোগা-দিলিংখানা,
উড়ছে

আকাশ হোয়ে যাচ্ছে।
আকাশ দেওয়াল আকাশ ছাদের একটি ঘরে থাকছি
থাকতে থাকতে, "কেমন আছি" সবাই মিলে ভাবছি।

পান্থপাদপের দিকে/প্রণব মাইতি

আমি তো তেমন কেউকেটা নই
মাঝে নদী ব্যবধান সেতু হ'য়ে যাবে
আদেশে মানুষ তার যা কিছু দরকার
কথায় ও কবিতায় ন্যায্য সব পাবে

তার কাছে সুখ আছে সুখের সন্ধান
সে জানে বাঁচার জন্য সব দরকারী
কথা ও কাহিনীময় স্বপ্নের উজান
যা ছড়িয়ে প্রতিদিন তিনি অহংকারী

আমি তার কাছে যাই অসুখে ও সুখে
চিলতে আলোর জন্য বাতাস ছুঁতেই
পান্থপাদপের নীচে সমবেত হই
সাজানো পুতুল ঘরে যেনো জল ঢোকে

প্রার্থনায় নত সন্ধ্যা এ হৃদয় নদী
মানুষের জন্য কিছু করে যেতে চাই
সময়ে সবার শস্য তোলা হয় যদি
হাসি মুখে মানুষের পাশে নিরবধি

চেয়েছি প্রস্তুতিসহ জাগর উত্থান
তোমার সৃষ্টির মধ্যে অনুক্ষণ আছো
তারও পরে মিছিলের যত অনুরাগী
তোমাকে ছোঁয়ার জন্য নদী ব্যবধান

আমি তো তেমন কেউকেটা নই
তর্জনী মধ্যমা জুড়ে অক্ষম লেখনী
তবুও সমস্তক্ষণ শুধু অনুধ্যান
আকাশে বাতাসে তুমি তোমাকে ছুঁতেই

কাল রাতের প্লাবনে/চন্দ্রশেখর ঘোষ

অকস্মাৎ ঢেউ-এ এনেছিল প্লাবন।
নিশিরাতে চুপিসারে ভাসিয়েছিল ঘর, উঠান
আমার এ অন্দর মহল…… ।

ঢেউ-এ ঢেউ-এ দারুণ উল্লাসে
বেজেছিল মাদল এই বুকে—

মানুষের আচ্ছন্ন বোধে, অতর্কিত আক্রমণ
এ বড়ো নিষ্ঠুর ক্রিয়া…
আধো ঘুমে, আধো জাগরণে
ভোর ভোর সরে গেছে জল
দালান উঠোন সব শূন্য খাঁ খাঁ।

যেন কেউ নেই, ছিলও না কোনদিন
পোড়ো বাড়ী পড়ে আছে ধূ ধূ প্রান্তর… ।
কাল রাতে— অকস্মাৎ
দারুণ প্লাবনে কি ভাসিয়েছিল
আমার এ অন্দর মহল নাকি—
মায়াবী স্বপন, ডাইনী এসে ছেয়েছিল
এই ঘর এই উঠোন ?

ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গের 'পরে চাঁদ/অনুবাদ—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বসন্ত তার দীর্ঘায়িত চূড়ায় ফুলের ছবি ঘেরা তোড়া সব
মদিরা আধারে বা ঝলমলে আলোরই ভেতর
স্রোতের পথ ধরে পাইনের সারি সারি ডালগুলি মাঝে
হাজারটা যুগ কাটিয়ে গেল যেন পেছনে রাখা জোছনা ;
এখন কোথায় তা ?

হেমন্ত তাঁবুর ধারে শাদা তুষার বিন্দু সব—তবু
বুনো হাঁসগুলি সবই গুনচি ; উড়ে চলে গেলে পর
কাঁদে তারা ইনিয়ে বিনিয়ে
অতীতের আলোটা সারি বেঁধে ঝলসে উঠছে যেন
প্রোথিত তরবারগুলির সেই আলো ;
এখন কোথায় তা ?

এখন শুধু ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গের 'পরে মাঝরাতের চাঁদ
বদলে যাওয়া আলোয়—কার জন্য বা এই জোছনা,
লতার বেড়ায় কেবলই ফেলে রাখে পিছে…
পাইনে, কেবলই ঝড়ের বাতাস হেথা শুধু গায় গান।
উঁচু আকাশের 'পর স্বর্গ যেন আলো না-বদলে থাকে
রূপ হারানো এ-পৃথিবীর চিহ্ন শুধু গৌরব আর ধ্বংসের
এখনই কি তা নকল করা যায় যদিও উজ্জ্বল
ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গের 'পরে—মাঝরাতের চাঁদটা ?

আধুনিক যুগের আধুনিক ছন্দোবদ্ধ জাপানী কবিতা
জাপানী কবি : টি সুচি বানসই (১৮৭১-১৯৫২) প্রবন্ধকার
অনুবাদক এবং বিখ্যাত জাপানী কবি।

তবু চাঁদ/মবিনুল হক

মেচেতা মাখানো মুখ, তবু চাঁদ
তবু আদিখ্যেতা করে হেসে ওঠো।

টকটকে মোরগফুলের মতো সহজ সরল ফুলে ওঠা
মনে পড়ে চাঁদ! আনাড়ী ছোকরা তাই
কিছুও কী অপ্রস্তুত? উত্তেজিত কিছু?
দুনিয়া চঞ্চল হয়; ভিতরে ভিতরে কাঁপে প্রতিটি জীবন
আহা চাঁদ! তুমিও কী দেখ নাই শীত, কী ভীষণ
পেরেক-বিধ্বস্ত ঘরবাড়ী, ভাঙা আস্তাবলে বাঁধা ঘোড়া!

তাহাদের মোরগ ফুলের মতো সহজ সরল ফুলে ওঠা
আহা চাঁদ! যেখানেই থাকো
ঘোড়াগুলি ছুটে যাবে বন্দুকের মতো;
ওয়াটার-বটল্ নয়, বন্দুকের নল
কোমরে টোটার বেল্ট, রিভলভার হাতে সমুদ্যত!

যদিও লুকাও মুখ অন্ধকারে – ব্যর্থ, বেকার সব
'এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে চাঁদ'—ব'লে ঠিক
টুঁটি টিপে ধরে সেই তৎপর, তীক্ষ্ণধী আলো
সূর্য কী ভয়ংকর, কী ভীষণ ভালো…আহা চাঁদ, তবু চাঁদ

মেচেতা মাখানো মুখ, তবু চাঁদ
তবু আদিখ্যেতা ক'রে হেসে ওঠো!
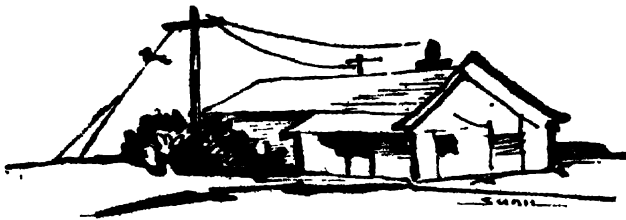
কালো মেয়েটার চোখ/মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

কালো মেয়েটার চোখে একদিন আগুন ছিলো গো আগুন…

ফাগুন আসার আগেই সখের মহুল ফেটে চৌচির
ফাট্‌কা বাজারে বিক্রি হয়ে গেছে সস্তায় নীলাম হাটায় ঢোল বাজছে।
ওর মেখলা যৌবনকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে কোন মস্তান ?
এক মুঠো ভাত, শিউলি ফুলের মতো সাদা ভাতের স্বপ্ন
নীড় বাঁধার আগেই ভেসে গেছে খড় কুটোর সংসার
পা রাখার আস্তানা।

জন্মভিটের উপর ওর কান্নায় ফুটে উঠা কৃষ্ণচূড়া
সবুজ ঘাসে মোড়া দীর্ঘশ্বাসের চিঠি পাঠায় দক্ষিণের হাওয়ায় হাওয়ায়
পাড়াপড়শীর বুকের ভেতর রক্তের তাই তো ওঠা নামা নড়ন চড়ন
হৃদপিণ্ড আর ধমনী কাঁপায়।

কালো মেয়েটার চোখ শেষ বারের মতো দেখে নিলো
পৃথিবীর বুক থেকে সূর্য নিভে গেছে
চাঁদ ভেঙ্গে টুক্‌রা হয়ে গেছে অরণ্য অন্তরালে বন্য বর্বরতায়।
এক মুঠো ভাত আর এক টুক্‌রো রুটি
ইজ্জৎ কাড়ে, শুরু করে যৌবন লুণ্ঠনের সাড়ম্বর প্রদর্শনী
আগুন জ্বালা ডুসুং এর উৎসবে হা হা কোন্ ভুয়াং নাচ ?

কালো মেয়েটার চোখে একদিন আগুন ছিলো গো আগুন…

ফুটো সমাজের ভাঙা ভিসে কাঁচা মাংসের ফুল
সাত মহলার সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে চলে গেছে মহাজনের পেটে।
খাপ সুরত শরীর নাচিয়ে বাঈজীদের ঘুঙুর
চঞ্চল রক্তে ডিঙ্গি ভাসায়, শরীর দিয়ে শরীরে দাঁতের বিষ ফাটায়—
চোখ যেন আর চোখ নেই ওর এক মুঠো ভাত, ভাতের স্বপ্ন
করাত চালায়—খিদের প্রহরগুলো আজকের এই রাজনীতিতে
ধরে থাকে একশো একটা ঘোড়ার লাগাম।

কালো মেয়েটার চোখে এখন কুৎসিত এক ঘৃণা
ছুঁড়ে মারছে কাঁড় বাঁশ আর বুকের থেকে বের করা এক শক্ত কঠিন পাথর।

কান্নার ভাষা

ডাঃ (ক্যাপটেন) সমীর কুমার দত্ত

"কান্নার কি ভাষা আছে?" হঠাৎ চমকে গেলাম। মুক্তগাছার ধূলিসাৎ প্রাসাদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। ম্যানেজার বাবুর কথার উত্তরে বললাম—"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। একটা বিশেষ বক্তব্যই তো কান্নায় ফুটে ওঠে। শব্দহীন ভাষাই রূপ নেয় কান্নার মধ্যে। বুঝতে পারা চাই সেই ভাষা।" ময়মনসিংহের মুক্তগাছায় গেছি ছ-আনা এস্টেটের জমিদারের ম্যানেজারের ডাকে। না গিয়ে উপায় কি?

ঠিক যুদ্ধ শেষের দুদিন পর আঠারো ডিসেম্বর ৭১ এর দুপুর। হঠাৎ দুজন ভদ্রমহিলা ও আরেকজন ভদ্রলোক মেসে এসে হাজির। মিলিটারী অফিসারস্ মেস্—আউট অফ বাউণ্ড এরিয়া—সেখানে এরকম অনাহূত অতিথি অপ্রত্যাশিত। কমাণ্ডিং অফিসার লেঃ কর্ণেল লদার বাঙালী দেখে একমাত্র বাঙালী অফিসার আমাকেই বললেন কথা বলতে। জানা গেল যে তাঁরা ময়মনসিং জেলার মুক্তগাছার 'ছয় আনার এস্টেটের জমিদার গৃহিনী ও তনয়া। আর বৃদ্ধ ভদ্রলোক ম্যানেজার। উনি বললেন জমিদার বকুল আচার্য চৌধুরীকে (ব্যারিস্টার স্নেহাংশু আচার্যের ভাই) পাক সেনারা হত্যা করেছে। কিন্তু মা-মেয়ের কাছে তা গোপন রাখা হয়েছে। কুমারী মেয়েটিকে দেখলাম অন্তঃসত্ত্বা এবং পাক সেনাদেরই শিকার বলে জানা গেল। তাঁরা আছেন তাঁদেরই ভৃত্যদের ভগ্নপ্রায় ঘরে। সেই ঘরের জানালা দরজাও রাজাকারদের দ্বারা অবলুপ্ত এবং ছেঁড়া চটের পর্দায় অন্তঃপুরের লজ্জা রক্ষার চেষ্টা চলেছে। তাদের আরেকটা বড় বাড়ীতে ক্যায়ার ব্রিগেডের অফিস। যদি ইণ্ডিয়ান আর্মি দয়া করে সেই বাড়ীটা খালি করার আদেশ দেন সেই উদ্দেশ্যেই এখানে আসা।

কর্ণেল লদার আমাকে এবং ক্যাপ্টেন গোঁসাইনকে পাঠালেন সমস্ত ব্যাপারটা অনুধাবন করে সম্পূর্ণ রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। অফিসারস্ মেসে দীর্ঘদিন অভুক্ত তিনজনকে খাইয়ে জিপ নিয়ে যাত্রা শুরু। ম্যানেজার বাবু খুব সজ্জন ও গল্পবাজ। মা ও মেয়ের ফুঁপিয়ে কান্না মাঝে মাঝে কানে আসছে। বিকেলের পড়ন্ত রোদে জীপ থেকে নেমে মুক্তগাছার জমিদার বাড়ী দেখছি। একি, বিশাল প্রাসাদ যে ভূমিকম্পের মতো ধূলিসাৎ! "এসব রাজাকারদের কীর্তি।" ম্যানেজারবাবু বলে চললেন—"জমিদার বাড়ীর সোনা নাকি দেওয়ালের মধ্যে লুকানো থাকে। তাই প্রতিটি ইট খুলে খুলে দেখেছে ও লুটেছে। বার্মা সেগুনের অসংখ্য দরজা-জানালা সম্পূর্ণ নিঃশেষ। সঙ্গে লোহাও বাদ যায়নি। শুধু যা পড়ে আছে তার নাম রাবিশ্।" একটা দুর্গন্ধের আভাস পেলাম। ম্যানেজারবাবু বললেন—"ক্যাপটেন সাহেব এই কুয়োটা দেখলেই বুঝবেন যে মিনিমাম স্পেসে ম্যাক্সিমাম লোক কেমন দিব্যি শুয়ে আছে। দেখি অসংখ্য মৃতদেহ দিয়ে কুয়োটা প্রায় পূর্ণ। পাকিস্তানীরা সহচর

রাজাকারদের সাহায্যে বাঙালীদের মেরেছে আর শূন্যস্থান পূর্ণ করেছে। ইতিমধ্যে আমাদের মিলিটারী জিপ ও মিলিটারী পোষাক কিছু অনাহূতকে ডেকে এনেছে। বাংলা দেশে তখন নেই কোন কোলাহল, নেই কোন মানুষের মুখ। উপস্থিত ছেলেদের বলে শুকনো ঘাস পাতা দিয়ে কুয়োটার মুখ বন্ধ করালাম। ম্যানেজারবাবু বললেন—"ইতিহাস একদিন বলবে প্রায় ২০০০ মাইল দূর থেকে এসে পাকিস্তানীরা বাংলা দেশ শাসন করত একদিন। শাসনের নামে লুণ্ঠন করে এ পাকিস্তান থেকে ও পাকিস্তানে হোত মাল পাচার। তারা কখনই পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাই বোন বা একটা অংশ বলে অন্তরে গ্রহণ করেনি।" আমি বললাম—"তাই যদি ভাবত তাহলে ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পাশে একটা পুকুর সৃষ্টি হোত না। জানেন তো প্রিন্সিপাল ডঃ রহমান যখন রেডক্রশ চিহ্ন লাগাতে চেয়েছিলেন মেডিকেল কলেজের সীমানায়, তখন পাক্ অফিসাররা এই বলে নিরস্ত করেছিলেন যে জেনেভা কন্‌ভেনশন আজকাল কেউ মানে না সুতরাং রেডক্রশ লাগানোর কোন মূল্য নেই। এদিকে ভারতীয় বিমান বাহিনী না বুঝতে পেরে বিভিন্ন জায়গার সাথে হাসপাতাল সীমানায়ও বোমা বর্ষণ করেছে। পাকিস্তানের দুটো উদ্দেশ্য এটা করা। এক, রাষ্ট্র সংঘকে দেখানো যে, ইণ্ডিয়ান এয়ারফোর্স হাসপাতালকেও বোমার আওতায় এনেছে। দুই, বহু বাঙালীও বুদ্ধিজীবিদের হাসপাতাল অভ্যন্তরেই শেষ করা ভারতীয় সেনার সাহায্যে। দ্বিতীয়টা অবশ্য সফল হয়নি হাসপাতাল বাড়ীতে বোমা পড়ার ব্যর্থতায়। পরিবর্তে বোমার সাহায্যে একটা পুকুর খোঁড়া হয়ে গেছে বিনা ব্যয়ে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে।"

ইতিমধ্যে কুয়োটা প্রায় ভরে এসেছে। মৃতের মিছিল প্রায় চোখের বাইরে চলে গেল। কিন্তু দেখতে দেখতে আরেকটা মৃতের মিছিল ভেসে উঠল চোখে। গতকাল ১৭ই ডিসেম্বর, প্রফেসর শেখের বাড়ীতে গেছি চায়ের নিমন্ত্রণে ময়মনসিং শহরে। তিনি ছাদে নিয়ে গিয়ে দেখালেন পাশেই ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার। আগে ছিল ময়মনসিং এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটির গেষ্ট হাউস। উনি বললেন—"জানেন ক্যাপটেন দত্ত, আমি বাঙালী হিন্দু, কোন্নগরের লোক। দীর্ঘদিন ধরে এই ইউনিভার্সিটির কোয়ার্টারে আছি এবং 'জেনেটিক্স' পড়াই। প্রাণের দায়ে মুসলমান হয়েছি। বউছেলেমেয়ে নিয়ে কি অবস্থায় আছি আল্লাই জানেন। কারণ প্রতিটি রাত্রে শুধু গুলির আওয়াজ শুনেছি আর শুনেছি পরক্ষণে 'আল্লা' বলে করুণ চিৎকার এবং মৃতদেহ পাশেই ব্রহ্মপুত্রের জলে ফেলে দেওয়ার শব্দ। স্ত্রী বলেছিলেন এখান থেকে চলে না গেলে মুক্তি ফৌজ এবং বাঙালীদের গাছে বেঁধে গুলি করার দৃশ্য দেখতে দেখতে পাগল হয়ে যাব আমি। কিন্তু পাকিস্তানী বর্বরতার সামনে আমার চিন্তা বিচারের বাণী হয়ে নীরবেই কেঁদেছে।" যুদ্ধ বিধ্বস্ত শহরের ছাদে চায়ের টেবিলে আমরা কয়েকজন। বললাম—"প্রফেসর শেখ, মানুষ মানুষকে চিরকালই মেরেছে। কিন্তু নিয়তি যখন মারে তখনও তো মানুষ বিচারের বাণী খোঁজে। দিল্লী মিলিটারী হাসপাতাল থেকে পোসটিং এসেছি এখানে। সেই হাসপাতালের কম্যানডিং অফিসার কর্ণেল ব্যানার্জী ছিলেন সুদক্ষ প্যারাট্রুপার। প্রতি তিনমাস অন্তর আগ্রায় যেতেন প্যারাজাম্প করতে। জীবনের ১২০ তম জাম্প করার আগে অফিসারস্ মেসে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"স্যার যদি কারোর প্যারাস্যুট না খোলে?" তিনি বললেন,—"সেইজন্য সকলেরই থাকে রিজার্ভ প্যারাস্যুট। আর তাও যদি না খোলে? তবে G. O. K. (গড্ ওনলি নোস্)। প্যারা জ্যাকেট পরতে পরতে বেরিয়ে গেলেন। ফিরেও এলেন সাফল্যের সঙ্গে একমাসের মধ্যে। এর দুদিন পরেই বাথরুমে পড়ন্ মূর্চ্ছা ও মৃত্যু। কর্ণেল ব্যানার্জীর

'সেরিব্রাল হেমারেজ' বলে ক্যাজুয়ালটি পাবলিশ হোল। প্যারাস্যুট তার খুলে ছিল কিন্তু বিচারের বাণী ছিল স্তব্ধ।"

ইণ্ডিয়ান আর্মিতে বাঙালী হওয়ার অভিশাপ হয়েছিল এই যে, নৃশংস দৃশ্য দেখার ও অমানুষিক ঘটনা শোনার বোঝা বেড়েছিলো। বাংলা দেশের অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিতরা বাঙলা ছাড়া কিছুই জানেনা। ইণ্ডিয়ান আর্মির ভাষা হিন্দি ও ইংরাজী। তাই মুক্তিফৌজের ছেলেরা চিকিৎসা ও নানান সমস্যা আমাকে জানাতো যাতে সেটা কম্যান্ডিং অফিসারের কাছে ঠিকমতন ব্যক্ত হয়। তাদের মধ্যে অনেককে আজ আমরা হারিয়েছি। আমার রেজিমেন্টের কুড়িজন মৃত মুক্তিফৌজের নাম দিয়ে একটা সুন্দর গ্রিটিং কার্ড আমরা ছাপিয়েছিলাম আমাদের শিকস্ বিহার রেজিমেন্টের ৩৫ জন জওয়ান শহীদের সাথে। সেটা পয়লা জানুয়ারী ১৯৭২ হলেও নামগুলো এখনও ধূসর হয়নি স্মৃতির মণিকোঠায়। জল ভরা ঝাপসা চোখে দেখতে পাচ্ছি কত ছোট ছোট ছেলে খালি গায়ে লুঙ্গী পরে স্বেচ্ছায় আসছে আমাদের কাছে। বয়ে নিয়ে চলেছে কেউ রেডিও ট্রান্সমিটার সেট্, মর্টার, কেউ মেডিকেল যন্ত্রপাতি, কেউবা আমাদের কিট্‌ব্যাগ। 'মাইন'এ পা লেগে তিনজন শেষ হয়ে গেল আর কেউ গেল মেশিনগানের বুলেট বা মর্টারের স্প্লিন্টারের সঙ্গী হয়ে। গারোহিল ময়মনসিং-এর পথে নদী পেরিয়ে ছয়দিন পরে শুরু হয়েছিল আমার দুর্দিন। সেই যন্ত্রণাময় অনুভূতি আজ কান্না হয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। 'জঙ্গল সু' খুলে আবিষ্কার করেছিলাম আমার খুঁড়িয়ে চলার কারণ কি? পা দুটো হেজে গিয়ে গ্যাংগ্রিনের রূপ গ্রহণ করতে চলেছিল। সেদিনের কাঁটা বিছানো পথ আজ ফুল হয়ে হাসছে ঠিকই। কিন্তু সেইসব মানুষের কান্নার ভাষা আমি চোখ বুজলেই শুনতে পাই। কারণ ভুলে যাওয়ার গভীরেই তো থাকে অশ্রুজলের রাশি।

পুস্তক সমীক্ষা

মানুষের মুখ জলের আগুনে

জলছুরি কাটছে পাথর/অরুণ কুমার চক্রবর্ত্তী/বিশ্বজ্ঞান/দশ টাকা

আজ থেকে চার বছর আগে, বাংলা কবিতার দশ বছরের এক অধ্যায় যখন প্রায় পশ্চিমগামী, একদিকে যখন যুক্তির নিক্তিতে তাকেই যাচাই করার প্রাক্ প্রস্তুতির কলরোল দেখা দিয়েছে আলোচক মহলে, আর অন্যদিকে অস্থিসর্বস্ব বুদ্ধির ছুরিতে ঐ দশকওয়ারি ভাগের নিদারুণ চক্রান্তে তার তাবৎ লক্ষণের ছাঁচে ফেলে সহস্রাধিক কবির সহস্রাধিক কাব্যগ্রন্থের স্বকীয়তা নির্ণয় করতে গিয়ে কিছুটা নাভিশ্বাস উঠেছে পাঠকের, হঠাৎই হাতে এসেছিল ছেচল্লিশ পৃষ্ঠার এক কৃশকায় কাব্যগ্রন্থ: 'অরণ্য হত্যার শব্দে।' পাড়িনি কখনো এর আগে এই কাব্যগ্রন্থের কবির কোনো লেখা. কিন্তু দশক লক্ষণের ওই ছাঁচে ফেলার আগেই, পালিশ করা বুদ্ধির কণ্ঠরোধ করে, তাবৎ ভুয়ো মতবাদের পরিখা ডিঙিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল কয়েকটি পঙক্তি: 'চেরাপুঞ্জি দারুণ কৃপণ/মরুভূমি সিঁদ কাটে ড্রইংরুমে/গলা উঁচু উট সব/শব্দ গিলে গিলে/শব্দ গিলে গিলে/মরুদ্যান কত দূর...।' সম্পূর্ণ একমত হয়ত হতে পারিনি ঐ কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে, তবু আত্মবিজ্ঞাপনে নিস্পৃহ এই কবির বুকের গোপণ তূণ থেকে উঠে আসা আন্তরিক আবেগের, মগ্ন অনুভবের কিছু শর যেন কতকটা সরাসরি বিদ্ধ করেছিল সেদিন।

আজ, এই চার বছরের ব্যবধানে, যখন হাতে এসে পৌঁছল সেই অরুণ কুমার চক্রবর্ত্তীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ: জলছুরি কাটছে পাথর, কবিতা সম্পর্কিত আরও কিছু মতবাদ যখন বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে, তখনও কিন্তু সেই কথাগুলোই পুনর্লিখনে বাধ্য হতে হচ্ছে, মেনে নিতে হচ্ছে নির্দ্বিধায়, অপরিহার্যভাবে যে, সেই তিনিই আবার তুলে আনলেন বুকের ওই গোপন ভাঁজেই সযত্নে রক্ষিত কিছু সনিষ্ঠ উচ্চারণ; তাঁর আগেই সেই আপাত শিথিল স্বরভঙ্গীতে নয়, আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বল্পতায়ও নয়, নয় সেই মুক্তবাক্ উচ্চারণ পদ্ধতিতে; বরং আরো যেন বাক্‌পটুত্বের সন্ধানে অন্তরীণ ছিলেন তিনি এই চার বছর, অন্তরীণ ছিলেন স্বল্পবাক্ উপস্থিতিতে বাড়ো অভিজ্ঞতাকে আবদ্ধ করে রাখার দক্ষতার সন্ধানে, যা অবশ্যই তাঁর সশ্রম ও সচেতন সংযমী ও অনুশীলন সাপেক্ষ অভিনিবেশের ফলশ্রুতি।

॥ ২ ॥

অ্যাবস্ট্রাকশান নিয়ে কারবার নয় অরুণ কুমার চক্রবর্ত্তীর, দৃশ্যাতীতের অভীমুখীও নয় তাঁর কবিতা। আত্মপ্রচার বা উন্মার্গগামিতা কিম্বা উঁচু গলায়, উচ্চ স্বরে, ক্ষিপ্ত উত্তেজিত ভঙ্গীতে কথা বলার অথবা উত্তেজক সময়োপযোগী প্রসঙ্গের সোচ্চার উপস্থাপনে বাংলা কবিতার বড়বাজার গরম রাখার বা চমকপ্রদ কোনো তাৎক্ষণিক কৌশলে আসর মাৎ করার প্রলোভন বা প্রবণতা তাঁর নেই, আর যে কারণে চড়া রঙের ব্যবহারেও প্রবল অনিচ্ছা তাঁর। পরিচিত বস্তুজগৎ থেকেই, তাঁর পরিপার্শ্ব থেকেই উপাদান সংগ্রহ করেন তিনি। স্বত্তার গূঢ় দহনে, অস্তিত্বের সংগোপন রক্তক্ষরণে আহত হয়েও তিনি তাঁর সমসময়ের সংযোগহীনতা, আত্মরহীনতার

অনিশ্চিতি, পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে বিরোধ জাতীয় অস্থিরতার মধ্যে প্রাত্যহিকতার মায়া, ঘর-গেরস্থালির টানকে মিশিয়ে খুব আটপৌরে ভঙ্গীতে, আলতো মৃদু উচ্চারণে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন।

খুব সহজেই তাই বলে উঠতে পারেন এই কবি 'মানুষ তো চিরকালই নতজানু জলের কিনারে' তবু জলের আগুন থেকে সার সার উঠে আসে মানুষের মুখ [জল মানুষকে তাড়া করেছে] অথবা 'অজান্তে অজস্র রঙীন পোষাক নিয়ে আমাদের এই চলাফেরা। এই ওঠা বসা [লজ্জা লুকোবার পোষাক]। আবার সন্তার দহনেও পীড়িত হতে হয় তাঁকে। তখন নিজেরই এক গূঢ় সত্তাকে আহবান করে বলে ওঠেন 'উদাস্তে নিমগ্ন আছো বহুকাল আমার ভিতরে' [বটগাছ]। আসলে এই যে অন্তর্গত রক্তক্ষরণে আহত হয়ে ওঠেন তিনি, এর কারণ বোধহয় তাঁর রোমান্টিক মনোগঠনের সঙ্গে ক্লেদাক্ত পারিপার্শ্বের দ্বন্দ্ব।

কিন্তু এই দীর্ঘশ্বাসেই শেষ হয়ে যান না কবি। খোলা আকাশের নীচে 'রূপোর টাকার মত' চাঁদের আলোয় 'অরণ্য বালিকার' মুখের গল্প শুনে যিনি তন্ময় হয়েছিলেন, তিনিই উপলব্ধি করেছেন কে যেন কাঁচের মতো ভেঙে দিচ্ছে নির্জনতা, মনে হচ্ছে, 'এই ধ্যান, এই নিমগ্ন প্রণাম তছনছ করে, কে কাঁদলো। কে ডাকলো ওরুণ ও...রু...ণ' [ভেঙে যায় কাঁচ-নির্জনতা] আর তাই এই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেন না তিনি ; লিখতে হয় তাঁকে, 'আমি ভিতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালাম' [ঐ]।

আবার প্রাত্যহিকতার মায়া, ঘর-গেরস্থালির ভাঙন কিম্বা স্মৃতি-প্রেম-নিসর্গ বিষয়ের বিষাদ বেদনায় কাতর হতে হয় তাঁকে। তাঁর মনে হয় ভাঙনের মুখে, 'জলতলে ভেসে যায় বেনারসী কানি, ছাউনি নাড়া ফুল/পচাগলা রজনীগন্ধ/ গহিন তলদেশ থেকে কায়ক্লেশে উঠে আসে সানাইয়ের প্রথম মোহিনী' (ভাঙন ভিভিয়ে) অথচ তার পরেই লেখেন তিনি, 'তবুও/ভাঙন ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ডিঙোতে ডিঙোতে...পৌঁছে যাই মানুষের নতুন স্বদেশে (ঐ)। কিন্তু এই আত্মপ্রত্যয়, আশ্রয়ে অটল আস্থা মাঝে মাঝে হয়ে ওঠে তাঁর অসহায়তার কারণ, আর ধরা দেয় আধুনিকতার চেয়ে বেশী করে সাম্প্রতিকতার আভাস। শেষ লাইনে সার কথা বলে দেবার অভ্যাস, পথ নির্দেশের টান, প্রেমের বাক্যে ভাবালুতার স্পর্শ, যতই হোক আন্তরিকতার লক্ষণ, কিছুটা দুর্বলতারও! অন্ততঃ 'ছাতা' কবিতাটি আমার কাছে এরকমই তাৎপর্য এনেছে। যেন এই জটিলতা, এই বিষাদময়তা অতিতুচ্ছ, অহেতুক ; আর একে খতিয়েছে দেখার আগেই খুব এক সহজ আশ্রয় ওঁর কাম্য, তাতেই তৃপ্ত তিনি।

॥ ৩ ॥

মাত্র ছেচল্লিশটি কবিতার এই সংকলনে গদ্য-পদ্য উভয় ছন্দের প্রতিই কবির একটা আকর্ষণ অনুভব করা যায়, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই কিছু কিছু পতনকেও তিনি রোধ করতে পারেননি সম্পূর্ণ। প্রশ্ন উঠতো না হয়ত নিছক গদ্য হলে, কিন্তু আশ্রয় নিয়েছেন যখন পদ্য ছন্দের, তখন তার তান, মাত্রার সমতা মানা বাঞ্ছনীয়। যন্মাত্রপর্বের মাত্রাবৃত্ত রীতিকে আশ্রয়ের ক্ষেত্রেও তাঁর মাত্রাতিরেকের লক্ষণ নজরে আসে। কথাছন্দ আয়ত্ত করার পক্ষে সূক্ষ্ম মাত্রাবোধই কি আবশ্যক নয়? এত কথা বলতে হল কেন না অক্ষম বা টালমাটাল ছন্দে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ভাব-ভাবনাও অচিরেই বিনষ্ট হতে বাধ্য। যথেষ্ট আন্তরিকতা নিয়েই তাছাড়া সংকলনের দু-একটি কবিতায় আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগের প্রতি তার একটা সহজাত আকর্ষণ বা প্রচলিত শব্দকে ভাঙা-জোড়ার

দিকে কিছুটা টান লক্ষ্য করা গেলেও, সেগুলি এই সংকলনকে আলাদা কোনো Dimension দিতে পেরেছে বলে মনে হয় না ; বরং সেগুলি কিছুটা তাঁর 'Bra in cortex'-এ অনুসন্ধানের বৈপরীত্যেরই পরিচায়ক। আর একটা কথা, কবিতাকে কাব্যশূন্য করা এক জিনিষ, কিন্তু নিরাভরণ, নিরাবরণ ধরণে দৈনন্দিনতাকে কবিতায় আনার প্রয়াস বেশী দেখা দিলে ক্ষতির সম্ভাবনাই বোধহয় বেশী।

আশ্বাস তবু এখানেই যে, যদিও বিষয়াশ্রয়ের বাহুল্য অনেকক্ষেত্রে সুস্পষ্ট জীবনবীক্ষার পরিপন্থি, তাহলেও আত্মরতিবিলাপ থেকে বস্তুনিষ্ঠতার দিকে, বিষয়হীনতা থেকে বিষয়নিষ্ঠতার দিকে বাংলা কবিতা আবার বাঁক নিচ্ছে ; আর কবিতার ইতিহাস তার টেকনিকের না কনটেন্টের—এ প্রশ্ন না হয় থাক আজ ভাবী কালের উত্তরের অপেক্ষায়।

উশীনর চট্টোপাধ্যায়

সংবাদ

॥ তৃণাঙ্কুরের গল্প মেলা ও কবি সম্মেলন ॥

বিগত ১৮ এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর শ্যামনগর ভারত চন্দ্র গ্রন্থাগারে তৃণাঙ্কুর পত্রিকা গোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনায় দু দিন ব্যাপী গল্প মেলা ও কবিতা সম্মেলন হয়ে গেল।

প্রথম দিন গল্প পাঠে অংশ নেন, যথাক্রমে : নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌর বৈরাগী, পুলক চট্টোপাধ্যায়, গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন আচার্য, লক্ষ্মী দাস, গোপাল সাঁতরা, শিবশঙ্কর রায়চৌধুরী, স্বপন ঘোষ, অরুণ সরকার, দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীগোপাল ভৌমিক।

পরের দিন কবিতার দিন। মনে রাখার মত কিছু তাজা কবিতা শোনালেন গৌরাঙ্গদেব চক্রবর্তী, রাখাল বিশ্বাস, কার্তিক মোদক, সমর বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল ত্রিবেদী, অমল দাস, কমলেশ পাল, শ্যামলকান্তি মজুমদার, চির মিত্র, অমর ঘোষ প্রমুখেরা।

এই দিনই একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশে তৃণাঙ্কুর পত্রিকা গোষ্ঠী কর্তৃক সম্বর্দ্ধিত হলেন সাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, প্রীতিভূষণ চাকী, কৃষ্ণা বসু, সনৎ মান্না, দ্বিজেন আচার্য, গল্পকার গৌর বৈরাগী, অরুণ রকার, নব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘ অনলস, লিট্‌ল ম্যাগাজিন সম্পাদনার কৃতিত্বের জন্যে সম্বর্দ্ধিত হলেন শ্রদ্ধেয় ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু (একক), অশোক চট্টোপাধ্যায় (গোধূলি মন) অসিতকৃষ্ণ .দ (অতিথি) এবং কাশীনাথ ঘোষ (সন্দীপন)।

দু দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানটি সুন্দর এবং ত্রুটিহীন উপহার দেওয়ার জন্য 'তৃণাঙ্কুর' সম্পাদক গৌরাঙ্গদেব চক্রবর্তী সকলের দ্বারা প্রসাংসিত হন।

॥ প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন ॥

△ শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত কবি সাহিত্যিকদের আশ্রয় দেওয়ায় কৃতিত্ব আছে নিঃসন্দেহে কিন্তু ততটা মাহাত্ম্য নেই, যতটা আছে অখ্যাত, অপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের আবিষ্কার করায়। 'গোধূলি মনে' আপনারা দু'টি কাজই করেছেন সমানভাবে। একদিকে পত্রিকাকে আকর্ষণীয় করতে তথা মানবৃদ্ধির খাতিরে কিছু খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের স্মরণ করেছেন অন্যদিকে অপ্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিত্যিকদের আশ্রয় দিয়ে তাঁদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। তাই আপনাদের এই পত্রিকাটি একধারে কৃতিত্ব ও মহত্বের দাবীদার।

বস্তুতঃ আপনাদের এই নিরপেক্ষতার কারণেই পত্রিকাটি আমার বিশেষভাবে ভালো লেগেছে। এবং এজন্যে আপনাদেরকে আমি আন্তরিক সাধুবাদ জানাচ্ছি। নমস্কারান্তে—

শামসুন্‌ নাহার লিপি
যশোর ॥ বাংলাদেশ

প্রতিবারের মত

এবারের পূজোয় ইনরেকো রেকর্ডে সুভাষ
ঢাড়ভুম, ধলভুম ও মানভুমের প্রসিদ্ধ চারটি ভিন্ন স্বাদের
মন মাতানো ঝুমুর গান ও ১২টি গানের ক্যাসেট শুনুন।

কথা ও সুর—**সুভাষ চক্রবর্তী**

Record No—E. P.
2223—0957
INRECO

স্থানীয় ডিলারদের সাথে যোগাযোগ করুন

শিল্পীর পূর্বেকার গানের Record No—
1979—Recrd No-2223-0500 E. P. INRECO
1980—Record No-2223-0684 E. P. INRECO
1981—Record No-2223-0781 E. P. INRECO

শারদ শুভেচ্ছা সহ

বিশ্বনাথ বীজ ভাণ্ডার

উৎকৃষ্ট পাট বীজ ও সবজি বীজ বিক্রেতা

শেওড়াফুলি ॥ হুগলী

বিশেষ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

জীবেন্দু রায়ের প্রবন্ধ / কাব্যতত্ত্ব : দেশ কাল ও জিজ্ঞাসা আট—তেইশ।

কবিতা লিখেছেন :

ধীরা বন্দ্যোপাধ্যায় / চার, রবীন্দ্রনাথ রায় / চার, কৃষ্ণা বসু / পাঁচ, শিখা মল্লিক / পাঁচ, অরুণ মণ্ডল / পাঁচ, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় / পাঁচ, কঙ্কণ নন্দী / ছয়, দ্বিজেন আচার্য / ছয়, আবৃত্তি দত্ত / ছয়, মনোরঞ্জন খাঁড়া / সাত, সফিওর রহমান / সাত, ইলোরা বিশ্বাস / সাত,

কুবেন্দু বসু / চব্বিশ, ইলিয়াস হোসেন / চব্বিশ, বীণা চট্টোপাধ্যায় / চব্বিশ।

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি মন

২৫ বর্ষ / ৩য় সংখ্যা / চৈত্র ১৩৮৯

প্রতি সংখ্যা এক টাকা
বার্ষিক (সডাক) দশ টাকা

সম্পাদকীয়

প্রিয় পাঠক, ইতিপূর্ব্বে সম্পাদকীয়ে বলেছিলাম আমাদের রজতজয়ন্তী বর্ষে কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা আপনাদের উপহার দেবো। ফেব্রুয়ারী মাসে 'শুদ্ধসত্ত্ব বসু সংখ্যা' প্রকাশিত হয়েছে। ২০শে মার্চের রজতজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে বর্ত্তমান কবিতা সংখ্যা-টিও একটি বিশেষ সংখ্যা। আশা রাখি এবছরের মধ্যে আরো একটি বড় আকারের কবিসম্মেলন এবং কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ কোরব।

সেই ১৯৫৮-৫৯ সালের কথা মনে পড়ছে খুব। হাফপ্যান্ট পরা কয়েকটি ১৪/১৫ বছরের কিশোর প্রবল উৎসাহে ছোটাছুটি করছে লেখকদের বাড়ি, বিজ্ঞাপনের জন্য দোকানে-দোকানে, কখনও বা প্রেসে-প্রেসে। কাঁধে করে নিজেরাই বয়ে আনছে কাগজ—পত্রিকা ছাপার। সেই সব কিশোরেরা আজ সকলেই যৌবন পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় দাঁড়িয়ে। বর্ত্তমান সম্পাদক ছাড়া সেদিনের আর সকলেই হারিয়ে গেছে সংসার সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্ত্তে।

এই সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে, নানা অসহযোগিতার সামনে দাঁড়িয়েও পথচলা বন্ধ হয়নি 'গোধূলি' তথা 'গোধূলি-মন'এর। একদিকে তথাকথিত প্রথম শ্রেণীর কবি-সাহি-ত্যিকদের লেখা প্রকাশের সৌভাগ্য যেমন হয়েছে আমাদের—তেমনি দু'বাংলার অজস্র তরুণ প্রতিভার বিকাশের মাধ্যম হয়েছি আমরা। এর কৃতিত্ব শুধু আমাদের মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহিত্য-কর্মীর নয়—এর পেছনে রয়েছে দু'বাংলার বেশ কিছু সাহিত্য বোদ্ধা মানুষের আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা।

॥ সম্পাদক ॥
অশোক চট্টোপাধ্যায়

★ সম্পাদকীয় কার্য্যালয় ॥ নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর ॥ হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥ ভারত
★ কলিকাতা কেন্দ্র : ৩৩/৬ জি নাজির লেন, কলিকাতা-৭০০০২৩
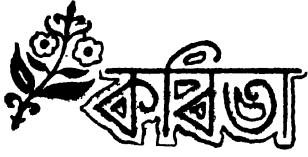
ফজলআলী হয়ে উঠি / ধীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

(শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ফজল আলী আসছে'
মনে রেখে)

ধীরে ধীরে ফজলআলী
হয়ে উঠি।
গাছের মতো-ই হয়ে উঠি।
দামাদামি মগডালে।
ক্যালসিয়ম, প্রোটিন, ভিটামিন
মাটি, বাতাস, জল এবং সূর্যকিরণ।

পোড়া দেশে ফজলআলীর
কদর বাড়ে।
জয়ধ্বনি ছড়িয়ে যায়।
প্রেতের মতো ঘোরে ফেরে
জীবন্ত মানুষ।

গাঁয়ের ছেলে বিস্ময় ছড়ায়
খরা, বন্যা, মুদ্রাস্ফীতি —
দমাতে পারেনি তাকে।
ফজলআলী হয়ে ওঠার
কসরৎ সর্বত্র-ই

ধীরে ধীরে ফজলআলী—
হয়ে
গাছের মতো-ই হয়ে উঠি

ফিরে আসি / রথীন্দ্রনাথ রায়

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে শুকতলা খয়ে যায়
গোলাপী রঙয়ের তেতলা সেই বাড়ির জানলাগুলোর
কাচ নীল সবুজ রঙয়ের পর্দা ওড়ে হাওয়ায়
টি ভি-র এ্যান্টেনা দেখা যায়
দূর থেকে বাড়িটাকে মনে হয় ছবি
কিংবা রাজবাড়ী

তিনতলায় একটা পরিবারে আমার আনাগোনা
আমার একান্ত স্বপ্ন সেখানে তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখ
নিয়ে বসে থাকে
টি ভি দেখে
গল্পগুজব করে ফুরিয়ে ফেলে বিকেল

আমরা কখনো অট্টালিকার ফুল বাগানে
রক্তপাত করি
সেখানে মাতুর পাতা ঘাস-দূর্বা মাড়িয়ে
ঈষদুষ্ণ কথপোকথন
গাঢ় থেকে গাঢ়তর ছায়া নামে
আমি অট্টালিকার কোলাপসিবল গেট খুলে
স্বপ্ন কিংবা জাগরণে
ফিরে আসি

তিনতলার ফ্ল্যাটে সে স্বপ্নাচ্ছন্ন
বসে থাকে।

মাঝখানে জেগে থাকে / কৃষ্ণা বসু

আলকাতরা রঙের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক তীব্র বাঁশির শব্দ।
এ কোনো যুদ্ধের বিউগল নয়,
কিম্বা কোনো প্রণয়ী হৃদয়ের লাল এতে লাগেনি কখনো,
ওযাগান ব্রেকারের জটিল সংকেত বাজে দমদমের রাতের বাতাসে,
ঘুম ভেঙে যায়, বেঁচে থাকবার জন্য আরো কত বেশি ক্ষরণ দরকার ?
এই কথা ভেবে শুধু নষ্ট করি ঘুম, ঘুমের আরাম,
এই সময় গুলির শব্দ আসে,—এক দুই তিন চার,
পর পর নয়টি গুলির শব্দে ছিঁড়ে যায় রাতের বাতাস,
বেকুবের মত উঠে পাশের বস্তির দিকে চাই,
ওইখানে কোনো নারী জেগে আছে।
এই শব্দে কার হৃদয়ের ঝুঁজিয়ে পড়ে রক্তের লাল ?
আমার ঘুমন্ত হাত তার সমস্ত স্নায়ু নিয়ে জেগে ওঠে
উৎসুক হাত নিয়ে জানলার বাইরে রাখি! কাকে ছুঁই ?
রাতের বাতাস ? বাড়ীতে ফেরার পথে কাল দেখলাম
গভীর মন্ত্রণা নিয়ে মগ্ন ছিল তিন যুবা,
হঠাৎ তাদের কথা মনে পড়ে কেন ?
আমি হাত দিয়ে অন্ধকার ছুঁই
আমার হাতের দৈর্ঘ্য ওপারের বস্তিকে ছোঁয় না
মাঝখানে জেগে থাকে খুব রক্তের এক নদী।

সমুদ্রে / শিখা মল্লিক

সমুদ্রে পড়েছে মন বৃথাই মৌতাত
যুবার প্রশান্ত মুখ আমাকে ভাবাল
আমার যা বন্ধ ছিল জানালা দরজা নদী
অকস্মাৎ খুলতে থাকে দুলে ওঠে অদম্য বেগ

আমি চাই, আমি চাই না
বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিকেলের ক্লান্ত ফুলের মতো
আমি চাইনা কাউকে দেখতে।
অসহ্য আমার কাছে
গতিহীন পথ চলা।
আমি চাই
সকালের সোনালী সূর্যের মতো
প্রতিটি স্তরের পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাস—
প্রতিটি মুহূর্তের চঞ্চলতা, উজ্জ্বলতা।
আমি চাই ভরা নদীর উন্মাদনা
অনিবার্য এই পথটুকু চলতে।

আমি যখন / অরুণ মণ্ডল

বৃষ্টির শব্দের সাথে তাল মিলিয়ে
ঝিমধরা সন্ধ্যায়
ঠাকুমা যখন
তাঁর ছেলেবেলার বয়সটাকে
নিমেষে ফিরিয়ে আনে
তার শরীর থেকে অঝোরে
মৌরীফুলের গন্ধ ঝরে।

আর আমি যখন
আমার সবে ফেলে আসা
দিনগুলোর কথা ভাবি
বাতাসে তার বারুদ ভাসে
সূর্যবন্দী দিনে।

অলক্ষ্যে / কঙ্কন নন্দী

এই যে একটু একটু করে গড়ে উঠছে ইমারত
তার সাথে সাথে
একই গতিতে ভাঙনের কাজ চলছে
অলক্ষ্যে

মহাকাল নিপুণ কর্মী
(তবে গড়া যত সহজ ভাঙা তত কঠিন নয়)
তার ছেঁড়া শার্ট নোংরা ধুতি কিংবা কাঁধের
গামছায়
অথবা নগ্ন পায়ের মিহি ধূসর ধূলিকণায়
লুকিয়ে রয়েছে শত ইতিহাস
আমরা শ্রমিক কৃষক রাজনৈতিক নেতা
কিংবা কবি– কবিতা পাঠক
—এসব ছোট ছোট মানুষ
ক্রমাগত একে অন্যের সাথে মিশে যাচ্ছি
তৈরি হচ্ছে মহামানব নবাগত মানুষ
জন্ম ও মৃত্যুর সাথে সমতা রেখেই
গ্রীবা তুলে তাকায় প্রকৃতি মাথা তুলে দাঁড়ায়
সভ্যতা
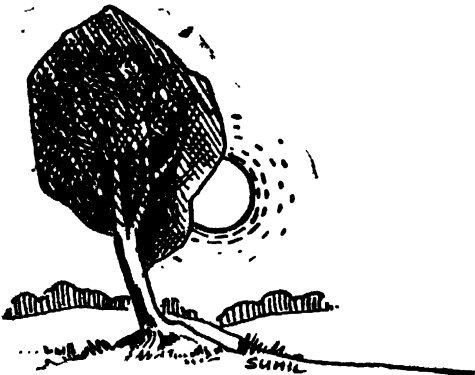
একটু একটু গড়ে ভাঙেও
সবার অলক্ষ্যে

শান্তির পালক / আরতি দত্ত

এখন কবিতায় আনবো না আর
ফুল পাখী চাঁদ
সাগর রহস্য কিম্বা কল্পনা
কেবলি থাকব না ভুলে
প্রেমিকের হাসি দেখে।

এবারে আনব একফালি রোদ
এক হাত কাপড় একমুঠো অন্ন
নিশ্চিন্ত আশ্রয় এক,
আর বৃক্ষের হাওয়া
শান্তির পালক থেকে শান্তির জল
শিশুদের হাসি সহ

পরিবার পরিজনের সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্য
স্নিগ্ধ পরিভাষায় দু'বিন্দু শান্তির উৎফুল্ল জীবন

আসাম-৮৩ / দ্বিজেন আচার্য

যেদিকে ফিরাই চোখ—অন্ধকারে জ্বলে ওঠে চিতা
আরক্তিম স্মৃতি মোছে রক্তিম অঞ্জলি
কাকে বলি : সন্নিবদ্ধ রাখ বুকে হাত—
জেনে গেছে স্বজনেরা—আসাম উৎখাত

বিবেচক যারা, তারা জেনে গেছে এর চেয়েও
বেশী— শতগুণ
অন্ধকারে জ্বলে চোখ—ছড়ায় আগুন
বিমূর্ত বাতাসে কাঁদে মানুষের শব
শবের হৃদ্‌পিণ্ড ফুঁড়ে ভেসে আসে
আগুনের গান—

মানুষ ঘুমন্ত সুখে, ক্লান্তিহীন ভেসে যায়
দুঃখের আহ্বান······

যদি অভিশাপ লেগে যায়

মনোরঞ্জন খাঁড়া

এখানে ভেঙোনা বেহুলা-শাঁখা অভিশাপ লেগে যাবে
এখানে ওভাবে ফেলোনা শাড়ীর জল
বিকেল গড়িয়ে অসুখে নিওনা ডেকে
এখানে তামার উঠোনে তুলসি-নদী একেতো ভেঙে সাতখান
হয়ে আছে।

এখানে শাড়ীর হলুদ ফেলোনা ভূমে
আচম্বিতে জেগে ওঠে যদি যাহারা শান্ত ঘুমে
এখানে কপালে তুলে নিয়ে শাঁখ সে যদি স্বর্গ চুমে
একেতো পাঁজর ক্ষুধা জর্জর মন খরাভূমি হয়ে আছে
সেরকম ভুল ফুল হয়ে যদি ঝরে তো ঝরুক অনাথা
না হয় আমাকে বইতে দিও গভীর গোপন সে ব্যথা।

দুর্বোধ্য খুন / ইলোরা বিশ্বাস

খুব দুর্বোধ্য গভীর খুন হয়েছিল,
প্রবল রক্তপাতে ভিজেছিল ভূমি—
সেখানে লোক জমায়েত হয়নি
আজও জানেনা কেউ সে খুনের গল্প,
হত্যাকারীও খবর রাখে না এ গল্পের
কিন্তু হত আছে, অবিরল আছে
আজও আছে হত্যাকারীর খুব কাছে,
হত জানে, শুধু নিজে জানে অতি দুঃখে-
বড় দুর্বোধ্য গভীর খুন হয়ে গেছে!
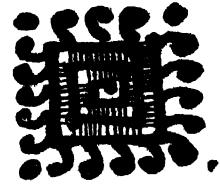
পুরোনো গাছের ফুল দিয়ে / সোফিওর রহমান

চৈত্রের শেষ বিকেলের বাতাসে প্রবীণা নর্তকীর এলোমেলো ছন্দ
দীর্ঘশ্বাস, ভাঙা বাঁশীর সুর। দেহ দিয়ে তাল-ছানা শেষ তার
প্রস্থান পথে উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি বিমূর্ত হতে থাকে
জড়িপাড় সোনা-ঝরা আসরে মানুষের শিল্প বিলাস
সৌখিন হলুদ সজ্জা, সন্ধ্যা চামেলি পেরিয়ে খুশীর নির্ঝর
গভীরে গভীর, ময়ূরের মত পেখম তুলে নাচে সেই আলিঙ্গন।

সময় হারানোর ব্যথা কোথায় এখন?
পুরোনো গাছেরই নতুন ফুল দিয়ে গাঁথা হ'ল মালা
আর কিছু নয়, এ শুধু অঙ্কের মত মানুষের এগিয়ে চলা।

কাব্যতত্ত্ব ঃ দেশ কাল ও জিজ্ঞাসা

জীবেন্দু রায়

অতুলচন্দ্র নমস্য। নমস্য এই কারণে যে রসের অলৌকিকতা, কবির নির্মোহ প্রকৃতি, কাব্য বা কবিতার বিশ্বজনীনতা এবং অন্যফলনিরপেক্ষভাবেই কাব্যের পরমমূল্যের প্রতিষ্ঠা এগুলি তিনি যথোচিত আধুনিকতায় আলোচনা করেছেন; কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড়ো কীর্তি হলো প্রাচীন কাব্যতত্ত্বের প্রযোজ্যতা আধুনিককালে কতখানি তার পরিমাপে। পূর্বোক্ত অংশগুলির তিনি তুলনাহীন আলোচক, পরবর্তী অংশে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশ্লেষণধর্মী সমন্বয়, ফলত তাঁর ভূমিকা অনেকটাই নতুন ভাষ্যকারের মতো। সুবোধ সেনগুপ্ত বলেছেন আনন্দবর্ধন অভিনব গুপ্তের পরেই তাঁর স্থান। অবশ্য দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মশাইও আছেন।

অতএব অতুল গুপ্তের বইয়ে আমাদের দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। কাব্যতত্ত্ব কোনো স্ট্যাটিক স্থাণু বিষয়মাত্র নয়। তাকে নিয়ে জিজ্ঞাসাও প্রভূত। আলোচনাও সব সময়েই হচ্ছে। তাছাড়া তার ধারাও সুদূর বিস্তৃত। এদিকে ভরত ধরলে ওদিকে অ্যারিস্টটল—সেই সঙ্গে নানারকম বিপরীতমুখী স্রোত। সেই কথাগুলিই আলোচনা করলে কাব্যতত্ত্বের প্রবেশ পাঠের পর পর্যায়ের মাত্রা বাড়ে। সেখানে আলোচনার অন্ত নেই।

এক

যা সুন্দর তাই রস। পুরাতন বিশ্লেষণে তার সৃষ্টি আবার বিভাব অনুভাব আর সঞ্চারীর যোগে। ভরত মুনির ব্যাখ্যা সেইভাবেই। এবং তাই গৃহীত। ভাবের সঙ্গে রসের সম্পর্ক ওতপ্রোত যদিও ভাব কদাচ রস নয়। ভাব থেকেই অবশ্য রসের সৃষ্টি।

এই রসের অনুভব অ-লৌকিক। লৌকিক জ্ঞান বা প্রমাণ থেকেই যে শুধু এর ভিন্নতা তা নয়, লৌকিক সুখ দুঃখ থেকেও এর স্বাতন্ত্র্য সুচিহ্নিত। জগন্নাথ তাঁর রসগঙ্গাধরে বলেছেন লৌকিকভাব (Primary emotion) হৃদয়েরই বৃত্তি। এই লৌকিকভাব যখন ব্যক্তির পরিমিতিত্ব থেকে আরও প্রসারিত হয় অর্থাৎ যেখানে ব্যক্তিবিশেষের অনুভব, দেশকাল বিশেষের সত্য বহুজন অনুভবে সিদ্ধ হয়, সত্য যখন দেশকালাতিশায়ী—এই সাধারণীকৃত অবস্থাই রস।

এখানে অ্যারিস্টটলের কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিশেষ করে 'ইমিটেশন' তত্ত্ব পাঠক সহজেই স্মরণ করতে পারবেন। তিনি যাকে শিল্প বা কাব্যের অনুকরণ বলে আলোচনা করেছেন তা কখনই প্রকৃতি বা বস্তুজগতের অবিকল প্রতিফলন নয়। কবি একটা বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর অনুকরণ করতে গিয়ে যা সৃষ্টি ক'রে তোলেন তা 'সামান্য'। তা সর্বজন প্রযোজ্য—'য়ুনিভার্সাল স্টেটমেন্ট'।

এসব একটু অসদৃশ শোনাচ্ছে। কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া একই। অতুলচন্দ্রের উদ্ধৃত সেই ক্রোধের কথাগুলিও তো তাই। সেখানে বলা হয়েছিলো কবির দৃষ্টির সংকীর্ণতা বা সীমাবদ্ধতা হচ্ছে তাই যেখানে কবি ব্যক্তিবিশেষের আবেগ প্রক্ষোভ বাসনা বা সংরাগকে সার্বিকের প্রেক্ষাপটে রাখতে পারেন না—পরিভাষায় যা সকল হৃদয়বান জনের হৃদয়সংবাদী নয়। বিক্ষুব্ধ এবং নিতান্ত অহংকেন্দ্রিক ভাবকে যখন প্রশান্ত ধ্যানের জগতে পৌঁছে

দেওয়া হবে তখন তো রসের প্রসন্ন আবির্ভাব। 'পোয়েটিক আইডিয়ালাইজেশন' হচ্ছে সেই শক্তি যা রস সৃষ্টির এই প্রক্রিয়া এবং পরিণামটিকে সম্ভব করে।

এ অনুভূতি অলৌকিক বটে কিন্তু অলীক কি? না তা নয়। আলংকারিকেরা চিদ্‌গত আবরণ ভঙ্গের কথা বলেছেন। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলা যায় আমরা যাকে চিদ্‌শক্তি বলে মনে করি প্রকৃতপক্ষে তা স্বাধীন নয়। কোনোখানে একে অভিভূত করছে সুখ দুঃখের অনুভব, কোথাও বা সত্য মিথ্যার দুরূহ প্রশ্ন। কোথাও ব এই চিদ্‌ নিতান্তই নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণকারী। যেখানে এইসব বাধার আবরণ সরে যায় সেখানে এর যে নির্বিঘ্ন অনাবরণরূপের প্রকাশ ঘটে তা অখণ্ড আনন্দের। চৈতন্য এখন সমস্ত প্রতিবন্ধকতা পার হয়ে নিজেকে উপলব্ধি করছে—রসের অবস্থা তো এই। তা অলীক হবে কি করে? মনের প্রাথমিক আবেগভাব বা বৃত্তিগুলিই তো তার লৌকিকতার আবরণটুকু সরিয়ে রেখে আনন্দময় চৈতন্যের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে যায়।

দুই

আনন্দবর্ধনের ব্যঞ্জনা বা ধ্বনিবাদের আলোচনার প্রবেশক হিসেবে প্রয়োজন শব্দের শক্তি নিরূপণ। এইটিই প্রাথমিক। শব্দের তিনি দু'রকম অর্থ ধরেছেন। এক বাচ্য, দুই, বাচ্য থেকে যা ফুটে উঠছে যা আভাসিত হচ্ছে—পরিভাষায় 'প্রতীয়মান'—'বাচ্যাতিরিক্ত ধর্মান্তরের অভিব্যঞ্জনা'।

শব্দও সব সময় কিন্তু একই ধরণের অর্থ পাঠকচিত্তের কাছে গোচর করেনা। কাব্যের যা লোকপ্রচল অর্থ সেটিকেও প্রধান-অপ্রধান দু'রকম ভাগ করতে আপত্তি নেই। প্রধান সেটি যা শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দ্ব্যর্থহীনভাবে আমাদের মনে গেঁথে যায়। মাঝে মাঝে বাধা আসে। যেমন 'নরচন্দ্রমা' শব্দটি। শব্দটিকে অভিধা দিয়ে ধরলে অর্থোদ্ধার হবেনা। চাঁদের মতো মধুর অপরূপ দীপ্তিময় এমন কিছুর সাহায্যে 'নর' শব্দটিকে গ্রহণ করতে হবে। কবি অবশ্যই সব কিছু নতুন করে দেন। যে আলো কোথাও কখনও নেই বা ছিলোনা তাও তিনি সহৃদয়জনকে দেখিয়ে দেন। সেই কারণে প্রতিটি শব্দ কেবলমাত্র অভিধাশক্তি সম্বল করে একটি মাত্র অর্থ প্রকাশেই ক্ষান্ত হয়না, বাচ্যার্থ অতিক্রম করে অন্য একটি অর্থকে সংকেতিত বা আভাসিত করে। অবশ্যই তার জন্য প্রতিভার প্রয়োজন। দু একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে উপলব্ধির গভীরতা ও বিস্তৃতির স্বার্থে। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' কবিতাটি। তার কিছুটা মূল কাব্য থেকেই উদ্ধৃত করছি।

স্বপ্ন

'দূরে বহু দূরে / স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনী পুরে / খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী পারে / মোর পূর্বজন্মের প্রথমা প্রিয়ারে। / মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে, / কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে, / তনুদেহে রক্তাম্বর নীবিবন্ধে বাঁধা, / চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা। / বসন্তের দিনে, ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে। / হেনকালে হাতে দীপশিখা / ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা। / দেখা দিল দ্বারপ্রান্তে সোপানের পরে / সন্ধ্যার লক্ষ্মীর মতো সন্ধ্যাতারা করে। / অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ কেশধূপবাস / ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিঃশ্বাস। / প্রকাশিল অর্ধচ্যুত বসন-অন্তরে / চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে। / দাঁড়াইল প্রতিমার প্রায় / নগর গুঞ্জন ক্ষান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়। / মোরে হেরি প্রিয়া / ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া / আইল সম্মুখে— মোর হস্তে হস্ত রাখি / নীরবে শুধালো শুধু সকরুণ আঁখি / 'হে বন্ধু আছ তো ভালো'? মুখে তার চাহি / কথা বলিবারে গেনু, কথা আর নাহি। / সে ভাষা ভুলিয়া গেছি, নাম দোঁহাকার / দুজনে ভাবিনু কত মনে নাহি আর। / দুজনে ভাবিনু কত চাহি দোঁহা পানে, / অঝোরে ঝরিল

অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে। ./ দীপ দ্বারপাশে কখন নিবিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে। / শিপ্রানদী তীরে | আরতী থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে'।

কবিতার কথা স্পষ্ট। কবি তাঁর জন্মান্তরের প্রেয়সীর অন্বেষণে ব্রতী। প্রেয়সীর সঙ্গে দেখাও তাঁর হয়েছে। প্রেয়সীর রূপের বর্ণনাও সঙ্কোচহীন। অঙ্গের মদির 'কুঙ্কুমগন্ধ' 'কেশধূপবাস' যেমন আছে তেমনি স্খলিত বসনের অবকাশে দৃশ্যমান 'বামপয়োধরের' উপর 'চন্দনের পত্রলেখা'ও বাদ নেই। কিন্তু এ সাক্ষাৎ বচনহীন। সকরুণ আঁখিতে উচ্চারণহীন জিজ্ঞাসা আছে, কিন্তু জন্মান্তরের ভাষাতো উভয়েই বিস্মৃত, তাই নামটুকু পর্যন্ত ধরা দিলো না। এই বাচ্য অর্থের ব্যঞ্জনা হিসেবে সহৃদ। পাঠক যা অনুভব করেন তা বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রস। এ বিচ্ছেদ ব্যবধান কেবল বিশেষ কোনো নারীপুরুষের বিরহবিচ্ছিন্নতার কথা মাত্র নয়, সকল কালের পক্ষেই সে বিচ্ছিন্নতা সত্য। এ বিচ্ছেদ আর একদিকে রূপময় প্রাচীনের সঙ্গে জীর্ণ অধুনাতন কালের। তাছাড়া সমস্ত প্রেমই খণ্ডিত, অপূর্ণ। সব আকাঙ্খাই শেষত কোনো না কোনো অর্থে প্রতিহত। স্বপ্ন ও সিদ্ধির মধ্যে দুস্তর দূরত্ব। এ বিচ্ছিন্নতা বা দূরত্বের বীজ ব্যক্তিস্বরূপের গভীরে। মানসী কাব্যের মেঘদূত কবিতা থেকে কয়েকটি পঙ্ক্তি এই সূত্রে তুলনাহীন।

'কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে যায় / রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা, / লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা / চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিনী প্রিয়া / অনন্ত সৌন্দর্য মাঝে একাকী জাগিয়া ··· / ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান, / কে দিয়েছে হেন শাপ. কেন ব্যবধান ? / কেন ঊর্দ্ধে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ ? / কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ ? / সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে, / মানস সরসীতীরে বিরহশয়ানে / রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে / জগতের নদীগিরি সকলের শেষে।'

এতো কবিতা। এই সঙ্গে 'মেঘদূত' গদ্য রচনাটিও পাঠক অনায়াসে স্মরণ করতে পারবেন। ম্যাথু আরনল্ডের বিচ্ছিন্ন দ্বীপবৎ মানুষের কথা কবিতো বিরহীযক্ষের মধ্যেও প্রত্যক্ষ করেছেন। বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের কথা আগেই বলেছি। তার সঙ্গে এ বাক্যগুলি জুড়ে দেওয়া যায়—'হে নির্জন গিরিশিখরের বিরহী. স্বপ্নে যাহাকে আলিঙ্গন করিতেছ, মেঘের মুখে যাহাকে সংবাদ পাঠাইতেছ, কে তোমাকে আশ্বাস দিল যে, এক অপূর্ব সৌন্দর্যলোকে শরৎ পূর্ণিমা রাত্রে তাহার সহিত চিরমিলন হইবে।'

রবীন্দ্রনাথের রসোপলব্ধিতে এই চিরায়ত বিরহ বিচ্ছিন্নতার কথাই মেঘদূত কাব্যের ধ্বনি।

একটি গুরুতর প্রশ্ন এই সূত্রেই উঠেছে। সে প্রশ্ন স্বয়ং শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো আলোচকের। তার তীক্ষ্ণতাও এক হিসাবে অপ্রতিরোধ্য। একথাও প্রতিবাদহীন যে আধুনিক সাহিত্যবিচারের যে মানদণ্ড তার সঙ্গেও প্রতিযোগিতায় আত্মপ্রকাশ করতে ধ্বনিবাদের তেমন অসুবিধে হবার কথা নয়। এর সূক্ষ্মতার তুলনায় গ্রীক সমালোচনাও নাকি বহুলাংশেই তথ্য নির্ভর বহিরঙ্গব্যাপার। যদিও এই সূক্ষ্মতার মাত্রা বা তার পরিণামী প্রকৃতি নিয়ে অনেক আলোচনা চলতে পারে। এবং সেখানে দেখা যাবে প্রভেদ আনন্দবর্ধন অভিনবগুপ্তের মধ্যেও রয়েছে। বিভাব অনুভাবের পরম্পরা নিয়েই এ প্রভেদ। অভিনবগুপ্তের মতে বিভাব প্রভৃতিই প্রধান। প্রধান এই অর্থে যে তারাই রস সৃষ্টির কারণ। তবে সে আলোচনায় যথেষ্ট পরস্পর বিরোধিতা আছে। বিশেষ করে লৌকিক ভাব কেমন করে লোকোত্তর রসে পরিণত হয় এ কথা বলতে গিয়ে রসের উপাদানকে একবার বলছেন, লৌকিক, একবার অলৌকিক। অন্যদিকে আনন্দবর্ধন আবার রসকেই বলেছেন মুখ্য প্রবর্তনা, বিভাব অনুভাব সবই এর বশ। তাছাড়া রসের

লোকোত্তর প্রকৃতি আসলে নিষ্পন্ন রসেরই অবস্থা। তাকে উপাদানের খর্ব করলে চলবে কেন? এছাড়া আরও জিজ্ঞাসা আছে। সূক্ষ্মতা সৃষ্টির জন্যে এর অতিমাত্রায় নিয়মানুগতা একে শেষ পর্যন্ত এত বস্তুভারপীড়িত করে তুলেছে যে তা স্থূলতরাই অন্তত্র প্রকার হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া মানবমনের অন্দর মহলের বহুবিচিত্র বিভাজন রস ভাবের বাঁধাবাঁধিতে কতখানি সঠিকভাবে ধরা পড়ে তা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। 'মহাসমুদ্রের প্লাবন'কে 'কৃত্রিম অববাহিকার' পথে কতদূর প্রবাহিত করে দেওয়া যেতে পারে? 'সমালোচনা সাহিত্য'র গ্রন্থ পরিচিতি অংশ থেকে শ্রীকুমার বাবুর মন্তব্য তুলেই বলা যায়, 'বাহিরের উপকরণে বদ্ধদৃষ্টি সমালোচনা ক্রমশঃ অন্তর গভীরতার অনুভূতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। রসের অলৌকিকত্বের স্বাদবৈচিত্র্য রসনায় ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছে- রন্ধন সামগ্রী সমাবেশ রন্ধন নৈপুণ্যের মর্যাদা খর্ব করিয়াছে। কাব্যের এই অলৌকিকত্বের প্রকৃতি বিশ্লেষণ ক্রমশঃ গৌণ হইয়াছে।'

শ্রীকুমার বাবুর আপত্তি এখানেই শেষ হচ্ছেনা। আরও আছে। বিশেষ করে যাঁরা এই প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের মতবাদের বিশ্বজনীনতা বা পৃথিবীর সমস্ত দেশের ও কালের সাহিত্যে এর প্রযোজ্যতা খোঁজেন বা প্রতিষ্ঠা করেন তাঁদের বিরুদ্ধে তাঁর সোজা কথা হলো যে এ মত প্রমাদমুক্ত নয়। তাঁর কথা-রসের সৃষ্টি বা রকম ফের নিয়ে এত যে আলোচনা, রসসৃষ্টির সার্বিকতা, 'অখণ্ড ও স্ববিরোধহীন' পূর্ণাবয়বতা নিয়ে এত যে প্রচার আনন্দবর্ধন অভিনবগুপ্ত কি রসবৈশিষ্ট্যের সেই সমগ্র মূর্তিটি দেখতে পেয়েছিলেন। মেঘদূতের যে ব্যঞ্জনা রবীন্দ্রনাথ তন্ময়তার সঙ্গে অনুভব করেছিলেন যা বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার তো বটেই, তার সঙ্গে অতিরিক্ত আরোও কিছু—তার সমগ্রতা প্রাচীন ধ্বনিবাদীদের কাছে ধরা পড়েনি বলেই ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছেন।' কাব্যালোক' বইয়ে সুধীর দাসগুপ্তও মহাভারত থেকে এ জাতীয় একটা ব্যঙ্গ্যের সন্ধান করেছেন, কিন্তু সে তো আনন্দবর্ধন বা অভিনবগুপ্তদের কোনো সামগ্রী নয়। এই কথাটাই পরিষ্কার করে ভেবেছেন তিনি এবং সেই হেতুই তাঁর জিজ্ঞাসা সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে এমন কোনো দৃষ্টান্ত কি প্রাপ্তব্য যার থেকে মনে হওয়া সম্ভব যে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, উত্তরচরিত প্রভৃতি রচনায় ব্যাপ্ত রসের সমগ্র মূর্তিটি এইসব আলোচকের কাছে কাছে ধরা পড়েছিল? বাক্‌সৃষ্টির বা বাক্‌নির্বাচনের পিছনে স্রষ্টার যে মনটি কাজ করছে তার 'সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতনতার অবকাশই বা কই? শকুন্তলায় যে প্রেম সৌন্দর্য আর মঙ্গলের কথা রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন সে অনুভবে তিনি একক। এ ব্যঙ্গার্থ বিশেষ করে উনিশ শতকেরই আবিষ্কার। সুতরাং 'কাব্যরসের সামগ্রি বিচার সম্বন্ধে আগ্রহ' 'প্রাচীন সমালোচনারীতিতে লক্ষ্য করা যায়না বলে যে অভিযোগ শ্রীকুমার বাবু এনেছিলেন তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

সুশীলকুমারও এমন একটা কথা বলতে চেয়েছেন। 'স্টাডিজ্ ইন দি হিষ্ট্রি অফ স্যানস্ক্রিট পোয়েটিক্স্' বইয়ের দ্বিতীয়খণ্ডে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব জিজ্ঞাসায় দুটি বস্তুর অভাবের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। কবিমন ও কাব্যবস্তু। সহজ করে বললে দাঁড়ায় কবি যা সৃষ্টি করলেন, সেই কাব্য বিষয়ের প্রকৃতি কি, আমাদের প্রপিতামহেরা সে কথায় গুরুত্ব দেননি। অথচ প্রতীচির কাব্যতত্ত্বের তাই প্রধান অন্বিষ্ট। এখানে সুশীলকুমারকে যে বোধ বা প্রেরণা অনুক্ষণ মথিত করছে তা তো একটা আধুনিক পশ্চিমী ব্যাপারই। 'Criticism of life' বা 'higher interpretation of life' যাই হোক না কেন।

অমলেন্দু বসুর 'সাহিত্যের ইতিহাস ও সাহিত্য সমালোচন।' প্রবন্ধটি এখানে ভাবতে পারি। তাতে অভাববোধের মাত্রা বাড়ে। শ্রীবসুর বলায় অবশ্য অভিযোগের সুর ঠিক নেই, আছে বিবৃতির গড়ন। তিনি লিখেছেন আমাদের কাব্য বা সাহিত্যে অলংকারবিদ্ বা তাঁরা কারেরা সম্পূর্ণ অভিনিবেশশীল ছিলেন কেবলমাত্র কাব্য বিষয়ে। কবির জীবনকথা বা Time space এর সঙ্গে কবির যোগ কতখানি তন্ময় এসব আলোচনা তাঁরা করেননি। প্রাচীন

ইতিহাসের ধারাপথে ভারতীয় মন ব্যক্তিসত্তার মানদণ্ডে শিল্পমূল্য নিরূপণ করতে পারেনি। একটু অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, 'নদীর চূর্ণিত তরঙ্গগুলি স্বতন্ত্র নয়, অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের অঙ্গীভূত, space and time এর অন্তর্গত, মহাকালের স্থান ও কালশাসিত অংশমাত্র'— এ বোধ আমাদের কাব্যশাস্ত্রে অনুপস্থিত। যে ব্যাপারটিকে শ্রীকুমার বাবু অন্য দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন 'শকুন্তলার মৃগ চুস্তনের বর্ণনাটি সুস্পষ্ট, উজ্জ্বল চিত্র হিসাবে উপভোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাতে কি পলায়মান মৃগশিশুর হিমস্পর্শ আতঙ্ক শিহরণটুকু সম্পূর্ণভাবে অনুভব গোচর হইয়াছে? সুন্দর শব্দ-পরম্পর-গ্রথিত যথাযথ গুণসম্পন্ন এই চিত্রে কি মৃত্যু ভয় রূপ ধরিয়া আমাদের কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ হইয়াছে? বিশেষতঃ সমস্ত শকুন্তলা নাটকের সহিত এই খণ্ডাংশের ভাবগত সামঞ্জস্যের কোনো লক্ষণই আলোচিত হয় নাই।'

এতো অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ! এই জাতীয় ব্যাপারকেই ক্রোচে বলেছিলেন 'in capacity of seeing particular passions in the light of human passion, aspirations in the fundamental and total aspiration, partial and discordant ideals in the ideal which shall compose them in harmony.' ['European Literature in the Nineteenth Century'—অতুলচন্দ্র 'কাব্য জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে এর থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।]

এই অখণ্ড ঐক্যসূত্রের সর্বজনগামী বা উপলব্ধ কোনো ব্যঞ্জনার বিষয়টি নিয়েই সংশয় দেখা দিয়েছে। 'সমালোচনা সাহিত্য'র গ্রন্থপরিচিতি অংশে প্রতীচীর সাহিত্য সৃষ্টির তুলনায় সংস্কৃতের চূড়ান্ত দীনতার কথা বলেছেন শ্রীকুমারবাবু। য়ুরোপের, সাহিত্যে যে পরিণত অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে উপলব্ধ 'ব্যক্তিত্বরহস্যের স্বচ্ছদর্পণে যে সার্বভৌম ব্যঞ্জনা' আভাসিত হয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যে সেরকম কিছু নেই। 'এখানে সাধারণীকরণের ভিত্তি অপরিণত ব্যক্তিত্বের উপর শ্রেণীদ্যোতক ব্যঞ্জনার আরোপ।'

এ নিঃসন্দেহ যে সুশীলকুমার বা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের যে যে অভাবাত্মক দিকগুলির কথা বলেছেন তা বহুলাংশেই যথার্থ—প্রকাশের রুক্ষতা অনুচিত হলেও। যদিও একথা বলতেও বাধা থাকার কথা নয় যে, প্রাচীন কাব্যতত্ত্বের আলোচনায় যে বোধ বা মানদণ্ড এঁরা ব্যবহার করেছেন তার প্রায় সবটাই য়ুরোপীয়। অখণ্ডত্ব অনুধ্যানের বীজ অ্যারিস্টটলের 'ইমিটেশন' তত্ত্বের মধ্যে অবশ্যই বিদ্যমান, তাছাড়া আছে কোলরীজ ব্রাডলির রোমান্টিক, ভিক্টোরিয় 'আইডিয়ালাইজেশন' সেই সঙ্গে ক্রোচে। জীবন সম্পর্কে নতুন বোধ নতুন ভাষ্য এক্ষেত্রে অনেকটা অবচেতনার মতো। সেই জন্যেই শ্রীকুমারবাবুরা অনুযোগের বদলে প্রকাশ করে ফেলেছেন ক্ষোভ ও উষ্মা। এই ধরণেও আলোচনায় আমার মনে হয় এক ধরণের অনাবশ্যক ঝোঁক প্রাধান্য পায়। সেই ঝোঁকে নির্বাচিত সৎ অংশগুলির সম্যক্ প্রযোজ্যতার আলোচনার বদলে অভাবাত্মক দিকগুলির কথাই বড়ো হয়ে ওঠে। অভাবাত্মক দিকগুলির আলোচনার প্রয়োজন আছে বৈকি, না হলে পুজোই হবে—কিন্তু হাজার বছরের পুরোনো সাহিত্যতত্ত্ব আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব বা আদর্শের ক্রমপ্রসারণশীল বোধ ও নিরীক্ষার মাত্রার সঙ্গে সঙ্গে কেমনভাবে জায়গা বিশেষে অদ্ভুত বিসদৃশ হয়ে পড়ছে, আলোচনার এই পদ্ধতিই সর্বোত্তম। না হলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের মতো সাহিত্যতত্ত্বেও পরম আপ্তবাক্যটি পেতে চাচ্ছি আনন্দবর্ধন অভিনবগুপ্তের কাছে! আমার কথা—সাহিত্যের সামগ্রীর পরিবর্তন বা বিবর্তনের কথা যেমন কৌতুহলোদ্দীপক, সাহিত্য বিচারের পদ্ধতির পরিবর্তন বিবর্তনের মধ্যে কোন প্রবর্তনা কাজ করছে সেইটিই বা কম আকর্ষণীয় কিসে!

এরকম একটি অনর্থক ঝোঁকের দৃষ্টান্ত রয়েছে ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের 'বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি' বইয়ে রসতত্ত্বের আলোচনায়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অনুভব করেছেন যে অলংকারবাদ যথোচিত মূল্য পায়নি। ভামহ, দণ্ডী একাদশ

শতাব্দীর বক্রোক্তিজীবিত কার কুন্তক, কিছুটা কুন্তকের ধারায় তাঁরই সমকালীন অচ্যুত রায়, মথুরানাথ, অরুণাচলনাথ এঁদের প্রকৃত অভিপ্রায় বা প্রতিপাদ্যকে মান্যতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ডঃ দাসের বক্তব্যটি উদ্ধৃত করলে অভিযোগের প্রকৃতিটি আরও স্বচ্ছ হবে। 'কাব্য ও অলংকৃতি' পরিচ্ছেদে তিনি লিখেছেন—'রসধ্বনিবাদের পূর্বেকার অলংকারিকেরা বিশেষ বিশেষ অলংকারের অতিরিক্ত কাব্যের প্রাণস্বরূপ কোনও বস্তুর নির্দেশ দেননি একথাও ভূতার্থবাদ নয়। তাঁদের অভিপ্রায়কে দেহাত্মবাদ নাম দিয়ে উপেক্ষা করলে আমাদের ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। ইংরেজি আলোচনায় যাকে Beauty বলা হয়, কাব্যের যা অন্তরঙ্গ বস্তু, সেই পরম বৈচিত্রীকেই এঁরা বিভিন্ন ভাষায় উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। নতুবা কাব্যের শব্দার্থময় একটা দেহ গঠন করে নিয়ে পশ্চাৎ-এ কয়েকটা বিশেষ বিশেষ ভূষণ আরোপ করার উপদেশ এঁরা দেননি। তাঁদের বিশেষ বিশেষ অলংকারের আলোচনা এই সৌন্দর্য উপলব্ধিকে কেন্দ্র করেই। তাঁদের কাব্যদেহও সাধারণ দেহ নয়, গুণময়, বিশিষ্ট পদরচনায় সমুজ্জ্বল দেহ এবং তাঁদের অলংকারও সাধারণ অলংকার নয়, কাব্য শোভার প্রাণস্বরূপ, বাচ্যা বাচকের একাত্মতা বিধায়ক।'

ডঃ দাসের ঝোঁকটি কোনদিকে তা অনুধাবনের জন্য তাঁর আরোও দুটি কথা সংক্ষেপে ব্যবহার করতে পারি। যেমন (ক) ভামহ, দণ্ডী বা বামনের মতো অলঙ্কারবিদেরা বিশেষ বিশেষ অলংকারকে কাব্য সৌন্দর্যের হেতু হিসেবে চিহ্নিত করলেও 'সর্বালংকার সারস্বরূপ চমৎকৃতির'র ব্যাপারটাই যে সর্ব প্রধান একথা তাঁরা ভোলেননি। (খ) রসবাদীরা নিজেদের অভিপ্রেত তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য 'এই বক্রোক্তি বা চারুত্বাতিশয় বা বৈচিত্র্যসার সম্পৎটি গ্রাহ্য করেননি। এই ব্যাপারটিকে তাঁরা অস্বীকার করেছেন বলা ভালো। অলংকৃতি বলতে বিশেষ কিছু অলংকারের ধর্মকেই বুঝেছেন। শুধু তাই নয় রসপ্রস্থানের অন্যতম আচার্য মম্মটভট্ট কাব্যলক্ষনে অলংকারের সঙ্গে কাব্যের সম্পর্ক 'অনিয়ত' বলেই নির্দেশ করেছেন। রসবাদীদের এ জাতীয় পক্ষপাতিত্বের তুলনায় ধ্বনিবাদীরা কিন্তু সমন্বয়ধর্মী। ডঃ দাস আবার একই সঙ্গে একথাও স্বীকার না করে পারেন না যে, ধ্বনিবাদ পূর্বেকার সৌন্দর্যবাদ এবং পরবর্তী রসবাদের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে চেয়েছে'।

আমার বক্তব্য—তাই যখন স্বীকার্য তখন এত কথা 'বকুনি' মাত্র—এক অর্থে পণ্ডশ্রমও বটে। কাব্যতত্ত্বে যিনি যতমূল্যবান কথা বলার দাবী রাখুন না কেন, আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্তের তত্ত্ব বা অভিপ্রায়ই শেষ পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত পূর্ণের মূল্যে হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। 'অপেক্ষাকৃত' কথাটি বললাম এই কারণে যে শ্রীকুমার বাবুর কথা আমাদের মনে আছে।

সুতরাং সেই বহুজনবিদিত ধ্বন্যালোকের বচন ব্যবহার করাই শ্রেয় যেখানে বলা হয়েছিলো মহাকবিদের শ্রেষ্ঠ কাব্য মাত্রেই দেখা যায় তার ভাষা অলংকার এবং ভাব 'অপৃথকযত্ননির্বর্ত্যঃ', অর্থাৎ তার জন্য কবিকে কোনো স্বতন্ত্র শ্রম বা যত্ন নিতে হয়নি। রসবস্তু এবং অলংকার কবির একপ্রযত্নেই সিদ্ধ হয়েছে। আনন্দবর্ধনের মত অনুসারে কবির যে রসসৃষ্টি তার ভিত্তিই তো বাচ্য। কিন্তু বাচ্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা তার কদাচ ঘটেনা, তারা কাব্যরই অঙ্গ।

ধ্বন্যালোকের 'লোচন' টীকার বাংলা 'বাসুদেব' ভাষ্যে বলা হয়েছে অলংকরণের প্রধান কথা রসভাব প্রভৃতি তাৎপর্যকে সুপরিস্ফুট করা। অংলকার সজ্জা সেই উদ্দেশ্যেই। রসকে পুষ্ট করাই এর অভিপ্রেত। রসসৃষ্টির অনুকূল ভাবে অলংকৃতি ঘটলেই তাদের অলংকারীত্বর সিদ্ধি। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে কাব্যের আত্মা তার রসধ্বনিই হচ্ছে অলংকার্য। নানাবিধ অলংকারে শরীর যে সাজানো হয় তাতেও চিত্তবৃত্তিবিশেষের পক্ষে সঙ্গতিপূর্ণ ঔচিত্য সূচক বলে চৈতন্যময় আত্মাই প্রকৃতপক্ষে অলংকৃত হয়। অলংকার প্রয়োগের প্রধান নিয়মই হচ্ছে—'আত্মগত চিত্তবৃত্তিবিশেষের

ঔচিত্য'। সেই ঔচিত্যবোধ অনুসরণ করেই অলংকারের ব্যবহার। দেহের নিজস্ব ঔচিত্য বা অনৌচিত্য বলে কিছু নেই। মৃত দেহে অলংকার সজ্জা কি সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে? না, কারণ সেখানে অলংকৃত করা হবে এমন কোনো চেতন বস্তু উপস্থিত নেই আবার যোগী বা সন্ন্যাসীর শরীরে অলংকারযোজনা হাস্যকর—কারণ অনৌচিত্য।

অলংকার সন্নিবেশের নিয়ম নির্দেশ করে ধ্বন্যালোকের দ্বিতীয় উদ্যোতে বলা হয়েছে, 'রসপর করিয়াই অলংকারের বিবথা হইবে, অঙ্গিরূপে কখনও নয়। সময়মত তাহার গ্রহণ ও ত্যাগ হইবে এবং অত্যন্তভাবে (প্রকটভাবে) তাহার নির্বাহ হউক—এরূপ ইচ্ছা থাকিবেনা। আর যদি সেইভবে নির্বাহ হয়ও, তাহা হইলে যত্নসহকারে পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে যে তাহা যেন অঙ্গরূপেই থাকে; এইভাবে রূপকাদি অলংকার সমূহের অঙ্গত্বসাধন হইয় থাকে।

রসসৃষ্টিতে অতিরিক্ত মনোনিবেশকারী কবি যে অলংকারকে রসের অঙ্গরূপে ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, (তাহার উদাহরণ) যেমন—

হে মধুকর। তুমি বেপথুমতী নারীর চঞ্চল কটাক্ষযুক্ত নয়ন বহুবার স্পর্শ করিতেছ; তুমি ইহার কর্ণের নিকট বিচরণ করিয়া অন্তরঙ্গ সখার মত মৃদু মৃদু শব্দ করিতেছ; হস্ত দুইটি প্রকম্পিতকারিণীর রতি সর্বস্ব অধর তুমি পান করিতেছ; আমরা তত্ত্বান্বেষণ করিতে গিয়া মরিলাম; তুমিই প্রকৃতপক্ষে কৃতী' *

এখানে ভ্রমর-স্বভাবোক্তি অলংকারটি রসের অনুকূলই বটে।

বাংলায় 'বাসুদেব' ভাষ্য অনুসারে এর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অলংকার হবে রসপরতন্ত্র এবং অঙ্গি হিসেবে তার কখনই প্রয়োগ হবেনা। রসসৃষ্টির প্রয়োজনেই অলংকারের গ্রহণ ও বর্জন এবং অঙ্গ হিসেবে অস্তিত্বই তাদের পক্ষে সদর্থক।

যে শ্লোকটির বাংলা অনুবাদ ব্যবহার করা হয়েছে তা কালিদাসের শকুন্তলা নাটক থেকে নেওয়া। এটি শকুন্তলার প্রতি প্রেমিক দুষ্মন্তের প্রেমগদ্‌গদ্ বচন। রস এখানে সম্ভোগ-শৃঙ্গার, অলংকার স্বভাবোক্তি। কেউ কেউ বলেন এ হলো রূপক যুক্ত ব্যতিরেকের দৃষ্টান্ত। শকুন্তলার চোখকে নীলপদ্ম মনে করে ভ্রমর তাকে বার বার ছুঁয়ে যাচ্ছে। কান অবধি বিস্তৃত চোখ দুটিকে পদ্মফুল মনে করে কানের কাছে এসে মৃদুগুঞ্জন করছে; শকুন্তলার অধর মধুর আধার বলে ভ্রমর তা পান করছে। এইভাবে পদ্মবলে ভুল করে বারবার স্পর্শ, গুঞ্জন, মধুপান প্রভৃতির সাহায্যে সুন্দরভাবে অঙ্গী সম্ভোগ শৃঙ্গার রসকে অভিব্যঞ্জনা দেওয়া হয়েছে। অলংকার এখানে স্বভাবোক্তি। তা রসপরতন্ত্র ভাবেই সন্নিবেশিত হয়েছে।

ডঃ দাসের ঝোঁকটি আর কিছুই নয়, অলংকার বাদের অবমূল্যায়ণকে প্রতিহত করা। রসপ্রস্থানের শ্রেষ্ঠতম আচার্যদের হাতে অলংকারকে যে সম্পূর্ণ লৌকিক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে এতে তাঁর রুষ্ট হবারই কথা। তবে এসব ব্যাপারে বাংলা দেশে তিনি প্রথম নন। সুধীর দাসগুপ্তের কাব্যালোক তাঁর বইয়ের অনেক আগে বেরিয়েছে। সেখানে এসব কথা আছে। তারও আগে এখানে আছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের কথা অবশ্য তিনি বলেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু রস ও ভাবের প্রভেদ বোঝেননি। বঙ্কিমও তাই। রস ও ভাব তাঁদের কাছে একার্থক। একথা সুবোধ সেনগুপ্ত তাঁর 'বাংলা সমালোচন পরিচয়' বইয়ে বলেছেন।

ডঃ দাস যদি ইতিহাসের ক্রম উদ্ধারের চেষ্টা করে থাকেন তবে সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু মনে হয় অলংকার প্রস্থানকে রসধ্বনি প্রস্থানের সমকক্ষ হিসেবে স্থাপন করাই তাঁর অভিপ্রেত। এর ভুল ও ত্রুটি বিচারের কথাই ওঠেনা।

---

* ধ্বন্যালোকের লোচনটীকা —ডঃ বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সংস্করণ ব্যবহার করেছি।

ঝোঁকটি দেখানোই আমার উদ্দেশ্য। সেই ঝোঁকে অলংকারের প্রত্যেকটি 'স্থূল' কেই সম্পূর্ণ বলে বোধহয় এবং রসবাদীদের অসম্পূর্ণতা দেখানোর দায়ে ধ্বনিবাদের পূর্ণতা সামগ্রিক ভাবে দৃষ্টির আড়াল করতে হয়।

তিন

সুবোধবাবু একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তার কথা অনুসারে এক কাব্যের সঙ্গে আর এক কাব্যের প্রভেদ নিরূপণ কি ভাবে করা হবে? যেখানে তুলনা শ্রেষ্ঠ ধ্বনিকাব্যের সঙ্গে গুণীভূত ব্যঙ্গকাব্য বা চিত্রকাব্যের সেখানে অসুবিধে নেই কিন্তু দুটি ব্যঙ্গকাব্যের আপেক্ষিক উৎকর্ষ বিচার করা বা তরতম করা আনন্দবর্ধনেরও সাধ্যের অতীত। এখানে ক্রোচের সঙ্গে তাঁর একটা সাদৃশ্য আছে। সাদৃশ্য আছে না বলে বলা ভালো মানদণ্ডটি ক্রোচের কাছ থেকেই নেওয়া। ক্রোচেও দেখেছেন দুটি কাব্যখণ্ড বা Intuition এর সঙ্গে ভেদরেখা টানা শক্ত। সেইহেতু তিনি এক ধরণের শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞাপক তালিকা প্রণয়ণে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এভাবে কোনো কাব্যের সমগ্র মূর্তি ধরা পড়ে কি? আধুনিকের কাছে ধ্বনি বা অলংকারপ্রস্থান তাই কিছুটা সমস্যা সঙ্কুলও বটে। এ জাতীয় সমালোচনা বা রসবিচার 'ক্যাটালগিং' এর মতো শোনায়।

এ প্রসঙ্গে ক্রোচের সামান্য আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে কাব্য বা কবিতার সমগ্র মূর্তির পরিপেক্ষিতে। তাছাড়া ধ্বনিবাদের সঙ্গে তাঁর মতের বহুলাংশিক মিলের কথা পণ্ডিতেরা সকলেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে শব্দটা আমি ব্যবহার করছি তা হলো 'বহুলাংশিক'। আর ক্রোচে তো একেবারে সাম্প্রতিককালের মানুষ। সাম্প্রতিক হলেও বার্কলের দার্শনিক প্রতিজ্ঞার সঙ্গেই তাঁর সাধর্ম্য। এটুকু বলা কর্তব্য, সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনা এক হিসেবে দর্শনসম্মত আলোচনাই। প্লেটো থেকে আরম্ভ করে হাল আমল পর্যন্ত।

বাহিরের বস্তুর স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব ক্রোচে স্বীকার করেননি। সেই সূত্রে সুন্দরেরও কোনো বাহিরের সত্তা নেই। সৌন্দর্যবোধই সুন্দর। 'থিওরী অফ ইস্‌থেটিক্‌স্' বইয়ের তেরোর পরিচ্ছেদে তিনি স্পষ্ট বলেছেন সুন্দর কোনো বস্তুসত্তাই নয় ('the beautiful is not a physical fact'), মানুষী ক্রিয়া তার আত্মিকশক্তির সঙ্গেই এ শ্লিষ্ট। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই বোধটিকে দৃষ্টান্ত দিয়ে স্বচ্ছ করে বলেছেন, তাজমহল সুন্দর, এই বাক্যটি বিরোধদোষে দুষ্ট। কোনো বহিঃসত্তাযুক্ত বস্তুই যখন সুন্দর হতে পারে না তখন তাজমহলের ক্ষেত্রেই বা তা প্রযোজ্য হবে কেমন করে? ('Nature is beautiful only for him who contemplates her with the eye of an artist') আরও পরিষ্কার করে কোনো কাব্যস্রষ্টা বা শিল্পী তাঁর কল্পনার সহায়তায় প্রকৃতিকে যতক্ষণ পর্যন্ত না বিশেষ করে শোধন করে নিয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য অন্বেষণ বৃথা, যেহেতু প্রকৃতির নিজস্ব কোনো সৌন্দর্যই নেই ('Natural beauty which an artist would not to some extent correct does not exist.')। 'ইস্‌থেটিক্' বইয়ের পনেরোর পরিচ্ছেদে ক্রোচে এই বিষয়টিকে আরও বিশদ করে বলেছেন একটি চিত্রে দুটি জিনিষ লভ্য—এক চিত্র; দুই চিত্রের অন্তর্গূঢ় অর্থের প্রতিমা; কবিতার ক্ষেত্রে শব্দের এবং শব্দের অর্থের প্রতিমা। কিন্তু এই 'ইমেজ' বা প্রতিমার দ্বৈততা অ-সৎ মূলক। ভৌতথ্যের সঙ্গে আত্মিক বা মানসিকের ঠিক সমন্বয় হয় না। তবে ইমেজ সৃষ্টির কারণ হয় বটে। এইজন্যই বলতে হয় সুন্দর বা সুন্দরের বোধ আন্তর বিষয় এবং তার সৃষ্টির ব্যাপারে কোনো বিধি রচনা সাধ্যাতীত।

মানুষী জ্ঞানের আকার দ্বিবিধ। 'Intuitive' অথবা 'Logical'। প্রথমটির উৎস কল্পনাবৃত্তি, দ্বিতীয়টির ধী শক্তি। বিশেষ এবং সামান্য। অনেকে মনে করেন সামান্যের অস্তিত্ব নিরপেক্ষভাবে বিশেষ অবয়বহীন। কিন্তু সে কথা যথার্থ নয়। সূর্যোদয় বা চন্দ্রোদয় দেখে একজন চিত্রকরের যে ভাবের সৃষ্টি হয়, তা বিশেষই এবং 'Logic' নিরপেক্ষ।

একথা ঠিক, অনুসন্ধান ব যুক্তিঋদ্ধ পর্যবেক্ষণে প্রকাশ পেতে পারে এমন বহুভাব চিত্রটির মধ্যে নিহিত রয়েছে ; কিন্তু ছবিটির মধ্যে দিয়ে যে অখণ্ড বা সমগ্র রূপটি আভাসিত হয়ে ওঠে, তাকেই বলা যায় 'Intuition', আমাদের অন্তরেরই একটি বৃত্তি। এক অর্থে 'aesthetic activity'। এর সঙ্গে 'প্রকাশ' ব্যাপার সমবায়ী-অবিচ্ছেদ্য। যতটুকু প্রকাশ ততটুকুই দর্শন বা অনুভবের সামগ্রী। কোনো কাব্য শুনলে শোনার আনন্দ এবং ভাবগুলি আমাদের অন্তরের গভীর প্রদেশের মধ্যে দিয়ে প্রশান্ত ধ্যানের আনন্দ ('Serenity of contemplation') রূপময় হয়ে ওঠে। 'it is impossible to distinguish intuition from expression. The one is produced with the other at the same instant because they are not two but one'.) এই 'oneness'টাই আদত কথা। এই সূত্রে দু-একটা উদাহরণ সঙ্গত হবে। 'বন্দী সাজাহান' ছবিটিতে শুধুমাত্র আগ্রা দুর্গে বন্দী সম্রাট সাজাহানের 'ভিসুয়াল ইমেজ'টাই বড়ো নয়, ছবিটি তখনই পুরো উপলব্ধি করা যাবে যখন সে দৃষ্টিতে শিল্পী এই ছবিটিকে এঁকে তুলেছিলেন সেই দৃষ্টির সঙ্গে আমার একাত্মতা ঘটবে। এ কেবল বর্ণমাত্রের সংশ্লেষ বিশ্লেষ নয়।

'Intuition' 'Perception'এর কথা আরও একটু বলছি। 'Perception' এক জাতীয় ইন্দ্রিয়জ সান্নিধ্য-সংবেদন। এইটিই যখন ধী বা ধ্যানসাপেক্ষভাবে অন্তরের একটি বিশেষ অনুভূতি হিসেবে আকার নেয় তখনই 'Intuition'এর অবস্থা। ইন্দ্রিয়জ প্রতীতি অসংলগ্ন বিচ্ছিন্ন হতে পারে কিন্তু এই আন্তর অনুভূতিই অখণ্ড এবং সামগ্রিক। 'Expression' এর সহগ। অনুভবের গড়ন বা ভঙ্গীকে স্বচ্ছ করতে হবে। গড়ন বা ভঙ্গী বাদ দিলে আর থাকে কি ? তাই ক্রোচে যখন বলেন 'It is most true that art does not consist of content but also it has no content', তখন তাঁর দিক থেকে ব্যাপারটা বোধগম্য হয়। এবিষয়ে হেগেল, শোপেনহাওয়ার বা কিছুটা পরিমাণে কান্টের সঙ্গেও একধরণের সামীপ্যবোধ অবশ্যই নজরে আসে। সেই সামীপ্য সৌন্দর্যবোধ যে বস্তুত একধরণের অধ্যাত্ম-বোধ এই অনুভবে। যদিও ক্রোচে 'মিসটিসিজম্' বা ঐ জাতীয় কোনো অলৌকিকত্বে একেবারেই বিশ্বাসী ছিলেন না। Pure intuition is essentially lyricism', তাঁর এ মত লক্ষ্য করার মতো।

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'Expression'-এ সমস্যার কথা বলেছেন। কেননা এ মাপকাঠিতে 'হ্যামলেট'র সঙ্গে কালিদাস বা দীনবন্ধু মিত্রের পার্থক্য দেখানো কঠিন। ক্রোচে বিষয় মাহাত্ম্যের ওপরও অনর্থক গুরুত্ব দেননি। তুচ্ছ বিষয়ও Intuition ও Expression এর সমবায়ে সুন্দর হয়ে ওঠে তবে তাই সিদ্ধকাম। প্রকাশ অর্থেই সম্যক্‌সিদ্ধি। কারণ তিনি বিশ্বাস করেছেন প্রকাশ মাত্রই আধ্যাত্মিক অবস্থার রূপান্তর বিশেষ। অর্থাত সেই ' aesthetic activity'।

এই 'Expression' এর সঙ্গেই অলংকৃতির কথা অনায়াসে আলোচনা করা যায়। আনন্দবর্ধন কাব্যের অলংকারকে বাহিরের কোনো পৃথক বস্তুমাত্র বলে বিবেচনা করেননি। ক্রোচের 'Expression' এবং এ বিষয়টির সমধর্মিতা দেখবার মতো। 'ইস থটিক' বইয়ের নবম অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন—'আমরা যখন কবিকর্ম বা শিল্পবস্তুকে খণ্ড বস্তু, দৃশ্য, ঘটনা, উপমা বা বাক্যাংশে বিভক্ত করি তখন আসলে এই বিভাজন কলাবস্তুর প্রাণকেই নষ্ট করে। ব্যাপারটা অনেকটা এইরকম যে একটি প্রাণবন্ত দেহকে হৃদ্‌যন্ত্র, মস্তিষ্ক, স্নায়ু বা পেশীতে খণ্ড খণ্ড করে যদি দেখি তবে সে তো এক অর্থে জীবন্ত সত্তাকে মৃতদেহ হিসেবেই দেখা। বস্তুকে সমগ্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই দেখতে হবে।

অলংকৃতির প্রশ্নে ক্রোচে আরও লিখেছেন যে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেন অলংকরণ 'Expression' এর সঙ্গে কেমনভাবে যুক্ত হবে ? বহিরঙ্গ কিছু হিসেবে ? সে ক্ষেত্রে তো এটি স্বতন্ত্র কিছু হয়েই থাকবে। অন্তরঙ্গভাবে ? তাহলে হয় এটি Expression এর সহায়ক হয়ে একে বিনষ্ট করবে, আর না হয় এটি তার অংশই হয়ে যাবে, অলংকার নয়। ফলত তা হবে Expression এরই মৌল উপাদান স্বরূপ সমগ্রের থেকে অবিচ্ছেদ্য।

বাহির থেকে সন্নিবিষ্ট করা বা যোজিত অলংকার বিশেষকে ক্রোচে তাই কাব্যের অঙ্গ বলেই স্বীকার করেননি। চাপিয়ে দেওয়া এসব সামগ্রী তাঁর মতে 'Expression'কেই নষ্ট করে। ধ্বনিবাদের 'অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্যঃ' কথাটি সামান্য অভিনিবেশশীল পাঠক মাত্রেই এর তুলনায় স্মরণ করতে পারবেন। ক্রোচে বলেন এ জাতীয় একান্ত বহিরঙ্গ অলংকৃতি মহৎ কাব্যসৃষ্টির বিঘ্নস্বরূপ। বস্তুত এই শ্রেণীর অলংকারিক বিশিষ্টতা কাব্য বিচারের যে ক্ষতি করেছে তা অপরিমেয়। কেননা এই অলংকার সজ্জার জোরেই বহু 'bad writing' 'fine writing' এ পরিণত হয়েছে। 'Expression' কে বিভিন্ন অলংকারের ভাগে ভাগে ধরবার এই যে চেষ্টা তার সমস্তটাই তাঁর কাছে অবৈধ ('illegitimate')।

চার

কাব্যতত্ত্ব জিজ্ঞাসা এখানেই থামে না। সব তত্ত্বই সময় আর কালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গড়ে ওঠে। বিশেষ করে যখন শুধু কাব্য আঙ্গিক নয়, বিজ্ঞান এবং সামাজিক প্রশ্নের মাত্রাগুলিরও নিদারুণ পরিবর্তন ঘটছে। সাহিত্য বিচার পদ্ধতিতে তখন মানদণ্ড প্রসারণের চেষ্টা স্বাভাবিক। কথাটা হচ্ছে মানদণ্ড প্রসারণের, উল্টে দেবার নয়। সাহিত্যের একটা চিরন্তন মানদণ্ড থাকেই, সেটা তার মৌল ব্যাপার। উপরিযোগ হয় ফল ফুল পাতা। রস, ধ্বনি বা ইমিটেশন অফ নেচার এসব কেন্দ্রবিন্দুর মতো। কিন্তু বৃত্তের পরিধি ক্রমেই বিদীর্ণ হতে থাকে—জীবনের মাপের সঙ্গে সঙ্গে।

আর সেখানে মধ্যপন্থাই উত্তম। অবশ্য তার অর্থ এ নয় যে এ-কথায় নতুন 'স্কুল' সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে। নতুন 'স্কুল' তৈরী হওয়া যেমন অনিবার্য তেমনি মধ্যপন্থার গ্রহণযোগ্যতাও। মধ্যপন্থার আর এক প্রতিশব্দ ভারসাম্য। তা সৃষ্টিচক্রের নিয়মও বলা যায়। কাব্যতত্ত্ব তার বাইরে যাবে কেমন করে ?

আধুনিক সমালোচনায় 'ইজম' বস্তুটি আদৌ উপেক্ষনীয় নয়। এ সমালোচনার যে চলতি ধরণ তাতে অন্তত একটা কথা স্বচ্ছ। তার পদ্ধতি বা প্রসার বিশেষ সমাজরাষ্ট্রীক আদর্শ এবং চিন্তাভাবনা প্রসূত। সমালোচককে এক্ষেত্রে শুধু সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়েই ওয়াকিবহাল হলে চলবে না। এর সূত্র যে দর্শন তার সঙ্গে পরিচিতিও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আধুনিক সমালোচক বহুমাত্রিক তো হবেনই সেই সঙ্গে গভীরতা। তাছাড়া ভাষাবিচার তো এক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি বটেই। সাহিত্যসৃষ্টির অসাধারণত্ব অনুধাবন করতে হলে সমালোচককে ভাষানির্ভর হতেই হবে। কালে কালে এ ভাষা ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটে, নতুনভাবে সুন্দর হয়ে ওঠে। প্রত্যেক সিদ্ধকাম কবির ভাষাব্যবহারে সৎ শিল্প চিন্তার পরিচয় তুলনাহীন ভাবেই পাওয়া যায়। সে ভাষা ব্যবহারের যথাবিহিত বিশ্লেষণ অধুনাতন সাহিত্য আলোচনার নিত্য চিত্র।

ভাষাবিচার নতুন কোনো সামগ্রী কিন্তু নয়। 'ডিক্‌শনে'র আলোচনা তো অ্যারিস্টটলের সময় থেকেই। অতএব বহু পুরাতন। য়ুরোপীয় সাহিত্যে যেমন 'রেট্‌রিক'। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। আধুনিক কালে আই এ রিচার্ডস। 'লজিকাল পজিটিভিজম্' এই প্র্যাকটিক্যাল ক্রিটিসিজম' এর উৎস। য়ুরোপের ধ্রুপদী কাব্যতত্ত্বে অলংকৃতির উদ্দেশ্যই ছিলো পরিচ্ছন্ন ও সুচারু বাক্ চাতুর্যের সম্যক্ অনুশীলন। আমাদের আলংকারিকেরা তুলনায় শেষত রসধ্বনিপন্থী। আধুনিক কাব্যতত্ত্ববিদ্ অবশ্য চেয়েছিলেন বাক্য সমূহে শব্দমাত্রে বা পদ্যাংশে যা বাক্যের অতীত সৃজনীশক্তি তার অন্বেষণ করতে। আধুনিকতাত্ত্বিক তাই শৈলীবিদ্। 'Stylistics' তাঁর অভিষ্ট। আলাদা ভাবে শব্দ বা শব্দের সজ্জা, সমাবেশ, শব্দের অর্থ এবং ধ্বনি, শব্দের বাক্ প্রতীমা, বহুমাত্রিক অর্থ পরম্পরা, প্রসাদগুণ, 'সেনসাস্‌নেস' অর্থাৎ এককথায় বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এসবই :Stylistics এর মধ্যেপড়ে।

কিন্তু সমগ্রতা বা কাব্য শিল্পের অখণ্ড রসমূর্তি ধ্রুবকের মতো। যে অমীকায় অংশবিশেষই প্রধান হয় তাকে পূর্ণের

মর্যাদা দেওয়া যাবে কেমন করে? সুতরাং রেটরিক বা স্টাইলিস্টিক্স যাই বলি না কেন, সবই এক অর্থে আপেক্ষিক। এর অভিপ্রেত—বাক্যচয়ের বিশ্লেষণের সূত্রে তার শৈল্পিক প্রবর্তনাকে স্পর্শ করা। এই বিধি অনুসরণ করলে মিল্টনের লাটিনিজমকে যথার্থ তাৎপর্যে বুঝব আমরা; বা মধুসূদনকে, কিংবা কালিদাসের বন্দনাগীতি রবীন্দ্রনাথের কাব্য বা গদ্যরচনাখণ্ডগুলিও। যদিও তা পূর্বের পরম অভিজ্ঞান নয়। অন্যতম মাত্র। এই সূত্রেই আধুনিক কাব্যতত্ত্ববিদের কাছে 'বাক্‌প্রতিমার' মূল্যবান প্রসঙ্গটি এসে যায়। এর সহায়তায় তিনি কবির সৃজনধর্মী প্রতিভার প্রকৃতি বা তার ব্যঞ্জার্থকে অন্বেষণ করবেন। কোনো শব্দবিশেষের বারবার ব্যবহার, তার পিছনে ক্রিয়াশীল কবি বা শিল্পীমনের একান্ত প্রাতিস্বিক গড়ন বা অনুভূতির সামীপ্য লাভ করে সমালোচক বস্তুত শিল্পীর সৃজনধর্মকেই নতুনভাবে আবিষ্কার করবেন। এ আবিষ্কৃতির মাত্রা 'ডিক্‌সন্' বা 'রেটরিকের' তুলনায় বহুদূর প্রসারিত। বাক্‌প্রতিমার মাধ্যমে রসজ্ঞ তাই কবির সৃষ্ট পরিমণ্ডলেই পৌঁছে যান। যদিচ এ কথা সবাই জানেন যে সব বাক্‌প্রতিমাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, এরকম বর্ণক্ষেত্রসদৃশ কোনো বাঁধাবাঁধিই অনর্থক, বরং একথা বলাই শ্রেয়, অনেক চমৎকার বাক্‌প্রতিমাই—অন্য প্রতিমার অনুষঙ্গে সৃজিত, ভাবানুষঙ্গে পরস্পর বিজড়িত—কবি অনুভূতির কাছে আমরা যে পৌঁছে যাই তা এসবেরই সমবায়ী প্রতিক্রিয়া বিশেষ। আধুনিক বহু রসজ্ঞ এইজন্যেই বলে থাকেন বাক্‌প্রতিমার এহেন বিন্যাসেই কাব্যবোধের প্রকাশ ও চমৎকৃতি। বর্তমান জটিল ও বহুস্তরবিশিষ্ট সভ্য মনের কাছে এ 'চর্বণা' হয়ত খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং কাব্যভাষায় দুরূহতা এরকম অনিবার্য।

এখানে অমলেন্দু বসুর একটি মত অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ভাবতে চাই। শ্রদ্ধা পূজা নয়। শ্রীবসু লিখেছেন, যে 'ambiguity শব্দটিতে আমরা এতকাল রচনার অপকৃষ্টতা বুঝতাম, উইলিয়ম এম্‌পসন তাকেই সূক্ষ্ম কাব্যানুভূতি ও তৎতুল্য সূক্ষ্ম রচনাকৌশল বলে প্রচার করলেন। আমেরিকান সমালোচকদের হাতে এই বিশ্লেষণ পদ্ধতি এতই জটিল, এত গুরুগম্ভীর হয়ে পড়েছে যে শেষ অবধি সংশয় জাগে এঁদের তত্ত্বপ্রিয়তার উত্তাপে সাহিত্যরস বিলকুল উবে গেছে কিনা। কাব্যভাষার দুরূহতা সম্বন্ধে এলিয়টের উক্তি অথবা শৈলী বিশ্লেষণের আমেরিকান প্রণালী বাংলা কাব্য সম্বন্ধে পুরোপুরি খাটে কিনা সে বিষয়ে আমি সন্দিহান। প্রধান কথা civilisation as it exists at present; সভ্যতার পরিস্থিতির ইউরোপে ও ভারতবর্ষে এক কিনা এ বিষয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। ...আমাদের সভ্যতায় প্রচুর জটিলতা আছে। জটিলতা আর ও বাড়ছে, হয়তো বাড়বে। তবুও বাঙালী সমাজ ও বাঙালী মানস ঠিক ইউরোপীয় পন্থায় খণ্ডিত, অন্তর্দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত বলে মনে হয়না। অন্ততপক্ষে বাঙালী জীবনের স্থূল প্রাকৃতিক পরিবেশ তো ইউরোপীয় পরিবেশ থেকে পৃথক বটেই। এলিয়ট যে বলেছেন—The poet most become, সে বাধ্যবাধকতা বাঙালী কবিচিত্ত ও কাব্যসম্পর্কে খাটেনা'।

এর ঠিক পরেই তিনি বলেন যে Stylistics এ পুরো মনোযোগী হবার সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বজিজ্ঞাসুকে অবগত হতে হবে যে সঠিক কোন কাব্যপদ্ধতিটি বাঙালীর কাব্যবিধি বা প্রকৃতির সঙ্গে মেলে। আর যে কারণে আমাদের কবি প্রকৃতিতে কল্পনার সম্যক্ প্রাধান্য এবং সমাসরীতি বাক্‌প্রতিমার অনুকূল সেইজন্যে একে সচেতনভাবে অনুধাবন করে আমাদের সমালোচনায় এক ফলপ্রসূ পদ্ধতি গড়ে উঠতে পারে।

একটি কথা। কাব্যভাষার দুরূহতার যে পরিপেক্ষিত প্রতীচীতে তা যখন এখানে নয় তখন এলিয়টের উক্তি এখানে তেমন প্রযোজ্য নয় বলে যে সংশয় শ্রী বসু প্রকাশ করেছেন তা অমূলক। এর দ্বারা এমন কিছু যদি বোঝাতে চেয়ে থাকেন যাতে বাংলা কবিতায় অপেক্ষাকৃত সুবোধ্য হওয়াই স্বাভাবিক—কারণ আমাদের সমাজ ও ও ব্যক্তিমন তুলনামূলক বিচারে ইউরোপীয় খণ্ড-বিখণ্ড হয়নি আর পরিবেশও স্বতন্ত্র তাহলে কিন্তু প্রশ্ন হবে যে এই

Time space এর মাত্রায় শিল্পীমনকে সবসময়েই ধরা যায় কিনা এবং কেউ কেউ জটিলতা বা নতুনত্বে অন্য সকলকে পিছনে ফেলে যেতে পারেন কিনা! সবটা কখনই আমার মত মানুষের পক্ষে বলা সম্ভব নয়, তবে এটুকু বলা যায় বিপুল কবিতাংশে জীবনানন্দ রীতিমতো দুরূহ, সে দুরূহতা অনেক শব্দ বা বাক্যখণ্ডের জটিলতাতেও সুধীন দত্ত বা বিষ্ণু দে'র কবিতায় নেই। প্রায় একই সময়ে নজরুল লিখেছেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন আবার অমিয় চক্রবর্তীও। নতুনদের শব্দের মরীচীকা রবীন্দ্রনাথের কাছেও অনেক সময়েই দুষ্ট হয়নি। আধুনিক কবিতার বহুমাত্রিক শাখা-প্রশাখার পূর্ণ আস্বাদন কি ইউরোপের সাহিত্য বা তার জটিলতা সম্পর্কে অবগত না থাকলে হওয়া সম্ভব? তাছাড়া প্রাথমিকভাবে এঁদের কি বাংলা সাহিত্যের বহতা ধারার সঙ্গে যুক্ত মনে হয়েছিলো! এসবই তো ক্রমে অনুশীলনে অভ্যস্ত হয়েছি! সেদিন তো মৈত্রেয়ী দেবীও লিখেছেন সমষ্টিগত চেতনায় আধুনিক কবিতা এখনও তেমন অনুভূত হয় না! তার স্মরণে যোগ্যতা নেই। এ মন্তব্যে কাব্যবিচার না থাকুক, কিন্তু বিদুষী মহিলার এ কথাটা অবশ্যই ভাববার মতো যে আধুনিক কবিতা এখনও বহুলাংশেই আমাদের কাব্য সংস্কারের বাইরেই রয়ে গেছে। স্মরণযোগ্যতার অন্যতম প্রধান হেতু অনুরাগ, হৃদ্যতা (ব্যবহারিক জীবনে সব স্মৃতিই অবশ্য হৃদ্যতার নয়) কখনও বা একাত্মতা— মন নৌকার নোঙর তো ফেলা আছেই; মাঝে মাঝে 'ছুটি' গল্পের বালক ফটিকের মতো অবস্থাও হয় বৈকি! এক বাঁও মেলেনা দু বাঁও মেলেনা!

এত কথার নির্গলিতার্থ একটাই। এখানকার পরিপ্রেক্ষিতেও রসের ঠিকানা যে পাহাড়ের মাথায় তা সত্যই দুর্গম দুরূহ। এলিঅটের কথা আমাদের কবিরা যে আপ্তবাক্যের মতো শিরোধার্য করেননি একথা অমলেন্দুবাবু নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন না। আমি বিনীতভাবে বলতে পারি সাধারণীকৃত বাঙালী সমাজ ও মনের পরিপ্রেক্ষিতে কবিপ্রকৃতির বিশ্লেষণ বিচার ঠিক সম্ভব নয়। সম্ভব করতে গেলে সরলীকরণ এবং তরলীকরণ দুইই আসবে জানি, 'ট্র্যাডিশান অ্যান্ড্ ইনডিভিজুয়াল ট্যালেন্টের' কথা অনেক পাঠকই ভোলেননি। অন্তত এই মুহূর্তে বেশী করে মনে পড়ছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেমন ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করেছিলেন এঁরা কখনই তা নয়। এ ঐতিহ্যপ্রীতির ধাকাটা পশ্চিমী, চেতিয়ে তোলা। 'দি স্যাক্রেড উড' বা 'ক্রাইটেরিয়ন' তো বিষ্ণু দের ভাবগঙ্গার গঙ্গোত্রী। বস্তুত হ্যামলেট, আর্টেমিস, ক্রেবাদুর গান, লোরকা, এলুয়ার, আরাগঁ, ভালেরি টেনিসন, আইজেনস্টাইন, স্তানিস্লাভস্কি এসবের প্রেরণা কতখানি সামাজিক বা সাধারণীকৃত জানিনা তবে নব্বুই ভাগই ব্যক্তির একান্ত ব্যাপার বলে মনে হয়। এসব আমাদের চরিত্রে যতখানি 'স্পনটেনিয়াস, তার চেয়ে অনেক বেশী ইম্পোজড্। তাছাড়া অমলেন্দুবাবু নিজেই 'টি. এস. এলিয়ট অ্যান্ড্ বেঙ্গলি পোয়েট্রী' আলোচনায় বিষ্ণুবাবুর এলিঅট আসক্তির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন 'immense panoroma of futility' আর 'anarchy' কে—'Contemporary history' তো এবংবিধ চেতনাতেই তন্ময়। 'ওয়েস্টল্যাণ্ড, পরে বেরোলে আমাদের 'ফ্রাসট্রেশান' ও বোধহয় পরে আসতো! মোট কথা চোরাবালি, মরুভূমি, ফণিমনসার মন এসব চিত্রকল্প আসছে কোথা থেকে! অবশ্যই সেই এলিয়ট। এর সঙ্গে আছে নিম্নবিত্ত জীবনের গ্লানি বা তথাকথিত শিক্ষিত বিত্তবান জীবনের সারশূন্যতার ছবি। সে কি পুনশ্চ শ্যামলীর উত্তরাধিকার! এর সাধর্ম্য বেশী বরং 'দি লাভ সং অফ জে আলফ্রেড প্রুফ্রক' বা ওয়েস্টল্যাণ্ডের। পাঠক এ ব্যাপারে আরও অভিনিবেশশীল হলে 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'—'ভিলানেল' 'পাঁচ প্রহর' 'অন্বিষ্ট' কাব্যের ১৪ই আগষ্ট' বা সন্দ্বীপের চর' দেখতে পারেন। তাঁর কাব্যে নীলকমল, লালকমল, উপনিষদ, রবীন্দ্রনাথ বা কালিদাস কেউই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছে বলে আমার মনে হয়নি। এ ট্র্যাডিশানপ্রীতি, আগেই বলেছি, সুনিশ্চিতভাবে 'ইম্পোজড্' ব্যাপার। এরকম হপকিন্স, ষ্টিভেনস্ বা রিল্কের কথা না ভেবে অমিয় চক্রবর্তীকে স্বয়ম্ভু কিছু ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব কি? এলিয়ট থাকলেও প্রত্যয় শেষ পর্যন্ত জয়ী মনে হয় রিল্কেকেই। আগে রবীন্দ্রনাথের নাম মনে হতো, এখন দেখেছি তা ঠিক নয়।

জীবনানন্দের ইতিহাসবোধও তাই। 'কবিতার কথা'য় তিনি যে 'কবিতার অস্থির ভিতরে' 'ইতিহাস চেতনা' এবং 'মর্মে' স্থিত 'পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান' এর কথা বলেন তা এলিয়টেরই অবিকল প্রতিফলন। শ্রাবস্তী, বিদিশা উজ্জয়িনী রবীন্দ্রনাথের মত নয়; ইয়েটসের বাইজ্যানটিয়ামের সঙ্গেই এর সাদৃশ্য বেশী। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সমাজচেতনা, 'মহাপৃথিবী' বা 'সাতটি তারার তিমিরে' সাম্রাজ্যলিপ্সা, উপনিবেশবাদের ফ্যাসিবাদের নিদারুণ নিপীড়ন এসব যতটা আমাদের ততটা পশ্চিমের। বোধ তো ওদের কাছ থেকেই পাওয়া। এর ওপর রয়েছে সুররিয়েলিজম্, ইমপ্রেশনিজম্, ফবিজম্, ফিউচারিজম্, একসপ্রেশনিজম্ বা কিউবিজম্ এর প্রসঙ্গ। এসব অল্পস্বল্প জানাও দরকারী। 'অন্বিষ্টে'র '১৪ই আগষ্ট' কবিতায় বিষ্ণু দে যখন লেখেন 'শ্রাবণ সন্ধ্যার সেই মাতিস আকাশ'—তখন জানতে হয় ছবির এক্সপ্রেশনিষ্ট আন্দোলনকে। এই আন্দোলনের তত্ত্ব ছিলো শিল্পীর কাছে আকৃতি ও বর্ণ অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম। দরকার মতো দৃশ্যমান প্রকৃতির গড়ন ও রঙকে বদলেও দেওয়া যায়। এ পথের পথিকদের ধারণা ছিলো ছবি আসলে বর্ণেরই সুসমঞ্জস মিলন। ছবির মধ্যে দিয়ে অন্য কিছু বা গল্প বর্ণনার প্রয়োজন নেই। মাতিসে দেখা যায় সামঞ্জস্যহীন ও বর্বর রঙের মিলনে এক প্রাণবন্ত, গতিময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতকে প্রকাশ করতে। সে রঙ তীব্র, রুক্ষ এবং গাঢ়। ইমপ্রেশনিজমের উল্টো। 'মাতিস আকাশের' সূত্র তাই। সবই পাণ্ডিত্যের গলা টিপুনী! পাউণ্ড থেকে যে অত্যাচার পাকাপাকিভাবে শুরু হয়েছিলো।

আমার কথা—স্টাইলিস্‌টিক্‌সে অভিনিবিষ্ট হতে গেলে, বিশেষ করে আধুনিক কবিদের—আমেরিকান শৈলী অনুসরণ করি বা না করি, য়ুরোপীয় আদল অনুসরণ করতেই হবে। আমাদের আধুনিকতা ব্যাপারটিই তো য়ুরোপীয়। ধুতি চপ্পল পরে হাঁটলে সেটা আরও বেশী করেই। 'হিন্দুত্ব' ব্যাপারটাও আমাদের নিজস্ব কিছু নয়। সবাই জানে এ সম্পত্তিটা আসলে দান করে গিয়েছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর, এনলাইটেনমেন্টের হাওয়ায় মাতাল প্রাচ্যবিদ্যাবিদেরা।

পাঁচ

কাব্যতত্ত্ব আলোচকেরা প্রতীক ও মনস্তত্ত্বের কথা অবশ্যই মনে রাখবেন। প্রতীকের আলোচনা তো বাক্‌প্রতিমার সঙ্গেই একরকম এসে যায়। এবং প্রতীক রূপক নয়। বরং বক্রোক্তির সঙ্গেই তার অনেকটা মিল। উইলিয়ম এম্পসন্ শব্দের বহুরকম বক্রতার কথা বলেছেন। বাক্যার্থের পর্য্যায় বিভাজন নিয়ে আলোচনা প্রচুর। আধুনিক সমালোচকেরা অবশ্য এটিকে ত্রিমাত্রিকই গণ্য করেন। বাক্‌প্রতিমায় পর্যায় দ্বিমাত্রিক—আবেগপ্রবল। কিন্তু সরল সোজা বাক্য বা পঙক্তি বিন্যাসে বুদ্ধির ব্যঞ্জনা তেমন খোলালো নয়; সেইজন্য প্রয়োজন প্রতীকি.ভাষার, আবেগ ও বুদ্ধির সম্মিলনে সে ঋদ্ধ। চংক্রমণে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর ব্যঙ্গে সে পাঠককে নিয়ে যায়। বিশেষ্য, সর্বনাম ভাষার নামার্থ থেকে 'emotive quality'—সেখান থেকেই প্রতীকের সৃষ্টি, অভিভব। যদিও ভাষায় বিভাজন সবাই দু-মাত্রাই ধরেছেন, এই পরবর্তী মাত্রারই নির্যাস হিসেবে জন্ম নেয় প্রতীকী দ্যোতনা। বাক্‌প্রতিমায় যেখানে এক বা একাধিকমাত্র ভাবের সমাবেশ, প্রতীক সেখানে বহুস্তরী বস্তু বা ভাবের বিকল্পমাত্র নয়। প্রতীকের কোনো সুনিশ্চিত সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ণয় চলতে পারে না। বিষ্ণুদের ঘোড়সওয়ারের প্রতীকে যেমন অন্তর্লীন হয়ে রয়েছে বহু অর্থের দ্যোতনা। সংক্ষেপে সামান্যের সঙ্গে বিশেষ, অনিয়তর সঙ্গে নিয়ত, ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টি কিভাবে সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে একের আলোয় অপরকে দীপ্তিমান করে প্রতীকের আলোচনায় সেই লক্ষ্যেই পৌঁছই আমরা। আধুনিক কাব্য মহলে প্রবেশের অপরিহার্য চাবিটি তো প্রতীকের হাতেই বাঁধা রয়েছে।

এরপর মনস্তত্ত্ব। মনোবিজ্ঞান এতদূর এগিয়েছে যে মনোবিশ্লেষণের সঙ্গে আধুনিক শিল্পপ্রকরণ বহুক্ষেত্রেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বিজড়িত। এতে শিল্পকর্মের মৌল প্রবর্তনা যেমন ধরা পড়ে, অবচেতনার ব্যাপারগুলিও একেবারে

প্রচ্ছন্ন থাকে না। শিল্পী বা কবি নিজেও মনস্তত্ত্বের এমন সব পদ্ধতি সচেতনভাবে প্রয়োগ করতে পারেন যাতে তাঁর বাস্তবতায় আমাদের সম্ভ্রম বাড়ে। তাছাড়া 'সাইকো অ্যানালিসিসে'ই বা লাভ কম কি? কাব্য কবি বা শিল্পীকে আমরা আদ্যোপান্ত পেতে চাই—যদি অবশ্য সমগ্রের দ্যোতনা নষ্ট না হয়। সমগ্রের দ্যোতনা কথাটি এখানে ব্যবহার করলুম চেতনা প্রবাহের কথা মনে রেখে। চেতনা প্রবাহে শিল্পী অন্তর্মুখ হলেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু সে তো একরকমের আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর হয়ে বেড়ানোর মতো কোণ নেওয়া! ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে পরিসর। 'বহিরঙ্গ' এই অজুহাতে বৃহৎ বিশ্বজীবনের সঙ্গে এই সহসা বিচ্ছেদ সাহিত্যের ব্যুৎপত্তিগত অর্থকেই বিঘ্নিত করে। কি এমন মহাসমুদ্রের হাওয়া খেলা করে ইউলিসিসের শেষদিকার পৃষ্ঠাগুলিতে! আমাদের ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাস প্রত্নশালায় জমা পড়লো বলে! 'সাইকোসিস' এখানে 'নিউরোসিস'এ বাঁক নিয়েছে। সবই গ্রহণযোগ্য হয় অনায়াসে যদি তা সুষম এবং সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অবশ্যই সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে।

ছয়

অতএব সব যোগ করেই আমাদের সিদ্ধি অর্জন করতে হবে। ধ্বনিবাদ বাতিল তো হতেই পারে না, ব্যঙ্গ্যার্থই সব কাব্যের প্রাণ, শ্রেষ্ঠতম হলো রসধ্বনি। এতে অলংকার প্রস্থানও গুরুত্ব হারাচ্ছে না, রস পরতন্ত্র হয়েই তার মূল্য বা মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকছে। এর সঙ্গে কোনো না কোনো অর্থে সাদৃশ্য পাচ্ছি' 'এক্সপ্রেশন-ইনটিউশন', 'ইমাজিনেশন-ইনটারপ্রিটেশনের'। 'সাবজেকটিভিটি' থাকলেও রসের সমগ্রতা বা পূর্ণাবয়বতার বিশ্লেষণেও আবার তুলনাহীন। বাক্-প্রতিমা, প্রতীক বা মনস্তত্ত্বের আলোচনা আবার শৈলী বিচারের অঙ্গস্বরূপ। বস্তুত এ শৈলী বিচার বহিরঙ্গ সামগ্রী মাত্র নয়, শিল্পীর শিল্পকর্মের মৌল প্রবর্তনার সঙ্গেই তা শ্লিষ্ট। এ আধুনিক বিদ্যার নাম আগেই করেছি—স্টাইলিস্টিক্স। এও এক অর্থে খণ্ড বিশ্লেষণ, কাব্য বিচারের পরমপ্রাপ্তি কিন্তু সুসমঞ্জস সমগ্রতাই। খণ্ডের ঔজ্জ্বল্য অসাধারণ হতে পারে কিন্তু তাতে সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে মানানসই হয়ে ওঠা চাই।

সাত

সবশেষে মোহিতলাল। মোহিতলাল, কেননা ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র তথা রসবাদের তিনি একজন আধুনিক প্রতিবাদী। তাঁর মতের মধ্যে কাটাকুটি প্রচুর। সুবোধবাবু এজন্যে তাঁকে বিদ্রূপও করেছেন। এটা ঠিক কি বেঠিক সে আলোচনায় যেতে চাই না। কেননা এখানে ব্যক্তিগত রাগদ্বেষের প্রশ্ন আছে। তবে কাব্যতত্ত্বের ব্যাপারে মোহিতলালের মতের ভারসাম্যহীনতা যেমন আছে, তেমনি একজন আধুনিক ইংরেজী নবীশ কবির কাছে আমাদের প্রাচীন কাব্যতত্ত্ব কতখানি গ্রহণীয় বলে গণ্য হয়েছে কতখানি হয়নি, সে আলোচনা কিছুটা কৌতূহলোদ্দীপক তো বটেই। এ প্রতিক্রিয়া আসলে বাঁধাধরা নিয়মের বিরুদ্ধে সৃষ্টিপ্রেরণার স্বাধীনতার প্রতিক্রিয়া। এভাবে দেখলে মোহিতলালের প্রতিবাদের নেপথ্য ভূমিকাটুকু বোঝা যায়। অবশ্য তাঁর বক্তব্যের আপাতবিরোধী দিকগুলিও মোটেই উড়িয়ে দিতে চাই না।

যেমন 'সাহিত্য বিচার' বইয়ের 'কল্পনা ও সৃষ্টিশক্তি' অংশে তিনি লিখেছেন রসই 'সকল-প্রযোজন-মৌলীভূত' বা রসাত্মক বাক্যই কাব্য এ মতের যাঁরা পৃষ্ঠপোষকতা করেন তাঁরা 'ইস্থেটিক্স' বাদী। মোহিতলাল এর পরই বলেন রসসৃষ্টি কাব্যের প্রধান প্রয়োজন রূপে গণ্য হতে পারে না। অথচ পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে এই 'কবি কল্পন' অংশেই অপেক্ষাকৃত অন্যরকম কথা রয়েছে। সেখানে রসই যে 'সকল প্রয়োজনমৌলীভূতং—এ কথা কোনও রসিক ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না' একথা যেমন আসে, একটু এগিয়ে গিয়ে আরো বলা হয়েছে, 'কল্পনার এই স্বাধীনবৃত্তি,

কবিগণের অন্তরগত বাসনা সংস্কারের প্রভাব কাব্যসৃষ্টিতে যে নূতনত্ব আনিল তাহা তত্ত্বের দিক দিয়া নয়, কবি কল্পনার দিক দিয়া সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের রস নামক বস্তুরই প্রেরণা।'

এ এক মারাত্মক আত্মখণ্ডন। রসসৃষ্টি কাব্যের প্রধান প্রয়োজন নয়, এ কথা বলে, পরে সেটাকেই স্বীকৃতি দেওয়া এবং ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রজ্ঞ ইংরেজি ধাঁচে 'ইমাজিনেশনের' কথা কিন্তু না জানলেও, কল্পনার স্বাধীনবৃত্তি, কবিকল্পনার দিক সংস্কৃত আলংকারিকদের রসেরই প্রেরণা একথা বলায় একবাক্যে সবই তো স্বীকৃত হলো! কেননা রসের প্রেরণা যদি কল্পনার স্বাধীনবৃত্তিই হয় তাহলে রসের সঙ্গে 'ইমাজিনেশন' এর দূরত্ব থাকে কিসে আর রসই তখন তো কাব্যের একমেবাদ্বিতীয়ম অভিপ্রায় হয়ে দাঁড়ায়।

এবার একটি দৃষ্টান্ত। 'সাহিত্য বিচার' এর 'কাব্য ও জীবন' অংশে মেঘদূত থেকে 'শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণী প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতম্' ইত্যাদি উদ্ধৃতির সঙ্গে সুইনবার্ণের Love that for very life shall not be sold ইত্যাদি কাব্যখণ্ডের তুলনা দিয়ে তিনি দ্বিতীয় জনের কবিতাটিকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেছিলেন। কারণ হিসেবে বলেছিলেন এখানে, 'দিব্যানুভূতির আবেগ ভাষায়, ছন্দে ও সুরে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে'; এবং তা এমন যাতে 'জীবনরস রসিকের চিত্তেও সাড়া জাগে।' অন্যদিকে কালিদাসের কবিতায়, 'বিশুদ্ধ কল্পনা বিলাসই আছে, বাস্তবের নাম গন্ধও নাই।' শুধু তাই নয়, 'বাস্তবের নাম গন্ধ নাই বলিয়াই রসবাদী আলংকারিকের মতে ইহা একটি উৎকৃষ্ট রচনা।'

অথচ 'কবি ও কাব্য' অংশে কীট্সের What the Imagination seizes as Beauty must be truth, whether it existed before or not'—এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের মত বলতে গিয়ে তিনি বলে ফেললেন, 'এখানে বাস্তব অবাস্তবের দ্বন্দ্ব কবি স্পষ্টই অস্বীকার করিয়াছেন। যে ভাবৈকরস চেতনায় সৃষ্টির মর্মস্থল উদ্‌ঘাটিত হয়, তাহার সাহায্যে আনন্দের অবশ্যম্ভাবী আবেগে যাহাকে উপলব্ধি করি সেই সুন্দর সারা চিত্তকে জয় করিয়া আত্মার পদ্মাসনে যখন বিরাজ করেন, তখন সেই যে আত্মসমর্পণ, তাহাইতো সত্যোপলব্ধি। বিচার বুদ্ধি ও কবিদৃষ্টির এই বিরোধ তর্কে ঘুচিবে না; ইহা কবির মতই উপলব্ধি করিবার—যাহার সে শক্তি নাই তিনি প্রাকৃত কাব্য উপভোগে বঞ্চিত। কবি কল্পনার সত্য বাস্তব-অবাস্তবের সীমারেখায় বিভক্ত নয়—একটি অপূর্ব চেতনায় নির্দ্বন্দ্ব হইয়া বিরাজ করে।' ফলত কবি কল্পনায় বাস্তব অবাস্তবের প্রশ্ন অবান্তর।'

এবং এভাবেই কাটাকুটিতে সব কিছু এলোমেলো হয়ে যায়। নিজের অগোচরেই হয়ত তিনি নিজের প্রতিটি কথাকে অস্বীকার কিংবা খণ্ডন করে বসেন।

তা সত্ত্বেও যে কথা আগে বলেছি, মোহিতলালের কথাগুলিকে অন্যভাবে দেখার অবকাশ আছে। সে অবকাশ আছে। সে অবকাশ কাব্যশিল্পী ও কাব্যতাত্ত্বিকের দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়ায়। 'higher interpretation of life and nature' বা একটা অভিপ্রেত জীবনাদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে কাব্যকে সৃষ্টি করে তোলা—তত্ত্বের খণ্ডভগ্ন অংশের কচকচি নয় শিল্পীর এই আধুনিক আকাঙ্ক্ষায় বাদ সেধেছে কিছু পুরাতনী তত্ত্ব বা বিধি নিষেধ। অন্তত মোহিতলালের কাছে। তাকে তিনি অবশ্য নতুন কালের মানদণ্ড বা পরিপ্রেক্ষিতে ইন্‌টারপ্রেট্' করতে তেমন যত্নবান হননি। 'রস' এই শব্দটির পিছনে রসবাদের ফর্মুলা তাঁকে যেন তাড়া করেছে। তাঁর নৈতিক হিসেবের সূত্রই এখানে। তাঁর কাছে জীবনের দেয় বা জীবনের সম্ভাব্য পরিধির সীমানা আদিগন্ত। মহাসমুদ্রের ঝোড়ো হাওয়ায় তা উত্তাল পাথার। শ্রীকুমার বাবুর কাছে এ জীবন তো মহাসমুদ্রেরই প্লাবন। অলঙ্কার শাস্ত্র তথা রস ধ্বনি সে অসীমের মাপ নেবে কি করে।

রে.নসাঁসের উত্তরাধিকার হিসেবে যে ভূমার তৃষ্ণা যে অখণ্ড জীবন রস পিপাসায় আমাদের রসিক মন উদ্বেল হয়েছে মোহিতলাল তার থেকে ভিন্ন কিছু নন। তাঁর ভুলভ্রান্তির সঙ্গে কাব্যবিচারের বিশিষ্টতার এই পশ্চাদ্‌পটটি আমাদের মনে রাখতে হবে। যেমন, মধুসূদন বিশ্বনাথ কবিরাজকে আমল দিতেই চাননি। তাঁর নতুন মহৎ কাব্য এই জীর্ণ পুরাতন আধারের মাপে কখনই ধরা যাবে না এই ছিলো তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। সে সংকট ঘোচেনি। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথও অবশ্যই বাদ নন। তবে প্রতীচীতে কোলরীজ থেকে যে কাব্য প্রত্যয় নির্মাণের আন্তরিক উদ্যম নেওয়া হয়েছিলো তা আরও সমৃদ্ধ বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে উত্তরোত্তর। রূপ রস সুন্দরের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথও আজীবন অক্লান্ত। নতুন কালে কাব্যতত্ত্ব আর কারাগার নয়। সুন্দরকে উপলব্ধি ও উপভোগের ক্ষেত্রে তার সহযোগিতা অবশ্য গ্রহনীয়। বহু কবির কাছেই তাই কাব্যতত্ত্বের কথা এখন প্রিয়প্রসঙ্গ। অবশ্য এ কাব্যতত্ত্ব সাহিত্য দর্পণ নয়। তা এই আদিগন্ত মহাসমুদ্রের মত জীবনের সঙ্গেই নিজেকে যুক্ত করতে নি ত উৎসাহী।

কবিতা

ফুল / রীণা চট্টোপাধ্যায়

ফুলের স্বপ্ন নিয়ে কেটে গেছে বালিকা বয়স
তখন হাওয়ায় ভেসে
দিন শুধু উড়ে উড়ে গেছে ॥

কবে কেটে গেছে সেই বালিকা বয়স
কবে ঝড়ে গেছে সেই ফুলের পাপড়ী
তবু অবচেতনার মাঝে
কোথা কিছু গন্ধ রয়েছে ।

ফুল মানে
শুধু কিছু নরম স্বপ্ন নাকি
অন্যকিছু ?
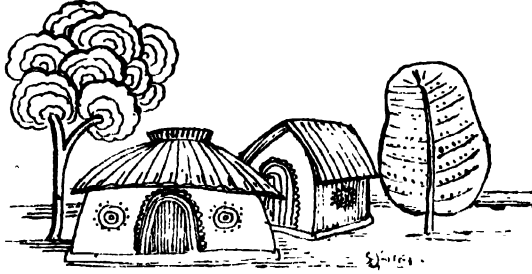
চিলেকোঠার নির্জনতা / কৃষ্ণেন্দু বসু

এইসব হল্লা, এলোমেলো ভ্রমণ আমাদের কোথাও পৌঁছে দেবে না
চিলেকোঠার নির্জনতা চাই ।
আসন পেতে, ধূপ জ্বেলে
চোখ বুজে ধ্যান ।
নাভির প্রতি প্রগাঢ় মনঃসংযোগ ।

চিল-চিৎকারে হয়তো ওড়ে প্রাচীরে বসা দাঁড়কাক
একটু একটু করে দুধ ঘন হয়ে তবে একদিন পুরুষ্ট ধান ॥

সব আছে কিছু নেই
ইলিয়াস হোসেন

রাজ্য আছে
রাজা নেই
নেতা আছে
নীতি নেই
কথা আছে
কাজ নেই
সাজা আছে
বিচার নেই
ক্ষিদে আছে
অন্ন নেই
বেঁচে আছি
মৃত্যু নেই
শোয়া আছি
ঘুম নেই
জন্তু আছে
জীব নেই
প্রেম আছে
প্রাণ নেই
পুরুষ আছে
নারী নেই
নারী আছে
পুরুষ নেই
তালে গোলে
গোলে মালে
ঠেকছে এখন
জগৎ টাই
ক্লীব লিঙ্গ
হিজড়ে ছাড়া
কোথাও কোনো
মানুষ নেই ।

MEMBER, All India Small & Medium News Paper Association, Delhi.
GODHULIMONE N. P. Regd. No. RN. 27214/75 March '83
Vol. 25, No. 3 Postal Regd No Hys-14 Price—Rupees Two only

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সরলা প্রিন্টার্স বড়বাজার, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও নতুনপাড়া, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

0 আপনার ছাপা চিঠিতে আগামী ২০শে মার্চ রবিবার দুপুরে চন্দননগর নতুনপাড়ায় এক সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আমন্ত্রণ পেলুম। ঐ পোষ্টকার্ডেই শুদ্ধসত্ত্ব বসু-সংখ্যা 'গোধূলি-মন'—যাতে আমার কবিতা ছাপা হয়েছে লিখেছেন, সেটির এক কপি আমাকে পাঠিয়েছিলেন জানিয়েছেন। আমি ওই সংখ্যাটি পাইনি! বোধহয়, ডাকে মারা গেছে। আবার পাঠালে হয়তো আবার মারা যাবে। কী আর বলবো? সম্ভব হলে না হয় আর একটি কপি পাঠাবেন।

২০শে মার্চ আমার একটি ভাষণ আছে রিজেন্ট পার্কে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে। তাই সেদিন আপনাদের ঐ সম্মেলনে যেতে পারছি না। সর্বপ্রকারে সম্মেলন সার্থক হোক এই প্রার্থনা জানাই। আমার বয়স ছেষট্টি পেরিয়ে সাতষট্টি শুরু হয়েছে। আমার জন্মতারিখ ১লা জানুয়ারী ১৯১৭ জন্মেছিলুম দেওঘরে। সেখানে আমাদের বাড়ি ছিল। কিন্তু আমার আরো আদি নিবাস শ্রীরামপুরের সন্নিহিত চাতরা-র বটতলায় এবং বৈদ্যবাটির বাগানেও ছেলেবেলায় অনেকবার গেছি। দেওঘর থেকে শ্রীরামপুরে গোস্বামী পাড়ার লাহিড়ীপাড়ার এক ভাড়া বাড়ীতে ১৯২৫ নাগাদ কোনো সময়ে (এক ফাল্গুনেই মনে হয়) আমরা ফিরে আসি। তারপর শ্রীরামপুরে রেলষ্টেশনের কাছে (এখন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র অ্যাভেনিয়ু) আমার পিতা ও তাঁর ভায়েরা একটি বাড়ি করেন। সেই বাড়িতে বাস করেই চাতরা নন্দলাল ইনষ্টিটিউশনে আমি তখনকার 6th class থেকে 1st class পর্যন্ত পড়ে ১৯৩৩-এ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করি। পরে কর্ম জীবনে হুগলী মহসিন কলেজে আমি ১৯৫১-৮২ (মার্চ পর্যন্ত) অধ্যাপনাও করেছি। হুগলী আমার স্বভূমি ছিল একসময়ে। সে সব অতীতের কথা। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ইত্যাদি কত যে মনীষী ও মহাপুরুষের পদধূলি আছে হুগলী জেলার পথে পথে সে কথা কি ভোলা যায়? হুগলীকে আমার প্রণাম জানাই। যাক্ আপনার চিঠি পেয়ে এই সব কথা মনে এলো এই অতি কথনের জন্য মার্জনা চাই।

হরপ্রসাদ মিত্র

৪৯/৭০, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শা রোড,
কলকাতা-৭০০ ০৩৩

0 গোধূলি-মন শুদ্ধসত্ত্ব বসু সম্বর্ধনা সংখ্যা পেয়ে ও পড়ে খুশী হলাম। কর্ম জীবনের শুরুতে আমি যখন কালীঘাট স্কুলে শিক্ষক হয়ে ঢুকি, তখন শুদ্ধ আমার ছাত্র ছিলেন। তারপর সুদীর্ঘ কাল গেছে। অনেক সংগ্রাম ও সংকটের স্রোত পাড়ি দিয়ে শুদ্ধ কেরাণি গিরি থেকে অধ্যাপক হন। তা থেকে হন অধ্যক্ষ এবং এক পা এক পা করে সাহিত্য জগতে পদ চারণা করতে করতে সাফল্যের তীর্থ ভূমিতে উপনীত হন। আমিও নানা অধ্যায় অতিক্রম করে বার্ধক্যে এসে পৌছাই। এই বিচিত্র ভাঙ্গা গড়ার মধ্যে শুদ্ধের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অব্যাহত থাকে, আজও তা আছে। অনেক পারিবারিক প্রয়োজনে তাঁকে আমি সহায়ক রূপে পেয়েছি। তাঁর একক পত্রিকার জন্মক্ষণ থেকেই আমি তার শুভানুধ্যায়ী ও লেখক। তাঁর কলেজে আমার পুত্র অধ্যাপকতা করেছে অনেকদিন। বহু জায়গায় বহু অনুষ্ঠানে তাঁকে পেয়েছি সংগীতরূপে। কবি ও প্রাবন্ধিক রূপে তিনি প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়েছেন। তাঁর সফলতার মধ্যে আমি দেখেছি আমারও সাফল্যের ছবি। এই সংখ্যাটি প্রকাশ করে তাঁকে তাঁর প্রাপ্যই শুধু দেওয়া হয়নি। দেশের একটি ঋণ পরিশোধেরও কিছু প্রয়াস হয়েছে। আমি এই উদ্যোগের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে আনন্দ ও গৌরব বোধ করছি।

আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

নন্দগোপাল সেন গুপ্ত

২১/১ রসা রোড, সাউথ, থার্ডলেন, কলিকাতা-৩৩

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি মন

পঁচিশ বর্ষ / ৪র্থ সংখ্যা / বৈশাখ ১৩৯০

প্রতি সংখ্যা এক টাকা
বার্ষিক (সডাক) দশ টাকা

সম্পাদক ॥
অশোক চট্টো[illegible]

সম্পাদকীয়

বিগত কয়েক বছর কবি প্রণাম সংখ্যা বা রবীন্দ্র সংখ্যা সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম রবীন্দ্র সম্পর্কীয় আলোচনায়। এবারে পুরোপুরি ব্যতিক্রম। 'রবীন্দ্র সংখ্যা' শিরোনামে সমকালীন চিন্তা-ভাবনা-আলোচনা সহ কিছু কবিতা, কিছু কবির কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা, এই সবই এ সংখ্যার পুঁজি।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এত বেশী আলোচনার ঝড় বয়ে গেছে—যে তাঁর সাহিত্যের অনালোচিত দিকনির্ণয়ই আজ অসম্ভব। ব্যক্তিমানুষ রবীন্দ্রনাথকে ঘিরেও আলোচনার অন্ত নেই।

অতএব সাময়িকভাবে ক্ষান্ত থাক রবীন্দ্র সম্পর্কীয় আলোচনা। সমকালীন বাংলা সাহিত্যের ডালি নিবেদনের সাধ্যতেই শ্রদ্ধা জানানো যাক্ কবিকে।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর ॥ হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥ ভারত
কলিকাতা কেন্দ্র : ৩৩/৬ জি নাজির লেন, কলিকাতা ৭০০০২৩

হেনরী মিলারের সাহিত্যে অশ্লীলতা

অমল হালদার

মামলা মিটেছে, কিন্তু তার জের মেটেনি, আদালতে বেকসুর খালাস পেলেও লেডি চ্যাটার্লির চরিত্র নিয়ে সংশয় কাটেনি। বহুদিন ধরে কাগজে-কাগজে এ নিয়ে বিতর্ক চলেছে। আর তাতে উত্তাপও কিছু কম সৃষ্টি হয়নি। খবর এলো তারপরে, হেনরি মিলারের 'ট্রপিক অব ক্যানসার' এর প্রথম আমেরিকান সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রথম মুদ্রণের ত্রিশ সহস্রাধিক কপি প্রায় শেষ হয়ে এল। 'লেডি চ্যাটার্লির' কলঙ্ক ভঞ্জনের মত 'ট্রপিক অফ ক্যানসার' এর মার্কিন দেশে আত্মপ্রকাশও সাহিত্য জগতের জোর খবর।

কেন-না, শেষোক্ত বইটির ইতিহাস এক হিসাবে লেডি চ্যাটার্লির মত এ বইও প্রথম লেখা হয়েছিল ত্রিশের যুগে। আর হেনরি মিলার যদিও আমেরিকান, এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বইটির কোন আমেরিকান সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। লরেন্সের মত প্রচার-ভাগ্য নেই মিলারের, নইলে লেডি চ্যাটার্লিকে নিয়ে যে পরিমাণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল, 'ট্রপিক অফ ক্যানসার' নিয়ে তার চতুর্গুণ হতে পারত।

কথাটা বোধ হয় ঠিক হলনা, আসলে মিলার নিজেই কখনও উত্তেজিত আলোচনার কেন্দ্র হতে চাননি। লাজুক মানুষ মিলার। সর্বদা তিনি ভিড় এড়িয়ে চলেছেন। অত্যন্ত মনোযোগী শ্রোতা। সদালাপী। বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তবে সেটা ঘরোয়া পরিবেশে। বক্তা হিসাবে তিনি ব্যর্থ। ভিড়ের মধ্যে তিনি জলের মাছ ডাঙায়। দীর্ঘকাল দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই কোরে দিন কেটেছে তাঁর। এক সময় অবস্থা এমন গিয়েছে যে, সহৃদয় পাঠকদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে কোন এক আমেরিকান পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হয়েছিল তাঁকে। আবেদনের জবাবে সম্পূর্ণ অচেনা মহল থেকে ছোট-ছোট অঙ্কের সাহায্যে এত পরিমাণে এসেছিল যে, মিলার অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন।

এখন অবশ্য তাঁর আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। গ্রোভ প্রেস 'ট্রপিক-অফ-ক্যানসার' প্রকাশন-স্বত্বের জন্য ৭০ হাজার ডলার দিতে রাজি থাকা সত্বেও মিলার বইটির আমেরিকান সংস্করণ প্রকাশের অনুমতি দিতে চাননি। সম্মতি আদায় করতে প্রকাশকের তিন বছর সময় লেগেছে।

মিলার নিজে তাঁর এই অনিচ্ছার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন :—'আমি আমার বই নিয়ে কোন বিতর্কের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠতে চাই না। রেডিও, টেলিভিসন বা খবরের কাগজে ইন্টারভিউ দিয়ে আমি আমার লেখার সময় নষ্ট করতে রাজি নই। যাদের মতামতের আমি মূল্য দিই, তাঁরা সবাই আমার বইটা পড়েছেন। যাঁরা খুঁজে খুঁজে তথাকথিত নোংরা শব্দগুলি বের করে পড়বার জন্য আমার বই কিনতে চান, তাঁদের প্রতি আমার কোন ঔৎসুক্য নেই'।

হেনরী মিলারের 'ট্রপিক অফ ক্যানসার' কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল পাঠকদের কাছে পরিচয় করার জন্য :—

ক) আমার জন্মস্থান এবং বড় হয়ে ওঠার দিনগুলির কথা মনে পড়ে— ম্যানহাটানে অন্ধ ক্রোধে সর্বাঙ্গ জলে যায়, কারাগারে, পথিপার্শ্বে সাদা পোকার ডিম গিজগিজ করছে। অফিসের ব্যবসা কেন্দ্রগুলি প্রাসাদ। খুব বড়। কুষ্ঠ-রোগীরা, খুনে গুণ্ডারা এবং সর্বোপরি অবসাদ। একঘেয়ে মুখের মিছিল। রাস্তাজোড়া পা, বাড়িঘর আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকা, খাবার, পোষ্টার, চাকরী, অপরাধ-ভালবাসা...সমস্ত শহর দাঁড়িয়ে আছে এক ভয়ঙ্কর

শূন্যতার ওপর। অর্থহীন। চূড়ান্ত অর্থহীন। এবং ফর্টি সেকেণ্ড ষ্ট্রীট—পৃথিবীর মধ্যে নাকি সেরা—ওরা বলে। তল কোথায়? ধনী অথবা গরীব, মাথা নিচু করে হাঁটে। ওপরের বন্দীশালা দেখবার জন্যে ওদের প্রায় ঘাড় ভেঙে যায়। ওরা হাঁটে রাজহংসের মত'।

খ) 'সবাই আমাকে দেখতে চায়—? সবাই আমার সঙ্গে চায় কথা বলতে। আমি কী করছি প্রশ্নবানে আমি জর্জরিত। কেমন আছি আমি..? আমি কী কাজ করছি..? বই লেখা শেষ করেছি কিনা...? আবার কী আর একটা তাড়াতাড়ি শুরু করবো ইত্যাদি। 'একজন বাঁদরমুখো জার্মান চায় যেন তার বই-এর অনুবাদ করি। একজন বন্য চোখের মেয়ের ইচ্ছা যে, ওর জন্যে আমার জীবনী রচনা করি। একজন আমেরিকান মহিলা শুনতে চান আমার জীবনের সর্বশেষ সংবাদ। একজন আমেরিকান ভদ্রলোক আমাকে নৈশ আহারে আমন্ত্রণ জানান। শিল্পী বন্ধু চান তার মডেল করতে।

গ) 'যিশু সম্পর্কে মতামত শুনতে চান একজন ধর্মপ্রাণ মহিলা। 'হায় যীশু ! আমি কী হতে চলেছি? তোমাদের কী অধিকার আছে আমার জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার? আমার সময় হরণ করা। আমায় কী ভেবেছো তোমরা। তোমাদের আনন্দ দেখার জন্য কী আমি মাইনে করা চাকর। আমি কি বেশ্যা যখন তখন স্কার্ট ওপরে তুলবো'?

ঘ) আমি একজন মানুষ যে, গৌরবের সঙ্গে বাঁচতে চায়। আমি মুক্ত মানুষ স্বাধীনতা আমার প্রয়োজন। নিঃসঙ্গ থাকতে চাই। নির্জনে আমার লজ্জা ও ব্যর্থতা নিয়ে থাকতে চাই। সঙ্গীহীন, চুপ চাপ, নিজের মুখোমুখি আমি চাই সূর্যকিরণ এবং পাথর বসানো রাস্তা। হৃদয়ের সঙ্গীতই হবে আমার সঙ্গী। কী চাও আমার কাছে, ? যখন আমি বলতে চাই, ছাপার অক্ষরে তা বলি। তোমাদের প্রশংসায় আমি অপমানিত বোধ করি। কেবলমাত্র যীশুর কাছে আমি দায়ী থাকবো তাঁর অস্তিত্ব থাকে।

ঙ) এই যুবকটি, গান্ধীজীর ঐতিহাসিক লবণ আন্দোলনের একজন অনুগামী শিষ্য। বহু বছর সে নারী সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত। ওকে আমি কুলাফোরিয়ারিতে (বেশ্যাবাড়ি) নিয়ে যাই। 'বাতটবের সামনে বাড়িউলি দাঁড়িয়ে থু থু ফেলছে। মেয়েরা তোয়ালে হাতে দাঁড়িয়ে। পাঁচজন আমরা বাথটবের দিকে তাকিয়ে থাকি। জলের ওপর ভাসছে দুটি বড়-বড় শুয়োর...। নোংরা শুয়োর।'

ওকে আমি প্রশ্ন করি—'কী করছো তুমি...?

চ) দশজন হিন্দু একত্রে হলেই দেখা যায় তাদের মধ্যে জাতপাত নিয়ে লড়াই ধর্ম ও রাজনীতি নিয়ে বিবাদ। গান্ধীজির সাহচর্যে এরা অদ্ভুত ভাবে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিল কিছু সময়ের জন্য। কিন্তু যখন এই মহান নেতা থাকবে না, ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে শুরু হবে বিবাদ আর বিশৃঙ্খলা।

ছ) একজন মানুষকে ধনী হওয়ার প্রয়োজন নেই, এমন কি নাগরিত্ব অর্জন, প্যারিসের বসন্তকাল উপভোগের জন্য। গরীব মানুষে ভর্তি প্যারিস। এখানে গর্বিত ভঙ্গিতে নোংরা ভিখারিরা চলাফেরা করে। তবু ও তাদের মনে হয় যে, তারা স্বদেশেই আছে। এই পৃথক মনোভাবের ফলে প্যারিসে বাসিন্দারা অন্যান্য বড় শহরের অধিবাসীদের থেকে পৃথক। (ট্রপিক অফ ক্যানসার—হেনরী মিলার) মিলার 'ট্রপিক অফ ক্যানসার' লিখেছিলেন ১৯৩১ সালে। তখন ফ্রান্সে। ১৯৩৪ সালে ফ্রান্সেই বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪ সালের মধ্যে ফ্রান্সে বইটির পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার পর বহু সংখ্যক আমেরিকান সৈন্য ফ্রান্সে আসত। তাঁরা মিলারের এই বইটি আবিষ্কার করেন। তাদের মনে হল, মিলার যেন

যুদ্ধোত্তর যুগের মানুষদের উদ্দেশ করে বইটি লিখেছেন। উপন্যাসটি পড়ে তাঁরা মুগ্ধ হয়ে যান।

ততদিনে মিলার আমেরিকা ফিরে এসেছেন, নিজ দেশে খ্যাতিও অর্জন করেছেন কিছুটা। তিনি কালিফোর্নিয়া উপকূলে একটা বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বাস করতেন। পাহাড়ের গায়ে তাঁর ছোট বাড়িটা এই সময় শত-শত গুণমুগ্ধ পাঠকের তীর্থক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

'ট্রপিক-অফ ক্যানসার' এখনও আমেরিকায় প্রকাশিত হয়নি। যাঁরা ফ্রান্সে যেতেন, তাঁরা কেউ কেউ বইটি সঙ্গে করে আনতেন। আট বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক 'ট্রপিক অফ ক্যানসার' তার সহচর বই 'ট্রপিক-অফ-ক্যাপরিকর্ন' ডাক যোগে আমেরিকা পাঠান। ডাক বিভাগ বই দুটি বাজেয়াপ্ত করে। মামলা আদালতে গড়ায়। সানফ্রান্সিসকোর জনৈক ফেডারেশন জজ রায় দেন বইটি অশ্লীল।

সাহিত্য সমালোচকেরা অবশ্য এ-মতে সায় দেননি। ইংরেজ কবি ও ঔপন্যাসিক লরেন্স ডারেল বলেছেন, 'ট্রপিক - অফ - ক্যানসার' - এর স্থান 'মবি-ডিক'—এর পাশেই আমরা সাধারণতঃ একটা বাঁধাধরা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে শিল্পের বিষয়বস্তুকে আবদ্ধ করে রাখি। এটা এমন একজন লেখকের বই, যাঁর নিজের প্রতি সততা এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর সীমানাকে অতিক্রম করেছে।'

অনেক লেখক এবং সমালোচকই বইটি সম্পর্কে এই মত পোষণ করেন। তাঁরা সকলেই স্বীকার করেন, বইটিকে শিল্পকর্ম হিসাবেই গণ্য করতে হবে। কিন্তু তাই বলে নীতিবাগীশেরা হার মেনেছেন তা নয়। আমেরিকায় অবশ্য অশ্লীলতা-নিরোধক কোন কেন্দ্রীয় আইন নেই, তবে পুলিশের চোখে যে বই অশ্লীল, তার প্রচার বন্ধ করা এবং সেই বইয়ের লেখক, প্রকাশক ও বিক্রেতাকে শায়েস্তা করার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে নানা আইন- অর্ডিন্যান্স ইত্যাদি আছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ও ডাক বিভাগ ও শুল্ক বিভাগের মারফৎ এ ধরণের বইয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের যদি মনে হয় বইটি অশ্লীল তাহলে বইটি খুলে তিনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন (অবশ্য প্রথম শ্রেণীর ডাক ছাড়া) পরীক্ষা করে যদি মনে হয় তাঁর সন্দেহ ভিত্তিহীন নয়, তাহলে তিনি আইনগত অভিমত নিয়ে বইটির বিতরণ স্থগিত রাখতে পারেন।

একমাত্র উচ্চতর আদালতেই এই অভিমতের বিরুদ্ধে আপীল করা চলে। এবং করা হয়ও। এই ধরণের বই ইত্যাদির জন্য প্রেরিত অর্থ ফেরৎ নেবার নির্দেশও দিতে পারেন পোষ্ট মাস্টার জেনারেল।

কয়েক বছর আগে 'ট্রপিক-অফ-ক্যানসার' প্রকাশিত হলে পোষ্ট মাস্টার জেনারেল যথারীতি বইটির বিতরণ বন্ধ করার জন্য আইনগত অভিমত চেয়ে পাঠান। কিন্তু এবারে আইন বিভাগ কোন নির্দেশ দেননি।

বইটি বিদেশ থেকে আমদানি করা সম্পর্কে আদালতে শুল্ক বিভাগের নির্দেশের বিরুদ্ধে একটি মামলা চলেছে। এই মামলার ফলাফলের কথা জানা যায়নি।

এজন্য 'ট্রপিকস্' সিরিজের বইগুলি সাতাশ বছরের মধ্যে প্রকাশ্যে আমেরিকায় আসতে পারেনি। 'ট্রপিক-অফ-ক্যানসার' প্রকাশক গ্রোভ প্রেস 'লেডি চ্যাটার্লির' অবর্জিত সংস্করণও প্রকাশ করেছেন।

আদালতের রায় অনুসারে গ্রোভ প্রেস-এ বইটি ডাক মারফত বিতরণের অধিকার অর্জন করেছেন।

আশা করা যেতে পারে আদালতের রায়ে 'ট্রপিকস্' সিরিজের গ্রন্থগুলি রাহু মুক্ত হয়েছে। অন্ততঃ তাহলে শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের সুস্থ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে…!

একাই তুমি / মিলনেন্দু জানা

(সুকান্তকে সামনে রেখে)

রাত্রিশেষে যে ফুল এলো ঘুম ভাঙাতে সোহাগ ভরে,
সূর্য্য-রাগে যে সব তারা ভরলো আকাশ ঝড়ের মুখে,
ধূলাবালি ঝল্‌ঝলিয়ে যে সব পাখি কণ্ঠে করে
আনলো রোদে আলাপ-গীতি সাগর ছোঁয়া পরম সুখে

দু'হাত চেপে বুকের কাছে টানলে যখন সাগর-চরে,
চোখে চোখে চোখ হারিয়ে উথাল পাতাল বর্ম-বুকে
গড়লে যখন স্বর্গ-তারা —হাসলো সে এক চোরাই হাসি,
নীলকণ্ঠ পাখির বাসা ঢাকলো তুফান সর্বনাশী —

ভাগলো সবাই ; একাই তুমি মুক্তোবনে সফল চাষী।

আশা রাখি / রবীন্দ্রনাথ সাহা

সাধারণ মানুষের
কৌতূহল এড়াতে
উদাসীনতার মোড়কে
জড়িয়ে রাখি
আমার অনুসন্ধিৎসু মন। …
আশা রাখি —
যদি তা কখনো,
সময়ের শিশিরে
কুঁড়ি থেকে ফুল হয়।

চিত্রমালা / নির্মল চক্রবর্তী

এ অক্ষরগুলো মুছে যাক। মুছে যাক
সেই স্মৃতিগুলো, যার উপর ভর করে
এতদিন চলেছি।

অনেক দূরে কোথাও একটা জানালা খোলা,
তার চারিদিকে লতানে ঝাড়, ফুলের
ভারে নত।

সেই বোকা লোকটা এখনও ফিরে যায়নি বাড়ি,
রাস্তার মাঝখানে, এক হাতে তার ফুল,
অন্যমনস্ক সে দাঁড়িয়ে।

এই সময় / অজিত ভট্টাচার্য

আমিও একটা স্তূপ তৈরী করবো
সময়ের নীরক্ত পাঁজর দিয়ে।
ভেতরে রেখে দেবো কেবল
ক্রোধ, দাহ আর নিষ্ফল
ক্ষমতাকে সালংকার মঞ্জুষায়।

হাজার বছর পরে খোঁড়াখুঁড়ি করে
মানুষ আবিষ্কার করবে
ধর্ষণ আর মৈথুন ক্লান্ত
এক বন্ধ্যা সময়কে।

জুরান্দা ফল্‌সের একজন যোদ্ধা / দিগত সাহা

জুরান্দা ফল্‌সের গর্জনে সব ধ্বনি নিবে আসে
লগ হাউসের শূন্য চেয়ারে আমি ঃ
চোখের সামনে আদিম অরণ্যভূমি—
প্লাবিত জ্যোৎস্নার অবতলমুখি রজতবর্ণ জলপ্রপাত।
তিন হাজার ফুট উঁচু উপত্যকায়
হাজার হাজার বছরের পুরানো বৃক্ষ ও লতা গুল্ম
সমাজহীন কয়েক বুনো মানুষের কুঁড়েঘর
শাল পিয়াশালের সঙ্গে পাইন স্কাই-পাইনের সহবাস
এক নির্জন রহস্য গভীর অন্ধকারে যুগযুগান্ত দাঁড়িয়ে আছে

আমার পেছনে সুসজ্জিত হলুদ ডাকবাংলো
মসৃণ বারান্দায় কয়েকখানা বেতের চেয়ার
কোনো ট্যুরিষ্ট পার্টির আগমনের জন্য
প্রতীক্ষা করছে ঃ

আমি এই অসীম নিঃসঙ্গতায়
আরণ্যক বর্ম এঁটে নিয়েছি সারাটা দেহে
জানি এখানে বাঘ আছে, হাতি বা ভল্লুক
চিত্রল হরিণ বা সম্বর
নিজেকে ভারি একজন সৈনিক সৈনিক মনে হচ্ছে

অথচ আমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই
কোনো শত্রু নেই
তবু কেন যে এই যুদ্ধসাজ
কিসের জন্য এই যুদ্ধযাত্রা ?
আমার পিছিয়ে যাওয়া নেই
এগিয়ে যাওয়া নেই

কেবল গাঢ় নিঃশব্দে জুরান্দা ফল্‌সের দিকে অবিরাম তাকিয়ে-থাকা
একটা ছুটো তারা খসে পড়ছে
বন্য জন্তুরা শিকারে বের হয়েছে
মাঝে মাঝে তাদের দাঁতাল চিৎকার শুনতে পাচ্ছি
আর জুরান্দা ফল্‌সের অবিরাম গর্জন
জ্যোৎস্নার ধারাপতনের সঙ্গে সর্বাঙ্গে শিশির স্নান

প্রকৃতই যোদ্ধা আমি
আমার যুদ্ধ নৈঃশব্দের সঙ্গে
হাজার হাজার বছরের আরণ্যক নৈঃশব্দ
এখন আমার প্রতিযোদ্ধা
এই নিবিড় নৈঃশব্দের রাজ্যে
আমি জ্যোৎস্নার ধারাপতনের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছি
আমার নৈঃসঙ্গ আমাকে রাহুর মত গিলে ফেলতে চায়
আমি শিশিরপতনের শব্দে আমার প্রাতিস্বিক মৃত্যুকে
প্রত্যক্ষ করছি
আমার সর্বাঙ্গে মৃত্যু জ্যোৎস্নার মতো
মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে।

এবছর তোমার মতন দুর্গাদাস ব্যানার্জী

ঘামঝরা রোদের ঝিলিকে
কবিতা শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত ঘর
রক্ত ঝরে নীলাকাশ থেকে এ খরার বাংলায়,
আমাকে আমার মতন বছরের উৎসবে
মাততে দাও, তুমি পাশে থাক যদি—
প্রেরণা জ্বালা সুপ্তির মচ্ছবে সুখকে
তুমি জাগাও, হে মানসী আমাকে জাগাও।
মানুষের সব শান্তিকে পৃথিবীর ভাষা দাও।

মৌরীফুল / রঞ্জিত কুমার সরকার

এই নিঃস্ব মৌরীফুলে তোমার উল্লাস ফুটেছিলো।
বিকেল চিনেছে তার প্রিয়তর নিস্ব আলাপ,
স্মৃতির বৈভব থেকে তুমি এক মুঠো শস্য দাও—
বিকল্প বাতাস নেই
শস্যের বনজ পরিমল
বুকের অক্ষর থেকে চেয়ে নেবে প্রিয় মৌরীফুল।

সভ্যতার নিষ্করুণ বুকে / স্বপন নাগ

এইখানে এই রৌদ্রছায়ায় দাঁড়িয়ে বড় কষ্ট হয়
একদিন এই ছায়া মুছে যাবে ! খাঁ খাঁ রোদ্দুর তার তপ্ত ডানায়
ঢেকে রাখবে ছায়াহীন বিবর্ণ এই ভূগোল ।
ভাবতে কষ্ট হয়, ভীষণ কষ্ট হয় যখন ভাবি
আদিবাসী কিশোরীর নিষ্পাপ মুখের মত শান্ত অন্ধকার
সন্ধ্যার হাত ধ'রে আর আসবেনা এই শাল পলাশের বনে
কী এক গভীর শংকায় তখন কেঁপে ওঠে বুকের নিরিবিলি চত্বর ।

অরণ্য নয়, বসতের ব্রত নিয়ে সভ্যতা এখন
ফাগুণের আগুণ হ'য়ে ছুটছে বাতাসে ;
এমন নিষ্ফলা দিনে হয়তো অরণ্যেরই গভীরে কোথাও
পেশল ইচ্ছে নিয়ে ব'সে আছে ধুরন্দর শিকারী কোনো ।
বাঁচার সুতীব্র অধিকারে এমন সভ্যতার নিষ্করুণ বুকে
বুঝি আজ অকপটে ছুঁড়ে দেবে ভ্রান্তিহীন বিষমাখা তীর

বাউল ইশারা / অরুণ কুমার চক্রবর্তী

ফাল্গুনের মধ্যরাতে সপ্তর্ষি মাথায় নিয়ে
হেঁটে যাচ্ছে কবি ।

কোথায় যাবে সে, কতদূর যেতে পারে
কেউ কি ডেকেছে তাকে, আলাভোলা
বাউলের গান,
অথবা কণ্ঠস্বর ভাসমান নক্ষত্র হাওয়ায় ।

অথবা জেনেছে কি দোতারার দুটি তার
পুরুষ প্রকৃতি
গানে গানে হবে বুঝি প্রেম বিনিময় ।

সপ্তর্ষি দেখাবে পথ কবি হাঁটে .
কন্টকিত একাকী নির্জন ।

রমণী ঃ তিন
অশোক চট্টোপাধ্যায়

মহানগরীর কাছে
কতটুকু পাবে তুমি নারী ?
উজ্জ্বলতাই শুধু দেখেছিলে
আকাশচুম্বনকরা বাড়ি
সেতো শুধু নামে—
আকাশকে ছুঁতে হলে
ছিঁড়ে ফেল গেরস্থ পোষাক
পাহাড়কে টেনে আনো
উদ্বেলিত সাগরের পাড়ে
সেইখানে দু'হাত বাড়াও
আকাশকে পেয়ে যাবে
হাতের মুঠোয়

প্রচ্ছন্ন বাসনা / প্রবাল কুমার বসু

সর্ব্বাঙ্গে প্রথম রোদ এসে ঝাপটা মারে
ছিলঙ্ক গহীন বন পথের দুধারে
পাখি ওড়ে, অনেক রঙীন পাখি ওড়ে
অদূরেই খুঁটিমারি বাঘের
ডাকবাংলো, ভাঙা পথ, রুদ্রাক্ষের গাছ
সকলে দুদিন আসে পোড়াতে সন্তাপ
এখানে সংসার নেহাতই না হলে নয়
কখনো বা পথ বড় দীর্ঘ হয়ে যায়
আরো দীর্ঘ হয়ে ছায়া সে পথ মাড়ায়, হাত নাড়ে
রাতের হাতির ঘ্রাণ পাশের বাদাড়ে
ফিরে আসে, আসে ফিরে ফিরে
তখনই সর্ব্বাঙ্গে এসে রোদ ঝাপটা মারে
ছিলঙ্ক গহীন বন পথের দুধারে
ওড়ায় অনেক পাখি মনে হয় একা থাকি
এখানেই কিছুদিন থাকি

আমারও চেনা / অজিত বাইরী

সে কিশোর আমারও চেনা
যে জানতো গাঙপাখিদের ঠিকানা
জানতো কখন সাদা বালুর চরে নেমে আসবে
আকাশের ফেনিল অর্বুদ
আবার ডানা ঝাপ্‌টে আকাশে উড়বে।

সে কিশোর আমারও চেনা
নৌকার পাঠাতনে শুয়ে শুয়ে
এক দুই তিন
গুণে যেতো আকাশের অগণন তারা
ছইয়ের মুখে দুলতো লণ্ঠন।

এখন তার চোখে তাকাতে পারিনা।
যদি বলি, চেনাতে পারো গাঙপাখিদের ঠিকানা
অবাক তাকায় বোবা বিস্ময়ে
যেন কোন্ দুর্বোধ্য প্রশ্নের হয়েছে সম্মুখীন।

যদি তাকে স্মরণ করিয়ে দিই নদী
নদীর ওপর নৌকা আর
নৌকার গলুই আর নক্ষত্রের কথা
এমন তাকায় উদাসীন
যেন কোনকালে ছিল না পরিচয়।

শুধু তার চোখ থেকে ঠিক্‌রে পড়ে পাথুরে যন্ত্রণা।
জীবনের খুব কঠিন সময় ও কিণার দিয়ে
হেঁটে যাচ্ছে সে সন্তর্পণে
মুহূর্তের ভুলে পা পড়বে ক্ষুধা ও মৃত্যুর
দাম্ভিক অহঙ্কারী তীব্র ধারাল ফলায়।

ঝরুক শুধু তোমাকে ঘিরে কবি / নিভা দে

পৃথিবীতে এমন কেউ আছে কি—
যে চাঁদ দেখতে চায় না—
এবং ধরতে চায় না
ছুটন্ত অশ্বমেধ ঘোড়াকে— !
কে চায় না বুকের মধ্যে গোলাপের বাগান
আর শরীরের চারপাশে প্রাপ্তির
স্বর্ণ সিংহাসন—
কে চায় না প্রখর গ্রীষ্মে স্বপ্নে পেতে
ভেজা ভেজা চেরাপুঞ্জির
অঢেল মেঘ !
আর শীতের অশিষ্ট শীতলতায় ওম পেতে—
প্রিয়তম জনের
মোলায়েম সান্নিধ্যে !
কে চায় না পৃথিবীর সব বাগানের ফুল
চুম্বক শুধু তারই জন্য—
প্রতিদিন।

আর সব আকাশের সব প্রখর দুঃখগুলো
ঝরুক শুধু তোমাকে ঘিরে, কবি—
নিয়ত যন্ত্রণায় চিরকাল জীবন্ত
রাখুক তোমাকে, কবি।
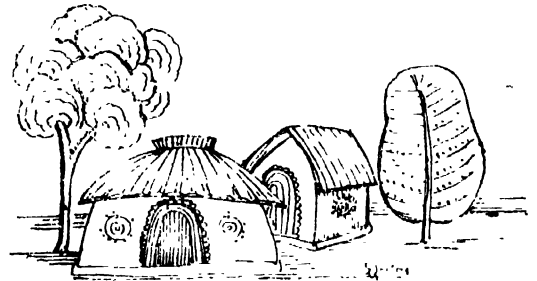
রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরীর একটি কবিতা

শীতল চৌধুরী

আরশি-নগর

আরশি-নগরে পড়শি বসত করে।
ধান ভেসে গেছে, মানুষ মড়কে মরে।
লতাপাতা জামা, চিত্রিত তুটি ভুরু,
সূর্য হাসায় শুপুরির গরিমাকে ;
শাঁখের শব্দে আলিপুরে ফেরে হাঁস,
পড়শি আমার উঠলো পন্টিয়াকে।
(৬-১৯) মনুমেন্টের নিচে
জনসভা তাকে ডাকে।

ডুবে গেছে কত শান্তির সংসার।
ত্রস্ত গোরুর তুটি চোখ দেখে ভয়,
ধ'রে আছে লোকে উঁচু বাড়িটির চুড়ো,
সাহায্য দরকার।

জলে ভাসে ঘর—সান্ত্বনা দরকার।
কাপড় অন্ন নিয়ে উড়ে যায় প্লেন,
তারায়-তারায় অনন্ত শাদা রোদ,
গুণতে পারিনে আর

গণক প্রেমিক ভিক্ষুকে গুলজার
রূপসী শহর –কোথায় আরশি তার ?

'আরশি-নগর' রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'আরশি-নগর' কবিতাটির সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত কবিতা পত্রিকায় ১৩৬৫তে। পরে বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক এই কবিতাটি ইংরেজীতে অনূদিত হয় 'That mirror-town' নামে ১৩৬৬তে। ১৩৬৮ তে কবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থের নাম দেওয়া হয় এই কবিতাটির নামেই 'আরশি-নগর'। কৃত্তিবাস প্রকাশনী থেকে আশ্বিন ১৩৬৮ তে প্রকাশিত হয় কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

'আরশি-নগর' কবিতাটির প্রসঙ্গে এ-কথা বলা যায়, কবিতাটি কবি মানসের স্বচ্ছ এক জীবনদর্শনের পরি-

পূর্ণ ছবি। যে ছবির ভেতরে কবি এঁকেছেন ভয়াবহ বন্যায় কবলিত পশ্চিমবাংলার শহর কলকাতার সমাজ ব্যবস্থার নিপুণ চেহারা। যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে মানুষ এবং প্রকৃতি। ভয়াবহ বন্যার সবগ্রাসী কবলে সব কিছুই যেন এক অবক্ষয়ের রূপ ধরে চলেছে সর্বনাশা পথে। মানুষ ও প্রকৃতিকে যেন করেছে কলুষিত, বিষাক্ত যন্ত্রণাকাতর—যার থেকে এতটুকু মুক্তি লাভের আশায় সবাই উদ্বেলিত, উৎকন্ঠিত, ভাবিত। একে একে খণ্ড-খণ্ড চিত্র জুড়ে রমেন্দ্রকুমার তাঁর গূঢ় চৈতন্যলোকের মর্মভেদী আলোয় রচনা করেছেন পরিপূর্ণ সেই ছবি—যে ছবি শুধু কবি মানসের একার নয়, সকলের, সমস্ত মানুষের। কবিতাটির মূল সার্থকতা এখানেই।

কবিতাটির শুরুতেই কবি আমাদের হৃদয়ে ঘা দেন প্রথম দু'টি পংক্তিতে। প্রথম দু'টি পংক্তিতেই পরিষ্কার পেয়ে যাই জনজীবনের একটা সুস্পষ্ট চেহারা। যা অন্ধ পাঠককেও যেন দৃষ্টি দান করে—নিয়ে যায় হৃদয়স্পর্শ করে এক বোধলোকে। বোধের চেহারা সাধারণ মনুষ্যজাত। কোনোও বিকৃতি বা কৃত্রিমতা নেই। ঠিক এইভাবেত পরের দু'টি লাইনে কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে পাই আধুনিক সভ্যতার পশ্চিমবাংলার পরিত্রাতা নগর কলকাতার আভিজাত পাড়ার একট চিত্রিত ছবি। এখানে কবি আভিজাত্যবিলাসী বাবুদের শৌখিন চেহারাটি ঠিক চিত্রকরের মতই তুলে ধরেছেন। সুন্দর শব্দকৌশলে গেঁথে গেঁথে তুলেছেন কাব্য-সুষমায়। 'লতাপাতা জামা, চিত্রিত দুটি ভুরু'—এই লাইনটির ভেতরে একদিকে যেমন পাই আভিজাত বাবুদের বহিঃপ্রকাশের চেহারা, তেমনি অন্তরলোকের চেহারাটিও আর চাপা রাখেন না কবি, ধরে দেন—'সূর্য হাসায় শুপুরির গরিমাকে', 'পড়শি আমার উঠলে পন্টিয়াকে,' ইত্যাদি শব্দ ব্যাঞ্জনায় কাটা-কাটা চিত্রে। এই স্তবকেই পাশাপাশি কবি 'শাঁখের শব্দে আলিপুরে ফেরে হাঁস' এই লাইনটির ভেতর দিয়ে তৎকালীন সময়ের নগর কলকাতার আলিপুরের প্রাকৃতিক মনোরম একটি সন্ধ্যার দৃশ্য এঁকেছেন। এইসব খণ্ড-খণ্ড চিত্রের পাশে কবি আরেকটি চিত্র এঁকেছেন—তা হল বন্যার কবলে গৃহহারা গরিব মানুষের পাশে বাবু ও বিবিদের সহানুভূতি; কর্মব্যস্ততা, চঞ্চলতা। যান্ত্রিক বিদেশী পন্টিয়াক গাড়িতে চড়ে মনুমেন্টের নিচে জনসভায় যোগ-দান। ৬-২৯ এই সংখ্যাটির মধ্যে কবি সম্ভবত একটি নির্দিষ্ট জনসভার কথা তির্যকভাবে উল্লেখ করতে চেয়ে-ছেন। সমস্যাবহুল জীবনের যেন প্রাণকেন্দ্র এই মনুমেন্ট! এখানে জনসভার মধ্যে একরকম নির্ধারিত হয় সাধারণ মানুষের ভাগ্য। কবি এখানে যেন উৎকন্ঠিত চোখদুটোকে ছুঁড়ে দিয়েছেন মনুমেন্টের দিকে।

তৃতীয় স্তবকে কবি ভয়াবহ বন্যার সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কন করেন মাত্র চার-পাঁচটি পংক্তিতে—'ধরে আছে লোকে উঁচু বাড়িটির চুড়ো'—এই লাইনটি করুণাপ্রার্থী মানুষের এক জীবন্ত ছবি। স্পষ্ট এবং মর্মভেদী। আবার চতুর্থ স্তবকে পাই গ্রামবাংলার অসহায় মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সাহায্যের ছবি। 'কাপড় অন্ন নিয়ে উড়ে যায় প্লেন'—লাইনটিতে তারই দ্যোতনা। তবে এই স্তবকের শেষ পংক্তিটির মধ্যে কবি-মনের এক দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাওয়া যায়। 'তারায়-তারায় অনন্ত শাদা রোদ, গুণতে পারিনে আর'—এই চিত্রকল্পটিতে আছে এক্সপ্রেসন-কাব্যের দ্ব্যার্থকতা বা অনেকার্থকতা যাকে আমরা বলতে পারি আধুনিক কবিতার একটি লক্ষণ। কঠিন বাস্তব থেকে যার দূরত্ব। এখানে শুধু মানুষের নিগূঢ় অনন্তের শুভ্র আধ্যাত্মিক সত্তার বিস্তারকেই কবি ধরতে চাননি। শরীরটাও খাঁ খাঁ করে ওঠে আমাদের হৃদয়ে-মননে, এমনকি বোধের ভেতরেও, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে মর্মবেদনা দেয়, হৃদয়কে করে পীড়িত।

কবিতাটি শেষ করেছেন কবি ঘরছাড়া মানুষের মানবিক সত্তাটুকু হারিয়ে যাবার নিপুণ জীবনদর্শনের চিত্রটি এঁকে। এখানেই কবি হয়ে উঠেছেন একজন বিশিষ্ট দার্শনিক। মানুষ তখন নানান রঙে সঙ সেজে

বহুরূপী। আর রূপ বদলেছে কলকাতার পথ-ঘাট, জনজীবনের। কবির চোখ এড়ায়নি। নিপুণ দার্শনিকের মতো তাই কবি বলে উঠেছেন : 'গণক প্রেমিক ভিক্ষুকে গুলজার' .. খেদোক্তির মতো কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল : 'রূপসী শহর—কোথায় আরশি তার ?'—এই পংক্তিটির মধ্যে কবির স্পষ্ট আক্ষেপ সুস্থ-স্বাভাবিক নগর কলকাতার স্বচ্ছ দর্পণের জন্য, যে দর্পণ যথারীতি হারিয়ে গেছে অগণন বহুরূপী মানুষের ভিড়ে। হারিয়ে যাওয়া দর্পণের জন্য কবির এই আক্ষেপ, সাধারণ সকল নগরবাসী, সুস্থ জীবনবোধে দীপ্ত মানুষের। কবি রমেন্দ্রকুমারের শিল্প-নৈপুণ্যের সার্থকতা এখানেই। আর এটুকুও বলা যায়—কবিতাটি একটি বিশুদ্ধ কবিতা। এবং সার্বিক জনমানসের কবিতা। যার ভেতরে প্রাণ আছে, আছে মানুষের গূঢ় অন্তর বাহিরের সত্যরূপের স্বপ্রকাশ। শুধু প্রাণউন্মাদনায় ভরপুরই নয়, কবিতাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও ঘটেনি শিল্প-নৈপুণ্যে কবির পদস্খলন।

'আরশি-নগর' কবিতায় কবি এক কঠোর বাস্তবের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। 'ঘোড়সওয়ার' কবিতার মধ্যে যেমন কবি বিষ্ণু দে। হুবহু খুঁজে না পাওয়া গেলেও এটুকু বলা বোধ হয় অসঙ্গত হবেনা যে—কবিতাটির নির্মাণ ক্ষেত্রে যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে স্বপ্নলোক থেকে চৈতন্যলোকে আবির্ভাব ঘটিয়ে যেমন বিষ্ণু দে লিখেছিলেন 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটি—তেমনি রমেন্দ্রকুমার ভয়াবহ বন্যা-বিধ্বস্ত মানুষ এবং সমাজব্যবস্থার চিত্রটি তিল তিল করে যন্ত্রণা ও মনোবেদনার ভেতরে সঞ্চিত করে নির্মাণ করেছেন 'আরশি-নগর' কবিতাটি।

কবিতাটির ছন্দমিলও অভিনব। শুধু মনকেই দোলা দেয় না, ঠিক 'ঘোড়সওয়ারে'র মতোই অনাবিল আনন্দলোক থেকে নিয়ে যায় বোধের ভেতরে। কবিতাটির শিল্পগুণ বলতে গিয়ে নিঃসন্দেহে লক্ষ করা যায় কবির চিত্রকল্প—শব্দ ব্যাঞ্জনার অসাধারণ মৌলিকত্ব। উল্লেখ করা যেতে পারে —'লতাপাতা জামা', 'চিত্রিত দুটি ভুরু', 'গুপুরির গরিমাকে' ইত্যাদি। শব্দপ্রকরণের এই সবই একান্তভাবে কবির স্ব-কণ্ঠের আওয়াজ ধ্বনিত করে। সম্পূর্ণ যা নিজস্ব। কোনও উত্তরসূরীর ঠিকেদারী কারবার নেই। এখানেই কবি রমেন্দ্রকুমার রেখেছেন তার জয়ের প্রথম পদক্ষেপ। স্থায়িত্বের নিশান। এক কথায়, নতুন দিগন্ত। 'আরশি-নগর' কবিতাটি পাঠককুলকে যত বেশী না বিস্মিত করে, তত বেশী রস আনন্দে টেনে নিয়ে যায় বোধের—চৈতন্যলোকের—আলোর বিচ্ছুরণে! এই আলোয় পাঠক মুখোমুখি হন—অনেক মানুষের, অনেক ছবির সঙ্গে কবির জীবনদর্শনের!

এই ফাল্গুনে / [illegible]
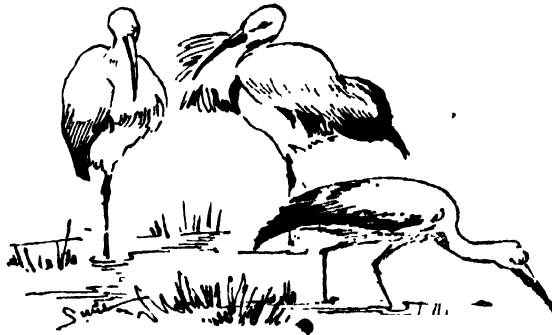
এই ফাল্গুনে তোমার স্মৃতি পলাশবনের আগুনের
মতো জ্বলজ্বল করছে :
আমি দেখেছি তোমার উপচানো সৌষ্ঠব, কামরাঙা
দ্যুতিময় ভোর, যৌবনের প্রখর বিভা, ভালোবাসার
অপরূপ গভীর লাবণ্যে
তুমি ছড়িয়ে দিয়েছো নিজেকে বিষ্ণুপুরের গৈরিক ধুলায়
শালবনের গভীর নৈঃশব্দ্যে
দিয়েছো শিল্পির তুলির টান : জীবনের মূল্যবান স্কেচ।

এখন তোমার জন্যে মন কেমন করে
আমি হারিয়ে ফেলি নিজেকে অসীম মমতায়।

পিছু [illegible] / [illegible]

সামনে আমার দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়া
অন্ধকারে ডাকছে তোমার হাত।

বুকের পালে বইছে এখন উথাল-পাথাল
হাওয়া, অপেক্ষমান তেপান্তরের ঘাট।
ধমনী বেয়ে চৌকাঠে নামছে রোদ
পাহাড় ভাঙছে প্রপাত,
ভোরের মলাটে নতুন স্বতঃলিপ্ত।

সামনে আমার দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়া
অন্ধকারে ডাকছে তোমার হাত।

কান্না / সমীর মণ্ডল

মাঝেমাঝে কান্না বড রমণীয়
বহুদিন মানুষ কাঁদেনি
মানুষের জন্য

সুচতুব গেরস্থালি খুঁটি নাটি
নিঃশব্দ সম্মোহনের ছায়া
স্বতঃস্ফুর্ত সংক্রামিত

বরঞ্চ দরজা খুলে দাও
আসুক সকালের প্রসন্ন রোদ
পাষাণ হৃদয়ের ঘনঘ গোলে
অপমান আসুক ঢেউ তরঙ্গে

এখন কাঁদতে দাও,
শব্দের বিন্যাসে সব মালিন্য ঘুচিয়ে
সাঁতার শেখাবে তোমায় আমায়।

বহুদিন আকাশ দেখিনি / নন্দিতা সেনগুপ্ত

বহুদিন আকাশ দেখিনি
তাই ভাবি দক্ষিণের বারান্দায় ব'সে
গোধূলি কি নেমেছিল বিকেলের ফুল ফোটা বনে।

তাই ভাবি প্রত্যহের কর্মক্লান্ত দিনে
যে মন হয়েছে মোর ধুলিধূসরিত
সে কখনও পায়নি প্রশ্রয়
আজও তো দিইনি সাড়া প্রকৃতির মৌন আহ্বানে।

চেয়ে দেখি অবিরাম জনস্রোত চলে,
সন্ধ্যার আলো লাগা রূপসী এ পথে
বহুদিন চলে গেছি অচেনা জগতে।

তাই আজ তৃষাতুর মন
খুঁজে ফেরে আনমনা শালিখের ঝাঁক
ভোরের স্বপ্ন মাখা সোনারঙা রোদ
আর খোঁজে বহু দূরে উদাস আকাশ।

গোধূলি-মন/রবীন্দ্র-সংখ্যা/১৩৯০, শ্রাবণ

অবুঝ হ'য়োনা / সংযম পাল

কবিতা শ্লোকের মতো উচ্চারণে সুগভীর হোক।
ছন্দোময় হোক।
মননের, আবেগের কোষে
ক্রমশ ছড়িয়ে যাক তার নীল জ্যোতিবিভা, তার পুত অন্তশীল গান।
কবিতা জীবন হোক, জীবনের সীমানা বাহির
মহাশূন্য হোক।

আমার নারীটি বলে : সুসময়ে সবকিছু হবে।
তার আগে এই ছ্যাখো, কবিতার থেকে আমি বেশী,
নরম জীবনঘট, ভরা জল, ভরা ঘন পল্লবের হার
আমার গলায়,
এই তো কেয়ূর ছ্যাখো নীবামঞ্জরীর।
কবিতা পৃথিবী হ'লে আমি নীল গ্রহঘূর্ণি জেনো।
রহস্যের কূপ।
এখন আমাকে ভালোবাসো।

প্রিয় নারী, তুমি মধু, সুন্দরের রস।
সুবর্ণ বোধের জঙ্ঘা, হীরকের নাভি।
শান্তির ধমনী।
তোমাকে প্রণাম নারী, তুমি থাকো কবিতার কূলে।
তোমাকে ধারণ ক'রে কবিতার শব্দময় তরী
ব'য়ে যাক স্রোতে,
সময়নদীর সাদা ফেনাপুঞ্জ-দোলা-ঢেউয়ে
কবিতা জীবন হোক, জীবন বাহির
মহাশূন্য হোক।

প্রিয়তম ঋতুপক্ক নারী,
অবুঝ হ'য়োনা।

নেতার প্রতি
নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়

চোপ্ রও—
মিথ্যাবাদি,
চাটুকার!
বন্ধ করো
বিস্তারিত
বক্তৃতা;
মাইকখানা
বিগড়ে গেছে?
সস্তা মাল,
স্তব্ধতায়
উচ্চকিত
যন্ত্রনা।
শুনবো নাকো
ফিলজফি
কিংবা জ্যামিতি কোণে
সূক্ষ্ম হাসি
ব্যঙ্গ ভার!
দাবার ছকে
সাদা কালোয়
যুদ্ধ সাজ;
সৃষ্টি-পালোট
রাজা উজির
অশ্বগজ!
দল বদলের
জাসি টাকার
সদুপদেশ
আবহমান
চলবে ধারা
ট্যাক্সো হীন।

পুস্তক সমীক্ষা

সাতজন সাম্প্রতিক কবি / উদীনর মুখোপাধ্যায়

সাতজন সাম্প্রতিক কবি ? শিরোনামেই হয়ত চমকে উঠবেন অনেকে। বহু বিতর্কিত এক প্রসঙ্গের জের টেনে বলে উঠবেন হয়ত কেউ কেউ, তার মানে ? এরা তবে আধুনিক নয় আর ? বলবেন হয়ত, যেমন বলেছিলেন জে লুইস তাঁর একটি নির্বাচিত কাব্য সংকলনের ভূমিকায় যে, 'Modern poetry is every poem, whether written last year or five centuries ago, that has meaning for us still' তবে কি কবিতায় এঁরা তেমন কোনো তাৎপর্য নিয়ে ধরা দিচ্ছেন না আজ ? কেউ হয়ত বলে উঠবেন ফ্রানসিস স্কার্ফ-এর প্রতিধ্বনি করে যে, 'All living poetry is contemporary. Shakespeare along side of Eliot, Shelly along side of Spender. If spender modelled himself on Shelly ; he would not exist.' বলবেন যে, 'The poet must be of his age.'

ঠিক ; কিন্তু এখানে তেমন কোনো বিচার বিশ্লেষণ অনুযায়ী এঁদের সাম্প্রতিক শিরোনামে ভূষিত করা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে এইজন্য যে এঁরা সকলেই কবিতা চর্চা করেছেন সাম্প্রতিক কালে। তবে সাম্প্রতিকেরও তো একটা সীমা থাকা উচিত। কোনো সমালোচক যদি বিহারীলাল থেকে বাংলা কবিতার সাম্প্রতিক কালের সূচনা চিহ্নিত করেন তবে কি তাঁকে দোষ দেওয়া যায় তেমন ? আসলে এই সাতজন কবির কারো যেমন কাব্যচর্চায় হাতেখড়ি হয়েছে বিগত দশকেই, তেমনি কেউ আবার এক পা চলিয়ে বসে আছেন তারও আগের দশকে। তবে কিছু কম বেশী প্রায় একই সময়ে এঁরা মাথা তুলতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সাতজন কবি নিশ্চয়ই রূপকথার সাতভাই চম্পা নন ; মেনে নিতেই হবে যে, একই সময়ে বিকশিত হলেও মানসিকতা ব প্রকাশভঙ্গীতে তাঁরা এক নন কখনই। আবার একথা বললেও অবশ্যই ভুল হবে যে সাতজন কবি সাত রকমের। কোনো কোনে ক্ষেত্রে যেমন মেজাজ বা ভঙ্গী একেবারেই আলাদা, তেমনি কোথাও কোথাও হয়ত অল্প স্বল্প মানসিকত ব রূপকারী বিবেকের সাদৃশ্য নজরে আসে।

যেমন আনন্দ ঘোষ হাজরা লিখেছেন, 'দেখে যাও রাস্তা জুড়ে রক্তের প্রলেপ / এসো, গ্যাখো রক্তের প্রলেপ রাস্তা জুড়ে / মুখচ্ছবি মুছে গেছে মা তোমার কীর্ণ মুখচ্ছবি।' অথচ প্রতিমুহূর্তেই তাঁর মনে হয়েছে, 'এ মাটি আমারই ছিল, আমারই এ বিচরণ ভূমি।' আর এই মাটি ছিল একদিন সবুজ প্রাণের দাপটে চঞ্চল, যে কথা মানুষ যেন তার স্মৃতির অভিধান থেকে মুছে ফেলে দিয়েছে। এই স্মৃতিভ্রষ্ট মানুষ, তার অতীত আর বর্তমানের তুলনামূলক একটি ছবি যেন ফুটে ওঠে আনন্দর কবিতায়। আনন্দ'র কবিতা অবশ্য কোনো সংকীর্ণ বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ হয়নি। তাই কখনও দেখি নাগরিক পরিমণ্ডলে আবার কখনো গ্রামীণ পরিমণ্ডলেও তিনি এক-একটি অপ্রাকৃত আবহকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। তবে অস্তিত্বের এক সংগোপন রক্তক্ষরণে আহত ও রক্তাক্ত হয়েও কিন্তু আনন্দ শেষ হয়ে যান না। তিনি এখনও আস্থা রাখেন মানুষের চিরায়ত নির্মাণের উপর। তাই ওই আনন্দকেই বলে উঠতে দেখি, 'দূরে পাঞ্চজন্য মেঘ / এবার জাহ্নবী তুমি সমুদ্রের সন্নিধানে যাবে।' মাঝে মাঝে কিছুটা উঁচু গলায় ও কথা বলে ওঠেন তিনি, যখন এক ভঙ্গুর পরিস্থিতির চাপে কিছুটা যেন কাব্যিক সংযম হারিয়ে বসেন এবং কতকটা নিরাভরণ আর নিরাবরণ ভাবেই তিনি তুলে আনেন তাঁর উচ্চারণকে, যা অবশ্যই কিছুটা তাঁর কবিতার সৌন্দর্যকে ব্যাহত করে, আবার কোনো ক্ষেত্রে একই পঙক্তি বা একই কবিতার ভিন্ন পঙক্তিতে কিছু কিছু সাধু আর চলিত শব্দের মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি যে কৌশলে তাঁর অভিজ্ঞতাকে রূপায়িত করেন, তা কিছুটা অনিবার্য ভাবেই স্মরণ করিয়ে দেয় জীবনানন্দের কিছু কিছু শব্দচয়ন আর শব্দ ব্যবহারের কৌশলটিকে।

ঠিক আনন্দ'র মত নয়, কিন্তু অন্যভাবে হরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ও মনে করেন যে, 'এই পৃথিবীতে সুখ ছিল, এবং মমতা।' ছিল, অর্থাৎ আজ যে একেবারেই নেই তা হয়ত বলা যাবে না। তবে প্রচণ্ড এক সংকটের মুখে সে সবের দেখা মেলা ভার। কিন্তু এই উপলব্ধিকে প্রকাশ করতে হরিজীবন আনন্দ'র চেয়েও রুক্ষ ও তেজী এবং উজ্জ্বল কথনভঙ্গী নিয়ে উপস্থিত হন; সচরাচর গৃহীত কাব্যিক উপকরণকে দূরে সরিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিতায় নিয়ে আসেন গদ্যময় উপকরণ। জন্মদিন তাঁর কাছে ফিরে আসে মৃত্যুর মত। তিনি লেখেন তখন তাঁরই এক সত্তাকে উদ্দেশ্য করে, 'ভেলায় ভ.সছে যার শব তাকে তুমি চেনো? / সে কি ভালোবাসা, সে কি নীল টেলিগ্রাম? / ·· আমি বছরের একটি দিনই শুধু চতুর লম্পট, সরল মাতাল, ভ্রষ্ট সাধু / পৃথিবী তোমার সমস্ত পাপ আমাকে উজাড় করে দাও!' এই পৃথিবী থেকে বিশ্বাস চুরি হয়ে যাচ্ছে, ছিনতাই হয়ে যাচ্ছে মানুষের জীবন থেকে তার পরম কাঙ্খিত প্রভাত, এসব হরিজীবনকে ভাবায়। অথচ প্রচণ্ড এক রাগান্বিত পুরুষ তার ভিরে শুধু যেন গুমরে ওঠে, তাকে সরিয়ে নিয়ে আসে বিশুদ্ধ কাব্যচর্চার জগৎ থেকে। তবু তিনি এই পৃথিবীকে তাঁর অনিঃশেষ ভালোবাসা দিতে চান। কিন্তু এই ভালোবাসায় আবেগচর্চা তিনি যতটা করেছেন, সে অনুপাতে মগজচর্চাকে প্রাধান্য দিলে বোধ হয় তাঁর ভালোবাসা আরো বেশী নিজস্বতায়, আরো বেশী স্বাতন্ত্রে চিহ্নিত হতে পারতো, তাঁর কাব্যগ্রন্থের চতুর্থ মলাটে যার কিছুটা আভাস দিয়েছেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়।

আনন্দ বা হরিজীবনের উপলব্ধির জগৎ থেকে একটু আলাদা সিদ্ধার্থ পালের কবিতার জগৎ। কখনও নষ্টালজিক, কখনও বিমূর্ত, কখনও আবার দৈনন্দিন তুচ্ছতাকেও চমক লাগার মত নকশায় ফুটিয়ে তুলতে চান সিদ্ধার্থ। কখনও যেমন খুব কম কথায় সামান্য কয়েকটি শব্দের ব্যবহারেই এক একটা অলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টি করেন, তেমনি আবার শব্দের অবয়বকে ভেঙেচুরে একাকার করে দেন, প্রয়োজন অনুযায়ী শব্দকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে ব্যবহার করেন এক bold type। ষাটের দশকে এই ধরণের কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] দাশগুপ্ত প্রমুখেরা। সিদ্ধার্থ'র কবিতা মাঝে মাঝে ওই সজল প্রমুখের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই [illegible] স্বরভঙ্গীর অভিনবত্বে ধরা দেন। যেমন, 'ভোরবেলায় ঘুমঘোরে / দুঃস্বপ্ন : কাক / ম / রা / ডা / লে / স [illegible], সবাক।' কবিতা আর ছবির সমীকরণ ঘটিয়েও মাঝে মাঝে তিনি ফুটিয়ে তুলতে চান তাঁর অস্থির আর কি[illegible] সমকালের অনাচার ও স্খলনের দ্বিধাদ্বন্দ্বময় কিছু টুকরো টুকরো চিত্র। তবে অনেক ক্ষেত্রেই সিদ্ধার্থ'র উচ্চারণ [illegible]-প্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবর্তনারহিত ঈষৎ চেষ্টাকৃত মনে হয়, যখন আমরা, কাব্যপাঠক, অনুভব করি তাঁর ও আমাদের মধ্যেকার সেতুটি যেন ভেঙে পড়ছে।

অলোক গঙ্গোপাধ্যায়ের উপলব্ধির জগতের সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য আছে হরিজীবনের উপলব্ধির জগতের, তবে একধরণের লৌকিক ছন্দকে কবিতায় ধরতে চান অলোক। কথ্য বা নিতান্ত স্থানিক শব্দকেও তিনি অবলীলায় কবিতায় নিয়ে আসেন। পরিপার্শ্বের দৃশ্যাবলী তাঁর চোখেও নিতান্ত ভঙ্গুর, 'বন্যা খরা মড়কের ক্ষুধিত ক্যানভাসে জেগে ওঠে করোটির আকীর্ণ হাসি' এইরকমই মনে করেন অলোক। আর এই মৃতপ্রায় দৃশ্যাবলীর ভিতরেও যিনি শান্তির অমৃত সন্ধান করেন, অথবা যার কাছে এসব চিত্তাকর্ষক মনে হয়, তারা প্রকৃতই দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে বসেছেন, অর্থাৎ 'দৃশ্যত: মনোরম যার চোখে শুধু ছানি?' তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অলোক কিছুটা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন, নিয়ে আসেন কিছু খণ্ডিত আর একদেশদর্শী উপলব্ধি। রাগ আর অভিমান নিয়ে অত্যন্ত নিরাবরণ ভাবে তুলে আনেন এক-একটি উচ্চারণ, আর যে সারল্যে আমরা উপনীত হই, তা অনেক সময়ই অভিজ্ঞতার পূর্ণতায় পৌঁছনোর সারল্য নয়, কাব্যচর্চায় সদ্য মনোনিবেশের সরলতার নামান্তর।

গোধূলি-মন/রবীন্দ্র সংখ্যা/১৩৯০/আঠারো

সন্তোষ দাশ অবশ্য মনে করেন যে মানুষের এই অবসাদগ্রস্ততা, এই বিষাদ ছিল তার আবির্ভাবে। শুধু তাদের ভিতরেও মানুষ ছিল একদিন সুখী এবং পরিপূর্ণ, পরবর্তীকালের সাম্রাজ্য জয় যার কাছে তুচ্ছ। তাই তার মনে হয়, 'কৈশোরের কুড়িয়ে পাওয়া নীল কাঁচের টুকরোটার বিনিময়ে / রাজ্যপাটও কি তুচ্ছ ছিল না'। এবং অবলীলায় লেখেন তিনি, 'মনে হয় ব্যার্থ বেচে আছি—।' কিন্তু এই ব্যর্থ বেঁচে থাকা সকলের নয় বলেই মনে করেন তিনি, 'সুখের ভিতর কার অমল আঁচলে চাবি অহর্নিশি অহংকারে বাজে।' এতো স্বাভাবিক যে সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল প্রাণীই কেবল আজ বিষাদগ্রস্ত। মানুষ যে বহুকাল তার ভালবাসা ভুলে গেছে অথবা এক ভুল ভালবাসাই ভুলিয়েছে তাকে—এসব তিনিও মনে করেন। কিন্তু তাঁর কাব্যিক উপলব্ধির উপস্থিতি এখানে যতটা পরিস্ফুট, গভীরতা ততটা নয়। শব্দ ব্যবহারে কিছুটা তাঁর অসতর্কতাও মাঝে মাঝে পীড়িত করে। শব্দ প্রয়োগের কিছু বহুল প্রচলিত কৌশল আর কিছু বিভক্তি বিপর্যয়কে এড়িয়ে উঠতে পারলে তাঁর কবিতা নিশ্চয়ই আরো চিত্তাকর্ষক ও শ্রুতিমধুর হয়ে উঠতে পারত।

অস্তিত্বের এক বহুল উত্থাপিত সংকটই রমানাথ ভট্টাচার্যের কাব্যপ্রেরণার উৎস বলে মনে হয়। সূর্য-তারা-গ্রহ-চাঁদ আর ছায়াপথের সঙ্গে এক আত্মজিজ্ঞাসা তাড়িত হয়েও রমানাথ লেখেন কোথা থেকে আর কেনই বা এখানে আগমন, কারই বা নির্দেশ সেটা। আর এই জিজ্ঞাসা থেকে, অতীতের প্রতি এক ঐকান্তিক আকর্ষণ থেকে তাঁর স্বপ্নের জন্ম। অর্থাৎ কবি যখন তাঁর তৎকালীন জীবনের মধ্যে প্রেরণার স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পাচ্ছেনন', তখনই তাঁর সরে যাওয়া, ...য় যাওয়া। সমকালীনতার বিরোধ বা বৈপরীত্য প্রাকৃতিক বৈপরীত্যের মতোই উঠে আসে তাঁর কাছে, 'একদিন মেঘ / কালো বাড়ীর ভিতর / একদিন রোদ / শিশিরের মতো ধরে সুখ / একদিন অন্ধকার / একদিন রোদ।' এই উপলব্ধিই তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়, 'স্কাইস্ক্রেপার থাকলে মানুষ / সত্যের কারবারী হলে আহাম্মক।' তবে তাড়িত হয়ে তিনি যেভাবে সত্যের সন্ধান করেন তা সব সময় সৌন্দর্যময় সনিষ্ঠ কবিদৃষ্টির তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানে ...ত হয়না, অনেক ক্ষেত্রেই অভিমানী মানুষের বুকের তূণ থেকে উঠে আসা ক্ষোভের প্রকাশ হয়ে দাঁড়ায়।

একধরণের নিসর্গপ্রীতি আর ঘর-গেরস্থালির ভাঙন ও অবক্ষয়ের দৃশ্য ফুটে ওঠে অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায়। ...া কখনো অতি পরিচিত বস্তু জগৎ থেকেও অরুণ তাঁর কবিতার উপকরণ সংগ্রহ করেন। এক বিভ্রান্ত সময়ের ...ঙ্গে যাচ্ছে পরিচিত ঘর গেরস্থালির দৃশ্য, নিসর্গ দৃশ্যের দিকে চোখ ফেরাবার অবকাশ থেকে আজ মানুষ বঞ্চিত। ...ই তাঁকে ভাবায়। নারীর প্রেম তাঁর কাছে নেমে আসে বিষাক্ত ছোবলের মত। তবে তাঁর অধিকাংশ কথনভঙ্গীই ...ধে পালিশহীন অনাসক্ত: 'ফুলবিবির জঙ্গলে যখন উত্তরের শিশির তখনই সূর্যদেব উঠলেন পূবদিকে আলো ...। কিন্তু তাঁর শব্দ প্রয়োগে অনেক সময়ই সাধু-প্রাকৃতের সংমিশ্রণ বা নাম ধাতুর বাহুল্য যেমন অস্বস্তিকর হয়ে ...ঠে, তেমনি পদ্য ছন্দে লেখা তাঁর কয়েকটি কবিতা কখনো কখনো সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কোনো কোনো কবিতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়! তাই স্বরভঙ্গীর অভিনবত্বে কয়েকটি কবিতায় তিনি ধরা দিলেও সকল ক্ষেত্রেই যেন ঠিক সম্পূর্ণ নিজস্বতায় পরিস্ফুট হননা।

দূরে পাঞ্চজন্য মেঘ / আনন্দ ঘোস হাজরা	বিশ্বজ্ঞান / পাঁচ টাকা
জন্মদিনে নীল টেলিগ্রাম / হরিজীবন বন্দোপাধ্যায়	অনবরত / পাঁচ টাকা
স্বপ্নের গঠন ও সাপ / সিদ্ধার্থ পাল	বিশ্বজ্ঞান / পাঁচ টাকা
মৃতের জার্নাল / অলোক গঙ্গোপাধ্যায়	বিশ্বজ্ঞান / ছয় টাকা
স্বগতোক্তি / সন্তোষ দাশ	বিশ্বজ্ঞান / সাত টাকা
এবং পৃথিবী / রমানাথ ভট্টাচার্য্য	বিশ্বজ্ঞান / ছয় টাকা
কবিতার ঘর গেরস্থালি / অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়	বিশ্বজ্ঞান / পাঁচ টাকা

০ গোধূলি-মন-এর পঁচিশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান

একটি-দুটি করে পঁচিশ বছর পার হয়ে গেল গোধূলি-মন। পার হল পঁচিশ বছরের পঁচিশ হাজার চড়াই-উৎরাই। তারই হিসাব-নিকাশ মিলিয়ে নিতে গত ২০শে মার্চ, ১৯৮৩ প্রায় সারাদিন ব্যাপী এক অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছিলেন সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষেরা। বর্ষীয়ান কবি শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পত্রিকা সম্পাদক শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়। তাঁরই বাসভবন, নতুনপাড়া, চন্দননগরে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করলেন সুধীর ভট্টাচার্য। এরপর বসে কবিতা পাঠের আসর। কবিতা পড়ে শোনালেন সর্বশ্রী দ্বিজেন আচার্য, শীতল চৌধুরী, সমীর মণ্ডল, শ্যামলকান্তি মজুমদার, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ রায় চৌধুরি, ধীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর বৈদ্য, গৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি দত্ত, কাশীনাথ ঘোষ, অভিজিৎ ঘোষ, গোপাল চক্রবর্তী, আভাষ মজুমদার, ডলি দত্ত, রূপাব্রয় মিত্র, অরুণ কুমার চক্রবর্তী প্রমুখেরা। উপস্থিত কবিদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ আলোচনা করে সভাপতি শ্রীরায় বললেন সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা সম্পর্কে দু'চার কথা। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা সম্পর্কেই আরো কিছু বললেন ? ঈগল পত্রিকার সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায়। 'গোধূলি-মন'-এর পঁচিশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেন 'তৃণাঙ্কুর' এর সম্পাদক গৌরাঙ্গদেব চক্রবর্তী। আধুনিক কবিতার গীতিরূপ পরিবেশন করলেন ঋষিণ মিত্র। রবীন্দ্র - নজরুলগীতি পরিবেশন করে শ্রোতাদের মন ভরিয়ে রেখেছিলেন শিপ্রা মুখোপাধ্যায়, তাপস মুখোপাধ্যায়, রেণুক সাধু, পূর্ণচন্দ্র মিত্র, সুমনা রায়। অনুষ্ঠানে কবিতার গান, গণসঙ্গীত, রবীন্দ্র - নজরুলগীতি ছাড়া গীটারও পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন অমৃততনয় গুপ্ত, গৌর বৈরাগী, সনৎ মান্না, অতীশ চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, জগৎ লাহা, বিশ্বজিৎ বাগচী, অমিত গুপ্ত, কাজল সরকার, নব বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর দত্ত, বীণা দত্ত, অমল দাস, চির মিত্র, লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ অর্দ্ধ শতাধিক কবি সাহিত্যিক, সাহিত্য রসিকেরা। সভাস্থলে জেলাভিত্তিক লিটল ম্যাগাজিন প্রদর্শিত হয়। এছাড়া চিত্রপ্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হয়েছিল।

০ এ্যাণ্ডারসন হাউসে সাহিত্য পাঠের আসর

ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির উদ্যোগে কাতায় এ্যাণ্ডারসন হাউসে একটি মনোরম বাসর হয়ে গেল। কবিতা পড়লেন সুভাষ মুখো বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দাশগুপ্ত, রবীন সুর, আনন্দ ঘোষ হাজরা, বাগচী, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তরু চক্রবর্তী। যাত্রা জগতের স্বনামধন্য অভিনেত্রী চ্যাটার্জী বলেন, দর্শক বা শ্রোতাদের উপরই শি শ্রোতার সার্থকতা নির্ভর করে। সুন্দর একটি গল্প শোনান সমরেশ বসু। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দেবকুমার বসু।

০ নিখিলভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের হুগলী জেলা শাখার কবি সম্মেলন

কোন্নগর সাধারণ পাঠাগারে ৩১শে মার্চ দুপুর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হ'ল নিখিলভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের হুগলী জেলা শাখার কবি সম্মেলন।

উপস্থিত কবিদের চন্দনচর্চিত করে নেওয়ার পর হাতে হাতে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় সভার শুরুতে। এরপর একে একে প্রবীণ ও নবীন কবিরা আসেন মঞ্চে কবিতা শোনাতে। কবিতা পাঠান্তে প্রত্যেক কবির হাতে তুলে দেওয়া হয় সুদৃশ্য মানপত্র। সাধারণত দেখা যায় তরুণ কবিদের কবিতা পাঠের আসরে প্রবীণেরা অনুপস্থিত এবং প্রবীণদের কবিতা পাঠের আসরে তরুণেরা উপেক্ষিত। একই আসরে তরুণ ও প্রবীণদের সম-মর্য্যাদা দেওয়ায় উদোক্তাদের অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাই।

ঐতিহাসিক মে-দিবস উপলক্ষে

পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি আমাদের অভিনন্দন

আজ ১লা মে ১৯৮৩। শ্রমিক শ্রেণীর রক্তে রাঙা ঐতিহাসিক দিবস। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি জানাই আমাদের সংগ্রামী অভিনন্দন। পশ্চিমবঙ্গের সচেতন শ্রমিক শ্রেণী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দিনগুলি থেকেই বৃহত্তর সংগ্রামের সাথী। গণতান্ত্রিক আন্দোলন, শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব দাবী দাওয়া পূরণের আন্দোলন—প্রতিটি সংগ্রামেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি সচেতন শ্রমিক সমাজ তাদের যোগ্য অংশ নিয়েছে। শ্রমিক-শ্রেণীর এই দীর্ঘ সংগ্রামের সাথী বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর জন্য একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছেন। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার আন্দোলনে হস্তক্ষেপ বন্ধ করা হয়েছে। চা, পাট, ইঞ্জিনীয়ারিং, ছাপাখানা এবং শিয়ারী শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন জয়যুক্ত করার জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। দ্বি-পক্ষীয ও ত্রি-পক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে শ্রমবিরোধ মীমাংসার প্রয়াস চালানো হয়েছে এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে রাজ্যে ধর্মঘট, লক-আউট, লে-অফের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে কমেছে। রাজ্যের সর্বত্র শান্তিপূর্ণ শ্রম-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার মে-দিবসের এই শুভলগ্নে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় এবং তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত রাখার সংগ্রামে অবিচল থাকার অঙ্গীকার করছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

'কল্লোল' আয়োজিত

একাংক নাটক প্রতিযোগিতা

চুঁচুড়ার 'কল্লোল' সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত সপ্তদশ বার্ষিক একাংক নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ২২শে মার্চ '৮৩ থেকে ২৮শে মার্চ '৮৩ চুঁচুড়ার রবীন্দ্রভবন মঞ্চে। সাতদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে প্রায় ২৮টি নাট্য সংস্থা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিদিন চারটি করে নাটক পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সভাপতি বিশিষ্ট অভিনেতা শ্রীশচীন আঢ্য। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্ত কুমার ঘোষ। সাতদিনের পরিবেশিত নাটকে বিশিষ্টতার ছাপ রাখেন উত্তরপাড়ার ইউনিট থিয়েটার, অরুণ চক্রবর্তী রচিত 'দামষ্ট্রং মূল্যাফোস্কার চন্দ্রাভিযান' নাটকটির পরিবেশনায়। মফঃস্বল বাংলার সুস্থ সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে চুঁচুড়ার এই প্রবীণ নাট্য সংস্থাটির অবদান যথেষ্ট।

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

0 গোধূলি-মন নিয়মিত পাচ্ছি। প্রতিসংখ্যাতেই সম্পাদনায় নিষ্ঠার স্বাক্ষর লক্ষ্য করি—তৃপ্তি পাই।

প্রীত্যন্তে—সৌমেন অধিকারী
শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পঃ বঙ্গ

0 পত্রিকার ২৫ বছর কম কথা নয়। ছোট পত্রিকায় ২৫ বছর ধরে যে সব চিন্তা ভাবনাকে ছড়িয়ে দিয়ে বাঙালীর সাহিত্য সংস্কৃতিকে গৌরবান্বিত করেছেন আপনারা, তার জন্য অভিনন্দন। গোধূলি-মন এর আরো শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। 'গোধূলি-মন' এর রজত জয়ন্তীতে আমার ইচ্ছে রজতজয়ন্তী স্মরণ করে চন্দননগর অঞ্চলে 'গোধূলি-মন' লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী গড়ে উঠুক। শুভেচ্ছা হাজারো—সন্দীপ দত্ত
টেমার লেন, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

0 আপনার অসাধারণ মনের খবর শুদ্ধসত্ত্ব বসু সংখ্যা গোধূলি-মন-এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

আমি শুদ্ধদাকে জানি—এককে আমি কলকাতার বাইরে থেকে লিখতাম। কলকাতা তখনও আমার কল্পনায় ছিলো। শুদ্ধদা কী অসীম মমতায় সে কবিতা ছাপতেন, চিঠি দিতেন—তা আমার কাছে প্রেরণার উৎস ছিলো। পরবর্তী কালে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিলো মানুষটির সঙ্গে—নিয়মিত তাঁর বাড়ীতে যেতাম। তাসের আড্ডা দেখতাম। দেখতাম অজস্র রঙের কলমে লেখার একটা রমণীয় নেশা। সবচাইতে মজা, ছোট বড়োর পার্থক্য কোন দিন করেননি—আজো করেননা। একক যতটা তার প্রমাণ, ব্যক্তিগত ভাবে তিনি নিজে তার চাইতে আরো বড় প্রমাণ। আর একটা কথা—তিনি, যতো মানুষের যথার্থ ভালোবাসা পেয়েছেন, যথার্থ শ্রদ্ধা পেয়েছেন, খুব কম লেখকই তা পেয়েছেন। কারণ কিছু দিয়ে ভালোবাসা কেনেন নি, হৃদয় দিয়ে হৃদয় পেয়েছেন।

আপনি শুদ্ধসত্ত্ব বসু সংখ্যা করেছেন—সাহিত্য, সরস্বতী আপনাকে আশীর্ব্বাদ করবেন।

নির্মলেন্দু গৌতম
৭৫ / ডি আলিপুর রোড, কলিকাতা-২৭

0 শুদ্ধসত্ত্ব বসু সংখ্যা 'গোধূলি-মন' হাতে পেয়ে আনন্দ পেয়েছি। প্রুফ দেখায় বেশ কিছু ভুল চোখে পড়লো। ছোট কাগজে প্রুফে ভুল থাকা উচিত নয়। এদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিলে পত্রিকা অধিক আকর্ষ[illegible]হবে। কাগজটি সুন্দর। এজন্য আপনার সম্পাদনা [illegible] প্রশংসনীয়। আমার অভিনন্দন জানবেন।

শুভার্থী—রণজিৎ কুম[illegible]
W / 7, Maniktala Govt. Housing [illegible]e,
V I P Road, Calc[illegible] 54

0 পরম শ্রদ্ধেয় ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসুকে নিয়ে [illegible]লি-মন'-এর সংখ্যার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন [illegible]। কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা, সাক্ষাৎকার ও [illegible] সব মিলিয়ে ডঃ বসুর প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁর [illegible] মূল্যায়ন সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও উল্লেখযোগ্য। লি[illegible] ম্যাগাজিনের পক্ষে 'গোধূলি-মন' একটা বড় কাজ করেছে।

সপ্রীতি শুভেচ্ছান্তে—নবকুমার শীল
লিটল্ ম্যাগাজিন সম্পাদক সমিতি
১০ / ২ টেগোর ক্যাসেল ষ্ট্রীট, কলিঃ-৭০০০০৬

0 'গোধূলি-মন শুদ্ধসত্ত্ব বসু সংখ্যা ও নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছি। সংখ্যাটি নানা কারণে আকর্ষণীয় হয়েছে। সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কাম্য। শুভেচ্ছান্তে—দেবী রায়
[illegible]

০ গোধূলি-মন দেখে-শুনে-পড়ে বেশ ভাল লাগে তার কারণের ভিতর একটি—কিছু পাকা হাতের লেখা আর কিছু কাঁচা হাত। একদিক থেকে পত্রিকার সুনাম থেকে যাচ্ছে, আর একদিক থেকে কাঁচা লেখক, কবি-সাহিত্যিকদের উদ্যম বেড়ে যাচ্ছে। সত্যিই বড় সুন্দর; আপনাকে জানাই অনেক শুভেচ্ছা।

ধন্যবাদ সহ—**তারিকুল হাসান মিন্টু**

কাজী মঞ্জিল, পায়গ্রাম, কসবা, খুলনা।

বাংলাদেশ

০ গোধূলি-মন রজত-জয়ন্তী জয়যুক্ত হোক। 'ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু' সংখ্যা অসম্ভব ভালো লেগেছে। আপনারা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ। মনে রাখছেন—স্বীকৃতি দিচ্ছেন পাঁভাকে। গোষ্ঠী নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী সাহিত্যের সংসারে বি[illegible] তাই ন? আপনার 'গোধূলি মন' সকলের [illegible]lay হোক; এই কামনা করছি। নমস্কার।

নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যা

৪৬ বি, রিচি রোড, কলিকাতা-৭০০০:

০ 'শুদ্ধসত্ত্ব বসু' সংখ্যা খুব ভালো লাগলো, বড় কাজ করলেন। শুদ্ধসত্ত্ব বাবু শুধু বড় দরের কবিই নন, বড় দরের মানুষ সত্যিকারের শিল্পী মানুষ। শুদ্ধসত্ত্ব বাবুকে ঘিরে আমার অনেক শ্রদ্ধা জড়ানো স্মৃতি রয়েছে। আজকের কথা নয়। কলেজ জীবন তখন শেষ করছি করছি এমন সময় ওঁর আর ৺কবি দুর্গাদাস সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ। কবি দুর্গাদাসের তখন 'অশোকের সময় গ্রাম' আর আমার প্রবন্ধের বই শিল্প ও শিল্পী। দুর্গাদাস আর আমি, বোধহয় কয়েক বছরের তফাৎ হলেও সম-সাময়িক ছিলেম - শুদ্ধসত্ত্ব বাবু বয়ঃজ্যেষ্ঠ। অথচ আমি তাদের দুজনেরই বুক ভরা ভালোবাসা নিয়ে আমায় তাদের বই উপহার দিয়েছিলেন। কালীঘাটের বাড়ীতে আমার যাতায়াত ছিল নিয়মিত—বৃদ্ধ বটবৃক্ষ আজও মনে আছে। অনেক কবিতা লিখেছি একে কে। আরো অনেক স্মৃতি আছে। আমার কর্মজীবনে ব্যস্ততায় সব হারিয়ে যাচ্ছে। তাই ব্যথা নিয়ে দিন কাটাই।

শংকর মিত্র

নিউ মাকড়দহ রোড, হাওড়া-১
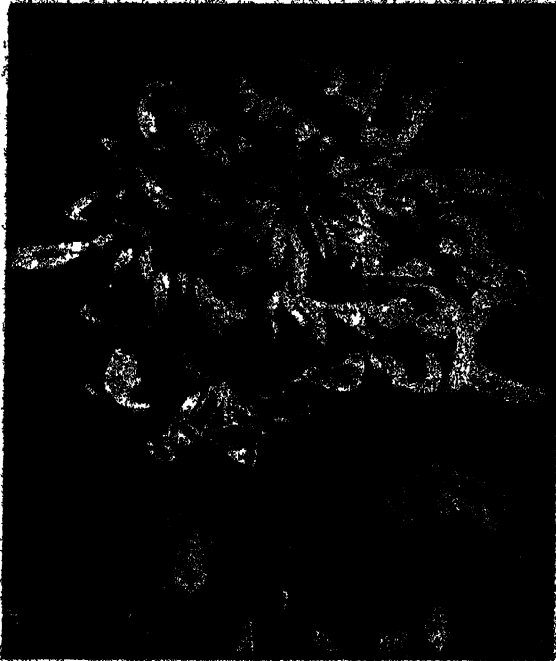
এই সংখ্যায়

জৈষ্ঠ ১৩৯০ সংখ্যা

প্রসঙ্গ : গোধূলি-মন

০ শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু সংখ্যা হাতে পেয়ে চমৎকৃত ও চমকিত হলাম। বাংলা সাহিত্যের কোন কাগজ যা পারেনি, আপনি তা পারলেন। আপনার সাহস ও নিষ্ঠাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়
পোঃ মটুকবনী, ভায়া-বালিতোড়া, বাঁকুড়া।

০ নিয়মিত একটি কাগজ প্রকাশ করা যে কতো শ্রমসাধ্য ও আন্তরিক উদ্যোগ প্রয়োজন তা মনে প্রাণে বুঝেছি, সূর্যতৃষ্ণ প্রকাশ করতে গিয়ে। গোধূলি-মন-এর 'শুদ্ধসত্ত্ব বসু' সংখ্যা প্রকাশ করে তুমি লিটিল ম্যাগের নির্ভিক দায়িত্ববোধ ও সচেতনতার পরিচয় দিলে। যিনি দীর্ঘ ৪০ বৎসর কাল নিরলস যত্নে এবং প্রচার বিমুখ হয়ে একক প্রকাশ করে চলেছেন—তার উদ্দেশ্যে নিবেদিত সংখ্যাটি যেন সমূহ লিটিল ম্যাগাজিনের তরফ থেকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানানো, যা ব্যবসায়িক কাগজকে তাদের মনোবৃত্তির দীনতার দিকনির্দেশ করলো।

গোধূলি মন-এর ছাপা পরিচ্ছন্ন হলেও দু'একটা ত্রুটি তুলে ধরছি, যা সংশোধন করলে ভালো হবে। বিশেষ করে গদ্যগুলি যদি দুটো কলমে ছাপা হয় তাহলে পাঠকের চোখে তা বিরক্তকর হয়না। এই সাইজের কাগজে কম পক্ষে দুটি কলম দরকার, বিশেষত গদ্যের ক্ষেত্রে।

সন্তোষ কুমার মাজি
নরেন্দ্রপুর, ২৪-পরগণা

০ আশাতীত ভাবে রবীন্দ্র সংখ্যাটি হাতে এসে পৌছল। প্রবন্ধ, কবিতা ও সমাচার সমৃদ্ধ এমন একটি পত্রিকার জন্য আমার মত অনেক সাহিত্য অনুরাগী চাতকের মত অপেক্ষায় দিন গুণছে। কারণ সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায়ের নিষ্ঠা ও পত্রিকার কলেবরকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলতে তার নিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা না করলে সত্যচ্যুৎ হবার দায়ে নিজেকে অপরাধী মনে হ'বে। তাই সত্য কথনের মধ্য দিয়ে আমার আত্মার আত্মতৃপ্তি।

গোপাল চক্রবর্তী
বালি, হাওড়া।

০ একজন অগ্রজ স্বনিষ্ঠ কৃতী কবিকে অনুজের শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর যে সহজ কর্তব্য বর্তমান দুরূহ প্রতিকূলতার মধ্যেও আপনি যে তা যথাযথভাবে অনুসরণ করে চলেছেন শুদ্ধসত্ত্ব বসু সংখ্যাটি তার প্রোজ্জ্বল নিদর্শন। কবি শুদ্ধসত্ত্ব বসু আমার মতো অনেকের কাছে যিনি শ্রদ্ধার 'শুদ্ধদা' গদ্যে পদ্যে বাংলা সাহিত্যকে যে পুষ্টি যুগিয়ে যাচ্ছেন বার বছরের মাপে তিন যুগ ধরে তার মূল্য অনস্বীকার্য। আমাদের অনেকের হয়ে আপনি এই সংখ্যাটি প্রকাশ করে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন কুড়িয়ে নিলেন। শুদ্ধদাকে উন্মোচিত করতে অনেকখানি সাহায্য করবে এই সংখ্যাটি।

মনোরঞ্জন খাঁড়া
বরনান, মেচেদা, মেদিনীপুর।

০ আপনার পাঠানো পত্রিকা আজকেই পেলাম। দারুণ লাগলো। এখানে সবাই প্রশংসা করছে get up এবং সম্পাদনার। জগতবাবুর কবিতাটি সুন্দর হ'য়েছে। আরশি-নগরের সমালোচনাটি খুব মনোগ্রাহী।

সংযম পাল
ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর

০ গোধূলি-মন নিয়মিত পাই। পত্রিকা ক্রমশই ভালো হচ্ছে। ছাপার ভুল কমছে। শুদ্ধসত্ত্ব বসু সংখ্যাতে আপনার আন্তরিকতা স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। সে জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

অজিত ভট্টাচার্য
প্রিন্স্ রোড, মানবাজার, পুরুলিয়া।

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি মন

পঁচিশ বর্ষ / ৫ম সংখ্যা / জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০

প্রতি সংখ্যা এক টাকা
বার্ষিক (সডাক) দশ টা

সম্পাদক
শ্যাম চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

প্রিয় পাঠক, কয়েক সংখ্যা আগেই বলেছিলাম 'শুদ্ধসত্ত্ব বসু সংখ্যা' ছাড়াও আরো কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা উপহার দেবো রজতজয়ন্তী বর্ষে। ইতিমধ্যে ঐ সংখ্যাগুলির ব্যাপারে কিছু কিছু কাজও শুরু হয়ে গেছে— যদিও তা একেবারেই প্রাথমিক স্তরে। লেখক নির্বাচন এবং আমন্ত্রণ জানানো। এই পর্যায়ের প্রথম বিশেষ সংখ্যাটি 'ছড়াসংখ্যা'। 'বাংলাদেশের ছড়া', প্রাচীন বাংলার ছেলেভুলানো ছড়া', 'মননদীপ্ত আধুনিক বাংলা ছড়া' ইত্যাদি প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রবন্ধ / আলোচনা সহ ঐ সংখ্যায় থাকবে প্রবীন ও তরুণ, প্রখ্যাত ও অখ্যাত বেশ কিছু ছড়াকারের নির্বাচিত ছড়া সঙ্গে বেশ কয়েকজন ব্যঙ্গচিত্রীর আঁকা ছবি! ২য় বিশেষ সংখ্যাটি আবু সঈদ আইয়ুবকে নিয়ে। ঐ সংখ্যা শুধুমাত্র প্রবন্ধ সংকলন হিসাবে প্রকাশিত হবে। আইয়ুবের গ্রন্থ আলোচনা, তাঁর দর্শন, তাঁর রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা, তাঁর ব্যক্তিমানস ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। প্রখ্যাত কয়েকজন আলোচককে আমন্ত্রণ জানালেও বিনা আমন্ত্রণে পাঠানো ভাল লেখাও আমরা সাগ্রহে এবং সমান শ্রদ্ধার সাঙ্গে প্রকাশ কোরব।

এই পর্যায়ের ৩য় সংখ্যাটি হরপ্রসাদ মিত্রকে নিয়ে এবং ৪র্থ সংখ্যাটি কবি-ঔপন্যাসিক-গল্পকার-সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে।

সব সংখ্যাগুলির জন্যই প্রিয় পাঠক আপনার কাছেও লেখা পাঠাবার আমন্ত্রণ রইল, বলাবাহুল্য মনোনয়ন সাপেক্ষে।

● সম্পাদকীয় কার্যালয় : নতুন পাড়া ॥ চন্দননগর ॥ হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥ ভারত
● কলিকাতা কেন্দ্র : ৩৩ / ৬ জি নাজির লেন ॥ কলিকাতা-৭০০০২৩

জীবন পঞ্জী

জন্ম : ২৮ আগষ্ট, ১৮৯৬ গোরখপুর (উত্তর প্রদেশ),

১৯১৩ : স্কুল লিভিং পরীক্ষায় (এলাহবাদে) উত্তীর্ণ, এবং বিবাহ ;

১৯১৫ : ম্যোর সেণ্ট্রাল কলেজ „ থেকে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ;

১৯১৬ : অসুস্থতার দরুণ বি, এ, পরীক্ষায় বাধা ; কলেজের শিক্ষণেই গোখলে পদক, শেষাদ্রী পদক ও রানাডে পদক লাভ ;

১৯১৭ : ১৮ই জুন পিতা মুন্সী গোরখপ্রসাদ 'ইবরত' (আইনজীবী) এর দেহাবসান, বি, এ, পরীক্ষায় উত্তর প্রদেশের মধ্যে চতুর্থ স্থান লাভ এবং প্রাদেশিক সিভিল সারভিসে ডেপুটি কালেকটর পদে নিযুক্তি ;

১৯১৮ : আই, সি, এস-এ নির্বাচিত এবং স্বরাজ্য আন্দোলনের শুরু হতেই সরকারি পদে ইস্তফা ,

১৯২০ : কাব্যচর্চা শুরু, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণপতি সহায়ের দেহাবসান। ৬ই ডিসেম্বর প্রিন্স্ অফ ওয়েলসের ভারত আগমনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগদান এবং জওহরলাল নেহেরুর প্রস্তাবে প্রাদেশিক কংগ্রেসে ডিকটেটর পদে নিযুক্তি তথা রফী আহমদ কিদওয়াইয়ের স্বপক্ষে ডিকটেটরশিপে ইস্তফা। ১৩ই ডিসেম্বর দেড় বছরের কারা-বাস এবং ৫০০০ টাকা জরিমানা, জেলে বাস করার সময় দেড় বছরে উৎকৃষ্ট উর্দু কবিতা সৃজন ;

১৯২২ : জওহরলাল নেহরুর প্রস্তাবে অখিল ভারতীয় কংগ্রেসে আনডার সেক্রেটারি পদে নিযুক্তি ;

১৯২৩ : আগরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ, (ইংরজি) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার এবং আবেদন-পত্র দাখিল না করেই এলাহবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে প্রভাষক নিযুক্তি, এই বছরেই তিনি উর্দু সাহিত্যের 'শায়র-এ-আজম' খেতাব লাভ করেন ;

১৯২৭ লখনউ ক্রিশ্চান কলেজে অধ্যাপক পদে নিযুক্তি ;

১৯২৮ কানপুরের বি, এন, এস, ডি, কলেজে ইংরেজি ও উর্দু বিভাগের প্রধান হিসেবে নিযুক্তি ;

১৯৫৮ এলাহবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ ;

১৯৫৯ বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে-এর জাতীয় গবেষণা পরিষদে প্রধান নির্বাচিত ;

১৯৬১ উর্দু কাব্যগ্রন্থ 'গুলে-নগমা' সাহিত্য আকাদেমি এবং উত্তর প্রদেশ সরকার দ্বারা পুরস্কৃত ;

১৯৬৫ জাতীয় গবেষণা পরিষদের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ ;

১৯৬৮ উন্নতধর্মী সৃজনশীল কাব্য-রচনার জন্যে রাশিয়া থেকে 'সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার' তথা 'পদ্মভূষণ' খেতাব লাভ ;

১৯৭০ : সাহিত্য আকাদেমির পঞ্চম সদস্য (ফেলো) নির্বাচিত, ৯০টি সংগীত প্রধান উর্দু কবিতা সংকলন 'গুল-এ-নগমা' (বাগানের ফুল) র জন্য 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার লাভ ;

১৯৮১ : গালিব পুরস্কার লাভ ;

১৯৮২ : ৩রা মার্চ নয়া দিল্লিতে জীবনাবসান।

জীবন ও কবিতায় ফিরাক গোরখপুরী

অজিত রায়

উর্দু ভাষাপ্রেমী অনেক সমালোচক উর্দুকে ভারতবর্ষের 'আমফহম' এবং 'মুশর্তকা জবান'-এর সম্মান দিয়েছেন। সেই উন্নত উর্দু ভাষার শরাব-শাকী-জ্যাম-মহফিল-ওয়ালা রুমানী কাব্যসাহিত্যকে যিনি দিয়েছেন 'সদা বাহার ঔর সদা সোহাগে'র সংজ্ঞা, সেই প্রাজ্ঞ, প্রবীণ, মননশীল জনপ্রিয় উর্দু শায়র ফিরাক গোরখপুরীর গত বছর ৩রা মারচে আকস্মিক জীবনাবসান, শুধু উর্দু কাব্য-পিপাসু মানুষের কাছেই নয়, তামাম হিন্দুস্তানের লক্ষ লক্ষ সাহিত্য-প্রেমী মানুষের বুকেই গভীর বেদনার মোচড় দিয়েছে। কারণ, শুধু কাব্য-কবিতাই নয়, শের কিংবা গজলই নয়, নজম অথবা কতএ-ই নয়, রুবাই কিংবা অদবই নয়, ফিরাক সর্বতো ভাবে নিজেকে নিবেদিত রেখেছিলেন সমাজ, দেশ আর দশের নানা উন্নয়নমূলক কাজে—ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক্ স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজবাদ আর ধর্ম-নিরপেক্ষতার প্রচারে তাঁর ভূমিকা ছিল পুরোভাগে। সবের মধ্যে তাঁর সঞ্চরণ-বিচরণ ছিলনা কোনো তালগোল পাকানো ভুয়োদর্শী ব্যাপার। অর্থাৎ, সমস্ত অন্যায়-অবিচার আর অপ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ ছিল ক্ষমাহীন। কতটা সাফল্য পেয়েছেন সেটা বড় কথা নয়, লড়াকু ফিরাক যে কোন অন্যায় অবিচারের বিরোধিতা গ্রাহ্য করে নিষ্ফল মাথা কুটে ক্ষান্ত হন নি, সেটাই বড় কথা।

ফিরাক বলেছিলেন 'অদব (সাহিত্য)-এর কোনো মকসদ (লক্ষ্য) থাকেনা। তিনি মনে করতেন, 'অল আরট ইজ ইউজলেস'। এ উক্তির উদ্ধরণ কিন্তু ফিরাককে দায়িত্বজ্ঞান শূন্য, উদার কিংবা বেপরোয়া কবি হিসেবে চিহ্নিত করে না, কারণ ফিরাক (পিতৃদত্ত নাম রঘুপতি সহায়) অত্যন্ত সতর্ক এবং চিন্তাশীল কবি তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'আমি যখন যা বলি সেটাই আমার বক্তব্যের সার ধরলে ভুল হবে'। তিনি লিখেছেন, 'আওয়াজ কখনো কিছু বলবার ওপর নির্ভর করেনা, কণ্ঠ কখনো মনের অপেক্ষায় থাকেনা। শেরের ভেতর যেমন সাইলেনসার (মৌন) থাকে, কবির কথার পিঠে থাকে তেমনি তাৎক্ষণিক উত্তেজনার ঝাপটা মুখ হাঁ করিয়ে জিভ যা বলে, সেটাই কবি-মনের সব নয়।'

ফিরাক মুখে মুখে শের বানাতে পারতেন, যেগুলিকে মুহম্মদ হসন অসকরী নাম দিয়েছেন দিয়েছেন 'আহটোঁ কী শায়রী' অর্থাৎ নিঃশব্দতার শব্দমালা। ফিরাকও শায়রীর জন্যে 'শব্দমালা' কথাটিকেই ব্যবহার করবার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি কবিতা আর শেরকে আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা করেছেন—যা মনকে ছুঁয়ে যায় তাই শের, আর কবিতা লেখা হয় যোগীর ধ্যান ভাঙানোর জন্য কবিতা যখন দীর্ঘ হয় কাব্য হয়ে উঠে, শের যখন দুটি পংক্তির সীমা ছাড়িয়ে যায় তাকে বলা হয় শায়রী। কিন্তু কবিতা আর শেরের মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। যদিচ, কবিতা এবং শের, দুটিতেই কবিসত্তা স্বয়ং দীপ্যমান, তবুও আধার-ভেদে ভাব ও ভঙ্গি এবং আঙ্গিক ও শব্দ গঠনের দরুণ প্রকাশে যে কিছু কিছু নিজস্ব বিশেষতা দেখা দেয়, তাকে নাকতোলা করা যায় না। এই পারস্পরিক ভেদাভেদে ফিরাক গোরখপুরী অবশ্যই কবি নন, শায়র। কবিতার জন্য নন, শেরের জন্যে তিনি 'ফিরাক'। তাঁর শেরে সাধারণ রূপের রসাভিব্যক্তি, শায়রীতে রসের পূর্ণ-পরিণতি। তাঁর শেরের 'ম্যায়' বা 'হম'-এর প্রকাশ, শায়রীতে 'তুম' বা 'তুমলোগোঁ'র ধারণা। পক্ষান্তরে বলতে হয়, ফিরাক নিজে যেমন আত্মকেন্দ্রিক ছিলেন না, তেমনি তাঁর রচনাও সর্বজনীনতা প্রাপ্ত।

জীবনের আদর্শ আর দর্শনের দিক থেকে কোন এক অলক্ষ্য শক্তি তাঁর পুরো ৮৬ বছরের জীবনকে রেখেছিল তাবৎ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কুত্রিম প্রভাবের অতিরেক

থেকে সম্পূর্ণ রূপে নিবৃত্ত এবং প্রথম জীবনে যা ছিল সবেধন নীলমণি, সেই বুদ্ধি আর মনুষ্যত্ব পরবর্তী জীবনে হয়েছিল একমাত্র সম্বল। তিনি স্বীকার করতেন, সাহিত্য রাজনীতির উর্দ্ধে নয়, ব্যক্তি-জীবনেও তিনি ছিলেন পুরোপুরি রাজনীতিক মানুষ, কিন্তু রাজনীতিকে ঘেঁষতে দেন নি নিজের কোনোও শেরে, গজলে কিংবা রুবাইয়ে। ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় তিনি জন্মসূত্রে হিন্দু হয়েও, ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। অকবর ইলাহাবাদীকে উৎসর্গ-কর তাঁর দুটি শের ছিল এই রকম :

অজীব লোগ থে হিন্দু হো য়্যা মুসলমাঁ।
কি বাত বাত মেঁ ভাঈ সে লেতে থে টক্কর।
তেরে সওয়াল পে হর তক তরফ থা সন্নাটা
হমারে দেশ মেঁ হ্যঁয় আদমী কি ঘনচক্কর।

উর্দু ভাষা থেকে ফারসী আর আরবী শব্দগুলিকে বের করে দিলে উর্দু তখন আর 'উর্দু' থাকে না, হয়ে ওঠে হিন্দি। দুটি ভাষাই এসেছে খড়ী বোলি থেকে। তাই পরকীয় শব্দগুলিকে বর্জন করলে উর্দু হিন্দীতে প্রভেদ থাকে না। এই বিশেষ দিকটি নিয়ে ভেবেছিলেন ফিরাক। আর সত্যি বলতে কি, ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যে ফিরাকের সবচেয়ে বড় কর্মযজ্ঞ হল : উর্দুকে নিজস্ব স্টাইলে ভারতীয়করণ। এখানে 'ভারতীয়করণ' কথাটির তাৎপর্য হল, উর্দুর বিদেশি লিপির (ফারসী) ব্যবহার ছেড়ে উর্দুকে নাগরী লিপির পিরাণ দেওয়া। উর্দু যখন দেশীয় ভাষা, তখন বিদেশি লিপিতে লেখা হবে কেন? এই ছিল ফিরাকের বক্তব্য। তিনি উর্দুর ভেতর থেকে ফারসী ও আরবী শব্দের প্রয়োগ যথাসম্ভব কম করে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির ভেতর থেকে শব্দ-চয়ন করে নিজের শের, গজল, রুবাই প্রভৃতিতে ব্যবহার করেছেন। রুবাইগুলিতে সংস্কৃত নিষ্ঠ শব্দের প্রয়োগের কারণেই এক শ্রেণীর ছিদ্রান্বেষী সমালোচকেরা তাঁর 'শায়র-এ-আজম' মুকুট কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন। অথচ, ফিরাক 'রুবাইকার' হিসেবে সেইসব মুষ্টিমেয় কবির সঙ্গে গণ্য, যাঁরা ভারতেই নয় আন্তর্জাতিক স্তরে পেয়েছেন 'সিদ্ধহস্ত রুবাইকার'-এর সম্মান।

রুবাই লেখা সহজ নয়, এর-শৈল্পিক মাধুর্য লিখে বোঝানো সম্ভব নয়, শুনে বুঝে নিতে হয়। বড় কোমল, সূক্ষ্ম আর জটিল এই সংগীতময় রুবাইয়ের শরীর, যাকে নিয়ে এলোমেলো ব্যবহারে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। গালিব আর ইকবালের পরে জোশ মহিলাবাদী এবং ফিরাক গোরখপুরীই রুবাইকার হিসেবে পেয়েছেন যথার্থ সফলতা। 'রূপ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ৩৫০টি রুবাই (চতুষ্পদী) আজ পাকিস্তান আর ভারতবর্ষে ফিরাককে তুলে ধরেছে জনপ্রিয়তার শেষ চুড়োয়। তাঁর একটি সংস্কৃতনিষ্ঠ রুবাই :

কোমল পদ গামিনী
'কী আহট তো সুনো,
গাতে কদমেঁ। কী
গুনগুনাহট তো সুনো।
সাওন কা লহরা হে
মদ মেঁ ডুবা হুয়া রূপ,
রস কী বুঁদোঁ কী
ঝমঝমাহট তো সুনো॥

ফিরাকের গজলের ভাবে ছিল দর্দ-এ-দিল, দর্দ-এ-জিগরের অভিব্যক্তি আর আঙ্গিকে ছিল সর্বাধুনিকতার সুস্পষ্ট ছাপ। ভাষার সরলতা ও স্বাভাবিকতার ওপর আস্থা ছিল তাঁর। নজম-এ তিনি ততটা পারদর্শী হতে পারেন নি, যতটা গজলে :

রাজ কো রাজ হী রখা হোতা
ক্যা কহনা গর এ্যয়সা হোতা
কটতে কটতে রাঁতে হোতী
য়ে নির্জন ওয়ন য়ে সন্নাটা
কোঈ পত্তা খড়কা হোতা
ম্যঁ হুঁ দিল হ্যয় তনহাই হ্যয়
তুম ভী জো হোতে অচ্ছা হোতা

অনেকের মতে, উর্দু ভাষায় গালিবের পরেই গজলকারের স্থান ফিরাক গোরখপুরীর। কেউ কেউ এও বলেন, মীর তকিমীর ও গালিবের পর শ্রেষ্ঠ কবি ফিরাক। ফিরাক প্রথম প্রথম দাগ, জিগর, দর্দ, মীর হসরত, ফয়েজ প্রমুখের ছাঁদে গজলে হাত পাকিয়ে ফেলে ছিলেন কিন্তু 'স্বতন্ত্র' চিন্তার উদয় হতেই ভিন্ন পথ ধরলেন। উর্দুকে দিলেন 'জনভাষা'র স্বীকৃতি, নিজের সাহিত্যকে নিয়ে গেলেন জীবনবোধের বাঁধানো পথে। যিনি ছিলেন 'শায়র-এ-শবাব' (প্রেমের কবি) তিনি তুলে নিলেন সংগ্রামী তলোয়ার, আর হয়ে উঠলেন 'শায়র-এ-ইনকলাব' (বিপ্লবী কবি)। বাহারউদ্দিন লিখেছেন, 'মধ্যযুগীয় সামন্ত চেতনা থেকেই তাঁর (ফিরাকের) কবিস্বরূপের যাত্রা—আর এক উত্তরণ ঘটল আধুনিক কালে, এলিয়েট-পাউনডের বুদ্ধিবাদী জগতে'। ফিরাক ছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির কবি। তিনি ছিলেন হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সংগমের স্বপক্ষে; এই কারণেই তিনি হিন্দু মিথের গামাম প্রতিকগুলিকে শেরে দিয়েছেন শৈল্পিক অমরত্ব। 'ধুপছাট' 'চিরাগো' 'রুহে কায়নাত' 'শব্দমিস্তা' 'আন্দাজেঁ' প্রভৃতি সংকলনগুলিতে ইশক আর মুহব্বতে বুদবুদ যে শরাবের জামে তুলেছেন, সেই পেয়ালাতেই হিন্দু উপনিষদের (আরণ্যক) মন্থন করে উপহার দিয়েছেন অবদমন-মনের যথার্থ উপলব্ধি:

> ফিতরত কী খনওতোঁ মে ডালে ডেরে
> পেচোখম জীস্ত কে লগায়ে ফেরে
> পিন্হা থে জো দুনিযা কে কুতুবখানোঁ মে
> ওয়ো রাজ খুলে হ্যায় জংগলোঁ মেঁ তোর।

এখানে কবি উপনিষদের ব্যাখ্যা করেছেন হিন্দু ঐতিহ্য-পরম্পরার সূত্র ধরেই, এই গতিজ বিবর্তনে বিশ্বাসী বিশ্বাসী ফিরাকের গজলে তাই আমরা দেখতে পাই আরব-ইরানের সহ-বর্ণন। নজম-এও তাই। এই বাঁকের মুখেই কাব্য-কৃতি বা বিষয়ানুগত্যের প্রশ্নে ফিরাকের বিপ্লব। তিনি 'শায়র-ই-ইনকলাব' তকমার অধিকারী। তাঁর বিদ্রোহ—হিন্দু ও ইসলাম চেতনার গতানুগতের প্রতিবাদে। সাম্প্রদায়িক হীনতাকে দিয়েছেন 'মাতম'র সংজ্ঞা।

গজল, নজম, কতআ, রুবাই—তাবৎ শের-শায়রীর কাব্য-কৃতিতে, হিন্দু মিথপোলক্ষ প্রতীক অন্বেষায় হিন্দু ধর্ম-গ্রন্থগুলির (রামায়ণ ও মহাভারত) শরণ নেওয়া উর্দু কবি ফিরাকের লেখন-বৈশিষ্ট্যের আর এক ঘটনা। তবে, তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতি ছিলেন না আসক্ত। ধর্মের আঠা বাঁচিয়েই তিনি গিয়েছেন রামায়ণ-মহাভারতের ধারে! আর এই কারণেই উর্দু কবিদের 'শায়র-এ-নামা'র ভিড়ে মীর, দর্দ, দাগ, জিগর, গালিব, হালি, ফয়েজ, হাফিজ, ইকবাল, জোশ, আশাদ, হসরত প্রমুখ প্রথম সারির কবিবৃন্দের মধ্য থেকে ফিরাককে আলাদা করে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না আমাদের।

ফিরাক গোরখপুরী ওরফে রঘুপতি সহায়, যিনি জন্মসূত্রে ছিলেন হিন্দু রীতি-নীতি ও হিন্দু ধর্মের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত অথচ আজীবন ধর্মনিরপেক্ষ থেকে উর্দু সাহিত্যের বাগিচায় করে গেছেন ফুল ফোটানোর কাজ, তাঁর মৃত্যুর পর সেই ফুলের সুবাস আরও ছড়িয়ে পড়বে চতুর্দিকে, সে বিশ্বাস আছে; কিন্তু সেই অদ্বয় স্রষ্টা, সেই প্রতিভার মৃত্যু উর্দু সাহিত্যের জমিতে অনাবৃষ্টির মতই অপূরণীয় ক্ষতি, তাঁর মৃত্যু আরও দুঃখের কারণ উর্দু সাহিত্যের আকাশ থেকে এক হিন্দুজাত মনীষা-নক্ষত্রের পতন ঘটল। বিদায় ফিরাক! বিদায়! শোক কখনো কালজয়ী নয়; তবুও এ-পৃথিবী সদা জাগ্রত, কেউ ভুলবে না তোমার কথা, সবাই জেগে রবে, তুমি ঘুমোও:

> অল ফিরাক অল বিদা হে অহলে ওতন
> ইক অনসুনী আওয়াজ বুলাতী হয়।
> অব তুমসে রুখসত হোতা হুঁ
> নয়ে তরানে ছেড়ো, মুঝে নীদ আতী হয়॥

ফিরাকের কবিতা ঃ কয়েকটি খণ্ড অংশ

গজল ঃ

রাত আছে, ঘুমও আছে, কাহিনীও
হায় কী জিনিস এই যৌবন
জীবনে আগুন আছে, শীতল জলও
একটু ছুঁই তোমার উষ্ণ শরীর,
ভেঙে ভেঙে পড়ে শুধু
ক্ষণভঙ্গুর এই অপরূপা শরীর।

রুবাই ঃ

যখন রাতের প্রহর একে একে
নিলাম হতে থাকে
সোহাগ করি তোমার শরীর
শরীর শরীর উষ্ণ শরীর
যদি ভালোবাসা থাকতো কোথাও
খুঁজে পেতাম এখানেই
যা নেই তাকে কেন
বৃথাই খুঁজে ফিরি।

কতআ ঃ

অঙ্গুলি ওঠে ফিরাকের
স্বদেশের সবুজ সৌম্যতায়
আজ সে ঘুরে ফেরে
শুধু তিলে তিলে বেঁচে থেকে।

নজম ঃ

অনাগত সেই দিনে, তোমাকে মনে করিয়ে দিই
আমার প্রতিক্রিয়া হয়তো অনুভূত হবে
যখন তুমি বুঝবে, তুমি জানতে পারবে
তুমি ফিরাককে দেখেছিলে।

[মূল উর্দু থেকে সরাসরি বাংলায় তরজমা : অজিত রায়]

০ কবিতা ০

বয়স চলে যাচ্ছে / শৌনক বর্মন

চ'লে যাচ্ছে আমাদের পুতুল খেলার বয়স……

তাই বুঝি কেউ আর গোলাপ দেয় না
গোলাপ উপহারের অর্থ যে বুঝতে শিখে গেছি
অথচ কৈশোরে কত গোলাপ পাঁপড়ি করেছি কুটিকুটি

পুতুল খেলার বয়স কখন যে পেরিয়ে গেছি
আমার কৈশোরের বালিকা এখন ভরাবুক যুবতী
আমি এখন ছিলা ছেঁড়া মূহ্যমান এক যুবক
কিশোর কিশোরী বয়সের সাথে ভেসে গেছে পুতুল খেলাঘর
হিম রহস্য নিয়ে এখন আমরা যুবক-যুবতী।

যাবার সময় / নিরঞ্জন দে চৌধুরী

তখনো ট্রেন ছাড়তে দেরী। অবুঝ আঁধার ছিন্ন ক'রে
দূরের সিগনালের সবুজ তখনো ঠিক জ্বলে ওঠেনি।
যাবার সময় তুমি হঠাৎ খুব প্রগলভ ব'লে উঠলে :
অনেক কথাই বলার ছিল, কিন্তু কিছুই বলা হ'লনা!

শোনামাত্র শিরার মধ্যে সশব্দ এক রক্ত প্রপাত।
উষ্ণ-চোখের খিলান থেকে তখনো সেই সুস্বাগতম
মন্ত্র হ'য়ে ঝ'রে পড়ছে, সুখ তখনো স্মৃতি হয়নি!

কিন্তু এরই মধ্যে আবার ঘরে ফেরার হা-কোলকাতা!

ট্রেন ছাড়ল। প্লাটফর্মে টানে উজান বেলা।
দু'গালে বিস্রস্ত চুলের ভরা কোটাল, কেবল তোমার
মৃণাল নিন্দিত বিদায় বরাভয়ের মুদ্রা হ'য়ে
দুলে উঠ্‌ল, দুলে উঠ্‌ল, মুহূর্ত নয়, সারা জীবন!

দেওয়াল

বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়

জানা ছিলো
দেওয়াল আড়াল দিতে জানে
সংকীর্ণতার খড়ি দিয়ে
গণ্ডির স্বরে ও ব্যঞ্জনে
ছন্দহীন পদ্য লেখা হয়—
এ্যাতোদিন এটুকু জেনেছি

বাবা, আজ শারীরিক নও—
দেওয়ালের ফটো হয়ে আছো

দেওয়াল সম্পর্কিত ধ্যানধারণাগুলি
অন্য ভাবনায় অন্যস্রোতে
বইতে শুরু হলো—
সাবলীল কবিতার মতো
দেওয়াল এখন আন্তরিক

দেওয়ালের বেষ্টনের ভিতর—
ফ্রেমের ভিতরে বাবা তুমি!!

০ কবিতা ০

আমরা জানি বলেই / ফারুক নওয়াজ

মেঘে-মেঘে এতো অভিমান অথচ নীলিমায় কোনো চাতক
পক্ষী নেই
পূর্ণিমার এতো হুটোপুটি অথচ বিষন্ন অন্ধকার
আমার চোখে স্ট্যাচু হয়ে আছে ; পিরামিড হয়ে আছে।
হ্যাখো, হ্যাখো এই সবুজ বনভূমি বাতাসে পেণ্ডুলাম
অথচ ভাষাহীন যন্ত্রণায় বৃক্ষরা মৃয়মান মূক...

রবীন্দ্রনাথ, আমরা বধির হয়ে যাবো, মূক হয়ে যাবো
আমরা সবাই এখোন অন্ধ তীরন্দাজ !
এ তীর কোথায় নিক্ষেপ হলে ভালো হয়—
কি করে বুঝবো বলো, কি করে বুঝবো ?

আমি চিৎকার করে বলতে পারি ;
এমন বন্ধ্যা সময়ে জন্ম নিলে 'বাল্মিকীর রামায়ণ' লেখা হতোনা
কালীদাসের 'মেঘদূত' মেঘের অভিমানে প্রকাশ রয়ে যেতো।
এমন হন্তা সময়ে জন্ম নিলে গোর্কী ও তলস্তয়
গ্রাম্য মুদিখানায় দোকানদারী করতেন।
আমি চিৎকার করে বলতে পারি—
আপনিও নোবেল পুরস্কার থেকে রীতিমতো বঞ্চিত হতেন
বঙ্গজ রবীন্দ্রনাথ।

শেক্সপিয়র, আমরা ক্যাকন আছি, শুনবেন ?
ওফেলিয়াকে কবরে শোয়াবার সময়
আগন্তুক হ্যামলেট যেমন বদরাগী হয়েছিলো ;
যেমন শোকাভিভূত হয়েছিলো
তখোন প্রেমবিদ্বেষী হ্যামলেটকে যেমন স্ত্রৈণ মনে হচ্ছিলো
আমরা ঠিক তেমন আছি,
আহারে ছিন্ন-ভিন্ন, হৃদয় কুটি-কুটি বদরাগী
শোকাভিভূত যুবক আমরা।

আমরা কক্ষচ্যুৎ 'দ্রাবিড় নক্ষত্র' ; ক্যামন টাল-মাটাল
ছুটোছুটি করছি

আমরা সবাই অপেক্ষমান যাত্রী, কাংখীত ষ্টেশনে
যাবো বলে লাগেজ, হোল্ডল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি
এই বিশাল প্লাটফর্মে।
অথচ কোনো ট্রেন এই ষ্টেশনে থামছেন না

রবীন্দ্রনাথ, আমরা ক্যামন আছি, শুনবেন ?
যেমন বেঁচে থাকে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুমুখী সৈনিক,
যেমন বেঁচে থাকে প্রসবোন্মুখ যন্ত্রণায় কাতর জননী।

প্রিয় রবীন্দ্রনাথ, প্রিয় শেক্সপিয়র !
তবুও আমরা বেঁচে আছি বাঁচার জন্য
তবুও আমি বেঁচে আছি বাঁচার জন্য

বন্ধুকে পাঠিয়েছি চৈনিক পাহাড় প্রদেশে
সেখানে 'শিলাজুতে' চক্ষু-প্রসূণ ;
সে টই-টই করে সমস্ত বন ঘুরে-ঘুরে
যাদুকরী চক্ষু-প্রসূণ থেকে রস এনে দেবে ;
চোখে লাগাতেই অন্ধত্ব ঘুচে যাবে ।

আমরা জানি, আমাদের প্রচণ্ড ধারণা
চোখ খুলে গেলেই আমাদের তীরগুলো
লক্ষ্যস্থান ভেদ করবে......

আমরা জানি; আমরা জানি বলেই
যন্ত্রণার মধ্যেও যন্ত্রণাহীন
আগুণের মধ্যেও দগ্ধহীন
মৃত্যুর মধ্যেও মৃত্যুহীন—
বেঁচে আছি, বেঁচে আছি ।

০ কবিতা ০

নতুন শত্রু / মনোরঞ্জন খাঁড়া

শত্রুর মধ্যে গজিয়ে উঠছে শত্রু
শয়তানের ভেতরে আর এক শয়তান মুখ বদল করছে
মাটি ও কোদালের কাব্য অনেকের খুব ভাল লাগে হেঁ-হেঁ
ধুরন্দর প্যাঁচাল প্রকৃতি
কানি ছিঁড়ে পোঁদ বেরিয়ে পড়লে বৃদ্ধার চোখ ঘুলান হাসি
অভদ্র দাঁতের কারুকাজ ওসব কিছুনা শুধু প্রগতি প্রগতি…
খাঁটি প্রগতির লম্বা পোষ্টার খাঁটি সমানাধিকারের লম্বা মিছিল
দাও দাও আরও দু'চারটি লটকে দাও গায়ে পিঠে

বেঁচে থাকা / অরুণ মণ্ডল

সারাটা দিন
কাজের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া ডুবে থাকা
যার জন্য এঘর ওঘর করা
যার জন্য আজ ঘর ভাঙা
সেই হয়েছে পর।

সারাটা রাত
ঘুমের মধ্যে জেগে থাকা, স্বপ্ন দেখা
যার জন্য আজ জেগে থাকা
যার জন্য আজ স্বপ্ন দেখা
সেই হয়েছে পর।

আসা যাওয়া / কৃষ্ণেন্দু বসু

এলেই যদি, কেন এতো দেরী করে আসা ?
যখন পুড়ছে বুক, আগুণ লেগেছে সর্বনাশা।
এলেই যদি, আবার ফিরে কেন যাওয়া—
যখন দুলছে নৌকা, লাগলো পালে হাওয়া ?

কৃষ্ণচূড়ার রঙ / বীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায়

এতো দ্বিধা কেন,
দাওনা তোমার রঙ একটু ঢেলে
আমার এ ধূসর প্রাণে।
বসন্ত বাতাসের মতো
উচ্ছল মানুষের মন খুঁজে খুঁজে
বড় ক্লান্ত আমি, বড় ক্লান্ত।

কিশলয়ের হাসির মতো
তোমাকে দু'চোখ ভরে দেখে নিতে
বড় সাধ জাগে।

কৃষ্ণচূড়া, কেন এতো দ্বিধা,—
দাওনা একটু রঙ্
আমার এ প্রাণে।

বর্ষায় / অভিজিৎ ঘোষ

আকাশ উপুড় করা ঘনবর্ষায়
সবকিছু ধূসর আবছা হয়ে যায় ;
জটিলতার ক্ষিপ্রতম ফাঁস খুলে
স্মৃতির টুকরো নিয়ে শুরু হয় খেলা

স্মৃতির ভিতরে কারা আছে
কারা কারা এসেছিলো, গেছে
দূরের দরজায় মনে পড়ে……

আকাশ উপুড় করা ঘনবর্ষায়
সবকিছু ধূসর আবছা হয়ে যায়
বুকের ভিতর শুরু হয়

খেলা…

০ কবিতা ০

ভাঙছে ভাঙছে এবং ভাঙছে / মনোরঞ্জন খাঁড়া

ভাঙছে নিয়ন টিন কাচ ও আরাম চেয়ার
ভাঙছে উৎখলের ফোকরা কল ও বাস্তুঘুঘুর বাসা
ভাঙছে বড়বাবু মেজবাবু ছোটবাবু
ভাঙছে বড়গিন্নি মেজগিন্নি নিতা মিতা তৃপা
ভাঙছে লাইটপোষ্ট সিগন্যাল হাউস স্টেশন মাষ্টারের সিগারেটের কৌটো
জমাদারের লাঠি কোঁচানো ধুতির বাবু প্যান্টের বোতাম চেন এ্যাটাচির তালা ইত্যাদি ইত্যাদি
জেলবাবু ক্যাম্বিসের খাট তোতনের স্কুল বাক্স মাসীমার সখের চিরুনী ও জগন্নাথের পট
ভাঙছে...... ..ভাঙছেই
মিডল স্টাম্প উড়ে যাচ্ছে উইকেট কীপারের পেছন
দেখতে পাচ্ছো না তুমিও তো ভেঙে পড়ছ একটু একটু একটু একটু করে।

শারীরবৃত্তিয়—খ / বিশ্বজিৎ ভপাদার

এখন আমরা রেসের মাঠে যাব
কাম্ অন মাই ডীয়ার কাম্ অন
বাজী রাখব বাদামী ঘোড়া সোনালী সওয়ার
কাম্ অন মাই ডীয়ার কাম্ অন
আমাদের ঘোড়া ছুটবে সবাইকে পিছনে ফেলে
কাম্ অন মাই ডীয়ার কাম্ অন
ঐ দেখ শনশন করে এগিয়ে যাচ্ছে বাদামী ঘোড়া
কাম্ অন মাই ডীয়ার
ঐ দেখ এগিয়ে যাচ্ছে সোনালী সওয়ার
কাম অন দেখতে পাচ্ছ
প্রচণ্ড হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে উর্দ্দিপরা সওয়ারের পাগড়ি
কাম্ অন মাই ডীয়ার আমার কাছে এসে বসো
আর একটু আর একটু
আমাকে জড়িয়ে ধরো আমি জিতে যাচ্ছি
কাম্ অন এই শেষ হল বলে
মাই ডীয়ার কিন্তু একি।

আমাকে ছেড়ে দাও মাই ডীয়ার
আমি আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিনা।

রাত্রি ও অন্ধকার / বৃন্দাবন দাস

আমরা আপাত অনেক কিছুই করি—

রাজা পাল্টাই, পাল্টাতে পাল্টাতে একদিন
খুলে নিই মাথার চূড়া, কেড়ে নিই
কোষবদ্ধ অসি – কিন্তু
একজন শাসক ঠিক-ই রাখি

নিয়ম বদলাই, বদলাতে বদলাতে একদিন
পুরোনো সব নিয়মই প্রায় ভুলে যাই—
অথচ একটা নিয়ম ঠিক-ই রাখি :
ভাঙা গড়া আর গড়া ভাঙা

বস্তুত আমরা গুলিয়ে ফেলি
রাত্রি ও অন্ধকারের মানে

০ কবিতা ০

দিবাকর / সুকুমার চৌধুরী

একজন পিওন এসে বদলে নিতে পারতো
আমার জীবন
অথচ আমার জীবনে অলৌকিক কোনো
ডাকপিওনের গল্প নেই
যখনই সময় পাই আমি সেই
না দেখা ডাকপিওনের কথা ভাবি
তার ছবি আঁকি

শীর্ণদেহ, খাঁকি পাৎলুন
কাঁধের ঝোলায় কত বর্ণময় অনুভূতি
স্যুইসাইড লেকের পাশ দিয়ে সে আসবে
সাইকেলে চড়ে

আর ঘন্টি বাজবে ঠুনঠুন
শীতের বাতাস বিলি কাটবে তার রুখু চুলে
খাতার পাতায় আঁকিবুঁকি কাটি
এইসব ছবিটবি
আর অবিকল খাতার পাতার থেকে যেন
নেমে আসে সকালের খবর কাগজওলা
আমি তার শীর্ণ দেহ দেখি, ছেঁড়া পাৎলুন
তারপর হেডলাইনে চোখ বুলোতে বুলোতে
একসময় তেতোমুখে বলে ফেলি :
তোমার কি একটা পিওন হোতেও
ইচ্ছে করে না দিবাকর।

বিনষ্ট ভ্রূণের জন্ম / ভক্তিব্রত চক্রবর্তী

তোমার গর্ভের মধ্যে বিষাক্ত বীজের ভ্রূণ—
মাগো—
বিকলাঙ্গ জন্ম দিল আমার শরীর
অন্ধকার জরায়ুতে তৃষিত রক্তের হাতে
আমি ক্রীড়নক
ক্রমে বেড়ে উঠি ভূমিস্পর্শ লালসায়
আশ্বিনের উজ্জ্বল সকালে—যখন হাজার ফড়িং ওড়ে
গায়ে মেখে মায়াবী রোদ্দুর।

কোথায় রোদ্দুর মাগো—
স্তূপাকার পড়ে আছে মৃত ফড়িং-এর শব
বিবর্ণ ঘাসের বুকে—হেমন্তের বিকেলের
রিক্ত পয়োধরে মুখ গুঁজে স্বাদহীন বিতৃষ্ণায়
ফিরে যেতে ইচ্ছে করে
অন্ধকারে—জরায়ুর গোপন গভীরে—

আমার শরীর পোড়ে গোপন অসুখে
আমি দেখি সারাদিন—মানুষের মুখ নয়
পচে ওঠা দুর্গন্ধ শবের এক ভয়ার্ত মিছিল
ক্রমাগত হেঁটে যায় ক্ষোভে অভিমানে
ধৌলি পাহাড়ের থেকে শান্তি কেড়ে নিতে—

বিষাক্ত বিষের জ্বরে বিকলাঙ্গ আমার শরীর
মাগো—বড়ো কষ্ট এই পরবাসে।

০ কবিতা

হাতের মুঠিতে হৃদপিণ্ড / মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

ফুস ফুসে ভর্তি আছে অক্সিজেন
আমি শোধন করছি বিষাক্ত বাতাস
নাগিনীর মাথায় পা রেখে জীবনের স্বপ্ন দেখছি।
নীল রক্তে ফুটছে গোলাপ কণক চাঁপা ফুল
দৌড়ে পালাচ্ছে নীলবর্ণ শৃগাল
জাতীয় শিল্পে ভিটামিন ও প্রোটিন শর্করা খুঁজতে গিয়ে
রাজনৈতিক নেতা ও শিল্পী শুনতে পেলো
অগণিত মানুষের আর্তনাদ।
পেটের ক্ষুধা শিল্প ও ভাষণে নিভে জল হয়।
হাতের মুঠিতে হৃদপিণ্ড মাংসের ফুল
আগুণ ছড়াচ্ছে
আকাশ ছিঁড়ে নামছে কালপুরুষ
এখন কঠিন অস্ত্রাঘাত প্রতিজ্ঞা পূরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রজন্মান্তরে / উৎপল মুখোপাধ্যায়

রক্তের ভিতরে আমি একা নই, বহু প্রজন্মের বীজ
অক্ষয় উজ্জ্বল, নির্বিরোধ জেগে আছে অহঙ্কারে
আশ্চর্য সুন্দর আকাঙ্খায়, আলো ও আঁধারে, তৃষ্ণার ভিতর
ক্লেশে দৈন্যে স্বপ্নে তাপে সশব্দে সঙ্গীতে
যে ভাঙ্গে ব্যথার শব কালো রাতে এই করতলে।
আমি ভাবি-আমার চৌদিকে শত নৌকা ভেসে যায়
শোকের, দুঃখের, লালনীল প্রেমের রেখার
ঢেউ টানি পার হই অস্পষ্ট আওয়াজে দিন
আয়ু টুকু বুকে ধরে আসমুদ্র জীবনের ঘ্রাণে।
বুকে কাঁপে হাড়, হাড়ে লাগে এ কালের দজ্জাল বাতাস
উর্মিতলে মনে হয় একা নই-রক্তের ভিতরে এক অন্য রক্ত
কাজ করে চলে।

খরা / অশোক মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়

আগ্রাসী আকাল ভরা মাঠে
মৃত্তিকার লাল ধুলো ওড়ে—
ধীরে ধীরে কালো হয় রোদ
বেদনার জলছবি ফুটে ওঠে
নীলচোখে-কপোলে-কপালে

প্রকৃতি পালিতগুলি বুভুক্ষ নয়নে
উপভোগ করে
নিসর্গের নিষ্করুণ ছবি—
ঘুণপোকা।

নির্বিকার দিন যাপন
ঈশিতা ভাদুড়ী

এই হ্রদে, এইখানে
ঢেউয়ে এবং ঘাসে
জলের মধ্যে মিশে গিয়ে
আমরা হেসে যাই,
আমরা কেঁদে যাই,—
এই নিরীহ হৃৎ স্পন্দনে
কোনো অহংকার নেই।
তবু শূন্যতার হিসেব ডিঙিয়ে
এক আধটা জ্যোৎস্না রাতকে
আমরা স্মরণীয় করে তুলি।
আমরা শুয়ে থাকি।
নির্দিষ্ট ভূমিকায় স্থির এই
দিন যাপনে
কোনো সুখ অথবা সম্মোহন নেই,
কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে
আমরা নির্লিপ্ত
এই হ্রদের ধারেই নিরন্তর।

০ পত্র পত্রিকা

০ একক | ৪১ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা | মাঘ-চৈত্র ১৩৮৯

সম্পাদক ॥ শুদ্ধসত্ত্ব বসু / ১০-৩ সি, নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীট, কলিকাতা-২৬। এ সংখ্যার সম্পাদকীয়ে বিগত ৪১ বছরের স্মৃতিচারণা করেছেন একক সম্পাদক কবি শুদ্ধসত্ত্ব বসু। আধুনিক কবিতা বিষয়ক দু'টি আলোচনা লিখেছেন শিবনারায়ন মুখোপাধ্যায় ও গৌতম কুমার হাজরা। উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন : সিদ্ধার্থ পাল, অজিত বাইরী, দীপক হালদার, শ্যামলকান্তি মজুমদার, সংযম পাল রায়। সম্পাদকের আলোচনা 'ধানবাদের খোট্টাই বাংলা : একটি প্রস্তাব' একটি গবেষণা-ধর্মী আলোচনা। সৈয়দ খালেদা জাহানের 'বাংলাদেশের নাটকে সমাজ ও স্বদেশ চেতনা' ও সোম দত্তের 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার ও লরেন্স' এ সংখ্যার আরো দুটি উল্লেখযোগ্য রচনা। শক্তিপদ রাজগুরুর গল্প 'একা' আকারে ছোট হলেও দাগ কাটার মতো। উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন : মতি মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল অধিকারী ও অমিয়কুমার সেনগুপ্ত।

● পঞ্চমা | ৯, ১০ | কবিপক্ষ ১৩৯০

সম্পাদনা ॥ সোফিওর রহমান ও পরিমল পাল, তের-পেখিয়া, মেদিনীপুর। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে পঞ্চমা তার নিজের বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল হয়ে ধরা দিয়েছে লিটিল ম্যাগাজিন প্রিয় পাঠকের কাছে। বর্তমান সংখ্যাটি দিল্লী প্রবাসী কবি অর্চনা দাশগুপ্তের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। দুটি যথার্থই সুন্দর গল্প লিখেছেন বিজন মজুমদার ও পরিমল পাল, তবে পরিমল পাল কারো কারো কাছে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হতে পারেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কবিতা উত্তরাধিকারের স্বরলিপি এই সংখ্যার আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশ। সুরস্রষ্টা আধুনিক কবিতার গীতিরূপকার ঋষিণ মিত্র। এ সংখ্যার উল্লেখ-যোগ্য কবিরা : কবিতা সিংহ, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবী রায়, সোফিওর রহমান ও অশোক চট্টোপাধ্যায়।

● মহুয়া | ১ম বর্ষ, ১ম সংকলন | বৈশাখ ১৩৯০

সম্পাদক ॥ অজিত রায় / নির্মল ভবন, লুবি সার্কুলার রোড, ধানবাদ-৮২৬০০১। বিহারের ধানবাদ থেকে প্রকাশিত লিণ্ডসে ক্লাব লাইব্রেরীর মুখপত্র মহুয়ার এটি প্রথম সংখ্যা। বাংলার বাইরে থেকে সুদৃশ্য তিনরঙা প্রচ্ছদে এবং অনেকগুলি ভাল প্রবন্ধ / আলোচনা দিয়ে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন করেছেন অজিত

০ স্বদেশ | একাদশ বর্ষ | বৈশাখ ১৩৯০

সম্পাদক ॥ পান্নালাল মল্লিক, মুনসেফ পাড়া, বসিরহাট, ২৪ পরগণা। সম্পাদক যদি কবি এবং শিল্পী হন, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, সুরুচি সম্পন্ন সুন্দর একটি পত্রিকা পাঠকের হাতে তুলে দেবার বাসনা তাঁর থাকে। স্বভাবতঃই সুন্দর পরিচ্ছন্ন একটি পত্রিকা আমরা উপহার পেয়েছি পান্নালালবাবুর কাছ থেকে। এ সংখ্যার উল্লেখ-যোগ্য প্রধান লেখাটি লিখেছেন সম্পাদক 'মানুষ মানুষের জন্য : নন্দলাল : পাবলো পিকাসো'। চেরবণ্ড রাজুর পরিচিতিসহ গল্পটিও এ সংখ্যার আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। অনুবাদ করেছেন বোমমানা বিশ্বনাথম্। ভাল কবিতা লিখেছেন : দেবাশীষ প্রধান, সমীরণ মজুমদার, ও অমিতেশ মাইতি।

০ টুংরী | ২৫শে বৈশাখ ১৩৯০ | ১ম সংখ্যা

সম্পাদনা ॥ ঈশিতা ভাদুড়ী / পুরশ্রী, চন্দননগর, হুগলী রবীন্দ্রপক্ষে প্রকাশিত ক্রাউন সাইজের আট পাতার এই পত্রিকাটির ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে শুধুমাত্র কবিতা নিয়ে। নবনীতা দেবসেন অনূদিত মার্গারেট অ্যাটউডের কবিতাটি ছাড়া আর সবই মৌলিক কবিতা। অন্যান্য কবিদের মধ্যে আছেন আনন্দ বাগচি, অশোক চট্টোপাধ্যায়, ঈশিতা ভাদুড়ী, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রমোদ বসু ও অরুণ চক্রবর্তী প্রমুখ।

○ **কেতকী** | ১৪শ বর্ষ | বসন্ত ১৩৮৯

সম্পাদক ॥ মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় / শিয়ালডাঙা পো: মণিহারা / পুরুলিয়া। কবি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত কেতকীর বর্তমান সংখ্যাটিতে একমাত্র আলোচনাটি লিখেছেন করুণা সেন। সাম্প্রতিক কবিতায় সমাজ চেতনা (দুই)। পরিচিতি সহ কবিতা গুচ্ছ প্রকাশিত হয়েছে সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি রায় ও নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের। উল্লেখযোগ্য আরো কিছু কবিতা লিখেছেন : ঈশ্বর ত্রিপাঠী, ডলি দত্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অজিত বাইরী অশোক চট্টোপাধ্যায়।

○ **ব্রাত্য** | ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা | বৈশাখ ১৩৯০

সম্পাদন ॥ গৌর বৈরাগী/সনৎ মান্না, এ, সি, চ্যাটার্জী লেন, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর। কবিপক্ষে প্রকাশিত ১ম সংখ্যাতেই 'ব্রাত্য' লিটিল ম্যাগাজিন-বোদ্ধা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সমকালীন ছোট গল্প নিয়ে সুন্দর বিশ্লেষণাত্মক একটি আলোচনা 'কিছু কথা প্রসঙ্গে'। সাম্প্রতিক ছোটগল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে আর একটি মননশীল আলোচনা করেছেন উশীনর চট্টোপাধ্যায়। এ-সংখ্যার একমাত্র গল্পটি লিখেছেন নব বন্দ্যোপাধ্যায়।

○ **জলপ্রপাত** | চৈত্র-বৈশাখ ৮৯-৯০

সম্পাদনা ॥ নিভা দে / ভাবা রোড, দুর্গাপুর-৭১৩০২৫ বিভূতি পত্নী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারটি এ সংখ্যার উল্লেখযোগ্য লেখা। তাছাড়া লিটিল ম্যাগাজিন নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন অসীম কুমার সরকার। নিভা দে ও কমল সেনের কবিতা দুটি সময় সচেতনার সাক্ষ্য দেয়।

○ **গ্রন্থিক** | ত্রিবেণী সংখ্যা

সম্পাদক ॥ অসীম ঘোষ হাজরা, ডি-এন, ৫/৫ বি, টি, পি, এস, টাউনশীপ। ডাকঘর : ত্রিবেণী, হুগলী-৭১২৫০৩ ত্রিবেণীর ম্যাপ সহ আর্ট পেপারে মোড়া প্রচ্ছদে সাজানো গ্রন্থিকের বর্তমান সংখ্যাটিতে ছোট ছোট বেশ কিছু আলোচনা গ্রন্থিত হয়েছে। অসিত মণ্ডলের 'ত্রিবেণী—অতীত থেকে বর্তমান' একটি তথ্যবহুল আলোচনা প্রাক-স্বাধীনতাযুগে ত্রিবেণীর রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস প্রসঙ্গে' লিখেছেন সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরানো দিনের ত্রিবেণীর গল্প শুনিয়েছেন বাসুদেব দাস, তাঁর 'ত্রিবেণী কালীতলার ডাকাতে কালী'তে। সব মিলিয়ে 'ত্রিবেণী সংখ্যা' নিঃসন্দেহে মফস্বল থেকে প্রকাশিত একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন।

সংবাদ

● ধ্বনির সাহিত্য বাসর

(৩রা বৈশাখ ১৩৯০) ধ্বনি সাহিত্য গোষ্ঠীর সপ্তিতম বাৎসরিক সাহিত্য বাসর বর্ধমানে মণিমার্টে বসে ছিল। সকাল ৯টা থেকে রাত্রি পর্যন্ত অফুরন্ত আনন্দ। অপরাহ্নের ঝড় ঝাপটা ম্লান করতে পারেনি। বিভিন্ন গ্রাম গঞ্জ থেকে শতাধিক কবি, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক যোগদান করেন। 'দিকাশ' সম্পাদক প্রফুল্ল অধিকারী আসর পরিচালনা করেন। কোমল দূর্বা-সম্পাদিকা নীলা করের বেদ স্তব পাঠে আসর শুরু হয়। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন : অভিজিৎ ঘোষ, প্রদীপ রায়চৌধুরী, বর্মীর মণ্ডল ডলি দত্ত, গনি সাহেব, অরুণ চক্রবর্তী, ব্রজ চট্টোপাধ্যায় রথীন মজুমদার, গৌতম ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে। ধ্বনি সম্পাদক সুধীর অধিকারীর আদর আপ্যায়ন সকলকে মুগ্ধ করে।

● সাংবাদিক অমিয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের মাতৃবিয়োগ

মফস্বল সাংবাদিক শ্রীঅমিয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের মাতা রেণুকা দেবী শনিবার ২২-৫-৮৩ রাত দুটো চল্লিশ মিনিটে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র, তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁর পবিত্র আত্মার শান্তি কামনা করি।

● চারণের সাংস্কৃতিক মহাসম্মেলন

(১লা বৈশাখ ১৩৯০) বন্দনা সাহিত্য সংসদের চারণ সাংস্কৃতিক মহাসম্মেলন ও উৎসব ১লা বৈশাখ ১৩৯০ থেকে ৩রা বৈশাখ কোন্নগর একের পল্লীর শিশু উদ্যানে হয়ে গেল।

এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য একটি সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা।

১লা বৈশাখ দ্বিপ্রহরে বসে সেমিনার।

আলোচ্য বিষয়: সময়, সমাজ, সংস্কৃতি।

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সমীর মণ্ডল, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখেন ভট্টাচার্য এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমাজসেবিরা। অন্যান্য দিনের অনুষ্ঠানে নাটক, স্বরচিত কবিতাপাঠ, আরত্তি ইত্যাদি ছিল।

● কবি প্রণাম

(২৫শে বৈশাখ ১৩৯০) বিকাল ৪টা থেকে একে একে দূর গ্রাম গঞ্জ থেকে অনেক কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক রবীন্দ্র সদনের পশ্চিম দিকের মাঠে জমায়েত হন। উদ্দেশ্য কবিপ্রণাম। এই আসরে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন লিটিল ম্যাগাজিন (পত্রিকা সমিতির সম্পাদক — নবকুমার শীল, আসর পরিচালনা করেন — প্রদীপ রায়চৌধুরী। ইয়ং রাইটারস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন— অভিজিৎ ঘোষ। কবি প্রণামে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন—অভিজিৎ ঘোষ, প্রদীপ রায়চৌধুরী, সমীর মণ্ডল, ডলি দত্ত, নবকুমার শীল, অপূর্ব সাহা, সত্যাদেশ আচার্য, রথীন সেনগুপ্ত, ব্রজ চট্টোপাধ্যায়, জীবন সরকার, বিপ্লব চন্দ্র, ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়, ধীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় নাগ প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিবেশন করেন ঋষিণ মিত্র।

কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের সংবর্দ্ধনা

শনিবার ৩০শে এপ্রিল 'রবিবাসরীয় জনতা'র উদ্যোগে ২৯ কলেজ ষ্ট্রীটে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তকে সংবর্দ্ধনা জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কবির কাব্য পাঠ এবং কাব্য আলোচনায় অংশ-গ্রহণ করেন মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, বাসুদেব দেব, তরুণ সান্যাল, শৈলেশ ভট্টাচার্য, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, ধনঞ্জয় দাস, পরিমল চক্রবর্তী, স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ গুহ, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমূলী, শ্যামল পুরকায়স্থ, অলকেন্দুশেখর পত্রী, শম্ভু রক্ষিত, সুব্রত সরকার, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর সেন মজুমদার, শিখা মল্লিক।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, কিরণশঙ্কর প্রেমের কবিতায় সবচেয়ে বেশি সার্থক।

সংবর্দ্ধনা সভার আহ্বায়ক ছিলেন রবিবাসরীয় জনতা'র সম্পাদক তাপস সাহা। কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তকে তাঁর অনুরাগী বন্ধু ও পাঠকদের পক্ষ থেকে যে মানপত্রটি দেওয়া হয় সেটি পাঠ করেন স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়।
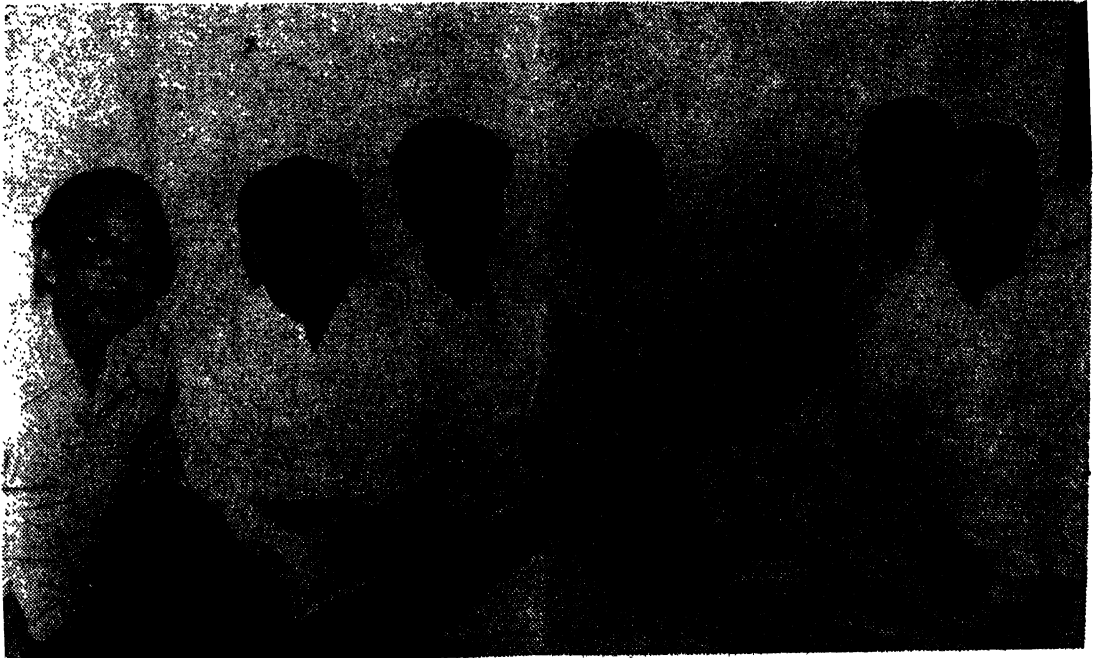
সংবর্দ্ধনা সভায় বাঁ দিক থেকে : কৃষ্ণ ধর, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও 'জনতা' সম্পাদক তাপস সাহা।

... Paper Association ...
GODHULIMONE ... No. 27214/75 ...
Vol. 23, No. 5 ... Postal ... Price—Rupee One only

মুদ্রাকর অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সরলা প্রিন্টার্স বড়বাজার, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও
নতুনপাড়া, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

আষাঢ়-শ্রাবণ

১৩৯০

শ্রী মুক্তবাবু প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়

এই সংখ্যায় —

প্রসঙ্গ : গোধূলি মন

O গোধূলি-মন রবীন্দ্র সংখ্যা পেয়েছি। সম্পাদকীয়তে কৈফিয়ৎ জানালেও একটি অন্তত রবীন্দ্রসম্পর্কীয় আলোচনা থাকলে ভালো হতো। তাঁর নামকরণে সংখ্যাটি যখন! 'আরশি-নগর' কবিতাটি আলোচনায় শীতল চৌধুরীর আরশি বেশ পরিষ্কার দেখলুম। স্বল্প পরিসরে উশীনর চট্টোপাধ্যায় - এর কাব্যগ্রন্থ আলোচনা প্রশংসনীয়। কয়েকটি মাত্র কবিতা ভালো।

আশা করি ভালো আছো। দুটি কবিতা পাঠালাম। সুযোগ মতো ছাপিয়ে নিও। আর কি। শুভেচ্ছাসহ—

কৃষ্ণসাধন নন্দী
বাঁশবেড়িয়া, হুগলী

O কবি প্রণাম সংখ্যা পেয়েছি। প্রত্যেক সংখ্যার মধ্যেই অভিজ্ঞতার ছাপ পাওয়া যায়। যদিও বলব না যে প্রত্যেক সংখ্যার প্রতিটা লেখনীই উন্নত মানের। তবে সহজে বোঝা যায় বয়সতো কম হল না। বয়সের সাথে সাথে অভিজ্ঞতাও বাড়ে।

সরাসরি একটা পত্রিকার সাথে জড়িত থাকায় লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সুবিধা-অসুবিধাগুলি ভীষণভাবে বুঝতে পারি। 'গোধূলি মনে'র পথ ধরে 'পল্লব' ও রজত জয়ন্তীর স্বপ্ন দেখে। এবং দৃঢ় প্রতীক্ষাবদ্ধ।

তবে দুঃখের বিষয় এত সমালোচনালব্ধ 'শুদ্ধসত্ত্ব বসু' সংখ্যা কিন্তু আমাদের দপ্তরে পৌঁছায় নি। হয়তো কোথায়ও ত্রুটি হয়ে গেছে। ধন্যবাদান্তে—

চিত্তরঞ্জন হীরা
কলিকাতা-২৮

আপনার সম্পাদিত পত্রিকার কবিপ্রণাম সংখ্যায় হেনরী মিলারের 'ট্রপিক অফ ক্যানসার' থেকে উদ্ধৃতিগুলি বিশিষ্টতার দাবী রাখে।

পুস্তক সমীক্ষা বিভাগটিও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

কামনা করি পত্রিকাটি যেন গৌরবময় দীর্ঘজীবন লাভ করে।

অচল ভট্টাচার্য
শিবপুর, হাওড়া

O শীতল চৌধুরী লিখিত 'রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরীর একটি কবিতা' পড়লাম, ভালো লাগলো। এই সময় ত্রিশ বছর আগেকার কথাও মনে পড়ে গেল। আমি হুগলী মহসীন কলেজ থেকেই পাশ করি। সেটা ১৯৫৩-১৯৫৪ সাল। আমি তখন হুগলী মহসীন কলেজের প্রথম বার্ষিক কমার্স বিভাগের ছাত্র। সাহিত্যের ক্লাসগুলি সাহিত্য ও বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রেরা একত্রেই করতেন। আমিও আর সকলের সঙ্গে ক্লাস করতাম। এই সময়ে আমাদের ক্লাসে ইংরাজী কবিতার ক্লাস নিতেন অধ্যাপক রমেন্দ্র কুমার আচার্যচৌধুরী। ত্রিশ বছর পরেও এখনও মনে পড়ছে যেন তিনি সেই 'হার্ট লিপ ওয়েল' কবিতাটি আমাদের পড়াচ্ছেন।

'গোধূলি মন' পত্রিকা আমায় যেমন লেখক হতে সাহায্য করেছে — ঠিক তেমনই অতীতকে স্মরণ করতেও সাহায্য করেছে। ধন্যবাদ জানাই।

শীতল দাস
রায়ের বেড়, চুঁচুড়া

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি মন

২৫ বর্ষ / ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা

আষাঢ় শ্রাবণ : ১৩৯০

প্রতি সংখ্যা এক টাকা

সম্পাদক

সম্পাদকীয়

প্রিয় পাঠক, আপনারা যে আমাদের কাগজ নিয়মিত নিষ্ঠার সঙ্গেই পড়েন, আপনাদের আন্তরিকতা মাখা বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা থেকেই সে খবর পাওয়া যায়।

ফিরোক গোরখপুরী প্রসঙ্গে অজিত রায়ের আন্তরিক আলোচনা কিংবা কাব্যতত্ত্ব নিয়ে অধ্যাপক জীবেন্দু রায়ের মননশীল আলোচনা সাধারণ পাঠক, সম্পাদক, নামী আলোচক সকলকেই ছুঁয়ে গেছে। এই সব লেখা নিয়ে অজস্র চিঠি নিয়মিত আসছে আমাদের দপ্তরে। সাঁত্রের জীবন সঙ্গিনী সিমন দ্য বোভেয়ার কে নিয়ে অমল হালদারের সংক্ষিপ্ত আলোচনাটিও পাঠক-চিত্তে সাড়া জাগিয়েছে। আর এই সাড়াই প্রমাণ দিয়েছে পঁচিশ বছরে আয়ু ফুরিয়ে যায়নি গোধূলি-মন-এর। নব যৌবনের আলোকে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে সে দিনে দিনে।

নিরবে থেকে সাহিত্য সাধনা করেন, দু' বাংলার এমন অনেক প্রবীন মানুষও গোধূলি-মন-এর সাম্প্রতিক সংখ্যাগুলি হাতে পেয়ে কলম ধরেছেন। এধরণের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের মধ্যে রয়েছেন রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রধান ডঃ রশিদুল আলম, যশোরের সম্মিলনী ইনষ্টিটিউটের প্রধান শাহাদত আলী আনসারী, কবি আলোচক হাসান কামরুল প্রমুখ।

আমাদের আগামী বিশেষ সংখ্যাগুলি আশারাখি পাঠকচিত্তে আরো জোর আলোড়ন তুলবে।

● সম্পাদকীয় কার্যালয় ॥ নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর ॥ হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥ ভারত

● কলিকাতা-কেন্দ্র : ৩৩/৬ জি নাজির লেন, কলিকাতা-৭০০০২৩

কবিতা কবিতা কবিতা

কৃষ্ণসাধন নন্দীর দু'টি কবিতা

নিথর বাতাস

নিথর বাতাস মোচড় খাচ্ছিল অনেকক্ষণ।
জটসুতো খুঁজে পাচ্ছিলাম না খেই
কানাকানি হবার আগে ফুটল জ্যোৎস্না।
এক পশলা বৃষ্টিতে প্রদীপ্ত মুখ ;
কোথায় অভিমান ?
শিস্ দিয়ে নেচে উঠল পাখি—মুছে গেছে সব।

সে ভাসল, সাথে সাথে আমিও ভাসলাম।

পাঁচমাথার মোড়

পাঁচটা রাস্তা থেকে পাঁচজন এসে মিলেছিলাম।
অনিল পুব, সত্যেন পশ্চিম,
বাসু উত্তর, সনৎ দক্ষিণ
আমি ঈশান কোন থেকে
একসংগে পাঁচমাথায়।
কোথা থেকে কি হ'ল
অনিল ছিটকে দক্ষিণ, সত্যেন উত্তরে
বাসু পশ্চিম, আমি পুবে
আর সনৎ ঈশানে
যে যার তালে—
পাঁচমাথার মোড় এখন ফাঁকা, ভালোবাসাহীন

সোফিওর রহমানের দু'টি কবিতা

যুদ্ধের বিরুদ্ধে

বাতাসে লকলকে জিভ, বিষাক্ত সাপ
আকাশে মেঘ, মেঘের আড়ালে অনেক শকুন
বাগানে বেড়েছে ঝোপ, ঝোপে হিংস্র বিজ্ঞানের নীল-নালা ছেঁকে
তুলেছে থাবা, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে কার্বনের ধোঁয়া
ওরা সাধারণ মানুষের মাটি করে দেবে পাথর—
হয়তো একশ বছরে কাটবে কুয়াশা
ফুটবে না কোন ফুল
না জল লালা, শুধু লালা
মার্কিনী বিষ আর রুশী গরল।
ঠাণ্ডা মানুষ কথা কও ! দুইবার ঘর পুড়েছিল তোমার,ভুলে গ্যাছো ?
মুখবন্ধ হাতির মত সংঘবদ্ধ সঙ্গতে ভাঙ্গো ঝোপ, তীর ছোঁড়ো
গ্রীণরুমে পুড়ে যাক ওদের রক্ত মাংস হাড়।

ফাল্গুন ১৯৮৩

মানুষের মাংস নিয়ে মস্তি
খেলার সাথী আগুন .
মায়ের জন্য ভাষার জন্য
ভায়ের রক্তে ফাগুন ?
সাগর ছেড়ে নদী, একক
চলন-পণ আভাস
ভিত্তিবর্ষ পিছোক, নইলে
মাংস সেঁকবে বাতাস ?

দ্বীপ / সমীর মণ্ডল

আজ দৃষ্টিতে এক হরিণ শিশু
বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখি তার পদচিহ্ন
যেন কোনো এক দৈব শক্তি
রৌদ্রময় চূড়ায় সফরমান
শান্ত অনুপ্রেরণায় আমায় ডাকে—

পৃথিবীর পথে ঘুরে ঘুরে
শুনি তার কণ্ঠে স্তবগান
ভ্রান্তির মোহ ছেড়ে
ভেসে যাই তার প্রেমে, উদ্বেল প্লাবনে।
খুঁজে পাই অতিথি বৎসল এক আবাস,
প্রেমের রহস্যময় শান্ত মৌন দ্বীপ।

একদিন নক্ষত্র পুরুষ / নিভা দে

চিরকাল দুঃখ নিয়ে ঘর করা
মানুষের মতো কথা নয় জেনো—
দুঃখকে পরিশ্রুত করে শিরায় শিরায়
ভ'রে নাও উৎসাহী রক্তের মতো—
ব্যর্থতাগুলোকে ঘষে মেজে
ধারালো তীর করে নিতে হবে—
হিংস্রতাকে পোষ মানাতে হবে
অবিরাম ক্ষমার যাদুকাঠি বুলিয়ে
জানলাগুলো খোলা রাখো আকাশের দিকে—
তারপর
সকাল-দুপুর-মধ্যরাত
ঠিক এসে একদিন নক্ষত্র পুরুষ
ঘুম ভাঙ্গাবে কুমারী রাজকন্যার।

তুমি এলে / সন্তোষকুমার মাজী

তুমি এলে ছড়িয়ে পড়ে অমিত লাবণ্য, অঙ্গরাগের বিলাস
তুমি এলে মর্মরিত হয় প্রাণহীন বর্ণমালা, অধীর গুঞ্জনে
তুমি এলে অঙ্গনে ফুটে ওঠে কুন্দরাজি, জ্যোৎস্নাময় হিরণে
তুমি এলে ছড়িয়ে পড়ে কর্পূর, অগুরু ও চন্দনের অমর্ত সৌরভ

তুমি এলে ভিজে ওঠে তোমার চোখের পাতা. দর্শনের গৌরবে
তুমি এলে করবী থেকে খসে পড়ে প্রণত অভিসারমঞ্জরী
তুমি এলে অপাঙ্গে জানিয়ে দাও বীতনিদ্র প্রহরযাপনের অভিলাষ

তুমি এলে কিরকম প্রত্যাশা আকুল হয়ে ওঠে রক্তিম দুটি অধর
তুমি এলে নীল শালুকের মতো চোখ দুটিতে জেগে ওঠে চকিত বিভঙ্গ
সচেতন নীরবতায় অনুভবে শিথিল হয়ে আসে অঙ্গ, মদিরার অলস ঘুমে

তুমি এলে হৃদয়ে গড়ে ওঠে অযুত পত্রলেখা, ঝংকৃত পদাবলী॥

সিঁড়ির ধাপে জীবন/দেবদাস দাস

সিঁড়ির ধাপ গুনে নামতে নামতে
হঠাৎ গড়িয়ে পড়ে গেলাম
অনেক নীচে—
আরো নীচে—
—হঠাৎ
চোখ খুলে দেখি
আমরা কোথায় নেমে যাচ্ছি
'এরিক সিপটনের' মতো পথ হারিয়ে
কোন নতুন আবিষ্কারের নেশায় ?
না—নতুন আবিষ্কার তো নয়,
তবে কোন দিশাহারা পথিকের আশা।
পথিক, এতো সাহারা—
জল কোথায় ওতো মরিচিকা।
মাথা থেকে টুপিটা খোলো
একটু শীতল বাতাস লাগুক দেহে
চোখ থেকে ঠুলি খুলে দেখো তো
কিছু দেখতে পাও কিনা।
আবার হাঁটতে শুরু করো
পারুল বোনের গল্পটা মনের মধ্যে
জপোমালা করে নিয়ে এগিয়ে যাও
দেখো তো—
কিছু একটা মেলে কিনা।
অবশেষে—
উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম,
একটু কষ্ট হলেও পারলাম
আবার সিঁড়ির ধাপ গুনে গুনে উঠতে লাগলাম
এবার আমি নিশ্চিৎ আর পড়বোনা
পথিক যদি জল পেয়ে থাকে
আমিও শেষ ধাপে পৌঁছে যাবো নিশ্চয়।

সর্বাণী-২ / যদুপতি মল্লিক

দিন যায় রাত যায়
ক্ষেতের কুঁড়ে ঘরে অতিদূর নক্ষত্রের আলো
আমার ফসলের মাঠে ঘন সবুজ ফড়িং
সর্বাণী, তুমি কি স্বাতী নক্ষত্র ?

পথ হাঁটি পথই হাঁটি
মিষ্টি হাসে শহরের চাঁদ
চৌমাথার লাল ট্র্যাফিক।

নদীর চড়ায় সেই তরমুজের ক্ষেত
কুঁড়েতে আমার শয্যা এবং ঘুম
বুকের মধ্যে কেবল সর্বাণী, সর্বাণী……

হোপ ফর দি বেস্ট
ক্ষিতীশ দেব সিকদার

মেয়েটিকে দেখে অবাক লাগে
হাতে কি দারুণ স্পীড
খটাখট টাইপ করে চলেছে
মানুষের ভাগ্যলিপি—
অ্যাপয়েন্টমেন্ট
প্রোমোশন
ট্র্যান্সফার
চার্যশীট
টারমিনেশন
সুপারঅ্যান্নুয়েশন—
শুধু আমার বেলায়
ওর স্পীড স্লো হয়ে যায়
বলে
'এত তাড়াহুড়ো কিসের
অপেক্ষা কর—
হোপ ফর দি বেস্ট'

রূপক রচনা

এখন দুঃসময় / সুচন্দ্রনাথ দাস

চান্দিকে ইতস্তত: ছোট ছোট পাহাড়। পাহাড়ের পায়দেশে সারি সারি শাল-মহুয়া। একটা ছোট নদী কুল্‌কুল্‌ শব্দে ছুটে চলেছে মোহনার দিকে। শহর থেকে বহুদূরে এই নৈসর্গিক পরিবেশ। এমন সুন্দর পরিবেশের উপর থেকে সরকারী কর্মচারীদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তাই এখানে নির্মীত হয়েছে বিলাসবহুল টুরিষ্ট লজ। জায়গাটার নাম শাল-মহুয়া। ছোট বড় সব পত্র পত্রিকার সাংবাদিকরা এই টুরিষ্ট লজ সম্পর্কে অল্প-বিস্তর লেখালেখি করেছেন তাঁদের কাগজে। একারণে এই টুরিষ্ট লজের কথা প্রায় সকলের জানা। পৃথিবীর সব দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যেই এই বিলাসকুঞ্জের দ্বার খোলা আছে। তবে ফেল কড়ি, মাখো তেল।

অনেকে আসেন সপরিবারে প্রাইভেটকার নিয়ে, অনেকে আসেন দল বেঁধে ডিলাক্স বাস রিজার্ভ ক'রে।

শহরের সঙ্গে যোগাযোগ একটা মাত্র পিচঢালা রাস্তার মাধ্যমে। টুরিষ্টলজের অনতিদূরে তাল তমালের সুনিবিড় ছায়ায় ঘেরা বিক্ষিপ্ত গ্রাম, ধানক্ষেত, ভুট্টা ক্ষেত, গরু ছাগল ভেড়া।

ইতিহাসের কোন এক রাজপ্রাসাদের অনুকরণে এই শাল-মহুয়া টুরিষ্টলজ তৈরী হয়েছে। তিনতলা বাড়ি। আঠারো খানা ঘর। ইলেকট্রিক নেই, টেলিফোন নেই। রাতে ঝাড়বাতি জ্বলে।

অবসর বিনোদনের জন্যে অনেক বিখ্যাত লোক এসেছেন: অধ্যাপক, গায়ক, শিল্পপতি, কোটিপতি, লেখিকা, সিনেমার নায়িকা, জন দরদী দেশনেতা, আইনজীবি ইত্যাদি। অখ্যাতদের মধ্যে ফেরিওলা, রিক্সাওলা, মুদি, কামার, কুমোর, কৃষক, পকেটমার, বেকার যুবক, দেহপসারিণী ইত্যাদি।

এবং একজন বংশীবাদক। তবে তিনি অবসর বিনোদনের জন্য এখানে আসেন নি। বহুদিন এখানে আছেন। তিনি কেন এখানে আছেন কেউ জানেন না, কেউ জানতে চান না। তিনি কে কেউ জানেন না, জানতেও চান না। কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলেন না, তাঁর সঙ্গ চান না। তাঁকে সবাই অবহেলা দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখেন, উপেক্ষা করেন। কিন্তু তিনি সকলকে জানেন. সকলের ভেতরে-বাইরে তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়ে ঠিক সার্চ-লাইটের মত।

রূপোলি জোছনা মাখতে মাখতে, সুশীতল হাওয়া মাখতে মাখতে, জোলাপ খেয়ে প্রলাপ বক্‌তে বক্‌তে, বংশীবাদক ছাড়া অন্য সকলে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলেন। তারপর যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

সবাই ভেবেছিলেন, অন্যদিনের মত সেদিনও ঠিক ভোরবেলাতে সকলের ঘুম ভেঙে যাবে।

অন্য দিনের সাপেক্ষে সেদিন ঠিক সময়েই সকলের ঘুম ভাঙলো বটে, কিন্তু ভোরের আলো ফুটলো না।

গায়ক রিষ্ট ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলেন সময় বারটা। আশ্চর্য হলেন। রাত বারোটা পর্যন্ত সকলে গল্প করে কাটিয়েছেন। তারপর ঘুমিয়েছেন। এখন বারোটা হবে কেন? ঘড়িটা কানের কাছে নিয়ে এসে টিক্‌টিক্‌ শব্দ ঠিকঠিকভাবেই শুনতে পেলেন।

প্রফেসর মন্তব্য করলেন; আমরা ঠিক ঘুমোই নি।

—আমরা কি ভুল করছি?

—হয়তো।

—এখন তাহলে—

গোধূলি-মন/আষাঢ়-শ্রাবণ/১৩৯০/সাত

—আমাদের ভাল ক'রে ঘুমুনো দরকার।

ফের সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। বংশীবাদক একাই চাঁদের আলোয় ছাদে ব'সে বাঁশি বাজিয়ে চললেন্।

ফের সকলের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

প্রফেসর দেখলেন, রিষ্টওয়াচ আগের সময়ই নির্দেশ করছে।

সকলের ঘড়িতে একই সময়। সারা টুরিষ্টলজ জুড়ে কোলাহল উঠল।

আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই।

সূর্যও উঠছে না, পাখি ডাকছে না, বাতাস বইছে না

সকলের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছায়া। একটা ঘরে এসে সকলে ভীড় করলেন।

নায়িকা বললেন, এতক্ষনে তো দিনের আলো ফুটে ওঠার কথা।

শিল্পপতি বললেন, কিন্তু সূর্য ওঠেনি।

আইনজীবি বললেন, পাখি ডাকেনি।

জনদরদী দেশনেতা জিজ্ঞেস করলেন, এখন কি রাত ?

লেখিকা জানালার কাছে ছুটে গিয়ে আকাশ দেখলেন। অন্য সকলেও ছুটে গিয়ে আকাশ দেখলেন। কিন্তু কেউ সময় ঠিক করতে পারলেন না।

ঘরের ঝাড় বাতিটাও এবার নিভে গেল।

সকলে দেখলেন, ভেতরে বাইরে একই অন্ধকার।

সকলেই আর্তকণ্ঠে বলতে লাগলেন, চাদ্দিকে এত অন্ধকার কেন ? সূর্য উঠছে না কেন ?

সূর্যকে জাগাবার জন্য লেখিকা সকাতর প্রার্থনার কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন, তাঁর সঙ্গে অন্য সকলেও কণ্ঠ মেলালেন।

গায়ক সূর্যের বন্দনাগীতি গাইলেন।

তবু সূর্য উঠল না।

সকলে তারস্বরে বললেন, আলো চাই, আলো চাই।

তবু সূর্য উঠল না।

হঠাৎ সকলে একটা অপ্রত্যাশিত, অভাবিত দৃশ্য দেখতে পেলেন। সকলের উপেক্ষিত বংশীবাদক তাঁর বাঁশের বেনু বাজাতে বাজাতে সামনের পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁর বাঁশির সুরের সঙ্গে এক স্বর্গীয় আলোর দ্যুতি চাদ্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

দেহপসারিণী বললেন, ঐ বংশীবাদক জানেন আলোর ঠিকানা। ঐ বংশীবাদকই দিতে পারবেন সূর্যের সংবাদ।

সকলেই দেহপসারিনীর কথা শুনলেন এবং সমর্থন করলেন।

মুহূর্তের মধ্যে টুরিষ্টলজ থেকে সকলে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বংশীবাদকের পিছনে পিছনে ছুটতে লাগলেন। সমস্বরে চীৎকার ক'রে বংশীবাদককে ডাকতে লাগলেন, বংশীবাদক থমকে থামলেন না পিছন ফিরে দেখলেন না, বাঁশি বাজানো বন্ধ করলেন না।

বংশীবাদক নদীর ধারের একটা প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ডের উপরে উঠে দাঁড়ালেন। বাঁশী বাজানো বন্ধ করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই অদ্ভুত আলোকরশ্মি বিলীন হ'য়ে গেল। তবে অন্ধকার গাঢ় নয়।

সকলে সমস্বরে বংশীবাদককে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে ?

বংশীবাদক বললেন, আমি সামান্য একজন বংশী বাদক। আমার আর তেমন কোন পরিচয় নেই।

—আপনার বাড়ি কোথায় ?

—পৃথিবী আমার দেশ, আমার বাড়ি। পৃথিবীর মানুষ আমার আত্মীয়।

—সূর্য উঠছে না কেন ?

—সূর্য তো অস্ত গেছে। আপনারা সূর্যকে বিদায় দিয়েছেন ব'লেই তো অস্ত গেছে।

—আমরা আলো চাই।

—এতোদিন আপনারা সবাই অন্ধকারের সাধনা করেছেন। আলো তাই অভিমানে ম্লান হয়েছে।

সকলেই নিজেদের মধ্যে কথা বললেন কিছুক্ষন।

কেউ মন্তব্য করলেন, লোকটা পাগল।

কেউ বললেন, লোকটা ডিলিরিয়াম বক্‌ছে।

কেউ মন্তব্য করলেন, লোকটা সাধারণ মানুষ নয়।

কেউ বললেন, লোকটা অলৌকিক শক্তিধর।

ফের সকলে বংশীবাদককে জিজ্ঞেস করলেন, এখন সময় কি থম্‌কে থেমেছে?

বংশীবাদক দীপ্তকণ্ঠে বললেন, সময় কখনো থমকে থামে না। সময় কখনো থামতে জানে না।

—তাহ'লে?

—আপনাদের জীবন থমকে থেমেছে।

—কোথায়?

—বারোটার ঘরে। আপনাদের সকলের ঘড়ি তাই নির্দেশ করছে। পৃথিবীর সমস্ত ঘড়িতে এখন একই সময়।

বারটার ঘরে থামলো কেন?

—আপনারা সবাই থামিয়ে দিয়েছেন, তাই। আপনারাই আপনাদের জীবনের বারোটা বাজিয়েছেন।

সকলেই মৃদু গুঞ্জন তোলেন।

বংশীবাদক বললেন, আপনারা একেকটা সুন্দর মুখোশ প'রে আছেন। আপনরা কেউ কাউকে জানেন না। আপনারা কেউ কারোর কাছে ধরা দেন না, দিতে চান না। কিন্তু আমি আপনাদের সকলকে জানি, খুব ভালভাবে জানি।

সকলে ভীতকণ্ঠে বললেন, আপনি আমাদের সকলকে জানেন!

বংশীবাদক বললেন, আপনাদের প্রত্যেকের জীবনের প্রতিটি ঘটনা আমি সকলের সামনে চলচ্চিত্রের মত দেখাতে পারি।

—আমরা সকলেই দোষী, অন্যায়কারী, অপরাধী,

—আপনারা মানুষের বেশে, মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনারা কি মানুষ হয়েছেন?

—না, আমরা মানুষ হ'তে পারি নি।

—কিন্তু পৃথিবীতে আসবার সময় আপনারা সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন আপনারা সবাই মানুষ হবেন।

—আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারি নি।

—আপনাদের কর্মের ফল এখন আপনারাই ভোগ করুন।

কথা শেষ ক'রেই বংশীবাদক প্রস্তরখণ্ডের উপর থেকে নিচে নামলেন। হাঁটতে হাঁটতে ছোট নদীটা পার হ'য়ে অপরপারের একটা পাহাড়ের উপর উঠে দাঁড়ালেন।

নদীর এপারে ভূমিকম্প শুরু হ'ল।

সকলে ভীতকণ্ঠে চিৎকার করতে লাগলেন।

—বংশীবাদক, আপনি কোথায়?

বংশীবাদক তাঁর বাঁশের বেণু বাজালেন। তাঁর বাঁশির সুর ঘিরে অলৌকিক আলোর একটা বৃত্ত। সেই বৃত্তের মাঝখানে বংশীবাদককে সকলে দেখতে পেলেন।

সকলে চিৎকার ক'রে বললেন, বংশীবাদক, আপনি আলোর দূত। আপনি আমাদের আলোর ঠিকানা ব'লে দিন। আপনিই ঈশ্বর। আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

—আপনারা আমাকে ভুল বুঝছেন। আমি ঈশ্বর নই। আমি মানুষ। মানুষের বেশে জন্মেছি ব'লে মানুষের দুঃখেসুখে মিশে গেছি বলে নিজেকে মানুষ বলছি। মানুষ হ'তে পেরেছি কিনা তা'জানি না।

—আমরা বাঁচতে চাই। নতুনভাবে বাঁচতে চাই। আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

—আপনারা যদি পারেন নদী পার হয়ে আমার কাছে চ'লে আসুন। এখানে ভূমিকম্প হচ্ছেনা।

সকলে নদী পার হবার জন্যে উদ্যত হলেন, কিন্তু নদীর জলে পা দিতে গিয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন।

নদীর জলে অগণিত হাঙর-কুমীর ব্যারাকুডা।

মানুষের গন্ধ পেয়ে কুমীরগুলো জল ছেড়ে ডাঙায় উঠতে শুরু করলো।

সকলে পাহাড়ের দিকে ছুটতে শুরু করলেন।

কিন্তু কোনদিকে যাবার পথ নেই।

শাল-মহুয়া বন থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসছে নেকড়ে-চিতা-সিংহ-হায়না। তাদের হিংস্র নখর, জ্বলন্ত চোখ। তাদের নিঃশ্বাসে সাইক্লোন।

সকলে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে বংশীবাদককে বললেন, আপনি আমাদের ত্রাণ করুন।

বংশীবাদক বললেন, আপনাদের সকলের মনের মধ্যে আছে নেকড়ে-চিতা-হায়না। যদি তাদের হত্যা করতে পারেন, তা'হলে ওরা সবাই পালিয়ে যাবে।

সকলে বললেন, আমরা অতি শঠ, আমরা অতি হিংস্র। আমরা আমাদের হিংস্রতা ভুলে যাবো। আমরা মানুষ হবো।

পুস্তক-সমীক্ষা

কবিতারুদ্ধ গাণিতিক সক্রিয়তা/অমৃততনয় গুপ্ত

প্রবর্তনা কি উদ্ভাবনার নয়, শব্দের উন্মোচন আর উদ্বোধন অর্থাৎ চয়ন আর যাচাই-এর ধরন কবিতায় কবির স্বাতন্ত্র্যকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে বা চিহ্নিত হতে সাহায্য করে অবশ্যই, কিন্তু শব্দের বিবেচিত ও নির্ধারিত অর্থ আর অনুভব-উদ্বোধনের ক্ষমতা অর্থাৎ কবির অবিকম্পতার মুখাপেক্ষিতা বা অনির্বচনীয় ইংগিত-ময়তার গোলামী—কবিতায় কোনটির অগ্রাধিকার বা প্রাধান্য তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা নিশ্চয়ই সমালোচকের কুললক্ষণ নয়। শব্দের সঙ্গে শব্দের সম্পর্কের সংযোগ ধরে শব্দসমাহারের অর্থের অর্থাৎ শব্দান্তরে প্রকাশিত অর্থের ঐক্য খুঁজতে যাওয়াও কি আরেক ধরনের বিড়ম্বনা নয়? কেননা শব্দ সমাহার দিয়ে শব্দ সমাহারের অর্থ নির্ণয় তো বড়জোর আনুমানিক বা উপান্তিকই হতে পারে, সঠিক বা যথার্থ হওয়া তার পক্ষে সম্ভবই না; আর তা যদি নাই হয় তবে কি করে বলা যাবে শব্দ বা শব্দ সমাহার বাহিত উদ্দীপকে যথার্থ সাড়া জাগানোর প্রকৃত নিরিখ এটাই? এখন, অনেক উৎকৃষ্ট কবিতাকে আপাত দৃষ্টিতে সাবলীল ও নির্মল বলে গণ্য করার সময়েই, বাধ্যতামূলক ভাবে আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে যে, শব্দেরা আছে বলেই কবিতা আছে ভয়ঙ্কর অমোঘ এই বিধি নির্দেশ।

তবুও বাহ্য যে, বাক্যের সৃষ্টির উপর আমার সংশয় জন্মে গেছে -একথা যিনি বলেছিলেন তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর একে শুধু সাময়িক বিতৃষ্ণা কিম্বা অভিমান বা মানসিক অস্থিরতারই সাক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করলেও আমাদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে ডিকেন্‌স্‌-এর কথা, যে ডিকেন্স শঙ্কিত ছিলেন 'শব্দদের উৎপীড়ন' নিয়ে। উৎপীড়ন বলতে অবশ্য তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন অপ-ব্যবহার বা অপপ্রয়োগের দিকে। এখন শব্দের কাছে কেন নিজেকে এই দাস বা ক্রীড়নক বোধ করা? আমাদের কালে যখন কমপ্যুটরকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে নেওয়া হয়, যখন স্বয়ংক্রিয় লেখার নমুনা এসে আমাদের হাতে পৌঁছয় তখনো তে মনে হয় কল্লোচ্ছসিত শব্দমুখর কবিতার শাস্তি আমাদের পক্ষে অনেক সময়েই পীড়াদায়ক? তবু শব্দেরাই থাকে কবিতায় শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু শ্রবন-দর্শন-গ্রাহ্য কবিতাকেই যেহেতু আমরা আশা করি ছাপা কাগজের মসৃন ও নির্মল পিঠের ওপর, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জনের দোহাই দিয়ে কবিও তাঁর সহায়ক হাতখানি বাড়িয়ে দিতে পারেন আমাদের দিকে অনায়াসেই। ছাপা কবিতা তো স্থানু, নির্বিকল্প, বোবা। স্বরলিপিকারের কাছ থেকে আমরা তাল-লয়ের পরিচয় জানতে পারি, জানতে পারি সুরকারের অভিপ্রেত

উচ্চারণের পরিমাপ, কিন্তু স্মরণে রাখি আমরা গানটিকেই, স্বরলিপিকারের নির্দেশনামাকে নয়। শব্দার্থের ক্ষেত্রে যখন বাচ্যার্থ আর ব্যঞ্জনার্থকে একটার পরিবর্তে আর একটা বলে ধরে নেওয়া যায়না, কিম্বা একটা থেকে আর একটা লব্ধ বা উদ্ভূত বলেও না, তখন আমাদের ভিন্নতর চিন্তার দিকে ফিরতে হবেই। কোনো কাব্য সংস্থানে শব্দ সমাহার গত অর্থের প্রকৃত অবস্থান কী কিম্বা এর ভূমিকা কী? অর্থাৎ শব্দ সমাহার সম্পর্কে কী প্রত্যাশা করা যায় যা তার অর্থের ঐ বিশেষ অবস্থান অধিকারেরই নিশ্চিত ফল বলা চলে? কাব্য সংস্থান কেমনভাবে শব্দ সমাহারগত অর্থকে নিয়ন্ত্রিত করে বা নিয়ন্ত্রিত হয়? ঐ অর্থের বৈশিষ্ঠ্যই বা কেমনতর— সাধারণ, পরিচিত, সুপ্রতিষ্ঠিত ধারণা ভাবনা গুলোই, নাকি এমন কিছু যা কবিতায় অনন্য ও তাৎপর্যময় প্রভাব বিস্তারে সক্ষম—যা পাঠক সমালোচকের পক্ষে গৃহীত বা নির্ভরযোগ্য মনে হবে? আর আমাদের তো জানাই আছে যে, কবিতার ধর্ম এমনি যে তা ভাবনা ধারণাগুলি ক দমিত বা ভস্মীভূত করেনা, বরং তাদেরই পাশাপাশি সংবেদনকেও সমন্বিত করে, খাপ খাইয়ে নেয়।

তাছাড়া দেকার্তের অনুভাবনায় ফরাসী কৃমে যে জ্যামিতিক উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল, সেই অনুপুঙ্খেও একে বিচার্য করে তুললে কথাগুলো অবশ্যই প্রাসঙ্গিক শোনাবে। হ্বিটগেনষ্টাইন ও বলেছিলেন একবার Language game এর কথা, কিন্তু এক্ষেত্রে অভীষ্ট লক্ষ্য অপেক্ষা প্রস্থান বিন্দুর প্রশ্নটিই অতীব জরুরী। কেননা এখানে কি তিনি বিষয়টীকে সমস্যা হিসাবে নিয়েছেন না সমাধান হিসেবে নিয়েছেন? আর সমস্যা জরুরী হলেই কি সমাধান যোগায় না সমাধান পরাক্রান্ত হলেই সমস্যা জরুরী হয়ে ওঠে—বা অন্ততঃ পাঠকের তাই মনে হয়? এবং এই কবিতাবলীর মর্মোদ্ধারের জন্য ইউক্লিড, হেলেম বা হোলৎজ তার উত্তর সাধকের দায়স্থ হওয়ার ততটা প্রয়োজন হয়না, যতটা প্রয়োজন ৺য় জয়েসের বারোটি কবিতার মূল্য হিসাবে বারো পেনি দামের 'Poems penny .each'-এর তেরো সংখ্যক কবিতা 'Tilly'র পশ্চাতে আপাত কৌতুকের স্বরূপ উদ্ঘাটনে ভাবলিনের দুধ বিক্রয়ের হিসাব জেনে নেওয়ার। কবিতা থেকে উৎসারিত আবেগ এখানে খোঁজা ভুল হবে; আবেগ এখানে প্রদত্ত, কিম্বা এমন ভাবেই উন্মোচিত যে পাঠক একে আবেগ বলে গ্রহণ করতেও পারেন বা না ও পারেন। কবিতা আমাদের যে চিত্রকল্প উপহার দেয় তাও এখানে প্রায়শ অনুপস্থিত বা আংশিক ভাবে উপস্থিত বা তাকে কারো কাছে চিত্র-কল্পের ইংগিত বলে মনে হতে পারে। কবিতার তাৎপর্য এখানে একটাই বা তাৎপর্য কোনো ব্যাপারই নয়। একে বলা যায় কবিতার এমন এক খসড়া যাতে সুপ্ত হয়ে থাকে অগণিত অলিখিত [নাকি অলিখিতব্য] কবিতার ভ্রূণ, আর যেহেতু একটা গোটা কবিতার কোনো বিকল্প নেই। একাধিক খণ্ডিত বা আংশিক কবিতার সমাহার ও নয় একটা কবিতা, এগুলো কবিতার সম্ভাবনাকে সূচিত করেই নিঃশেষিত হয়, নির্দিষ্ট কবিতাকে উপহার দেয়না। এক্ষেত্রে দুধরণের বিপদের ঝুঁকি নিতে হয় কবিকে। প্রথমতঃ এর সঞ্চার সামর্থ্য এতটাই ব্যাপ্ত বা প্রসারিত হতে পারে যার ফলে নিরাকার বা কিমাকার মনে হবে; এবং তাকে কবিতা বলেই চিহ্নিত করা যাবেনা আর; দ্বিতীয়ত একে ন্যূনতম সঞ্চার সামর্থ্যহীন মামুলি শূন্যগর্ভ উচ্চারণ বলে সাব্যস্ত করা হতে পারে। Typographyর নিরীক্ষা হিসাবে ধরলে একে কংকালের উপর চামড়া পরানোর কাজ বলে মনে হতে পারে। কারণ পাঠকের উপর এরা সেইরকম চাপ দেয় যাতে পাঠের ধরনের পুঁজি ওঠে ফেঁপে। কিন্তু তার চরিত্রের হের ফের ঘটেনা। তাছাড়া এগুলো তাদের বোধকে সংহত ও সমৃদ্ধ করার বদলে নির্বিকার ও একঘেয়ে করার দিকেই ঠেলে দেয়। ওষুধের ক্রিয়া বা উপাদান না জানিয়ে কেবলই সেবন বিধি-জানাবার মত। লোকাচারের মতই এক ধরনের সাহিত্যাচারও কি কখনো কখনো আমাদের পরম কাম্য হয়ে ওঠে না? কেননা কবিতা, কবিতা হলেই,

কাগজের পাতার সঙ্গে তার সম্পর্ককে অবৈধ মনে হতে পারে, পাঠকের সমস্ত সত্তার সঙ্গে তার সখ্যকেই তখন মনে হয় প্রকৃত আদর্শ। কবির সমস্ত নির্দেশনামাই তখন ভ্রষ্ট, ভণ্ড, ভ্রান্ত মনে হতে পারে। রেম কেন-যে তাঁর উপন্যাসকে, বাহান্নটী তাসকে ওলোট-পালোট করার মত করেই সাজিয়ে ছিলেন সেখানে কি ছিল কোন বিশেষ নির্দেশনামা বা উপন্যাসটীর একটি মূল বা আদর্শ শরীর? সব ভাঙা-চোরা তো হয়ে ওঠে পাঠকেরই সর্তাধীনে, গ্রহণ বর্জনের নিরিখ ও তো পাঠকেরই নিজস্ব। আক্ষরিক অর্থে পাঠক হয়ত নির্দেশানুযায়ী Unit গুলিকে গ্রহণ করতে পারেন কিন্তু সেগুলি অনুষঙ্গহীন হয়ে দ্যোতনাসৃষ্টিতে অক্ষমই নয় কি অনেক ক্ষেত্রে? অবশ্য চতুর্থ মলাট থেকেই জেনে নিতে হয় এই সকল ক্ষেত্রে কাব্যভাবনা, অন্য উপায় নেই বলেই, আর ভিতরের লিপিবদ্ধ অপূর্ণতাই কি পূর্ণ হয়ে ওঠে ভূমিকা আর টিকায়?

তাছাড়া আমাদের তো মনে রাখতেই হয় যে কোন পরীক্ষাই কি অভিনব না অভিনব হলেই মৌলিক, কিম্বা মৌলিকতাই আধুনিকতার অন্যতম শর্ত। চেতনা-সচেতন, সজ্ঞান-নির্জ্ঞান ইত্যাদি মনোবিকলনের jargon মিশিয়ে কাব্যতত্ত্ব প্রসঙ্গটি যেমন যথেষ্ট obscure করে তোলার প্রবণতা দেখা গেছে, তেমনি কথাকে নিছক sound unit হিসাবে ব্যবহারের প্রবণতাও কবিতার ইতিহাসে লক্ষ্যণীয়। কিন্তু মানুষের মনের চেয়ে স্বতঃসিদ্ধ যে কিছু নেই, একথা বোধহয় কান্টই প্রথম বুঝেছিলেন।

আসলে বুনন-গঠন-আংগিকের ভেতর দিয়ে অনুভবকে ধরার বদলে কয়েক প্রস্থ বিন্যাসের ভেতর দিয়ে এখনে ধরা হয়েছে। কবিস্বভাব, বিশ্ববীক্ষা, কাব্যবোধ, ভাষা বা ধ্বনির পরীক্ষা কিছুই তাই এখানে লভ্য নয়। কবিতায় একটা শব্দ বা শব্দগুচ্ছের অভিপ্রেত ভূমিকা তৈরি হয় বিশেষ ও বিবেচিত প্রসংগের সৃষ্টি করে; প্রসংগ এখানে অবান্তর, কিন্তু বিশ্বাসই একটা প্রসংগ অথচ যে-অপ্রত্যাশিত কবিতার অন্যতম আকর্ষণ, খেলার ক্ষেত্রেও অননুমেয়র সেই শর্ত; এই অর্থেই খেলার আদলে পাওয়া যাবে এই বইর সার্থকতা। ইদানীং অনেক লেখক কথাকে নিরবচ্ছিন্ন বলিয়ে নিয়ে কথাকেই হটিয়ে দিতে চাইছেন; এখানে দেখি কবিতার কাছ থেকে কিছু না পেয়ে কবিতাকেই ব্যংগ করা হয়েছে।

কবিতাবন্দী জ্যামিতি ও জ্যামিতিবন্দী কবিতা—অরুণ চক্রবর্ত্তী / বর্ত্তমান প্রকাশনী

সংবেদাতিরেক : চিন্তনবিরলতা/উশীনর চট্টোপাধ্যায়

কামনা ও নৈরাশ্য	পঙ্কজ কুমার মণ্ডল	তুলিকলম	:	চার টাকা
কল্পিত দুঃখকে নিয়ে	রবি রায়	সমুদ্রণ	:	ছ' টাকা
মানুষের কাছে	হিমাংশু দে	নারায়ণচন্দ্র দাস, ইছাপুর	:	চার টাকা

কবিতার জন্ম রহস্যের ভিতরে বন্দ হয়ে আছেন এরকম একজন কবিকে একবার বলতে শুনেছি যে, কবিতাকে যেদিকে চালিত করবার কথা থাকে, কবিতা ঠিক সেদিকেই যেতে চায়না সবসময়। কেননা তার নিজেরই আছে কিছু আয়োযিত সেন্সরশিপ। কার্য-কারণ পারম্পর্যের অসংলগ্নতা সেখানে এতই প্রকট যে যুক্তির ডিসেকশান টেবিলে সবসময় তার এ্যানালিসিস কার্যকরী হয়না। শুনে মনে হতে পারে যে, তা কি করে হয়? কবিতা কি তবে নিয়তিযুক্ত নিয়ম রহিত কোনো গোলকধাঁধা, যেখানে কবির কোন উদ্দেশ্য, কোন পরিকল্পনাই শেষপর্যন্ত ফলপ্রসূ হওয়া সম্ভব নয়? ঠিক, যুক্তিগুলি যে একেবারেই অগ্রাহ্য একথা বলা যায় না। তবে অনেকেই

আশাকরি মানবেন যে, কিছু না কিছু বলার ইচ্ছা থাকে কবির চিন্তার জগতে. অনেক ক্ষেত্রেই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত ঠিক সেই ভাবে বলা হয়ে ওঠেনা। একে অস্বীকার করলে কবিতাকে পরিণত করা চলে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্রে অথবা ডুবতে হয় তুচ্ছতার চোরা-ফাঁদে। আর একে মেনে নিলে নিজের সঙ্গেই নিজের একটা প্রবঞ্চনার প্রশ্ন এসে যায় অনেক সময়। এজন্যই বলা হয়েছে কবিতার অঘোষিত সেন্সরশিপ। আর এই সেন্সরশিপের জন্যই কবিতাকে কেউ বলেছেন বিশ্বাসঘাতক, কেউ বা চিহ্নিত করতে চেয়েছেন ছদ্মবেশী প্রতারক হিসাবে।

এটুকু ভূমিকা। কেনন। যে তিনজন কবি এখানে আলোচ্য তাঁদের একজনের ভিতরেও আন্তরিকতার অভাব নেই। নেই কোন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ঘাটতি, বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু তাত্বিক প্রত্যয়েরও। যদি কোন কিছুর অভাব থেকে থাকে তবে তা গোল খানিকট কাব্যিক সংযম। হৃদয়ের আহবানে সাড়া দিয়ে এঁরা যতটা চিড়বিড় করে জ্বলে উঠেছেন বা চরম গ্লানির মধ্যে পিছু হঠতে চেয়েছেন কিম্বা স্থির দৃষ্টিতেই পরিপার্শ্বকে পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছেন, ততট মননশ্রয়ী হয়ে মগজচর্চাকেও সমন্বিত করে নিতে না পারার দরুণ এঁদের উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রেই সৌন্দর্যময় কবিদৃষ্টির তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানকে ছাপিয়ে প্রথাগত কিছু ক্যাটেগোরিতেই ঘোরা ফেরা করেছে। যেমন ধরা যাক পঙ্কজের এই সব উচ্চারণ :

তোমার উৎসব কপালে জ্বালুক অরুণ
আমার হাতের সব দীপ ভেঙে, আর আমি
জলঘরে সাজাই বাসর
থকথকে রক্তে, ঝরাদল কাঁদুক তুমি যেন
দেখনা সে করুণ দৃশ্যপট।
পরজন্মে রাজপুত্র হবো—এই ভেবে
ছিঁড়ে ফেলি প্রাণের শিকড়
[উৎসব]

কিম্বা :

মিছিলে যাবে ?
এক ফোঁটা রক্ত কি দিতে পারো তোমার বুকের,
উষ্ণজল দিতে পারো শোকিত চোখের ?
না, পারোনা বলেই তুমি রাজা সেজেছো
আর আমরা মিছিলে যাবো
এক হাতে কাস্তে নেবো অন্য হাতে ধান
কিম্বা হাতুড়ি নেবো, লাল নিশান
....
এই পথ হেঁটে পৌঁছবো ভোরে
তোমারই দরজার কাছে বুঝে নিতে সব।
[মিছিলে যাবো]

এই দু'রকমেরই কবিতা আছে পঙ্কজের বইটীতে। ভূমিকায় পঙ্কজ অবশ্য বলেছেন যে তিনি নিজেই জানেন না যে তার কল্পলোক কখন অলীকে, কখন আবার নিবিড় মাটিতে। এইভাবেই পঙ্কজ তাঁর কামনা আর নৈরাশ্যের সংবাদ পৌঁছে দিতে চান পাঠকের কাছে তবে তাঁর নৈরাশ্যের কবিতাগুলি বোধহয় পাঠককে কিছুটা টেনে নিয়ে যেতে সক্ষম। কিন্তু এই নৈরাশ্যের সমাধান চেয়ে তিনি যে কামনার দ্বারস্থ হয়ে কবিতা লিখেছেন তা মনকে প্রশ্নপ্রবণ করে যতটা ততটা কবিতার সৌন্দর্য বা তাৎপর্যের নতুন কোনো উপলব্ধিতে প্রসন্ন করেনা। কবিতায় স্বাতন্ত্র্য কি চিহ্নিত হয়ে থাকে সংবেদের প্রাবল্যে। না আবেগ-ভাবালুতার স্রোতে ছাড়া লাটাইয়ের নি স্তুন হারানোয় ? চিন্তনের প্রাখর্য্য কি সেখানে একটা বড কথা নয় ? আর একটা কথা এটি পঙ্কজের প্রথমকাব্যগ্রন্থ কিন্তু এর অঙ্গসজ্জা সম্পর্কে তিনি এত উদাসীন কেন ? পৌনপুনিক মুদ্রন প্রমাদ কি কাব্যগ্রন্থে গতি রোধের প্রতিভূ নয় ?

'কল্পিত দুঃখকে নিয়ে' রবি রায়ের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। ভূমিকায় তিনিও বলেছেন যে, 'কবিমাত্রেরই একটি প্রতিশ্রুতি থাকে আর সে প্রতিশ্রুতি হল তাঁর স্বসমাজ ও জীবন পরিবেশের মধ্যে আত্মস্থ থেকে এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে

নিজেকে অন্বেষণ উপস্থাপন ও নির্মাণ করা। আর এ' কাজটা কবিকে করতে হয় অত্যন্ত সুচারু আর শিল্প সম্মত ভাবে' কিন্তু 'সুচারু' ও 'শিল্পসম্মত' বলতে তিনি ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন তা খুব স্পষ্ট নয় তাঁর কবিতার সর্বত্রই। মনে হয় শ্রেয়োনীতি তাঁকে যতটা আচ্ছন্ন করেছে, সাহিত্যনীতি ততটা নয়। একেতো আমাদের দৃষ্টির ভিতরেই অপূর্ণতা রয়েছে, উপরন্তু তা আবার চৈতন্যের উপরি তলের পক্ষপাতদুষ্ট। তার ভিতরে আবার অটো সাজেশন জুড়ে কবিতার স্রোতকে প্রবাহিত করা হয়তো কোন কোন কবির পক্ষে সম্ভব, কিন্তু তার জন্য কবিত্ব শক্তির তীক্ষ্ণতা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। রবি রায়ের কবিতায়ও দেখছি কিশোর প্রেমিকের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস যতটা প্রকট বা সন্তাপী মানুষের অন্তর্বেদনার প্রাবল্য যতটা সোচ্চার অথবা এ সবের সম্মিলিত প্রয়াস হিসাবে প্রজ্ঞাবানের উপলব্ধি যতখানি সরাসরি উপস্থাপিত কবিদৃষ্টির, সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ, সৌন্দর্যময় পর্যবেক্ষণ ততটা নয়। শুধু, সাহসের অভাবে/কত কিছুই আমরা হতে পারিনা/......হতে পারিনা প্রেমিক/কিংবা লুচ্চাও'—তাঁর এই উচ্চারণ আমাদের ছুঁয়ে যায় মাত্র, দীর্ঘস্থায়ী কিছু রেখে যায়না হৃদয়ে। একেবারে সাদাসিধে। অতিসরল উচ্চারন সত্বেও, তাঁর উপলব্ধির সারল্য জীবনবীক্ষার চরমে পৌঁছনর সারল্যে পর্যবসিত হয়না, কাব্যচর্চায় সম্যক মনোনিবেশের সারল্যে পরিণত হয় কেননা শব্দের যে প্রয়োগকৌশলে কবিতা বিশিষ্টতায় চিহ্নিত হয়। শব্দের সেই Intrinsic value'র উপলব্ধি তার অর্থের উপরিতলে নেই, বহুল ব্যবহৃত হয়েও তার লাবণ্য উৎপাদনের ক্ষমতা লুকিয়ে আছে কবি আর পাঠকের অনুভূতিতে ছন্দ ব্যবহারে কবির অনবধানও কিন্তু তাঁর কবিতার রসাস্বাদনে যথেষ্ট বঞ্চিত ও আহত করে। অক্ষরবৃত্ত রীতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি পয়ারের আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু অনেক সময়ই যুক্ত ব্যঞ্জনের ধ্বনিকে বিশ্লিষ্ট করে যেমন মাত্রামূল্য দিতে চেয়েছেন, তেমনি প্রায় একই রকম ধ্বনিবহুলের ক্ষমতা সত্বেও কোনো কোনো যুক্ত ব্যঞ্জনকে দিতে চেয়েছেন একমাত্রার মূল্য অথচ জীবনানন্দীয় শিথিল পয়ার তাঁর নয়, যেখানে অনায়াসেই একই যুক্তব্যঞ্জনকে ভিন্ন মাত্রামূল্য ব্যবহার করে নেওয়া যায়। যথেষ্টই আঁটোসাঁটো আর সুসংহত তাঁর পয়ার।

হিমাংশুর কবিতায় অবশ্য চূড়ান্ত বিস্ময়ের প্রশ্নপ্রবণতা যেমন আছে তেমনি আশান্বিত হৃদয়ের কামনা জনিত প্রস্তাবও কিছু আছে। কিন্তু জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নূতন কোনো উপলব্ধিতে তিনি আমাদের পৌঁছে দিতে পারেননি। কবিতাকে কাব্যশূন্য করে তুলতে চাননা হিমাংশু। কেবল নিরাভরণ আর নিরাবরণ ভাবে তুলে আনেন এক একটি পংক্তি। ভূমিকায় অবশ্য লিখেছেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক যে, 'হিমাংশু কবিতা লেখে বাইরের চারপাশটাকে ভিতরের চৌহদ্দির মধ্যে মৃদু ঘুম পাড়িয়ে। কবিতায় তার জেগে ওঠা, ঘুমিয়ে পড়া, যেন নিজেরই গরজে', কিন্তু হিমাংশু নিশ্চয়ই 'কবিতা বুঝিয়ে দেবেনা মানে, সে শুধু হয়ে উঠতে থাকবে'—এই ধারণার কাছাকাছি থেকে কাব্যচর্চা করেননি? 'আকণ্ঠ বিশ্বাস বধির করেছে আমাকে। অনুতাপে কি ধুয়ে ফেলা যায় সমস্ত কলুষ?'—এই উচ্চারণে নৈর্বক্তিকতা যেমন পুরোমাত্রায় অনুপস্থিত, তেমনি একেবারে আত্মরতি বিলাপও বলা যাবে না একে। এ দুয়ের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছেন হিমাংশু, অথচ কবিতায় তাঁর বলার যদিবা কিছু আছে কিন্তু কাব্যশৈলী দিয়ে তিনি তেমনভাবে চিহ্নিত নন বলেই মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে বইটির অঙ্গসজ্জায় আরেকটু নজর দেওয়া যেত না কি?

জন্মভিটার উপর দিয়ে ফিরছি : শ্রীকান্ত পাল ; মহাপৃথিবী : পাঁচ টাকা

নিজের মুখোমুখি : দ্বিজেন আচার্য ; অনুভব প্রকাশনী : চার টাকা

ছন্নছাড়া জন্মভিটার উপর দিয়ে যে কবি ফিরছেন তিনি তাঁর কবিতার সংসার সাজিয়েছেন মূলত স্মৃতির অলঙ্কারে ; প্রতিমা নামিয়েছেন শ্মশানে, 'অনাত্মীয় অন্ধকারে' ; 'হারানো অতীত এবং প্রেম'-এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনুভব করেছেন 'হাতফেরা' 'একতরফা প্রেমের মত বিকলাঙ্গ' এক অস্তিত্ব যা 'ভাগফল মেলাতে পারে না'। তারুণ্যের স্বভাবধর্মে কবিরা প্রকাশকাতর, সকল সময়ই যে প্রকাশসমর্থ এমন নয়। শ্রীকান্ত পাল সম্পর্কেও সে কথাই বলতে হয়। তাঁর কবিতায় সময়ের চাপ আছে, ভালবাসার দীর্ঘশ্বাস আছে, এবং মানুষের দুর্মরতা নিয়ে প্রত্যয়ও রয়েছে। তাঁর চেতনায় যে উৎসব নেই তা'ও তিনি জানেন ; সেটা তাঁর স্বকালের উত্তরাধিকার যা কবিতাকে অস্থিমজ্জা দেয়। যেটা অনেক সময় শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায় তা' হল, কবির আত্মপ্রকাশে কেন উৎসব থাকবে না, থাকবে না সংবেদনার স্ফূর্তি ও বাক্যের তীব্রতা যা পাঠককেও দীর্ঘশ্বাস ফেলাবে। তবু লাভ ; ঐ প্রতিবেদককে তিনি নৈষ্ফল্যে পৌঁছে দেননা, প্রত্যাশা জাগিয়ে রাখেন ; এবং অসম্ভব খুশি হওয়া যায় সেই প্রত্যাশার ভূখণ্ডে মানুষকেই বসে থাকতে দেখে, দেশ-কাল-সমাজের কাছে দায়বদ্ধ সচেতন মানুষ যে শুধু নিজের বেদনার ক্ষতমুখেই মুখ রাখে না। পাঠককে পড়ে দেখতে বলি, 'প্রতিদিন নতুন মহড়া', 'সবদেশ আমাদের দেশ', 'এত কাছে রয়ে যাচ্ছে', 'কারারুদ্ধ নজরুলকে ভেবে' কবিতা কটি। আধুনিকের বাগ্‌রীতি এবং বিচিত্র সংবেদ শ্রীকান্ত পালের স্বভাবী উচ্চারণে ধরা পড়ে ; প্রয়োজন নির্মোহ এবং নির্মমতার সাধনা, প্রথমটি চেতনাগত এবং দ্বিতীয়টি শৈল্পিক।

দ্বিজেন আচার্যর 'নিজের মুখোমুখি' তাঁর পত্র-পত্রিকায় ছড়ানো ইদানীং কালের রচনার কতটা শিল্পগত সামীপ্য দাবী করে সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। কারণ এই কবির আরও প্রবল রচনা বর্তমান প্রতিবেদকের স্মৃতিতে অস্পষ্ট ধরা আছে। সাধারণ ভাবে এই সময়ের কবিদের গ্রন্থসিদ্ধির যে আগ্রহ তা থেকে তিনি মুক্ত নন বলেই কি অনেক দুর্বল, বর্জনীয় রচনাকে কোল দেন, ('এপিটাফ', 'প্রতিশ্রুতি', 'সমুদ্র স্বাক্ষর', এবং —) ? তাঁর বাচনভঙ্গিতেও অসতর্কতাবে আসে বাসিমড়ার গন্ধ — 'সখী গন্ধরাজ', সংকল্পে নৈবিদ্য সাজাও মনোরমা', 'উটের গ্রীবার মৃদু', কৃকলাশ যৌবন, বিপ্রতীপ দুঃখ, স্মৃতির অর্গান ইত্যাদি শব্দবন্ধ 'ব্যবহৃত হতে হতে শূয়োরের মাংস' হয়ে যায়নি কি ? অথচ, দ্বিজেন দিতে জানেন ঠিক পর্দায় নিষ্কম্প ছন্দের টান। পাঠক পড়ে দেখুন, 'শ্মশানবন্ধু' 'বাঘ', 'নারী', 'মৃচলেখা', 'কথা রাখ', 'একদিন-চিরদিন'—বা শুধুমাত্র 'বিশ্রাম' এর মত তিন লাইনের সপ্রতিভ দ্যুতিময়তা। তাহলে কি দ্বিজেন আচার্য ছোটকবিতার 'মুড' ফোটানোয় বেশি পারঙ্গম, বড় আয়তনের চিন্তার পরিসরে বিহ্বল ও দিশাভ্রান্ত হয়ে পড়েন ? সে মতামত দেখার সময় এখন নয়, কারণ দ্বিজেন এখনও চেতনায় জায়মান এবং উচ্চারণে আত্মনেপদী হতে চান।

কেউ কেউ কোন কোন দিন / নিভা দে / কোরাস প্রকাশনী / দুর্গাপুর-৪

আটতিরিশ বছরের রণেশ হল গল্পের নায়ক। তিনি প্রচ্ছন্ন বেকার। প্রচ্ছন্ন একারণে যে মাঝে মাঝে তিনি কিছু কিছু ধরাবাঁধার বাইরে কাজ করেন। আবার সে কাজ ছেড়েও দেন। কাজের মধ্যে দু'একটা ট্যুইশানী। একটি লিটিল ম্যাগাজিন বার করা আর গল্প উপন্যাস লেখা। হ্যাঁ, আর একটা কাজ। এই আটতিরিশ বছরে তিনি বেশ কয়েকটি প্রেম করেছেন। কিন্তু কোন প্রেমই বিয়ের পরিণতিতে পৌছয়নি। এই নিয়ে নায়কের মর্ম-বেদনা। এইসব নিয়ে দেহে একসময় আটত্রিশ বঁছর এলে শ্রুতি আসে জীবনে। শ্রুতির বয়েস তেইশ। এই শ্রুতির সঙ্গে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' প্রেম চলতে থাকে নায়কের। নায়কের ইচ্ছা 'এই একটি প্রেমকে সে অমলিন রাখবে'—সেটি কিভাবে সম্ভব? তারও ফরমুলা দেওয়া আছে এই গল্পে। মনে মনে নায়ক-নায়িকা খুব করে প্রেম করবে। বর্ষায় জানালা দিয়ে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে। কোন কাজে মন বসবেনা। দু'জনের দেখা হলে ন্যাকা ন্যাকা কথা বলবে। এমন কি কোন রাতে নায়কের যদি নায়িকাকে পাবার খুবই ইচ্ছা হয় তাহলে বেশ্যাবাড়ি যাবারও ইচ্ছা পোষণ করবে শুধু নায়িকার দেহটি ছুঁলে চলবে না। তাহলেই নাকি পবিত্র প্রেম মলিন হয়ে যায়।

তো যাই হোক এই একটি প্রেমকে অমলিন রাখার মানে হল অন্য অন্য প্রেমগুলি সব অমলিন অপবিত্র ছিল। তাই যদি হবে তাহলে একসময় নায়ক বলেন কি করে— 'এতগুলি সার্থক প্রেমের ধারক সে'। মলিন কিম্বা অপবিত্র প্রেম সার্থক হয় কি করে। এই সার্থকতার সংজ্ঞাও দেওয়া আছে গল্পে। 'বিয়ের কারাগারে' প্রেমকে বন্দী না করলেই' নাকি তা সার্থক! তাহলে বিয়ে না হওয়ার জন্য গল্পের পাতায় পাতায় পাতায় নায়কের দীর্ঘশ্বাস শোনানোর কি দরকার!

এইসব বৈপরিত্য এবং স্ববিরোধীতা নিয়ে এই গল্প। এ-গল্প আমাদের নতুন কিছু দেয় না। না বিষয়বস্তুতে না আঙ্গিকে না ভাষায়। গল্পের উত্তাপের সঙ্গে ভাষা সামঞ্জস্য রক্ষা করেনি। বড আলগা এবং ভুল ব্যবহার বলে মনে হয়। 'আদর করত আস্বাদ মিটিয়ে'। এরকম লেখা হয় নাকি? 'সারা দেহ যেন কুলুকুলু সুখের নদী'। 'হাত পা গুলো কেমন খড় খড়ে'। 'সার্থক প্রেমের ধারক'। 'জীবন তরী' 'বিয়ের কারাগার'। আজকাল এরকম ভাষায় কথা ভাবতেও কষ্ট হয়।

আগেই বলা হয়েছে নায়ক কোন কাজকর্ম করেন না। অর্থাৎ স্থায়ী কোন আয়ের সংস্থান নেই। তবু নায়কের দু'বেলা পেট ভরে ভাল ভাত জোটে। মাঝে মাঝে তাকে রেষ্টুরেন্ট ও সিনেমায় যেতে হয়। অবশ্যই প্রেমের খাতিরে। ট্যুইশানির টাকায় তাও মাঝে মাঝে ছেড়ে দেন নায়ক) এত সব হয়। যদি না হয় তাহলে নায়ক নিশ্চয়ই একপেট খিদে নিয়ে দিন যাপন করেন। এক পেট খিদে নিয়ে আর যাই হোক একটুও প্রেম হয় না।

বোঝা যায় লেখিকা নারী পুরুষের প্রচলিত সম্পর্কের সংস্কার ভেদ করে বেরিয়ে আসার প্রানপন চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বেশ কিছু স্ববিরোধিতা এবং জীবনের অন্য অনেক প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন না থাকার জন্যে তিনি কেন্দ্রচ্যুত।

দু'টী কবিতার বই ও একটি ছড়ার / অমল দাস

● **প্রিয় ফুল কোথায় লুকোলে** / অমর ঘোষ, সন্দীপন প্রকাশনী, চাঁপদানী, হুগলী, ৩ টাকা।

প্রথমেই কেমন একটা সংকোচ। ৪র্থ মলাটে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের দুটি লাইন। এসব দেখেও আলোচনা করতে হচ্ছে। মোট ২৬টি কবিতা নিয়ে বই। কিছু কিছু কবিতা দারুন টানে—প্রিয় ফুল—.. লুকোলে অরণ্য মাটির মেয়ে', 'সবুজ পাতা এবং বিষ' জল সরে যায় ইত্যাদি বানান ভুল বড় লাগে। পীড়া দেয়। এটা এড়ান যেত। প্রচ্ছদ খুব একটা টানে না। আগামী দিনগুলো আরো সম্ভবনাময় হয়ে উঠুক।

● **ইপ্সিত উত্থানের দিকে নিয়তির দিকে** / শান্তি রায়, স্বপ্ননীড়, কোতল পুর, বাঁকুড়া, ৩ টাকা।

প্রকাশকের নিবেদনই শান্তি রায়ের ভূয়সী প্রশংসা। কবি প্রকৃতি বা কবিতার মেজাজ নিয়ে তিনি বেশ বার বার সোচ্চার। তবু বলতে হচ্ছে কোথায় সেই শব্দ যা টং টং করে বাজে। সেরকম কোন ব্যবহার চোখে পড়লনা, চতুর্থ কাব্য গ্রন্থহিসেবে আরও গভীরতা এবং পরিণতি আশা করা যায় না কি ?

তবে শান্তি রায় সাত্যিই সংরাগী স্বভাবের। খুব স্পর্শকাতর মন। যা তাকে আঘাত করে সেটাই কবিতা হয়। বইটার ছাপা ভাল। কিন্তু উৎসর্গ ওই ভাবে কেন ?

● **ইটীং বিটীং চিটীং** / অমিত চক্রবর্তী কথা শিল্পি, ১৯ শ্যামা চরণ দে ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৭৬, ১-৫০ টাকা।

প্রচ্ছদ থেকে দেখতে দেখতে ছড়া কে ছড়াবো। প্রচ্ছদটি খুব বেশী জ্যাবড়া। আর একটু হাল্কা হলে কি হত ? ছড়াগুলো খুব একটা উতরায়নি। কাঁচা হাতের লেখা মনে হয়। আর দুটি বড় গোছের বৈষম্য চোখে পড়ল। মাত্রা বোধ এবং মিল। দুচারটে ছড়ার দু'চার লাইন যা ভাল লাগে। ব্যস্। ভবিষ্যতে আরও ভাল ছড়ায় ছড়িয়ে যেতে চাই।
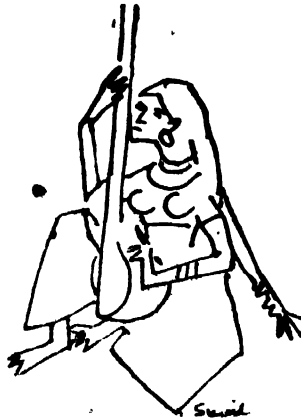
অনন্য সাজে সেজে প্রতি বছরের মতো এবারেও মহালয়ায় প্রকাশিত হচ্ছে—

শারদীয়া গোধূলি-মন—১৩৯০

দু'টি প্রবন্ধ লিখেছেন : ডঃ জীবেন্দু রায় ও অজিত রায়

অনুবাদ সাহিত্য : সিসিল ডেলুইস-এর পরিচিতি সহ দু'টি কবিতার তর্জমা— উশীনর চট্টোপাধ্যায়

৪টি ছোট গল্প : জগৎ লাহা, গৌর বৈরাগী, অরুণ সরকার ও নব বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা লিখেছেন : নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, গোপাল ভৌমিক, সুশীল রায়, কৃষ্ণ ধর, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, কৃষ্ণা বসু, অরুণ কুমার চক্রবর্ত্তী, অমৃততনয় গুপ্ত, অমল দাস, গোপাল চক্রবর্ত্তী, সমীর মণ্ডল, রবীন সুর, শীতল চৌধুরী, সনৎ মান্না, অজিত বাইরী, মতি মুখোপাধ্যায়, আবুবকর সিদ্দিক, ফারুক নওয়াজ, মহশীন মুর্শেদ, আবুল হাসনাত মনিরুজ্জমান, ডাঃ জ্যোতির্ম্ময় বসু, ভাস্কর দাশগুপ্ত, প্রবাল কুমার বসু, সোফিওর রহমান, কৃষ্ণসাধন নন্দী, কৃষ্ণেন্দু বসু, গৌরাঙ্গদেব চক্রবর্ত্তী, দ্বিজেন আচার্য্য, কাজল সরকার, রমেন্দ্র কুমার আচার্য্য চৌধুরী, সমর দাস, প্রীতিভূষণ চাকী, সরল দে, হরপ্রসাদ মিত্র, বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায় ও অশোক চট্টোপাধ্যায়।

সাক্ষাৎকার : নিমাই ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে কিছুক্ষণ—শাহাদত আলী আনসারী

দামী কাগজ ॥ ঝকঝকে ছাপা ॥ সুদৃশ্য রঙিন প্রচ্ছদ।

দাম : চার টাকা মাত্র

প্রকাশিত হোল

কবি শীতল চৌধুরীর

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ

সরল দর্পণে জং

(পাঁচ টাকা)

গোধূলি প্রকাশনী

নতুনপাড়া

চন্দননগর ॥ হুগলী

আমাদের পরবর্তী সংখ্যাই

সেই ছড়া সংখ্যা

১৫ই আগষ্ট প্রকাশিত হবে

দু'বাংলার প্রবীন ও তরুণ ছড়াকারদের ছড়া ও ছড়াসম্বন্ধিয় প্রবন্ধ তৎসহ ব্যঙ্গচিত্রী অমল চক্রবর্ত্তীর আঁকা ছবি।

O **প্রবন্ধ লিখছেন :**

প্রীতিভূষণ চাকী, ডাঃ স্বপন কুমার গোস্বামী, হাসান কামরুল ও আভাষ চন্দ্র মজুমদার

O **ছড়া লিখছেন :**

হরেণ ঘটক, প্রীতিভূষণ চাকী, সরল দে, রবীন সুর, কৃষ্ণধর, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সনৎ মান্না, অমল দাস, শীতল চৌধুরী, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃদুল দাশগুপ্ত, বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, রীনা চট্টোপাধ্যায়, গোপাল চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণেন্দু বসু, সুদীপ নাগ, অরুণ কুমার চক্রবর্ত্তী, শিখা নন্দী, যদুপতি মল্লিক, তুষার কান্তি ব্রহ্মচারী, ফারুক নওয়াজ, অমিয় কুমার মুখোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ দেব চক্রবর্ত্তী, নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিজেন আচার্য, উশীনর চট্টোপাধ্যায় এবং অমিতাভ চৌধুরী।

দাম : দু' টাকা

সংবাদ

০ কেতকী সম্পাদক ও কবি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এর উপর আক্রমণ—

গত ৩০-৬-৮৩ তারিখে পুরুলিয়ার বিশিষ্ট কবি ও কেতকী পত্রিকার সম্পাদক মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় স্বীয় বাসভবনে রাত্রি ১১৪টার সময় একদল গুণ্ডা ও মস্তান বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হন। ওরা কবিকে খুন করার চেষ্টা করলে কবি চিৎকার করেন। চিৎকার শুনে কিছু সাহসী যুবক ছুটে এলে আক্রমণকারীরা পালিয়ে যায়।

গণ মানুষের কবি মোহিনীমোহন। তাঁর কবিতায় সংগ্রামী মানুষের ভাষা। অন্যায় অত্যাচার শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে কবির কণ্ঠ অতি সোচ্চার। তাই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির চক্রান্তে এই আক্রমণ।

কবির উপর আক্রমণে অগনিত মানুষ দারুণ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং ঘটনার তদন্তের দাবী জানিয়েছেন।

০ মহকুমা তথ্য দপ্তরের উদ্যোগে চলচিত্র প্রদর্শনী—

চন্দননগরের জ্যোতি সিনেমায় ৮, ৯ ও ১০ই জুলাই তিনদিন ব্যাপী এক চলচিত্র প্রদর্শনীর উদ্যোগ নিয়েছিলেন মহকুমা তথ্য দপ্তর। ৮ই সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' ৯ই সত্যজিৎ রায়ের 'সোনার কেল্লা' এবং ১০ই মৃণাল সেনের 'পরশুরাম' প্রদর্শিত হয়।

জেলা তথ্য দপ্তর অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ লিপিতে এই চলচিত্র প্রদর্শনীকে 'উৎসব' নামে উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন ছোটখাট ক্লাব প্রায়ই এ ধরনের চলচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকেন। একে কোনমতেই 'উৎসব' বলে না। একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করে এবং প্রতিদিন এক একজন বক্তাকে দিয়ে ১৫/২০ মিনিটের জন্যও আলোচনার ব্যবস্থা করলে আমরা উৎসব হিসাবে মেনে নিতে পারতাম। সত্যজিতের উপরোক্ত বইগুলি চন্দননগরের চলচিত্র উৎসাহী মানুষেরা ইতিপূর্বেই দেখে নিয়েছেন।

মহকুমা তথ্য অধিকারিক শ্রীবিভূতি ভূষণ রায় উদ্যোগী মানুষ। তিনি চেষ্টা করলে চলচিত্র প্রদর্শনীটিকে উৎসবের রূপ দিতে পারতেন—এবিশ্বাস আমাদের আছে। আগামীতে আমাদের প্রত্যাশী উৎসবের আশায় রইলাম।

০ কবি কৃষ্ণাবসুর বাড়িতে কবিতা পাঠের আসর—

কবি কৃষ্ণাবসুর শুধু কবিতার হাতই সুন্দর না, তাঁর রান্না এবং আতিথেয়তাও মুগ্ধ হবার মতো। ১৮ই জুন তাঁর লেকটাউনের ফ্ল্যাটে উপস্থিত সকল কবির মুখেই এ কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল। অনুষ্ঠানের শুরুতে মাছের পুর দেওয়া পটলের দোর্মা সহ নানান ধরনের মিষ্টিতে ভরিয়ে দিলেন উপস্থিত কবিদের।

ন শুরুর আগেই চলে গেলেন কবি নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী। বললেন—তাঁর বাড়িতে কিছু অতিথি অপেক্ষা করছেন। সবে আমরা তিন/চার জন মাত্র জমা হয়েছি এমন সময় কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এলেন। সদ্য রাশিয়া ঘুরে এসেছেন সুনীলদা। আমরা রাশিয়ার আবহাওয়া, ওখানের পরিবেশ, সাধারণ মানুষ ইত্যাদি প্রসঙ্গে প্রশ্ন রাখছিলাম। সুনীলদা উত্তর দিচ্ছিলেন। সবশেষে বললেন, রাশিয়ান ভাষা না জেনে ওখানে গেলে আনন্দের অনেকটাই মাটী। দোভাষীর সাহায্যে সাধারণ মানুষের মনের কথা জানা যায়না। আলাপও জমেনা।

কবিতাপাঠের আসর শুরু হতে প্রথমেই কবিতা

শোনালেন সুব্রত রুদ্র। গোটা তিনেক কবিতা শোনালেন তিনি এবং অনুষ্ঠান পরিচালনার ভার নিলেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জানালেন সাতটার মধ্যেই উনি উঠবেন। সুব্রত রুদ্র ব্যস্ত হয়ে পড়লেন—তাঁর পরিচিত বন্ধুদের কবিতা তাড়াতাড়ি পড়িয়া দেবার সুনীলদা থাকতে থাকতে। কারণ আর কাউকে কবিতা শুনিয়ে লাভ কি? এই ভাবে একে একে উত্তম দাশ, অনন্ত দাশ, সুব্রত সরকার, ধুর্জটি চন্দ কবিতা শোনালেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দীর্ঘদিন বাদে খুবই আবেগের সঙ্গে প্রতিটী শব্দ পরিস্কার উচ্চারনে কয়েকটী সংরাগী কবিতা শোনালেন। প্রায় সব কবিতাই কোলকাতা কেন্দ্রিক। এর পর একটি দীর্ঘ কবিতা শোনালেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়।

এর পর একে একে কবিতা শোনালেন রাণা চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল দত্ত, প্রবীর সেনগুপ্ত, অশোক দত্ত চৌধুরী, অশোক চট্টোপাধ্যায় (ঈগল), শুভবসু, নৃশংস মুরারী দে, অশোক চট্টোপাধ্যায় (গোধূলি-মন), সনৎ মান্না রাখাল বিশ্বাস, কৃষ্ণা বসু ও অরুণ ভট্টাচার্য্য। রাত আটটা নাগাদ অনুষ্ঠান শেষ হলো।

O ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের ভদ্রেশ্বর-চাঁপদানী শাখা ও চন্দননগর রোটারী ক্লাবের যুগ্ম উদ্যোগে চিকিৎসা কেন্দ্র—

বিগত ৩০শে জুন বিকেল পাঁচটায় ভদ্রেশ্বর জুটমিলের মঞ্চে অনুষ্ঠিত হোল ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের ভদ্রেশ্বর-চাঁপদানী শাখা ও চন্দননগর রোটারী ক্লাবের যুগ্ম উদ্যোগে একটি স্বাস্থ্য সুরক্ষা কেন্দ্র। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন প্রবীণ রোটারিযান শ্রীপ্রতুল সেনগুপ্ত ও প্রধান অতিথি ছিলেন ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি ডাঃ সত্যেন কুণ্ডু।

আই-এম-এ ভদ্রেশ্বর-চাঁপদানী শাখার সভাপতি বর্ষিয়ান ডাঃ বিমল চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন—গরীব মানুষের চিকিৎসার সুবিধার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে এ ধরণের বহু চিকিৎসা কেন্দ্র ইতিমধ্যে খুলেছেন।

চন্দননগরের রোটারী ক্লাবের ইতিহাস প্রসঙ্গে রোটারিয়ান এস্ মুখার্জী বলেন—১৯৬৯ সালে চন্দননগর রোটারী ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়। বিগত কয়েক বছরে চন্দননগর রোটারী ক্লাব—নলকূপ প্রতিষ্ঠা, ছোট সংস্থাকে সাহায্যদান, কৃতি ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি করেছে। তাঁদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান হোল আই-এম-এ ভদ্রেশ্বর শাখার সহযোগিতায় চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন।

আই-এম-এ পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি ডাঃ সত্যেন কুণ্ডু তাঁর ভাষণে চন্দননগর রোটারী ক্লাবের ভূয়সী প্রসংশা করে বলেন, এ ধরণের একটি চিকিৎসা কেন্দ্র করার ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য করে সাধারণ মানুষের উপকার করেছেন। জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন সমর্থন করে ডাঃ কুণ্ডু বলেন - ডাঃ বিধান চন্দ্র শিশু চিকিৎসা কেন্দ্র, আর, জি, কর ও বর্দ্ধমান মেডিক্যাল কলেজের ঘটনায় জানা গেছে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনে কোনো অন্যায় নেই। পঃ বঃ সরকারের মধ্যেই সহযোগিতার অভাব রয়েছে।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশিত সুভেনিরটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ডাঃ সত্যেন কুণ্ডু।

আই এম-এ ভদ্রেশ্বর-চাঁপদানী শাখার সম্পাদক ডাঃ শ্রীসাধন তাঁর ভাষণে বলেন—স্বল্পমূল্যে সাধারণ মানুষকে ওষুধপত্র দেওয়া, মায়েদের স্বাস্থ্য রক্ষা প্রসঙ্গে শিক্ষাদান, আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসকদল প্রেরণ ইত্যাদির কারণেই এই স্বাস্থ্য সুরক্ষা কেন্দ্র স্থাপন। দশজন ডাক্তার বিনামূল্যে এই কেন্দ্রে চিকিৎসা করবেন। চিকিৎসা কেন্দ্রের চারটি শয্যা পরিবার পরিকল্পনা, ছোটখাট অপারেশন এবং চক্ষু অপারেশনের রোগীদের জন্য ব্যবহৃত হবে।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে পরে অ্যাপ্লাসে চন্দননগর রোটারী ক্লাবের সাপ্তাহিক বৈঠকে সাংবাদিকদের নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রভূত জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়।

O জেলা সম্পাদকদের মিলন মেলা

হুগলী জেলার পত্র-পত্রিকা সম্পাদক সমিতি ১৭ই জুলাই মিলিত হয়েছিলেন মিলন পার্ক, সাহাগঞ্জে।

রাজ্যপালের অনুষ্ঠানে জেলার পত্র-পত্রিকাকে আমন্ত্রণ না জানানোর ফলে পূর্ববর্ত্তী অধিবেশনে স্থির হয়েছিল সর্বরকম সরকারী অনুষ্ঠান বর্জন করা হবে। আজকের অধিবেশনের শুরুতে ঐ নিয়েই আলোচনা শুরু হোল। 'পল্লীডাক' সম্পাদক ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, 'মুখপত্র' সম্পাদক তারাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ও 'চরাচর' সম্পাদিকা পারুল ভট্টাচার্য একযোগে বলেন—জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংবাদ আমাদের প্রকাশ করতেই হবে। সেটা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। সেক্ষেত্রে আমন্ত্রণ জানানো, না জানানোর প্রশ্নই ওঠে না।

'গোধূলি-মন' জেলা তথ্য দপ্তরের বিজ্ঞাপন বন্টন নীতির নিন্দা করে ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে যে পত্র দিয়েছিলেন তার ওপর বিস্তারিত আলোচনায় জেলার উপস্থিত সকল সদস্যই অংশগ্রহণ করেন। 'কৃষি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন মাসিক সংবাদপত্র পাবে না বা প: ব: সরকারের একাধিক বিজ্ঞাপন একই সংখ্যায় প্রকাশ করা যাবে না' জেলা তথ্য দপ্তরের মৌখিক এই কথার কোন ভিত্তি নেই বলে জানান ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়। তিনি জেলা পত্রপত্রিকা উপদেষ্টা সমিতির সদস্য। তিনি আরো বলেন—সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের অনুলিপি সদস্যদের প্রত্যেকের কাছে পাঠানো হয়। বিগত তিন বছরের মধ্যে না রাইটার্স থেকে, না জেলা পত্র-পত্রিকা উপদেষ্টা সমিতির বৈঠকে এ ধরণের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

বাস পাসের ব্যাপারে দীর্ঘদিন চেষ্টার পর নিষ্ফল হয়ে জেলা শাসককে এ ব্যাপারে অব্যাহতি দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

উপস্থিত সম্পাদকদের জন্য প্রথমে চা-বিস্কুট, একটা নাগাদ মুড়ি-চানাচুর এবং তিনটের সময় ভাত-মাংস সহযোগে মধ্যাহ্ন ভোজের পর্য্যাপ্ত আয়োজন করেছিলেন 'স্বপ্ন সবুজ' সম্পাদক গোঁসাইলাল দে ও শ্রীমতী দে। তাঁদের আন্তরিক আতিথেয়তা মুগ্ধ হবার মতো।

O স্বতন্ত্রজোয়ারের বার্ষিক উৎসব

চন্দননগর গোন্দলপাড়ার স্বতন্ত্রজোয়ার সাহিত্য সংঘ গত ২২শে মে ১৯৮৩, সংঘের একাদশ বর্ষপূর্তি পালন করলেন এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। চন্দননগর বঙ্গবিদ্যালয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন সাহিত্যিক সম্রাট সেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি গৌরাঙ্গদেব চক্রবর্ত্তী। বিশেষ অতিথি ছিলেন নাট্য পরিচালক রেবতীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, গান, গল্পপাঠ, কবিতা পাঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। ১৯৮২ সালের সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণও করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন স্বতন্ত্রজোয়ার পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় ও সুদর্শন দত্ত।

O প্রচ্ছায়া বার্ষিক উৎসব '৮৩

৪ঠা জুন সন্ধ্যা ছটায় ব্যারাকপুর গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয় মঞ্চে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কবিদের উপস্থিতিতে প্রচ্ছায়া চতুর্থ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হল। ক্ষুদ্র পত্র পত্রিকার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন রবিদাস সাহারায় ও শোভনা সেন। পত্রিকা সম্পাদক শৌনক বর্মন উপস্থিত প্রায় পাঁচশো সাহিত্যানুরাগীকে স্বাগত জানিয়ে বলেন আপনারা আরো বেশী করে ক্ষুদ্র পত্র পত্রিকাকে জানুন—কারণ ওখানেই আছে বাংলা সাহিত্যের আগামী দিনের ফসল। অনুষ্ঠানে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী উৎপল চৌধুরী,

কবিতার গীতিরূপ পরিবেশন করেন ঋবিন মিত্র, নজরুল-গীতি পরিবেশন করেন শ্রীমতি মঞ্জুলা দাশগুপ্ত। জীবনানন্দ ও সুভাস মুখোপাধ্যায়ের কবিতা পাঠ করেন মোহুমী মুখোপাধ্যায় এবং 'বিনোদন' কর্তৃক পরিবেশত হয় রতন কুমার ঘোষের নাটক অমর চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় 'শেষ বিচার'। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পত্রিকা সম্পাদক শৌনক কর্মন।

O হাওড়ায় সুর ও সাহিত্যের রবীন্দ্র-নজরুল জন্ম জয়ন্তী পালিত

গত ২৯শে মে '৮৩ রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় শ্রীসুনীল দাশের বাসভবনে ২১৫, শিবপুর রোড (ইউ, বি, আই, বিল্ডিং-এ ৪র্থ তলায়) হাওড়ায় সুর ও সাহিত্যের রবীন্দ্র-নজরুল জন্ম-জয়ন্তী পালিত হয়। উক্ত সভায় পৌরহিত্য করেন বিশিষ্ট আরত্তিকার শ্রীসলিল চক্রবর্ত্তী এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন কবি ও সাংবাদিক শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ছোটদের আরত্তি দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয়। আবৃত্তি করে শুভাশীস দাশ, নন্দিনী সেনগুপ্ত, দেবরাজ রায়, মল্লিকা বসু ও অমৃতা বসু। এরপর সভায় রবীন্দ্রনাথ নজরুলের উপর লেখা কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন যথাক্রমে সর্ব্বশ্রী অমিয়া ভট্টাচার্য্য, নরবাহাদুর লামা, মানিক মুখার্জী, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, ধীরা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবীব গোপাল মুখার্জী, নিতাই দাস। সভায় দুই কবির কাব্য নিয়ে আলোচনা করেন শ্রীঅচল ভট্টাচার্য্য ও শিশির রায়। সভায় রবীন্দ্র-নজরুল সঙ্গীত সুললিত কণ্ঠে পরিবেশন করে সকলের মন জয় করেন শ্রীবাদল চট্টোপাধ্যায় ও জিতেন ভট্টাচার্য। শ্রীদুলাল ভট্টাচার্য ও গোপাল চক্রবর্ত্তী তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে আরত্তি করে নজীর সৃষ্টি করলেন।

সভান্তে সভাপতি শ্রীসলিল চক্রবর্ত্তী রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের উপর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে কয়েকটি আবৃত্তি করে সকলকে বেশ মাতিয়ে তুললেন/এর পর সভার প্রধান অতিথি কবি শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় দুই কবির প্রতি অন্তরে শ্রদ্ধার্ঘ জানিয়ে নিজের স্বরচিত কবিতা পাঠ করে সভার পরিবেশ জমিয়ে তোলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাহিত্যবাসীর সম্পাদক শ্রী[illegible] মজুমদার।

O নজরুলের ৮৪ তম জন্মদিন পালিত হলো হুগলী জেলে

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৮৪তম জন্মদিন পালিত হলো হুগলী জেলখানায় গত ২৬-৫ তারিখে। উদ্যোক্তা হুগলী চুঁচুড়া নজরুল স্মৃতি সংরক্ষ সমিতি।

'ধূমকেতু' পত্রিকার সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম দেশদ্রোহের অপরাধে কারারুদ্ধ হন ১৯২৩ সালে। এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড। প্রথমে তাঁকে আলিপুর জেলে রাখা হয়। পরে তাঁকে হুগলী জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

কবি হুগলী জেলে ছিলেন ১৪-৪-২৩ তারিখ থেকে ১৮-৬-২৩ তারিখ পর্য্যন্ত। কারাবাস কালেই তিনি ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচারের প্রতিবাদে অনশন করেন।

বিদ্রোহী কবি নিজেই লিখে ছিলেন—

'তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়—
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়।'

এই সময়ে উদ্বিগ্ন দেশবাসীর চিন্তদূত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎকণ্ঠিত তারবার্তা Give up your hunger Strike. Our literature claims you" এই কারাগারেই বিদ্রোহী কবির হাতে পৌঁছায়। দীর্ঘ ৩৯ দিন পরে বিদ্রোহী কবি অনশন ভঙ্গ করতে স্বীকৃত হন। কবি জননীও হুগলী জেলে এসে কবির সঙ্গে দেখা করে বলেন—"বাবা দুখু, আমি চুরুলিয়া হতে শুধু মাত্র এখানে এসেছি তোকে কিছু খাওয়াবার জন্য। তোকে খেতে হবে বাবা।"

সে এক অতীত কথা।

হুগলী চুঁচুড়া নজরুল স্মৃতি সংরক্ষন সমিতি কর্তৃক গত ২৬-৫-৮৩ তারিখে হুগলী জেলের যে কক্ষে নজরুল বন্দী ছিলেন—সেখানে এবং জেল ফটকে স্মৃতি ফলক স্থাপন করা হলো। এছাড়া জেল ফটকে একটি আবক্ষ মূর্ত্তি স্থাপন করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সমিতির কার্যকরী সভাপতি হুগলী জেলাশাসক শ্রীসুমন্ত্র চৌধুরী।

News Paper Association, Delhi
RN. 27214/75 June-July '8
Hys-14 Price—Rupee One onl

সে অরণ্য

প্রাকৃতিক [illegible] নের প্রয়োজনীয় পরিবেশ রক্ষার জন্য যেখানে অরণ্যের অনুপাত হওয়া উচিত [illegible] সেখানে পশ্চিমবঙ্গে বনভূমির পরিমাণ ১৩ শতাংশ বনভূমির পরিমাণের সঙ্গে বৃষ্টিপাত, ভূমিক্ষয়, আবহাওয়ার আর্দ্রতা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ নিবিড় ভাবে যুক্ত। নির্বিচারে বন ধ্বংস করার [illegible] আমাদের দেশে যেসব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তার মধ্যে আছে খরা, বন্যা এবং সর্বোপরি পরিবেশ দূষণ। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য আজ প্রয়োজন ব্যাপকভাবে বনসৃজন।

এ লক্ষ্য রেখেই সরকারী প্রচেষ্টায় বনভূমি সৃজনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনের দৈনন্দিন [illegible] মেটাবার জন্য সমাজভিত্তিক বনসৃজনের নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্প রূপায়ণে স্থানীয় জনসাধারণেরই ভূমিকা প্রধান। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ মানুষ, স্থানীয় ক্লাব বা সংগঠন, বিদ্যালয়, গ্রাম পঞ্চায়েত নিজ নিজ পতিত জমিতে, খাল ও নদী-র পাড়ে, গ্রামের রাস্তার পাশে কিংবা পল্লীর প্রান্তরে বৃক্ষ রোপণ করে একদিকে যেমন দেশের বনজ সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারেন তেমনি বাড়তি আর্থিক উপার্জন করতে পারবেন। কারণ এভাবে সৃষ্ট বনজ সম্পদ হবে জমির মালিকের ব্যক্তি-গত সম্পত্তি যা নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করা ছাড়াও বিক্রয় করা যাবে। এই কাজে জনসাধারণের উদ্যোগকে সার্থক করে তোলার জন্য সরকারের বন বিভাগ গাছের চারা সার ও পরামর্শ দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত। এজন্য স্থানীয় বনবিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ও বিশ্ব অর্থ ভাণ্ডারের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গে সমাজভিত্তিক বনসৃজনের এক ব্যাপক প্রকল্প রূপায়ণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের খরাপ্রবণ এলাকায় চাষের অনুপযুক্ত পতিত জমিতে এই প্রকল্পের সাহায্যে বনজ সম্পদ সৃষ্টির ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে।

বনবিভাগের বিভিন্ন স্তরের কর্মী এবং জনসাধারণের যৌথ প্রয়াসে সার্থক হোক সমাজভিত্তিক বনসৃজন প্রকল্প। অরণ্য সম্পদে ভরে উঠুক পশ্চিমবঙ্গের রুক্ষ প্রান্তর, বৃক্ষের আবরণে আচ্ছাদিত হোক নগ্ন ভূমি, আর বন্ধ্যা মৃত্তিকা শস্য-শ্যামলা হয়ে উঠুক।

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সরলা প্রিন্টার্স বড়বাজার, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও
নতুনপাড়া, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি মন

২০ বর্ষ / ৮ম সংখ্যা / ভাদ্র / ১৩৯০

প্রতি সংখ্যা এক টাকা
বার্ষিক সডাক দশ টাকা

সম্পাদক
অশোক চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় ঃ

এটিই সেই প্রস্তাবিত ছড়া সংখ্যা। খুবই স্বল্প সময়ের প্রস্তুতিতে হাজির করা এ সংখ্যা। জৈষ্ঠ্য সংখ্যার সম্পাদকীয়-এ দু'এক লাইনে উল্লেখ করেছিলাম। কিন্তু তাতেই দেখা গেল যথেষ্ট প্রচার হয়েছে। পত্রিকা প্রকাশের কয়েকদিন পর থেকে শুরু হয়েছিল ছড়া আসা। সব ছড়াই যে প্রকাশযোগ্য এমন নয়। তার মধ্যে থেকেই বাছাই করে এই ছড়া সংখ্যা।

বাঙালী শিশু তার বোধোদয়ের সময় থেকেই মা, দিদিমা, ঠাকুমার মুখ থেকে ছড়া শুনে শুনে তৈরী করে নেয় তার ছন্দের কান।

'আয় আয় চাঁদামামা টিপ দিয়ে যা
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা'

—এ ছড়া শোনার সময় হয়তো শিশুর বোধগম্য হওয়ার সময় আসেনি, কিন্তু অবচেতনার অন্তস্থলে এর ছন্দের দোলা গভীর ছাপ রেখে যায়।

আরো একটু বড় হবার পর—

'খোকা গেছে মাছ ধরতে
ক্ষীর নদীর কূলে
ছিপ নিয়ে গেল কোলাব্যাঙ
মাছ নিয়ে গেল চিলে'।

—শিশুর কল্পনা শক্তি বাড়াতে এ ধরণের ছড়া তুলনাহীন। শিশু চোখ বুজলেই দেখতে পায়—বিশাল আকৃতির এক কোলা-ব্যাঙ তার ছিপ মুখে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে লাফিয়ে লাফিয়ে পালাচ্ছে। আর মাথার উপর অসীম নীল আকাশ, সেই আকা-শের বুকে ডানা মেলেছে চিল—মুখে খোকারই ধরা মাছ। এই ভাবেই বাঙালী শিশুর মনে ছড়া কল্পনার জগৎ গড়ে তোলে।

সম্পাদকীয় কার্যালয় ॥ নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর ॥ হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥ ভারত
কলিকাতা কেন্দ্র ঃ ৩৩/৬ জি নাজির লেন, কলিকাতা-৭০০০২৩

দুইটি পাগল চুক্তি করে কাটাকুটি খেলে,
একটি আছে সি এম ডি এ-য়, আরটি পাতাল রেলে।
ভাঙছে বাড়ি ভাঙছে শহর, কাটছে পথ ও ঘাট,
যেমন খুশি গাঁইতি চালায়, পুকুর বানায় মাঠ।
ডাইনে কাটে বাঁয়ে কাটে, কাটে আগু পিছু,
শাবল নিয়ে আবোল তাবোল, রইল না আর কিছু
লোপাট হল পিচের সড়ক, অলি গলি নানা
চাদ্দিকে চাই, চোখে পড়ে কেবল খন্দ খানা।
পাগল দুটি দাবড়ে বেড়ায়, যখন তখন আসে,
মাটির তলার বালি এনে হি-হি করে হাসে।
কখন এসে গর্ত খোঁড়ে কখন কাটে খাল,
কখন এসে গর্ত বোঁজায় কখন বাঁধে আল।
দুই পাগলের দস্যিপনায় টিঁকে থাকাই দায়,
আমরাও ঠিক পাগল হব নিদেন পাগল প্রায়।

উশীনর চট্টোপাধ্যায়ের দুটি ছড়া

(১)

দরগা-দেউল সেলাম ঠুকে
তাবিজ বাঁধে চারটি,
বরাত জোরেই খুন ঝরিয়ে
আনবে সে লিবারটি,
করেরেখা তাই হঠাৎ কেটে
ভাবছে 'বোনাপারটি'।

(২)

লিখতে লিখতে হারছি কেবল
কাজ নেই আর লিরিকে
খেতাব টেতাব দায় জোটা এই
পদ্য লেখার ছিড়িকে।
ভাবছি এবার কোন্ ফিকিরে
আত্মঘাতীই হয়ে নি',
তারপরে সব ভেঙেই হব
'এসেনিন' কি 'ওয়েন' ই।

ডাঃ স্বপন কুমার গোস্বামীর দু'টি ছড়া

ছড়া—১

ফুট পাত কাকে বলে
বলো দেখি পার কে?
হুকারে যা গ্রাস করে
রাজনীতি আর কে।
বিকি কিনি মেলা বসে
গড়ে ওঠে ষ্টল
রাজপথ বয়ে নামে
মানুষের ঢল।

ছড়া—২

যারা ভোট এলে দাঁড়ায়
তারা ভোট ফুরুলে বসে?
তারা জিতলে পরে ঘুমোয়
এবং টাকার হিসেব কষে।
তখন ভোটার এলে তাড়ায়
তখন বিনয় পড়ে খসে।

ছড়া : ছড়া : ছড়া

অশোক চট্টোপাধ্যায়ের তিনটি ছড়া

(১)

রামায়ণের রাম ছিল এক
এ যুগের এক রাম,
আগেছিলেন ডাইনে
এবং এখন তিনি বাম

(২)

রাজনৈতিক দলাদলি
ওপর-ওপর থাক্না।
মন্ত্রী পুলিশ দুই বগলে
ওরাই আশার ঢাক্না।

(৩)

চীন, রাশিয়া থমকে তাকায়
এমনি সে এক নারী,
জন্মেছেন এই ভারতবর্ষে
পাল্লা দেওয়া ভারী।

বাংলাদেশের ছড়া ও ছড়াকার

হাসান কামরুল

বাংলাদেশের পাঠক সমাজের কাছে একঘেয়েমী কবিতা যখোন বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করেছে, যখোন কবিতাতে পাঠককুল নতুন কিছু খুঁজে না পেয়ে এদেশের কবিতার প্রতি অনাকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন, ঠিক তখোনই তারা ছড়ার ভেতরে খুঁজে পেয়েছেন তাদের কাঙ্খিত ভাষা-ভাব ছন্দ আর সুপ্রিয় বক্তব্য মালা।

'বাংলাদেশের ছড়া ও ছড়াকার' ব্যাপকভাবে তুলে না ধরলে জিনিসটির অনেক কিছুই অভাব বোধ হবে। তবুও স্বল্প পরিসরে যেটুকু সহৃদয় পাঠক সমাজে তুলে ধরা যায়—

এদেশে ছড়া এখোন সবচে' জনপ্রিয় সাহিত্য। এই ছড়ার ভেতরে রয়েছে—ছেলেমেয়েদের ভালোলাগার বিষয়। রয়েছে রম্য হাসির তুফান। আর, অভাবগ্রস্থ অবহেলিত এবং জীবন সংগ্রামে পরাজিত মানুষের বেঁচে থাকার শপথ উচ্চারণ।

'৪৭ এর পাক-ভারত স্বাধীনতার পর এদেশের ছড়ায় সাহসী উচ্চারণ তেমন ছিলোনা। তবে কতিপয় ছড়াকারের লেখনীকে অস্বীকার করাও যায়না। সে সময় ছড়ায় ছেলেমেয়ের প্রিয় বিষয়বস্তু আর পেটকাটা হাসির শব্দ ছন্দই প্রাধান্য পায়।

রোকোনুজ্জামান খান, ফয়েজ আহমেদ, আতোয়ার রহমান, হোসনে আরা প্রভৃতি সে সময়ের সার্থক রূপকার।

তার পরবর্তী কয়েকজন ছড়াকারও সেই পথেরই পদাংক অনুসরণ করেন। তাদের মধ্যে আল মাহমুদ, হাবীবুর রহমান, এখলাসউদ্দীন আহমেদ, রফিকুল হক, মোহাম্মদ মোস্তফ, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্ প্রমুখ বিশেষ ভাবে সমাদৃত।

তবে এটা ধ্রুব সত্য যে, ষাট ও সত্তর দশকে এসে এখানকার ছড়া অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ষাট-পূর্বের নিয়ামত হোসেন, দিলওয়ার, কাজি আবুল কাসেম, নুরুল আবসার এবং সাটদশকের সুকুমার বড়ুয়া, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন, আখতার হুসেন, মাহমুদ উল্লাহ, আবু সালেহ, শামসুল ইসলাম, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, শকিকুন্নবি, রশীদ সিন্হা, আলতাফ আলী প্রভৃতি ছড়াকারের ছড়া একটা নতুন যুগের সূচনা করে।

দিলওয়ার, আখতার হুসেন, আবু সালেহ, আলতাফ আলী, মাহমুদ উল্লাহ জনগনের বাঁচার সংগ্রামকে ছড়ার ভাষায় তুলে ধরেন। তাদের ছড়ায় বাম চিন্তাধারাই প্রাধান্য পায়। কয়েকটি ছড়ার কয়েক লাইন উঠিয়ে দিচ্ছি।

আর কাইন্দোনা আর কাইন্দোনা
আর কাইন্দোনা ছি!
কাবলীওলা থাকতে আমার
ট্যাহার অভাব কি?
(আখতার হুসেন)

আমার মুখের ভাত টা যারা কাড়িং
তাদের আমি আরতো নাহি ছাড়িং
সব শালাকে পায়ের নীচে গাড়িং
দেশটা থেকে মারিং তাদের তাড়িং।
(আবু সালেহ্)

তবে এযুগের সার্থক ছড়াকার সুকুমার বড়ুয়া। তার ছড়ায় জনগনের কথা সরাসরি না আসলেও রূপকের মাধ্যমে আকর্ষণীয় ছন্দ ও বক্তব্য উজ্জ্বল। তার একটা

ছড়া—

শেয়াল নাকি পোভ করেনা
পরের কোন জিনিসটার,
কি পরিচয় ছিলো আহা
কি সততা কি নিষ্ঠার।
তাইতো শেয়াল বনের মাঝে
এডুকেশন মিনিষ্টার॥

ষাটের আরো কিছু ছড়াকার শিশু কিশোরদের কাছে অধিকভাবে পরিচিত। জ্যোতির্ময় মল্লিক, খালেকবিন জয়েনউদ্দীন, আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দীন (যদিও ইনি অনেক আগে থেকেই লিখছেন) এ পর্যায়ের ছড়াকার। জ্যোতির্ময় মল্লিকের ছড়া একসময় ছেলে-বুড়োদের হাস্যরসের খোরাক যোগাতো। একটি উদাহরণ—

খলিল খানের নাতি—
দিন দুপুরে আঁধার দেখে
জ্বালান ঘরে বাতি।
সকাল সাঁঝে তাহার
উপচে পড়ে বাহার
তখোন তিনি যেথায় সেথায়
জোরসে ছোড়েন লাথি।

এরপর এলো কাঙ্খীত সত্তর দশক। এদশকের ছড়াকাররা জনপ্রিয়তার শীর্ষে স্থান করে নেন। এখোন কবিতা থেকে সাধারণ মানুষ চোখ ফিরিয়ে নেয়। চোখ ফেরায় ছড়ার পাতায়।

এটা অস্বীকার করলে চলবে না যে, এ যুগের ছড়াকাররা তাদের ক্ষুরধার আগুনঝরা ছন্দে ভাষায় আশাহত জনমনে সংগ্রামের যে দীপশিখা জ্বালান পরবর্তীতে তারই ফলশ্রুতিতে জনগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলো। এবং বিভিন্ন দাবীর সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধভাবে শরীক হয়। বাংলা দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেও ছড়াকারদের অবদান যথেষ্ট ছিলো।

এই দশকের ছড়াকাররা একই হাতে সংগ্রামের— অধিকারের এবং শিশুতোষ ও রম্য সবদিক নিয়েই ছড়া রচনা করেন। তবুও এই দশকের ছড়াকারদেরকে দুই ভাগে পৃথক করা যায়। এক, সমাজ-সচেতন ও দুই, শিশুতোষ ও রম্যকার।

সমাজ সচেতনতার দিক থেকে সর্বপ্রথম ফারুক নওয়াজের নামই উথাপন করতে হয়। এর ছড়া শুধু জনপ্রিয়ই নয়, এর ছড়া—সাধারণ মানুষ তথা এদেশের ছোট্ট ছেলে মেয়ের মুখে মুখেও উচ্চারিত হয়। এর প্রধান কারণ; তিনি তার আগুন ঝরা ছড়ায় শুধু রাশভারী শব্দ আর বামঘেঁষা বে-রস বক্তব্যকেই স্থান দেন না, সাথে সাথে শিল্পকেও প্রাধান্য দেন। তার আগুনঝরা ছড়াগুলিতে এমনসব টুক্‌টাক-রিম-ঝিম, শন্‌শন্‌, রংমাখা শব্দ এবং ছন্দের মারপ্যাচ বিদ্যমান; যা বেরসিক পাঠকও না পড়ে পারবেন না। তার দুটি ছড়া এখানে তুলে দিলাম—

১)
ঢাক্ গুড়গুড় ঢোলরে
ইষ্টি মিষ্টি বোলরে,
মিষ্টি বোলের কায়দা
দেশটা লুটে ফায়দা॥

২)
সিংহাসনের চর্তুপাশে
হাস্‌ছে কারা হি-হি!
গরুর মতো হাম্বা এবং
ঘোড়ার মতো চি-হি॥

হাসছে কারা গাধার মতো
পাঁঠার মতো পে-পে ?
সবাই দাঁড়াও ও পশুদের
বুকের উপর চে-পে ॥

এসময়ের আরো ক'জন সমাজ সচেতন জনপ্রিয় ছড়াকার হলেন-লুৎফর রহমান রিটন, আবু হাসান শাহরিয়ার, শরীফ আল মাজি, তুষার কর, তপংকর চক্রবর্তী শামসুল হক দিশারী, সিরাজুল ফরিদ প্রমুখ। লুৎফর রহমান রিটন এদেশের ছড়া আন্দোলনের এক চ্যালেঞ্জ। তার ছড়ায় বক্তব্য ও ছন্দের গাঁথুনি অতি মজবুত। এর অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অনেকের মধ্যেই ঈর্ষার কারণ হয়ে দেখা দেয়। তার একটী ছড়া—

হুজুর ছিলেন প্রভাবশালী
যখোন তখোন দিতেন গালি,
মুখ ফুটে কেউ বললে কিছু
পাইক-প্যাদা লাগতো পিছু।

শক্ত পায়ে মারতে লাথি –
ভাঙতো শেষে বুকের ছাতি,
সেই হুজুরের শুনবে খবর ?
সবাই মিলে দিলাম কবর ॥

'৭০ দশকের অন্য ছড়াকাররা যারা শিশুতোষ ও রম্যছড়ায় নিজ নিজ স্বকীয়তায় উজ্জ্বল, তারা হচ্ছেন—শাহাবুদ্দীন নাগরী, আইউব সৈয়দ, হানিফ সংকেত, রোকেয়া খাতুন রুবী, আনওয়ারুল কবীর বুলু, শাহেদা জেবু, সৈয়দ আল ফারুক, সৈয়দ নাজাত হোসেন, আমিরুল ইসলাম, হোসনে আরা হেনা, আহমদ মতিউর রহমান, হাসনাত আমজাদ, ফারুক হোসেন, মোখতার আহমেদ, নাজমুল হাসান হেলাল (দুর্ঘটনায় নিহত) প্রমুখ।

'৭০ এর শেষের দিকে এসে '৮০ দশকী ছড়ার মিছিলে কয়েক জন ছড়াকার বেশ জমিয়ে তুলেছেন। বাপী শাহরিয়ার, মাছুদ মতিউর রহমান, তুহীন রহমান, কুতুবউদ্দীন আমীর, উৎপল বড়ুয়া এদের মধ্যে অন্যতম।

এছাড়া আরো অনেকে খ্যাতিমান এবং প্রবীণ ও নবীন ছড়াকার রয়েছেন যাদের ভূমিকা বৈশিষ্টপূর্ণ।

সবশেষে এটুকু না বললেই নয় যে, বাংলা দেশের ছড়া আন্দোলন ভবিষ্যতে আরো শক্তিশালী হবে।

ছড়া আরো জনপ্রিয় হবে। এদেশের ছড়াকাররা একটি প্রশংসিত পরিবার।

এ তো বড় রঙ্গ / কৃষ্ণ ধর

(১)

এ তো বড় রঙ্গ জাদু এ তো বড় রঙ্গ
চার ভালো দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
কালো চোখে কাজল ভালো
ফর্সা গালে তিলটি ভালো
ছুটির দিনে গল্প ভালো
সবার চাইতে শুনতে ভালো তোমার মুখের অভঙ্গ

(২)

এ তো বড় রঙ্গ জাদু এ তো বড় রঙ্গ
চার সুখ দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
ব্যাঙ্কে টাকা জমলে সুখ
মিনিবাসে বসলে সুখ
সুখের কথা ভাবলে সুখ
সবার চাইতে বড় যে সুখ তোমার মধুর আসঙ্গ ॥

মৃদুল দাশগুপ্তের দুটি ছড়া

(১)

এই ছড়া পড়ে যদি
কোনো মেয়ে পস্তান
ভেবে নেন ছড়াকার
রকবাজ মস্তান,
তাহলে বলতে হয়
আমি খুব নিরীহ
ছুঁইনা কারণ-বারি
এমন কি বিড়িও।

(২)

মদ্য খান যে শক্তি
খাম্বনা মদ শক্তিকে,
এই কারণে তাকে আমি
করি খুবই ভক্তি যে।
তার কবিতার পাঠক আমি
মনোযোগে আটক আমি
এবং অনুরক্তি যে।

ছড়া : ছড়া : ছড়া

খ্যাঁট / রবীন সুর

পটলের দোর্মায়
বেশী ঝাল দিতে পারো
যদি পাও পাটনার বাটনা।

যদি দ্যাখো কালো পাঁটা
নধর শরীরখানি
দেরি নয়, ধরে এনে কাটনা।

লাউখানি কচি হলে
মুড়োটাকে পুরো নিয়ো—
ধব্‌ধবে ভাতে হবে টাকনা।

জোটে যদি গাছ পাকা লঙ্কা
একধামা মুড়ি এনে
তেল দিয়ে মাখনা।

ভোঁদর বুড়ো শিয়াল খুড়ো / বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোঁদড় বুড়ো মাছ ধরেছে
এঁদো পুকুর থেকে,
শিয়াল খুড়ো তাই দেখেছে
কাঁঠাল খেতে খেতে।
শিয়াল বলে,—ভোঁদড় ভায়া
সব দেখেছি আমি।
ভোঁদড় বলে,—শিয়াল খুড়ো
কাঁঠাল খেলে তুমি?
শিয়াল শেষে বললে ভয়ে,
এসব কথা বলে?
ভোঁদড় বলে, তাইতো বলি—
ভয় দেখালে চলে?

কাকের নামকরণ / সুদীপ নাগ

রেগে গিয়ে কাকা
বললো—শুধুই কা-কা
তোদের পাড়ার কাকগুলোতো
বেজায় রকম পাকা।
আমার পাড়ার কাক
শুনিস তাদের ডাক
ইতিহাসের বস্তা পচা—
সে সব বুলি রাখ।
বললাম কি, কাকা
কাক মানেই তো কা-কা
ডাকটা যদি কোকিল হবে
যাবে—কাক নামটি রাখা?

খাসা পাত্র / যদুপতি মল্লিক

চাকরি করি না ঘরে বসে তবু
মাইনেটা ঠিক পাই,
ঝেড়েই কাশুন দেখি মশাই
এমন পাত্র চাই?
একগাল হেসে 'এ-তো খাশা'
ঘটক মশাই কয়,
আমি বলি শেষে সরকারি রেট
মাসে পঞ্চাশ হয়!

রাজাকে নিয়ে হুলুস্থুলু / গৌরাঙ্গ ভৌমিক

রাজা তো ছিলেন ইয়া লম্বা
সত্তর ফুটের কিছু কম বা
বেশি।
দেখে তো সবাই হতভম্ব,
লোকটা ভালো না মন্দ,
দেশি?
কেউবা বলল, 'ইনি তালগাছ'।
কেউ বা বলল, 'খান তিমি মাছ।'
সত্যি?
তবে তো মানুষ ইনি মোটে না,
সাবাড় করেন কাছে পান যা,
দত্যি!
তবুও একটা রাজা—রাজা তো
দেশের জন্য চাই—চাইই তো!
বাদ্যি
বাজিয়ে জানানো হ'ল, 'রাজাকে
দেশের যোগ্য করে বানাতে
উদর ও পা দুটো তাঁর
বাদ দি।'

মিষ্টি খবর / মাণিক মুখোপাধ্যায়

মন্টু এসে বললো হেসে শোন্‌রে সন্টু শোন্‌,
ও পাড়াতে এসেছে কাল আন্নাপিসির বোন।
বয়েসটা তার কত হবে যায় নাকো আঁচ করা,
শুনছি নাকি তিন কুড়ি চার মুখে হাসি ভরা।
কচি খুকির মত নেচে হেথা-হোথা ঘোরে,
গাছে উঠে খায় পেয়ারা, যায় না নীচে পড়ে।
আয়না দেখে আড়াল থেকে ভারী মজা পাবি,
দেখতে পেলে বলবে ডেকে রস-মালাই খাবি?

সত্যজিৎকে নিয়ে ছড়া

নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়

লোকটা যেন লম্বাটে
চলল ছুটে রন্‌পাতে
চলৎ চিত্রে চাল ধরে
পথ-পাঁচালীর হাল ধরে
বিশ্বপটের রঙ্গ্‌-নাটে
লোকটা যেন কে ?
বাংলা দেশের শামলা ছেলে
ছবির রাজা যে !
রং তুলিতেই সং শুরু
সুর ও ধ্বনির ঢং গুরু
ফেলুদা আর তোপসে তে
ক্রিমিন্যাল কে কোপ দিতে
কলম খানা শান দিয়ো
ভাই পুনঃ-পুনঃ
টোপ দিতে।
লোকটা যেন কে ?
চেনা চেনা জবর চেনা
দেশ বিদেশের ডিগ্রী-বোনা
চাদর গায়ে যে !
ঐ নামেরই তথ্য
চিত্র পটের পথ্য
ঐ নামেরই সত্ত্ব
জয় করিল সত্য।
লোকটা যেন কে ?
বাংলা দেশের বুদ্ধিজয়ী
চিত্রজয়ী যে ॥

জেনে রাখা চাই / হরেন ঘটক

উট আর পাখি মিলে
হলো উটপাখি !
ইতিহাস বলে এটা
তাও জানোনা কি ?
বাজ আর পাখি মিলে
বাজপাখি হয় !!
একথাও ইতিহাসে
আছে নিশ্চয় !!
দাঁড় আর কাক মিলে
দাঁড়কাক তবে !
ইতিহাস না বলুক
সকলেই কবে !!
হাত আর ঘড়ি মিলে
হাতঘড়ি তাই !
আজ থেকে এ'কথাটা
জেনে রাখা চাই !!

ছড়া ঃ ছড়া ঃ ছড়া

শীতল চৌধুরীর দুটি ছড়া

(১)

ছিল এক বিল্লী
একদিন প্লেনে চেপে
চুপচাপ একা একা
গিয়েছিল দিল্লী।
তারপর ফিরে এসে
মস্ত সে ওস্তাদ—
জলেতেই লাফ দিয়ে
সাপ ধরে পুকুরে ;
তাই দেখে দুই পায়ে
নেচে নেচে গান ধরে
যত ছিল কুনোব্যাঙ
আর সব কুকুরে॥

(২)

পান্তাভাতে নেই নুন
খরায় খরায় মাটি খুন।
গাঁ-গঞ্জের ঘুম নেই
মেয়ে-মরদের নাচ নেই।
চারপাশে শুকনো পুকুর
পথে পথে ডাকছে কুকুর

কৃষ্ণেন্দু বসুর দুটি ছড়া

(১)

ছড়া লিখে ঘোরাই ছড়ি,
ছড়া লিখে জমিদারি।
ছড়া লিখে করছি জাঁক
ছড়া লিখে 'পন্টিয়াক্'।
ছড়া লিখে ঝরাই মৌ
ছড়া লিখে সুন্দরী বৌ।
ছড়াকারের মাথায় পাগড়ী
ছড়া লিখে খাচ্ছি রাবড়ি।

(২)

চাকরী চাকরী করে ছেলে
চাকরী গেছে তারে ফেলে
আয়রে চাকরী মুঠোয়-আয়
এ জীবন যায় বয়ে যায়!

গন্ধমাদন, জীবনযাপন / অরুণ কুমার চক্রবর্ত্তী

ধোপদুরস্ত গন্ধমাদন জমছেই শুধু জমছেই,
মানুষ নামের কলের পুতুল নাচছেই শুধু নাচছেই,
তাধিনা তাধিনা তাথৈ তাথৈ
তেইয়াম তেই, তেই তেই—।

এখানেসেখানে আথানেবাথানে গোলাপের
কুঁড়ি ঝরছেই,
মানুষ নামের কলের পুতুল নাচছেই শুধু নাচছেই,
তাধিনা তাধিনা তাথৈ তাথৈ
তেইয়াম্ তেই, তেই তেই!

শিশুদের খেলার ছড়ায় সমাজ ছবি

ডাঃ স্বপন কুমার গোস্বামী

শিশুদের খেলাধুলার সঙ্গে ছড়াকাটার এক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' ছন্দ শিশুদের দারুণ আকৃষ্ট করে। তাই মিল মেলান ছন্দে যা তারা শোনে তাই মনে রেখে অন্যত্র প্রয়োগ করে। এছাড়া ছেলেখেলা, যেমন এককা দোক্কা, হাডুডু, চু কিৎ কিৎ, বুড়িবসন্ত প্রভৃতি খেলার সময় এক পক্ষ ছড়া কেটে অপর পক্ষের দিকে ধেয়ে যায় 'মোড় করতে'। এই খেলার ছড়াগুলি কালের সঙ্গে সঙ্গে পালটে যায়। কে বা কারা এর রচয়িতা কে জানে। এইসব ছড়ার একটা আপাত উদ্দেশ্য থাকে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের ক্ষমতাকে ন্যূন করা বা হেয় চক্ষে দেখা। যেমন (১) 'নিমাই আমার গরু পাট কাঠান সরু।' কিংবা (২) হা কিৎ কিৎ পাঁচনবাড়ী / বৌ পালাল বাপের বাড়ী।' এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের নিমাইকে স্পষ্টতই অপমান সূচক বাক্য বলা হচ্ছে। এছাড়া রয়েছে 'ছোট ছোট পাটবন/মোড় করতে কতক্ষণ।'

এছাড়া এই খেলার ছড়ায় সমাজের একটা সমকালীন ছবিও ধরা পড়েছে। ছড়ায় যা সমাজ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তা-দিয়ে শিশুমনের গভীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাও দেখা যাচ্ছে। এই রকম কিছু ছড়া সংগ্রহ থেকে তুলে দিচ্ছি :

৩) 'কনট্রোলেতে দিচ্ছে আটা / দাঁড়িয়ে আছে ভেনোর ব্যাটা' (৪) 'কনট্রোলেতে দিচ্ছে চিনি / দাঁড়িয়ে আছে দিদিমণি'। ছড়াকার খেলুড়েদের বয়স মোটামুটি পাঁচ ছ বছর। কনট্রোলের দোকানে রেশন গ্রহীতার লাইনে ভেনোপামধারী চাকরের ছেলে বা দিদিমণি সকলেই সমান তুলাইনের ছড়ায় তা পরিস্ফুট। সমাজের কি কঠোর বাস্তব চিত্র!

ছড়ায় এসেছে প্রাকৃতিক দৃশ্য। (৫) চুরেচুবুটী/ব্যানাগাছের মুকুটি / ব্যানা নড়ে / ঘুঘু চরে। ডাক পাঠাতে লড়ালড়ি করে।' (৬) 'চুরে রায় / মধু কোথায় পায় / মধুর গন্ধে তোদের বাড়ী যায়'।

শিশুর ছড়ায় বাস্তব চিত্র : (৮) আলুপটলের তরকারী / শিবের মাথায় জল ঢালি /' (৯) 'তেঁতুল গাছের কটোরে / বৌ আসছে মটোরে' / (১০) 'হাকিৎ কিৎ লালা / বর্গী আমার শালা /' (১১) 'ষ্টেশনের রেলগাড়ীটা / মাইপ্যা (মেপে ?) চলে ঘড়ির কাঁটা।

খেলতে খেলতে ছড়ায় মনোবাসনা প্রকাশ করেছে শিশুর দল এই বলে :

(১২) 'দুধ খাব গেলাসে / উড়ে যাব আকাশে' | কলকাতা যাব | মাছের মুড়ো খাব', (১৩) ষ্টেশনে যাব | চা মুড়ি খাব', (১৪) 'চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি | তাতে দিলাম কুলবড়ি | কুলবড়িটা গলে গেল | সবাই মিলে এক পা তোল'। সহজ সরল মনের আশা আকাঙ্খা।

ছড়ার মাধ্যমে প্রতিপক্ষের মনোবল ভাঙ্গার জন্য অহং বোধে আঘাত (১৫) 'শিখিয়ে দেয় | শিকলি খায়' ১৬) 'খাট দেয়না খাটাশে—ছেলে হবে আটাশে'। খেলায় হেরে যাওয়া পক্ষের 'খাট' দিতে হয় বিজয়ীদের কাছে। বিজিত 'খাট দিতে' অর্থাৎ 'হার স্বীকার করতে' না চাইলে শেষতম মোক্ষম বুলিটি ছাড়া হয়। তবে পাঁচ-ছ বছরের মেয়েদের মুখে এ কথা ঠিক মানায় না—'ছেলে হবে আটাশে' অর্থাৎ আট মাসের 'প্রিম্যাচিওর বেবী'র কথা উল্লেখ করা হচ্ছে!

আরো কত বিচিত্র ছড়া শিশুদের মুখে মুখে ফিরছে। সবগুলি সংগ্রহ করলে তাদের বিচিত্র মনোজগতের সন্ধান মিলবে।

ছড়া : ছড়া : ছড়া

ছড়া / আভাসচন্দ্র মজুমদার

লেখাপড়া লেখাপড়া
ঝালাপালা ভাইরে।
এটা ছাড়া জীবনে কি
কোন কথা নাইরে ?
ইংরাজী, বাংলা
অঙ্কের বইটা
পড়ার সাগরটাতে
পাইনা যে থইটা॥
দিনে পড়া, রাতে পড়া
দুপুরেতে ইস্কুল;
পড়ে পড়ে বিগড়াল
মগজটা বিলকুল।

ছড়া / সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

মাতৃভাসা মাতৃদুগ্ধ
ব'লেই হলেন মন্ত্রী মুগ্ধ
রামমোহনের মূর্তি গ'ড়ে
ইংরাজীতে খতীন বলে
জ্যোতি-পাণ্ডেও সেপথ চলে
রাষ্ট্রপতির মুখটি শুদ্ধ
হিন্দিতে ঠিক উঠল নড়ে—
যাব যে আজ কে কার দলে
তাই নিয়ে তাই জুড়ছি যুদ্ধ।

তুষারকান্তি ব্রহ্মচারীর দু'টি ছড়া

(১)

ব্যস্ত কেন মস্ত পদে ?
সব তো তোমার হাতে।
সরকারের সব জিনিষগুলো—
তোমার ঘরে জমিয়ে তোল,
তুমি রাজা—
দোষ নেই তোমাতে।

(২)

ক্যান্সার
এক অদ্ভুত ড্যান্সার,
নাচিয়ে নাচিয়ে শেষে
হাতে তুলে দেয়
জিরো অ্যান্সার।

প্রসঙ্গ : গোধুলি-মন

মাননীয় সম্পাদক,

আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও লিটিল ম্যাগাজিনে প্রুফের ভুল থেকেই যায়। কিন্তু গত সংখ্যায় (আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৯০) নিভা দের উপন্যাসের ওপর আমার আলোচনায় বেশ কিছু প্রুফের ভুল চোখে পড়ল। তাই ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে এই চিঠি। প্রকাশ করলে বাধিত হব।—**গৌর বৈরাগী**

টাটকা ছড়া / ফারুক নওয়াজ

লাটিম্ লাটাই ঘুড্ডি কাট্
উদোর ঘাড়ে বুদোর চাট্
নড়বে হাকিম।হুকুম্ না ;
লুটে পুটে দেশটা খা।

ঝিনিক্ ঝিনিক্ ঝিনিক্ ঝুন্
জ্বলছে মাথায় আগুন-খুন
তেঁতুল খেতে ভীষণ—টক্!
রাখ্না তোদের বকর্—বক্॥

উকুন্-টুকুন্-ফুরুৎ ফুড়্
পিঁপড়ে খেলো লাভের গুড়্।
কারনটা কি—খুলেই বল ?
বাদ্দে ওসব ; ঘুমাই চল্।

দুধের বাটি চুকুম্ চুক্
ভার হয়েছে খুকুর মুখ্ ;
পুতুল খেলায় বাঁধ্লো গোল্
গড়িয়ে পড়ে মাছের ঝোল্

তেলের শিশি, ঘটির জল্
কি হচ্ছে ? নতুন দল্ ?
এবার ঠ্যালা কেমন বোঝ্—
কুকুর মেরে বিয়ের ভোজ্।

তিড়িং বিড়িং মার্ছি লাফ্
কে আমাদের জাতির বাপ্ ?
আঁধার রাতে ফুটুশ্ ফুট্,
আয়না সবাই চিবাই বুট্!

হাঁড়ির ভেতর ডাকছে ব্যাঙ্
নিম্নে মাথা উর্দ্ধে ঠ্যাঙ্ ;
ব্যাপার স্যাপার ওয়াণ্ডার—
ভীষণ ভীড়ে পকেট্মার্।

ইটিং মিটিং চিটিং চট্
স্যাটিজ্ কারেক্ট ইটিজ্ নট্
ইটিজ্ ভেরী ফাউল কজ্—
বিড়াল নাকি করবে হজ্।

উলুক্ ঝুলুক্ হাটিম্ টিম্—
ছাই-ভস্ম-ঘোড়ার ডিম্।
ঘোড়ার ডিমে গাধার ছা,
লুটে পুটে দেশটা খা॥

ছড়ার কদর / প্রীতিভূষণ চাকী

হন্যে হয়ে বেড়াই ছুটে
একটি ছড়ার জন্যে,
ফিকফিকিয়ে হাসেন কেন
বংশী বাবুর কন্যে ?

ছড়ার কদর কেউ বোঝেনা
চলছে যে ঘোর কলি,
ইচ্ছে করে এই কথাটি
চেঁচিয়ে আমি বলি !

মাসীর বায়না/গৌরাঙ্গদেব চক্রবর্ত্তী

কাশী থেকে মাসী এসে ধরলেন বায়না
নিয়ে এস তাড়াতাড়ি ক্রগরোষ্ট চায়না
কতদিন খাইনাতো চাক্‌দার বাগদা
বিল থেকে সিল খুলে এনো যেন পাবদা।
দ্বারিকের দই চাই মিরিকের পানীয়
ঝাল করে রেঁধ যেন মহাশোল স্থানীয়।
জুত ক'রে খেতে হবে ডাল দিয়ে ডাল্‌না
খুঁজে পেতে এন চাল বালাম কি কালনা।
চালতার চাটনিটা হয় যেন পাতলা
তাতে যদি মুড়ো দাও দিও তবে কাতলা।
এই ভাবে ড্যাবা ড্যাবা চাস কেন খোকারে
হেসে হেসে মাসী বলে তুই ভারী বোকারে,
মেসো তোর ফেসোধর গায়ে পড়ে এসেছে
একেবারে যাঁতাকলে হিটলার ফেঁসেছে।
শুনে টুনে এইসব মাসীমার বায়না
কোঁচা খুলে বাবা বলে পালাব কি রায়না।

টাকা মাটি, মাটি টাকা

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

লাখপতি ছাতুলাল শুয়ে-শুয়ে খাটিয়ায়।
বলে, মাটি মানে টাকা, টাকা মানে মাটি হ্যায়
শুনে তার ভৃত্য
জুড়ে দিলো নৃত্য
বলে, বাবু আপনার কথা খুব খাঁটী হ্যায় !!!

পরদিন ঘুম থেকে উঠে বেলা দশটায়!
ছাতুলাল মাথা খুঁড়ে কাঁদে আর পস্তায় !!
আলমারি ফাঁকা তার
হাওয়া সব টাকা তার
বদলেতে মাটি কিছু রাখা আছে বস্তায় !!!

দুটী লিমেরিক / দ্বিজেন আচার্য

(১)

ছুট্ করে খুলে গেল সদরের দরোজা
ওরে বাবা—এ-কী এলো। —ভয়ে কাঁপে বড়-জা
ছোট বৌ-র চিৎকারে
সেজো এসে ধরে তারে
তিন বউ মিলে শেষে শুরু করে তরজা।

(২)

দয়ানিধি নাম তার, ডাক্তার হাতুড়ে
দেশ তার শিলচর, ভারি ঘুম কাতুরে
ঢিল দিয়ে শিল পাড়ে
ধমকালে মাথা নাড়ে
রুগী এলে চেপে ধরে ছায় কাতু-কুতুরে।

নেই-এর ছড়া / গৌর বৈরাগী

রাজা বলে কেউ নেই
আছে একজন সে
বাঘ আর আসেনাকো
সুন্দর বন সে।

বুড়ি বলে কেউ নেই
থুখুরি চানদে
এটেনবরোতে নেই
বুড়ো সেই গানধে।

কথায় সত্যি যদি
পাও এক টুকরো
কাঠেতে কাঠ নেই
বলে কাঠঠুকরো।

এভাবে নেই নেই
বার বার চিল্লে
কি হবে ফায়দা বলো
তার চে' হিল্লে
হয়ে যাবে, যদি খাও
আহামুখ বিল্লে
আস্ত সে একখানা
টপ করে গিল্লে।

পুতুলের বায়না / জয়ন্তী বৈরাগী

পুতুল সোনা আর কেঁদোনা
চুপ কর তাড়াতাড়ি,
দেব তোমায় কিনে একটা
ছোট্ট খেলার গাড়ী।

আর কি তোমার ইচ্ছে আছে
বলনা আমায় খুলে,
দেব নাকি? বেড়াল একটা
সাদা আর তুলতুলে?

ছড়া : ছড়া : ছড়া

ছড়া নিয়ে ছত্রাকার / শ্রীঅমিয় কুমার মুখোপাধ্যায়

ছড়া লেখার কায়দাটা কি
জানতে বড় সাধ জাগে।
ঠাণ্ডা মাথায় কেউ কি লিখি
কিংবা লেখে বদরাগে ?
নিঝুম রাতে লিখলে ছড়া
আসল সেটাই ; নেই ফাঁকি।
ভরদুপুরে লিখছে যারা
তারাই নাকি খুব লাকি।
বেরোয় না কো ছড়ার গাদা
পেনসিল পেন কিংবা ডটে
ছড়া লেখার হ্যাপা কতো
লিখলে ছড়া বুঝতে বটে !
মোটা কাগজ পাতলা কাগজ
সব কাগজে হয়না লেখা
অবাক কাণ্ড কলেজেতেও
ওসব নাকি যায় না শেখা।
ভ্রমর চাঁদ আর কোকিল দেখে
কোবতে বেরোয় ঝুড়ি ঝুড়ি
কাব্য পাহাড় মিলবে অঢেল
অভাব ছড়ার ছোট্ট নুড়ি।
গিন্নীর সাথে ঝগড়া হলে
পাগল রোগটি পড়লে ধরা।
অম্বল হলে ডায়াবিটিসে
ব্লাডপ্রেসারে বেরোয় ছড়া
দেদো খুড়োও চুলকে দাদ
ছড়া লেখার কায়দা বলে,
এবার যারা লিখছে ছড়া
ভাবতে বসো, কোন দলে ?

শৈল দেবীর গল্প / রীণা চট্টোপাধ্যায়

শিব রাত্রে শিবের মাথায়
ঢালতে গিয়ে জল
শিবপুরের সেই শৈলদেবী
পেলেন হাতেই ফল ;
ফলের সাজি ডান হাতেতে
বাঁ হাতে বেলপাতা,
বাজার ভরা রাস্তা দিয়ে
যাচ্ছেন কোলকাতা।
রাস্তা পাশে শিবের বাহন
কোথায় ছিল বসে
ফলের সাজি নিয়ে হঠাৎ
দৌড়ে পালান কসে।
কাদায় পড়ে শৈলদেবী
গড় গড়ি খান
ভাগ্য ভাল এই বয়সে
হাড় হয়নি খান খান।

দীপালী দে সরকারের দুটী ছড়া

(১)

কাজ কোরোনা ছিঃ।
লোকে বলবে কি ?
ফাঁকি দিনরাত মারো
বাঁ-হাতে পকেট ভরো

(২)

খোকা গেছে চাকরী করতে
কলকাতা নগরে,
ঘড়ি নিলে ছিনতাইকারী
টাকা পকেট মারে।

আধভজন ছড়া / সরল দে

কোন্ দিকে যে মন দিই আর
কোন্ দিকে যে কান দি।
নুন আনতে পান্তা ফুরোয়
নেই পকেটে চান্দি।
হয়নি দেখা দিগ্‌বিজয়ী
এ্যাটেনবরোর গান্ধী।
গান্ধীবাবা, ভারত ভেঙ্গে
আমরা আজো কান্দি॥

●

ছিলেন তিনি ছিলেন—
আধখানা তাঁর হিরো আবার
আধখানা তাঁর ভিলেন।
কালোটাকায় ভর্তি ছিল
দালান কোঠা খিলেন॥

●

পাঁচতারকার হোটেল থেকে
এক তারকা খসলে—
রাত-বিরেতের তারা গুনলেন
বসন্তরাও ভোঁসলে॥

হাত দেখব পয়সা দিলে—
আচ্ছা দেখি বাঁ হাত তোর।
দাদুর মতন বুড়ো হবি
বয়স হলে বাহাত্তর।

●

বড়াসাহেব ট্যাস্‌কি চড়েন—
ছোটাসাহেব রিস্‌কো।
টেম্পু চড়ে ভেম্পু দিয়ে
ছোকরা নাচে ডিস্‌কো।

গেরামবাসী টেরাম চড়ে
সঙ্গে নিয়ে বাস্কই।
লাইন দিয়ে ভাবছি আমি
ডালহৌসির বাস কই?

●

তলে তলে তা দেয় নাকি
হিংসেপাখির ডিমে সে,
এমন বোমা বানায় যাতে
মানুষ মরে নিমেষে।
হায় হায় হায় হায় রে তবু
পা টলে তার দাঁড়ালে—
মাটি কাঁপছে পায়ের তলায়
মেঘ জমেছে আড়ালে॥

ছড়া : ছড়া : ছড়া

নামমাত্র / রেবতীভূষণ ঘোষ

চন্দননগর নামেই শুধু
নগরে কৈ চন্দন।
চন্দনবন ধারে কাছে
তারওতো নাম গন্ধনা।
পান্টালুন আর সার্ট
দেখায় খুবই স্মার্ট
আধুনিকের সঙ্গে কোথা
ফরাস ডাঙার ধুতি
মানেন তো সম্পাদক ভায়া
সেটাও একটা খুঁতই।
বাগবাজারের দৈ
তাইবা এল কৈ
বারাসতের মিষ্টি কিছু
আনলে হতো মন্দনা।
(পুরানো 'গোধূলী'র পাতা থেকে)

মাঝ রাতে জয় / দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

দ-ড়া-ম্-দ-ড়া-ম্ দু-ম্ শব্দ
জ্বর বলে পালাবার পথ দে।
মাঝরাতে নেচে উঠে ডিসকো,
ডাক্তারও ছেড়ে দেন ফিজকো।
ভারতের জয় ব'লে কথা তো,
বস্তি কি থাকে আর সতাতো ?

ছড়া / দেবব্রত ঘোষ

এই ছেলেটা, নাম কি রে তোর,
একটুখানি দাঁড়া,
কাছেই থাকিস্ কোথায় যেন,
তবে কিসের তাড়া।
হাতে বোধ হয় দই-এর হাঁড়ি,
ওইটুকু তুই ছেলে
কেমন করে বইবি ওটা
হয়ত দিবি ফেলে।
তার চেয়ে দে আমার হাতে,
ইস্ এটা যে পাথর,
খানিক খেয়ে হালকা করি,
কষ্ট হবেনা তোর।
মনটা আমার বড় কাঁদে
এসব দেখে শুনে,
আরে থু থু, কী এনেছিস !
গাল পুড়ে যায় চুনে।

পাকামী / শিখা নন্দী

আম পাকে কাঁঠাল পাকে
পাকে কর্ত্তার দাড়ি,
জামাইষষ্ঠী কাছে এলে
ভাবনা বাড়ে তারই।
এটা আনো সেটা আনো
বলেই গিন্নী খালাস,
কোনো কিছুর কমতি হ'লে
হন যে ফিউরিয়াস।

ছড়া / কল্যাণ মিত্র

নেতারা সব ঠিক করেছে
শিখবে এবার নৃত্ত্যো,
নাচের তালে মন ভুলিয়ে
জিততেই হবে ঠিকতো ।

বাজার টাজার বেজায় কড়া
বুকনি দিলে চলবে না,
ধিনৃতা বোলে মুদ্রা-তালে
কথায় ভবী ভুলবে না । ।

জবর খবর টপ সিক্রেট
ইলেক্‌শনের চিন্‌তা,
ভোটে এবার চলবে শুধু
তা-ধিন তা-ধিন ধিনৃতা ।

তিনি / বিমলেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মাইক পেলে হাতের কাছে এখন তিনি ছাড়েন না
দুঃখ নিয়ে গল্প করেন দুঃখ কিন্তু কাড়েন না
চায়ের স্টলে বসেন তিনি রাজা উজির মারেন না
হাঁসের মতোই থাকেন বসে ডিমটি কিন্তু পাড়েন না
বক্তৃতা দেন জমজমাটি কারো ধারই ধারেন না
শিং থাকলেও পেটের ভেতর এখন তিনি নাড়েনা
রসগল্প যতই জানেন ঠিক ততটা ছাড়েন না
ভোটের সময় দাঁড়ান তিনি শুনছি এখন হারেন না ।

প্রজাপতি / শ্যামলকান্তি মজুমদার

একঝাঁক রোদ্দুর
ফড়িঙের পাখনায়
হাসিখুশী প্রজাপতি
উড়ে বসে আয়নায় ।

বসে বসে ভাবে খুব
এ-কীরূপ ! এ-কী রূপ !
তার মত সুন্দর
কেউ নয় কেউ নয় ।

দু'টি লিমেরিক / মৃণাল দাশ

(১)

নেঙটি ইঁদুর কাটছে বই,
পড়ার আমার সময় কই ?
গিলছি পেটে
তাই তো খেটে
এবার যেন প্রথম হই' ॥

(২)

ছন্নছাড়া মিলের ছড়া
মন বসেনা করতে পড়া ।
মনটা থাকে
বেড়ার ফাঁকে ।
দিদিমণি হোক না কড়া !

সমৎ মান্নার দুটি লিমেরিক

(১)

পল-এর টাকা ঠাণ্ডা হ'তেই ডাণ্ডা দেখায় শ্বশুরকে
চোখ ঠিকরে দেখুন চেয়ে করছে এমন কসুর কে
বউ পুড়িয়ে বানায় লাশ
বাধ্য করুন থানায় বাস
জুতিয়ে সবাই লম্বা করুন সেই অমানুষ অসুরকে

(২)

দৈ মারছে নেপোর দলে ঘাই মারছে বোয়ালে
গৌরী সেনের টাকা উড়ছে হরি ঘোষের গোয়ালে
দেশের যত হোমড়া চোমড়া
গান গাইছো যাদের তোমরা
তারা মারছে হম্বি-তম্বি ময়দানে আর ওয়ালে।

কেমন যেন / অমল দাস

আমাদের পাড়ায় এক
থাকে সে উকিল
দিনরাত ঘরে বসে
হাসে খিল খিল।

তিনখানা বাড়ি ছেড়ে
থাকে ডাকতার
রুগী এলে চটপট
দেখে নাক তার।

পুকুর পাড়েতে থাকে
রহমৎ জেলে
জল দেখে লাফ দেয়
গামছাটা ফেলে।

সব শেষে তেমাথায়
থাকে যে ছুতোর
বাড়ি বাড়ি খোঁজ নেয়
নতুন জুতোর।

এই সব লোক নিয়ে
আমাদের পাড়া
রাতভোর জেগে জেগে
দিনে দিশেহারা।

ড়া ঃ ড়া ছ

ঋতুর মেলা / গোপাল চক্রবর্তী

গ্রীষ্ম গেল-বর্ষা এ'ল
শরৎ উঁকি মারে
হেমন্ত'র ঐ হিমেল হাওয়া
ভুলতে কি ভাই পারে ?

শীতের পোষাক চাইযে এবার
পিঠে পুলির দিন;
মিঠু কেমন নাচচে দেখ
তা ধিনা ধিন্ ধিন্ ।

ঋতুর রানী বসন্তে ভাই
হোলি খেলার দিন,
দাদুর গালে আবীর দেব
নাগ ডিঙা ডিং ডিং ।

এমনি করে বারো মাসে
ছ'টা ঋতুর খেলা,
এদের নিয়ে ব্যস্ত সবাই
রং বে রং এ'র মেলা ।

তিলোত্তমার ছড়া/বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়

ধান ভানতে বসে পিসি
শিবসংগীত গেয়েছে :
লোডশেডিং-এ তিলোত্তমা
গোলডো ম্যাডেল পেয়েছে ।

তিলোত্তমা সই-লো
কাণ্ডটা কী হইলো
তুই চড়বি চক্ররেলে
বাঁকুড়ো খরায় রইলো ।

হাওড়া ব্রিজের ফোঁকর দিয়ে
কিশোর পড়ে গঙ্গায়
পুলিশ তখন খৈনি ঠোঁটে
জোর ডিস্কো সঙ গায় ।

তিলেতিলে তিলোত্তমা
তালেতালে নাচিস—
নাচতে নাচতে তিলোত্তমা
হাঁচতে হাঁচতে বাঁচিস !!

হাত বাড়ালেই / ভাস্কর দাশগুপ্ত

হাত বাড়ালেই বন্ধু এবং পা বাড়ালেই আশ্রয়
মন্দ কি আর ?   এমনি করে হোক্না কিছু সাশ্রয়
ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবে কোন সে জনা অন্ধ
'অহং' এবং 'অস্থি' নিয়ে বাঁধুক না হয় দ্বন্দ্ব ।
বেশ তো আছি নির্ভাবনায়, কাজ কি মিছে ঝঞ্ঝাট
সাবেকী ঠাট রাখতে বজায় লোপাট কত রাজপাট
রাজা গেলেন মন্ত্রী গেলেন আমরাতো ভাই কোন্ ছার
পাঞ্জাবীতে তাপ্পি বাড়ে ঠেলতে গিয়ে সংসার ।
শেয়ার বাজার উর্দ্ধগামী অশ্বেরা সব দুর্মুখ
রেঁস্তোরাতে রেস্ত লাগে মাগনা মেলে কোন সুখ ?
নব্যযুগের ভব্য প্রাণী বাইরে কতই শিষ্ঠ
সময় কাটান ক্রয়েড পড়ে জপেন মনে ইষ্ট
লক্ষ্যবিহীন চলছি ভেসে পেরিয়ে গিরিকন্দর
স্বপ্নে কাঁপে আলোর মালা নাম-না-জানা বন্দর
ভয়-ভাবনা-ভালোবাসায় জলাঞ্জলি শূন্যে
প্রাণটা তবু থাকুক বেঁচে সাতপুরুষের পুণ্যে ॥

স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার

যে অগণিত শহীদ ও দেশবাসীর অবিরাম সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও আত্মাহুতির ফলে আমাদের দেশ বহু আকাঙ্ক্ষিত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন করেছে, স্বাধীনতার ৩৬তম বার্ষিকীতে আজ আমরা তাঁদের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। কিন্তু দেশকে শোষণ বঞ্চনা আর কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাত থেকে মুক্ত করে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর জীবনে স্বাধীনতার সুফল পৌঁছে দেওয়ার জন্য নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্য আজও অপূর্ণ। আজও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভেদকামী শক্তি ধর্ম, জাতপাত আর গোষ্ঠীগত নানা সংকীর্ণ দাবী তুলে জাতীয় সংহতি ধ্বংস করতে সচেষ্ট।

বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জনগণের জীবন ও জীবিকার সংগ্রামের শরিক হয়েছে। জাতীয় সংহতির আদর্শ রূপায়ণে দৃঢ়তার ফলেই পশ্চিমবঙ্গ আজ আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিবিদ্বেষ মুক্ত।

আমরা বিশ্বাস করি জনগণের নিরবিচ্ছিন্ন সতর্কতা ও ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসই জাতীয় সংহতি, ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষায় সক্ষম।

এই শুভদিনে আমরা জনগণের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থার কথা আর একবার ঘোষণা করছি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সুস্বাস্থ্যই মানুষের প্রথম প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে পরিকল্পনা রূপায়ণকালে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

- ২০০০ সালের মধ্যে "সকলের জন্য স্বাস্থ্য" বাস্তবায়িত করতে এক পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে।
- এর আগেই সারা দেশে প্রায় দেড় লক্ষ স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া ৫৫ হাজারের উপর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং উপকেন্দ্র খোলা হয়েছে।
- শিশু ও প্রসূতি মহিলারা সহজে রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। সেই কারণে শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এক সুসমন্বিত কার্যসূচী শুরু করা হয়েছে। এর সুফল লক্ষ্যগোচর হতে শুরু করেছে।
- বস্তির অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নানান রোগের উৎপত্তি হয়। এধরনের বস্তি এলাকায় বসবাসকারী তিন কোটির মত লোক ১৯৯০ সালের মধ্যে ২০ দফা কার্যসূচীর মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতে সক্ষম হবেন

সুস্থ নাগরিকই সুস্থ সমাজের বনিয়াদ

এবিষয়ে বিশদ জানতে হলে নীচের কুপনটি ব্যবহার করুন ঃ—

অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিসট্রিবিউশন অফিসার
ডি. এ. ভি. পি.
৩৯ রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০০৭৩

নতুন বিশদফা কার্যসূচী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই। অনুগ্রহ করে আমাকে ইংরাজী, বাংলা পুস্তিকা পাঠান।

নাম ....
ঠিকানা ....
.... পিন ....

নতুন ২০ বিশদফা কার্যসূচী

davp 83/55

MEMBER, All India Small & Medium News Paper Association, Delhi.
GODHULIMONE N. P. Regd. No. RN. 27214/75 August '83
Vol. 25, No. 8 Postal Regd. No. Hys-14 Price—Rupees Two only

অনন্য সাজে সেজে প্রতি বছরের মতো এবারেও মহালয়ায় প্রকাশিত হচ্ছে

শারদীয়া গোধূলি-মন—১৩৯০

- সম্প্রতি ইংল্যাণ্ড ও স্পেন ঘুরে এলেন ক্যাপ্টেন (ডাঃ) সমীর কুমার দত্ত। তাঁর সেই অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাবেন গোধূলি-মনের পাঠকদের •
- কথা সাহিত্যিক বরেণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন এক অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণ মূলক রচনা
- শিল্পী সুবোধ দাশগুপ্ত তাঁর নিজের লেখা ছড়ায় নিজেই ছবি আঁকছেন গোধূলি-মনের পাঠকদের জন্য এবং অমল চক্রবর্তী আঁকছেন ব্যঙ্গ ছবি
- খুব অল্প বয়সেই সাংবাদিকতার আসরে নেমে নাম কিনেছেন সমীরণ মুখোপাধ্যায়। তাঁর ফিচার ধর্মী একটি লেখা পাবেন শারদীয়া গোধূলি-মন এর পাতায়

দু'টি প্রবন্ধ লিখেছেন : ডঃ জীবেন্দু রায় ও আজহার রায়

অনুবাদ সাহিত্য : সিসিল ডেলুইস-এর পরিচিতি সহ দু'টি কবিতার তর্জমা—উশীনর চট্টোপাধ্যায়

৪টি ছোট গল্প : জগৎ সাহা, গৌর বৈরাগী, অরুণ সরকার ও নব বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা লিখেছেন : নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, গোপাল ভৌমিক, মঞ্জুভাষ মিত্র, হরপ্রসাদ মিত্র, নচিকেতা ভরদ্বাজ, সমীর মণ্ডল, রবীন সুর, শীতল চৌ কৃষ্ণা বসু, অরুণ কুমার চক্রবর্তী, অমৃত তনয় গুপ্ত, অমল দাস, গোপাল চক্রবর্তী, রীণা চট্টোপাধ্যায়, সনৎ মান্না, অজিত বাইরী, মতি মুখোপাধ্যায়, ফারুক নওয়াজ, আবুবকর সিদ্দিক, মহশীন মুর্শেদ, আবুল হাসনাত মনিরুজ্জমান, ডাঃ জ্যোতির্ময় বসু, প্রবাল কুমা ভাস্কর দাশগুপ্ত, সোফিওর রহমান, কৃষ্ণসাধন নন্দী, কৃষ্ণেন্দু বসু, গৌরাঙ্গদেব চক্রবর্তী, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, দ্বিজেন আচার্য, কাজল সরকার, রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী, সমর দাস প্রীতিভূষণ চাকী, সরল দে, বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায় ও অশোক চট্টোপাধ্যায়।

সাক্ষাৎকার : নিমাই ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে কিছুক্ষণ—শাহাদত আলী আনসারী

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

দামী কাগজ ॥ ঝকঝকে ছাপা ॥ সুদৃশ্য রঙিন প্রচ্ছদ।

দাম : চার টাকা মাত্র

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সন্ধ্যা প্রিন্টার্স বড়বাজার, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও নতুনপাড়া, [illegible] হইতে প্রকাশিত।

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধুলি মন

২৫ বর্ষ / ৯ম সংখ্যা / ভাদ্র-আশ্বিন / ১৩৯০

সম্পাদকীয়

শাদা শাদা কাশের ঝাড় মাথা দোলাচ্ছে হাওয়ায়। আমাদের এই মফস্বল সহরের একটু বাইরে চোখ রাখলেই এ দৃশ্য চোখে পড়ছে। অর্থাৎ কিনা শরৎ এসে পড়ল—আর শরৎ মানেই মনের ঢাকে বেজে যায় পূজোর বাজনা। পূজোর সঙ্গে পূজাসংখ্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে বাঙালীর জীবনে।

বিগত কয়েক বছর ধরে ক্রম বর্ধমান নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম এবং ব্যাপকহারে বিদ্যুৎ ঘাটতি সকলের মতো লিটিল ম্যাগাজিনের পরিচালক বর্গকেও এক অনিকেত ও দোলাচল মানসিকতার মধ্যে এনে ফেলেছে। আমাদের এবারের পূজা সংখ্যা নিয়ে মাস ছয়েক আগে থেকে সুন্দরতম পরিকল্পনা নিয়েছিলাম আমরা। সেই চিরকালীন সাধ ও সাধ্যের মধ্যে ফারাক থেকেই গেল। অনেকের নাম বিজ্ঞাপিত হওয়া সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে কোন মতেই সব লেখা ছাপার সুযোগ পাওয়া গেলনা! আমাদের অসহায়তা আশা রাখি তাঁদের মার্জনা পাবে।

আপনার পূজোর দিনগুলো আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠুক এই আন্তরিক কামনা রইল।

● সম্পাদকীয় কার্যালয়: নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর ॥ হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥ ভারত

● কলিকাতা কেন্দ্র: ৬৩/৬ জি নাজির লেন, কলিকাতা-৭০০০২৩

সূচীপত্র

কবিতা ঃ

ছড়া ও লিমেরিক

প্রসঙ্গ গোধূলি মন ঃ

- **প্রচ্ছদ ঃ সুবোধ দাশগুপ্ত**
- **সম্পাদক ঃ অশোক চট্টোপাধ্যায়**

মহিষাসুর মর্দিনী

ডঃ হংসনারায়ন ভট্টাচার্য

সমগ্র বঙ্গদেশে শরৎকালে যে উৎসবের আনন্দ চারদিন অথবা মাসাধিক কাল যাবৎ বাঙ্গালীর জীবনে উদ্দীপনা সঞ্চার করে প্রাণের হিল্লোল বহিয়ে দেয় তা একটি মাত্র দেবতার পূজার্চনাকে কেন্দ্র করে—এই দেবতা মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা। শারদোৎসবের আনন্দে—বাঙ্গালীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের আনন্দ বেদনা মিশে গেছে দশভূজা মহিষাসুরহন্ত্রীর পূজাকে কেন্দ্র করে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডীর উপাখ্যানে এই দেবীর যে রূপগুণের বর্ণনা আছে তা থেকেই মহিষাসুরমর্দিনী দেবীর পূজা প্রচলিত হয়েছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের কাহিনী অনুসারে মহিষাসুর দেবতাদের পরাজিত ও স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করে স্বর্গের অধীশ্বর হয়েছিল। দেবগণ পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণুর কাছে মহিষাসুরের অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত করলে ক্রুদ্ধ দেবতাদের মুখ থেকে তেজ নির্গত হতে থাকে। সেই তেজ একত্রিত হয়ে এক অপূর্ব নারীমূর্তি পরিগ্রহ করে।

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেব শরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা ॥ (চণ্ডী-২।১৪)

দেবগণ নিজ নিজ অস্ত্র ও অলংকার দিয়ে দেবীকে সাজিয়ে দিলেন। হিমালয় দিয়েছিলেন দেবীর বাহন সিংহ। দেবী বিপুল পরাক্রমে মহিষাসুরের সৈন্য ধ্বংস করতে থাকায় মহিষাসুর স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মহিষাসুর কখনও পুরুষ, কখনও মহিষ, কখনও মহাগজ রূপ ধারণ করে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকে। পুনরায় যখন সে মহিষরূপ ধারণ করেছিল, দেবী তখন তার পৃষ্ঠে আরোহন করেছিলেন। পুনরায় সে যখন মনুষ্যরূপ ধারণ করছিল সেই সময় অর্ধনিষ্ক্রান্ত অবস্থায় দেবীর বীর্যে স্তম্ভিত হলে শূলাঘাতে দেবী তাকে বধ করেন।

মহিষরূপ থেকে অর্ধনিষ্ক্রান্ত মহিষাসুরের স্কন্ধে এক পদ স্থাপন করে অপর পদ সিংহপৃষ্ঠে স্থাপন করে নাগপাশে বদ্ধ মহিষাসুরের এক হাতে কেশাকর্ষণ করে অপর হস্তে শূলাঘাতে তার বক্ষ বিদীর্ণ করছেন দশভূজা দেবী। এই মূর্তি মহিষাসুর মর্দিনী। কালিকাপুরানে (৫৯অঃ) দেবীর যে ধ্যান আছে, সেই ধ্যান মন্ত্রেই দেবীর পূজা হয় এবং দেবীর মূর্তিও এই ধ্যানমন্ত্র অনুসারেই নির্মান করা হয়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী চণ্ডী দেবতাদের তেজের দ্বারা গঠিত। ইনিই আদ্যা শক্তি মহাশক্তি, সৃষ্টি—স্থিতি-লয় কর্ত্রী :-

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোহস্য জগন্ময়ে ॥
(চণ্ডী-১।৭০-৭১)

—হে জগন্ময়ি, জগতের সৃষ্টিকালে তুমি সৃষ্টিরূপা, পালন কালে স্থিতি রূপা সংহার কালে সংহৃতিরূপা।

সৃষ্টি পালন ও ধ্বংসকর্তা ঋগবেদে স্থাবর জঙ্গমের প্রাণস্বরূপ সূর্য। সূর্যের বিভিন্ন গুণকর্ম নিয়ে কল্পিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর এবং অন্যান্য দেবতা। যিনি আকাশে সূর্যরূপে বিভাসিত মর্তে তিনিই অগ্নি। সূর্যাগ্নির সর্বব্যাপী যে তেজ তাই-ত বিশ্বের প্রাণশক্তি। সূর্যের তেজোরূপা মহাশক্তিই দেবতেজোময়ী মহামায় চণ্ডী।

তেজোময়ী জগদ্ধাত্রী মহিষাসুর ঘাতিনী (কালিকা পুরান-৫৯৬)। এই তেজোময়ী দেবীই মহিষাসুরকে ধ্বংস করে জগতের অমঙ্গল নাশ করেন।

দেবী ভাগবতে দেবতেজোনির্মিতা মহাশক্তির নাম মহালক্ষী; বামন পুরানে দেবীর নাম কাত্যায়নী। মহাশক্তি ছাড়া বিশ্বের অশুভ শক্তিনাশ সম্ভব নয়। তাই মহাশক্তির আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়েছে।

মহাশক্তি চণ্ডী কাত্যায়নী দুর্গা যেমন কোন শরীরী জীব নন, মহিষাসুরও কোন শরীরী জীব নয়। মহিষাসুর কোন ব্যক্তি বিশেষের নামও নয়। ঋগ্বেদে মহিস শব্দটি (৮।১২।৮) বিরাট—বিশালাকৃতি —মহাশক্তি-শালী অর্থে ব্যবহৃত। মহিষাসুর অর্থে বিশালাকৃতিবিশিষ্ট বা প্রভুত বলশালী অসুর। অসুর শব্দ ঋগ্বেদে দেবতা অর্থে ব্যবহৃত হলেও ক্রমে দেব বিরোধী অশুভ শক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মহিষাসুরকে যে চণ্ডী একা বধ করেছেন তা নয় মহাভারতে অগ্নিপুত্র দেবসেনাপতি মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন; মহিষাসুরের ছিন্নমুণ্ড ষোড়শ শত যোজন পথ রুদ্ধ করেছিল। সুতরাং বিশাল অর্থেই মহিস শব্দটিকে গ্রহনীয়। স্কন্দপুরানে (আবন্ত্য খণ্ড) মহিষাসুর বধ করেছেন শিবগন বা শিবের অনুচর বর্গ। এখানে মহিষবেশী দৈত্যের নাম দেবকন্টক বা অমর কন্টক। সুতরাং মহিষাসুর ব্যক্তির নাম হতে পারে না।

বৈদিক আর্যদের প্রধান দেবতা ছিলেন ইন্দ্র। ইন্দ্র বৃত্র, নমুচি শুষ্ণ, বল প্রভৃতি অনেক দানব বধ করলেও তাঁর মহত্তম কর্ম বৃত্রবধ। বলা বহুল্য ইন্দ্রও যেমন শরীর ধারী প্রাণী নন, বৃত্রও তেমনি শরীরী জীব নয়। ইন্দ্র ঝড় বৃষ্টির দেবতা। বৃত্র বৃষ্টি রোধ করে থাকতো। ইন্দ্র বজ্রের সাহায্যে বৃত্র বধ করে বৃষ্টি আনয়ন করতেন। সূর্যের যে শক্তি পৃথিবীতে বৃষ্টি নিয়ে আসে সেই শক্তিই ইন্দ্র। বৃত্র শব্দের অর্থ আবরনকারী। যে অশুভ শক্তি বৃষ্টির বাধা সৃষ্টি করে তাই বৃত্র। যাস্ক এবং অনেক দেশী বিদেশী পণ্ডিত বৃত্র বলতে মেঘকে বুঝেছেন। বৃত্রের অপর নাম অহি। সাপের মত কুণ্ডলীকৃত যে মেঘ আকাশ অবরুদ্ধ করে অথচ বৃষ্টি দেয় না সেই মেঘই বৃত্র। ঋকবেদে সরস্বতীও বৃত্রহন্ত্রী (৬।৬১।৭)। তিনি ও ইন্দ্রের মত বৃত্রবধ করে জল বর্ষণ করেন (ঋগ্বেদ-(৫।৪৩।১১)।

বৈদিক সরস্বতী প্রথমে ছিলেন সরণশীল অর্থাত গতিশীল সমস্ত আকাশে পরিব্যপ্ত সূর্যকিরণ। ইনি দিব্যসরস্বতী। মর্তে তিনি নদী সরস্বতী। দিব্যসরস্বতী যেমন বৃত্রের মত অশুভ প্রাকৃতিক শক্তিকে বিনষ্ট করতেন, মর্ত্য সরস্বতীও তেমনি আর্যভূমির স্বাভাবিক প্রহরীরূপে শত্রু দমন করতেন। পরে সরস্বতী হলেন বিদ্যার দেবতা—বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী। তখন দেবতেজঃ সম্ভূতা চণ্ডী দানব বধের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। চণ্ডী দুর্গা হলেন দানব দলনী—মহাশক্তিশালী অসুর মহিষাসুরঘাতিনী। আকাশে কুণ্ডলীকৃত মেঘ সাপের কল্পনাও জাগাতে পারে মহিষের সাদৃশ্য ও বহন করতে পারে। মোট কথা মহিষাসুরবধ ইন্দ্রের বৃত্রবধ বা সরস্বতী বৃত্রবধ কল্পনার সাদৃশ্যেই কল্পিত। বৈদিক যুগে দুর্গা-চণ্ডীর নামে কোন দেবীর আবির্ভাব হয়নি। তখন সরস্বতী ছিলেন নারী দেবতাদের মধ্যে প্রধান। উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যারূপা উমা হৈমবতী এবং যজুর্বেদের অম্বিকার দুর্গা-চণ্ডীতে পরিণত হতে বহু শতাব্দী সময় লেগেছে। উমা পার্বতী-অম্বিকা যখন মহিষাসুর হন্ত্রী দেবীতে পরিণত হলেন তখন তিনি হলেন অশিবনাশিনী বরাভয়দাত্রী জগন্মাতা—শুভঙ্করী শিবানী।

সরল দে'র দু'টি লিমেরিক

ভয়ে আর ভাবনায় আছি ভাই, গতি কর-
সিগারেট স্বাস্থ্যের পক্ষে যে ক্ষতিকর !
বড় দুশ্চিন্তাই
হয় সারাদিন, তাই
হর্‌দম টেনে যাই—বলে পার্বতী কর ॥

'স' দোষেই খেলো তোকে, বলেছিল পৃথ্বি-
ভুল উচ্চারণে কি হয় আব্‌বৃত্তি ?
অভ্যেসে যায় দোষ
ঐ সুসোভন ঘোষ—
সে-ও ছিল তোর মত, হ'ল খ্যাতকীত্তি ॥

অশোক চট্টোপাধ্যায়ের ছড়া

পদ্য লেখেন পদ্মপিসী
ঠ্যাং ছড়িয়ে উঠোনে
মাথাতে তার হাড় ফেলেছে
কাকে কিংবা শকুণে ।
যেই ফেলুক না তার কিন্তু
ছাড়ান নেইকো আজকে
এমন দেবেন অভিশাপ যে
ডেকে আনবে বাজকে ।
পদ্য লেখা ছেড়ে পিসী
ছোটান মুখে তুবড়ী
কাক চিলেরা বাংলা ছেড়ে
পালিয়ে গেল ধুবড়ী ;
ধুবড়ী গিয়েও শান্তি নেইকো
সেথায় যতেক আসামী
বাংলাদেশের কাককে দেখে
শুরু করল খ্যাপামী ।
সেই খ্যাপামীর খবর গেল
আসাম থেকে দিল্লী
নড়ে উঠলো সোফা থেকে
ইন্দু দিদির বিল্লী ।

সনৎ মান্নার ছড়া

বাড়লে ব্যাথা টনসিলে,
মন্ত্রী ছোটেন মন্ট্রিলে।
নেই পরোয়া টাকার তাই,
সর্দি হ'লেই জাকার্তাই।
জ্বর সারাতে জার্মানিতে,
যাচ্ছে তারা কার মানিতে ?
আমাদের তো দিল অত নেই,
আমরা ছুটি নীলরতনেই।
মনের সুখে খুব ইজিতেই,
মরলে মরি ঐ পি. জি.-তেই !

কাজল সরকারের দুটি ছড়া

১

একটা দিন্‌তো দিবসরে ভাই
আর সবই তো রাত
জনগণের জনমনে
ছুঁড়বো কিছু বাত।

'হে' বাজারে যাহোক তাহোক,
ভোট বাজারে গরম
খরা ভরায় ভোটের বাকস্
ভোলোরে আজ সরম্।

টাক্ ডুমাডুম্ ডুম্
মে'দিবসের ধূম্
জনগণের রায়ে দোব
সারা বছর ঘুম্।

এ' তো বড় রঙ্গ যাদু
দুয়ে দুয়ে চার
শহরে শ্বেত পায়রা ওড়ে
কেয়া মজাদার।
কত বড় রঙ্গ যাদু
ঊষা উথুপ গায়
গান শুনে ঐ দাদা নাচে
অন্তে মুচ্ছো যায়।
কত বড় রঙ্গ যাদু
যতুগৃহ দেশে
লঙ্কা কাণ্ড দেখে কারও
ঘুম আসেনা শেষে।
পঞ্চনদে আগুন জ্বলে
আসাম ধিকি ধিকি
দেখো যাদুর অঙ্গ তবু
রঙ্গে কাঁপে দেখি॥

ভরাট স্তব্ধতা / গৌরাঙ্গদেব চক্রবর্তী

বিজয়িনী আমি পাইনি তোমায়
চির হরিৎ নিরালায়
মেঘময় রোদ এই যেন খেলা
খেলে যাই সারাবেলা
লাশচাপা বুকে বহুদিন তবু
শুয়ে আছি ছায়া হয়ে
তবু চুপিসাড়ে বলেছি কে তুমি কে তুমি
নিরালা মণি ?
পাইনি উত্তর। বুকের স্তব্ধতা ভেঙে
উঠে আসে জল
চকিতে উজান তাই বেয়ে যাই
শব্দ হয় ছলাৎ ছল।
উজানীর চরে দেখেছি তোমাকে দেখেছি
হরিৎ রোদ্দুরে
আছ ঘেরাটোপে বেঁধেছ শেকল
তবু তুমি একপায়
হরিণী চঞ্চলে ছেয়ে আছ যেন, ক্লান্তি
মোছ অন্যপায়
বুকজোড়া দুঃখ তবু ভাললাগা যেন
সেতারের মূর্চ্ছনা
ম্লান মগ্নতায় চেয়ে দেখি আমি শুধু
ভরাট স্তব্ধতা
আমি ভেঙে পড়া স্তবকের মত
ছিন্ন ভিন্ন শব্দমালা।

এই ভাবে দিন এই ভাবে… / অমল দাস

আবার একটা চলে যাওয়া
মনটাকে নিয়ে পড়ল
আনেকটা প্রাণ জুড়োন হাওয়ায়
কেউ আসত এসে যেত।
ক অত আর দুঃখ টুঃখ…
যত বেশী কাছে কাছে থাকা
বেসাতিপায়ে পায়ে বেধে যায়।
ব্যথাটুকু ঝুলোন সময় বেয়ে
মানুষকে ভারী করে খু-উ-ব।
এই ভাবে দিন এই ভাবে…

এক ফালি চাঁদ / বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাঙা রাতে
জীবনের প্রতিচ্ছবি
এক ফালি চাঁদ দেখে
ভয় পাও কেন ?
ক্লান্ত চাঁদের মতো
তোমার আমার মন ক্ষয়ে গেছে কতো।
মেঘে ঢাকা আবছা আলো
মনে হয়—
আমাদের রুদ্ধ দৃষ্টি, স্তব্ধ হৃদয়।
মিটিমিটি তারাগুলো
হৃদয়ের কোন কোনে জমে থাকা
নিরুত্তাপ এক বিন্দু ভালোবাসা।
সর্বগ্রাসী কালো রাতে আলো জ্বেলে দিতে
আমাদের সংগ্রাম চলে
ক্ষণে ক্ষণে, প্রতিক্ষণে।

জগদ্রামের সুলোচনা
এবং
মধুসূদনের প্রমীলা

অজিত রায়

অর্বাচীন বাংলার অমর সৃষ্টি 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রমীলা চরিত্রটি মধুসূদনের অনুপম সৃষ্টি। প্রমীলা চরিত্রের কল্পনায় কবির সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ অসামান্য সৃজনীপ্রভা, সংযত পরিণামবোধ' মহাকাব্যিক দায়িত্ব ও গভীর অধ্যয়নশীলতা নিহিত আছে। এই চরিত্রটি মধুসূদন কোথা থেকে গ্রহণ করেছেন, এ প্রসঙ্গটি আজও যথার্থ অনালোচিতই থেকে গেছে। আর কোনো রামায়ণে মেঘনাদ-ভার্য্যার উল্লেখ নেই। বাল্মীকিতে নেই, কৃত্তিবাসেও নেই। এবং মধুসূদনই প্রথম সম্ভবত কাশী-রামী মহাভারত থেকে 'প্রমীলা' নামটি সংগ্রহ করে স্বকপোলকল্পনায় মেঘনাদপত্নীর একটী স্বাধীন চরিত্র চিত্রিত করেছেন এবং নিজের মানস-দুহিতা প্রমীলাকে কুলনারীর কোমলতা, কুলবধূর কমনীয়তা এবং বীরনারীর তেজস্বিতার সমন্বয়ে পরিপূর্ণ নারীত্বের মহিমায় উজ্জ্বল রূপে দেখানোর জন্যেই তৃতীয় সর্গের পরিকল্পনা করেছেন, অর্থাৎ সেই চরিত্রাঙ্কনের যাবৎ কৃতিত্বটুকুই কবির অপূর্ব-বস্তুনির্মাণক্ষমা প্রতিভার—সমালোচক ও পাঠক মহলে অদ্যাপি বিদ্যমান ধারণা সেইরকম। তথাচ মেঘনাদের সর্বগুণসম্পন্না একটী উপযুক্ত সহধর্মিণীর চরিত্র কল্পনায় মাইকেল যে পুরোপুরি মৌলিক অথবা পূর্বসূত্রহীন ছিলেন না, তার প্রমাণস্বরূপ মধ্যযুগীয় বাংলার লৌকিক সাহিত্য-ভাণ্ডার থেকে একটি মাত্র রামায়ণের কথা আলোচনা করবার ইচ্ছায় বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা।

মাইকেলের আগে বাঁকুড়ার বিখ্যাত রায়-বংশের অন্যতম প্রথিতযশা পুরুষ জগৎরাম রায় কর্তৃক যে অদ্ভুত অষ্টকাণ্ড রামায়ণ রচিত হয় সেই রামায়ণের রামপ্রসাদ রায় সংযোজিত লঙ্কাকাণ্ডে এই কোমলে-কঠিনে-প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বে ভাস্বর জনৈক মেঘনাদ-জায়ার প্রথম আত্মপ্রকাশ স্মর্তব্য। জগদ্রামী-রামপ্রসাদী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে মেঘনাদ-পত্নী 'সুলোচনা'র একটী স্বতন্ত্র চরিত্র অঙ্কিত আছে। মাইকেলের আগে বাংলা কাব্যসাহিত্যে মেঘনাদ-পত্নীর উল্লেখ একমাত্র জগদ্রামী রামায়ণেই মেলে এবং সংকীর্ণ ও সূক্ষ্ম বিচারে মধুসূদনের কাব্যে সেই রামায়ণেরই প্রভাব পড়েছে বলতে হবে। কারণ জগৎরাম ও রামপ্রসাদের অদ্ভুতরামায়ণ বা অধ্যাত্মরামায়ণ বর্ণিত সুলোচনা নাম্নী চরিত্রের পরিণতি পরবর্তী কালে বর্ণিত প্রমীলার অনুরূপ। উক্ত রামায়ণে বর্ণিত সুলোচনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট অধিকাংশ পরিস্থিতির সঙ্গে মেঘনাদবধের প্রমীলা এবং তৎসংশ্লিষ্ট কিছু পরিস্থিতির যে সাদৃশ্য, বৈজ্ঞানিক সমালোচনায় তাকে নিতান্ত কাকতালীয় বলা চলে না। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার আগে এরই সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আর একটি জরুরী আলোচনা সেরে নিই। সেটা হল, উক্ত রামায়ণ ও তার রচয়িতাদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

॥ এক ॥

বর্তমান নিবন্ধের লেখক সেই জগৎরাম রায়েরই এক সামান্য বংশধর। জগৎরামের পিতার নাম রঘুনাথ রায় ও মাতার নাম শোভাবতী দেবী। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কটি এইরকম: জগৎরাম রায়, তৎপুত্র রামপ্রসাদ রায়, তৎপুত্র রামানন্দ রায়, তৎপুত্র নবীন রায়, তৎপুত্র রাম-নাথ রায়, তৎপুত্র বিশ্বনাথ রায়, তৎপুত্র নিত্যরাম রায় এবং তৎপুত্র অজিত রায়, অর্থাৎ আমি।

বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে দামোদর সংলগ্ন মেজিয়া, কালিকাপুর, অর্দ্ধগ্রাম, কালিদাসপুর আর ভুলুই।

ভুলুই গ্রামই রায়দের জন্মভিটে। সাবেক ভুলুই গ্রামের অর্দ্ধেক আজ দামোদর গর্ভে। এই গ্রাম রাণীগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন থেকে তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং বাঁকুড়ার ২০ মাইল উত্তরে। 'ভুলুই স্থানটী এখনও অতি রমণীয়। উত্তরে অল্পদূরে বিহারীনাথ শৈল, পশ্চিমে কিছু দূরে পঞ্চকোট শৈলশ্রেণী ও অরণ্য, দক্ষিণে অতি নিকটে শীর্ণ দামোদর দুই পার্শ্বে বিস্তীর্ণ বালুকাস্তূপের মধ্য দিয়া তরল রজত রেখার ন্যায় ধীরে বহিয়া যাইতেছে।' (পাক্ষিক সমালোচক, বাং ১২৯২ ভাদ্র)। প্রায় ২৫০ বছর আগে এই ভুলুইগ্রামের বন্দ্যঘটীয় বংশে শোভাবতী দেবীর ক্রোড়ে জগৎরামের জন্ম হয়। নানা লেখকের সাহিত্যের ইতিহাসে জগৎরাম বা জগদ্রাম রায়ের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁর সঠিক জন্মতিথি আজও অনুমান-নির্ভর।

রামায়ণটির রচনাকাল সম্পর্কেও ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছিলেন, 'পঞ্চকোটের রাজা রঘুনাথসিংহ ভূপের আদেশে ইনি (জগদ্রাম) রামায়ণের অনুবাদ আরম্ভ করেন, ১৭১২ শকে (১৭৯০খৃ) এই পুস্তক শেষ হয়।' (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সংস্করণ, পৃ ২৮৬)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আচার্য দীনেশচন্দ্র তার 'বঙ্গভাষ ও সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছিলেন—'আমরা জগৎ-রামের কাব্য দেখি নাই, 'দাসী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধগুলি হইতে তদ্বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছি। বলরাম বাবুর নির্দ্দিষ্ট সময়ই আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু এই পুস্তকে উক্ত কবির বিবরণ মুদ্রিত হওয়ার পরে ১৮৯২ খৃ অব্দের মে মাসের 'দাসী'তে শ্রীযুক্ত সত্যকুমার রায়, বলরাম বাবুর নির্দ্দিষ্টকাল সংশোধন করিয়াছেন। আমাদের মতে সেই সংশোধিত কালই গ্রহণীয় বলিয়া বোধ হইতেছে, তদনুসারে জগৎরাম রায় ১৬৯২ শকে (১৭৭০ খৃঃ অব্দে) দুর্গাপঞ্চরাত্রি এবং ১৭১২ শকে (১৭৯০ খৃঃ অব্দে) রামায়ণ রচনা করেন।' আবার ভূদেব চৌধুরীর মতে, রামায়ণটী ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয় (বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, ১ম পর্যায়, ২য় সং,পৃ ৩৪০)। রাণীগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভূদেব বাবুকে সমর্থন করেছেন (দেশ, ৬ মার্চ ১৯৮২)। ভূদেব বাবুর মতে, 'পঞ্চকোট রাজ রঘুনাথের রাজত্বকালে জগদ্রামের অগ্রজ জিতরামের আদেশে কাব্যখানি সূচিত হয়।' (ঐ পৃ, ৩৩৯)। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও গবেষণা থেকে আমি জেনেছি, জগদ্রাম রঘুনাথ সিংহের দরবারে রাজ সভাকবি হিসেবে কিছুকাল নিযুক্ত ছিলেন।

সংস্কার যুগের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বা চৈতন্যোত্তর যুগে বন্দ্যঘটিয় কবি জগদ্রাম রায় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রামপ্রসাদের সহযোগিতায় এই সুবৃহৎ অদ্ভুত অষ্টকাণ্ড রামায়ণ রচনা করেন। জগদ্রাম প্রথমে আনুপূর্বিক গ্রন্থখানি রচনা করে লঙ্কাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডের বিস্তার সাধনের জন্য নিজের সুযোগ্য পুত্রকে নির্দেশ দেন।

জগদ্রামের রামায়ণ আক্ষরিক অর্থে অনুবাদ-গ্রন্থ নয়। মনে রাখতে হবে, তিনি যখন এই কাব্যখানি লিখতে শুরু করেন, তখন ভারতের ভক্তি-আন্দোলন ছিল মূলত খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু তিনি বাঙালীসুলভ কোমলতা ও ভক্তিভাবের প্রবণতা থেকে উর্দ্ধে ছিলেন না। অনেকে তাঁর রচনার মধ্যে অপরাপর রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশ এবং কিছু কল্পনার সঙ্গে তা নিজের কাব্যে মূর্তরূপ দিয়ে প্রস্ফুটনের কথা উল্লেখ করেন; যা খুবই স্বাভাবিক, কারণ হাতে-লেখা পুঁথির যুগে তা এড়ানোর কোনো উপায় ছিলনা।

ষোড়শ শতাব্দী অনুবাদের যুগ। দীনেশচন্দ্রের ভাষায়, 'কবিকঙ্কণের পর বঙ্গীয় কবিপ্রতিভা যেন শতাব্দী কাল নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। সহসা সংস্কৃতের অতুল ঐশ্বর্য্য বঙ্গীয় লেখকবর্গের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল।' জগদ্রামের কাব্য সম্পূর্ণ হওয়ার পর বর্দ্ধমানের পশ্চিমাঞ্চল, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও ধানবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে ঘরেঘরে সমাদৃত হয়। আমাদের গ্রাম (ভুলুই) ছাড়াও

বিভিন্ন স্থানে জগদ্রামের কাব্য বিভিন্ন উপলক্ষ্যে গীত হতে শুনি। এই সমাদরের কারণ দুটি : এক, জগদ্রামী কাব্য মারফৎ এতদ্‌অঞ্চলে কৃত্তিবাসী রামায়ণের কাঠিন্য থেকে সরল গ্রাম্য ভাষায় রামায়ণ নেমে এলো দুর্বার স্রোতধারায়; এবং দ্বিতীয় কারণ, এই কাব্যের অভিনবত্ব।

প্রচলিত রামায়ণের সাতকাণ্ড ছাড়াও এই রামায়ণে একটি পুষ্করকাণ্ড জুড়ে দেওয়া হয়েছে গ্রন্থখানিতে 'কাণ্ড' আটটি হলেও 'খণ্ড' নয়টি। যথা—আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড, পুষ্কর-কাণ্ড, রামরাস এবং উত্তরাকাণ্ড। লঙ্কাকাণ্ড ও উত্তরা-কাণ্ডের রচয়িতা জগদ্রামের জেষ্ঠপুত্র রামপ্রসাদ। কবি যুগ্ম পিতা-পুত্রে রচনাই ছিল রস-সমৃদ্ধ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ১৬৯২ শকে (১৭৭০খ্রী) এই পিতা-পুত্র যুগ্মভাবে 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' নামে একখানা কাব্য রচনা করেন, যাতে রামচন্দ্র কর্তৃক কিষ্কিন্ধায় অনুষ্ঠিত দুর্গোৎসব বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যে রামপ্রসাদ এইভাবে মুখবন্ধ করেছেন : 'নবমী দশমী দুই দিবসের গান। বর্ণনা করিতে মোরে দিল আজ্ঞা দান॥ আজ্ঞা পেয়ে হর্ষ হয়ে কৈনু অঙ্গীকার। যেমন মশকে লয় মার্জ্জারের ভার॥ বামন বাসনা যেন বিধু ধরিবারে। পঙ্গু লংঘিবারে চায় সুমেরু শিখরে॥ তেন অঙ্গীকার কৈনু পিতার বচনে। আগু পাছু কিছুমাত্র না ভাবিলাম মনে॥' এই কাব্যের ষষ্ঠি, সপ্তমী ও অষ্টমীর পালা জগৎরামের রচনা. অবশিষ্ট দুই পালা রামপ্রসাদ রচনা করেন। এই রচনা বেশ পরিপক্ক ও উপাদেয়। দুর্গাপুজার সময় ভুলুই গেলে এই কাব্য শোনা যায়। শিব ও গৌরীর কথপোকথন নিয়ে মধুর ও তীব্র একটি দাম্পত্য কোন্দল আছে এই গ্রন্থে। গোপীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের 'রাখালী', 'পীতধটা' এবং 'তিন ঠাঁই বাঁকার' খোঁটা তথা শিবঠাকুরের সিদ্ধিধুতুরা-প্রিয়তা উপলক্ষ্যে গৌরীর মিষ্ট-ভর্ৎসনা—সোহাগে ও গালিতে মিশ্রিত হয়ে বাংলা সাহিত্যে রৌদ্রমিশেল বৃষ্টির মতো কৌতুহলকর হয়েছে। রামপ্রসাদের লেখা আর-একখানি বৃহৎ কাব্য আছে—'কৃষ্ণলীলামৃত রস'। কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামে কবির জনৈক বংশধর পুস্তকখানির মধ্যে মধ্যে নিজের ভণিতা সূচক কবিতা সংযোজন করে সেটি প্রকাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বসন্তরঞ্জন রায় প্রকাশিত সম্পূর্ণ পুস্তকখানির যে কপি ১৩৩ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষদে দিয়েছিলেন, দেখা গেছে কাশীবাবুর প্রকাশিত গ্রন্থ তা থেকে অভিন্ন। দীনেশ চন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের ২৮৭ পৃষ্ঠায় এর সমর্থন দ্রষ্টব্য।

রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড ও উত্তরাকাণ্ড রামপ্রসাদেরই রচনা (১৭৯১)। নয়টি খণ্ডের বিষয়সূচীতে, বিশেষ করে নব-সংযোজিত খণ্ড দুটিতে পৌরাণিক ঐতিহ্যগত কাহিনীর সহায়তায় নতুন বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করবার মতো। ভূদেব বাবুর মতে, 'বস্তুত পূর্ববর্তী শতাব্দী থেকেই এই বৈশিষ্ট্য বাংলা কাব্য-সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করে।' জগদ্রামের পাণ্ডিত্য ও রামপ্রসাদের কাব্য-প্রতিভার যুগ্মমিলনে, বুদ্ধিবৃত্তির হৃদয়বৃত্তির এমন মণিকাঞ্চনযোগ বাংলার লৌকিক কাব্য-সাহিত্যের জগতে ছিল এক বিস্ময়কর সংযোজন। বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'প্রমীলার উৎস' নিবন্ধে লিখেছেন, 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে জগদ্রামের পুঁথির যে সংগ্রহ আছে তার থেকে এই গ্রন্থ যে সেকালের সমাজে বেশ জনপ্রিয় ছিল তা বোঝা যায়' (দেশ, ৬ মার্চ'৮২)। বর্তমান আলোচনার মাধ্যমে সেই লৌকিক রামায়ণের শিল্পসত্তার গভীরে নিহিত রস ও কাব্যসম্পদের প্রতি আধুনিক যুক্তিবাদী, সাহিত্যরসিক, বোদ্ধা, সংবেদনশীল পাঠক-গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার একটি অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু জগদ্রামী কাব্যের অন্তর্নিহিত রস ও কলাবিন্যাসের যথাযোগ্য মুল্যায়ণ একটি সুবৃহৎ গ্রন্থের পরিসরে ধরানোই

যেখানে দুঃসাধ্য, সেখানে ক্ষুদ্র একটি নিবন্ধের মুষিক অঞ্জলিতে কতটুকু সম্ভব? এ আলোচনা কঠিন ভাবে অতি সংক্ষেপিত। বারান্তরে বিস্তৃতির মধ্যে অবগাহন করবার ইচ্ছা রইল।

এই সূত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং অপরাপর সাহিত্য গবেষণা কেন্দ্র সহ, উদ্যমশীল গবেষক, লেখক ও পাঠকের কাছে আমার অনুরোধ, জগদ্রামী কাব্যের মতো আরও বহু প্রাচীন কবিদের পুঁথি ও ছাপা বই (আজ যা আবর্জনার মতো ঝেঁটিয়ে ফেলা হচ্ছে) যথাসম্ভব সংগ্রহ করবার চেষ্টা করুন। সম্প্রতি জানতে পেরেছি, জগদ্রামী-রামপ্রসাদী 'অদ্ভুতরামায়ণ' (ডঃ সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ২য় সং, পৃ ৪১২)-এর কয়েকটি মুদ্রিত সংস্করণ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। জগদ্রামের এক বংশধর কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায়ই এ কাজে প্রথম হাত দেন। তিনি এই কাব্য সম্পাদনা করে চলতি শতকের গোড়ার দিকে কাশিকাপুর, পোঃ—অর্দ্ধগ্রাম, বাঁকুড়া থেকে প্রকাশ করেন। এ ছাড়া অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত অদ্ভুত অষ্টকাণ্ড সম্পূর্ণ রামপ্রসাদী-জগদ্রামী রামায়ণের ৩য় সংস্করণের একটি কপিও আমার কাছে এসেছে। এটি ১৩০৭ বঙ্গাব্দে এন ব্যানার্জি অ্যানড সন্‌স, রামমোহন সাহা লেন, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথি বিভাগ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেও এই কাব্যের পুঁথি সংগৃহীত রয়েছে। তেমন হিন্দু বৌদ্ধযুগ, গৌড়ীয় যুগ, শ্রীচৈতন্য সাহিত্য বা নবদ্বীপের প্রথম যুগ, সংস্কার যুগ প্রভৃতি প্রাচীন কালের কবি-গীতিকারদের পুঁথি সংরক্ষণ ও মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করা যায় না।

॥ দুই ॥

বর্তমান নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমীলার উৎস-সন্ধান। জগদ্রামী-রামপ্রসাদী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে বর্ণিত ইন্দ্রজিৎ-পত্নী সুলোচনাই যে মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে বর্ণিত মেঘনাদ-পত্নী প্রমীলা, এই কথনের যুক্তি-প্রমাণ যেমন বিতর্ক-বস্তু তেমনই বিস্ময়কর। জগদ্রামের কাব্য লেখা হয় ১৭৯১ সালে। এর প্রায় এক যুগ পরে মধুসূদন মেঘনাদবধ লেখেন। মধুসূদনের পত্রাবলী ঘাঁটলে মেঘনাদবধের রচনাকাল সম্পর্কে একটা আভাস পাওয়া যায়। ১৮৬০ সালে ২৪ এপ্রিল তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন, I enclose the opening invocation of my মেঘনাদ—you must tell me what you think of it.' নির্দ্বিধায় বলা যায় এর কিছুদিন আগে মেঘনাদ লেখা শুরু হয়। কাব্য শেষ কবে হয়েছিল তা স্পষ্ট না হলেও, ১৮৮১র জুনের আগে নিশ্চয়ই হয়েছিল। রাজনারায়ণকেই লেখা তাঁর অপর এক চিঠিতে বেলগাছিয়ায় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকাল-প্রয়াণের প্রসঙ্গ এবং হিন্দু প্যাট্রীয়টের সম্পাদক হরিশ মুখার্জির মুমূর্ষু অবস্থার কথা উল্লেখিত হয়েছে। ১৮৬১ সালে ২৯ মার্চ ঈশ্বরচন্দ্র এবং ঐ বছরই ১৪ জুন হরিশবাবুর মৃত্যু ঘটে। এই সূত্র ধরে অনুমান করা যায়, ১৮৬১-র এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে মেঘনাদবধ লেখা শেষ হয়।

মধুসূদনের অন্তত ১৫টি চিঠিতে মেঘনাদবধ-প্রসঙ্গের প্রত্যক্ষ উল্লেখ আছে। কিন্তু তন্মধ্যে একটীতেও এমন স্বীকারোক্তি নেই যদ্দারা আমরা সরাসরি বলতে পারি যে এই যুগান্তরকারী মহাকাব্য লেখবার বহিরঙ্গ ভাবনা অথবা আপন প্রতিভার বৈশিষ্ট্য না বুঝে অপরের দ্বারা সাময়িক ভাবে প্রভাবিত হবার ফলে তিনি মহাকাব্য লিখতে প্রবৃত্ত হন। তবে মধুসূদনের কাব্যে জগদ্রামের প্রভাব রয়েছে তার প্রামানিক যুক্তি কী? মনে রাখতে হবে, মধুসূদনের কবিদৃষ্টি পুষ্ট হবার পেছনে প্রাচীন মহাকবিদের প্রভাব ছিল গভীরভাবে কার্যকর। অর্থাৎ উনিশ শতকের সাহিত্যরীতির অনুচিকীর্ষা-প্রবণতার প্রভাববশত মধুসূদন তাঁর কাব্যের সকল সৌন্দর্যকে মঞ্জরিত করে তুলতে যেমন বিশ্বসাহিত্যের প্রতীচ্য ও প্রাচ্য মধুভাণ্ড থেকে সংগৃহীত

মাধুর্য নিয়ে নিজভাষায় অভূতপূর্ব মধুচক্রের সৃষ্টি করেছেন ; তেমনি এ কথাও সত্য, তিনি বাংলার প্রাচীন ও অর্বাচীন লৌকিক সাহিত্য ভাণ্ডারের কাছেও ছিলেন সমানভাবে ঋণী, তবে স্থূলভাবে নয়, তাকে সূক্ষ্ম দর্শন মারফৎ আত্মসাৎ করে মৌলিকত্ব প্রদান করেছেন তিনি। সাহিত্যের ব্যাপারে একটি গ্রীবাবন্ধনী, বড় জোর একটি ফতুয়া ধার করলেও কখনই পুরো স্যুট ধার করবার পক্ষপাতী ছিলেন না মাইকেল। গৌরদাস বসাককে লেখা একটি পত্রাংশে স্বরচনায় পরকীয় সাহিত্যের সৌরভ সম্পর্কে তাঁর স্বীকারোক্তি অনেকটা এই রকমই : 'In matters literary, old boy, I am too proud to stand before the world in borrowed clothes. I may borrow a neck-tie, or even a waist coat, but not the whole suit.'

ঠিক সেইভাবে মধুসূদন জগদ্রামের কাব্যের সংস্পর্শে এসে তা থেকে প্রমীলা চরিত্রের নির্মাণের জন্য ঋণ নিয়েছেন। এর প্রমাণার্থে প্রথমে জগদ্রামের রামায়ণের বিষয়বস্তু এবং পরিস্থিতি মধুসূদনের কাব্যে কতটুকু বিদ্যমান এবং সুলোচনা চরিত্রের সঙ্গে প্রমীলা চরিত্রের মিল কতটুকু তা দেখতে হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসে যখন মেঘনাদ-পত্নীর নামোল্লেখ নেই, তখন জগদ্রামই বা এ-চরিত্র পেলেন কোথা থেকে ? জগদ্রামেরই এক পূর্বপুরুষ লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনি বিখ্যাত ভারতপাঁচালীর রচয়িতা দ্বিজলক্ষ্মণ) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের খণ্ডাংশ অবলম্বনে 'অধ্যাত্মরামায়ণ' নামে এক রামায়ণ অনুবাদ করেন, সেটিতে মেঘনাদ প্রসঙ্গ থাকলেও তাঁর পত্নীর কোন পরিচয় নেই। দ্বারকানাথ কুণ্ডু রচিত ৯০ পৃষ্ঠার 'অদ্ভুত রামায়ণ' গ্রন্থে যুদ্ধকারী রাবণিগণের দীর্ঘসূচীতে মেঘনাদেরও নাম অনুপস্থিত। সমালোচক মহলে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী সুলোচনা চরিত্র জগদ্রাম এবং রামপ্রসাদের কপোলকল্পিত বলেই ধরা হয়েছে। এবং জগদ্রামী কাব্যের লঙ্কাকাণ্ডে বর্ণিত ইন্দ্রজিত পত্নী সুলোচনার যে চরিত্র আছে, সেটাই মেঘনাদবধের প্রমীলা চরিত্রের উৎস বলে পরিগণিত হবার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

একথা অনস্বীকার্য যে, এ দেশীয় সাহিত্যে মধুসূদনের যে স্থান, তা থেকে তাঁকে কেউ ব্যক্তিগত অভিপ্সায় চ্যুত করতে পারবেন না। কিন্তু তথাপি জগদ্রামকেও তাঁর যথোচিত প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা যায় না। এ দাবি আমরা কখনই করব না যে, মধুসূদন প্রমীলা চরিত্রের ব্যাপারে শুধুমাত্র জগদ্রামের দ্বারাই প্রভাবিত ; কিন্তু অধিকাংশ প্রমীলা চরিত্র পরিকল্পিত হয়েছে সুলোচনাকেই সামনে রেখে। বৈজ্ঞানিক সমালোচনায় তা স্বীকার করতেই হবে। প্রমীলা চরিত্রের রূপদানে মধুসূদনের নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তির ছাপ থাকলেও, দুটী কাব্য পাশাপাশি রেখে অনুশীলন করলে এই সাদৃশ্য বা প্রভাব ধরা যায়। আর এখানেই আমাদের অমর জাতীয় কবি-মধুসূদনের চেয়ে ধুরন্ধর জ্ঞানতাপস পাঠক মধুসূদনের প্রতি আরও একবার সবিমুগ্ধ শ্রদ্ধা জানাতে অভিলাস জাগে।

।। তিন ।।

জগদ্রামী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের কাহিনী এই রকম : স্বামী ইন্দ্রজিতের ছিন্নমুণ্ড উদ্ধারের জন্য সুলোচনা রণরঙ্গিনী সহচরীবৃন্দ পরিবৃত হয়ে ভীমনাদে লঙ্কা গমনের পর রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ প্রার্থিনী হয়েছিল। কিন্তু রামপদের সদাজাগ্রত প্রহরী জাম্বুবানের প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। পরে সবিভীষণ রামচন্দ্র তার প্রার্থনা পূরণ করেছিলে। সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করে সুলোচনা স্বামীর খণ্ডিত দেহ কোলে নিয়ে চিতাপ্রবেশ করেন। সৎক্রিয়ার জন্য তারই প্রার্থনায় রামচন্দ্র এক দিবসের যুদ্ধবিরতি রাখলেন এবং সদলে সেই পুণ্যানুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন।

মধুসূদনের কাব্যে এই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদের আগমনে বিলম্ব হওয়ায়

শূন্য প্র.মাদোদ্যানে প্রমীলার উদ্বেগ ও সমরসজ্জিতা নারী-বাহিনীসহ লঙ্কাপুরে গমন এবং রামচন্দ্রের সদাজাগ্রত প্রহরী হনুমানের দ্বারা প্রমীলা-বাহিনী গতিরোধ। হনুমানের সাবধানবাণীর পরে প্রমীলার প্রতিনিধি নৃমুণ্ডমালিনীর বীরদর্পে প্রমীলার বক্তব্য পেশ করার পর রামচন্দ্র কর্তৃক প্রমীলার স্বামীভক্তির প্রশংসা। ইতিপূর্বেই পার্বতী কর্তৃক মেঘনাদের হত্যাসাধন ঘটে এবং প্রমীলা পতির খণ্ডিত দেহ নিয়ে চিতাপ্রবেশ করে। পতিব্রতের এই অপূর্ব নিদর্শন দেখে বিস্মিত রামচন্দ্র সপ্তাহকাল যুদ্ধ বন্ধ রাখেন।

জগদ্রামী রামায়ণ ও মধুসূদনের কাব্যে এই কাহিনীগত এবং চরিত্র পরিকল্পনায় সাদৃশ্য ছাড়াও সুলোচনার রূপগুণ এবং কতকগুলি পরিস্থিতির সঙ্গে প্রমীলার রূপগুণ ও গল্পগত পরিস্থিতি চিত্রণে আশ্চর্যজনক মৌলসাদৃশ্য বিদ্যমান। প্রসঙ্গত আরেকটি বিশেষ তথ্য, 'প্রমীলা' নামটির জন্য মধুসূদন কাশীরাম পর্যন্ত দৌড়লেও তাঁর কাব্যে প্রমীলা প্রসঙ্গে অন্তত তিনবার 'সুলোচনা' শব্দের প্রয়োগেও জগদ্রামী রামায়ণের সুলোচনা নামের প্রভাব লক্ষণীয়। (বুদ্ধদেব বসুর 'সাহিত্যচর্চা' গ্রন্থের 'কাব্যে প্রভাব' আলোচনা দ্রষ্টব্য)। তৃতীয় সর্গে সমরসজ্জায় ভূষিতা প্রমীলার বর্ণনায় প্রথম শুনি : ..'উচ্চ কুচ আবরি কবচে / সুলোচনা' (১২০ ছত্র)। দ্বিতীয়বার তৃতীয় সর্গেই হনুমান ও প্রমীলার সংলাপে : 'তব সাথে কি বিবাদ তাঁর, সুলোচনে ?' (২৩১) এবং পঞ্চম সর্গে সুযন্ত্র-মিলনে বৈতালিকদের গানে 'সঙ্গে সেনা সুলোচনা।' (৪৪২)। এটি কি সত্যিই জগদ্রামের প্রভাব ? হতেও পারে। অবশ্য, মেঘনাদবধের অন্য নারী চরিত্র প্রসঙ্গেও 'সুলোচনা' শব্দের প্রয়োগ আছে। সরমা সুন্দরী প্রসঙ্গে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তিনবার। চতুর্থ সর্গের ৭২ পংক্তিতে—'কত ক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি সুলোচনা', ১১৮ পংক্তিতে 'ছিনু মোরা সুলোচনা, গোদাবরী তীরে', এবং ৬৪১ পংক্তিতে 'কতক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি সুলোচনা'। সীতা প্রসঙ্গেও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে একবার চতুর্থ সর্গের ২৬৬ পংক্তিতে —কতক্ষণে চেতন পাইলা সুলোচনা।' সুতরাং 'সুলোচনা' শব্দটি প্রমীলা প্রসঙ্গে জগদ্রাম থেকে না-ও এসে থাকতে পারে, শব্দটি চোখের সৌন্দর্যজ্ঞাপক বিশেষণ হিসেবেই এসেছে।

এবার সুলোচনা ও প্রমীলার সাধারণ বর্ণনায় সাদৃশ্য প্রসঙ্গে আসা যাক। জগদ্রামী কাব্যে সুলোচনা নিজের পরিচয় দিচ্ছে 'রাবণের বধূ ইন্দ্রজিতের রমণী' এবং মধুসূদনের কাব্যের সমাগম পর্বে প্রমীলা বাসন্তী সখীকে বলছে 'রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী' (৭৯ ছত্র)। এই দুই উক্তির নিকট সাদৃশ্য বিশেষ প্রণিধেয়। সুলোচনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এইরকম :

সুলোচনা নাম ইন্দ্রজিতের রমণী।
নাগকন্যা অতি ধন্যা সতী শিরোমণি॥
বয়সে যুবতী তাহে অতি রূপবতী।
সুকামিনী দামিনী জিনিয়া দেহদ্যুতি॥
চম্পকবরণ সে ঝম্পক দোলে কেশে।
বদনচন্দ্রমাতে মদন মোহে হাসে॥
মধ্যদেশ ক্ষীণ পীনোন্নত পয়োধর।
দাড়িম্ব বিজিত দন্ত সুবিম্ব অধর॥ ..
কমল মৃণাল ভুজ উরু রম্ভা তরু।
নীলাম্বরে সম্বৃত নিতম্বদেশ চারু॥' (৩৩০পৃ)
এবং 'স্বর্ণসিংহাসনে বসি আছে সুলোচনা।
বিদ্যাধরী নারী সেবা করে কতজনা॥
ইন্দ্রপুর জিনি তার অন্তঃপুর শোভা।
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণীকে নিন্দিয়া বৈসে কিবা॥ (ঐ)

'প্রমীলার উৎস' প্রবন্ধে লেখক বিশ্বনাথ বাবু জগদ্রামী কাব্যের উপরোক্ত বর্ণনার পাশাপাশি মেঘনাদবধের সমাগম সর্গের প্রমীলার বর্ণনার পাশাপাশি মেঘনাদবধের সমাগম সর্গের প্রমীলার বর্ণনাকে রেখে উভয়ের ঐশ্বর্যভাব ও অন্তরস্থ গর্বসচেতনতার সাদৃশ্য দেখিয়েছেন।

মধুসূদনের কাব্যে প্রমীলার বর্ণনা নিম্নবৎ :

'...পরিলা দুকূলে
রতনময় আঁচল, আঁটিয়া কাঁচলি
পীন-স্তনী; শ্রোণিদেশে ভাতিল মেখলা।
দুলিল হীরার হার, মুকুতা-আবলী
উরসে, জ্বলিল ভালে তারা-গাঁথা সিঁথি
অলকে মণির আভা কুণ্ডল শ্রবণে।
পরি নানা আভরণ সাজিলা, রূপসী।' (৩য় সর্গ,)
এবং ...'স্বর্ণাসনে বসিলা দম্পতী।
গাইল গায়ক দল ; নাচিল নর্ত্তকী ;
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী ত্রিদশ-আলয়ে' (ঐ,)

আবার জগদ্রামে সুলোচনার অসাধারণ সাহসিকতা এবং শোকবিধুর অথচ অন্তর্নিহিত নারীসত্তার যে দীপ্ত প্রস্ফুটন দেখতে পাই, মধুসূদনে প্রমীলা চরিত্রেও তা বিদ্যমান। এই সাদৃশ্য নিঃসন্দেহে কাকতালীয় হতে পারে না, বৈজ্ঞানিক সমালোচনার আইনেই সুলোচনাকে প্রমীলার পূর্বসূত্র হিসেবে ধরতে হবে।

অবশ্যি প্রমীলার বীরাঙ্গনাসুলভ আচরণ সুলোচনায় দৃষ্ট হয় খুব সূক্ষ্ম ভাবে। মেঘনাদবধের তৃতীয় সর্গের ঘটনার সূত্রপাতোত্তর ইন্দ্রজিতের আগমন-বিলম্ব-হেতু প্রমীলার অস্থিরতা এবং রণরঙ্গিণী সহচরীবৃন্দের সমরসজ্জা, লঙ্কাগমনের উদ্যোগ তথা সখীদলকে সম্বোধন করে বড়বামুঢ়া প্রমীলার আহ্বান—এই অংশটুকু জগদ্রামের সুলোচনায় অনুপস্থিত। এটি কি তবে পূর্বসূত্র ছিন্ন মধুসূদনের সম্পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত ?

মোটেই নয়। প্রমীলার এই বীরনারী মূর্তির কল্পনায় মধুসূদন দেশী - বিদেশী একাধিক কাব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে অনুমান করা অসংগত নয়। আসলে প্রমীলা বীরাঙ্গনা, কিন্তু বীরবালা নয়। সে মেঘনাদ - পত্নী বলেই বীরাঙ্গনা, নায়িকা / মধুসূদন গ্রীক তথা পাশ্চাত্য রীত্যনুযায়ী লিখতে চেয়েছেন বলে নায়ককে পরিপূর্ণতা প্রদান করতেই তাঁকে প্রমীলা চরিত্রে এই বিশেষত্ব আনতে হয়েছে। প্রমীলার রণসাজ প্রেমেরই সঞ্চারী ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। যতক্ষণ মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন ততক্ষণই তার অঙ্গে সংগ্রাম চিহ্ন। প্রমীলা নির্ভিক দুঃসাহসিকা, কিন্তু স্বামী ব্যতিরেকে তার কোনো গৌরব নেই। হোমারের Iliad-এর রণসজ্জায় সজ্জিতা Athenae, ভার্জিলের Aeneid মহাকাব্যের অশ্বারোহণ-নিপুণা সসঙ্গিনী বীরাঙ্গনা Camilla, ট্যাস্-সোর Jerusalem Delivered মহাকাব্যের Clorinda, গ্রীকপুরাণে বর্ণিত আমাজন নারীগণ (বিশেষত চার শতকে লেখা কুইনটাস অফ স্মারনার Where Homer Ends-এর কথা স্মর্তব্য), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'পদ্মিনী' ও কবিকে প্রেরণা যুগিয়ে থাকতে পারে। (বাংলার ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির বীররমণীদের সঙ্গে মধুসূদনের পরিচয় ঘটেনি)। এইরকম বীরাঙ্গনা চরিত্র পাশ্চাত্যের আরও একাধিক কাব্যে আছে এবং মধু-সূদনের প্রমীলার সঙ্গে সাদৃশ্যসূত্রে কেউ কেউ তাদেরও উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু পাশ্চাত্যে আদর্শ নারীর অন্তর্নিহিত এ কোমলতা এবং বিনম্র ভাব পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু কাশীরাম দাসের মহাভারত এক্ষেত্রে বিবেচ্য।

কাশীরামের মহাভারতোল্লিখিত প্রমীলা এবং মধুসূদনের মেঘনাদবধোল্লিখিত প্রমীলার অন্তর্নিহিত চারিত্রিক সাদৃশ্য এখানে সংক্ষেপে তুলনা করলে বোঝা যাবে, এই বীরাঙ্গনা প্রমীলার রূপটিও মধুসূদনের অপূর্ব-চরিত্র-নির্মাণক্ষমা-প্রজ্ঞার কৃতিত্ব নয়, এটি কাশীরামের প্রমীলা চরিত্রেরই অনুসৃত। তৃতীয় সর্গে ইন্দ্রজিতের আকস্মিক বিদায়ের পর সহসা সেই বিরহ-বেদনার অবসান ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে একশত সখীসহ দ্রুতগামী তুরঙ্গপৃষ্ঠে সংগ্রামভূষণে সুসজ্জিত হয়ে শত্রুব্যূহ ভেদ করে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করা কুলবধূ প্রমীলার পক্ষে দুঃসাহসিক

কাজ সন্দেহ নেই—কিন্তু দেহে উত্তপ্ত যৌবন থাকলে, দুরন্ত আবেগের আতিশয্য থাকলে, অনির্বেয় কামানল, থাকলে সর্বোপরি হৃদয়ে প্রণয়ের স্রোতোবেগ দুর্দম হয়ে উঠলে, তা সমস্ত প্রতিকূলতার উপলবাধা চূর্ণ করে প্রিয়তম-রূপ সাগরে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ধাবিত হবেই। প্রমীলার সাহসিকতা ও সমর সজ্জার যতই আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনা মধুসূদন দিয়ে থাকুন, প্রমীলার আসল পরিচয় প্রেমিকা—সেটা ভুললে চলবে না। মধু-সাহিত্যে অন্যান্য নারীর মত প্রমীলা ও আপন প্রেমে বিশিষ্ট, বীরত্বে নয়। আত্ম-হৃদয়ের প্রেমানুভূতির আকুণ্ঠিত প্রকাশই তার বীরাঙ্গনা। প্রেম-সর্বস্ব প্রমীলাকেস্ব ামীবিরহ ও শত্রুবাধাই বিদ্রোহিনী করে তুলেছে। বিশেষ স্মর্তব্য যে, আলোচ্য সর্গের শেষাংশেই রয়েছে, স্বর্গে শংকরী বিজয়াকে বলেছেন—'মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী'—অর্থাৎ প্রমীলা সক্রসম্ভূতা বলেই এমন ভয়ংকরী রুদ্ররূপিণী। প্রেমসর্বস্ব প্রমীলার অতৃপ্ত দেহমনের সেই ব্যাকুলতা কত মেদুর, কত গভীর, কেমন অব্যক্ত—প্রমীলার এই দুঃসাহসিকতা কি তারই প্রচ্ছন্ন প্রকাশ নয়? প্রমীলার প্রেম তো যৌন-মিলনের ভোগ-বাসনার ঊর্দ্ধে নয়। তার যৌনতা আছে, তাই রমণীর তাৎপর্য। কায়িক ক্ষুধা মস্ত ক্ষুধা। শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্নেই মধুসূদন আমাদের কাছে সরাসরি না বলে পরোক্ষ ভাবে বলেছেন। প্রমীলা চরিত্রের লক্ষণই এই— তাই শেষাবধি প্রণয়প্রবাহিনীর অনিরুদ্ধ গতিবেগেই সে ভর্তার সঙ্গে মিলনভিযানে যাত্রা করেছে। এই অভিযান ও প্রিয়মিলনের জন্যই মেঘনাদবধের তৃতীয় সর্গের 'সমাগম' (শ্রীমেঘনাদবধ কাব্যে সমাগমো নামতৃতীয়ঃ সর্গঃ) নামকরণের তাৎপর্য ও সার্থকতা। কাব্যপ্রয়োজনে মধুসূদন মেঘনাদবধে একাধিক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন কিন্তু শুধুমাত্র নিজের মানসী আত্মজা প্রমীলাকে শক্তি-প্রেমের সমন্বয়ে পরিপূর্ণ নারীত্বের দৃপ্ত মহিমায় অবর্ণনীয় মাধুর্যের ভাস্বরে দেখাবার জন্যেই তৃতীয় সর্গের পরিকল্পনা করেছেন, যা সত্যিই বিস্ময়কর। অথচ এই অতিরিক্ত পরিকল্পনা, কবির সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ, অনন্যসাধারণ সৃজনী-শক্তি, সংযত পরিণামবোধ, মহাকাব্যিক মাধুর্য বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হয় নি। তার কল্পনায় আবিলতা স্থান পায়নি, পেয়েছে অত্মনিবেদ-প্রবণতাই।

কিন্তু শতচেড়ীসহ বীরাঙ্গনা প্রেমময়ী প্রমীলা বস্তুত মধুসূদনের মানসী দুহিতা নয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী গার্গী দত্ত প্রমুখ সমালোচকদের মতে, প্রমীলা নামটিই যে কাশীরাম থেকে সংগৃহীত তা নয়, কাহিনীগত অমিল থাকলেও দুই প্রমীলার অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য যথেষ্ঠ রয়েছে। (দেশ, চিঠিপত্র,৫জুন'৮২)। বর্তমান আলোচনায় প্রমীলার উপরোক্ত চারিত্রিক বিশেষতার সঙ্গে কাশীরামের প্রমীলার বিস্ময়কর মিল আমরা উভয় কাব্য থেকে পাশাপাশি উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝাতে পারি।

তৃতীয় সর্গে দাশরথির সৈন্যবাহিনীর মধ্য দিয়ে বড়-বাপৃষ্ঠে প্রমীলার মিলোৎকণ্ঠা ও প্রেমার্তিকে তীব্রতর করতে করতে সহগমন করার একটি দৃশ্য আছে। যোগীন্দ্র-নাথ বসু এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে সেটি ট্যাস্সোর Jerusalem Delivered থেকে সংকলিত (মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরীত)। কিন্তু দৃশ্যটিকে বিশ্লেষণ করলে কাশীরামী মহাভারতের অশ্বমেধপর্বে বর্ণিত অর্জুনের প্রমীলাপুরীতে প্রবেশের দৃশ্যটির সংগে (ব্যাসের মহাভারতে সে কাহিনী নেই) এর স্পষ্ট মিল খুঁজে পাই।

মেঘনাদবধে ভর্তার সংগে মিলনের উদ্দেশ্যে প্রমীলা যখন লঙ্কাভিযানের উদ্যোগ করছে, তখন তার সাজসজ্জা ও দৃপ্ত ভংগিমার বর্ণনা প্রসংগে কবি একটি ভিন্ন সাদৃশ্য স্পষ্ট করে তুলেছেন :

'যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,
যজ্ঞের তুরংগ সংগে আসি, উতরিলা
নারী-দেশে, দেবদত্ত শঙ্খ-নাদে রুষি,
রণ-রংগে বীরংগনা সাজিলা কৌতুকে;—(৮৫-৮৮ছত্র)

কাশীরামের মহাভারতে আছে, অশ্বমেধ যজ্ঞের মন্ত্রপূত অশ্ব নিয়ে পার্থ যখন পুরোপুরি নারী অধ্যুষিত

প্রমীলাপুরীতে এসে হাজির হলেন, তখন অর্জুনের দেবপ্রদত্ত শঙ্খের গুরুধ্বনিতে ক্রুদ্ধ প্রমীলা বহুতর নারী সৈন্য নিয়ে অর্জুনের সামনে রণরঙ্গিণী বেশে এসে দাঁড়ালেন :

'মহাবনে আছয়ে প্রমীলা নামে নারী।
পদ্মিনী তাঁহার সনে আছে লক্ষচারি॥...
অর্জুন প্রভৃতি মনে ভাবেন বিষাদ।
এমন না দেখি কভু হইল প্রসাদ॥
ঘোড়া নাহি দেখি পথে চৌদিকে রমণী।'

(মহাভারত)

অর্জুনের কথায় মহাভারতে প্রমিলা যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে আত্মপরিচয় দিয়েছেন এই ভাষায় :

'আমাকে জিনিতে নাহি পারে ত্রিভুবন।
মোর ভয়ে কম্পিত যতেক দেবগণ॥
পার্বতীর বরে কারে ভয় নাহি করি।
হাতে অস্ত্র কেহ না আইসে মোর পুরী॥'

সমভাবে মেঘনাদবধের প্রমীলা আত্মপরিচয় দিয়েছে :

'দানবনন্দিনী আমি ; রক্ষ: কুল-বধূ...'

(৭৮ ছত্র)

এবং 'আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ?'

(৮০ ছত্র)

কাশীরামের প্রমীলাপর্বে দেখি অর্জুনের সংগে তারা আসে যুদ্ধ করতে 'নানা বেশ ধরি', কিন্তু 'যুবতীগণের চিত্তে বাড়িল মদন। সম্মুখে আছেন কাম কৃষ্ণের নন্দন।' এবং 'বিবাহ করহ মোরে কহিলাম আমি' প্রমীলার এই উক্তিতে যে কামমদমত্ত রমণীর পরিচয় মেলে, মেঘনাদ-ভার্য্যা প্রমীলা ও তার শতচেড়ীর আস্ফালনেও সেই লক্ষণ সুস্পষ্ট। তৃতীয় সর্গের 'অধরে ধরি গো মধু-গরল লোচনে' (১৪৮), 'জরজরি সর্বজনে কটাক্ষের শরে' (২৬১), 'কামের পতাকা যথা ওড়ে মধুকালে' (২৬৬) প্রভৃতি তার উদাহরণ। রামপক্ষের বীরদের সংগে ধনুর্বাণ, চর্ম-অসি বা গদা নিয়ে যুদ্ধ অথবা মল্লযুদ্ধ করাটা তো মধুসূদনের স্মিত কৌতুকের সুরেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সমরসজ্জার সংগে কামের বিজয়কেতনের বর্ণনায় প্রেমশরনিক্ষেপের ফলে যে দেহের তিয়াস ও ভোগলিপ্সা জেগে ওঠে—অফুরন্ত সম্পদ ও রাজক্ষমতাসীন রাবণের বর্গের মধ্যে দেহবলে অধিকৃত ঐশ্বর্যের ভেতর থেকে উৎসারিত প্রাণকে নিঃশেষে উপভোগ করবার বাসনা থেকে সেই ইংগীতটুকুই মেঘনাদপত্নী প্রমীলার অন্যতম প্রধান চারিত্রিক লক্ষণ। সম্ভবত এই কারণেই যোগীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'তাঁহার (মধুসূদনের) বাল্যের প্রিয় কবি কাশীরাম দাসের অশ্বমেধ পর্ব হইতে তিনি তাঁহার মনঃকল্পিত নায়িকার একখানি রেখাচিত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।...প্রমীলার নাম, প্রমীলার বীরাংগনা সংগিনীগণ, প্রমীলাপুরীতে পুরুষের অভাব এবং পার্বতীর অনুগ্রহে প্রমীলার অজেয়ত্ব প্রভৃতি মধুসূদন কাশীরাম দাস হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।' বলতে কি, শ্রীবসুর এ মন্তব্যের কোন টেকসই প্রমাণ না থাকলেও কিছু সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কাশীরামের প্রভাবের সম্ভাবনাকে অস্বীকার না করেই আমরা বলব, সেই মহাভারতের প্রমিলাই প্রকৃতপক্ষে মেঘনাদবধের প্রমিলার উৎস এমত সিদ্ধান্ত নেওয়া অবৈজ্ঞানিক।

॥ চার ॥

প্রশ্ন উঠতে পারে, মধুসূদনের প্রমিলা চরিত্রের অধিকাংশ উপাদানই যখন জগদ্রামি রামায়ণ থেকে অনুসৃত, তখন এই সামান্য অংশের জন্য তিনি কাশীরামকে অনুসরণ করলেন কেন ? এ প্রশ্নের অনায়াস উত্তর : মধুসূদন মূলত সৃষ্টিধর্মী কবি এবং তাই জগদ্রামি রামায়ণ থেকে প্রমিলা চরিত্র গড়তে সুলোচনা চরিত্রের হুবহু নকল করেন নি। কারণ জগদ্রাম লিখেছেন আঠারো শতকের ভক্তিকাব্য এবং মধুসূদনের প্রয়াস ছিল উনিশ শতকের উপযোগী বীরকাব্য রচনার। তাই মেঘনাদবধে প্রমীলার জন্যে সুলোচনার চারিত্রিক ধর্মটুকু যথোপযুক্ত পরিবর্তিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। এর জন্যে কাশীরামের প্রভাব এলেও এসে থাকতে পারে।

প্রসংগক্রমে প্রমীলা চরিত্রের বীরাঙ্গনাসুলভ আচরণও বিবেচ্য হয়ে ওঠে। পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি, প্রমীলা বীরাঙ্গনা হয়েছে স্বামীমিলনেচ্ছায় কিন্তু সে স্বভাবত বীরবালা নয়; তার হৃদয় সত্যিকারের নারীসুলভ প্রেম, কোমলতা ও বিনয়ের ভাবে পূর্ণ। মধুসূদন স্বয়ং এ মহাকাব্য অবিমিশ্র বীররসে করেন নি। নিছক বীররস যে এ যুগে সম্ভব নয়, তিনি তা সম্ভবত জানতেন। কাব্যসূচনায় কবি সরস্বতী-বন্দনায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—'গাইব মা, বীররসে ভাসি মহাগীত!' কিন্তু যে-কাব্যে মূল ঘটনা অন্যায়যুদ্ধে নায়কের অকালপ্রয়াণ, সেখানে বীররস খুঁজতে যাওয়া গোঁয়ার্তুমি সুতরাং প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের প্রশ্নও অবান্তর। বীর ও করুণ রসের অঙ্গাঙ্গী সমন্বয়েই এ কাব্যের ভাব সংশ্লেষ গঠিত। কবি স্বয়ং এ সম্পর্কে লিখেছেন: 'You must not Judge of the work as a regular Heroic Poem, I never meant it such. It is a story, a tale, rather heroically told.' অতএব 'বীররসকে কবি করুণ রসে বদলেছেন' না বলে, 'করুণকাহিনীকে যথা সম্ভব বীর্যসহ বর্ণনা করেছেন' বলা উচিত। এই নিরিখেই প্রমীলা চরিত্রও বিশ্লেষ্য।

আবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। জগদ্রামের সুলোচনা-উপাখ্যানে বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদ অবগত হয়ে মেঘনাদ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার উদ্যোগ করতে সুলোচনা অজ্ঞাত আশংকায় কাতরতা প্রকাশ করে, তখন মেঘনাদ তাকে অভয় দিলেন যে কোনো সাধারণ যোদ্ধার আঘাতে তাঁর মৃত্যু সম্ভব নয়। শত্রুনিধনপূর্বক অবিলম্বে তিনি প্রত্যাবর্তন করবেন এবং তবে দৈবাৎ তাঁর যদি মৃত্যুই ঘটে, তবে তার কাটা হাত দুটি এসে অন্তত সে-সংবাদ সুলোচনাকে লিখে জানিয়ে যাবে। সেই রকম মধু-কাব্যের অভিষেক পর্বে (প্রথম সর্গে) প্রভাষা ধাত্রীর ছদ্মবেশ ধারিণী অম্বুরাশি-সুতার (লক্ষ্মী দেবী) মুখে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শুনে মেঘনাদের যুদ্ধ গমোনোদ্যোগের সাথে সাথে প্রমীলার প্রীতিপূর্ণ কাতরতা উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। এ কাব্যেও মেঘনাদ যুদ্ধযাত্রা পূর্বে প্রাণপ্রিয়া প্রমীলাকে রাঘব সংহারপূর্বক অবিলম্বে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এবং ইন্দ্রজিৎ-বিদায়ের পর সুলোচনার মত প্রমীলার হৃদয়ও অজ্ঞাত আশংকায় কাতর হয়ে উঠল। বিলাসকুঞ্জের প্রমোদলহরী থেমে গেল। মেঘনাদের প্রমোদশীলতা বিস্মৃত হয়ে মুহূর্তে ক্রোধ ও উত্তেজনায় পুষ্পাভরণ ফেলে রণসাজ পরে কর্তব্য পালনের সংকল্প নেওয়াটা ইতালীয় কবি ট্যাস্‌সোর Jerusalem Delivered কাব্যে Rinaldo-র আচরণ (Book XVI) এবং প্রমীলার আশংকা ও কাতরতা হোমরের Iliad কাব্যের Hector-এর যুদ্ধযাত্রা পূর্বে তৎপত্নী এন্ড্রোমেকির বিলাপের সঙ্গে তুলনীয় হলেও জগদ্রামের ইন্দ্রজিৎ সুলোচনার সঙ্গেই তার সাদৃশ্য অপেক্ষাকৃত বেশি।

জগদ্রামী রামায়ণে মেঘনাদের মৃত্যু ঘটলে তাঁর ছিন্ন করদ্বয় অঙ্গিকার রক্ষার্থে সুলোচনার দ্বারে এসে পৌঁছল। চেড়ী অর্থাৎ সহচরী মারফৎ সেই তথ্য জেনে, স্বামীর অজেয়ত্বের প্রতি দৃঢ় আস্থাবশত সুলোচনা সেই খবরে প্রথমে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল:

> হেন বাণী শুনি হাসি কয় সুলোচনা।
> মোর নাথে বধিতে আছয়ে কোন্‌জনা॥ (৩৩১পৃ)

মধুসূদনেও দেখতে পাচ্ছি, স্বামীর অপরাজেয়ত্বে প্রমীলার অগাধ আস্থা। মেঘনাদ অরিন্দম, অজিৎ, রথীন্দ্র-ঋষভ। বীরেন্দ্র কেশরী। দেবরাজ ইন্দ্রকে তিনি পরাজিত করেছিলেন, তিনি ইন্দ্রজিৎ। কোন বিরুদ্ধ শক্তি তার সঙ্গে যুঝতে পারে নি। তাই প্রথমে সুলোচনা বা প্রমীলার বিশ্বাসভঙ্গ হয় নি। কিন্তু পরক্ষণেই দ্বিতীয় দাসীর মুখে একই খবর শুনে এক অজ্ঞাত আশংকায় সুলোচনার বুক কেঁপে উঠল, ব্যাকুল হয়ে উঠল এবং কিছু দুর্লক্ষণ কল্পনা করে সে ম্রিয়মাণ হল:

> 'বসন ভূষণ কেশ বিচলিত হৈছে।
> মন্দগতি ত্যেজে নিরানন্দে দ্রুত যেছে॥' (৩৩ পৃ)

স্বামীর মৃত্যুকালে প্রমীলার হৃদয়ও আশংকাদোদুল হয়ে উঠেছে। সুলোচনার মত সেও—

'মুছিলা সিন্দুরবিন্দু সুন্দর ললাটে।' (ষষ্ঠ সর্গ)

মেঘনাদের মৃত্যুকলে সুলোচনা ও প্রমীলার একই অনুভূতি হয়েছে। বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, জগদ্রামের 'দক্ষ অঙ্গ নাচয়ে নাচয়ে দক্ষ আঁখি' (৩৩১পৃ) এবং মধুসূদনের কাব্যে ষষ্ঠ সর্গে 'প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল' (৬৩৪ ছত্র) এই উক্তিদ্বয়ের প্রকট সাদৃশ্য। মেঘনাদবধে প্রমীলা চরিত্রে জগদ্রামের সুলোচনার প্রতিধ্বনি কি প্রমাণ করে না যে, অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনাও মধুসূদন এই রামায়ণ থেকে সংগ্রহ করেছেন ?

এরপর দেখি, মেঘনাদের মৃত্যু-সত্য অবগত হলে সুলোচনা ভেঙ্গে পড়ে এবং ছিন্ন হাত দুটি নিয়ে গৃহত্যাগ করল। এখানেও প্রাসঙ্গিক বর্ণনার বহুলাংশ মেঘনাদবধে প্রতিফলিত হয়েছে। জগদ্রামের ভাষায় :

'গৃহ ছাড়ি সুলোচনা চলিল যখন।
হাহাকার করি কান্দে পুরবাসীগণ॥
বন্ধুবান্ধবেতে সবে উচ্চরবে কান্দে।
দাস দাসীগণ কেউ কেশ নাহি বান্ধে॥

(৩৩১ পৃ)

যার পদ চন্দ্রসূর্য দেখিতে নাহি পায়।
হেন সুলোচনা সে নগরে চলে যায়॥
পুরজন পরিজনে দোলা ধরি যায়।
নানা বাদ্য বাজে গুণিগণে গীত গায়॥

(৩৩৩ পৃ)

মেঘনাদবধে প্রমীলার নগরত্যাগের বর্ণনা এর সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্যসম্পন্ন। নবম সর্গে মধুসূদন লিখেছেন :

'...অবিরল ঝরে অশ্রুধারা
তিতি বস্ত্র, তিতি অশ্ব, তিতি বসুধারে।
উচ্ছাসিছে কোন বামা ; কেহ বা কাঁদিছে
নীরবে ; চাহিছে কেহ রঘুসৈন্যপানে'

পুনরায় : ...'ঢুলাইছে চামর চৌদিকে
কিঙ্করী, চলিছে সঙ্গে বামাব্রজ কাঁদি
পদব্রজে ; কোলাহল উঠিছে গগনে।'

নবম সর্গেই : 'ছড়াইছে খই, কড়ি, স্বর্ণমুদ্রা আদি
অর্থ, দাসী, সকরুণে গায়িছে গায়কী ;
পেশল উরস হানি কাঁদিছে রাক্ষসী।'

এবং : 'সকরুণ গীতে গীতি গাহিছে কাঁদিয়া
রক্ষ দুঃখে! স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইছে কেহ'

মেঘনাদপ্রয়াণের খবর পেয়ে জগদ্রামের সুলোচনা শোক-কাতরতায় :

'কাঁদিতে কাঁদিতে সুলোচনা ঘরে গেল।
ধন, ধেনু, বসন, ভূষণ দান কৈল॥
বীতরাগ জনে যেন বিষয়ে বিরাগ॥

(৩৩৩ পৃ)

মধুসূদন-কাব্যের সংক্রিয়া সর্গেই, চিতারোহণকালে :

·· 'প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন-আভরণ, বিতরিলা সবে।'

॥ পাঁচ ॥

প্রমীলার পরিণতি সুলোচনার পরিণতিরই অনুরূপ—অর্থাৎ উভয় কাব্যেই মেঘনাদপত্নীকে পতির সঙ্গে চিতা-রোহণ দেখানো হয়েছে, এবং সহমরণ-সংশ্লিষ্ট বর্ণনার বহুলাংশ বিশেষ সাদৃশ্যযুক্ত। রামের সঙ্গে মেঘনাদপত্নীর সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গটি আগেই তুলনা করেছি। কিন্তু তৎ-পূর্বের প্রমীলা-মেঘনাদের লীলাবিহার দৃশ্যটির সম্পর্কে দু-চার কথা বলা দরকার। এটি জগদ্রামী কাব্যে নেই। তৃতীয় সর্গের সূচনায় লঙ্কাপুরীর বহির্ভাগে স্থাপিত মেঘনাদ-প্রমীলার নিজস্ব লীলাবকাশ যাপনের কুঞ্জের যে বর্ণনা তা অন্য কোন রামায়ণেও নেই। সেটা যদি ট্যাসসোর জেরুজালেম লিবারতো কাব্য থেকে কুহকিনী আরমিডার উপবনের সারূপ্যে কল্পিত হয়েছে তবে ঐ সর্গেরই 'অশ্রু আঁখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে। কভু, ব্রজ-

কুঞ্জ-বনে, হায় রে, যেমনি / ব্রজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে / পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মুরলী' (৬ ছত্র) বর্ণিত দানব-নন্দিনী শক্তির অংশে জন্মজাত প্রমীলার প্রেম-সিঞ্চিত কোমল নারীমূর্তিটি মধুসূদনের কল্পনায় কোথা থেকে এল ? এই রকম পতিগতপ্রাণা প্রণয়দুর্বল নারী-মূর্তির সঙ্গে স্বভাবতই বৈষ্ণব কবিতার রাধার কথা মনে পড়ে। অর্থাৎ সেটি ব্রজলীলার অনুরূপ। স্বয়ং মধুসূদন প্রমোদকাননে অশ্রুবিবশা প্রমীলার বিরহোৎ-কণ্ঠিতা-দশা বোঝাতে কৃষ্ণ-অদর্শনে কাতরা রাধার উপমা ব্যবহার করেছেন। কুঞ্জবনের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী-বর্ণিত কদম্বফুল এবং কৃষ্ণের সঙ্গে মেঘনাদ উপমিত। অরুণ-কুমার বসু লিখেছেন : 'পদাবলী অনুষঙ্গের প্রতি কবির একটি দুর্বলতা ছিল, বিরহিণী রাধার বিলাপ অবলম্বনেই তিনি ব্রজঙ্গনা কাব্য লিখিয়াছেন।' কিন্তু এতে এ প্রমাণ হয় না যে রাধাই প্রমীলা চরিত্রের একমাত্র প্রেরণ। কারণ এ কাব্যের অন্যত্রও বৈষ্ণব কাব্যের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। দ্বিতীয় সর্গে মহাদেবের ধ্যানস্থান শ্যামাংগ বা গোগোসন পর্বতকে তিনি চন্দন চর্চিত পীতবসন ময়ূরপুচ্ছ-চূড় বনমালীর সংগে উপমিত করেছেন (১২৬-৩২ ছত্র)। বস্তুত মধুসূদনের সৌন্দর্যকল্পনাময় অন্তঃপুরে হরিৎধড়া পরিহিত মুরলী-অধর শ্রীকৃষ্ণ ও কদম্বকুঞ্জে ভ্রাম্যমানা রাধিকার মঞ্জুনাশী বিগ্রহদ্বয় চিত্রিত ছিল। তৃতীয় সর্গে 'কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ / বিরহিণী' (৮) বাক্যেও প্রমীলার ঘরে ঢুকে পরমুহূর্তে বেরিয়ে আসার বৈরাগ্যদশাটি পদাবলীর রাধার মত 'সদাই ধেয়ানে . লঙ্কাপানে' (১০) পংক্তিদ্বয়েও পদাবলীর কথা মনে করিয়ে দেয়। স্মর্তব্য যে, বৈষ্ণব দার্শনিকদের পঞ্চভাবের (দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, শান্তি) সাধনায় মধুসূদন বিশ্বাসী ছিলেন।

এইরকম কোন কোন স্থলে মধুসূদন-কাব্যে অন্য কাব্যের প্রভাব থাকলেও তিনি অধিকাংশই নির্ভর করেছেন জগদ্রামের ওপর। তৃতীয় সর্গে রাম-সন্নিধানে প্রমীলার গমনের পরিকল্পনা মধুসূদন জগদ্রাম থেকেই নিয়েছেন, এমত ধারণাও অসঙ্গত কিছু নয়। রামের কাছ থেকে মেঘনাদের কাটামুণ্ডটি উদ্ধারের জন্য জগদ্রামের সুলোচনা প্রথমে রাবণের সাহায্য প্রার্থনা করেছে (কারণ সে গুরুজন লঙ্ঘন করবে না), কিন্তু রাবণের এলোমেলো উত্তরে সুলোচনা মন্দোদরীর কাছেও বিফল হয়ে ভাবল :

'কুলশীল লাজ ভয়ে কি কাজ করিব।
মাগিতে স্বামীর মাথা রাম কাছে যাব ॥
এ ভাবি সবার পদে করিয়া প্রণাম।
দোলা ধরি যান যথা আছেন শ্রীরাম ॥
দশ হাজার রাজার রাণীরা যায় সঙ্গে।
লাজ ভয় পাশরিল শোকের তরঙ্গে ॥ (৩৩৪ পৃ)

রাম সুলোচনা এবং রাম প্রমীলার সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে এক দিক লঘুগুরু পরিস্থিতিগত সাদৃশ্য উভয় কাব্যে দ্রষ্টব্য। জগদ্রামের লঙ্কাকাণ্ডে সুলোচনা প্রথমে জাম্বুবানের সাক্ষাৎ পেল ; মধুসূদনের কাব্যে হনুমান, দূতী নৃমুণ্ডমালিনী ও প্রমীলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। জগদ্রামী কাব্যে পরে সবিভীষণ শ্রীরাম সুলোচনার প্রার্থনা পূরণ করেন, মেঘনাদবধেও সবিভীষণ শ্রীরাম তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। 'প্রমীলার উৎস' প্রবন্ধে বিশ্বনাথ বাবু যথার্থ তুলনা করে লিখেছেন 'সুলোচনার প্রথম আবির্ভাবে কপিসেনার বিস্ময়বোধ, মেঘনাদবধে প্রমীলা-দর্শনে হনুমানের এবং দূতীদর্শনে কপিসেনার বিস্ময়বোধের অভিব্যক্তির সঙ্গে প্রকট সাদৃশ্য-যুক্ত।' জগদ্রাম লিখেছেন :

'আগে আগে বিভীষণ পিছে সুলোচনা।
ভূমিতে দাঁড়ায়ে দেখে যত কপিসেনা ॥
একে রাজবধূ তারে বয়েসে যুবতী।
অতি রূপবতী, তাহে পতিব্রতা সতী ॥
সূর্যসম তেজ অংগ বিজলীর ছটা।
রূপে আঁখি মিলিতে না পারে কপিঘটা ॥' (৩৩৮)

মধুসূদন-কাব্যে প্রমীলার প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ

এইভাবে বিধৃত হয়েছে :

'আগে আগে চলে হনূ পথ দেখাইয়া।
চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে।
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশাকালে
হেরি অগ্নিশিখা ঘরে; হাসিলা ভামিনী
মনে মনে। একদৃষ্টে চাহে বীর যত
দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে (তৃতীয় সর্গ)

বিশ্বনাথবাবু দেখিয়েছেন, জগদ্রামের বর্ণনার অলংকার—'সূর্যসম .. ছটা'র সংগে মধুসূদনের প্রাসংগিক বর্ণনা—'স্বর্ণপ্রভা অংশুরাশিতে' পর্যন্ত সাদৃশ্য আছে।

এ ছাড়া মেঘনাদবধের নবম সর্গে দেখতে পাই পৌলস্ত্য রাবণ তাঁর পুত্রের সৎক্রিয়ার জন্য রামের কাছে সাত দিনের যুদ্ধবিরতির আবেদন জানিয়েছেন :

'—তিষ্ঠ তুমি সসৈন্য এ দেশে
সপ্তদিন, বৈরিভাব পরিহার, রথি!
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে'

জগদ্রামী রামায়ণেও এই পরিস্থিতিটি বিদ্যমান। তবে মেঘনাদবধ কাব্যে বিগ্রহবিরতি যেখানে সাত দিন দীর্ঘায়িত হয়েছে, সেখানে জগদ্রামের কাব্যে মাত্র একদিনের যুদ্ধবিরতি। সেখানে সুলোচনা স্বয়ং রামকে বলছে :

'মে অভাগী লাগি প্রভু শরণ তোমে।
রণ কর নিবারণ আজিকার দিন॥

এই নিবেদনে : রাম কন আজি রণ নিবারণ কৈল।

(৩৩৯ পৃ)

অবশ্য, হোমরের Iliad কাব্যেও Priam তাঁর পুত্র Hector-এর শেষকৃত্যের জন্য Achilles-এর কাছে ১১ দিন যুদ্ধবিরতির আবেদন জানিয়েছিলেন, সেটা ভুললে চলবে না। কিন্তু মেঘনাদবধের সঙ্গে জগদ্রামী-রামপ্রসাদী রামায়ণের মিলটাই এখানে অপেক্ষাকৃত বেশি স্পষ্ট। কারণ, এই আবেদনোত্তর জগদ্রামী কাব্যে আরও দুটি ছত্র পাচ্ছি, সুলোচনার প্রার্থনায় স্বয়ং রামচন্দ্র মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিতে সদলবলে যোগদান করলেন—।

'একভিতে রাক্ষস সহিত দশানন।
একভিতে কপিসাথে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥

(৩৪০ পৃ)

মেঘনাদবধেও নবম সর্গে অঙ্গদ রামের প্রতিনিধি-স্বরূপ দশলক্ষ্য রথী নিয়ে মেঘনাদের শেষকৃত্যে যোগদান করলেন :

'দশ শত রথী সাথে চলিলা সুরথী
অংগদ সাগরমুখে।'

।। ছয় ।।

পরিশেষে মেঘনাদ-পত্নীর সহমরণ প্রসঙ্গে আসি। লাভের কথা, এই সূত্রসন্ধানের ফলে মেঘনাদবধ সম্পর্কে আগ্রহী পাঠক-গবেষকদের সামনে একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন-খড়্গ উত্তোলিত হয়ে ওঠে। সেটা হল, আধুনিক বাংলার প্রথম জাতীয় মহাকবি, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলনযজ্ঞের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত, ক্ষুরধারবুদ্ধি ও যুক্তিবাদী, শিল্পের অভিনব সংস্কারক, যিনি ছিলেন ঊনিশ শতকের নবজাগরণ বা রেনেশাঁর প্রেরণাদীপ্ত আধুনিক যুগের আদিকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর পরমশিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের খনিত পথে সিন্ধুকল্লোল আবির্ভূত অন্তঃপুরিকা নারী-মুক্তির বাণী-প্রবাহক, সেই মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর কাব্যে প্রমীলার সহমরণ দেখালেন কেন?

অনেকের মতে রাবণের জীবনের ট্যাজেডিকে তীব্রতর করে তুলতেই প্রমীলার সহমরণ জরুরী ছিল। আবার অনেকের মতে, প্রমীলার সহমরণ বস্তুত তার প্রেমিকা সত্তারই বহিঃপ্রকাশ, যা মধুসূদনের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির উজ্জ্বল প্রমাণ। প্রেমসর্বস্ব প্রমীলার মৃত স্বামীর চিতায় প্রাণাহুতি স্বাভাবিক পরিণতি। গার্গীদেবী লিখেছেন, 'নারী জাগরণের সংগে এ কল্পনার বিরোধ নেই—স্বাধীন ইচ্ছেতেই প্রমীলা অনুস্মৃতা।' কিন্তু এ ব্যাখ্যার কোনো লজিক্যাল ভিত্তি নেই। প্রসংগত, বিশ্বনাথ বাবু লিখেছেন, 'তাই যদি মধুসূদনের সচেতন উদ্দেশ্য হত, তবে চিতায় অগ্নিসংযোগের সংগে সংগে

উদ্বেল করুণরসের মধ্যেই তিনি কাব্য সমাপ্ত করতেন, কিন্তু তা না করে, তিনি লিখলেন :

'ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইল সত্বরে !
সহসা জ্বলিল চিতা । সচকিতে সবে
দেখিলা আগ্নেয় রথ; সুবর্ণ আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী
দিব্যমূর্তি ! বামভাগে প্রমীলা রূপসী
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে ;
চিরসুখ হাসিরাশি মধুর অধরে ।'

এই বর্ণনা কি মধুসূদনের তথাকথিত উদ্দেশ্যকে শুধু ক্ষুণ্ণই করেনি ? জীবনের পরে মহাজীবনের এই আশ্বাসের অস্তিত্বই সংস্কৃত সাহিত্যে আধুনিক ট্র্যাজিডি-সৃষ্টির অন্তরায় হয়েছিল, এ কথাই কি আমরা বলি না ? সেইজন্যেই সন্দেহ জাগে, সম্ভাব্য কোন বহিঃসূত্র থেকে বৈচিত্র্যের খাতিরে প্রভাবরূপেই বুঝি এই প্রসঙ্গ মধুসূদনে এসেছে। এবং তাই এই মধ্যযুগীয় বিশ্বাসের প্রচারকে নারীমূর্তির কল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য । আসলে 'প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাব না ফাঁকি'—এই গুরুবাক্য মেনে নিয়ে একথা স্বীকার করাই ভাল যে, মধুসূদনের মানসে এই নবলব্ধ রেনেশাঁস-চেতনার সর্বত্র স্ববিরোধের উর্দ্ধে ছিল না । (এ বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর 'সাহিত্যচর্চা' এবং বিষ্ণু দে-র 'মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা' প্রভৃতি গ্রন্থের সমীক্ষা অনুধাবনীয়)। আর উদ্ধৃত অংশটি মধুসূদন যে পৌরাণিক প্রতিবেশ রচনার জন্য অন্তর্ভুক্ত করেন নি, এ সিদ্ধান্তের আশা করি কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই ।

আসলে, উপরোক্ত প্রশ্নের সরল সমাধান আমরা পেয়ে যাই যখন দেখি, জগদ্রামী রামায়ণের সঙ্গে মেঘনাদ-বধের কাহিনীর এখানেও কোন বৈসাদৃশ্য নেই, বরং সহমরণের বিবরণে উভয় কাব্যে আক্ষরিক অর্থেই বিস্ময়কর মিল আছে। জগদ্রামের কাব্যে, স্বামী মেঘনাদের মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাত হয়ে শোকাবেশে :

'কাঁদিতে কাঁদিতে সুলোচনা ঘরে গেল ।
ধন, ধেনু, বসন, ভূষণ দান কৈল॥' (৩৩৩ পৃ)

মধুসূদনের কাব্যে, নবম সর্গে চিতারোহন কালে শোকাবেশে :

'মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন-আভরণ, বিতরিলা সবে।'

জগদ্রামের সুলোচনা চিতারোহণের আগে –

'শ্বশুর শাশুড়ী পদে প্রণাম করিল।' (৩৪০ পৃ)

মধুসূদনের প্রমীলাও একই ভাবে—

'প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী ... . '

জগদ্রামের সুলোচনার স্বামীসহ মরণের সঙ্গে কিছু কিছু বিশেষ ঘটনাও মধুসূদনের কাব্যে কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ ভিন্নভাবে বিন্যস্ত দেখতে পাই । মধুসূদন যদি প্রমীলা প্রসঙ্গে বেশীরভাগ পরিস্থিতি জগদ্রাম থেকে নিয়ে থাকেন তবে সংশ্লিষ্ট সহমরণের বর্ণনাই বা সেখান থেকে নেবেন না কেন ? জগদ্রামে সুলোচনা শ্বশুর রাবণ ও শাশুড়ী মন্দোদরীকে প্রণাম করার পরেই—

'নতি করি বলে সতী না করি এ ভয় ।
এই বলি চিতাপাশে করিল বিজয় ॥
রাম রাম বলি সতী চিতায় চাপিল ।
পতি হস্ত মস্তক আপন কোলে নিল ॥
এ সময়ে দশানন বলয়ে রাক্ষসে ।
চিতায় ঢালহ ঘৃত কলসে কলসে ॥ (৩৪০ পৃঃ)

মেঘনাদবধে সহমরণের দৃশ্যে প্রথমে 'কহিল বাহকে/ সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে'। অতঃপর। গুরুজন পদে প্রণাম নিবেদন করে—

'চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন !)
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে ;
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী-প্রদেশে'

জগদ্রামী কাব্যে—

'হেথা সুলোচনা বসি চিতার উপরে ॥
শ্যামল সুন্দর রূপ দেখিয়া দেখিয়া ।

'[illegible] রাম নাম জিয়া ॥
[illegible] অগ্নি লইয়া চিতায় লাগাল।
পর্শমাত্র বহ্নিশিখা গগনে উঠিল ॥' (৩৪১ পৃ)

মধুসূদনের কাব্যে—

'বাজিল রাক্ষসবাদ্য ; উচ্চ উচ্চারিল
বেদ-বেদী ; রক্ষোনারী ছিল হুলাহুলি ;
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব ! পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে।
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী ..'

এখানে বাল্মীকি রামায়ণের রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বর্ণনার প্রভাব থাকলেও মধুসূদন প্রমীলার সহমরণ দেখাতে আবর্তিত হয়েছেন মূলত জগদ্রামকে ঘিরে। এই সংক্রিয়া পর্বের শেষ দিকে মেঘনাদ ও তৎপত্নীর চিতা ধৌত করা হল, তা দুই কাব্যেই বর্ণিত হয়েছে। জগদ্রামের কাব্যে আছে—

'সময়ে উচিত ক্রিয়া কৈল লঙ্কাশ্বর।
সবান্ধবে উচ্চৈস্বরে কান্দি গেল ঘর ॥'

মেঘনাদবধের শেষ দৃশ্য—

'করি স্নান সিন্ধু নীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে'—
অবশ্য এই অংশে হোমারের Iliad-কেও মনে
পড়ে যায় :

'All Troy then moves to Priam's court again
A solemn, silent, melancholy train'.

তবে মেঘনাদবধে জগদ্রামের প্রভাবই যখন অপেক্ষাকৃত বেশি জলজ্বলে তখন হোমারের প্রভাবকে স্বীকার করা কি সঙ্গত ? প্রমীলা যদি মধুসূদনের মনোঃপ্রসূত দুহিতা হয়, তবে জগদ্রামের সুলোচনাই কেন বারংবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এই চরিত্রে ? সুলোচনার মত প্রমীলাও দানব-মহাবীর দেবদ্রোহী-কালনেমির অগ্নিস্বরূপা কন্যা, রাবণের পুত্রবধূ এবং ইন্দ্রজিতের রমণী ও প্রেয়সী। সুলোচনার মত প্রমীলাও যেন চিরন্তনী রমণী, চির-সৌন্দর্য-চিরবীর্য-চিরপ্রেমের মানবীমূর্তি। দুজনেও কখনও বিরহিণী শোকতপ্তমানা, কখনও বীরাঙ্গনা রণরঙ্গিণী, কখনও প্রেমাতুরা রসরহস্যময়ী, কখনও বা আশংকাতাড়িতা কুলবধূ এবং পরিশেষে দুজনেই মৃত-ভর্তৃকা ও সাধ্বী সহমৃতা—দুটি কাব্যেই কখনও হুবহু কখনও বিক্ষিপ্তভাবে একই সাজে একই বেশে একই পরিবেশে দুজনকে দেখানো হয়েছে। সুতরাং প্রমীলা মধুসূদনের পূর্বসূত্রহীন 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি' মানস-দুহিতা তো নয়ই, উপরন্তু আঠারো শতকে জগদ্রামী রামায়ণের রামপ্রসাদসৃষ্ট মেঘনাদ পত্নী সুলোচনাই উনিশ শতকে মধুসূদনের কাব্যে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে বলে মেনে নিতেই হবে।

॥ সাত ॥

এখন প্রশ্ন, মেঘনাদবধ রচনার পূর্বে মধুসূদন জগদ্রামী রামায়ণের সংস্পর্শে এসেছিলেন কিনা এবং কীভাবে ? মধুসূদন সেই রামায়ণ পড়েছিলেন না শুনেছিলেন ? প্রথমে বিচার্য, মধুসূদন কৃত্তিবাস-কাশীরাম ছাড়া অন্য কোনো প্রাচীন বাংলা কাব্য পড়তেন কিনা ! সপ্তদশ শতাব্দীর কাশীরাম, জগদানন্দ, ঘনারাম, ময়মনসিংহ গীতিকা, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ; প্রাচীন ও মধ্যযুগের সন্ধিকালের গোবিন্দ অধিকারী, মদনবাউল, দাশরথী রায় এবং উনিশ শতক বা আধুনিক যুগের আদি কবি ঈশ্বর গুপ্ত তথা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যধারার সঙ্গে মধুসূদনের পরিচয় ঘটে বাংলা কাব্যের ঐশ্বর্যকে আয়ত্তাধীন করার মাধ্যমেই এবং সেটাও নেহাৎ উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত কতকগুলি ছন্নছাড়া চিত্রকল্প বা অনুপ্রাসজনিত শব্দসংগীতেই সীমাবদ্ধ / প্রথম দিকে মধুসূদন বাংলা পড়া এবং লেখা থেকে বিরত ছিলেন। কারণ প্রাচীন বঙ্গকাব্যে (কৃত্তিবাস, কাশীরাম ছাড়া) কিছু সম্পদ থেকে থাকতে পারে, এমত ধারণা তাঁর ছিল না। ঠিক এই কারণেই অনেকে জগদ্রামী রামায়ণের সঙ্গে তাঁর যোগসাদৃশ্য সম্পর্কেও সন্দিহান হয়েছেন।

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (৩য় সং ৩৭৮) গ্রন্থে মধুসূদনের ওপর জগদ্রামের প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন : 'এই রামায়ণে প্রমীলার কাহিনী, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রা ও নিধনের পর শোকযাত্রা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর সঙ্গে মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের কোন কোন বর্ণনার প্রায় হুবহু মিল আছে। এ মিল কেন এবং কি ভাবে ঘটল তা বলা যায় না। আধুনিক কালের ইংরেজিয়ানার কবি মধুসূদন তাঁর পূর্ববর্তী শতাব্দীর বর্ধমানের এক অজ্ঞাতপরিচয় গ্রাম্য কবির পুঁথি পড়েছিলেন বলে মনে হয় না' (৩১২-১৩ পৃ)।

অসিতবাবুর মন্তব্যকে যুক্তি হিসেবে ধরে নিলে, সেই রামায়ণের সঙ্গে মধুসূদন-কাব্যের মিলকে নিছক কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দিতে হয়। কিন্তু সত্যি কি তাই? মনে রাখতে হবে, অসিতবাবু যখন 'অজ্ঞাত-পরিচয় গ্রাম্যকবি' জগদ্রামের প্রভাবকে স্বীকার করতে পারেন নি, তখন তাঁর চিন্তাগত কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। কারণ রাণীগঞ্জের সঙ্গে মধুসূদনের যোগাযোগের প্রশ্নটি তিনি খতিয়ে দেখেন নি এবং তাই তিনি, তৎকালীন পরিস্থিতিতে যথোচিত মন্তব্য করেছিলেন অনেকটা ডিপ্লোম্যাটিক কায়দায় : 'এ মিল কি করে ঘটল তা বলা যায় না।' অর্থাৎ তখনই তিনি এ বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন।

কিন্তু পরবর্তীকালে মধুসূদনের রাণীগঞ্জের শিহাড়-সোলের রাজবাড়িতে যোগাযোগের তথ্যটি বিবেচনার পর সিদ্ধ হয়েছে। তিনি যদিও জীবনের শেষ পর্বে ১৮৭২খ্রী এর কয়েকটি মাস মানভূমের পঞ্চকোট রাজ্যের আইন-উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত ছিলেন, তবুও মানভুম-পুরুলিয়া (অধুনা ধানবাদ পুরুলিয়া) অঞ্চলের সঙ্গে তাঁর ব্যাপক যোগাযোগ তৎপূর্বে মেঘনাদবধ লেখার আগেও ছিল। নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর 'মধুস্মৃতি' (২য় সং ১৩৬১) গ্রন্থে জানিয়েছেন পুরুলিয়া থেকে প্রত্যাগমনের সময় মধুসূদন নিজের 'সোদরোপম বন্ধু' শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর মালিয়ার সাদর নিমন্ত্রণে রাণীগঞ্জ হয়ে ফিরছিলেন। রাণীগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক ড: আবদুস সামাদ শিহাড়সোলের রাজবাড়িতে অনুসন্ধান করেও এ তথ্য দিয়েছেন।

আমি জন্মসূত্রে জগদ্রাম-বংশজাত হওয়ায় এবং আমাদের আদিগ্রাম ভুলুই তথা মেজিয়া, অর্দ্ধগ্রাম, কালিকাপুর, বল্লভপুর, রাণীগঞ্জ, শিহাড়সোল প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার দরুণ আমার বদ্ধমুল ধারণা হয়েছে যে বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমানের এইসব অঞ্চলে জগদ্রাম মোটেই 'অজ্ঞাতপরিচয়' ছিলেন না বা এখন নন, বরং এতদঅঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যেও সেই রামায়ণ সমধিক সমাদৃত। এ সব অঞ্চল তো বটেই এমন কি ধানবাদ পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলাতেও রামপ্রসাদী আমল থেকেই সেই কাব্য বিভিন্ন উপলক্ষ্যে গীত হয়ে আসছে। জগদ্রামী রামায়ণ শিহাড়সোলের রাজবাড়িতে ছিল অত্যন্ত প্রিয় বস্তু। রাণীগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি সেই রাজবাড়ির বর্তমান প্রধান, কুমার জীবনলাল মালিয়ার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনা করে একটি চিঠিতে লিখেছেন : 'জীবনবাবুর প্রপিতামহ রাজা বিশ্বেশ্বর মালিয়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন (শ্রীমধুসূদন) এবং সাল তারিখযুক্ত নথিবদ্ধ দলিল না থাকলেও মধুসূদন যে রাজবাড়িতে মধ্যে মধ্যে আসতেন, পারিবারিক সূত্রে এই তথ্য জীবনবাবুর জানা আছে। তাছাড়া জগদ্রামের কাব্যও রাজবাড়িতে পড়া হত বলে তিনি জানিয়েছেন।' (দেশ ৪ সেপ্টে '৮২)

মধুসূদনের মত দুর্দ্ধর্ষ অনিসন্ধিৎসু পাঠক-কবির পক্ষে রাণীগঞ্জে এলে, জগদ্রামের নাম শুনতে পারাই আশ্চর্য! বিশ্বনাথবাবুর মতে, 'মধুসূদন যেখানে যার কথা শুনেছেন, তাকেই বাজিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছেন, প্রয়োজনবোধে উপদান-চয়ন করেছেন। জগদ্রাম সম্বন্ধেও তাই ঘটেছে।' (ঐ)। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে : একবার বা বারবার শুনলেই কাহিনী বা বর্ণনাগত পুঙ্খানুপুঙ্খ

মনে থাকা কি সম্ভব ? এর জবাবে বিশ্বনাথবাবু লিখেছেন 'রাজবাড়িতে এইরূপ কাব্যগান শুনে মধুসূদনের পক্ষে প্রয়োজনবোধে কিছু খুঁটিনাটি স্মরণ রাখা অসম্ভব ছিল না। (ঐ)। এবং 'জগদ্রামের লঙ্কাকাণ্ড এমন বিশাল কিছু নয়, মধুসূদনের কাব্যের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত অংশ সংক্ষিপ্ততর'।

কিন্তু জগদ্রামী রামায়ণ শুনে তার কাহিনীর মূল অংশটি মধুসূদন নিয়ে থাকলেও পংক্তি বা শব্দগত খুঁটিনাটি বিষয় স্মরণ রাখার সম্ভাবনায় সন্দেহ জাগে, তাই মধুসূদনের পক্ষে উক্ত রামায়ণটি পড়ে থাকার সম্ভাবনাটিকে আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে। প্রথমে বিচার্য, মেঘনাদবধ লেখার আগে জগদ্রামী রামায়ণ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা? আমরা দেখেছি, মেঘনাদবধের রচনাকাল ১৮৬০ এর এপ্রিল থেকে ১৮৬১-র জুন। আর জগদ্রামী রামায়ণ কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশ পায় (সম্ভবত) ১৮০৭ সালে। কিন্তু এই প্রকাশকালের প্রমাণিকত্বে অনেকে অবিশ্বাস করেছেন (আমার কাছেও তেমন তথ্যাগত প্রমাণ নেই), কারণ রেভারেণ্ড জে লং সাহেব Senders, Cones & Co. ৬৫, কালীতলা থেকে ১৮৫৫ খ্রী এ 'A Descriptive Catalogue of Bengali Works' নামে গ্রন্থে ১৮০০ থেকে ১৮৫৫ পর্যন্ত মুদ্রিত ১৪০০ পুস্তকের বিবরণী প্রকাশ করেন সেই 'বঙ্গ সাহিত্যের সর্বপ্রধান আলোকবর্তিকায় জগদ্রামী রামায়ণের উল্লেখ নেই; মৎ প্রণীত 'Bengali Prose Style' বা অধ্যাপক সুশীলকুমার দে-র ১৮০০-২৫ পর্যন্ত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-সম্বলিত ৫০০ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ ইংরেজি বইটিতেও তার উল্লেখ নেই; এবং পরবর্তীকালে প্রকাশিত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা থেকে তথ্য সংকলিত পুস্তক প্রকাশের বিবরণীতেও কোথাও এ বইয়ের নাম নেই। তবে কি মেঘনাদবধের পূর্বে সেটি প্রকাশ পায় নি? এর প্রামাণিকতায় আমাদেরও সন্দেহ আছে। তবুও, মধুসূদনের পক্ষে সে-কাব্য পড়ে থাকার সম্ভাবনাটিকে নাকতোলা করা যায় না, কারণ তিনি মাঝে মধ্যে শিহাড়সোলের রাজবাড়িতে যেতেন এবং সেখানে রামায়ণটি পড়া হত। ইচ্ছে করলে রাজবাড়িতে পুঁথি আনিয়ে পড়াও কঠিন ছিল না। অনেকের সন্দেহ, 'মধুসূদন বাংলা পড়তেন ঠিকই, তবে তা ছাপা বই। তাঁর বাংলা হরফে লেখার অভ্যাসই তেমন ছিল না—যার ফলে লিখতে গেলে অনেক বর্ণাশুদ্ধি ঘটত, প্রায়ই তিনি পণ্ডিতদের দিয়ে লিখিয়ে নিতেন। বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গের যে কপি পাঠিয়ে 'The copy I enclose, though neatly written is full of bad speaking' বলে মার্জনা চেয়েছিলেন সেটি সম্ভবত দীননাথ ধরের নকল করা। তাছাড়া, শিক্ষা বা চর্চা ছাড়া প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার করা যায় না এবং মধুসূদন সে-চেষ্টাও কখনও করেন নি।'

এ যুক্তি সন্তোষজনক নয়। কারণ, পুঁথিপাঠ তেমন অসাধারণ প্রশিক্ষণসাপেক্ষ নয় এবং হলেও প্রয়োজনমত পণ্ডিতদের সাহায্যে মধুসূদন তার পাঠোদ্ধারে সক্ষম হতেন নিঃসন্দেহে। একথা ঠিক, উরোপ প্রবাসের পর দেশে যখন বাংলা কাব্যনাট্য নিয়ে তিনি মগ্ন, তখনও জীবিকা-রূপে পুলিস-কোর্টে চাকরী, নানা ভাষা চর্চা ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকার দরুণ পুঁথি পড়া মধুসূদনের পক্ষে অসম্ভবই ছিল। কিন্তু তবুও, বিশ্বনাথ বাবুর ভাষায়, 'মাদ্রাজ বাসের স্বল্প কয়েক বছরে মধুসূদন যদি চাকরী, ভাষা-শিক্ষা, দেশী-বিদেশী ধ্রুপদী সাহিত্য পাঠ, ইংরেজি কাব্য-রচনা, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদির পরেও স্থানীয় সংস্কৃত হেমচন্দ্রীয় রামায়ণ ও তামিল ভাষায় আঞ্চলিক কম্ব রামায়ণ পড়ে থাকতে পারেন, তবে কলকাতায় বা ভ্রমণাবকাশে রাণীগঞ্জে ঐটুকু অতিরিক্ত কাজও তাঁর পক্ষে করা অসম্ভব কিছু ছিল না। জগদ্রামের লঙ্কাকাণ্ড তেমন বিশাল কিছু নয়। মধুসূদনের কাব্যের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত অংশ সংক্ষিপ্ততর।'

পরিশেষে বলি, মধুসূদনের ওপর জগদ্রামের প্রভাব সম্পর্কে কোন ইতিহাস বা তথ্যনির্ভর প্রমাণ কোথাও পাই নি। কিন্তু বিনীত জিজ্ঞাস্য, জগদ্রাম-মধুসূদন সম্পর্ক ছাড়া আর কোন তথ্যনির্ভর প্রামাণিক যুক্তি আছে কি? যদি তা নিকট কিংবা দূর ভবিষ্যতে পেয়েও যাই তবু কি উভয়ের সম্পর্কটি একেবারে অস্বীকার করা যাবে? যেটুকু পেয়েছি তাই কি যথেষ্ট নয়?

●

সূত্রচয়ন :

১। অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং এন ব্যানারজি এণ্ড সন্স, রামমোহন সাহা লেন থেকে প্রকাশিত 'অদ্ভুত অষ্টকাণ্ডে সম্পূর্ণ রামপ্রসাদী-জগদ্রামী রামায়ণ (৩য় সংস্করণ ১৩০৭ বঙ্গাব্দ)।

২। ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত সম্প্রাদিত এবং সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত 'মধুসূদন রচনাবলী' (২য় মুদ্রণ, ১৯৬৭ খ্রীঃ)।

৩। অজিত রায়—'কাব্যে প্রভাব, মধুসূদন ও জগদ্রাম' (দেশ, ২ মে '৭৬)

৪। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

৫। শ্রীভূদেব চৌধুরী—'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'।

৬। শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'প্রমীলার উৎস' (দেশ ৬ মার্চ '৮২)।

৭। শ্রীকাশীরাম দাস—'মহাভারত'।

৮। শ্রীবুদ্ধদেব বসু—'সাহিত্যচর্চা'

৯। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু—'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত'

১০। শ্রীঅরুণকুমার বসু—'মেঘনাদবধ্য কাব্য'

১১। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম-'মধুস্মৃতি'

১২। শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'

১৩। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'

১৪। শ্রীবিষ্ণু দে—'মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা'

১৫। হোমর—'Iliad'

১৬। ট্যাস্সো—'Jerusalem Delivered'

১৭। রেভারেণ্ড জে লং—'A Descriptive Catalogue of Bengali Works'

১৮। শ্রীমৎ -'Bengali Prose Style'

১৯। ডঃ সুকুমার সেন—

২০। যে-সব সাময়িকপত্র থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে : 'দেশ' (কলকাতা), 'অমৃত' (কলকাতা), 'পাক্ষিক সমালোচক' (কলকাতা), 'বাঁকুড়া বিচিত্রা' (বাঁকুড়া), বিকাশ (বর্দ্ধমান), 'সমাচার দর্পণ' (কলকাতা), 'আন্তরিক' (নিউ ইয়র্ক), 'নীড়' (ধানবাদ) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

২১। যাঁদের সাক্ষাৎকার ও চিঠিপত্রের ওপর ভিত্তি করে বর্তমান রচনাটি সম্পূর্ণ হতে পেরেছে :
ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ আবদুস সামাদ, ডঃ গোলোকবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ প্রমথ মণ্ডল, শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজীবনলাল মালিয়া, দীপিকা ভট্টাচার্য, শ্রীমতী যূথিকা দাশগুপ্তা, শ্রীমতী সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

বাক্সটাই / শুদ্ধসত্ত্ব বসু

খোকন সোনার জন্য
রথের মেলা থেকে
ছোট্ট এই মাটির বাক্সটা কিনে এনেছি,
কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের উজ্জ্বল নিদর্শন :
সত্যি কি করে এমন জীবন্ত করে গড়ে !

বাক্সটা কাঁচের আলমারিতে
সাজিয়ে রাখা হলো—দৃষ্টিনন্দন ভঙ্গিতে।
একি বাক্সটা যে বড় হচ্ছে ক্রমে ক্রমে,
হাত-পা বের হলো, দাঁতও গজালো তার,
কাঁচের আলমারিতে তাকে আর ধরলো না,
ঘরের মস্ত মেঝে দখল করে নিল সে।

না ঘরেও ধরে না, বাক্সটা বড় হচ্ছে আরও,
ক্রমবর্ধমান আয়তন তার,
বেড়েই চলেছে, বেড়েই চলেছে,
ঘরে নয়,
গোটা বাড়ীতেও তাকে আর ধরে না।
বাড়ী ছেড়ে গঞ্জে গ্রামে শহরে
গোটা দেশে, পৃথিবীর ব্যস্ততর ভূমিখণ্ডে···

বাক্সটাই শৈশব, যৌবন—জীবনের বিবর্তন,
ওর ভেতরেই বাসনার বিবিধ বস্তু;
সযত্নে রাখতে হবে,
নইলে হারিয়ে যাবে।
বাক্সটা মনে করলেই বড়—
নইলে সে ছোট,
মৃৎশিল্পের উজ্জ্বল শিল্পের মতই
নয়নাভিরাম, প্রিয় পরম রমনীয় !

বিদ্যুৎ / গোপাল ভৌমিক

আসে আর যায়
আঁধার বিলায়
কখনও বা থাকে লুকিয়ে
জ্বলে ওঠে ফের
মিটে গেলে জের
কাজ কারবার চুকিয়ে।
আঁধারের স্বাদ
এমন নিখাদ
মাথায় কে দিল ঢুকিয়ে
সে তো বিদ্যুৎ
অতি কিম্ভুত
না পেলে যাই যে শুকিয়ে।

কথা / সুশীল রায়

তোমাকে নতুন বার্তা শোনাবার জন্যে এ কলমে
কত কথা প্রত্যহই ওঠে জমে-জমে।
কিন্তু জমা-খরচের হিসাব নিকাশ শুধু সার—
শোনানো হলনা কিছু, হে বন্ধু আমার।
তোমার বলার যদি থাকে কিছু, বলো—
মুগ্ধ শ্রোতা হয়ে শুনব সেই কোলাহলও।
এ কলমে, জানি, তাতে কিছু জমা হবে
কথোপকথনে আর কিছু কলরবে।
শুনেছি, অনেক শব্দ হলে একাকার
তৈরী হয় শান্ত পরিবেশ স্তব্ধতার।
নীরব নিভৃতি রচো মুখর আলাপে
কলমের কালি মুছে রাখলাম খাপে।
যে-কথা বলবে, টুকে রাখব ডায়রিতে
সুবর্ণ সুযোগে তারা বাজবেই সংগীতে।

অদেখা কারো প্রতি / নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

যেতে যেতে গান শুনি, কোন দিন
দেখিনিক চোখে,
শুনেছি দর্শন শাস্ত্রে করেছ এবার এম এ পাশ,

গল্প ও কবিতা লেখ, পত্রিকায় হয় তা প্রকাশ,
সুন্দরীও নাকি তুমি ''একথা বলেছে বহু লোকে।
তাই ত ভেবেছি মনে কোন দিন খেয়ালের ঝোঁকে,
দেখা করতে চলে যাব ! তোমার
ছোড়দাদা অবিনাশ
আমার বিশেষ বন্ধু, একসংগে খেলী দাবা তাস,
স্যাটারডে ক্লাবে প্রায়ই ! এক দিন
ডাকতে যাব ওকে !

একই পল্লীতে থাকি. দশ বিশবার আনাগোনা
করি রোজই নানা কাজে, তোমার
বাড়ীর রাস্তা দিয়ে,
কোন একটা অজুহাতে হঠাৎ উঠতে পারি গিয়ে।
যাওয়া কিন্তু হয় নাক ! হয় না কখনো চেনা শোনা
আকস্মিক একটা কোন ঘটনার। ধ্বনি রূপ নিয়ে
হয়েছ বাস্তবী তবু, আমার মনশ্চক্ষে
কি করে জানোনা !

আমি খুশী / অজিত বাইরী

দেখতে পাচ্ছি, গাছগুলিতে ভ'রেছে নতুন পাতা
রুগ্ন কিশোরী মেয়েটি উঠে ব'সেছে বিছানায়।
লাল হলুদ বেগুণীতে মেশা ফুল ফুটেছে—
ভাব্‌বে না।
এ-গোলার্দ্ধে এখন শরৎ ;
শরতের আকাশ নীল।

রাস্তায় অবিরল উদ্বেল মানুষের স্রোত।
জানলার গা' বেয়ে উঠে
আঁকশির মত লতাটি উর্দ্ধমুখে
ধরেছে আঙরার ফুলকির মত ফুল।
একবার ছোট ছোট ফুল,
একবার অগণিত মানুষের মুখের
মিছিল দেখি।

কানে কানে গুনগুন করছে পৃথিবী
দুপুরের মৌমাছির মত নিবিষ্ট।
তোমার হাত আমার হাতের মধ্যে।
তোমাকে ভালবেসেই
ভালবেসেছি নদী, নক্ষত্র, জনপদ, ঘনিষ্ট বসতি
আমি খুশী,
রোদ্দুরের মত খুশী॥

আমাদের মুখ / রাখাল বিশ্বাস

॥ ১ ॥

টেলিফোনের ওপার থেকে তার কণ্ঠস্বর শুনি
আমাদের কথা হয় জীবন, ব্যর্থতা,
সুখ ও দুঃখের মধ্যে
ভিতরে ভিতরে শুধু আমরা এগিয়ে যাই,
মুখোমুখি হই।

॥ ২ ॥

টেলিফোনের এপার থেকে আমি কথা ব'লি,
সে শোনে, বোঝে না কিছু, নিরুত্তর থাকে।
আমি বলি, সেন্ট্রাল এভিন্যু খোঁড়া হচ্ছে
তরুণ বৃক্ষের গায়ে শাবলের কাটা দাগ
দেখেছি সেদিন
প্রেমিক ভিক্ষুক জানি নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে
রাস্তায়, কোথাও।
তারপর "বাইরে তুমুল বৃষ্টি,
সেই শব্দে ঘোর কাটে, দেখি —
ভিজে যাচ্ছি, তাকে বলি, এসো
ওই বৃষ্টিতেই আজ আমরা ভিজিয়ে নেবো
আমাদের মুখ।
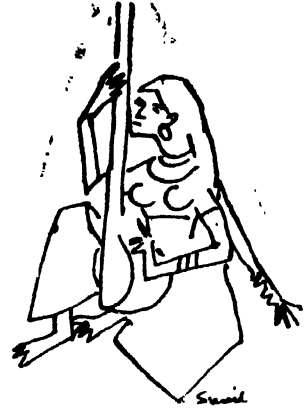
হেঁটে যায় বহুদূর / সোফিওর রহমান

তুই সুন্দরী যুবতী
সন্ধ্যা-জ্যোৎস্নার মৌ মৌ মসৃণ পথে
হাঁটছিল তুই যুবতী

ওপরে চাঁদের দেহে কি বিরাট গহ্বর !
মানুষের পৃথিবী কত সোহাগে
শুষে নেয় তার গন্ধ
অথচ সন্ধ্যায় ফেরার পরে
অতর্কিত ছোবলে রক্তাক্ত হ'লে
চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়ায়
শত কাঁটা-ক্যাকটাস
যদিও এরাই পুষেছে সাপ !
শুধু অকৃপণ চাঁদ
আজ বুকের মৌন অশ্রুতে ছড়ায় আলো
দু'টি সংগ্রামী শরীর তাই
হেঁটে যায় বহুদূর

নিরুদ্দেশ সম্পর্কিত ঘোষণা / গৌরাঙ্গ ভৌমিক

স্বাধীন সামন্ত নামে বাইশ বছরের এক তরুণকে
উনিশশো সাতচল্লিশের শরৎকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা।
স্বাধীনের শাদা পায়রা ওড়ানোর শখ ছিল, গায়ক পাখির
চিড়িয়াখানা করার ইচ্ছে ছিল। নিরুদ্দেশের সময়
তার গায়ে সবুজ রঙের পাঞ্জাবী ও পরনে নীলপাড় ধুতি ছিল।
রবীন্দ্রনাথের 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' গানের
কয়েকটা কলি তার বড় প্রিয় ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের যাবতীয়
স্বদেশী গান মুখস্ত ছিল। সন্ধান জানাবার ঠিকানা,
স্বদেশ সামন্ত, গ্রাম থানা এবং জেলা ভারতপুর।
সন্ধানদাতাকে একটা গ্রাম্য নদী, তেত্রিশ বর্গমাইলের
একটা সবুজ মাঠ এবং ৭৩৪৮২টি গায়ক পাখির
অভয়ারণ্য উপহার দেওয়া হবে।

সত্যকিঙ্কর জহুরী নামে একান্ন বছরের এক প্রৌঢ়কে
১৯৪৮ সালের মধ্যগ্রীষ্ম থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা।
সত্যকিঙ্কর তাঁর মা-বাবা এবং গুরুজনদের পায়ের দিকে
চোখ রেখে কথা কইতেন। কেউ মিছে কথা কইলে চটে যেতেন।
একবার একটা বোয়াল মাছের পেটে বাচ্চা ছেলের কড়ে আঙুল
আবিষ্কার করে অনিদ্রা রোগে আক্রান্ত হন। অন্যবার
চৌদ্দ বছরের একটা ছেলেকে সিনেমায় লাইন দিতে দেখে
এত উত্তেজিত হয়ে পড়েন, যে, বোবা বনে যান।
বনগাঁ লোকাল, ক্যানিং লোকাল, আজিমগঞ্জের ট্রেন,
এবং কলকাতার বড়োবাজার ও চোরাবাজার এলাকায়
তিনি যেতেন না। নিরুদ্দেশের সময় তার পরণে
আটপৌরে ধুতি, পায়ে খড়ম এবং গায়ে ফতুয়া ছিল।
সন্ধান জানাবার ঠিকানা, শিবসত্য জহুরী,
গ্রাম এবং থানা সনাতনপুর, জেলা ধর্মনগর।
সন্ধানদাতাকে বিদ্যাসাগর রচনাবলী এবং হিতোপদেশের
মূলসংস্করণসহ যাবতীয় নীতিশিক্ষার বই উপহার দেওয়া হবে।

প্রীতি মিত্র নামে উনিশ বছরের এক শ্যামলা তরুণীকে

১৯৫০ সালের শীতকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
প্রীতি রাখীবন্ধনের কথা বলত। তার বন্ধু রোশেনারাদের
বাড়ির ওপর দিয়ে সূর্য এবং চাঁদের উদয়-অস্ত দেখে
কবিতা লেখা শুরু করেছিল। নিরুদ্দেশ্যের সময়
তার পরণে আকাশীরঙের শাড়ি এবং গায়ে
আকাশী রঙের ব্লাউজ ছিল। 'নীলিমা' শব্দের
১০২টি প্রতিশব্দ সে জানত। সন্ধান জানাবার ঠিকানা,
সম্প্রীতি মিত্র, গ্রাম, থানা এবং জেলা ভুবনডাঙা।
সন্ধানদাতাকে সীমান্তবর্তী আকাশের চাঁদ এবং নক্ষত্র
উপহার দেওয়া হবে। আর, আজীবন ব্যবহারের যোগ্য
আকাশী রঙের শাড়ি এবং ব্লাউজের কাপড়।

বিপ্লব গুপ্ত নামে আঠারো বছরের এক তরুণকে

১৯৬৯ সালের জষ্টিমাস থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা।
বিপ্লব পাগলা ঘোড়ার পিঠে চড়ে পৃথিবী পর্যটনের
সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পূবের পাহাড় ও সূর্য-ওঠার গল্প ভালবাসত।
এক খোঁড়া এবং বুড়ি ভিখিরিকে সে মা ডাকত।
নিরুদ্দেশের সময়, তার পরণে মেরুণ পাজামা এবং পাঞ্জাবি ছিল।
ঠোঁটে 'যেমন করে ঝর্ণা নামে দুর্গম পর্বতে' গানের কলি।
সন্ধান জানাবার ঠিকানা, উদয়ন গুপ্ত,
গ্রাম এবং থানা উদয়নগর, জেলা রাঙাপুর।
সন্ধানদাতাকে মধ্যগ্রীষ্মের আঠারোটি দুপুর এবং
২৭৮২টি পাগলা ঘোড়া উপহার দেওয়া হবে।

কেউ যদি এদের প্রত্যেককে, এক সঙ্গে কিংবা আলাদা,

জীবিত কিংবা মৃত হাজির করতে পারেন, কিংবা কোথায় গেলে
তাদের পাওয়া যাবে জানাতে পারেন, তো, তাকে
তাঁর জন্মভূমির আকাশ-বাতাস, চন্দ্রসূর্য এবং গ্রহ নক্ষত্র সহ
এক জন্মের পুরো অধিকার ছেড়ে দেওয়া হবে।

আর্ষপ্রয়োগ / প্রদ্যুম্ন মিত্র

প্রত্যেকেরই দরকার ছিল একটা না একটা কিছুর
সিঁড়ি সিংহাসন ইমারত
শুধু তার জন্যেই ছিল আজন্মের খরা
ধিকিধিকি ধিকিধিকি জ্বলা
জ্বলতে জ্বলতে জ্বালিয়ে যাওয়া
সল্‌তের পর সল্‌তে
এক একটা হৃদয়

হায় হৃদয়
তোমার ঘাড়ের ওপর এখন মাংস
মাংসের ওপর কেশর
গর্জন করছে মিঁউমিঁউ

শস্যের ইচ্ছার থেকে অনেক দূরে
জল হাওয়া আগুনের খোলা মেলায়
আমি তাকে বসে থাকতে দেখেছিলাম
একেবারেই একা বড় নিঃসঙ্গ পাথরে
শুধু বুকে একটা ঝলমলে দিন
শুধু গলার আওয়াজে ঝড়
সুর তুললে
তা' আর্ষপ্রয়োগের মত
উজ্জ্বল দীপ্তিময় তবু একক।

সেদিনের এই শহর / কৃষ্ণ ধর

এই ধুলোবালির শহরকে মনে হত কত পবিত্র
সরল শিশুর মতো আকাশের মেঘভাঙা নীলিমা
এসে রোজ সকালে মুখ বাড়িয়ে দিত
উৎসুক বাড়ির জানালায়।

এক একটা দিন ছিল যেন আগুনে-ঝলসানো
মানুষের মিছিল বেরুত পথে
হাতে হাতে ঘুরত কবিতার পাণ্ডুলিপি
প্রতিবাদের ভাষায় মুখরিত হয়ে উঠত পথ।
কতদিন চৈত্রের ক্ষ্যাপা বাতাস
উড়িয়ে নিয়ে গেছে নাটকের ছেঁড়া পাতা।

এক একদিন বিক্ষোভের দাপটে চমকে উঠেছে
গোলদিঘির বন্দী জল
সেনেট হলের সোপানে দাঁড়িয়ে
হাঁক দিয়েছে গর্জনকারী চল্লিশ
আর বুলেট বেঁধা কলকাতা
রামেশ্বর-রশিদ আলির শ*
বুকে নিয়ে রাত জেগেছে ধর্মতলায়
অক্টোরলনির অহংকার গুঁড়িয়ে দিয়ে
শহীদ মিনার বানাবে বলে।

ওই বালক এখন কোথায় ?

প্রবাল কুমার বসু

একটি নদী ছিল ও তার প্রান্ত ছুঁয়ে বট
তাদের কী ছিল সংকট ?
নদীর কথা জানত ও গাছ। গাছের কথা নদী

একটি বালক নদীর পাড়ে গুণত বসে ঢেউ
তার ছিলনা আর কেউ
সময় তার হাতটি ধরে বইত নিরবধি

সেই বালকটি আজ কোথায় ?
সেই নদীর পাড় আছে
এখনও বট নদীর কাছে গাছের কথা বলে
গোপন কোলাহলে
এখনও নদী গাছের কাছে শোনায় তার গান
ওই বালক এখন কোথায় ?
কেউ জানেনা সন্ধান ॥

মায়া / হরপ্রসাদ মিত্র

নানা খাতে বহে যায় উচ্ছল বৃষ্টির জল মাঠে
সেচের ক্যানালে রাঙা জল।
নীল ডানা রেখা আঁকে মাছরাঙা হঠাৎ উড়ে গেলে
ধানের সবুজে ধূ ধূ অনেকটা,—গ্রাম দূরে দূরে।
প্রকৃতির এই রূপ বছরে বছরে ফিরে আসে—
বিশ্বস্ত বন্ধুই যেন দরজায় পৌঁছেই কড়া নাড়ে।
শান্তির আরাম আছে এই সব আহ্বানে সাড়াতে।

হলুদ ঘাসের ফুল, লাল শাদা নয়নতারা-রা
এইখানে রক্তজবা, ঐ-কোনে বেগুনী কুরুশ,
ঝিঙেফুল, মানকচু, পুঁইলতা, কাটোয়ার ডাঁটা—
আবদুলের মুরগী চরে—জমি তার আট-দশ কাঠা,
তারপরে বাঁশবন, তার পরে রেল-লাইন. মাঠ,
অন্ধকার কালো জল হরিহর রায়ের পুকুর,
তারপরে সারি সারি বহু দূর টেলিগ্রাফ-তার।
দৃশ্যের মোহিনী মায়া কৃষ্ণকলি সকালে বিকেলে
ইন্দ্রিয়ের উপহার বুকে নিয়ে বুকের বাতাস
চূড়ান্ত বোঝার চেষ্টা বৃথা চেষ্টা সকলেই জানে।

ব্যথা তুমি আছ

সমর দাস

ব্যথা, তুমি আছ
ছবি আঁকো তাই
শিরা ছিঁড়ে রক্তক্ষরণ হয় বটে
স্বপ্ন আর অনুভবে

চোখের অনেক জল
হৃদয় সাগর হয়ে ওঠে
ভালবাসার শব্দ থাকে
নিঃসঙ্গোপনে।

বুকের নীল শিরা
গানের কলি হয় মাঝরাতে
কবিতা ব্যঞ্জনাময়

চোখের ভাষায় ফুল ফোটে
কল্প বালুচর ভেঙ্গে
নিষ্পাপ হৃদয় স্থলে
দরজা বন্ধ ঘরে।

ব্যথা. তুমি আছ
হৃদয়ের দাম আছে তাই।

হাসপাতালে বিকেলে / অভিজিৎ ঘোষ

অগ্রজ কবিদের অসংখ্য শব্দের কোনো কারুকাজ
আনন্দের কলস্বর এখন বাজে না
চিৎ হয়ে শুয়ে থাকি, দিন আসে নুয়ে

মনে হয় পদ্মপাতার মতো হৃদয়ে শিশির নিয়ে
যেন শুধু ঝরে যাওয়া ভালো—মৃত্যুকে কাছে পাওয়া ভালো
মানুষের অন্যমনস্কতার ফাঁকে একা শুয়ে থাকা
আর বুঝি নিরাপদ নয়,
দুর্দশার একতারায় বাজে
করুণ বেহাগ—
স্মৃতি এসে জড়িয়ে ধরে—আমি কেবলই পালাতে চাই
কর্মক্লান্ত নার্সের গলায় ষ্টেথোসকোপের বিষধর বিনুনী
বুকের মানচিত্র জরিপ করে ছাখে
মনে ভাবি নিশ্চয়ই
একদিন তার কপোল বেয়ে নেমে আসবে করুণার অশ্রুবারিধারা
একদিন বুক পকেটের কাছে উড়ে এসে বসবে রঙিন প্রজাপতি
শেষ মার্চের ভাঁটার জলে ফিরে আসবে উজ্জ্বল দিন
যেখানে শ্যামল পথে আবছা পড়ে আছে ভালোবাসার পদচিহ্ন
এ জীবনের প্রেম ও পতন

আহা, দিন আসে নুয়ে
আমি চিৎ হয়ে শুয়ে থাকি

অগ্রজ কবিদের অসংখ্য শব্দের কোনো কারুকাজ
আনন্দের কলস্বর এখন বাজে না
শুধু তার ব্যর্থতার ডানা ঝাপটানোর শব্দ রেখে যায়।

দর্শনার শরীর ১১ / মঞ্জুভাষ মিত্র

রাত্রির পর দিন এল, যেন নারীর পশ্চাদধাবন-রত পুরুষ। অন্ধকারের গোল চাকাগুলি ঘুরে ঘুরে গেল, কত ঊষার সুন্দরী রক্তিম আর্তনাদ প্রতিফলিত হ'ল আকাশের নীল কক্ষে কক্ষে। অতঃপর সেই দৈবনারী প্রস্তুতি নিল আত্মপ্রকাশের জন্য; তার মহিমান্বিত স্তন ও উরুর সৌন্দর্য আত্মাকে যারা ধর্মরূপে গ্রহণ করেছে সেইসব মানুষকে শয্যার থেকে উঠবার জন্য আমন্ত্রণ করল। অন্ধকার নদী কল কল করে বয়ে গেল, যেন শতাব্দী শতাব্দী ধরে পুঞ্জ পুঞ্জ রঙীন ফুল তার বুকের উপর দিয়ে বয়ে গেছে: ডালিয়া ও গোলাপ, পিঙ্ক ও ভিমোরপোথেকা। রতির পরিপূর্ণ আভাস সঙ্গীতের মত বেজেছে। তারপর এই সুন্দর সবল সূর্যদেবের তন্নিষ্ঠ ভাবানুভূতিপূর্ণ মুহূর্ত এল। তিনি সুন্দর এবং বিদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। জন্মভূমির অন্তত দু'টি পর্বত তাঁর নাম জানে। সবুজ গাছের কোমল পাতাগুলি কাঁপছে যেন কোমল ত্বকের রমণী; ঘাসের কণাগুলি সুন্দর সঘন স্বর্ণমুদ্রার মত পায়ের নীচে ঝমঝম করে বাজছে। এই ঘাসে পা ফেলে যে হাঁটবে উক্ত বিশাল রমণী তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। উক্ত বিশাল রমণীর সুবর্ণজঙ্ঘা তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। স্মৃতির বরফ তুমি প্রথম সূর্যরশ্মিপাতে নিবিড় এবং ঘনভাবে কেঁপে ওঠ। পুরুষটির বিদেশে নিজস্ব ফ্ল্যাট এবং মোটরগাড়ী আছে, তার টাই-এর রঙ নীল সমুদ্রের জলের মত নীল। সে যখন মোটরগাড়ী চালায় তখন তার চোখে লেগে থাকে নীল সমুদ্রের স্বপ্ন। বিগত বসন্তে সমুদ্রবেলায় ছুটি উদযাপনকালে অমেয় অপরিমাণ নগ্ননারীর স্নানলীলা সে দেখেছিল। অথবা পরিপূর্ণ সঙ্গীতের মত সমৃদ্ধ পশ্চাৎপট সূর্যের দিকে তুলে ধরে বালিতে তলপেট রেখে তরুণী মেয়েদের সেই শুয়ে থাকা স্মরণে আসে। এই দৃশ্যাবলীই সবচেয়ে মনোরম এবং স্নায়ুমণ্ডলীকে স্নিগ্ধ করে। দিন এখন রাত্রিকে ধরে ফেলেছে, রাত্রির চুলগুলি বাতাসে দুলতে দুলতে আর্দ্র করুণ আঙুরলতা হয়ে গেছে। সৌন্দর্যপিপাসু মাতালের হাসি আকাশকে পরিপূর্ণ করে দিল তীক্ষ্ণ ঝংকারে।

জাহাজঘাট / আবুল হাসনত মনিরুজ্জামান

ট্রেন অবশেষে এখানেই এসে থেমে গেল।
জনশূন্য, বিলীন স্টেশন, সামনে
ধূ-ধূ বালিয়াড়ি
বালিয়াড়ি পেরুলেই নীচে খরস্রোতা নদী
জাহাজ ঘাট।
ঐ ঘাটে দিনরাত ভেঁপু বাজে ধোঁয়ার
কুণ্ডলী ওড়ে।
আমি এখন বড় একা তবুও ভেবে সুখ,
জাহাজঘাটের শেষ জাহাজখানা এখনও
নোঙর তোলেনি॥

অনুভূতি / গোপাল কুম্ভকার

দুঃখের আগুনে আমি সেঁকেছি শীতল দুটি হাত
বুকের শৈত্যঝড় বয়ে গ্যাছে আমলকী বনে
মানুষের দুঃখে আজ মানুষেরা কাঁদেনা এখন
কেবলই মাকড়সা জাল বুনে যায় সন্দিহান মনে।

মাতাল / দ্বিজেন আচার্য

কখনো বা নিভৃত নির্জনে কোন এক
মাতালের সঙ্গে দেখা হলে
একান্ত নিজস্ব, তার কিছু শুদ্ধতম কথা
শোনা যায়।
এবং এ-রকমই মনে হয়, অন্ধকারে ধাক্কা খেলে
এ-রকম সংঘাতের প্রয়োজন ছিল।

কেননা
মাতাল শয়তান কিংবা দেবদূত নয়—
শব্দহীন হেঁটে গেলে চুরমার হবে গৃহস্থালি।
মাতালেরা হল্লা করে—শোক সভায় এ-রকম
হল্লা কিছু ভাল ;
আশ্চর্য মহুয়া গন্ধে যে মাতাল—মাতাল কেবল
তার এই রক্তপায়ে পথ চলা
আমাকে ভাবায়......

এবং
এ-রকমই ভাবি আমি : মাতাল বলেই সে
কবি বা ঈশ্বর

★

মায়া-দর্পণ / কৃষ্ণা বসু

কোনখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি ?
বৃষ্টি পতনের ভিতর নোনা শোক অসুখের মধ্যে
কেন দাঁড়িয়ে রয়েছি ?
এই পরবাস থেকে ফিরে যাবো ?
কে পরালো নোংরা কাপড় ?
কেন বাসী ছেঁড়া তেনা দিয়ে আমাকে মুড়েছ ?
সর্ব অঙ্গে গন্ধ, বিষ, জ্বালা
এইবার শেষবার ধুয়ে নেব তাকে,
এই স্নান, গূঢ় শুদ্ধতম স্নান পাব বলে,
শান্ত কোনো নদীর সকাশে যাবো ?
নদীই শুশ্রুষা জানে,
সন্তাপহরণ দোলা দিয়ে যায় রক্তের ভিতরে,
সাগরের ধারে নয়, নোনা জল
বড় বেশি প্রতারণা জানে,
শরীরের সহজ নিয়ম জানে,
ভাঙে তার মায়া, নদী শুধু শুশ্রুষা জানে,
সেবা দেয়, স্বস্তি দেয়,
মায়ার দর্পণ তার ভেসে থাকে বুকে,
নদীর সকাশে গিয়ে তার মায়া-দর্পণের
মায়া মেখে নেব মুখে—

চীনা গল্প

আমার পুরনো ভিটে

মূল গল্প : লুশুন
অনুবাদ : জগত লাহা

তীব্র শীতের মধ্যে দু হাজার লি অতিক্রম করে আমি আমার পুরনো বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়েছি। কুড়ি বছর পরে আমি গ্রামে ফিরছি।

শীতের শেষ। আমরা যতোই গ্রামের নিকটবর্তী হচ্ছি, আকাশ ততোই মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। আমাদের নৌকার গলুইয়ের মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকে পড়ছে। বাঁশের গলুইয়ের ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে আমরা কয়েকটি নির্জন গ্রাম দেখতে পাচ্ছি, জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই,—বিবর্ণ এবং হলুদ আকাশের নিচে গ্রামগুলি এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে। আমি বিমর্ষ না হয়ে পারলাম না।

আঃ। গত কুড়ি বছর ধরে আমি যে পুরনো বাড়ির কথা স্মরণ করে আসছি, নিশ্চয় সেই পুরনো বাড়ি এগুলোর মতো নয়।

যে পুরোন বাড়ির কথা আমার মনে আছে তা, আদৌ এরকমটি ছিল না। আমার পুরোন বাড়ি এর চেয়ে অনেক ভাল ছিল। তবে তুমি যদি এর বিশেষ কোন মাধুর্য বা সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে বলো, আমি হয়ত সে সম্পর্কে কোন পরিষ্কার ধারণা দিতে পারব না, তা বর্ণনা করার ভাষাও আমার নেই।

অতঃপর এইভাবে আমি মনে মনে যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করলাম যে : পুরোন বাড়ি এরকমটাই ছিল, এবং যদিও তার কোন উন্নতি হয়নি, তথাপি আমি যেমনটা ভাবছিলাম তা ততোখানি হতাশাজনকও নয়। আসলে আমার মেজাজটাই বদলে গেছে, কারণ এখন আমি কোন রকম মোহ না নিয়েই 'দেশে' ফিরছি। মনে হয়, এ সম্পর্কে এখন শুধু এইটুকু বলা যায়, এবার আমি চিরবিদায় জানাতেই গ্রামে আসছি। যে পুরোন বাড়িতে আমাদের বংশের লোকেরা বছরের পর বছর বাস করে এসেছে, সেটা অন্য পরিবারের লোকেদের ইতিপূর্বে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে এবং বছর শেষ হওয়ার আগেই সেটা হাত-বদল করে দেওয়া হবে। তাই, সেই চিরপরিচিত পুরান বাড়িটাকে চিরবিদায় জানাতে নববর্ষ দিবসের আগেই আমাকে ছুটে যেতে হচ্ছে। পুরোন বাড়িটাকে শুধু চিরবিদায় জানানোই নয়, আমার জন্মভূমি থেকে অনেক দূরে, অন্যত্র—যেখানে আমি চাকরি করি—মূলত সেখানে আমার পরিবারবর্গকে স্থানান্তরিত করার জন্যই দীর্ঘকাল পরে আমার আবার ঘরে ফেরা।

দ্বিতীয় দিনে ভোরবেলায় আমাদের গ্রামের প্রবেশ-দ্বারে পৌঁছে গেলাম। শুকনো খড়ো চালের ভাঙা খুঁটি বাতাসে নড়বড় করছে। এই দেখেই বোঝা যায় এ পুরোন বাড়ি হাত-বদল থেকে কেন রেহাই পায়নি। আমাদের বংশের কয়েকটি শাখা হয়তো ইতিমধ্যে অন্যত্র সরে গেছে। তাই বাড়িটা অস্বাভাবিক শান্ত। আমি অল্প কিছু আসবাব কিনেছি ; নতুন আরো কিছু জিনিস কেনার জন্য বাড়ির সমস্ত আসবাবই বিক্রি করে দেওয়া দরকার। মা রাজী হলেন, এবং জানালেন যে পোঁটলা-পুঁটলি সবই বাঁধা-ছাঁদা হয়ে গেছে, এবং যেসব আসবাব সহজে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না সেগুলো এর মধ্যে বিক্রি করেও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন লোকজনের কাছ থেকে সে-গুলোর দাম আদায় করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'তুমি দু-একদিন বিশ্রাম নাও, এবং আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করো, তারপর আমরা যেতে পারি', মা বললেন।

'হ্যাঁ'।

'তাছাড়া রুনটু আছে। যখনই সে আসে, সবসময় সে তোমার খোঁজ নেয়, এবং তোমাকে একবার দেখতে চায়। আমি তাকে তোমার বাড়ি আসার সম্ভাব্য তারিখ জানিয়েছি। সে যে-কোন সময়েই এসে পড়তে পারে।'

এই মুহূর্তে একটি ছবি হঠাৎ আমার মনে ভেসে উঠল: সুনীল আকাশে সোনালী চাঁদ ঝুলে আছে, তার নীচে—সমুদ্রসৈকতে—জসন-জেড) পাথর) সবুজ তরমুজের মতো আদিগন্ত ছড়িয়ে আছে; তার মাঝখানে বসে আছে রূপোর বালা-পরা একটি এগারো-বারো বছরের ছেলে, হাতে একটা হাতলঅলা কাঁটা, আঁকড়ে-ধর—সমস্ত শক্তি দিয়ে সে একটা 'ঝা'-কে সজোরে ঠেলছে, 'ঝা'টা হঠাৎ সরে গিয়ে আঘাত এড়ানোর চেষ্টা করে পা তুলে পালিয়ে যাচ্ছে।

এই ছেলেটাই রুনটু। আমি যখন তাকে প্রথম দেখি তখন তার বয়স দশ বছরের কিছু বেশি—ত্রিশ বছর আগেকার ব্যাপার, সে সময় আমার বাবা বেঁচে আছেন, আমাদের পরিবারও তখন বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন. সেজন্য আমি বাস্তবিক নষ্টই হয়ে গিয়েছিলাম। সে-বছর বংশ-পরম্পরাগত বলিদান উৎসবের পালা আমাদের। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথম মাসে পূর্বপুরুষদের প্রতিমূর্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত করা হল, এবং নৈবেদ্যাদি দেওয়া হল। যেহেতু যজ্ঞীয় পাত্রাদি খুবই মূল্যবান এবং ভক্তের সংখ্যা ছিল অগুনতি সেহেতু সেগুলো চুরি না হয়ে যায় সেজন্য পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমাদের পরিবারে কোন একজন আংশিক সময়ের চাকর ছিল। (আমাদের জেলায় আমরা চাকরদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে থাকি: যারা কোন পরিবারে সারা বছর কাজ করে তাদের বলা হয় পূর্ণ সময়ের চাকর, যাদের একদিনের জন্য ভাড়া করা হয় তাদের বলা হয় একদিনের চাকর; এবং যারা নিজেদের জমি নিজেরা চাষ করে এবং নববর্ষে, উৎসবাদিতে বা যখন খাজনা আদায় করা হয় তখন কেবল একটি পরিবারে কাজ করে তাদের বলা হয় আংশিক সময়ের চাকর।) এবং যেহেতু অনেক কাজ, আমাদের আংশিক সময়ের চাকর বাবাকে বলল যে যজ্ঞীয় পাত্রাদি দেখা-শোনার জন্যে সে তার ছেলে রুনটুকে পাঠিয়ে দেবে।

যখন বাবা সম্মতি দিলেন, আমি যৎপরোনাস্তি খুশি হলাম. কারণ আমি অনেক দিন থেকে রুনটুর কথা শুনে আসছি, এবং আমি জানতাম যে প্রায় আমারই বয়সের এবং ত্রয়োদশ মাসে (৩৬০ দিনে চীনা চান্দ্র বৎসর, এবং প্রত্যেকটি মাস ২৯ বা ৩০ দিনে, কখনো ৩১ দিনে হয় না। সে জন্য কয়েক বৎসর অন্তর ত্রয়োদশ মাসে বৎসর গণনা করা হয়) তার জন্ম। যখন তার কোষ্ঠি বিচার করা হয়, দেখা গিয়েছিল—পাঁচটি উপাদানের মধ্যে একটি উপাদান ছিল না, তাই তার বাবা তার নাম দিয়েছিলেন রুনটু। সে ফাঁদ পেতে ছোট ছোট পাখি ধরতে পারত।

আমি নববর্ষ দিবসের জন্য প্রত্যেকদিন উন্মুখ হয়ে থাকতাম, কেননা ওই দিনে রুনটু আসবে। অবশেষে বছর শেষ হতে একদিন মা বললেন রুনটু এসেছে, আমি ছুটে তাকে দেখতে গেলাম। সে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে ছিল। তার মুখটা গোল এবং গাঢ় লাল। সে মাথায় একটা পশমের টুপি পরে ছিল, গলায় রুপোর হাঁসুলি; পাছে সে মারা যায় এই ভয়ে তার বাবা দেব দেবী এবং বুদ্ধদেবের কাছে তার জন্য মানত করে গলার হাঁসুলিতে একটা মাদুলি আটকে দিয়েছিলেন। সে খুব লাজুক এবং একমাত্র আমাকেই ভয় করছিল না। যখন কাছে-পিঠে কেউ ছিল না, তখন সে আমার সঙ্গে গল্প শুরু করে দিল এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলাম।

আমরা তখন কি নিয়ে গল্প করছিলাম মনে নেই। কিন্তু আমার মনে আছে রুনটু খুব খোশ-মেজাজে ছিল, আমাকে বলছিল শহরে আসার পরে সে অনেক নতুন নতুন জিনিষ দেখেছে।

পরের দিন আমি তাকে পাখি ধরতে বললাম।

'কিছুতেই ধরা যাবে না', সে বলল, 'কেবল ঘন বরফ পড়ার পরই পাখি-ধরা সম্ভব। বরফ পড়ার পর আমি

আগে বালির ওপর খানিকটা জায়গা ঝাঁট দিয়ে নিই, একটা ছোট কাঠিকে ঠেকনো করে তার ওপর একটা বড়ো ঝুড়ির একটা দিক উঁচু করে ঠেকিয়ে রেখে দিই, এবং নিচে ধান বা গমের তুষ ছড়িয়ে দিই। ঠেকনোর সঙ্গে সুতো বেঁধে আমি খানিকটা দূরে বসে সুতোর একটা দিক ধরে থাকি, যেই পাখিরা তুষ খেতে আসে অমনি সুতো ছেড়ে দিই, পাখিরা ঝুড়ির মধ্যে ধরা পড়ে। অনেক রকমের পাখি ; বুনো তিতির, কাঠ-ঠোকরা, বুনো পায়রা, লেজতোলা......"

তদনুসারে আমি আগ্রহ সহকারে তুষার পাতের জন্য অপেক্ষা করে রইলাম।

'এখন খুব ঠাণ্ডা', একসময় রুনটু বলল, 'কিন্তু গ্রীষ্মকালে তুমি আমাদের বাড়ি যেও। দিনের বেলায় আমরা সমুদ্রের ধারে ঝিনুক কুড়োতে যাব।—সবুজ লাল কতো রকমের ঝিনুক পাওয়া যায়। যখন বিকেল বেলায় বাবা আর আমি তরমুজের ক্ষেত দেখতে যাব, তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে'।

'চোরদের ধরবার জন্যে?'

'না। পথিকেরা তেষ্টা পেলে তরমুজ তুলে খায়, আমাদের অঞ্চলের লোকের তাকে চুরি বলে মনে করে না। আমাদের বেজি, শজারু এবং ঝা-দের খুঁজে বার করতে হবে। চাঁদের আলোয় যখন তুমি কড়মড় শব্দ শুনতে পাবে, তখন বুঝে নেবে ঝা-রা তরমুজ খাচ্ছে, তখন তুমি একটা সাঁড়াশি হাতে নিয়ে চোরের মতো হামাগুড়ি দিয়ে . .'

তখন 'ঝা' কাকে বলে সে-সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না—এবং এখনো আমি ওই প্রাণীটি সম্পর্কে স্পষ্ট কিছুই জানিনা— তবে কিভাবে আমার ধারনা হয়েছে যে, 'ঝা' ছোট কুকুরের মতো, এবং খুব হিংস্র।

'তারা লোকজনকে কামড়ায় না?'

'তোমার কাছে সাঁড়াশি থাকবে। তুমি পাশ দিয়ে যেতে যেতে, যে-ই চোখে পড়বে সঙ্গে সঙ্গে ওটা দিয়ে তাকে আঘাত করবে। জন্তুটা খুবই ধূর্ত, দেখামাত্র তোমার দিকে তেড়ে আসবে এবং তোমার দু-পায়ের মাঝখানে থেমে পড়বে। ওদের লোমগুলো তেলের মতো পিছল'।

এ-ধরণের অদ্ভুত জীবের যে অস্তিত্ব আছে, তা আমি আদৌ জানতাম না। আমি জানতাম সমুদ্রের বেলাভূমিতে রামধনু রঙের ঝিনুক বা শাঁখই থাকে। তরমুজের এরকম একটা মারাত্মক ইতিহাস আছে, তাও জানতাম না। আগে আমি জানতাম সবজি-বিক্রেতার দোকানেই কেবল তরমুজ বিক্রি হয়।

'যখন জোয়ার আসে তখন আমাদের জমিতে অনেক লাফানো মাছ পাওয়া যায়, মাছগুলোর ব্যাঙের মতো দুটো পা থাকে '

রুনটুর মন ছিল এই ধরণের অদ্ভুত জ্ঞানের একটি ধনাগার। আমাদের জ্ঞাতি গোষ্টির কেউ এতো খবর রাখত না। তারা এসব বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, এবং রুনটু যখন সমুদ্রতীরে বাস করত, তারা তখন উঁচু চারদেওয়ালের ওপরে আকাশের চারটি কোণাই কেবল দেখতে পেত। দুর্ভাগ্যক্রমে নববর্ষের একমাস পরে রুনটুকে বাড়ি যেতে হল। আমি খুব কান্নাকাটি করলাম, সে কাঁদতে কাঁদতে রান্নাঘরের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল, শেষ পর্যন্ত তার বাবাই তাকে সেখান থেকে টেনে আনল পরে সে আমাকে তার বাবার হাত দিয়ে এক প্যাকেট ঝিনুক এবং অনেকগুলি ভারি সুন্দর পাখির পালক পাঠিয়েছিল, আমি তাকে একবার বা দু'বার উপহার পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু আর কখনো আমরা পরস্পর পরস্পরকে দেখিনি।

এখন মা তার কথা তুললেন, বিদ্যুতের ঝলকানির মতো তার স্মৃতি জীবন্ত হয়ে উঠল, এবং আমি আমাদের অতীতের সেই পুরনো বাড়িটা দেখতে পাচ্ছি বলে মনে হল। সেইজন্য আমি উত্তর দিলাম।

'চমৎকার। এবং সে—সে কেমন আছে?

'সে? তার অবস্থা একদম ভালো নয়', মা বললেন এবং তারপর দরজার বাইরের দিকে চেয়ে: 'সেই লোকগুলো আবার এসেছে। তারা বলছে তারা আমাদের পুরনো আসবাবগুলো কিনবে। আসলে তারা দেখতে এসেছে কি কি তারা কুড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমাকে যেতে হবে এবং তাদের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে'।

মা দাঁড়ালেন, তারপর চলে গেলেন। বাইরে বেশ কয়েকজন মহিলার গলা শোনা যাচ্ছিল। আমি হোভারকে কাছে ডাকলাম এবং তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলাম। জানতে চাইলাম সে লিখতে পারে কিনা, এবং এখান থেকে গিয়ে সে খুশি হবে কিনা।

'আমরা কি ট্রেনে যাব'?

'হ্যাঁ, আমরা ট্রেনে যাব'।

'এবং নৌকায়'?

'প্রথমে আমরা একটা নৌকা নেব''।

'ও। সেই ছেলে। তার এরকম লম্বা গোঁফও গজিয়েছে।'' হঠাৎ একটা অদ্ভুত তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর বেজে উঠল। আমি মুখ তুলে তাকালাম, প্রায় পঞ্চাশ বছরের এক মহিলাকে দেখতে পেলাম। তাঁর গলার হাড়গুলো উঠে আছে-পাতলা ঠোঁট, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, হাতদু'টো কোমরের ওপরে রেখেছেন, স্কার্ট না পরে বেশি ঘেরের পাজামা পরেছেন—তাঁকে দেখতে ঠিক জ্যামিতিবক্সের কম্পাসের মতো।

আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম।

'আমাকে চিনতে পারলে না? আমি তোমাকে কোলে নিয়ে কত ঘুরেছি!'

আমি আরও ঘাবড়ে গেলাম। ভাগ্যিস্ সেই সময় মা এসে পড়লেন এবং বললেন, ''ও এতোদিন এখানেছিল না। তুমি এই বিস্মরণের জন্য নিশ্চয় ওকে ক্ষমা করবে।''

'তোমার মনে পড়া উচিত', তিনি আমাকে বললেন, 'আমি রাস্তার ওপারের শ্রীমতী ইয়াঙ—আমার একটা দইয়ের দোকান আছে।'

তারপর, নিশ্চিত হয়ে, আমি তাঁকে চিনতে পারলাম। যখন আমি শিশু ছিলাম শ্রীমতী ইয়াঙ তাঁর দইয়ের দোকানে প্রায় সারাদিনই বসে থাকতেন, সকলে তাঁকে দধি-সুন্দরী বলে ডাকত। তখন তিনি পাউডার মাখতেন, তাঁর গালের হাড়গুলো এরকম বেরনো ছিল না। তিনি সারাক্ষণই বসে থাকতেন, কাজেই কম্পাসের সঙ্গে তাঁর মিলটা আমার কখনও চোখে পড়েনি।

সেকালে লোকে বলত—তাঁকে ধন্যবাদ, যে তাঁর দইয়ের দোকানটি ভালোই চলত। কিন্তু আমি তখন খুব ছেলেমানুষ ছিলাম বলে তাঁর কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। যাহোক শ্রীমতী কম্পাস আমার ওপর রুষ্ট হয়েছিলেন, তিনি ঘৃণাসূচক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন—যেমন নেপোলিয়নের নাম শোনে নি এমন একজন ফরাশী অথবা ওয়াশিংটনের নাম শোনে নি এমন একজন আমেরিকানের দিকে কেউ তাকিয়ে থাকে তিনিও সেইরকম ব্যঙ্গের হাসি মুখে ফুটিয়ে আমাকে বললেন!

'তুমি ভুলে গেছ? তার মানে আমি তোমার চোখে এত তুচ্ছ হয়ে গেছি .... '

'মোটেই না ..... আমি ....', আমি কিছুটা উত্তেজিত স্বরে উত্তর দিলাম।

'তাহলে আমার কথায় কান দাও, শ্রীমান সুন। তুমি অনেক পয়সার মালিক হয়েছ, এবং অত পয়সা নিয়ে নাড়াচাড়া করা তোমার পক্ষে বেশ কঠিন, সুতরাং সম্ভবত তোমার পুরনো আসবাবগুলোর দরকার নেই। ওগুলো নিয়ে যাওয়ার চেয়ে আমাকে দিয়ে দাও। আমাদের মতো গরিব লোকের ওগুলো অনেক কাজ দেবে'

'আমি বড়োলোক হইনি। নতুন আশবাব কেনার জন্য এগুলো আমাকে বেচতে হবে—"

'ও, তাহলে বলি, তুমি এখন একটি সার্কিটের পরিচালক হয়েছ, তা সত্ত্বেও তুমি বলছ—তুমি বড়োলোক হওনি? এখন তোমার তিন-তিনটে উপপত্নী, এখন তুমি কোথাও গেলে আট বাহকের বড়ো পালকী-চেয়ার চ'ড যাও, তা সত্ত্বেও তুমি বলবে তুমি বড়োলোক হওনি? —হা! তুমি আমার কাছে কিছুই লুকোতে পারবে না।'

আমার কিছুই বলার নেই বুঝে আমি চুপ করে থাকলাম। 'এখন শোন, বাস্তবিকই মানুষ যতো পয়সা উপার্জন করে, ততোই সে কৃপণ হয়ে পড়ে,' কম্পাস বললেন। এবং রুষ্টভাবে ঘুরতে ঘুরতে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলেন, এবং যেন অন্যমনস্কতাবশে মায়ের দস্তানাটা কুড়িয়ে নিয়ে তাঁর পকেটে ঢোকালেন এবং চলে গেলেন।

এরপর পাড়ার বেশ কয়েকজন আত্মীয় দেখা করতে এলেন। তাঁদের আসা-যাওয়ার মাঝখানে আমি কিছু কিছু জিনিষ বাঁধা-ছাঁদা করে নিলাম, এবং এইভাবে তিন-চারটে দিন কেটে গেল।

একদিন ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়েছিল, দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি চা খাচ্ছিলাম। সেই সময় যেন কেউ এল বলে মনে হল, আমি কে তা দেখার জন্য মাথা ঘুরিয়ে প্রথমটায় খানিকটা অগ্রাহ্যভরেই তাকিয়েছিলাম, পরক্ষণে চটপট উঠে দাঁড়ালাম এবং তাকে স্বাগত জানাতে ছুটে গেলাম।

আগন্তুক ছিল রুনটু। প্রথম দর্শনেই রনটুকে চিনতে পেরেছিলাম, কিন্তু এ-রনটু সে-রনটু নয়। সে আগের চেয়ে দ্বিগুণ বড় হয়েছে, তার আগের লাল গোলগাল মুখটা এখন হলদে হয়ে গিয়েছে, এবং সেখানে অনেকগুলো রেখাও ভাঁজ পড়েছে, চোখগুলো তার বাবার চোখগুলোর মতো ফোলা-ফোলা এবং লাল হয়ে উঠেছে। চেহারাটা সমুদ্রের ধারে যারা কাজ করে এবং সামুদ্রিক হাওয়ায় সারাদিন খালি গায়ে থাকে সেইসব কৃষকদের মতো দেখাচ্ছে। সে মাথায় একটা পশমের পুরনো টুপি এবং গায়ে পাতলা তুলোর একটা জ্যাকেট পরেছে ফলে শীতে সে আপাদমস্তক কাঁপছিল। তার হাতে ছিল কাগজের একটা মোড়ক এবং একটা লম্বা পাইপ। যে পুরুষ্টু লাল হাতের কথা আমার মনে আছে। এ-হাত সে-হাত নয়—এখন তার হাত দুটো রুক্ষ, খসখসে এবং বিশ্রী—পাইনগাছের ছালের মতো।

আমি এত খুশি হয়েছিলাম যে কিভাবে নিজেকে প্রকাশ করব তা বুঝতে পারছিলাম না, এবং আমি কেবল বলতে পারলাম :

'ও! রনটু—তুমি?'

এরপর ওর সঙ্গে অনেক কিছু সম্পর্কে কথা বলতে চাইলাম; যেগুলো সুতোয় গাঁথা পুঁতির মতো একসঙ্গে নিঃসারিত হতে চায় : বনমোরগ, লাফানে মাছ, ঝিনুক, ঝা·· কিন্তু আমার জিভ কেউ যেন টেনে রেখেছে; যে কথাগুলো আমি চিন্তা করছিলাম সেগুলো ভাষায় প্রকাশ করতে পারলাম না।

সে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল, তার মুখে আনন্দ ও বিষাদের ছায়া মাখামাখি। তাঁর ঠোঁট নড়ল, কিন্তু সে একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারল না। অবশেষে একটা বিনীত ভঙ্গি করে সে স্পষ্ট ভাষায় বলল :

'মালিক!'

আমার রক্তের মধ্যে একটা কাঁপুনি বয়ে গেল; আমি মুহূর্তে বুঝতে পারলাম আমাদের দু'জনের মধ্যে কি বেদনাদায়ক একটা প্রশস্ত দেয়াল গড়ে উঠেছে। তবু আমি কিছু বলতে পারলাম না।

সে মাথা ঘুরিয়ে ডাকল :

'শুইশেঙ, মালিককে প্রণাম করো'। তারপর সে একটি ছেলেকে টেনে সামনে নিয়ে এল, ছেলেটি তার পিছনে লুকিয়ে ছিল; রোগা পাতলা ছেলেটা এবং তার গলায় রূপোর মাদুলি নেই।

'এ আমার পাঁচনম্বর সন্তান,' সে বলল। 'ও এখনো উঁচু সমাজে চলাফেরা করে নি, সে জন্য খুব লাজুক আর আড়ষ্ট।'

মা হোঙারকে নিয়ে নিচে নেমে এলেন, হয়তো আমাদের গলা শুনতে পেয়েছিলেন।

'আমি কিছুদিন আগে চিঠি পেয়েছিলাম, মহাশয়া' রুনটু বলল, 'মালিক আসছেন জেনে আমি সত্যই ভীষণ খুশি হয়েছিলাম ....'

'তা তোমরা এরকম চুপ করে আছো কেন? ছেলেবেলায় তোমরা দু'জন খেলার সাথী ছিলে না?' মা উল্লাসের সঙ্গে বললেন, 'তুমি আগের মতো ভাই সুনা বলেই ওকে ডাকো।'

'ও আপনি সত্যই খুব..... সেটা খুবই অবাস্তব হবে। তখন আমি ছেলেমানুষ ছিলাম এবং বুঝতে পারিনি'। কথা বলার সময় রুনটু শুইশেঙকে এসে প্রণাম করতে ইঙ্গিত করেছিলেন, কিন্তু ছেলেটা লাজুক, সে বাবার পেছনে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

'ও-ই শুইশেঙ? তোমার পঞ্চম সন্তান?' মা জিজ্ঞাসা করলেন। 'আমরা সবাই ওর অপরিচিত, কাজেই ওর লজ্জা পাওয়ার জন্য তুমি তাকে দোষ দিতে পার না। বরং হোঙার ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে খেলা করুক।'

যখন হোঙার এ কথা শুনলো সে শুইশেঙের কাছে গেল এবং শুইশেঙ খুব সহজ ভাবেই তার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গেল। মা রুনটুকে বসতে বললেন, একটু দ্বিধা করে সে বসল। তারপর সে তার লম্বা পাইপটা টেবিলের ওপর রেখে কাগজের মোড়কটা হাতে দিয়ে বলল:

'শীতকালে নিয়ে আসার মতো কিছুই থাকে না, তবে কিছু শিম আমাদের জন্য শুকিয়ে রেখেছিলাম, আপনি যদি দয়া করে এগুলো নেন স্যর ...'

যখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম সে কেমন আছে, সে কেবল মাথাটা নাড়াল।

'খুবই খারাপ। আমার ছোট ছেলেটা পর্যন্ত কাজ-কর্ম করে, তবু আমরা পেট পুরে খেতে পাইনা... তাছাড়া কোন নিশ্চয়তা নেই ......সব রকমের লোকই টাকা চায় এবং কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই......এবং ফসলও ভালো জন্মায় না। আপনি ফসল ফলান, কিন্তু যখনই আপনি বেচতে যাবেন আপনাকে সর্বদা কিছু খাজনা দিতে হবে এবং কিছু টাকা খোয়াতেই হবে, যদি বেচতে চেষ্টা না করেন, পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে দাঁড়াবে..... '

সে মাথা নাড়তেই থাকল; কিন্তু তার মুখের খাঁজ-গুলো একেবারেই নড়ে না, সে যেন একটা পাথরের প্রতিমূর্তি। সন্দেহ নেই তার মনটা খুবই তেতো হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সে নিজেকে ঠিকমত প্রকাশ করতে পারছিলনা। কিছুক্ষণ চুপ করে সে পাইপটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে ধূমপান করতে লাগল।

তার সঙ্গে কথাবার্তায় মা বুঝতে পারলেন সে খুবই ব্যস্ত এবং পরের দিনই তাকে ফিরে যেতে হবে, এবং যেহেতু সে দুপুরের খাওয়া সেরে আসেনি, তিনি তাকে রান্না ঘরে গিয়ে দুটো চাল ফুটিয়ে নিতে বললেন।

সে চলে গেল, আমি এবং মা দুজনেই তার দুর্ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করলাম: অনেকগুলো কাচ্চা-বাচ্চা, খাজনা, সৈনিক, ডাকাত, অফিসার, জমিদার সকলেই নিংড়ে নিয়ে তাকে একটা ম্যমিতে পরিণত করেছে।

মা বললেন যেসব জিনিষ আমরা নিয়ে যাবোনা সেগুলো নিজের পছন্দ মতো তাকে বেছে নিয়ে যেতে বলবেন।

সেদিন বিকেলে অনেকগুলো জিনিষই তাকে দেওয়া হল: দুটো টেবিল, চারখানা চেয়ার, একটা ধূপদানি, একটা পিলসুজ এবং একটা দাঁড়িপাল্লা। সে ছাইগাদার সমস্ত ছাই ও নিতে চাইল, (আমরা খড় দিয়ে রান্না করে

থাকি, বেলে জমিতে ছাই সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।) বলল আমরা চলে গেলে সে এসে সেগুলো নৌকায় করে নিয়ে যাবে।

রাত্রেও আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হল, কিন্তু কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে নয়। পরদিন সকালে শুইশেঙকে নিয়ে সে চলে গেল।

আরও ন-দিন পরে আমাদের রওনা হবার দিন সকালে রুনটু এল। এবার শুইশেঙকে সে সঙ্গে আনে নি—তার বছর পাঁচেকের একটা মেয়েকে নৌকা দেখাতে সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

সারাদিন আমরা খুব ব্যস্ত ছিলাম, এবং তার সঙ্গে কথা বলার ফুরসতই পাইনি। তাছাড়া অনেকেই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছিল—কেউ কেউ আমাদের বিদায় জানাতে, কেউ কেউ জিনিষ-পত্র হাতাতে, কেউ কেউ দুটোই। সন্ধ্যার কাছাকাছি আমরা নৌকায় উঠলাম, তৎপূর্বেই বাড়ির সমস্ত জিনিষ-পত্র - তা পুরোন বা ছেঁড়া, বড়ো বা ছোট, সূক্ষ্ম বা স্থূল যা-ই হোক—সাফ হয়ে গেছে।

আমাদের নৌকা ছেড়ে দিল। নদীর দুই তীরের সবুজ পাহাড়গুলো ক্রমশ ঘন নীল হয়ে আসছে। নৌকাটা ক্রমশ ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে।

আমি এবং হোঙার নৌকায় কয়েকবার জানালার ওপর ঝুঁকে বাইরের আবছা দৃশ্যগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করল:

'কাকা আমরা কবে আবার ফিরে আসব?'

'ফিরে আসব? যেখানে যাচ্ছি—না গিয়েই ফিরে আসব?'

'বলছিলাম কি শুইশেঙ তাদের বাড়িতে যাবার জন্য আমাকে নেমন্তন্ন করেছে......' কালো এক জোড়া বড়ো বড়ো চোখ মেলে উদ্বিগ্ন স্বরে সে বলল।

আমি এবং মা খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়লাম, এবং তখন রুনটুর নাম আবার মনে পড়ে গেল। মা বললেন—যেদিন থেকে আমরা জিনিষ-পত্র গোছ-গাছ শুরু করেছি, সেদিন থেকেই শ্রীমতী ইয়াঙ প্রত্যেক দিন আমাদের বাড়ি আসতেন। কদিন তিনি ছাইগাদা খুঁড়ে এক ডজন থালা ও প্লেট বের করেছেন, তাঁর জোরালো ধারণা ওগুলো রুনটুই লুকিয়ে রেখেছিল; আমরা চলে যাওয়ার পর সে যখন ছাইগাদা থেকে ছাই নিতে আসবে, সেই সময় ওগুলো নিয়ে যাবে। এই আবিষ্কারের পর শ্রীমতী ইয়াঙ গভীর আত্মপ্রসাদে আমাদের কুকুর নিরোধক খাঁচাটি নিয়ে মুহূর্তে সরে পড়লেন (এতদঞ্চলে যারা হাঁস-মুরগী পালন করে তারা এই কুকুর নিরোধক খাঁচা ব্যবহার করে। এই খাঁচা কাঠ দিয়ে তৈরী করা হয়—হাঁস বা মুরগী গুলো যখন গলা বাড়িয়ে খাবার খায়, তখন তাদের দিকে তাকিয়ে দেখা ছাড়া রাগী কুকুরগুলোর আর কিছুই করার থাকে না।) তাঁর পায়ের যা আকার তাতে তিনি যে অতো জোরে ছুটতে পারেন তা না দেখলে বিশ্বাস করাই কঠিন।

আমি আমাদের পুরোন ভিটেটা পেছনে ফেলে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যাচ্ছি, সেই সঙ্গে আমার জন্মভূমির পাহাড় এবং নদীগুলোও ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু আমার মনে কোন কষ্ট হচ্ছে না। আমি কেবল অনুভব করতে পারছি আমার চারপাশে অদৃশ্য এক উঁচু দেওয়াল এতোদিন আমাকে ঘিরে ছিল, আমাদের সঙ্গীদের থেকে সরিয়ে রেখেছিল,—আমাকে পুরোপুরি হতোদ্যম করে রেখেছিল। গলায় মাদুলি-পরা তরমুজক্ষেতের সেই ছোট্ট নায়কের ছবিটি আগে আমার কাছে দিনের মতো উজ্জ্বল ছিল, কিন্তু এখন তা হঠাৎ ঝাপসা হয়ে গেছে, এখন কেবল আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলছে।

মা এবং হোঙার ঘুমিয়ে পড়লেন। আমিও শুলাম, নৌকার নিচে জলের কলকল্ শব্দ কানে আসছে। আমি সঠিক পথেই এগিয়ে যাচ্ছি। আমি ভাবছিলাম:

আমার এবং রুনটুর মধ্যে এরকম একটা পাঁচিল আছে ঠিকই কিন্তু আমাদের ছেলেপুলেরা তাদের মধ্যে সহজ সম্পর্ক গড়ে তুলবে। একটু আগেই হোভার শুইপেঙের কথা ভাবছিলনা? আমার আশা, তারা আমাদের মতো হবে না; তারা নিজেদের মধ্যে গড়ে তুলতে দেবে না কোন পাঁচিল। তাদের আমি পছন্দ করব না যদি তারা আমার মতেই একজন হয়, আমার মতোই বৈচিত্র্যহীন জীবনে অভ্যস্থ হয়. অথবা রুনটুর মতো যন্ত্রনায় মূক হয়ে ক্লেশ সহ্য করে, অথবা আরো অনেকের মতো অসংযত জীবনযাত্রায় নিজেদের সমর্পণ করে। তারা নতুন জীবন লাভ করুক — যে জীবনের আস্বাদ কখনও পাই নি আমরা।

আশার সঞ্চারের শুরুতেই আমি হঠাৎ ভীত হয়ে পড়ি। যখন রুনটু আমার কাছে ধূপদানি এবং পিলসুজ-গুলো চেয়েছিল আমি মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলাম, এই ভেবে যে এখনো সে ব্যক্তি পূজা করে চলেছে এবং মন থেকে কখনও মূর্তিগুলো অপসারিত করতে পারবে না। তবু এইমাত্র যাকে আমি 'আশা' বললাম তা আমার নিজের গড়া মূর্তি ছাড়া আর কি? একমাত্র তফাত এইখানে যে, সে যা চেয়েছিল তা তার হাতের কাছেই ছিল, আমি যা চেয়েছি তা বাস্তবে রূপায়িত করা সহজ নয়।

আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। জেড-পাথরের মতো সবুজ সমুদ্রতীরের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে আছে আমার চোখের সামনে। ওপরে গাঢ় নীল আকাশে সোনালি গোল চাঁদ ঝুলে আছে। আমি ভাবছি: আশা একেবারেই নেই তা যেমন বলা যায় না, তেমনি আশা আছে তা-ও হলফ করে বলা শক্ত।

পৃথিবীর আর দশটা পথের মতোই আশাও দূরপ্রসারী কেননা প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে কোন পথই থাকে না, যখন বহু মানুষ দলে দলে একটা জায়গার উপর দিয়ে হেঁটে যায় তখনই কেবল একটি পথ তৈরী হয়ে থাকে।

প্রসঙ্গ গোধূলি মন :

প্রিয় সম্পাদক,

সাহিত্যের দেওয়ালে পিঠ রেখে যখনই কাব্যচেতনার আকাশে চাই অজস্র তারার মতো চোখে পড়ে লিটল ম্যাগাজিন। অথচ সন্ধ্যাতারার মতো উজ্জ্বল 'গোধূলি মন' আমাকে অনেকটা অধিকার করে ফেলে। অনেক ভাবাবেগে কথাগুলো বলে ফেললাম। একমাসান্তরে গোধূলি মন হাতে এলে ভাবি লিটল ম্যাগাজিন বেঁচে আছে। সাহিত্যের জন্য অন্তত একজন সম্পাদক সবকিছু ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন। কাগজ নিয়মিত পাই। আনন্দ যে কতোখানি—আপনিও কবি—কী ভাষায় বোঝাই! বর্তমান সংখ্যাটা পেলাম (আষাঢ়-শ্রাবণ)। কবিতাগুলো সব ভালো লাগলো না। কৃষ্ণসাধন নন্দীর দ্বিতীয় কবিতাটি না থাকলে ভালো হতো। সোফিওর রহমানের কবিতায় মামুলি শব্দের প্রয়োগ। অন্যান্য কবিতাগুলো মোটামুটি। নিভা দে'র কবিতা মনে দাগ কাটে। পুস্তক সমীক্ষা লেখকদের মান বাড়াবে। রূপক রচনা ভালো।

আমার দূরের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন নিন।

মধুসূদন মাটী
রাজারামপুর

গৌর বৈরাগী'র

এগারোটা কুড়ি

বসে থাকতে থাকতে সুবল একজনকে জিজ্ঞেস করল—কটা বাজে।

একজন হন হন করে হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে ঘড়ি দেখল। তারপর না তাকিয়েই বলল—এগারোটা কুড়ি

শুনে চারদিক তাকাল সুবল। দশটা দশ কোথায় গেল? দশটা দশ মানে কলেজ গার্ল, দশটা তিরিশ মানে জুটমিলের ভোঁ, হলুদ রোদ্দুর। কালো কোট গায়ে উকিল বাবু, পাশে পাশে মুহুরী। কিন্তু এসব সে ত' দেখে নি। যা: এগারোটা কুড়ি হতেই পারেনা এখন। লোকটার ঘড়ি নির্ঘাত—হঠাৎ টুকাই শব্দে তাকাল সুবল। মাথার ওপর ঝুপড়ি বট। ঝুপড়ি বটের টোল টোল পাতার ফাঁকে টোপা টোপা ফল। যুবক টিয়া আবার গাঢ় স্বরে ডাকল—টুকাই।

টুকাই ঠিক পাশটায়। কি রকম অভিমানী অভিমানী মুখ যুবতীর। আড়চোখে একবার তাকাল তারপর যেমন কে তেমন। টপ করে একটা ফল পড়ল গায়ের ওপর। সুবল মুখ নামাতেই দেখল আর একজন। একটু দূরে। হেঁটে আসছে। হাতে ঘড়ি। সুবল মনে মনে ঠিক করে নিল। এবার সে ঠিক সময়টা জেনে নেবে। ওপার থেকে লঞ্চটা এইমাত্র এপারে জেটিতে এসে ঠেকল। জলে ছোট ছোট ঢেউ। একটা ল্যাজঝোলা পাখি ভয় পেয়ে প্রিক করে আকাশে। একটু একটু হাওয়া আসছে। উত্তুরে। হাওয়ায় কাগজকলের গন্ধ।

—কটা বাজল।

এবার সেই একজন একবার মাত্র তাকাল। তারপরই মুখ ঘুরিয়ে ঘড়িতে—এগারোটা কুড়ি।

খুব ধাঁধায় পড়ে গেল সুবল। দুজনের ঘড়ি ঠিক এতটা করে ফার্স্ট। তা কি হয়! তাহলে জুটমিলের ভোঁ। কালো কোট গায়ে উকিলবাবু। কড়কড়ে ধুতি পাঞ্জাবী পরা সুরেনবাবু। সুরেন বাবুর প্রতিদিন ফার্স্ট পিরিয়ড। ইংরিজির ক্লাশ। সুরেন বাবু বলত—বাবা সুবল—তা যাক্ সে কথা। এখন সুরেন বাবু মানে দশটা দশ। অথচ আজ সেই সুরেন বাবুকে ত' সে দেখতেই পায় নি। তাহলে কি দশটা দশ তাকে না বলে চলে গেছে। কিন্তু তা কি করে সম্ভব তাকে না জানিয়ে ত' কেউ কোনদিন যায় না। দশটা দশ যায় না। দশটা কুড়ি যায় না। দশটা চল্লিশ ও নয়। সে ঠিক টের পায় এদের যাওয়া। ব্যস্ততার মধ্যে একবার অন্তত।

এদের যাওয়ার পথে সুবল গঙ্গা দেখে। গঙ্গার ঢেউ। সে ঢেউ গোনে। একটা ঢেউ। দুটো ঢেউ। তিনটে ঢেউ। একটা নৌকো চলে যায় সামনে দিয়ে। জেলে নৌকা। নৌকায় একজন মাঝি দাঁড় বায়।

কি বসে নাকি?

সুবল তাকায়। দশটা কুড়ি তার পাশে এসে দাঁড়ায় একসময়। সে হাসে। ডান হাত দিয়ে বেঞ্চিটা পরিষ্কার করতে করতে বলে—বসবে নাকি?

দশটা কুড়ি হেসে ফেলে। তারপর বড় বড় চোখ নিয়ে বলে—হ্যাঁ এখন বসারই সময় বটে। স্কুলের ঘন্টা। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চেম্বার খোলা। আমি যাই সুবল। বলতে বলতে দশটা কুড়ি হন হন করে এগিয়ে যায়।

সুবল একা। এই রকম একা একা হলেই সে

গাছ দেখে। সবুজ 'অশথ' গাছ। গাছে গাঢ় সবুজ শিশু পাতা। একজন আঁকসি দিয়ে পাতা পাড়ে। সবুজ পাতায় ক্লোরোফিল আছে যা একমাত্র পশুরাই হজম করতে পারে। পাতা বিক্রি ক'রে সেই একজন সংসার চালায়। তোমার নাম কি ? সুবল একদিন জিজ্ঞেস করেছিল।

—আজ্ঞে বোজ্জো। লাল দাঁত বার করে হেসেছিল ব্রজ। ছাগলের জন্য পাড়ি বাবু।

—বেশ বেশ। সুবল উৎসাহ দিয়েছিল। ছাগল দুধ-টুধ দেয় ?

দেয় বইকি। পাতার বাণ্ডিল করতে করতে সে বলেছিল।

এব্‌লা একপো, ওব্‌লা আধপো টাক।

—দুধ কি কর ?

—আজ্ঞে বিক্কিরি করি।

—কেজি কত করে ?

—তিন টাকা।

সেই লোকটা আজও পাতা সমেত ডাল ভাঙছে। ছাগলকে খাওয়াবে। বেশ বেশ।

হঠাৎ রাণীর ঘাটের ওঙ্কারনাথ আশ্রম থেকে নাম গান ভেসে আসে। কলিযুগে একমাত্র নামগানই সার। সুবল ফিক্ করে হাসে। সে নাম গান শোনে। সন্ধে বেলায় ওখানে বেশ ভিড় হয়। এই ব্রজ যায় নাম শুনতে। হরি আসে। নেত্য আসে। মটোরে করে রতি গোস্বামীর বউ আসে। বাজারের চুমকী মিতুরা আসে মাঝে মাঝে। তখন ওদের কোমর দেখা যায় না। চোখে তখন 'তাকানো' থাকে না ওদের। পাটভাঙা সাদা খোলের শাড়ি বেশ করে শরীর মুড়ে ভক্তি ভক্তি মুখে বসে নাম শোনে ওরা। মাঝে মাঝে গাড়ি নিয়ে টাগাওয়ালাও এসে নাম শোনে। তখন ধর্ম মহা সম্মেলন হয়। এই সময় হাসি ঠেলে আসে সুবলের। সে হাসেও।

—কি ব্যাপার হাসি কেন ?

সুবল তাকায়। দশটা তিরিশ পাশে দাঁড়িয়ে। ব্যস্ত ব্যস্ত মুখ।

—এমনি। সুবল হাসতে হাসতে বলে। তারপর বেঞ্চির ওপরের ধুলো হাত দিয়ে পরিস্কার করে বলে—বোস না একটু। কথা বলি।

—এ সময় কি বসা যায়! দশটা তিরিশ ব্যস্ত মুখে আশপাশ তাকায়। মিলের ভোঁ। কলেজের ঘন্টা। স্কুলের ঘন্টা। অফিস বাবুদের ঘর খোলা। কত কাজ। বলতে বলতে সে চলে যায়।

সুবল আবার একা। একা একা হলে সে এমনি এমনি কথা বলে। এমনি এমনি হাসে। এমনি এমনি দেখে। কলেজের মেয়ে দেখে। পিঠে ব্যাগ স্কুল-স্টুডেন্ট দেখে। অফিস বাবু দেখে।

সুবল গলা বাড়ায়—কটা বাজল দাদা।

—এগারোটা কুড়ি। চকিতে ঘড়ি দেখে একজন দ্রুত চলে যায়।

এবার সুবল সত্যি সত্যি চমকে ওঠে। এখনও এগারোটা কুড়ি। ঘড়ি কি সব বন্ধ হয়ে গেল তাহলে। সব ঘড়িতে কেন এগারোটা কুড়ি। তাহলে কি সময়।

ফ্যাট্। সে হাসে। তা কখনও হয় নাকি। সে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে বাপির চায়ের দোকান। বাপির হাতে ঘড়ি। বাপি গত মাসে দুশো টাকা দিয়ে নতুন ঘড়ি কিনেছে।

কটা বাজল রে বাপি।

এগারোটা কুড়ি।

সুবল চমকে ওঠে। কিন্তু কিছু বলে না। শুধু এক কাপ চা চায়।

গম গম করছে কোর্ট। উকিল বাবুরা ব্যস্ত। গ্রামের মতিলালেরা পেছন পেছন। পুলিশ ভ্যান ভর-ভরন্ত দশ মাস আসামী পেট নিয়ে এসে থামে।

সুবল দেখে। এমনি এমনি দেখে। দেখতে দেখতে দেখে ফেলে অনিলকে, অনিল তার ক্লাস ফ্রেণ্ড। এখন উকিল হয়েচে। সুবল তাড়াতাড়ি গলায় চা ঢেলে এগিয়ে যায় অনিলের দিকে।

—কি ব্যাপার। অনিল ওকে দেখে হাসে। ডিক্লারেশন ত'। পাঁচ টাকার নন জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প আন। আমি সব করে দিচ্ছি।

—তার মানে! সুবল হাঁ করে তাকায়।

অনিল ব্যস্ত গলায় বলে ওঠে—এখন বেকার ভাতায় ডিক্লারেশন লাগছে।

সুবল আবার হাসে,—তার জন্য আসিনি। তোর ঘড়িতে এখন কটারে অনিল?

ব্যস্ত অনিল ঘাড় ঘুড়িয়ে ঘড়িতে চোখ রাখে—এগারোটা কুড়ি।

—আশ্চর্য!

—কি আশ্চর্য? অনিল তাকায়।

—সব ঘড়িতেই এগারোটা কুড়ি—জানিস অনিল।

অনিল হাসে। চাকরী-বাকরী কিছু করছিল, না এখনও বাবার হোটেলে?

সে জবাব দেয় না হাঁটতে থাকে। কোর্টে গম্-গম্ করছে এজাহার। সে এগিয়ে যায়। থানার বড়বাবু লম্বা সিগারেট ধরিয়ে ডায়রী লিখছে। সে আরও হাঁটে। কলেজের প্রেম দেখে গঙ্গার ধারে আনাচে কানাচে। তারও একটা প্রেম ছিল। তার প্রেমের নাম দোলা। দোলা এখন বর্ধমানে। দোলার বর ইনকাম ট্যাক্স ইনস্-পেক্টর। সে হাঁটে। গম্-গম্ করছে কলেজ লেকচার। সে পায়ে পায়ে লেকচার পেরিয়ে আসে। স্কুলের কাছাকাছি এসে সুবল দেখতে পায় সুরেন স্যারকে। সুরেন স্যার হাতে ডাস্টার নিয়ে এইমাত্র ক্লাশ থেকে বেরিয়ে আসেন। আঙুলে চক খড়ির সাদা। চক খড়ি ধরলে সুরেন বাবুর আঙুল এখন কাঁপে। সুবল একেবার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

—কে?

—আমি সুবল স্যার

—কি ব্যাপার! সুরেন স্যার না বুঝেই পিঠে হাত রাখেন। সুবল একটুও সময় নষ্ট না করে বলে ওঠে—এগারোটা কুড়ি কিছুতেই শেষ হচ্ছে না স্যার। আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি। সবাই-এর ঘড়িতেই এখন ঐ সময়। এগারোটা কুড়ি। এগারোটা কুড়িতেই দাঁড়িয়ে আছে। বলতে বলতে হাঁফাতে থাকে সুবল।

প্রসঙ্গ গোধুলি মন ঃ

প্রতি সংখ্যা পাই এবং মন দিয়ে পড়ি। মনটানা কবিতা ও চিন্তা জাগানো প্রবন্ধ থাকে প্রতি সংখ্যাতেই। গল্পের অংশটা সব সময় মজবুত মনে হয় না ওদিকে আর একটু মনোযোগ দরকার। ইদানীন্তন ছোট্ট পত্র পত্রিকার মধ্যে উন্নত রুচি ও পরিচ্ছন্ন ছাপার জন্তে যেমন, তেমনি যুগসচেতন সাহিত্য দৃষ্টির জন্তেও গোধুলি মনের ভূমিকা ভীড়ে হারানোর মত নয়।

আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ইতি,

নিত্যহিতার্থী
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সিসিল ডেলুইস আর তাঁর কবিতা

ভাষান্তর : উশীনর চট্টোপাধ্যায়

ঐতিহ্যানুসারিতার পরিপন্থী হিসাবে সমরোত্তর ইংরেজী কবিতায় স্বীয় কণ্ঠস্বর যোজনা করে কবিতার স্রোতকে যাঁরা ভিন্নমুখে প্রবাহিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, সিসিল ডেলুইস তাঁদের অন্যতম ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত বা সামান্য পরিচিত পাঠক মাত্রেরই বোধহয় অল্পবিস্তর একথা জানা আছে। কবিতার নিত্য প্রবাহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল পাঠকের জন্য আজ তাই ডেলুইসের তেমন কোন নূতনতর বা বিস্তৃততর পরিচয় জ্ঞাপক দ্বারোদঘাটনের মধ্যে না গিয়ে, কেবল অনভিজ্ঞ ও অমনস্ক পাঠকের কাছে তাঁর কবি চরিত্র সম্পর্কে সামান্য আলোক-পাতই এই সীমিত পরিসরে সাধ ও সাধ্যের বিরোধ ভঞ্জনে শ্রেয় বলে মনে করি।

একটি ঈঙ্গ-অইরিশ পরিবারে ডেলুইসের জন্ম হয় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে। মাতৃ-সূত্রে তিনি ছিলেন অলিভার গোল্ডস্মিত-এর বংশধর। শেরবোর্ণ স্কুল ও ওয়াডহাম কলেজে অধ্যয়ন শেষ করে ডেলুইস স্কুল শিক্ষক হিসাবে জীবিকা শুরু করেন। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করার পর নিজেকে নিযুক্ত করেন পুরোপুরি সাহিত্য চর্চায় এবং ইংলণ্ডের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থ গুলির মধ্যে Collected poems, A time to Dance, Overtures to Death, World for all ইত্যাদি বিখ্যাত। এছাড়া Nicholas Blake ছদ্মনামে লিখেছন কিছু গোয়েন্দা কাহিনীও। কাব্যচর্চার পাশাপাশি তিনি যে কাব্যতত্ত্ব নিয়েও অধ্যয়ন করেছিলেন তার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে তাঁর Hope for poetry এবং ১৯৪৬ সলে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ক্লার্ক বক্তৃতা The Poetic Image বই দুটিতে।

বিশ-তিরিশের দশকের এলিয়ট, অডেন, ম্যাকনীস এবং স্পেণ্ডার প্রমুখের প্রায় সমসাময়িক ডে লুইস-এরও প্রাথমিক পর্বে কাব্য প্রেরণার প্রধান সূত্র ছিল প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বিভৎষতা। যদিও ডে লুইস নিজে একজায়গায় বলেছেন যে, 'যুদ্ধোত্তর কবিতার জন্ম ধ্বংসের মধ্যে এবং এপথের প্রথম পথিক হলেন হপকিন্স, ওয়েন ও এলিয়ট।' পরবর্ত্তীতে অবশ্য স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের নিপীড়ন এবং রুশবিপ্লবে বলসেভিক পার্টির জয়লাভ ডে লুইস-এর ধ্যান ধারণাকে কিছুটা আন্দোলিত করে তুলেছিল, এবং তাঁর সমসাময়িক অনেকের মত তিনিও মার্কসবাদের প্রতি উৎসাহী হয়ে ওঠেন। তাঁর এই সময়ের কবিতায় জনজীবনের প্রতি আগ্রহ ক্রমশঃ প্রবল হয়ে ওঠে। যদিও দ্বিতীয় যুদ্ধারম্ভের পরই অডেন, স্পেণ্ডার প্রমুখের মত তাঁরও রাজনৈতিক মতের পরিবর্তন ঘটে। কোনো কোনো সমালোচক অবশ্য বলে থাকেন যে 'স্কুল অফ সোস্যাল কনসাসনেস্'-এর প্রভাবই ডে লুইস্-এর কবিতাকে কিছুটা অধঃপতনের মধ্যে দিয়ে অসামাজিক ও ঐতিহ্যানুসারী করে তুলেছিল।

ডে লুইস-এর একাধিক কবিতারই প্রধান সম্পদ শৈশবস্মৃতি, নিসর্গানুরাগ, স্বদেশপ্রীতি ইত্যাদি, যাকে তিনি যথার্থ লিরিক অনুভূতিতে রূপান্তরিত করেছেন। আধুনিক জীবনের বহুবৃত্তি, প্রবণতা ও সমস্যাকে কাব্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করে তিনি ছন্দ ও ভাষাভঙ্গী নিয়েও পরীক্ষা চালিয়েছেন। ডেলুইস মনে করতেন কবিতা হচ্ছে একধরণের বৃত্তি, অভ্যাস এবং সত্যানুসন্ধান। এই ধারণায় পৌঁছতে শুরু হিসাবে তিনি মেনেছিলেন রবার্ট ফ্রস্টকে, যে ফ্রস্টের ধারণা ছিল, কবিতা শুরু হয় আনন্দের মধ্যে, প্রজ্ঞার ভিতরে যার

সমাপ্তি। ক্লস্টই নয় শুধু, ডে লুইস-এর নিজের অন্ততঃ মনে হয়েছিল যে, কবিতার কলা কৌশলের ক্ষেত্রে তিনি ভার্জিল, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, হার্ডি, ইয়েটস্‌, ভ্যালেরি ও অডেনের দ্বারা প্রভাবিত।

ডে লুইস্‌ মানতেন যে, আধুনিক কবিতা কোনো একটি বিশেষ সময়ে উত্থিত হয়ে শূন্যস্থান পূরনের বস্তু নয়— ১৯০০ বা ১৯১৭ কিম্বা ১৯৩৩-এই যার সহসা আবির্ভাব বলে অনেকে মনে করেন। আধুনিক কবিতা বলতে তিনি সেই কবিতাকেই বোঝাতে চেয়েছিলেন যা এক বছর আগেই লেখা হোক বা পাঁচ শতাব্দী আগেই রচিত হোক, তাৎপর্যের দিক দিয়ে যা আজও ভাস্বর। এই ধারণাই তাঁর কবিতার স্বপক্ষে তাঁর নিজের এবং এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তাঁর একেবারে প্রথমপর্বের কিছুটা নস্টালজিক ও নিসর্গানুরাগী কবিতাদুটিরও তর্জমায় অনুবাদকের প্রথম ও প্রধান স্বীকৃতি বলে মনে করি॥

পৌরাণিক দ্বীপের কাছে পুনরায় এসে

সাইরেন বেজেছিল; নাবিকের দেহে ছিল মেদ;
পৌরাণিক এই দ্বীপে আজ ফের অগ্রসর হ'য়ে
আমরা বিস্মিত হই; কী হেতু এখানে বিশ্রামের?
স্থূল ওই মানুষেরা দিয়েছে তো অস্থি বিসর্জন!
যৌবনও নিশ্চিত গেছে ওইখানে গায়িকাসজ্জের
কণ্ঠ থেকে উবে!
কর্কশ গলার স্বর; লেগে আছে প্রসাধন শুধু
অনিবিড় ভাবে;
দাঁতের আঁচর থেকে বিরত ঠোঁটের হাসিটুকু
কবরের ভূত হয়ে যন্ত্রনায় সমর্থন চায়।
দংশনে অক্ষম ওরা; আমাদেরও মজ্জা নেই দেহে;
ক্ষুধা আর কালঘামে অবিরাম কশাঘাত স'য়ে
মিশে গেছি হাড়ের ভিতর;
কংকাল নাবিক দল অতএব স্রোতের উপর
অবিরল পরিশ্রম করি
আর প্রলোভন পেতে পরিহাস করে গেয়ে উঠি
প্রাসঙ্গিক গান।
প্রয়োজন নেই আজ গোচরে আনার এইসব;
বেগুনী আকাশ থেকে, গোধূলির অলংকার থেকে
তাইতো নিবৃত্ত রাখি চোখ।

(Nearing again the legendary isle)

রোমাঞ্চকর

সূর্য্যের অনতি দূরে ক্ষুদ্রতর আর কেউ নেই;
অথচ চাতক তোর শানিত অখণ্ড ধ্বনিটির
স্ফটিক স্বচ্ছতা এনে এনিথর বাতাসের হ্রদে
বিস্তৃত পরিধি কার এইখানে ভ'রেছে দুপুর।

হোক তবে তীব্র আরো তোমার ওই উদ্দীপ্ত বিহার
আকাশ-পালিত তোর সুর;
রণিত হৃদয় এক ওই দূরে কর শিহরিত;
যেখানে ডানার সাথে স্বর তোর এক হ'য়ে মেশে,
মুখর নক্ষত্র আর উজ্জ্বল সংকেত একাকার
ভেসে যাও আজ ওইখানে।

দিওনা বিরাম টেনে দিনমান প্রস্থানের আগে;
আকাশ বন্যার স্নানে প্রশস্ত দুপুর যাবে চলে,
তখনি আসবে ফিরে আলোর স্রোতের মুখ, থাকো
তুমি ততক্ষন ওইভাবে;
তারপর যেও, যেও ওই ব্যপ্ত তলদেশে নেমে
শাশ্বত শান্তির কাছে নেমে।

(The Ecstatic)

ধূর্জটিপ্রসাদ : 'রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজনীতি'

জীবেন্দু রায়

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজনীতি ধূর্জটিপ্রসাদ লিখেছিলেন উনিশশো চল্লিশে। এপ্রিল মাস। সময় নির্দেশের কারণটি খুবই গুরুতর। গুরুতর এই কারণে যে তা আশ্চর্যভাবে ভারসাম্যযুক্ত এবং সেইকালে ভারসাম্যহীনতাই যখন স্বাভাবিক বলে নিজের দাবী জানাচ্ছে। কারোর কাছে বুর্জোয়া বলে কবি বহুনিন্দিত। কেউ বা দেবতা ছাড়া আর কিছু ভাবেন না। বলাবাহুল্য দুইই অনৃত ফলত বর্জনীয়। ধূর্জটির মতামতেও ফাঁক আছে, এবং তা অবশ্যই সমালোচনাযোগ্য। কিন্তু সহিষ্ণুতা দেখবার মতো। বস্তুত এই সহিষ্ণুতাই তাঁকে বাঁচিয়ে দেয় হঠকারিতার হাত থেকে। মার্কস-তন্ত্রে ঠিক দীক্ষা নয়, আস্থাই তাঁকে আমাদের কাছে গ্রহণীয় করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ কথার কেন্দ্রটিকে তিনি ধরতে পেরেছিলেন বলেই আমার মনে হয়। দীক্ষা নিলে, সত্যি কথার সঙ্গে, কিছু বাঁধি বুলিও সংক্লেশে আউরে যেতে হতো তাঁকে।

কবিত্ব ও রাজনীতি সম্বন্ধে দুটো দামী কথা বলেছেন ধূর্জটি। প্রথম কথা কবিতা জীবনব্যতিরিক্ত অ-সামাজিক কোনো শক্তি নয়। তা জীবনসম্পৃক্ত, জীবনেরই অংশ —'বাই প্রোডাক্ট' কিছুতেই নয়। আর দ্বিতীয়ত রাজনীতিও তাই। তা দলাদলি, পার্টি চালানো বা বিরুদ্ধতাচারণ নয়। যদি রাজনীতির গূঢ়ার্থ এই সংজ্ঞায় এসে সীমাবদ্ধ হয় তবে সে দায়িত্ব পালন করে ওঠা কবির পক্ষে শক্ত। ধূর্জটি বলেছেন রাজনীতির এহেন নঞর্থক মানেটা যে আমরা করেছি তার কারণ আমাদের প্রায় সহস্র বৎসরের পরবশ্যতা। অদ্ভুত ভালোলাগে শুনতে যখন দেখি তিনি লেখেন, 'আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসটা অন্তর্শক্তির স্ফুরণ নয়, শাসন কর্তার বিরুদ্ধাচরণ।' অবশ্যই সে ভালোলাগা এর সদর্থক এর সৎ অংশটুকুর জন্য। অর্থাৎ যেখানে সবটুকু শক্তিই ব্যয়িত হয় বাহিরের বাধার প্রতি বিরুদ্ধতায়। বাহিরটাকেই যেখানে সবচেয়ে বেশী দাম দিয়েছি। কংগ্রেস করেই ভেবেছি স্বাধীনতা অর্জনের অনেকটা কাজ করে ফেললাম। মার্কসবিৎ লেখকের কাছে এ উপলব্ধি সত্য হয়েছে রবীন্দ্র বিশ্বাসের পথ ধরে। বিশ্বসুদ্ধ লোক জানেন, রবীন্দ্রনাথের লড়াই, অন্তত 'সভ্যতার সঙ্কট' লেখবার আগে পর্যন্ত এই 'অন্তর্শক্তির স্ফুরণ'—তিনি নিজে যাকে বলতেন 'আত্মশক্তির উদ্‌বোধন', তাতেই নিয়োজিত ছিলো। এ সাধনার প্রকৃতি একেবারে ভারতীয়। অন্যদিকে 'শাসনকর্তার বিরুদ্ধাচরণ' তো রবীন্দ্রবচনে সেই 'বিলাতী ধরণে' ষ্টেট তৈরীর বাসনা। একথার মধ্যে দুটি বিষয়ই ভেবে দেখবার মতো। এক, এ রাজনীতি আমাদের জীবন সমুদ্র মন্থন করা ধন ঠিক নয়, আদতে এ ব্যাপারটা ইংরেজী পড়া সমস্যা এড়ানো বাবুদের কীর্তি। ডাফরিনের 'মাইক্রোসকোপিক মাইনরিটি' কথাটা আমার আর গালাগাল ঠিক মনে হয় না। মনে হয় এটা একটা অবস্থারই সত্য বিবৃতি।

দ্বিতীয়ত রাজনীতি ব্যাপারটাকে এভাবে দেখার জন্য চিন্তা যুক্তিতে ফাঁকও থেকে গেছে যথেষ্ট। 'কালচার ও পলিটিক্‌স'কে এভাবে দেখার পদ্ধতিটাই হলো ভুল। কবি তো মানুষই, মানুষ বলেই সমাজসত্ত ও রাষ্ট্রসত্তা উভয়ের প্রতিবিম্বক তাতে হতে বাধ্য। এই যে মানবসত্তা তার যথার্থ সর্বাঙ্গিক বিকাশের জন্য গতিধর্ম সমন্বিত সমাজ ও সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তি আবশ্যক। সৃষ্টিশীল মানুষ, একমাত্র স্বাধীন হলেই প্রকৃত রসোপভোগে তন্ময় হতে পারে। এসব প্রত্যয় একেবারে মৌলিক ব্যাপার। এবং এরকম

এত ব্যাপকভাবে, শিকড় সমেত ইংরেজ দ্রোহিতা তো বিরাট ব্যাপার। ধূর্জটী বিশ্বাস করেছেন যে রবীন্দ্র প্রত্যয় বা প্রকল্প এই আদিম প্রতিজ্ঞার ওপরেই দাঁড়িয়ে। তার সার কথাটি হলো, পরাধীন রাষ্ট্রে এবং আচলায়তনিক সমাজক্ষেত্রে মানুষের সৃষ্টিক্ষমতার চরম প্রকাশ, আর সে সৃষ্টি সম্ভোগ দুই-ই একপ্রকার অসম্ভব।

রবীন্দ্র অনুভব ধূর্জটীকে একটু অভিভূত করেছে। না হলে তিনি দেখতেন এ প্রত্যয় বা বিশ্বাসেও যথেষ্ট অসম্পূর্ণতা আছে। রবীন্দ্রনাথ আত্মশক্তির উদ্‌বোধন চেয়েছিলেন, য়ুরোপীয় ধাঁচের যে রাষ্ট্রতন্ত্রটি ভারত সাম্রাজ্যের চূড়ায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে—সেটিকে একরকম উপেক্ষা করেই। এও কি সম্ভব। চিরদিন ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র'ই প্রবল বলে ইম্পিরিয়াল শক্তি বসে বসে তো আর তার উদবোধন দেখতে পারেনা। এটা একটা আইডিয়া। তার হাঁ-ধর্মী দিক অবশ্যই আছে। আর তা রাষ্ট্রমুখী সাধনার পরিপূরক শক্তি হিসেবেই। ওটাকে বাদ দিলে চলতে পারে না এবং চলেওনি। গোরা বলুন, ঘরে বাইরে বলুন সব জায়গাতেই রবীন্দ্রনাথ কেবল গৃহদাহের ছবিটাই বড়ো করেছেন। শেষ বইটির ক্ষেত্রে একমাত্র বললেও ভুল হয় না। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পেই কিন্তু পূর্ণবৃত্ত আছে বলে আমার মনে হয়। এখানে নায়েবরা সত্যি। ভীতু জেলেগুলো সত্যি আবার যে সাহেব কেবল সামান্য আক্রোশের বশে নৌকার পাল ফুটো করে তা ডুবিয়ে দেয় তাও সত্যি। এই বন্দুকধারী রাষ্ট্রতন্ত্রকে বাদ দেওয়া যায় কি, ভয় অবশ্য পাওয়া যায়! রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন এই রাষ্ট্রশক্তিকে উপেক্ষা করেছেন। তাঁর কর্মপদ্ধতির আন্তরিকতায় সংশয়ের অবকাশ নেই, কিন্তু তা অবশ্যই মূল প্রবাহ থেকে স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্নও বটে। আগেই বলেছি সে বিচ্ছিন্নতা বাঞ্ছনীয় ছিল না কিন্তু তাই ঘটেছে।

এর পরেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কথা। মনীষী বেনথাম এর জন্মদাতা। এ সময়ে ইংলণ্ডে বেশ ভালো-রকম বন্ধ চলেছে। নতুন বাজারই শেষতঃ এর প্রেরণা ও উদ্দেশ্য, একাধারে দুই-ই। মুনাফাবৃদ্ধির নির্বাধ অক্ত-পাতের অধিকারই হলো গত শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার প্রথম প্রয়োজন। বত্রিশটি লিবারেলিজম আদতে এই বস্তু।

য়ুরোপীয় ধাঁচের রাষ্ট্র ভারতে ছিল না ধূর্জটির একথা ঠিক। উনিশ শতকের নতুন ভারতে যা ছিল সেটা কেবল 'অ্যাডমিনিস্ট্রেশনই'—এও নিঃসন্দেহ। দেখার জিনিস যে রাণী ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন হয়নি। ধূর্জটির কথা, আমাদের মর্জ্জায় মজ্জায় যে ভক্তিরসধারা তাই নাকি এর জন্য দায়ী। সেটা কতখানি ভক্তি আর কতখানি ভয়ের তা অবশ্য বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। মূলত সেটা যতখানি ভয় ততখানি ভক্তির। এতে তো কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয় যে এ ভক্তি বঙ্কিমী ধাঁচের সর্বব্যাপিনী প্রীতিতত্ত্বের ব্যাপার নয়। আসলে এটাই ঠিক যে আমাদের পিতামহরা নিরুপায়ভাবে আত্মপ্রতারণা করেছিলেন। ভয়কে ভক্তির রূপ দিয়েছিলেন। তাই আন্দোলনটা রাণীর বিরুদ্ধে না গিয়ে গেলো আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে। ভাব-খানা এই, রাণীমা তুমি লোক ভালো, একেবারে মায়ের মতো; কিন্তু তোমার কাজের লোকগুলো মাঝে মাঝে ঠিক বিধিসম্মত আচরণ করেনা। এভাবে আমরা আমাদের অখণ্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমান সারির নাগরিক ভেবে বোসলুম। বোধহয় কলোনীর মানুষের ব্যাথা ভুলতে। এ সেই যেমন করে প্লিবিয়ানরা প্যাট্রী-শিয়ান হতে গিয়েছিলো সেরকম। ভেবে দেখলে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের বড়ো ইংরেজ ছোটো ইংরেজ তত্ত্বের শিকড় এখানে। বড়ো ইংরেজ এনড্রুজ আর এলম-হার্স্টদের সামনে রেখে তিনিও কলোনীর প্রজা হবার দুঃসহ অপমান ভুলতে চাইছিলেন।।

ফলে আত্মপ্রতারণা ছিল, বোঝাবুঝির অভাব ছিলো, ফাঁকিও ছিলো। হিতবাদে আসক্তি "ইংরেজী ইনজাস-

ট্রীয়াল মিড্ল্ ক্লাসের অভিপ্রায়ের অনুভূমিক', ব্যক্তি-তন্ত্র আসছে সেই ধারায় বুর্জোয়া লিবারালিজম থেকে! কিন্তু আমাদের বুর্জোয়াজিই তখন তো রীতিমতো অপুষ্ট তার পৃথক অভিপ্রায়ই বা কি আত্মপ্রতিষ্ঠাই বা কি! দেশী ব্যবসা বাঁচাবার জন্য সংরক্ষণের দাবী জোরদার হয়নি। প্রথম দিকে সাহেবদের একটা অংশ প্রোটেক্শনের হয়ে কথা তুললেও শেষ পর্যন্ত তা টেঁকেনি। সংরক্ষণের বিরুদ্ধে বিস্তর কথাবার্তা আমরাই বলেছি। যেন আমরাই অনেকটা এজেন্টের মতো। তাই আমাদের ব্যবসা বাঁচাবার আন্দোলন দানা বাঁধেনি। য়ুরোপের অন্যান্য দেশে কিন্তু ঠিক ইংলণ্ডের প্রতিক্রিয়া নয়। কারণ বাণিজ্যে তারা পেছনে ছিলো! ফলে সেখানে 'লিবারালেজিম' এসেছে 'প্রোটেক্শন' বাহিত হয়ে। সে বস্তুর পারিভাষিক পরিচিতি 'কনটিনেন্টাল' লিবারালেজিম্'। সেখানে সব সাধনা রাষ্ট্রমুখী। আর ভারতবর্ষে ঠিক অন্য ছবি। সব সমাজ ইতিহাসবিদই রায় দিয়েছেন ইংরেজ আমাদের বাণিজ্যে সাবলম্বন বা সমৃদ্ধি কোনটাই চাইতে পারেনা। অতি সোজা অর্থ এর। কলোনীর প্রজার লিবারালেজিম বুলির কোনো অর্থই হয়না। অতএব 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের এদেশে কোনো ঐতিহাসিক কারণ নেই'। এরপরে ধূর্জটি তিনটি বাক্য ব্যবহার করেছেন। একটু উদ্ধৃত করছি, বিতর্কের সুবিধার জন্য।

এক—'সাম্রাজ্যবাদের কূটনীতি' আমরা বুঝিনি। ঐ যুগে বুঝতে পারার সুবিধাও ছিলনা অবশ্য'।

দুই—'যে সব মহারোথীদের নাম নিয়ে আজ আমরা গর্ব অনুভব করি, তাঁরা কি সত্যই এমন বড় ছিলেন না যে, তাঁদের কাছ থেকে ওটুকু ঐতিহাসিক দৃষ্টি প্রত্যাশা করা অন্যায়'।

এবং শেষত—'পূর্বোক্ত কারণে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে দুটি মারাত্মক দুর্বলতা এসেছিল—ভিক্ষাবৃত্তি ও আবেদন নিবেদনের পালা এবং সর্বসাধারণের জীবন থেকে বিচ্যুতি, পলায়নও বলতে পারেন।

অর্থাৎ উপসংহার রাবীন্দ্রিক, যদিচ সমস্ত প্রতিপাদ্য আদৌ নয়। উনিশ শতকে আমাদের সমূহ কলরোলের একমাত্র সার কথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র, ফলত লিবারেল হওয়া এ তত্ত্ব ধূর্জটির কাছে ঠিক কেমন ভাবে গ্রহণযোগ্য হলো বুঝতে পারছিনা। ইংলণ্ড যেমন পুঁজির চূড়ায় পৌঁছোনোর জন্য এতে আশ্রয় করেছে আবার সমাজতন্ত্রী আন্দোলনও তো রীতিমতো মজার। মার্কস এঙ্গেলসকে বাদ দিলে সে কালের প্রায় সকল অগ্রণী 'সোস্যালিষ্ট', 'অ্যানার্কিষ্ট' এর নাম বঙ্কিমের লেখায় আছে। সামাজিক উন্নতির জন্য ব্যক্তি-এককে আহত করা চলবেনা এ কথার পাশাপাশি হারবারট স্পেনসারের সেই অতিখ্যাত বচন—The life of the social organism, must as an end, Mark above the lives of the units, তারও উদ্ধৃতি ছিলো। সকল ধর্মের উপর 'স্বদেশপ্রীতি'—বঙ্কিমের এ কাব্যের নিহিতার্থ, ব্যক্তির নিজেকে রক্ষার চেয়েও স্বদেশের কথা অনেক বড়ো কাজ। ব্রিটেনকে নকল করেছি এতে সন্দেহ কই? তবে তার সবটাই নির্বিচারে গৃহীত হয়েছে একথা একধরনের একপাশে আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় ও বাহুব্যবহৃত সরলীকরণ। এটা তো কলোনী! সুতরাং তার অন্তর্লীন দ্বন্দ্বগুলিকেও দৃশ্যপটে আনতে হবে। ব্রিটিশ ভা তে শ্রীবৃদ্ধির কথাতেও তিনি সমাজ বাস্তবতার কথা তোলেন। সামাজিক ধনবৃদ্ধির প্রয়োজন একথার একরকম অর্থ হয়। কিন্তু এ শ্রীতে 'সহস্র লোকের মধ্যে কেবল নয়শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি নাই'; সেই হেতু 'এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে, তুলুক, আমি তুলিবনা', তার অর্থ কিন্তু ইম্পিরিয়ালতন্ত্রের অভিপ্রায়ের সঙ্গে মেলেনা। এসব উদ্ধৃতিতে একথা প্রমাণ হয়না যে বঙ্কিম শ্রেণীচ্যুত সমাজতন্ত্রী বা আধুনিক কালের প্রীতিপ্রদ কৃষক সংগ্রামের নায়ক। একথায় প্রমাণ হয় যে দ্বিমুখী ধারার একটি

একটি লক্ষ্যই তাতে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। কলোনী বলেই আমাদের দৃষ্টিকোণ আলাদা হতে বাধ্য। বঙ্কিম সাম্য লিখেছিলেন, পরে মানুন আর নাই মানুন; 'বঙ্গদেশের কৃষক' লিখেছিলেন. তাছাড়া শিবনাথ শাস্ত্রী, লালবিহারী দে, হরিশ মুখার্জী, রমেশ দত্ত, প্রমুখ মানুষদের লেখা পত্র প্রচুর। সেগুলোর মূলে রয়েছে নাকি মুনাফা বৃদ্ধির নির্বাধ অঙ্কপাতের বাসনা—এসব আলোচনায় যা হয় তার নাম সরলীকরণ। ধূর্জোটি এ কথা ঠিক বলেছেন সে আমাদের লিবারেলিজম হয়েছে খুটো. কেননা ব্যক্তিতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অবকাশ তো এখানে নেই। তিনি যেটার আলোচনা করেন নি তা হলো এই-ই একমাত্র প্রবণতা ছিলোনা, কলোনীর প্রজার এ হলো একপ্রকার ভাণ অর্থাৎ লিবারেল হবার। নতুন শিক্ষা দীক্ষায় এবং কিছু সীমিত সুযোগ সুবিধায় অভিমান তো এসেইছে; 'ল্যানডেড অ্যারিস্টোক্রাসি' আরও স্বপ্ন দেখছে কিন্তু বৃহত্তর সমাজবোধের পরিপ্রেক্ষিতে এসবের দামই বা কী ভূমিকাই বা কি? এসব কথা ভাবছে পয়সায় অনেক কমজোরী ইনটেলিজেনসিয়া। বঙ্কিম যখন বহরমপুরে কর্মরত ছিলেন এক ইংরেজ সামরিক অফিসারের হাতে তিনি লাঞ্ছিত হন। এবং একরকম অকারণে। তাতে সমূহ আইনগত প্রচেষ্টায় উক্ত অফিসার ক্ষমা প্রার্থনা করেন মাত্র, তাঁর কোনো শাস্তি হয়নি। আই, সি, এস, সুরেন্দ্রনাথ তো আর ডাক্তারি ছাড়তে চাননি. যে কারণেই হোক, কর্মচ্যুত হয়েছিলেন। রবীন্দ্র বন্ধু বিহারীলাল গুপ্ত মশাই আই, সি, এস, হয়েও ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদার অফিসারের কাছে অপমানিত হন। লক্ষনীয় প্রত্যেকটা ঘটনা ঘটেছে কিন্তু সামান্য ভাবেও সংঘর্ষে না গিয়ে। মধ্যশ্রেণীর পক্ষে সমাজ বাতাবরণের বাস্তবতা কিরকম ছিলো তা তো সহজেই অনুমেয়। ভিক্ষাবৃত্তি নিন্দনীয় এবং সে নিন্দনীয় ভিক্ষাবৃত্তির জন্ম দিয়েছে অশক্ত পলকা ভিৎ—যার উৎস আবার বৃহৎ সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্নত। ভারত উদ্ধার ব্রতে তো আবার নব্য সামান্তভন্ত্র, রাজা, জমিদার সকলে ছিলো। জমির প্রশ্নে রায়ত নিপীড়ণের প্রশ্নে চাকুরী নির্ভর ইনটেলিজেনসিয়ার সঙ্গে 'ল্যানডেড অ্যারিস্টোক্রাসি'র যে অবস্থানগত প্রার্থক্য ছিলো এতে সন্দেহ কোথায়। 'বঙ্গদেশের কৃষক'ই তার প্রমাণ। কিন্তু বঙ্কিম শেষ রাখতে পারেন নি। প্রজার শোচনীয় অবস্থা হলেও এবং এতবড়ো অনিষ্টকারক পদ্ধতি আর না থাকলেও বঙ্কিম বলেন 'আমরা সমাজ বিপ্লবের অনুমোদক নহি'। তাতে 'সমাজের অমঙ্গল', 'ইংরেজের অমঙ্গল'। অথচ এই বঙ্কিমই মাত্র কয়েকটি অংশ আগে লিখেছেন দেশের শ্রীবৃদ্ধিতে হাজার জনের মধ্যে নশো নিরানব্বই জনের অংশ নেই। সুতরাং এ সামাজিক মঙ্গল তাহলে কিসের জন্যে? এবং তাঁর আগের মন্তব্যে পরের মন্তব্য কাটা পড়ে।

এই দ্বন্দ্ব বা সংকটে বঙ্কিম নিঃসঙ্গ ছিলেন না। কিন্তু যেহেতু উনিশ শতকের বাঙালীর সর্বোত্তম মানস উৎকর্ষ আমরা তাঁর মধ্যেই প্রত্যক্ষ্য করেছি, সেহেতু তিনি প্রতিনিধির মতো।

কয়েকটা দৃষ্টান্ত তবু সামান্যভাবেই দেওয়া উচিত। যুক্তিকে বিশেষ থেকে সামান্যে আনবার জন্য। যেমন রমেশ দত্ত। তাঁর নাম এই কারণে বিশেষ করে আনছি যে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক। পাবনা সিরাজগঞ্জের কৃষক জমিদারের অশান্তিতে তিনি প্রথম জনকেই অভিবাদন জানিয়েছিলেন। উচ্ছ্বসিতভাবে বলেছিলেন প্রজারা যে এইভাবে আদালত অবধি এগোল এর কারণ ব্রিটিশ শাসন। তার এনলাইটেনমেন্ট। অথচ তিনিই আবার 'দ্যপাস্ট অ্যানড ফিউচার অফ বেঙ্গল' রচনায় বঙ্কিমের প্রায় অবিকল প্রতিধ্বনি করেছিলেন। অর্থাৎ ইংরেজের সু-শাসন 'পিজ্যানট্রি' পায়নি এবং তারাই দেশের 'Nine hundred and Ninety nine out of every Thousand of the People of Bengal' বঙ্কিমী ভাষায় 'নয়শত নিরানব্বই জন'। এদের সম্পদের স্থিতিতে প্রায়শই হস্তক্ষেপ ঘটে; তা কখনও জমিদার, কখনও বা মহামান্য সরকার বাহাদুরের তরফেই। 'এনলাইটেনড'

ব্রিটিশ সরকারও এ অবস্থার কোন পরিবর্তন করতে পারেন নি। কিশোরীচাঁদ মিত্রের মতো স্বচ্ছন্দ পক্ষপাতপূর্ণ মানুষও বলেন যে, 'মার্কসের থেকে রায়তদের অবস্থা সামান্য ইতর বিশেষের ব্যাপার'। একটু কবিতা করে বললেও 'চিত্রা কাব্যে 'এবার ফিরাও মোরে'তে রবীন্দ্রনাথও এই কথা বলেছিলেন এবং প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার হয়েই। তবে রবীন্দ্রনাথ 'ডিটেলসের' খুব বেশী অপেক্ষা রাখেননি। আলোচনাও করেন নি। তিনি সমাধান খুঁজছিলেন। তাতে আবেগের মাত্রা অত্যন্ত বেশী। গ্রামীণ সমাজের পুনরভ্যুত্থান চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' পাঠেই বোঝা যায় সঙ্কটের কারণ নিয়ে হয় তাঁর ধারনা স্বচ্ছ ছিল না, না হয় এব্যাপারটাকে এড়িয়েই কাজ করতে চেয়েছেন তিনি। ঠিক যেমনটা হয়েছে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষাপদ্ধতিতে, ঔপ-নিবেশিক শিক্ষাকে এড়িয়ে গিয়ে এই প্রতিষ্ঠানকে সিদ্ধি দিতে চেয়েছিলেন তিনি। রাজনৈতিক সংগ্রামে এভাবে নিয়েছিলাম রফা, সমঝোতার নীতি। আর অরাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ছিলো একধরণের অবুঝ স্বর্গ রচনার মতো ব্যাপার। এসব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা বা টলস্টয়ের প্রত্যয় বা প্রচেষ্টা একজাতীয় ব্যাপার।

কিন্তু এর ঐতিহাসিক সূত্রটি খুব বড়। তাতে সেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের কথা আসে। কলোনীর প্রশ্ন হওয়ায় লিবারেল সাজতে গিয়েও সাজতে পারিনি। যন্ত্রণার কথা বঙ্কিম খুব ভালোভাবে বলেছিলেন। আগে যাদের কথা বলেছি তাঁরা এতে তলিয়ে বোঝেননি। রমেশ দত্তের মতো মানুষ ব্রিটিশ শাসনে গদগদ বচন হয়েছিলেন প্রজারা আইনের ব্যবহার করতে পারছে বলে। বঙ্কিম দেখিয়েছিলেন নির্বিত্ত মানুষের কাছে পরাণ মণ্ডলের মতো স্বল্প সংগতি সম্পন্ন কৃষকের কাছে আইন ব্যাপারটাই কত হাস্যকর। উচ্চআদালতে অবিচার হলে তাই শেষ কথা। কারণ সেখানে ইংরেজ বিচারক বিদ্যমান। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্যাটার্নেই যে আমাদের নব্য সমাজ গড়ে উঠেছে কলঙ্ক লাঞ্ছিত একথা বঙ্কিম বলেছেন। সীমাবদ্ধতার কথা তো আগেই বলেছি। সমাজের মঙ্গল আর ব্যক্তির মঙ্গল যে এক ব্যাপার নয় একথা বঙ্কিমের মতো তীক্ষ্ণধী মানুষের অগোচর থাকার কথা নয়। 'জন স্টুয়ার্ট মিল' রচনায় তিনি লিখে-ছিলেন, 'ব্যক্তিবিশেষ ও জনসমাজ এতদুভয় মধ্যে, মিলের মতে ব্যক্তির প্রাধান্য রক্ষা করিয়া সমাজের উন্নতিসাধন করিতে হইবেক নতুবা পৃথিবী ক্রমশ: নিস্তেজ হইয়া যাইবেক।

আর কোমৎ বলেন যে সহস্র চেষ্টা করিলেও মানুষের স্বার্থানুরাগ পরহিতৈষতা অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইবেক না; ব্যক্তি বিশেষের প্রাধান্যরক্ষার্থ যত্ন প্রয়োগ হইলে, সেই যত্নের দ্বারা সমাজের যে উন্নতি হইতে পারিত তাহার ব্যাঘাত হইবেক। অতএব স্বার্থানুরাগ কেবল দমন করিবার চেষ্টা করাই কর্তব্য।'

এ লেখা আঠারোশো তিয়াত্তরের। এর অনেক পরে 'ধর্মতত্ত্বে' চব্বিশ অধ্যায়ে বঙ্কিম লিখেছিলেন য়ুরোপের পেট্রীয়টিজম্ একটা 'পৈশাচিক পাপ'। তার গোড়ার কথাই হোল পরের মেরে ঘরে আনা। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিই তার একমাত্র প্রবর্তনা কিন্তু পর সমাজের সর্বনাশের মূল্যে। অথচ বঙ্কিম আবার অবাধ বানিজ্যের সমর্থক। ধনবাদের দুর্বার গতি তখন একটি প্রগতিশীল শক্তি। তিনি যখন তাতে সায় দেন তখন আপাতদৃষ্টিতে ঠিক কাজই করেন। অসুবিধে হয় যখন কলোনীর পরি-প্রেক্ষিতে তাঁরা গেলেন। না হলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা প্রবন্ধেই বঙ্কিমের কথা ছিলো আবিসিনি-য়ার, অথচ 'বাঙ্গের দায়ী ভারতবর্ষ'। তাছাড়া 'হোমচার্জেস' বলে যে সমস্ত খরচা সম্বৎসরের তালিকায় থাকে তার অনেক কিছুই 'ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারত-বর্ষের ক্ষতিস্বীকার।' প্রসঙ্গ শেষ করেন 'এইরূপ আরো অনেক আছে' বলে। বিবিধ প্রবন্ধের 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এ ছিলো—'ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, রাজকর্মচারীদের

জন্য এ দেশের কিছু ধন বিলাতে যায় এবং তাহার বিনিময়ে আমরা কোনো প্রকার ধন পাই না। কিন্তু সে সামান্য মাত্র, অথচ পরে পাদটিকাতেই যোগ করেছিলেন, 'এই কথাটিই বড়ো বেশী ভুল। এ সকল বিচারে ভুল আছে, গোড়ায় স্বীকার করিয়াছি।' তাছাড়া বাংলার ইতিহাস লিখতে গিয়ে যিনি 'ড্রেনেজের' কথা তোলেন, ব্রিটিশ শাসন সেখানে সহজেই অনুমিত হতে পারে। সেকালের সময়িক পত্রগুলির এই সচেতনতায় যথেষ্ট প্রমান আছে। পাঠক তা জানেন। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ, গ্রামীন বা ঘরোয়া শিল্পের পুনরুত্থান এরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে এসেছে। ইংরেজী ধাঁচে রাষ্ট্রতন্ত্রের পূজারী হলে চলবেনা, কারণ ভারতে তা কোনদিন ছিলনা—ওবস্তু আমাদের রক্তে বিদেশী; তাছাড়া দেশ তো নিরাবয়ব কোনো সত্তা মাত্র নয়, ভারতজননী নগশীষে অবস্থানও করেননা, অতএব একটা দৃশ্য নাও প্রত্যক্ষ জায়গায়. যত ছোটই হোক, আত্ম নিয়োগ কর। পরাধীনতায় যে আত্মশক্তি আমরা হারিয়েছি, অর্থাৎ মনুষ্যত্বের উন্নতিবিধায়িনী ইচ্ছাশক্তি যার বলে পাহাড় পার হয় সমুদ্র স্থলভূমি হয়, এসব কথার সার্থকতা তখন সেকালের কলোনীর পার্লামেন্টারীমিজ্‌মের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবতে হবে। বিচ্ছিন্নতার সত্যকে এ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিল। মেঘ ও রৌদ্রে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন শশিভূষণ, নায়েব জমিদার এবং গ্রামের সাধারণ মানুষ সবাই আলাদা। কারোর জন্য কেউ নয়। এই বিচ্ছিন্নতার আরও অনুপুঙ্খ অনুভবের ছবি রয়েছে 'গোরা'য়। এই বিচ্ছিন্নতার ছবি তিনি এঁকেছেন অসাধারণভাবে। যেটা করেননি তা হোল এই বিচ্ছিন্নতার সমাজ – অর্থনীতিক পরিপ্রেক্ষিতের পরম্পরা অনুযায়ী বিশ্লেষণ। ফলে সমাধান ভেবেছেন আইডিয়ায়। যেন চাষী মজুরের কাছে থেকে তাদের ভালোবাসলেই অসম স্বার্থ সুষম হয়ে যাবে।

কিন্তু আইডিয়া একেবারে মূল্যহীন নয়। সঙ্কটের কারণ নির্ণয় করে উঠতে না পারলেও বা তার ঔষধ নির্ণয়ও সব সময় মান অনুযায়ী না হলেও সঙ্কটের বৃত্তমান বৈশিষ্ট বা প্রকৃতি তিনি ঠিক ধরেছেন। আর এইখানেই তাঁর ঐতিহাসিক মূল্য। 'শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই' বলে বঙ্কিমের অসাধারণ মনীষা তার হাজারো রকমের সীমাবদ্ধতা নিয়ে যার দিকে যথার্থ নির্দেশ করেছিলো, রবীন্দ্রনাথের ভারতচিন্তার থিসিস সেই বনিয়াদের ওপর নিজেকে দাঁড় করিয়েছে। যদিও বঙ্কিমের রাষ্ট্রচিন্তা এবং তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় বহুদূর ব্যবধান।

ধূর্জটি কিন্তু নিরীক্ষার এ মানদণ্ড ব্যবহারে পরাঙমুখ ছিলেন স্পষ্টই দেখা যায়। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি স্বদেশ সমাজের শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে, তাঁর সমাজতত্ব 'নিতান্তই অর্গানিক' এবং ভারত-ঐতিহ্য অনুসারে 'ত্যাগধর্মী'। অর্থাৎ তাঁর সাধনাকে দেশের মাটির থেকে জাত এক ব্যাপার করতে চেয়েছিলেন। সেই হিসাবে তিনি অনেক স্বদেশী নেতার চেয়েও স্বদেশী 'ঢের বেশী রিয়েলিস্টিক।'

আমার এখানে একটাই কথা বলবার। রাষ্ট্র, কলোনী বা নতুনতরো ভূমি রাজস্ব এবং স্বাজাত্যানুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশ সাধনা বিশুদ্ধ স্বদেশী আকার দেওয়া কিনা! যায় না! সাধ্যমত করা যায়। তবে মাত্রার সমন্বয় ঘটিয়ে। আমাদের তো আর বিশুদ্ধ ভারতীয় বা বাঙালী হওয়া সম্ভব নয়, ভুলে যাই কেন যে, এই বিশুদ্ধতার বোধটিই বিদেশীয়।

ধূর্জটিপ্রসাদ দামী কথা বলেছেন রচনাটির শেষ দিকে। এখন এ নিয়ে লেখাপত্র, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের ভাষ্যে প্রচুর। কিন্তু তিনি যখন একথা লিখেছেন তখন এসব আলোচনা রীতিমতো অপরিণত। তার ইতিহাসগত দাম যথেষ্ট। যেমন, 'সমাজসংস্থানও যে পাকা ভিতের ওপর ছিলো তাও বলতে পারিনা' বা আরেক দামী বাক্য 'উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের জীবনযাত্রার অন্ন সমস্যার নিরাকরণে এমন কোনো

বিপ্লব বাধেনি যার জোরে সমাজের বনেদ ভেঙে যায়। উগ্র বা মৌলিক মতাবলম্বীরা এ কথায় ক্রোধপরবশ হবেন। তাঁরা কৃষকবিদ্রোহের গল্প করতে থাকবেন। সাম্প্রতিক ইতিহাস গবেষণায় কিন্তু ধরা পড়েছে যে, নীলচাষের আন্দোলন বা সাঁওতাল অভ্যুত্থান জাতীয় উপজাতি বিদ্রোহ বাদে তার সবই 'অশান্তি' বিদ্রোহ নয়, বিপ্লব তো আতিশয্য মাত্র। ঐতিহাসিক বিনয় বিনয় চৌধুরীর মত মানুষ বলেছেন কোনো কৃষক বিদ্রোহই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধিতা করেননি। কারণ এ বিদ্রোহ জমির মালিকানাহীনদের স্বার্থে নয়। সে ব্যাপারটা তখন কেউ ভাবেননি। তবে বঙ্কিমের হাজারে ন'শো নিরানব্বুই জনের মধ্যে এরা পড়তো। কিন্তু বঙ্কিম তো আর বিদ্রোহী নন। অবস্থাটা সেই নরম ভূত্বকের মতো। কোনো কোনো জায়গায় শক্ত জমি দেখে সন্দেহ হচ্ছে সবই তাই। কিন্তু মাঝে মধ্যে নরম জমি রয়েছে। আর তার থেকে ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাত হবার সম্ভাবনাও ছিলো যথেষ্ট। হয়েছেও তো। কিন্তু তার থেকে প্রমাণ হয়না সার্বিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিৎটাই নড়বড়ে। সেতো সাতচল্লিশেই তেমন নড়াতে পারেননি। ভারত-শাসনের ব্যয় ভারতশাসন জনিত প্রাপ্তির অঙ্ককে পাছে ছাপিয়ে যায় সেই আশংকাতে হয়ত এই পলায়ন। না হলে পঞ্চাশ পর্যন্ত তার জের চলে কি করে। মাঝ-রাত্তিরের স্বাধীনতা লিখে বিদেশী লেখকেরা প্রমাণ করে-ছেন ব্রিটেন ক্ষমতার বদল করেছিল, ছেড়েছুড়ে পালায়নি। স্ট্যাটাসেই বোধহয় বেঁচে যেতুম আমরা। সিপাহী অভ্যুত্থানের পর রাজশক্তি আর প্রজাশক্তি উভয়েই বুঝে গিয়েছিলো কার জোর কতখানি অবধি যেতে পারে। একটা আশার কথা। অল্পবিত্ত বা নির্বিত্ত 'ইনটেলি-জেনসিয়া' শক্তিহিসাবে ধীরে ধীরে কেন্দ্রীভূত হতে শুরু করেছে। বি. পি. মিত্র তাঁর 'ইন্ডিয়ান মিডিল ক্লাস' বইয়ে তো তালিকা, শতকরা হিসাব দিয়ে দেখিয়েছিলেন মুক্তির আকাঙ্খা। যেদিন যুদ্ধ হিসাবে একটা 'ফেনোমেনন' সেদিন কারা তাতে সব চেয়ে বেশী অংশ নিয়েছিলেন।

ধূর্জটি লিখেছেন, গোল বাধিয়েছিল নতুন শহুরে ভদ্রলোকেরা। তাঁরা সমাজ সংস্কারে বদ্ধপরিকর হলেন আইডিয়ার তাড়নায়।

বেশ। যে কোনা উদ্দ্যোগের পেছনেই থাকে কোনো না কোনো অর্থে আইডিয়া। সুতরাং শহুরে ভদ্রলোকেরও যে থাকবে আইডিয়া তাতে আর আশ্চর্য কি। আমাদের কথা হচ্ছে আইডিয়াকে বাস্তবের সংস্পর্শহীন করে দেখা-নের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ এটা যেন একটা বিমূর্তভাবের মতো। যেন সামাজিক পরিপেক্ষিতে সমাজ সংস্কারের তেমন তাগিদ ছিলোন।

একথা অবশ্য মান্য যে, গত শতকের এই সব সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন বৃহৎ জীবনকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু সেটিও ঘটেছে একটি ঐতিহাসিক ধারায়। তা বহুলাংশেই ছিল একটি অনিবার্য ভবিতব্যের মতো। সে সময়ে এর বেশী কিছু হোত না। কিলিয়ে কাঁটাল পাকানো যায় কিনা জানিনা তবে ঘুঁষির জোর কারোরই তেমন ছিল না। এখনকার গবেষক বিপ্লবীরা অবশ্য তাই নিয়েই জোর রব তুলেছেন। ভাবখানা এই যেন তাঁরা নভেম্বর বিপ্লব মার্কসের মৃত্যুর আগেই সম্পূর্ণ করে ফেললেন না। আমার কথা আইডিয়ার পেছনে একটা বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত ছিলো। নতুন শিক্ষা আংশিক ভাবে হলেও তাঁদের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য এবং মনের মানচিত্রের সীমা পূর্ববর্তী শতকীর তুলনায় বহুদূর বেড়ে গেল তখন তার সঙ্গে তাঁদের সমাজ ও পারিবারিক জীবনের দুঃসহ বৈপরীত্যও প্রকট হয়ে উঠল। যেমন কবি মধুসূদন। সমাজ বাতাবরনের এই গ্লানি বা দীনতার সবকিছুর মূলোচ্ছেদ করা তাঁদের সাধ্যের বাইরে কেননা তাঁরা নিজেরাও অনেক সময় কোনো না কোনো স্বার্থের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেই কারণে মেয়েদের শিক্ষা, বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ, সাধারণ ভাবে শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ বা সহবাস আইনের ব্যাপারগুলি কেবলমাত্র আইডিয়া নির্ভর বলে

ধূর্জটি তাঁর মন্তব্যকে তরল করে ফেলেছেন। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের জীবন বিপন্ন হয়েছিল। বিমূর্তভাবের জন্য জীবন বিপন্ন করা বোধহয় যায় না। এটা অবশ্য সম্পূর্ণভাবে আমার মত। অন্যের অন্যরকম বিশ্বাস থাকতে পারে। সেটা তাঁদের আবার ব্যক্তিগত ব্যাপার। মোট কথা নিজেদের জীবনকে অপেক্ষাকৃত সুসহ, সুস্থ করার তাগিদেই তাঁরা সব কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত সমাজ তাঁদের খানিকটা জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিলো। ব্রাহ্মসমাজের বা অগ্রণী ব্রাহ্মণদের ঐতিহাসিক মূল্যটা তো এখানেই। বিবেকানন্দ ব্রাহ্মধর্মের গড়নের বিরোধী ছিলেন, সামাজিক সংস্কারমূলক কাজের কিন্তু নয়। এটার দরকার আছে। সব দেশেই মধ্যবিত্ত সমাজকে আগে উন্নত হতে হয়। মননে এবং অপেক্ষাকৃত আর্থিক নিশ্চয়তায়। নচেৎ সমাজকে বদলের কথা শোনাবে কে? সমাজ সংস্কার আন্দোলন হচ্ছে তার নিজেকে খানিকটা পাল্টে তোলার উদ্যম। পাঠক লক্ষ্য করবেন আমার একথায় কিন্তু তার জটিল আর্থিক সম্পর্ক ও সমস্যার টানা-পোড়েনগুলির অবলুপ্তি বোঝাচ্ছেনা। ইংলণ্ডের পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র এবং ভিক্টোরীয় সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মধ্যবিত্ত এবং শিক্ষিত উচ্চবিত্তরা নিজেদের সংশোধন করতে চাইছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁদের প্রতিপক্ষ ছিলো সামন্ততন্ত্র। তার মধ্যে অনেক রাজা মহারাজ ছিলেন—পুরুত ব্রাহ্মণও। স্বল্প শিক্ষিত শহুরে বাবু কেই বা বাদ যান! আসলে গরীব নিঃস্ব চাষীরা কি আর প্রাথমিক ভাবে রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারে। খানিকটা স্বচ্ছলতারও দরকার। দরকার আইডিয়া ঋদ্ধ তৃতীয় পক্ষের। সেই আইডিয়া দেবে মধ্যবিত্ত। কিন্তু তারও তো ঘর গোছানো দরকার। সংস্কার আন্দোলন এক অর্থে নিজের ঘর গোছানো। সেটা মোটেই সমাজ পরিপ্রেক্ষিত হীন নয়। একথা যেন না ভুলি যে প্রথমত মধ্যবিত্ত ইনটেলিজেনসিয়া বস্তুটিই নতুন। আর দ্বিতীয়ত তার নিজেকে তৈরী করার কাজটাও সেকালের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আর ঠিক এই বিশ্বাসেই ধূর্জটির মতো বা একেবারে সাম্প্রতিকতম কালের অনেকের মতো উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে সামাজিক চিন্তাকে 'অবাস্তব' বলতে আপত্তি থাকে। এই 'অবাস্তব' সামাজিক চিন্তা নাকি গুণধর্মে রাজনৈতিক চিন্তা ও আন্দোলনের মতই। তার হেতু, আমাদের সেকালের মণীষীরা সাধারণ মানুষকে বাদ দিয়েছিলেন এবং তাদের তাগিদকে ব্যবহার করেন নি।

শুভাগে এর উত্তর দিচ্ছি। বাংলার রেনেসাঁস নিয়ে প্রয়াত সুশোভন বাবুর সেই অতি পুরাতন কথাই সবচেয়ে দামী মনে হয় আমার। আরো সবার কথাই মনে হয় অভিসন্ধি সম্বল। মনে হয় কোনো কোনো গোষ্ঠি বিশেষকে খুশী করাই এর আসল উদ্দেশ্য। যে উদ্দেশ্য সুশোভন বাবুর থাকবার কথা নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথকে তিনি অন্তরে পেয়েছিলেন। তাঁর মূল্যবান কথাগুলি একটু উদ্ধৃত করছি। যদিও সারাণভাবে উদ্ধৃতি প্রীতি উৎপাদন করেনা, মনে হয় এক্ষেত্রে অন্যরকম হবে।

'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নবজাগরণ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন 'ঘটনাচক্রেই য়ুরোপের তুলনায় আমাদের এই বহুবিদিত নবজাগৃতি অসম্পূর্ণ, আড়ষ্ট এবং কিছুটা অস্বাভাবিক রূপ নিতে বাধ্য হয়েছে। সেই সুবাদে এর মূল্য 'যৎকিঞ্চিত' একথা বলা অর্থহীন। একালের প্রাজ্ঞ আলোচকের কাছে 'ইউরোপের রেনেসাঁসও কিছু নিখুঁত নয়, তার উৎকর্ষও নিশ্চয় ছিল সীমিত'। সবচেয়ে ভাববার কথা হোল—'কোনো সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রকৃত মূল্য পাওয়া যায় পূর্ববর্তীযুগের পশ্চাদভূমিতে, তারই তুলনায়। আঠারো শতকের বাংলায় মানস-জগৎও সমাজ জীবনের মধ্যে এমন কিছু ছিলনা যে আমাদের রেনেসাঁসকে উন্নাসিক কায়দায় অশ্রদ্ধা করা চলে। বাংলার নবজাগরনের অতিরঞ্জিত ছবি আঁকা অথবা তাকে তাচ্ছিল্য জ্ঞানে অস্বীকার করা, এই দুই হল ঐতিহাসিক বাস্তব বিচার থেকে বিচ্যুতি। যুগ বিশেষের কীর্তি যেমন অসীম নয় তার আপেক্ষিক মূল্যটাও তেমনি মূল্যই বটে।'

অতএব ভিৎ ছিলো, আর অবাস্তবতা আপেক্ষিক। আধুনিক আলোচকেরা একে আলোকপ্রদীপ্ত স্বৈরাচারের কাছে আমাদের 'ইনটেলিজেনসিয়া'র প্রত্যাশা বলেছেন। আর জনসাধারণের তাগিদকে ব্যবহার করা। সদ্য নির্মিত বা নির্মীয়মান সামাজিক শ্রেণী বা স্বার্থের স্তর উপস্তর বহুবিচিত্র। তার থেকে একটা রাজনৈতিক অভিপ্রায় সংক্ষিপ্ত সারের মতো বেরিয়ে আস একটি প্রক্রিয়ার ব্যাপার। এবং তা অতি অবশ্যই সময় সাপেক্ষ। স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে ভোজবাজীর মতো উড়িয়ে দেওয়াটাই অবাস্তব। এতদসত্ত্বেও জনসাধারনের তাগিদ ব্যবহারের সচেতনতা সেকালে ছিলনা এই বিশ্বাস বা বক্তব্য যথেষ্ট অভিনিবেশের ফল বোধহয় নয়। একটু আগেই তো বঙ্কিমের কথা বলেছি। শিবনাথ শাস্ত্রী বা শশিপদ বন্দোপাধ্যায়ের মত মানুষজনের কথাও সবাই জানেন। দুস্থদের ইস্কুল বা ভারত শ্রমজীবির মত পত্র পত্রিকা ছিলোই। হরিশ মুখোপাধ্যায় বা শিশির ঘোষেরা নীল আন্দোলনে সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট কাজ করেছেন। জানি কথা উঠবে নীল আন্দোলনে জমিদারের সায় তো ছিলনা। আমার কথা তো ঠিক্। কিন্তু ত তো ছিলো রায়তদের স্বার্থেও। সমালোচনা করতে গেলে তার 'সৎ' অংশটুকুও বুঝি সর্বতোভাবে বাদ দিতে হয়। এটা বলাই সর্বতোভাবে ঠিক হবে যে ইনটেলিজেনসিয়া সামগ্রিক কর্মধারায় বা অভিপ্রায়ে সে প্রতিমা গড়ে উঠেনি। ইতিহাসের ধারাকে অন্যভাবে পুরো বদলে নেওয়া সব অর্থেই তাঁদের আয়ত্তের বাইরে ছিলো। তীক্ষ্ণধী ইতিহাসবিদ্ অমলেশ ত্রিপাঠীর একথাটা আমি অন্তরে খুবই মানি যে সে সময় এর বেশী কিই বা করা সম্ভব হতো! তাহলে একটি নতুন কলোনীর ভবিষ্ণু মধ্যবিত্তের মানসবিবর্তনের সমাজতাত্ত্বিক মানদণ্ডকে বাতিল করতে হয়। সেটাও বোধহয় অতিরেক হয়ে যাবে।

রবীন্দ্রনাথকে যেটা পীড়া দিচ্ছিল সে এই সমস্ত উদ্যোগ, বস্তুত বিপুল মানুষের কাছে বিদেশীই রয়ে যাচ্ছে। সেই যোগসূত্রপত্রটা এই মুহূর্তে সাঙ্গ জন্য না হলেও তার কাজ শুরু করে দেওয়া অতি অবশ্য দরকার। জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী যেমন লগ্নীর ক্ষেত্র অন্বেষণ করেছিলো, নিজেরাই শিল্পোদ্যোগে সচেষ্ট হচ্ছিল, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ বা বিশ্বভারতী প্রকৃতপক্ষে সে অভিপ্রায়েরই আর এক জাতীয় পরিপূরক উদ্দম ও তাত্ত্বিক ভাষা। আত্মানাং বিদ্ধি বা আত্মশক্তির উদ্‌বোধন প্রভৃতি শব্দ আসলে নিজেরই নিহিত শক্তির অন্বেষণ। এবং সম্যক স্ফুরণ। সেদিক দিয়ে দ্বারকানাথের পৌত্রের কাজই করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়' কথার একটাই অর্থ, নিজের শক্তিতে সম্পূর্ণ হও। ধূর্জটি লিখেছেন ভিক্ষাবৃত্তির ওপর তার কশাঘাতের তীব্রতা এত বেশী যে শুধু 'মডারেট' নয়, বৃটিশ সরকার পর্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়েছে। তাঁদের ছেলেবেলায় সাহেবরা রবীন্দ্রনাথকে নাকি 'একটি মিষ্ট' বলতেন। সেদিনকার অনেক স্বদেশীআলার চেয়ে কবিকে অনেক বেশী স্বদেশী, রিয়েলিষ্টিক বলে ধূর্জটি যে মনে করেছেন তার হেতুই এখানে। আমার কথা, আগেই বলেছি, আবার একটু বলি। তা হলো, স্বদেশী নিশ্চয়। তবে রিয়েলিষ্টিক কিনা জানিনা। না হোক তাঁর স্বদেশীয়ানা যে স্বাবলম্বন শক্তির ক্ষেত্রে একটা প্রতীকের মত তাতে সন্দেহ কি। বিদ্যায় নিজেদেরই পুরাতন ঐতিহ্যকে নতুনের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া সমাজ কর্মে, মানুষের সেবায় বা অর্থনৈতিক উদ্দমের সব কিছুর মধ্য দিয়ে প্রকৃত পক্ষে পুরাতন গ্রামীণ সমাজ নির্ভর একধরণের প্রাচ্য সমাজতন্ত্রেরই পুনরুজ্জীবন চেয়েছিলিন তিনি। চিরকাল যেমন রাষ্ট্রশক্তিকে উপেক্ষা করে ভারতের জীবনযাত্রা সুদূর পল্লী অঞ্চলে লোকায়ত জীবনে অব্যাহত থেকেছে, সে রকম কিছু একটার পুনরুজ্জীবন চাইছিলেন তিনি। মার্কসীয় আলোচনায় যাকে প্রাচ্য অর্থনীতি (এশিয়াটিক ইকনমি) বলে তার সঙ্গে এর আশ্চর্য মিল। ব্রিটিশ পুঁজির বিস্তারে এই প্রাচ্য সমাজকেন্দ্রিকতার ভীত গুঁড়িয়ে গেলেও রবীন্দ্রনাথ সেটা বেঁচে আছে ভেবেছিলেন। বেঁচে আছে

তখন অপূর্ব শীর্ণ অবস্থায়। তাকে তার আগের মর্যাদায় দাঁড়িয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে। এ স্বদেশী সাধনাই। ন্যাসানাল কনফারেন্স বলি বা ন্যাসানাল কংগ্রেই বলি দেশের মানুষকে তা চেতিয়ে তোলেনি। স্বদেশী আন্দোলনে তা হোল। তার কারণ সীমিত উদ্যোগ, উদ্যম বা অধ্যাবসায়ে হলেও দেশকে তা একটা জায়গায় স্পর্শ করেছিল। এর যে অংশ আত্মশক্তির উদ্বোধনের রবীন্দ্রনাথ সেখানে আছেন। নিজেকে গড়ার কাজে তিনি সমর্থক। অনর্থক প্রতিরোধ, প্রাচীর রচনার তিনি প্রতিবাদী। যেমন প্রতিবাদী ভিক্ষাবৃত্তির, বিদেশী ধাঁচের রাষ্ট্রতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্ধকারকে ঝাড়ি মারলে অন্ধকার মরেনা। দরকার আলো জ্বালানোর। বয়কটে, বিদেশী দ্রব্য বর্জনে মুক্তি নেই। জবরদস্তি আছে, সেটা আত্মগঠনের ধারায় আসছে না। আসছে সেই রাষ্ট্রবাদের ধুয়ো ধরে। এতে নিজেকে গড়বার প্রতিশ্রুতি নেই। অপরের ভাঙ্গার ইচ্ছেটা প্রবল। তাঁর শান্তিনিকেতন বাস, সমবায় সমিতি পাঠশালা হাসপাতালের পত্তন, পুকুর কাটানো, গাছ বসানো, পল্লী সংস্কার, শ্রীনিকেতন স্থাপন, ব্যবসায় বাণিজ্যে সক্রিয় সহযোগিতা, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ্ এডুকেশনে যোগদান সমস্ত ব্যাপারগুলি এক অখণ্ড অভিপ্রায়ের অন্তর্গত গণ্য করতে হবে। ছাত্রদের সম্ভাষণ করে যে মনোভাব তিনি ব্যক্ত করেছিলেন তার সার কথাটিই হোল নিজের দেশের যথার্থ কেন্দ্রটিকে, তার সঞ্জীবনী উৎসগুলিকে, তার মানুষকে বিদেশী অধ্যাপকের চোখে নয়, নিজের চোখে নতুন করে দেখা কর্তব্য।

অর্থাৎ পরগাছা বৃত্তি নয়। প্রতিরোধে, প্রাচীর নির্মাণে কিন্তু খণ্ডতা আসে। চরকায় সেই খণ্ডতা এসেছিল বলে তাঁর বিশ্বাস. দেশের মানুষকে যেভাবে তাদের মাঝে গিয়ে মহাত্মা স্পর্শ করলেন সেখানে তিনি বরণীয়। এক মহাযাত্রার সারথী। কিন্তু যেখানে তিনি সবকিছুকে বেড়ায় বাঁধতে সীমা টেনে দিলেন সেখানেই সংশয় এবং বিতর্ক। হতেই পারে। 'ভারত তীর্থের' কবি, গোরার কাহিনীর স্বদেশ প্রীতিকে এত ছোট করে দেখেননি। বঙ্কিমের মতই তাঁর আকাংক্ষা ছিলো। জননী জন্মভূমিকে তুলোল করে ভালবাসা। 'জাতি প্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়, ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়' রবীন্দ্রনাথের এই মত বিশ্লেষণ করে লিখেছেন, ভারতভূমিতে নানা জাতের বহু মানুষ এসে বাস করেছে। সম্মিলিতভাবে একটা সভ্যতাকেও তৈরী করে তুলেছে। বিশ শতকের একেবারে গোড়ায় বিশেষ করে একে কবি বলতেন হিন্দু সভ্যতা। পরে হিন্দু শব্দ কেটে লিখলেন ভারতীয়। ভালোমন্দ মিশে তার একটা প্রতিমা সাকার হয়েছে। যে প্রতিমা গ্রামের সমবেত জীবনে, জীবনের ত্যাগে এবং অধ্যাত্ম অনুভবের প্রাবল্যে ধরা পড়ে। আগেই বলেছি তা মুমূর্ষু। নতুনভাবে গড়তে পারলে ঔজ্জ্বল্যে চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে যাবে। বিজ্ঞান আর চিত্তশুদ্ধি হবে তার উপায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই একান্ত বিশ্বাস দু'ভাবে প্রকাশ করলেন। একটা ছোট উদাহরণ দিই। স্বদেশ, স্বদেশীয়ানা বা স্বদেশী শিল্প সাহিত্য যাই হোক না কেন তাঁর সমস্ত কল্পনা অনুভব বা চিত্তবৃত্তিকে এমন আকার দিয়েছিলো যে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুরমার ঝুলির ভূমিকায় তিনি লেখেন: 'ঠাকুরমার ঝুলিটির মত এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে? কিন্তু হায়, এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেষ্টারের কল হইতে তৈরী হইয়া আসিতেছিল। এখনকার কালে বিলাতের 'Fairy Tales' আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে।'

তুলনাগুলি মহার্ঘ। সেদিনের রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে। বিশেষ করে যখন হাওয়ায় হাওয়ায় এর সংক্রমণ। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য পণ্যসামগ্রীই শুধু বিলেত থেকে আসছে না। চিত্ত সামগ্রীও। একটা জাতকে তার স্বভূমে পরবাসী বানাতে গেলে এই-ই-ত দরকার। আর এ সংকটও সহজ মোচন

যোগ্য নয়। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। লোকসাহিত্য প্রকাশ করছেন। স্বদেশী সমাজের খসড়া শোনাচ্ছেন। কার্জনের বঙ্গ ব্যবচ্ছেদে বাঙালীর চিত্তবৃত্তির উদবোধনের একটা জোরালো সুযোগ ঘটলো। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তাঁর ক্ষেত্রে স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধেও আমরা সেকথ বলতে পারি—'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনির'।

অথচ কি আশ্চর্য স্বদেশের সাধনা যাঁর সমগ্র অস্তিত্বেই এত ওতপ্রোত তার রাশ তিনি টেনে ধরলেন। তা ঠিক না ভুল পরে আলোচনা করা যাবে। আপাতত ধূর্জটির বচনে এটুকু বলি—'সন্ত্রাসবাদ বা হিন্দুদের শ্রেষ্ঠত্ব-বাদ কোনোটাই তাঁর সমাজধর্মের অনুকূল ছিল না।' এবং একথায় আবার কথা বাড়ানোর কি থাকতে পারে। কালান্তর বইয়ে, উনিশশো একুশ সালে লেখা 'সত্যের আহ্বান' রচনাটির কথা তো সবাই জানেন। সেখানে তিনি পুরোনো সময়ের স্মৃতিচারন করতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'সেদিনকার এই দুঃসাহসিক যুবকেরা ভেবেছিলেন, সমস্ত দেশের হয়ে তাঁরা কজন আত্মোৎসর্গ-দ্বারা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাবেন; তাঁদের পক্ষে এটা সর্বনাশ, কিন্তু দেশের পক্ষে এটা শস্তা। সমস্ত দেশের অন্তঃকরণ থেকে সমস্ত দেশের উদ্ধার জেগে ওঠে, তার কোনো একটা অংশ থেকে নয়।'

এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে 'বাতায়নিকের পত্র'র অংশ বিশেষ; যেখানে ছিল: 'য়ুরোপের শুঁড়ি খানা থেকে পোলিটিকাল মদ খেয়ে মাতাল হয়েছেন এমন একদল যুবক আমাদের দেশে আছেন। তারা নিজেদের মধ্যে খুনে-খুনি করে। তাই থেকে অনেকবার এই কথাই ভেবেছি, মানুষের স্বদেশীপাপের তো অভাব নেই, এর ওপরে যারা বিদেশী পাপের আমদানি করেছে তারা আমাদের কলুষের ভার আরও দুর্বহ করে তুলছে।'

তিনটি কারণ এর থেকে নির্বাচন করা যায়। এক, রুদ্রপন্থা হলো কঠিন কাজের সহজিয়া উপায়; দুই, এ বিচ্ছিন্ন—কেননা সমগ্রের যোগ তাতে নেই, এবং তিন, এর সবই একরকম বাইরের সামগ্রী, ভারতবর্ষের জল মাটি হাওয়ার সঙ্গে কোনো যোগ তার নেই। তাঁর কথা দেশের মুক্তিতে শুধু 'পোলিটিকাল' বা 'ইকনমিক্' যোগ যথেষ্ট নয় সর্বশক্তির যোগ চাই।' অবশ্যই প্রশ্ন হতে পারে সর্ব-শক্তির যোগ কি ঐ দুটি বস্তু নিরপেক্ষ? আর তা ছাড়া এ হানাহানি কাটাকাটি তাঁর কাছে পশ্চিমের অশুভ-সূচক। সেটা সর্বতোভাবেই অবাঞ্ছনীয় কেননা, 'পশ্চিমের সহিত প্রাচ্যকে মিলিতেই হইবে।' এসব হল খানিকটা অযথা সরলীকরণ। রুদ্রমার্গীরা কি ইংলণ্ড বলতে সারা পশ্চিমকেই বুঝেছিলেন? পশ্চিমের মধ্যে তো রুশ জার্মান সবই ছিলো। তা ছাড়া ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে যে লড়াই তার সঙ্গে পশ্চিমের বিরোধ কোথায়, ব্রিটিশ ইমপিরিয়ালতন্ত্র কি পশ্চিমতন্ত্রের একমাত্র অভিজ্ঞান। রুদ্রপন্থার বিশেষ প্রেরণা এসেছিলো ইতালী, জার্মানী এবং রাশিয়া থেকে। সেখানে কিন্তু দ্বন্দ্বটা ছিলো দেশেরই অন্তর্গত শাসক রুদ্রশক্তির সঙ্গে।

এই অংশ বাদ দিলে রুদ্রপন্থা সম্বন্ধে তাঁর মতামত গুলি সাধারণভাবে ভেবে দেখার মত। এর বিচ্ছিন্নতার দিকটি তিনি নির্ভুলভাবে ধরে ছিলেন। তার সঙ্গে দেশের এবং দেশের সঙ্গে তার যোগাযোগের কোন অবকাশই সৃষ্টি হয়নি। এর কারণ নিয়ে সাম্প্রতিককালে আলোচনাও বিস্তর। আমরা কেবল দৃশ্যমান চিত্রটাই বর্ণনা করছি। তবে তাঁর 'সহজিয়া' শব্দটার অভিনবত্ব লক্ষণীয়। সহজিয়া কথাটা প্রযোজ্য দেশের লক্ষ লক্ষ নিষক্রিয় মানুষের ক্ষেত্রে। এতে আর সন্দেহ কি। এ হল তো ভাববাচ্যের কথা। যারা রুদ্রপন্থী তাঁদের কাছে এর থেকে 'সর্বনাশ' আর কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাধারণ ধর্মবুদ্ধিতে বুঝেছিলেন দেশোদ্ধারের এজেন্সী নেওয়া যায় না। তার বৈফল্য অবশ্যম্ভাবী।

ধূর্জটীর এ কথার কিছুটা ঠিক, সন্ত্রাসের একটা মুখ হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির দিকে আর একটা মুখ ধ্বংসের কিনা

তাও বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। প্রথমটা আমরা দেখেছিলাম সন্দীপের মধ্যে। দ্বিতীয়টার খানিকটাও তার মধ্যে আছে, বাকীটা ইন্দ্রনাথের দলের কাজ কারবারে। কিন্তু সমস্ত প্রতিবাদটাই যে আদ্যোপান্ত খলনায়কের, অতএব তাকে প্রতিনিধি স্থানীয় ভাবাটাই যে সবচেয়ে ত্রুটিপূর্ণ হবে। এ হলো আতিসয্যের রঙদারি। এর মূলে কাজ করছে হত্যা ব্যাপারটিরই এক নির্বিশেষত্ব সাধারণীকরণ। সেখানে নিরীহ মানুষের হত্যা পাপ। অত্যাচারী শাসকের হত্যাও। অন্তত নির্গলিতার্থ তাই হয়। ভাববাদের সংকটটাই এখানে। একজায়গায় এসে তাকে দিশেহারা হতে হবেই। ধরা যাক দেশের সমস্ত লোক একযোগে ম্যাজিস্ট্রেট বা কার্জনকে বিতাড়িত করছে বলপ্রয়োগে। কবি তখন কি করতেন? তখন তাঁকে বলতে হতো এ হলো বিলিতি ধাঁচের পলিটিকস্. এ দেশকে সত্য করে পাওয়া নয়. তাছাড়া ইংরেজ তো ভারত ইতিহাসেরই অন্তর্গত, তাকে তাড়াবার কথা আসছে কেন? না হলে কালান্তরে লিখলেন কি করে যে, 'ইংরেজ আমাদের রাজা কিম্বা আর কেউ আমাদের রাজা এই কথাটা নিয়ে বকাবকি করে সময় নষ্ট না করে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, নিজের দেশকে নিজে সত্যভাবে অধিকার করবার চেষ্টা সর্বাগ্রে করতে হবে।' তাছাড়া 'আমাদের নিজেদের দেশ যে আমাদের নিজের হয়নি. তার প্রধান কারণ এ নয় যে, এ দেশ বিদেশী শাসনাধীনে। আসল কথাটা এই যে সেবার দ্বারা; তপস্যা দ্বারা, জানার দ্বারা বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে···একে অধিকার করতে পারিনি'।

অতএব এই সূত্রই যদি ধরা যায়, আত্মশক্তির উদবোধন ঘটিয়ে দেশ সমৃদ্ধিতে প্রাণবন্ত উঠল তার আর অভাব দুঃখ-কষ্ট কিছু নেই। দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র, মহামারী সবই নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু বড়োলাট তখন কি করবেন? বড়োলাটের প্রতি আমাদের কর্তব্যই বা কি হবে? আমরা কি তখন বলব যে আপনার যা ইচ্ছে আপনি করুন, আমাদের তা স্পর্শ করবেনা। নাকি আমাদের সমৃদ্ধিতে তিনি আপনিই ভারত সাম্রাজ্যের ভার ছেড়ে দেবেন বা যুদ্ধ ঘোষণা করলেও শেষ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে পরাস্ত হবেন! কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণা করলেই কি ইউরোপীয় ধাঁচে রাষ্ট্রতন্ত্র আর ন্যাশানালিজম চলে আসবে?

'হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি' বাক্যাংশেও খানিকটা একদেশদর্শিতা আছে। একদেশদর্শি এই কারণে যে, তার তীব্র ব্রিটিশবিরোধিতার ব্যাপারটি কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। কতকগুলো আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। যেমন আনন্দমঠের বহ্নুৎসব করলো মুসলমানেরা। এতে মুসলমান বিদ্বেষ আছে। এ হলো সত্যের একদিক। আর একদিকে ব্রিটিশ সিংহ এ বইয়ের কয়েক পৃষ্ঠা নিরীহ কাগজকে তীব্র বিদ্বেষের চোখে দেখলেন। সেটা কি এতে সম্প্রদায়মনস্কতা আছে বলে? ব্রিটিশ কি এক অসাম্প্রদায়িক আবহ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো। ইতিহাসবিদেরাই সে কথা বলতে পারবেন। আমার নিশ্চিত প্রত্যয়, তাঁরা এর মধ্যে বিস্ফোরক পদার্থের সন্ধান পেয়েছিলেন।

ধূর্জটি কিন্তু এ পরিপ্রেক্ষিত নির্দেশ করেননি। আপেক্ষিকতাকেই তিনি পূর্ণ সত্য বলে ভেবেছেন। রবীন্দ্র অনুভবের এদিকটাই যে আপেক্ষিক, এ সত্য তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

ফলে উদ্ভূত হয়েছে আর এক তত্ত্ব। তার অর্ধেক যথার্থ, অর্ধেক অবশ্যই বিপজ্জনক। হয়ত তা রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই। অর্থাৎ অভিসন্ধি না নিয়েই তিনি এরকম ভেবেছেন. এতে করে তাঁর চিন্তার দৈন্যই কিন্তু প্রমাণ হয়। কেননা পুরো পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিষয়টি দেখতে পারেননি। একটা পূর্বনির্দিষ্ট আইডিয়াই ভারসাম্যহীনতা ঘটিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'ন্যাশানালিজম' বইটি স্মরণযোগ্য। ফ্যাসিজমের জন্ম তারিখের অনেক আগেই লেখা। আমি

অবশ্য আগেই দেখিয়েছি এই ব্যাপারটা নিয়ে বঙ্কিমের খুব সুনির্দিষ্ট ধারণা ছিলো। এ বইয়ে রাষ্ট্রসর্বস্বতার বিপক্ষে কথা আছে। তিনি দেখিয়েছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূলেও রাষ্ট্রবাদ বর্তমান, এ দুই ই-একবস্তুর এপিঠ-ওপিঠ। স্বদেশ প্রেমিক বা বিদেশী সবাই এর বিরুদ্ধে। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন একে স্বপ্নবিলাশ বলে অনেকে প্রথমে বিশ্বাস করলেও পরে নাকি সার কথাটিই বুঝেছেন।

সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখাপত্র উনিশ শতকেই অনেকদূর এগিয়েছিলো। কলোনীর প্রজা হওয়ায় এসব-ক্ষেত্রে স্পর্শকাতরতা বা সংবেদনশীলতার মাত্রা সহজেই অনুমানযোগ্য। সুতরাং একেবারে অভিনব কিছু ভাবায় সামান্য আতিশয্য আছে। বিশেষ করে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে তিনি যখন পথিকৃৎ নন। তাছাড়া এর থেকে উপসংহারের মতো যে আরেকটা মারাত্মক ক্ষতিকর দিক নির্গত হয়েছে সে কথা অস্বীকার করা যাবে কেমন করে? আর এব্যাপারে তাঁর চিন্তাধারায় একটা আশ্চর্য 'ইনটিগ্রিটি' আছে। ধূর্জটি সে দিক একেবারে আলোচনা করেননি। সে দিক বলতে জাতিয়তাবাদ ও অন্তর্জাতিকতাবাদের নঙর্থক দিক।

অরবিন্দ পোদ্দার মশাইয়ের রবীন্দ্রনাথ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বইযে রবীন্দ্রনাথ যে এভাবে ঔপনিবেশিক অভিপ্রায়ের পরিপূরক শক্তির কাজ করে চলেছিলেন সে কথাই বলেছেন। অরবিন্দবাবু নামী, শ্রদ্ধেয় মানুষ তাঁর সঙ্গে আমার মত মানুষের কোন তুলনাই চলতে পারেনা। পরিচয়পত্রহীন, খ্যাতিহীন আমি এই কথা অন্য ভাবে বলেছি তাঁর বইয়ের তিন বছর আগে প্রকাশিত একটি অকিঞ্চিতকর বই, 'সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি ও রবীন্দ্র সাহিত্য'-এ। রবীন্দ্রচিন্তা ঔপনিবেশিকতার পরিপূরক একথা বললে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক কাজের মধ্যেই এক গূঢ় অসৎ অভিসন্ধি খুঁজে বার করতে হয়। সেটা আমার অভিপ্রায়ের বহির্ভূত। আমি এটাকে তাঁর চিন্তার দুর্বলতা এবং জাতীয় দুর্ভাগ্য বলেই চিহ্নিত করেছিলাম।

আসলে এক হতভাগ্য পরাধীন জাতি হিসাবে এইটেই হয়ত আমাদের নিয়তি। ফলে দুঃখজনক হলেও মানতে হয় যে, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সমকালীন ভারতবর্ষে যিনি সবচেয়ে মুখর তিনিই মাঝে মাঝে নিজের অজ্ঞাত সারেই, সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকত তত্ত্বের মধ্যে এমনই এক বিপদ সঙ্কুল দিক আত্মগোপন করেছিল। শুধু আত্মগোপন নয়, প্রতিপক্ষের কাছে তারই ছিদ্রপথে মাঝে মাঝে অস্ত্রও পৌছে গেছে।

কবির কথা, সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে ভারত যেখানে যুক্ত সেখানেই তার সিদ্ধি। প্রতীচিতে, মুষ্টি পরিমানে হলেও, অন্তত কিছুজনের মধ্যে তিনি দেখেছেন স্বজাতির অন্ধ স্বার্থবোধকে অতিক্রম করবার আন্তরিক প্রচেষ্টা। ঐক্যের খোঁজে তাঁরা বার হয়েছেন সর্বমানবতার রাজপথে। নিজের দেশে তাঁরা বন্ধুহীন। তবুও সে উদ্দমের গঙ্গোত্রীমুখে কোনো বিঘ্ন এসে গতিরোধ করতে পারেনি। তাঁদের দৃষ্টি ভাবী সময়ের সূর্যোদয়ের দিকে। এ সূর্যের আলোয় তাঁদের কঠিন সাধনা বিগলিত বরফ হয়ে পথ করে নেবে সভ্যতা গঙ্গার সমুদ্র পরিনামী প্রবাহে।

এ দৃষ্টি রাসেলের। শ, রোলাঁ বা ক্রোচের। আইনস্টাইনের। কিন্তু তাঁদের পরিপ্রেক্ষিতকে কলোনীর কবিও একইভাবে ব্যবহার করেন। বিশ্লেষণ বা মূল্যায়নের মানদণ্ড একই, হয়। ফলে কি আশ্চর্য, পরাধীন দেশগুলির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তিনি অসমর্থক। অনেক আগেকার, 'আত্মশক্তি ও সমূহে' লেখা 'বিরোধমূলক আদর্শ' প্রবন্ধে শৃঙ্খলিত জাতির হৃদয়ে ন্যাশানাল ধর্মের আদর্শের তিনি বিরোধিতা করেছেন। একই সময়ে, বহু লেখায় যন্ত্রণার্ত ভারত, এশিয়া বা আফ্রিকার মর্ম-বেদনার চিত্র পাওয়া যায়। অথচ পরাধীন জাতির

মুক্তিসংগ্রাম আর জাতীয়তার ছদ্মবেশে, আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদকে তিনি সমীকৃত করে ফেলেন। এ সব ব্যাপারটাই নাকি মানবধর্মের, মানবতার বিরোধী—এই তাঁর মত। মনুষ্যত্ব, নিঃশর্ত মানবপ্রীতি আর মানুষের সঙ্গে মানুষের নিরবচ্ছিন্ন মিলনের সম্ভাব্যতা তাঁর কল্পনাকে এমন উজ্জ্বলতর বর্ণে অবয়ব দান করতে উদ্যত হয়েছিলো যার জন্যে জাতীয়তাবাদ মাত্রেই তাঁর কাছে চিহ্নিত হয় বিভেদলিপ্স আইডিয়া হিসাবে, তা সে জাতীয়তাবাদ যেখানকার হোক আর যে প্রকারেরই হোক।

'স্টেটিজম' বা রাষ্ট্রসর্বস্বতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের সদর্থকতা একটা অবশ্যই আছে। কিন্তু নঙর্থক দিকটা কম নয়। তা ধূর্জটি প্রসাদের দৃষ্টি এড়িয়েছে।

এ আলোচনার আরও একটু প্রাসঙ্গিকতা আছে। সে একেবারে আমার নিজের কথা। সে কথা বা বিশ্বাস অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিন বিন্দুকে স্পর্শ করে আছে। বিদেশে বিভিন্ন বক্তৃতায় রাষ্ট্রসর্বস্বতার বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সহজাত উদাসীনতার কথা বলেছিলেন বিবেকানন্দ। বলেছিলেন আমরা সব কিছুই ধর্মের নিরিখে গ্রহণ করি। যেমন সিপাহী বিদ্রোহ। আমাদের ধর্মের অধিকারে হাত দেওয়া মাত্র আমাদের যে প্রতিক্রিয়া তা এক অর্থে তুলনাহীন। আমি মনে করি বিবেকানন্দ দর্শনের অন্যতর এক দূরপ্রসারী ভূমিকা আছে। সে আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে বিস্তৃতভাবে চলতে পারে। কিন্তু বেশ কিছু বক্তৃতায় এই ট্র্যাডিশনাল মনোভাব তিনি ব্যক্ত করেছেন। এইরকমই রবীন্দ্রনাথ। অবশ্যই ভিন্নভাবে। এবং আরও অনেক অতীত ও বর্তমানের ধর্মনেতা। এতে দাবিত্বের মাত্রা ভিন্নমুখী হয়। তাতে ক্ষতি এই যে, রাষ্ট্রীক প্রগতি বা রাজনীতিকেই মায়া বলে সত্য অনুভব হয়। এবং ছোটো ছোটো গোষ্ঠীসর্বস্ব আঞ্চলিক জীবনধারাই অধিক গুরুত্ব পায়। একটা অখণ্ড রাষ্ট্রিক অভিপ্রায়কে ভাবা হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর, গৌণ কোনো ব্যাপার। মঠ মন্দিরের আউল বাউল আর কথকপুরুতরাও অন্যভাবে সেই একই মন্ত্র জপ করতে থাকেন। সংক্রামিত করার চেষ্টা হয় এক অদ্ভুত ধরণের বিচ্ছিন্নতাকে। রবীন্দ্রনাথ আত্মোন্নতি, স্বাবলম্বন শক্তিকে যদি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যুক্ত করতে পারতেন তবেই সেটা হতো একটা ফলপ্রসূ কিছু। তিনি নিষ্ক্রিয়তাকে আঘাত করেছিলেন কিন্তু তার সঙ্গে রাষ্ট্রীক স্বতন্ত্রতার ভাবকে কখনও যুক্ত করেননি এক 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধ ছাড়া। আগেই দেখিয়েছি সেটা 'লজিক্যালি' একটা অসম্ভব ব্যাপার।

অবশ্যই এ পুরাতন ট্র্যাডিশান আজ ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু এ ভাঙার কাজকে আরও সম্পূর্ণ করতে হবে। আধুনিক মানুষকে পোলিটিক্যাল জীব কমবেশী হতেই হবে, সেটাই সত্য। এতেই তার স্বদেশ অনুভব এবং বিশ্বচেতনার সুসমাঞ্জস সমন্বয় ঘটবে। আর তার রাষ্ট্রীক স্বতন্ত্রতাও অর্থাৎ বহিঃশক্তির উপস্থিতি নিরপেক্ষ এক অস্তিত্ব অতি অবশ্যই প্রয়োজন। শেষেরটি তো এক অর্থে জীবন মরণ ব্যাপার।

জীবনের সর্বশেষ প্রবন্ধে ওই উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আর সেই অর্থে আমাদের সময়কে তিনি অবশ্যই স্পর্শ করে আছেন। পরাধীনতা, স্বতন্ত্রতা এসব তখন মায়ামাত্র নয়। পরন্তু সমস্ত কিছুর উৎসকেন্দ্র। একটি মাত্র প্রবন্ধের সঙ্গে সমস্ত রবীন্দ্র সাহিত্যের পাঞ্জা কষার ব্যাপারটি সত্যই ভাবার মতো। কেউ বলতে পারেন আগেকার রচনার সঙ্গে এর মাত্রাটা যোগ করে-দিলেই তো হয়। সেটার সুবিধে হতো যদি দ্বিতীয় বস্তুটি ঐগুলিতে উপস্থিত না থাকতো। কিন্তু ব্যাপার তো তা নয়। সেখানে এই দ্বিতীয় বস্তুটির বিরুদ্ধেই যতো মুখরতা। অর্থাৎ এটা একটা প্রতিস্পর্ধী বিষয়।

একটা ছোট্ট বিষয়ের আলোচনা করে রচনাটি শেষ করছি। একথা বার বার বলেছি, গূঢ়তর অর্থে রবীন্দ্র প্রত্যয়ে এক অসাধারণ ইনটিগ্রিটি আছে। তার ইম্প্রেসন বা শেষত গ্রহণযোগ্যতা যাই হোকনা কেন। প্রবন্ধের একেবারে সূচনায় যে কবিও রাজনীতিকের

সমন্বয়ের কথা ধূর্জটি বলেছিলেন সেই প্রসঙ্গেই কথাটি বলছি। সম্ভবত এখানে কোনো 'বনাম' ব্যাপার থাকার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার রস পরিনাম এবং তাঁর ভারত ও বিশ্বকথাকে সম্পূর্ণ বিপরীত মনে করা নিশ্চিতরূপে এক ভ্রান্তি। বস্তুত এই দুইকে 'এক করেই' রবীন্দ্রনাথকে দেখা যায়। এবং সে দেখাই সম্পূর্ণ। ধূর্জটির কথাটি আমি আমার ভাবেই একটু বিশদ করছি। রাজনীতিক না হলেন সমাজ সচেতনতা বাদ পড়ছেনা। পাঠক নিশ্চয়ই বিস্ময় বোধ করবেন না কেননা তিনি জানেন রবীন্দ্রনাথ এই দুটি বস্তুকে বৈপরীত্য অর্থেই ব্যবহার করেছিলেন।

আর সেই হেতু, তাঁর পবিত্রাসত্তেই, কবি রাজনীতিক না হলেও, তাঁর নিজের রচনায়, এমনকি কবিতাতেও অর্থাৎ কবি যেখানে সবচেয়ে নিভৃত, সেখানে তাঁর সামাজিক চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রাখে স্বপ্নপ্রসূত আরও এক গভীরের তন্ময়তা, সেখানেও চার পাশের এই ধিকৃত খণ্ডিত অসম্পূর্ণ স্বদেশ বরাবর এত স্বীকৃতি পায় — যা আর সে সময়ের কোনো কবির কাব্যে নয়। রাষ্ট্রীক ভাবনাতেও সেই বিরোধকে জয় করবার অভিযান। যে কবি বিশ্বাস করেন, 'আনন্দের যে মঙ্গলরূপ তা অমঙ্গলকে অতিক্রম করেই, তাকে ত্যাগ করে নয়, তার যে অখণ্ড অদ্বৈতরূপ তা সমস্ত বিভাগ ও বিরোধকে পরিপূর্ণ করে তুলে, তাকে অস্বীকার করে নয়,' সেই কবিই যখন স্বদেশ কথা ভাবেন, তখন তার যে কল্যাণীমূর্তি অন্তরে রূপ পায়, সে তো সহসা হয়ে ওঠে নয়, অনেক দুঃখে বহু বেদনাতেই তার সম্ভাব্যত, 'মহাপ্রলয়ের পরে' বৈরাগ্যের অমলিন আকাশেই সেই নূতন ইতিহাসের প্রসন্ন আবির্ভাব। কবি অমিয় চক্রবর্ত্তী যে বিশ্বাসে বলেছিলেন, 'সাহিত্যের আর একটি রূপ আছে যা নিঃসংশয়, যা বর্ণাঢ্য কিন্তু শ্রেয়োধর্মী অথচ সেই শ্রেয়তা সমাজের উপস্থিত ভালোমন্দের সঙ্গেও স্পষ্টভাবে যুক্ত, নয়তো সে বিশ্বাস আসলে তিনি রবীন্দ্রনাথের থেকেই পান। মনে রাখতে হবে, সমাজের উপস্থিত ভালোকেও কবি পরম ভালোর স্বীকৃতি দেননি যদি তা তাঁর বৃহৎ সত্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করতে না পারে।

এই বৃহৎ সত্য, সৌন্দর্য বা আনন্দবোধ যেমন তাঁর কবি স্বভাবের আশ্লিষ্ট পরিচয়, স্বদেশ প্রসঙ্গেও দেখা যায়, বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নয় বরং 'সমগ্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই তাঁর স্বদেশ ভাবনা ও সাধনা তিনি সত্য করে তুলতে চেয়েছেন। এর ভ্রান্তি বা সীমাবদ্ধতা এক্ষেত্রে বিচার্য নয়। আমাদের কথা, সত্যের যে ভাবমূর্তি, যে অখণ্ডরূপ তাঁর চির স্বভাবের একান্ত ঈপ্সিত, সে অখণ্ডতার সাধনা তাঁর ভারত বা বৈশ্বিক চিন্তাতেও। মনুষ্যত্ব যেখানেই আহত, অপমানিত তা সে স্বদেশ বা অন্যদেশ যাই হোক না কেন তিনি সেখানেই অমঙ্গলের সঙ্গে দ্বৈরথে অবতীর্ণ হতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সবশেষে উপসংহার। আর তাতে ধূর্জটির এই রচনাটিকে মূল্যবান ভাবার যথেষ্ট হেতু আছে। সব কথা ঠিক কারোরই হয় না। এ তো অতি পুরাতন কথা যে সব মানুষী আলোচনাই এক অর্থে অসম্পূর্ণ। সুতরাং লেখকের ত্রুটি বিচ্যুতিকেও সেই প্রেক্ষিতে ভাবতে হবে। চার-এর দশকের মাঝথেকেই একরকম যে রাজনীতিক মত্ততা রবীন্দ্র আলোচনার নামে বাজার চালিত হয় এ-প্রবন্ধের মূল্যমান সেইহেতু সহজেই অনুমেয়। রাজনীতিক বন্যহস্তী হওয়া ধূর্জটির অভিপ্রেত ছিল না। রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গিই বাঞ্ছিত ফলপ্রদ। সেইভাবেই আলোচনার একটা পথ বেঁধে দেবার চেষ্টা আছে। সে বাঁধন প্রস্থে, যাতে পথ চলতে মানুষ অসতর্কতা বশতঃ পাশে বা নীচে, রাস্তায়, নদী বা খালে পড়ে না যান। অর্থাৎ মাত্রা বা 'ক্রান্ত' ব্যবহারে একটা শৃঙ্খলা। দৈর্ঘ্যের সীমা নেই; তা দিগন্তকে চুম্বন করছে।

নব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিংবা প্রত্নতত্ত্ব

'এ্যাই সামলে, বেশি বাঁদিকে কেউ যাবে না কিন্তু'!

'কেন ভাই'? নিখিলেশের ঠিক পেছন থেকে জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল ভরদ্বাজ।

'আমার আর কিছু করার থাকবে না তাহলে।' নির্লিপ্ত গলা নিখিলেশের। ওর হাতের তিন সেল'এর আলো যতদূর পৌঁছয় কেবল ভাঙা ইঁটের পাঁজা। বাতাবি লেবু পেয়ারা আর কুলগাছ ছেয়ে আছে জায়গাটা। রাস্তা বলতে ইঁটের মাঝখান দিয়ে সরু পায়ে চলার মতো সরানো হয়েছে শুধু। একেবারে থিয়েটারের ব্যাক্‌সিন। বিকেল সাড়ে পাঁচটা এই জায়গাটায় পেঁছতে পারেনি কোনদিন।

'এভাবে না এলেই ভাল হোত'। ছোট্ট দলটার মাঝখান থেকে অনুরাধার গলা শোনা গেল।

'এখন আর বলে কোনো লাভ নেই অনু; সামনে পেছনে এখন রাস্তা একই। সুতরাং চল চল এবং চল, চলাই জীবন'। বলতে বলতে একটু দাঁড়ালো নিখিলেশ। চারজনের গোটা দলটাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

নিখিলেশ ডাকল, 'ভরদ্বাজ—এ্যাই ভরদ্বাজ'।

'উঁ' সাড়া দিতেই ওর কাঁধে হাত রাখল নিখিলেশ, 'খুব অসুবিধে হচ্ছে?'

'আরে না না, আ ফ্যানটাসটিক ওয়ক। আয়্যাম এনজয়িং'।

সে তো বুঝতেই পারছি। রাস্তার ইটগুলো কি করে বাঁচাচ্ছ ভেবে পাচ্ছি না!'

'ফুঃ' মুখের সামনে মাছি তাড়ানোর মতো হাত নাড়ল ভরদ্বাজ।

'হ্যাঁ, বাঁদিকের কথা কী হচ্ছিল?' একেবারে পেছন থেকে বিশ্ব'র টর্চ চমকাল। বিশ্ব পেশায় ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়র আর অনুরাধার স্বামী। সুতরাং অনুরাধার ঠিক পেছনে থাকার নৈতিক দায়িত্ব ও ছাড়া আর কে-ই বা নিতে পারে।

'কথা আর কি! রাস্তাটা একটা বর্ডার। এদিক ওদিক হলেও ফোঁস-স-স।' মজা করার মতো হাত তুলে ছোবল দেখাল নিখিলেশ।

আঁতকে উঠল অনুরাধা। বিশ্ব খুব তাড়াতাড়ি ওদের পায়ের কাছে টর্চ ফোকাস করল। অনুরাধা পায়ে পায়ে পিছিয়ে এসে ওর কাছাকাছি হল।

অভয় দিল নিখিলেশ, 'তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই। এই সাপগুলোর একটা গুন আছে। যতক্ষন না বাঁদিকের ঝোপগুলোয় ওদের আস্তানার কাছাকাছি হচ্ছে কেউ কিংবা অ্যাটাকড্ হচ্ছে ওরা, ততক্ষন পর্যন্ত কিছুই করবে না।'

'—তার মানে তুমি বলছ দেড় ফুটের মধ্যেই আছে সাপগুলো। আর আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি!' বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মাঝামাঝি এসে থমকে যায় বিশ্ব।

'—জ্ঞানত: এগুলো রাস্তার ওপর এসে কাউকে কামড়েছে বলে শুনিনি!'

'—তার মানে সাপগুলো আমাদেরও কামড়াবে না এটাই বলতে চাও?' অনুরাধার গলায় ভয় স্পষ্ট।

হাসল নিখিলেশ,' তা নইলে আর এতটা রাস্তা এলাম কী করে বল?'

'—রাইট য়্যু আর! লেট আস প্রসিড!' দু হাত ওপরে তুলে নাড়াল ভরদ্বাজ। যেন সিগন্যাল দিল।

পেছনে গজ্‌গজ্‌ করতে থাকে বিশ্ব, 'এ্যাই জন্যেই তোমাকে বলেছিলাম মামীমা-দের কাছে থাকতে। রাতের পাগলামিটা আমাদের মধ্যেই থাক। শুনবে নাতো কি হবে'!

অবশ্য বিশ্ব'র-ও যে খুব একটা ভালো লাগছিল তা নয়, কিন্তু ভরদ্বাজটাকে বিশ্বাস নেই, হয়ত অফিসে গিয়ে চালিয়ে দিল ও ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছে। কেলেংকারির একশেষ। ব্যাটা মাতাল!

একটু আগেও মামারবাড়ির পুকুর ঘাটে কেউ লণ্ঠন নিয়ে এসেছিল। দু' চারবার ওপরে তুলে এদিক ওদিক দেখবার চেষ্টা করে চলে গেছে। এখন কেউ কোথাও নেই। ছোটমামা সঙ্গে লোক দিতে চেয়েছিল, নেয়নি নিখিলেশ। এই রাস্তা, গাছপালা, পুকুরধারের জঙ্গল কত চেনা ওর! মনে হয় দাদু, দিদিমা, বড়মামা আর তাঁর বোন, ওর মা খুব কাছাকাছি থেকে পাগলামি দেখছে ওদের। ভাবতেই শরীর শিরশির করে ওঠে।

আসলে, জায়গাটা খুঁজে পাওয়া নিয়ে নিখিলেশের মনে কোন সন্দেহ নেই। কতবার মা'র সঙ্গে, দিদিমার সঙ্গে চণ্ডিমণ্ডপের পাশের রাস্তা দিয়ে হেঁটে এসে দেখে গেছে।

এখনো চোখ বুজলে ছবির মতো মনে হয়। কাল ভোরে চলে যাওয়ার আগে একবার জায়গাটা দেখার কথা উঠতেই এক কথায় রাজি হয়েছে সবাই। গুপ্তধনের কথা রোমাঞ্চ সিরিজেই রয়ে গেছে এতকাল। এই সুযোগ ছাড়তে কেউ রাজি হয়নি। হাজার হোক জায়গাটা এখনো আছে।

দামোদরের বুক থেকে উঠে আসা হাওয়া ছুঁয়ে যায় ওদের। ঘর-ফেরতা পাখির দল নাছোড় লেগে থাকে সামনে পিছনে। গাছের মাথা বেয়ে নেমে আসে ঘন অন্ধকার। পায়ের নিচে শুখনো পাতা মস্‌মসিয়ে যায়। নিখিলেশের সিগারেট ধরানোর জন্য আবার থামতে হয়। জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি পরপর হাত-ফেরত হয়।

'য়্যু সি ভটাচারিয়া—আংকল কুড ইজিলি ইউটিলাইজ দ্য প্রপার্টি, লার্জ এনাফ আই থিংক!'

'হুঁ' অস্পষ্ট হাসল নিখিলেশ। জমিজমা বিক্রি করে ছোটমামার রঙের দোকান করার ইতিহাস এরা জানে না। জানিয়েও লাভ নেই। আস্তে আস্তে বলল, 'পারে। করে না।'

'এই করেই তো আমাদের জাত মরেছে ব্রাদার। খালি ভাঙিয়ে খাব। আরে বাবা এভাবে চলে! এই প্রপার্টি ভরদ্বাজকে দাও। সোনা ফলিয়ে দেবে।'

'ওয়েল সেইড। সোনা ফলিয়ে দেবে।' ভরাট গলায় হেসে উঠল ভরদ্বাজ। হাত বাড়িয়েছিল বিশ্ব'র কাঁধ তাক করে কিন্তু অনুরাধার গায়ে হাত পড়তে সরিয়ে নিল, 'সরি ম্যাডাম।'

'এবার একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে আমাদের। আবার ফেরা আছে।' তাড়া দিল নিখিলেশ।

'আবার এই রাস্তা দিয়ে ফেরা নিখিল? আমি পারব না।' অনুরাধা আর একটু হলে দাঁড়িয়ে পড়ছিল, ঠেলে ওকে সচল করল বিশ্ব, 'আরে বাবা—তুমি আমার কোলে চেপে আসবে, বুঝলে। উঁ—উঁ—মানু—মানু।'

'—যাহ্‌' অনুরাধার গলা শুনতে পেল। তাকাল না নিখিলেশ। ভরদ্বাজও না। ওরা এক মনে হাঁটতে থাকল।

'সামনের এটা চণ্ডীমণ্ডপ'। হাতের টর্চ ফোকাস্‌ করল নিখিলেশ, 'দাদুর বাবার তৈরী সব। গুপ্তধন পাবার পরের ব্যাপার।'

আদ্যোপান্ত জং, একপাশে হেলে-পড়া একটা লোহার গেটের পাশে পাথরের শিকারোদ্যত সিংহ, কোণ-ভাঙা মাদল আর আষ্টেপৃষ্ঠে লতার বাঁধনে টুপি-হীন পাথর প্রহরী।

নিখিলেশ টর্চ নিভিয়ে দিল। এখানে গাছপালা একটু কম। আবার ভেতরে ঢুকে কিছু আছে। দাদুর হাতের ল্যাংড়া কলম কত বড়ো হয়েছে এখন? আদৌ আছে তো নাকি ছোটমামা—! ভয় হচ্ছিল নিখিলেশের। সঙ্গে সঙ্গে ভরদ্বাজকে ধন্যবাদ না দিয়েও পারল না। ওর তাগাদা না থাকলে আজ, এতদিন পরে মামারবাড়ি আসা হয়ে উঠতো না।

চণ্ডীমণ্ডপের ওপর থেকে 'গুড়ুক' 'গুড়ুক' তামাক টানার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল নিখিলেশ। ফরাস বিছানো মণ্ডপের একপাশে তাকিয়া ঠেস দিয়ে দাদু, গুণমণি চট্টোপাধ্যায়। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে অম্বুরী তামাকের সুবাস। একপাশে পানের বাটা। আরো কয়েকজন এধারে ওধারে।

হ্যাজাকের আলোয় অসুরের বুকের খাঁজে রঙ ধরানো হচ্ছে জম্পেশ করে। দৌড়ে বেড়াচ্ছে কত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, তাদের মধ্যে চণ্ডীমণ্ডমণ্ডপের খুঁটি আঁকড়ে একেবারে একলা, ও-কে। নিজেকে চিনতে আর ভুল হয়না ওর।

'নিখিল—এই নিখিল'। কানের পাশে, প্রায়-ছুঁয়ে-যাওয়া দূরত্বে দাঁড়িয়ে ওকে ডাকল অনুরাধা।

চমকে উঠে অপ্রস্তুত নিখিলেশ।

'ওক্যে, ওক্যে। নো প্রবলেম'।

এইজন্যেই ভরদ্বাজকে ভালো লাগে। মাতাল-ই হোক আর যাই হোক, ঠিক সময়ে ও নিজেকে চেনায়।

পায়ের তলায় সিঁড়ির অস্তিত্ব প্রায় নেই। এদিক ওদিক জমাট ঘাস আর আগাছার ভিড়ে আলাদা করে কিছু বোঝার উপায় নেই। টর্চের আলোয় সন্তর্পণে দর-দালানের সীমানায় পা দিল নিখিলেশ। তারপর একে একে ভরদ্বাজ, অনুরাধা, সবশেষে বিশ্ব।

দাদু মারা গেছে আজ কত বছর হল? নিখিলেশ অস্পষ্ট মনে করতে পারে স্কুল হাফ-ছুটি হওয়ায় তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে মা-কে কাঁদতে দেখা গঙ্গাস্নানের লক্ষী হওয়া আর তারও পরে মা'র সঙ্গে এখানে আসা। তখনো দালান ছিল, দালানে ঝাড়লণ্ঠন ছিল, টানাপাখা ছিল। কী করে যে সবকিছু গেল আজো এক রহস্য ওর কাছে। হয়ত ছোটমামা জানতে পারে সব। কে জানে, ওদের তো জানায়নি কোনদিন।

'ঠিক যেন রোম সাম্রাজ্যের কোন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এসে পড়েছি'। ভেঙে-পড়া একটা পিলারের গা ছুঁয়ে বলল অনুরাধা।

'সেটা অবশ্য বেশ বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তবুও সেকালের কোলিয়ারি মালিক ছিলেন দাদু। যথেষ্ট সম্মানও পেয়ে গেছেন সরকারী, বেসরকারী সব জায়গাতেই। প্রকৃত বুর্জোয়া বলতে পার।' নিখিলেশের শেষ কথাটা বিশ্বকে খোঁচা দেওয়ার জন্য। সকালে এখানে এসেই ওকে চুপি চুপি বলেছে এসব নিতান্তই বুর্জোয়া ব্যাপার স্যাপার।

কোন-উত্তর দিলনা বিশ্ব। একহাতে টর্চ, অন্য-হাতে অনুরাধার হাত ধরে চণ্ডীমণ্ডপের সিঁড়ির ওপর উঠে দাঁড়াল। এই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ঝলসে ওঠা টর্চের আলোর পরিধি জুড়ে ওদের দুজনকে অবাক হয়ে দেখল নিখিলেশ। নিচের থেকে ওর মনে হল দাদুরা বোধহয় মনের গোপন কোন কোণে এমন ছবি এঁকে গিয়েছিলেন কোনদিন। এতদিন পরে, আগাছা সরিয়ে ভাঙা দেউড়ি আর দালান-চণ্ডীমণ্ডপের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ওরা শেষ টাচ্‌ দিল ছবিটায়।

'ফর গড্‌স সেক; আস্ক হিম টু কিস্‌ হার।' ফিস-ফিস করে বলল ভরদ্বাজ' আদারওয়াইজ এ সিন কমপ্লিট হবেনা—ভটাচারিয়া প্লিজ।'

নিখিলেশ কিছু বলতে চাইল না। এখন সামনে, পিছনে, ধ্বংসস্তূপের মাঝে উদ্ভাসিত আলোয় অপরূপা নারী, কোমর জড়িয়ে আছে প্রিয় পুরুষ। এরমধ্যে কথা

আসেনা। ক্রমশ বিশ্ব আরো ঘন হয়ে আসে অনুরাধার পাশে। টর্চ নিভিয়ে দেয় নিখিলেশ। থামের আড়াল থেকে অন্ধকার আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে।

স্তব্ধতা ভাঙে ভরদ্বাজ। পায়ের কাছে শক্ত কিছু ঠেলে সরিয়ে দিতে অস্পষ্ট শব্দ হয়। টর্চের আলোয নিখিলেশ দেখল কালো পাথরের একটা হাত, বালা-পরানো পাথরের বালার ওপরে কত সূক্ষ্ম কাজ করা!

'নিখিল—আমি এটা বাড়ি নিয়ে যাবো!

অনুরাধা আর বিশ্ব কখন নেমে এসেছে খেয়াল করেনি ওরা। নিখিলেশ হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

চণ্ডীমণ্ডপের পাশ দিয়ে একফালি রাস্তা। এখনো লোক চলাচল হয়। পরিষ্কার বোঝা যায়। একটু নীচু জমি রাস্তার দুপাশে ঝোপঝাপ। চেনা রাস্তা, তবু কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল নিখিলেশের। এভাবে আসতে হবে ভাবেনি কোনদিন। এখন আর টর্চ নেভাচ্ছে না কেউ। ঝিঁঝিঁ পোকার কোরাস চারিদিকে। নারকোল গাছের মাথায় বসে জ্ঞানবৃদ্ধ পেঁচা ভাঙা গলায সাড়া দিল 'হুত্-থুম্ থুম্'। একটু থমকাল নিখিলেশ। হাতের টর্চ ওপর দিকে তুলতেই ঝট্পট্ শব্দ। হাসল অনুরাধা।

'কি হল'?

'নাহ্ একটা ব্যাপারই হচ্ছে। মহিলা সমিতিতে বলার মতো।'

'অথচ, একটু আগে কী ভয়ই পাচ্ছিলে।

'কী বীরপুরুষ সব!' অনুরাধার ভেতরের 'মেয়েটা' বেরিয়ে আসে এতক্ষণে।

নিখিলেশ ততক্ষণে মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে থাকা একটা সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর পায়ের তলায় আরো দুধাপ। বিজয়ী সেনাপতির মতো সামনের দিকে হাত তুলে দেখাল, 'এসে গেছি'

সবাই উৎসুক আগ্রহে এগিয়ে আসতে যাচ্ছিল। বাধা দিল নিখিলেশ নিজেই, 'আস্তে, আস্তে। ওয়ান বাই ওয়ান। যা শ্যাওলা এখানে'!

টর্চের আলোর আওতায় এতক্ষণে দেখা গেল ছোট্ট, প্রায় একজন ঢোকার মতো দরজা। শেকল, কড়া বহুকালের জং মেখে আছে। হাত দিলে খসখস করে লাগে।

বাতাস এখানে থেমে আছে। সোঁদা গন্ধ উঠে আসছে মাটি থেকে। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে দম আটকানোর ভয়।

অনুরাধার হাত ধরে সিঁড়ির ওপরে আনল বিশ্ব। উদগ্রীব চোখে সবাই দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল। কতকালের রহস্য জমে আছে ওপারে কে জানে।

দরজার পাল্লায় সামান্য ঠেলা দিল নিখিলেশ। খুলল না। এমন হওয়ার কথা না। আগে যতবার এসেছে দরজা হয় খোলা না হয় ভেজানো পেয়েছে। আজ এ আবার কী। ভালো করে টর্চের আলো ফেলে ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত দেখল তারপর 'দুম' করে এক লাথি বসালো দরজায়। গোটা জায়গাটা কেঁপে উঠল, দরজা খুলল না।

সোজা হয়ে দাঁড়ালো নিখিলেশ 'ভেতরে লোক আছে।'

ওর মুখের দিকে তাকাল সবাই। ওর কাছে যা শুনেছে তাতে এখানে লোক থাকার কথা না। অথচ দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

'হোয়াট্স রং? ভরদ্বাজ জিজ্ঞেস করল।

'নাথিং', নিখিলেশ মরিয়া হয়ে দরজা আর আশে-পাশের দেওয়াল আঁতিপাতি করে হাতড়াতে থাকল। যদি কোথাও কিছু থেকে থাকে, যা কিনা দুহাট করে সামনে মেলে দেবে ওর ছেলেবেলার হারানো সাম্রাজ্য। হাতড়াতে হাতড়াতে কালো ছোপ ধরে যায় হাতে, কপালে ঘাম জমতে থাকে। বুকের মধ্যে হাপর শ্বাস। চিৎকার করে ওঠে, 'ভেতরে কেউ আছ?' কেউ সাড়া দেয় না।

ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে যায় নাম-না জানা পাখি। চণ্ডীমণ্ডপের খাঁ-খাঁ দুয়ার দিয়ে ছুটে আসে উতল-মাতাল হাওয়া।

মা'র সঙ্গে, দিদিমার সঙ্গে যে রাস্তায় হেঁটে এসেছে কতবার, আজ সেই রাস্তার শেষে বন্ধ দরজার সামনে বড়ো অসহায় মনে হল নিজেকে। মাথা নিচু করল নিখিলেশ। চোখের জল লুকাতে টর্চ নিভিয়ে দিল। পিঠে আলতো হাতের ছোঁয়া পেতে তাকাল। অনুরাধা এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। পরম মমতায় দু'হাতের মধ্যে টেনে নিল ওকে। বিশ্ব, ভরদ্বাজ দূরে, নির্বাক।

'চল এবার ফেরা যাক'। নিখিলেশকে নিয়ে এগিয়ে চলল অনুরাধা। ঝাপসা চোখে শেষবারের মতো বন্ধ দরজাটার দিকে ফিরে তাকাল নিখিলেশ। তখন আর কিছু দেখতে পাচ্ছিল না ও। সরু রাস্তাটা ক্রমশ অচেনা। অনুরাধার হাতে ধরে থাকা কালো পাথরের হাতটা চোখের জলে একাকার হয়ে যাচ্ছিল।
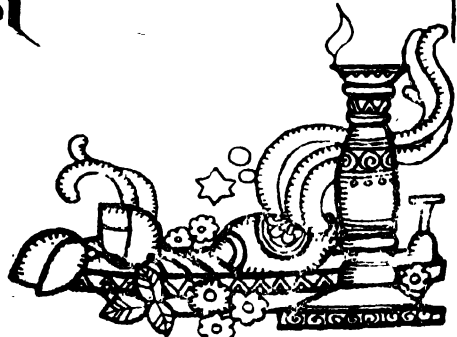
বিলেতের হাটে বাজারে

রীণা দত্ত

জীনস্ ও সার্ট পরিহিতা তরুণীটি মুখে সিগারেট ও হাতে প্র্যাম ঠেলে এক মাসের শিশুকে নিয়ে ঢুকছেন বাজারে। ধারণা ছিল বাঙালীরাই বেশী বাজার হাট রসিক। আর ব্যাজার-হয়ে-বাজার-করা বাঙালীর সংখ্যা স্বল্প। কিন্তু লণ্ডনে পা দিয়েই বুঝলাম ব্রিটিশ নাগরিকরা প্রত্যেকেই দোকান বাজার করতে এত ভালবাসে যে ক্যাশ দিয়ে কাইণ্ডস্ আনায় ওরা আরো বড় প্রেমিক। আমরা ছিলাম লণ্ডন সহরের উপকণ্ঠে গ্রেভসেণ্ড নামে আধুনিক শহরতলীর অতিআধুনিক বাড়ীতে। লক্ষ্য করতাম যে সকাল হলেই প্রত্যেকটি ছেলে এবং মেয়ে বাইরে বেরিয়ে যান নিজের নিজের কাজে। আমাদের দেশের মতন কাজ খোঁজার কাজে যান খুব কম। এ দেশে কাজ খোঁজাও একটা মহৎ কাজ। যে সব মেয়েরা চাকরীতে যান না তাঁরাও বেরিয়ে পড়েন বাজারে নিজের বাচ্চাকে নিয়ে কিংবা একাই।

এই বিলাতী দোকানের উদ্দেশ্যে রাস্তায় বেরিয়ে দেখি সবাই চলমান—কেউ দু-পায়ে, কেউ চার চাকায়। প্রত্যেকের কাছে সুন্দর মার্কেটিং ব্যাগ। এর মধ্যে যাঁরা আবার বয়স্ক পুরুষ মহিলা তাঁদের হাতে আছে ফোল্ডিং ব্যাগ-ঢাকা সমেত। তবে হাটে-বাজারে মেয়েদের প্রাধান্যই বেশি। সেখানে বয়সের কোন মাপকাঠি নেই। আমাদের দেশে যেমন আমরা ভাবি যে মা-ঠাকুমারা বৃদ্ধা হয়েছেন, ওনাদের কষ্ট হবে হাঁটা চলা করতে। ওদেশে সেই মনোভাবটা একেবারেই অচল। সেখানে ফুটপাথ দিয়ে প্রত্যেকেই রীতিমতন দৌড়োচ্ছেন, আর রাস্তাদিয়ে গাড়ী। আমাদের আবাসস্থল থেকে ওখানকার বিপনীকেন্দ্র ছিল খুবই কাছে—হাঁটার দূরত্বে। তবে আমরা তো কোলকাতার জনবহুল জ্যামজটের মধ্যে হেঁটে অভ্যস্থ আর ট্র্যাফিক লাইটের রক্তচক্ষু অমান্য করতেও খুব পারদর্শী। আবার বহু জায়গাতে রক্তচক্ষুই নেই-যে- ভয় পাবার কোন কারণ আছে। সেইজন্য ওখানেও ভেবেছিলাম রাস্তা পার হওয়া অত্যন্ত সোজা হবে। কিন্তু রাস্তায় বেরিয়েই ভুল ভাঙল। 'বিলেতে কেউই ৭০ কি. মি. স্পীডে-চলা-গাড়ীর রাস্তা ওভাবে পার হওয়ার কথা ভাবতে পারেন না। প্রত্যেকে ওখানকার ট্র্যাফিক সিগ্‌ন্যালকে সমীহ করে চলেন আর যাঁদের অত্যন্ত তাড়াতাড়ি, তাঁদের জন্য আছে একরকম ট্র্যাফিক সুইচ। সেই সুইচ্ টিপলেই ট্র্যাফিক লাইট গাড়ী থামার সিগন্যাল দেবে। তাছাড়া এমন অনেক রাস্তাও আছে যেখানে গাড়ী মানুষকো আগে পার হতে দেয়, পরে যায় সে। পরপারে পৌঁছে দেয় খুব কম পদযাত্রীকে।

যাই হোক দোকানে ঢুকে দেখি একি ব্যাপার! কোন ডাকাডাকি নেই, কোন কর্মচারী 'আসুন দিদি, এটা দেখে যান, ওটা ভাল', এসব কিছুই বলেন না। বিরাট এক জামা কাপড়ের দোকানে মাত্র চার পাঁচজন মানুষ। এক একজন এক একটা বিভাগ দেখা শোনা করছেন। আমাদের এখানকার 'দশকর্ম' ভাণ্ডারের মতন ওখানে বেশীরভাগই 'ডিপার্টমেন্টাল স্টোর'—সেখানে সব কিছুই আপনার হাতের নাগালে এক একটা ফ্লোরে। যেমন গ্রাউণ্ডফ্লোর, ফার্স্টফ্লোর, সেকেণ্ডফ্লোর এবং আণ্ডারগ্রাউণ্ড ফ্লোর। প্রত্যেক ফ্লোরে আলাদা আলাদা জিনিষ। 'মনে করুন গ্রাউণ্ডফ্লোরে আছে সমস্ত প্যাকেট-খাবারের জিনিষ, আণ্ডার গ্রাউণ্ডে খেলাধুলার জিনিষ, ফার্স্টফ্লোরে জামাকাপড়, এবং সেকেণ্ডফ্লোরে চামড়ার সুন্দর জিনিষ ও রকমারী বাসনপত্র। প্রত্যেকটি জিনিষ সুন্দরভাবে সাজানো আর প্রত্যেকটিতে নাম, দাম এবং পরিমান লেখা নিখুঁতভাবে। নিজের পছন্দ মতন জিনিষ হাতে কিংবা বাস্কেটে কিংবা ছোট ট্রলিতে

নিয়ে কাউন্টারে 'একাই-সেবক' পার্সটি নিজেদের মধ্যে কমপিউটারে মেশিনে হিসেব করে পাউণ্ড দিয়ে দেবেন। গুরুজনদের শেখানো যোগ করে নিজের কষ্টের সাথে আপনার সময়ের অপচয় যোগ দেবেন না। স্বভাবতই ভেবেছিলাম এতদামী জিনিষ সমস্ত বাইরে সাজানো, যার যেটা ইচ্ছে নিচ্ছেন কিভাবে এরা তস্করদের মহড়া রোধ করছেন? দেখেছিলাম যে প্রত্যেকটি ফ্লোরের চার দেয়ালে চারটে ম্যাগনিফাইং গ্লাস ফিট করা আছে, আর যিনি কাউন্টারে বসে আছেন তাঁর দৃষ্টি মাঝে মাঝেই সেখানে প্রসারিত হচ্ছে। সুতরাং কেউ যদি কিছু জিনিষ তুলে লুকিয়েও ফেলেন, তিনি কিন্তু সেটা দেখতে পাবেন আর ভদ্রভাবেই কাউন্টারে পাউণ্ড দেওয়ার পর আপনাকে বলবেন আপনার ব্যাগটা খুলতে এবং সেই লুকানো জিনিষ বার করে সেই যায়গায় রেখে ওখানকার 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড' পুলিশকে 'ওয়াকি টকি'তে ডেকে পাঠাবেন। তবে ও-দেশের লোকেরা 'প্রায়-সব-পেয়েছির দেশে' বাস করেন। আর তাই এরকম 'শপ্ লিফটার' পাওয়াই দুর্লভ। মোটামুটি সকলেই সৎ ও ভদ্র বলে চিহ্নিত আন্তর্জাতিক সমাজে।

বিলাতের উপকণ্ঠের বিপণী কেন্দ্রের পর আমরা যাই খোদ বিলাতে। আমাদের এখানে যেমন ধর্মতলা, চৌরঙ্গী এলাকা বিপণী কেন্দ্র বলে জানি, সেই রকম ওখানেও আছে অক্সফোর্ড সার্কাস ও অক্সফোর্ড স্ট্রীট। সেখানে সবই বিরাট বিরাট দোকান। একটা দোকানই আমাদের এখানকার একটা নিউমার্কেটের এরিয়া নিয়ে তৈরী। যেমন সি অ্যাণ্ড এ, হ্যারডস, মার্কস্পেনসার, ব্রিটিশ হোম স্টোরস্, টেক্স্কো, লিটল্উড প্রভৃতি। এইসব দোকানের প্রত্যেকটি বিভাগ সত্যই দেখবার এবং দোকানের মধ্যে সুন্দর টয়লেটের ব্যবস্থা আছে, আর বাইরে লেখা আছে রোমিও জুলিয়েট, অথবা টারজান-জেন অথবা সাংকেতিকে জাপানী পাখা ও জলন্ত সিগারেট। আপনি সারাদিন বাজার হাট করে ক্লান্ত হাতমুখ সাবান ও গরমজল দিয়ে ধুয়ে ড্রায়ার এর সাহচর্যে হাত-পা শুকিয়ে নিশ্চিন্তে আপনার প্রসাধন সেরে সেইসব দোকানের ভাল রেস্তোঁরায় খেয়ে অনায়াসে বাড়ী ফিরতে পারেন। বিলেতের লোকেরা গল্পগুজব খুব বেশী করেন না কারণ সব কিছুই লেখার মাধ্যমে। আমাদের দেশের 'কথা কম কাজ বেশী' শ্লোগানটা এত জোরে দেওয়া হয়েছে যে ওদেশেও পৌঁছে গেছে। কিন্তু এখানে এখনও পৌঁছতে পারেনি—মনে হয় ট্রাফিক জ্যামে আটকে আছে কোথাও!

যদি একটা দোকানে ঢোকেন আপনার বা আপনার ছেলের জামা কিনতে দোকানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার নজর পড়বে একটা বিরাট বোর্ড। সেই বোর্ডই হবে আপনার একমাত্র সহায়। সেখানে সব কিছুই আছে লেখা। কোন্ বিভাগ কোন্ ফ্লোরে তাও লেখায় ভুল নেই এবং সংকেত দিয়ে বোঝান। এরপর সিঁড়িতে ওঠা। ওখানকার লোকেরা কেউই কষ্ট করে সিঁড়িতে ওঠেন না। কষ্ট করেন যিনি তার নাম 'কারেন্ট'। ওখানকার সিঁড়িও সব 'কনভেয়ার বেল্টের' মতো সারাদিন চলন্ত। শুধু সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে থাকা। আপনাকে সেই চলন্ত সিঁড়ি পৌঁছে দেবে বাঞ্ছিত ফ্লোরে। যদি দোকানের কোন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করেন কোন জিনিষের কথা তাঁরা কিন্তু আপনাকে উত্তরে সেই বড়বোর্ডটাই দেখতে বলবেন। তবে ভাববেন না যে তাঁরা সবাই 'রাম গরুড়ের ছানা'! সবাই ওখানে কাজের সময় কাজ করেন এবং সন্ধ্যের পর সমস্ত কাজ শেষ হলে সবাই মিলে হৈ-চৈ নাচ গান করতে বেরিয়ে পড়েন ক্লাবে, রেস্তোঁরায় কিংবা বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে।

এবার যাই লণ্ডন সহরের বহুস্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা ছোট ছোট দোকানে। অক্সফোর্ড সার্কাস থেকে বাসে করে এবার রওনা দেব। লণ্ডন সহরের বাসের ব্যবস্থাও খুব ভাল। কারনটা হোল প্রত্যেক বাসষ্টপেজে আছে একটা করে মানচিত্র। সেই মানচিত্রে আপনি প্রত্যেকটি রাস্তায় যাওয়ার বাসনম্বর পেয়ে যাবেন। ১৩নং বাস যাচ্ছে টাফেলগার স্কোয়ারে, উঠে বোসলাম সেই বাসে।

লণ্ডন খুব জনবহুল ও ঘনবসতি পূর্ণ জায়গা বলে পড়েছি তাই আমাদের বাসের মতো ঝুলন্ত মানুষকে ধরে আরেক-জনের ঝোলার দৃশ্য না দেখে মনটা খুব দমে গেল। প্রত্যেকটি বাসই আমাদের দোতলা বাসের মতনই দেখতে। তবে আমাদের চোখ ঠিক সহ্য করতে পারেনা ভীষণ পরিস্কার আর দারুন ফাঁকা দেখে। বাসের কনডাক্টার মেয়ে এবং ছেলে সরকারী সাজে সুসজ্জিত। আমাদের বাসের পুরুষ কনডাক্টারটিকে দেখে ভেবেছিলাম যে নিশ্চয়ই উনি এশিয়ান। যাই হোক আমরা তো তাঁকে ট্রাফেলগার স্কোয়ারে এলে জানাবার অনুরোধ করে দোতলায় বসে দেখতে লাগলাম সাহেব, মেম আর তাঁদের সুদৃশ্য অট্টালিকার মিছিল। এদেশের ঘরে-বাইরে বাজারে ফুটপাথে যে পরিচ্ছন্নতার চিত্র চোখে পড়ছে সর্বদা সর্বত্র-আমাদের দেশের ঠাকুর ঘরও কি এর সমকক্ষতা দাবী করতে পারে? খাঁটি ঘি বা পিওর মিল্ক কথাটা এদেশে জিজ্ঞাসা করলে আজও এঁরা অবাক হয়ে ভ্রূ কোঁচকান। হঠাৎ দেখি এশিয়ান কনডাকটরটি আবার দোতলায় উঠে এসেছেন আর আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন—"আর ইউ কামিং ফ্রম বম্বে?" আমিও ইংরাজীতে জানালাম যে, "আমরা আসছি কোলকাতা থেকে।" তখন সেই বঙ্গ সন্তান অকৃত্রিম ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন দাদা লন্ডনে আইস্যা বাংলা ভুইল্যা গেসেন গিয়া?" এরপর উনি অনেক গল্পই করলেন একদম বাংলা ভাষায়। আসলে আমরা বাঙালীরা গল্পগুজব করতে খুবই ভালবাসি। আর লন্ডনের বাসিন্দারা স্বল্পভাষী। যেটুকু প্রয়োজন ততটুকুই ব্যাস্। সেইজন্য ভদ্রলোক বোধহয় আমাদের বাঙালী দেখে অনেক দিন পর গল্পের ভাঁড়ার খালি করে দিলেন এবং আমাদের গন্তব্য স্থলে নামিয়েও দিলেন। মনে হোল মুখের ফুটো দিয়ে বাংলা ভাষার গ্যাস খানিকটা বেরিয়ে গিয়ে দম-বন্ধ হওয়া চাপটা খানিক কমল। এই ট্রাফেলগার স্কোয়ার হোল নেলসনের মতো বীর সেনাপতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত—যিনি সুদীর্ঘ ট্রাফেলগারের যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডকে ফ্রান্সের পদানত হতে দেননি। এটাই লন্ডনের সব থেকে বিখ্যাত স্কোয়ার—বড় ও ছোটদের বড় প্রিয়। এটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে 'হোয়াইট হল অব ওয়েষ্ট মিনিষ্টার, চার পাশে রয়েছে ন্যাশনাল গ্যালারী, চার্চ অব সেন্ট মার্টিন, ওয়েষ্ট কানাডা ভবন ও সাউথ আফ্রিকা ভবন। এইসব দেখতে দেখতে আমরা কিছু ছোট দোকানের সামনে চলে এসেছিলাম। দোকানগুলো ছোট হলেও বেশ সাজানো আর পাওয়া যায় বহু জিনিষ। তবে এখানে আপনাকে একটু দর করে নিতে হবে। আবার ফুটপাথের উপর টেবিলে রেখে বিক্রি হচ্ছে টুপি, চশমা, ছাতা, সস্তা দরের টি শার্ট প্রভৃতি। মনে হয় এখানে বিদেশীদের ভীড়ের গুঁতোগুঁতানীতে ব্যঙের ছাতার মতন কিছু ছোট দোকান গজিয়ে উঠেছে।

এবার চলুন ছোটবড় সব পেছনে ফেলে একেবারে আদি অকৃত্রিম হাটে। ভাবছেন লন্ডনেও হাট বসে!' বৃষ্টির মধ্যেই হাটে বেরলাম কিছু সওদা করব বলে। একটা বেশ বিরাট বাজার এরিয়া জুড়ে হাট বসেছে। তবে এ হাট বসেছে শুক্রবারে নয় শনিবারে। হাটের মধ্যে লোকজনের ভীড়ও যথেষ্ট কারণ দোকানের থেকে হাটে একই জিনিষের দাম অনেক কম। আর হাটের কেনা বেচা সকাল আটটা থেকে বেলা একটার মধ্যে। "সন্ধ্যায় সেথা জলেনা প্রদীপ, বিকালে পড়েনা ঝাঁট"। লণ্ডনের হাটে আমার বেশ ভাল লাগছিল। হাটে গিয়ে বিভিন্ন জিনিষের সহ অবস্থান অভিন্ন জায়গায় দেখা যেন এক ভিন্ন ধরনের স্বাদ। 'উচ্ছে বেগুন পটল মুলো, বেতের বোনা ধামা কুলো' না পেলেও বায়নোকুলার, ঘড়ি, ক্যামেরা, জুতো, ব্যাগ ডিনার সেট প্রভৃতি সবই হাটে কেনা বেচা হচ্ছে। বিক্রি করছেন ইংলীশম্যান ছাড়াও ইউরোপ ও এশিয়ার বহু জায়গার লোকেরা মিলে মিশে। শনি রবি সব কিছুই বন্ধ কেবল শনিবারের এই হাট ছাড়া।

এবার চলুন যাই কাপড়, জামা, ঘড়ি ইত্যাদি পর্ব শেষ করে লণ্ডনের মাছ মাংসের আস্বাদ নিতে। হিন্দুরা গরুর মাংসকে অচ্ছুৎ মনে করেন বলেই তার সামাজিক

মূল্য কম এবং পাঁঠার মাংস কুলীন বলে পণ দিতে হয় বেশী। ওখানে কিন্তু সবই উল্টো। ঠিক তাসের দেশের মতন। আমাদের দেশে যে জিনিষের কদর নেই সে জিনিষ ওখানে মূল্যবান অন্য মাংসের তুলনায়। দামের জগতে গোমাংসের পরে হচ্ছে শুয়োরের মাংসের স্থান, তারপর ভেড়ার মাংস। ভেড়ার মাংস-খেতেও খুব সুস্বাদু আর সব থেকে কমদামী হোল মুরগী। এক একটা ট্রেতে মাংসের আলাদা আলাদা অংশ কেটে এবং সামান্য ফুটিয়ে সুন্দর ভাবে ছোট করে সাজানো আছে প্লাষ্টিকের প্যাকেটে বিভিন্ন দামে ও ওজনে। আমাদের দেশে পাঁঠা কেটে ঝুলিয়ে রাখার মতন নৃসংশ দৃশ্য ওখানে চেষ্টা করলেও চোখে পড়বে না। গরু, শূয়োর, ভেড়া, মুরগী সবাই লোকার্থে আত্মত্যাগ করে লোকচক্ষুর অন্তরালে। এদেশের এক মাংসের দোকানে মৃত পাঁঠার ঝুলন যাত্রা দেখে এক ইংরেজ বলেছিলেন, 'তোমাদের মন এত নরম কিন্তু ঝোলানো পাঁঠা দেখে তোমাদের মনের কোন নরম জায়গায় আঁচড় দেয় না ? এটাই আশ্চর্য্য !',

এছাড়াও লণ্ডনে বেশ কিছু ইণ্ডিয়ান সপ আছে। যাদের মালিক বেশীর ভাগই পাঞ্জাবী কিন্তু তাদের পণ্যেরা নাইজেরিয়ার অধিবাসী। এই সব দোকানে চাল, ডাল, ময়দা, আলু, বেগুন, উচ্ছে, কুমড়ো ইত্যাদির দেখা মেলে। কয়েকটি দোকান ভারতীয় ললনাদের শাড়ী, পেটিকোট, ব্লাউজ পরতেও করে সাহায্য।

এই রকমই একটা দোকান আছে নাম 'ভবানী', লণ্ডনে ইউস্টোন ষ্ট্রিটে। এই দোকানটি একজন সিন্ধ্রী ভদ্রলোকের। ভারতীয় খদ্দেরের পকেট খালি করার মতো হিম্মত আছে অবলা, শাড়ী সায়া ব্লাউজগুলোর। লণ্ডনের সিন্থেটিক থেকে ভারতীয় তাঁতের এবং সিল্কের শাড়ীর সমারোহ ওখানে আপনার চোখে পড়বে। তবে সিন্থে-টিকের থেকে তাঁত ও সিল্ক জাতীয় শাড়ীর দাম এখান-কার দ্বিগুণ।

এছাড়াও লণ্ডনে যথেষ্ট জায়গা আছে যেখানে বেশ কিছু বাংলাদেশী আছেন এবং ভাল দোকান দিয়ে মাছের ও তার সঙ্গে শাক্‌সব্জীর ব্যবসা করে মা লক্ষ্মীকে নিয়ে সুখে বাস করছেন। এই সব বাংলা দেশী দোকানে পাবেন বড় পোনা মাছ, গলদা চিংড়ী, ইলিশ, কাতলা প্রভৃতি। তবে বিলেত যাত্রার গরিমায় গোঁফে চাড়া দিয়ে তাঁরা উর্দ্ধলোকে বিচরণ করেন। ওঁরা টাকাকে বলেন 'পাউণ্ড' আর আমাদের টাকার পনেরগুণ মূল্য তার। সেই হিসাবে বেগুন ওখানে পাঁচ পাউণ্ড কেজি, পোনা মাছের কে জি ১০ পাউণ্ড আর দেড় পাউণ্ডের বদলে পাবেন একটা আম। তবে দেশের মূল্যকে প্রচণ্ড অধঃ লোকে নিয়ে গেছে ইলেকট্রনিক্‌সের সামগ্রী, চামড়ার জিনিষ আর কিছু জামাকাপড় ও প্রসাধন দ্রব্য।

তবুও ওখানকার বাঙালীরা সমস্ত জিনিষই রান্না করছেন। কারণ বাঙালীরা যে ভোজন বিলাসী, তার স্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথও দিয়েছেন—

'গদ্য জাতীয় ভোজ্য ও কিছু দিও,
পদ্যে তাদের মিল খুঁজে পাওয়া দায়।
তাহোক, তবুও লেখকের তারা প্রিয়—
জেনো, বাসনার সেরা বাসা রসনায়।

এখানকার জনপ্রিয় অসংখ্য 'টেক্ অ্যাওয়ে' দোকান থেকেও বহু ব্যস্ত মানুষ 'ফিস্ অ্যাণ্ড চিপস্', হ্যামবারগার, বিফবারগারএ মুখ চালাতে চালাতে পা চালাতে থাকেন রাস্তায়। এরা পরিতোষের খাবার দেন হাতে, কিন্তু পরি-বেশন করেন না পাতে। সুতরাং পছন্দ মত মেনুগুলোকে নিয়ে বাড়ীতে উদরসাৎ করে ঝামেলা ও সার্ভিস চার্জ পরিহার করেন যথাক্রমে বিক্রেতা ও ক্রেতা।

এতক্ষণ হাটে বাজারে ঘুরে সত্যিই আমরা সবাই খুব পরিশ্রান্ত। সুতরাং চলুন আবার ফিরে যাওয়া যাক্ টিউব ট্রেন পাল্টে সারফেস্ ট্রেনে করে লনডন ছেড়ে গ্রেভ্‌সেণ্ডের ফ্ল্যাটে। কারণ সেখানে সবাইয়ের জন্যই অপেক্ষা করছে ভারতীয় চা, রসগোল্লা, সন্দেশ এবং ভাতের সঙ্গে গলদা চিংড়ী ও ভেড়ার মাংস।

বন্দর ছুঁয়ে ছুঁয়ে / গোপাল চক্রবর্ত্তী

বন্দর ছেড়ে পাড়ি দেবে বলে
নোঙর ওঠাতে ব্যস্ত নাবিকের দল
সামনেই সেই, সেই মহা সমুদ্র
তীরের গণ্ডি নিয়ে, পাড়ি দিতে হবে
আকাশে জমেছে কাল, মেঘ, শুধু মেঘ
দক্ষিণ পশ্চিমে ঝড় হয়ত বা টাইফুন
ক্যাপ্টেন সতর্ক দৃষ্টি রাখে আকাশে
কখন শান্ত, কখন অশান্ত, নীল নীল জল
শুধু করে খল্ খল্, শুভ্র ফেনা, ফণি মনসার বুকে
গাঙচিল সামুদ্রিক পাখী পড়েনাক চোখে
সঙ্গীহীন জীবনের দ্যোতনায় সুর পাবে কোথা
সেই অতি পরিচিত প্রিয়জন, প্রিয় মুখখানা
বিদেশ সফর সূচী শেষে, আবার ঘরমুখো মন
এ বন্দর থেকে ও বন্দরে, কত মানুষের মুখ আর মুখ
তবুও কাটে না কেন, নিয়ত দোল দেয় একই অসুখ
স্নেহ প্রীতি, প্রেম, বাৎসল্যর সে ভরা মন, কোথা
প্রিয়জন, প্রিয়মুখ, প্রিয়ার প্রথম চুম্বন
বার বার মনে হয়, মহাসমুদ্রে ভেসে যাব কোনদিন
আমার অস্থিমজ্জা সব যেন সামুদ্রিক জীবের
কখন আহার হবে তাই ভাবি মনে মনে
তবুও চঞ্চল মন খোঁজে প্রিয় যত মুখ।
নিভৃতে মনের কোণে কি সে অসুখ।

মৎস্যমিথুন / অরুণকুমার চক্রবর্তী

সামনে সময়, আবহমান, চক্রাকারে খুঁজছো তুমি
খুঁজছি আমি……
রেখেছো চোখ দুয়ারজোড়া, পলকবিহীন অপেক্ষমান,
ঘর বেঁধেছো পছন্দসই বালির ওপর, এমনি বাহার !
নিথর-কালো ঝর্ণাখানি ঝাঁপ দিয়েছে পিঠের ওপর,
সই-পাতানোর বেলা গেল, মধ্যিখানে ভাঙছে সাগর ;
বাড়ছে বয়স, আষ্টে পিষ্টে জড়িয়ে আছে গন্ধমাতাল
প্রথম পরশ, প্রথম গরল ;
কেউ জানে না, বাঁশি হাতে বসেই আছি ফণার ওপর ;
যখন তখন পেতেই পারো যেমন তেমন মনের নাগর
এতই সহজ ? ? আষ্টে পিষ্টে জড়িয়ে আছে গন্ধমাতাল
প্রথম পরশ, প্রথম গরল ;
টলায়মান ঘর-দুয়ার, মিষ্টি মেয়ে পলকবিহীন,
ঘর বেঁধেছে বালির ওপর, এমনি বাহার, রেখেছে
চোখ দুয়ার জোড়া, মধ্যিখানে টলছে সাগর……
খুঁজছো তুমি, খুঁজছি আমি, আবহমান, সামনে সময়,
চাকার মতন, চাকার মতন……

আমরা দুঃখিত ও লজ্জিত

আমাদের অগণিত পাঠকবর্গ, শুভানুধ্যায়ী, গ্রাহক ও সেই সমস্ত লেখকদের কাছে যাঁদের নাম পূজাসংখ্যার লেখক তালিকায় বিজ্ঞাপিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যাপক বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও প্রেস[illegible] অসহযোগিতার কারণে আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ করা গেলনা।

—সম্পাদক, গোধূলি-মন

GOUHULIMONE
Vol. 25, No. 9 Postal Regd No. Hys-14 Price—Rupees

ই সংখ্যায়—

কার্তিক ১৩৯০ সংখ্যা

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি মন

O প্রীতি ভাজনেষু, আপনার 'গোধূলি-মন' নিয়মিত পাচ্ছি এবং এর বৈচিত্র্য ও রূপসজ্জা দেখে মুগ্ধ হচ্ছি। আয়তনে ছোট হলেও সকলের মন কেড়ে নেবার শক্তি এর অসাধারণ। নানাভাবে চিত্রময় করে পত্র-প্রকাশের যে গুরু ব্যয়ভার আপনি বহন করে চলেছেন, তা আপনার ন্যায় কৃতী শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব।

সম্প্রতি 'ছড়া' সংখ্যাটি হাতে পেয়ে এক নিঃশ্বাসে যাবতীয় রচনা পড়ে ফেললাম। আপনার তিনটি ছড়াই ভালো লাগলো। এর বক্তব্য, ছন্দ এবং মিল ... পারের মর্যাদা রক্ষা করে চলেছে। আরও ... ছড়া নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর। হাসান কামাল ... সংক্ষেপে বাংলাদেশী ছড়ার ইতিবৃত্ত আছে।

কিন্তু অপ্রিয় হলেও প্রসঙ্গতঃ বলতে বাধা নেই যে, বাংলায় যাঁরা কিছু বা কবিতা লিখতে পারেন, তাঁদের অনেকের লেখনীই ছড়া রচনায় পটু নয়, ফলে সেগুলো সাহিত্যের পাংক্তেয় ভোজে প্রায়শঃ নিমন্ত্রণের তালিকায় পড়ে না। আবার যাঁরা খুব ভালো ছড়াকার তাঁদের হাতেও অনেক সময় ভালো কবিতা খোলে না। স্বীয় শক্তি সম্পর্কে সচেতন হলে শিল্পীমা... ও নিঃসন্দেহে গৌরবের অধিকারী হতে পারে। ... সৃষ্টিকর্মে রত এ কথাটা স্মরণে থাকলে সময়ের ... মিথ্যা অপব্যবহার থেকে তাঁরা রক্ষা পেতে ... তাতে তাঁদের স্বভাবজাত সৃষ্টি আরও মনোরম হয়ে-ওঠার সম্ভাবনা থাকে। সকলের কাছে এইটেই প্রত্যাশিত। সচরাচর নানা ক্ষেত্রে যা চোখে পড়ে, তার অভিজ্ঞতা থেকেই প্রসঙ্গত কথাটা উল্লেখ করলাম। দ্বিতীয়তঃ 'লিমেরিক' শব্দটি সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগত ভাবে আপত্তি পোষণ করি। পাঠ-অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আমরা ইংরেজী হটাতে ব্যস্ত, অথচ কাব্যক্ষেত্রে বিদেশী শব্দকে ধরে রাখছে এটা প্রহসন নয় কি? অন্ততঃ বাংলার 'ছড়া'র রাজ্য এ দীন নয় যে, তার সঙ্গে 'লিমেরিক' জুড়ে দিতে হবে কথাটা ভেবে দেখবেন। এই সূত্রে আমার নিজের দু' ছড়া এখানে তুলে ধরছি। তাতে ছন্দে, মিল-এ, শব্দ ঝঙ্কারে ও বক্তব্যে স্বাজাত্য রক্ষা পেয়েছে কি না, লক্ষ্য করবেন :

১) নাপিত ভায়া দাড়ি চাঁচে,
কাপড় কাচে ধুপি,
দর্জি ভায়া বানায় বসে
মর্জি মতো টুপি।
রাঁধুনি সে রান্না করে
পোস্ত বেটে আলু,
পপ্ গানেরই বাজার এখন
দেখছি শুধু চালু॥

২) ধিক্ তারে শত ধিক্‌ঃ
লিমেরিক, লিমেরিক,
বাংলা 'ছড়া' কি আর
কম কিছু ঝিকিমিক্!
নিজের ভাষাটা শেখ,
খুব করে ছড়া লেখ,
ভেসে যাক্, মুছে যাক্
লিমেরিক, লিমেরিক।

সাহিত্য অভিযাত্রী সুহৃদদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও মমতা চিরকালের। সকলের সৃষ্টি সুধামণ্ডিত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করুক, এই কামনা করি।

আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন।

ভবদীয়
রণজিৎ কুমার সেন

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি মন

২৫ বর্ষ / ১০ম সংখ্যা / কার্ত্তিক ১৩৯০

প্রতি সংখ্যা এক টাকা
বার্ষিক (সডাক) দশ টাকা

পূজো পূজো করে অবশেষে পূজো এলো এবং যথারীতি চলেও গেল। শত অভাবের মধ্যেও মধ্যবিত্ত বাঙালী কয়েক দিনের জন্যেও সংসারে হাসি ফোটাতে আরও ক্ষয় করে ফেললো নিজেকে। যথারীতি [illegible]স আকারের বাজারী পূজা সংখ্যাগুলিও বেরিয়েছে—এব[illegible] [illegible]য়েছেও। এবারেও প্রতিযোগিতা হয়েছে গল্প অ[illegible] সহ[illegible]কে উপন্যাস হিসাবে চালিয়ে দেবার। সেই ধরণের মাল[illegible]ায় কে কার চেয়ে বেশী ছাপছেন তারও প্রতিযোগিতা চলেছে।

এবং এসবের মধ্যেও পশ্চিমবাংলার শহর ও মফস্বল গ্রামবাংলা থেকে প্রকাশিত হয়েছে অজস্র ছোট পত্রিকা। আর্থিক বিচারের মাণদণ্ডে যারা ছোট পত্রিকা হিসাবে বিবেচিত হলেও লেখার কৌলিণ্যে যারা তথাকথিত বাজারী পত্রিকার মাথা হেঁট করিয়ে দিয়েছে।

আমাদের দপ্তরে [illegible]এসে জমা হচ্ছে ছোট পত্রিকার যে সব শারদ-সংখ্যা, [illegible]শ কিছু ব ছাই সংখ্যা নিয়ে আগামী [illegible] সংখ্যায় অলোচনার পরিকল্পনা [illegible]রইল আমাদের।

আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা বিজ্ঞাপনদাতা এবং বাঙলা সাহিত্যপ্রেমী প্রতিটি মানুষকে জানাই ৺বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

।। সম্পাদক ।।
অশোক চট্টোপাধ্যায়

● সম্পাদকীয় কার্যালয়: নতুনপাড়া ।। চন্দননগর ।। হুগলী ।। পশ্চিমবঙ্গ ।। ভারত
● কলিকাতা কেন্দ্র: ৩৩/৬ জি নাজির লেন, কলিকাতা-৭০০০২৩

লিওপোল্ড সেদার সেনঘরের কবিতা

অরুণ মণ্ডল

লিওপোল্ড সেদার সেন্‌ঘর আফ্রিকা মহাদেশের এক উজ্জ্বল প্রতিভাদীপ্ত মানুষ। একাধারে জাতীয়তাবাদী নেতা ও সেনেগালের রাষ্ট্রপতি, বিশ্বনাগরিক, মননশীল বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক ও প্রথম শ্রেণীর কবি। প্রকৃত অর্থে তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী।

১৯০৬ সালের ৯ই অক্টোবর ফরাসী প্রাচীন উপনিবেশ সেনেগালের ছোট সেরেরের অন্তর্গত 'জোঅল' গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা 'সেরেরে' উপজাতির লোক, পেশায় ব্যবসায়ী, ধর্মবিশ্বাসে ক্যাথলিক খৃষ্টান। শৈশবের অল্প কিছুদিন তিনি এখানে কাটিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর মন থেকে এই স্মৃতি ম্লান হয়ে যায়নি। শৈশবের এই [illegible] আনন্দময় শিশুরাজ্য বার বার তাঁর কবিত[illegible] এসেছে। সেনঘর ছোট বেলায় চেয়েছিলেন পা[illegible] শিক্ষক হতে। তিনি তাঁর গ্রাম জোঅল থেকে কিছু[illegible] ফরাসী ধর্মযাজকদের পরিচালিত বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে তিনি ফরাসী ব্যাকরণ, প্রকৃতিবিজ্ঞান, ল্যাটিন ও ধর্মগ্রন্থাদি পড়লেন আট বছর। এখান থেকে গেলেন ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার রাজধানী ডাকার শহরে। ১৯২২ সালে ভর্তি হলেন 'লিবারম্যান জুনিয়র সেমিনারি' তে। চারবছর পড়াশোনার পরে তাঁকে জানানো হলো—ধর্মযাজকবৃত্তি—তাঁর পেশা নয়। সেনঘর [illegible] নিরাশাহত হলেও, পরে মনস্থির করলেন। শিক্ষক [illegible] তিনি ডাকারের মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হয়ে [illegible] সাথে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা শেষ করেন। [illegible] পরবর্তী পর্বে আংশিক সরকারী বৃত্তি নিয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্যারিসে গেলেন। ১৯৩১ সাল থেকে ফরাসী দেশে তাঁর প্রবাস জীবন শুরু হয়। সেখানে প্রধানতঃ তিনি ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনাতে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৩৪ সালে সারবোন থেকে Licence-es Letters ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'Exoticism in Baudelaire'। পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ফরাসী ভাষা পড়াবার জন্য জটিল ও প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা, এগ্রিগেশন (agregation) এ অংশ গ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। তিনিই প্রথম আফ্রিকান—যিনি এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী। এই কৃতিত্ব তাঁর ছেলেবেলার শিক্ষক হবার স্বপ্নকে সফল করে তোলে। শিক্ষকতার জীবন প্রধানত ১৯৩৫-৪০ সাল।

কৃতিত্বপূর্ণ শিক্ষা জীবনের সাথে সাথেই রাজনৈতিক চিন্তাধারা একটা স্পষ্টরূপ নিতে থাকে। অন্যদিকে সমৃদ্ধ ফরাসী সাহিত্য অধ্যয়ন ও ফরাসী সাহিত্যিকদের সাহচর্য তাঁর কবি সত্তাকে প্রকাশমান করে তোলে। প্যারিসের প্রবাসজীবন তাঁর কাব্যপ্রতিভা বিকাশের পথে একটি চূড়ান্ত ভূমিকা প্রকাশ করেছে। স্বদেশ থেকে দূরে ভিন্ন পরিবেশে বসে আফ্রিকা, তার প্রকৃতি, তার মানুষ আর সেই মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা, বেদনা, আশা-আকাঙ্খা তাঁর অনুভূতিকে কবিতায় প্রকাশ করলেন তিনি। এই ব্যক্তিগত পটভূমির সাথে সমসাময়িক রাজনৈতিক/ঐতিহাসিক ঘটনার তাৎপর্যও কম নয়। বিশ শতকের গোড়ার দিকেই কালো মানুষের নবজাগরণের যুগ শুরু হয়ে যায়। সুদূর প্যারিসে বসে তার কথা লিখলেন। কালো-সভ্যতার জয়গানই তাঁর সমগ্র সত্তার অন্যতম বিশ্বাস ও কর্ম হয়ে ওঠে। তাঁর কবিতায় কালো রং, অন্ধকার [illegible] আমরা ভিন্ন অর্থে ভিন্ন প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ব্যবহৃত হতে দেখি। এ কালো দুঃখ, হতাশা মৃত্যুর প্রতীক নয়,—এ কালো দ্যুতিময়, জীবনের প্রাণপ্রাচুর্যে ভাস্বর, অনিন্দ্যসুন্দর। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ Chants d' Ombre, প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে।

যদিও এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই রচিত হয়েছে তাঁর যৌবনে, প্যারিসের প্রবাসজীবনে, ১৯৩০-এর দশকে।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনঘর ফরাসী সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং ফরাসীরা জার্মানদের কাছে পরাজিত হওয়ায় তিনি বন্দী হন। ১৯৪০-৪২ সাল পর্যন্ত তাঁকে বিভিন্ন ক্যাম্পে যুদ্ধবন্দীর জীবন যাপন করতে হয়। ক্যাম্পজীবনের দিনগুলিতেই তিনি বেশ কয়েকটি অসাধারণ কবিতা লেখেন। এই সময়ের কবিতাগুলি নিয়েই ১৯৪৮ সালে বের হয় তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ Hosties Noires (Black Victims)। বন্দীজীবন থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি ফিরে গেছেন অধ্যাপনা জগতে। এই সময়ে তিনি আফ্রিকার ভাষা ও কাব্যরীতির উপরে বেশ কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। যুদ্ধ ও বন্দীজীবন তাঁর জীবন চেতনায় একটা বড়রকমের পরিবর্তন নিয়ে আসে। যুদ্ধ শেষে তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ দেন। ফিরে আসেন দেশে।

ফরাসী আফ্রিকা ও বর্তমান স্বাধীন সেনেগালের (১৯৬০ সালে স্বাধীনতা লাভ করে) রাজনীতির অনেক অস্বস্তিকর ধাপ, জটিলতা অতিক্রম করে এখন তিনি দেশের রাষ্ট্রপতি। এক সময় তিনি সেনেগালের National Assemblyর প্রতিনিধি ছিলেন, পরে মন্ত্রী হন এবং স্বাধীনতার পরে ১৯৬১ সালে Republic of Senegal-র রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। রাজনীতির সাথে সমান তালে কাব্যচর্চা করেছেন। ১৯৫০ সালে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ Chants pour Nrett, ১৯৫৬ সালে Ethniopiques এবং Nocturnes ১৯৬১ সালে। তাঁর গদ্যরচনায় সংখ্যায়ও অসংখ্য ও বিচিত্র ধর্মী। রাজনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি যেমন রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখেছেন, তেমনই আফ্রিকার ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি কবিত ধর্ম প্রভৃতি নিয়েও ফরাসী ভাষায় অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। চিন্তার ঋজুতা ও মৌলিকতা তাঁর গদ্য রচনার অন্যতম প্রধান গুন।

আফ্রিকার রাজনৈতিক সমস্যা অত্যন্ত জটিল। এই জটিল সমস্যার মধ্যেও যাঁরা আফ্রিকাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সাধনায় ব্রতী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সেনঘর অন্যতম। আফ্রিকার ঐক্যকে সম্ভব করে তোলার জন্যই সেনঘর প্রথমে নিগ্রোত্তা (Negritude) ও পরে 'আফ্রিকীয়তার' (Africanity) তত্ত্ব দাখিল করেছেন। আফ্রিকার এই সমগ্রতাকে বিশ্বসভ্যতার সাথে যুক্ত করেই তিনি প্রথম পূর্ণাঙ্গ মানব সংস্কৃতি গড়ে তোলার পক্ষপাতী। কবিতার প্রতি গভীর ভালোবাসায় নিমজ্জিত কবি সেনঘর। তাঁর কাছে কবিতা আশা ও স্বপ্ন, স্বপ্ন ও শান্তি, মৈত্রী ও ঐক্যের এক শক্তিশালী হাতিয়ার। আত্মবিশ্বাস ও প্রবল আফ্রিকান চেতনায় সমৃদ্ধ তাঁর কবিতা। অল্প পরিসরে তাঁর কবিতা আলোচনা করা সম্ভবপর নয় জেনে [illegible] থাকলাম। তাঁর দুটি কবিতার অনুবাদ এখানে [illegible]র হলো।

সহ[illegible]নে :

আজ রবিবার।

রবিবার আমাকে ভয়ার্ত করে অগণিত স্বজনের
পাথরপ্রতিম মুখগুলো।
উঁচু এই কাঁচের মিনারে বসে পূর্বপুরুষদের কথা মনে করে
যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে যাই—
স্থির দৃষ্টিতে দেখি : কুয়াশায় ঢাকা টিলা ও আকাশ
নিস্তব্ধ [illegible] স্থির চিমনিগুলো ভারী ও নিরেট।
এ স[illegible] আমার প্রিয় স্বজনেরা মৃত,
আ[illegible] আজ ধুলোয় একাকার
নি[illegible]ক্তে লাল হয়ে আছে এই পথগুলো
সব পথ গি[illegible] মিশেছে কশাইখানায়।
এখন এই সুউচ্চ কাঁচের মিনার থেকে কিংবা
কোনো দূর শহরতলীর থেকে দেখি
আমার সোনালী স্বপ্নেরা
মুখ থুবড়ে পড়ে আছে পথের ধারে

অন্তিম শয্যায় যেন শায়িত রয়েছে—
সীন নদীর তীরে আর পাহাড়গুলির পদতলে
জাম্বিয়া বা স্যালুমের বিস্তীর্ণ তীরে
যেমন আমার মহান পূর্বপুরুষেরা ঘুমিয়ে আছেন।
এখন মৃত স্বজনের কথা ভাবতে দাও।
অতীতে যাঁরা ছিলেন সাধুসন্ত,
তাঁদের সমাধিগুলিতে সময় তার চিহ্ন রেখে যায়
অথচ কেউ নেই তাঁদের স্মরণ করে।
হে আমার মৃত স্বজনেরা,
তোমরা সব সময় অস্বীকার করেছো মৃত্যুকে
সাইনের তীর থেকে সীন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে
প্রাণপণে মৃত্যুকে রুখেছে যারা নিরবধি কাল
আমার দেহে বহমান হে অপরাজেয় রক্ত বিন্দু
রক্ষা করো, আমার সোনালী স্বপ্নকে রক্ষা করো
যেমন এক সময় রক্ষা করেছিলে তোমাদের পুত্র
যা

হে আমার মৃত স্বজনেরা
দুরন্ত কুয়াশার হাত থেকে বাঁচাও পারীর আকাশ
যে আকাশ প্রহরায় আছে মৃতস্বজনদের।
আমাকেও রক্ষা করো
কাঁচের মিনারের ভয়াবহ নিরাপত্তা থেকে,
যাতে আমি নামতে পারি পথে
পৌঁছতে পারি আমার মহান ভাইদের কাছে
যাদের নীল চোখে, বীর বাহু আমাকে গর্বিত করে।
(Sn Memoriam)

॥ ২ ॥

লুক্সেমবার্গ ১৯৩৯

লুক্সেমবার্গের সুন্দর সকাল,
এই শরতের সুন্দর সকালে
যৌবনের দিনগুলো অনায়াসে কেটেছিলো।
অলস ভাবে কেউই পথ চলছিল না
জল ছিল না, নদীতে নৌকা ছিল না
আর ছিল না কোথাও শিশু ও ফুল।
হায় বসন্তের ফুল, শিশুদের কল কাকলি
শীতের আগমনে কোথায় লুকালো!
শুধু দুই বৃদ্ধ প্রাণপণে টেনিস খেলার চেষ্টা করছে
শিশুহীন এই শরতের সকালেও
ছোটদের থিয়েটার বন্ধ।
এই লুক্সেমবার্গে আমি আমার হারানো যৌবন
আর খুঁজে পাইনা এখন,
এখনও সেই বৃক্ষগুলো কি উন্মুখ হয়ে আছে।
আমার স্বপ্নেরা হেরে গেছে, ভেঙ্গে গেছে
বন্ধুরা হতাশ কণ্ঠে বলে—
এমনও কি হয়, কখনও হতে পারে?
শুকনো পাতার মতো ওরা ঝরে পড়ে
সেই বিবর্ণ পাতা কত পায়ের চাপে
আহত হতে হতে ক্রমশ মারা যায়
সবুজ রাস্তা রক্তে লাল হয়
তারপর বেলচা করে ঠেলে দেয় কবরখানায়।
এই লুক্সেমবার্গকে আমি চিনি না,
ওই পাহারাদার সেনাদের জানিনা,
ওরা বন্দুক উঁচিয়ে সেনেটারদের পালাবার পথ পাহারা দে
ওরা বেঞ্চের তলায় সুড়ঙ্গ কাটে
যেখানে ছড়িয়ে আছে আমার চুমার স্মৃতি
হায়রে সেই দুরন্ত যৌবন।
আমি দেখি পাতাগুলো ঝরছে
ঝরে পড়ছে আশ্রয় স্থলে, গর্তে, সুড়ঙ্গগুলিতে
যেখানে অনবরত রক্ত ঝরছে
এই সময়ের ইউরোপে
প্রতিদিন নতুন নতুন দেশের জন্মকে হত্যা করা হচ্ছে
হত্যা করা হচ্ছে অনন্ত নতুন সম্ভাবনাকে
হত্যা করা হচ্ছে সভ্যতার আশা-আকাঙ্খাকে।
(Luxembourg 1939)

—●—

অশোক চট্টোপাধ্যায়ের তিনটি কবিতা

কাক

স্মৃতিময় ভরাট দুপুর
হটাৎ ডেকে উঠলো—'কা'
কয়েকটা শুক্‌নো পাতা
ছড়িয়ে গেল এধারে-ওধারে
যেন ভয়ে, যেন আতঙ্কের কোন
খবর এসেছে ;
আমি বিরক্তিতে ঘাড় ফেরালাম।
আমাকে দেখেও না দেখার ভঙ্গীতে
এধার-ওধার ঘাড় বেঁকিয়ে
সে আবার ডেকে উঠল—'কা'

তার উপেক্ষায় আহত আমি
পরম উদাসীনতায় অন্য দিকে
ঘন আম বাগানের ছায়া-শীতল
অন্ধকারে অদেখা সেই পাখি
মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে ডেকে চলেছে
কু — কু — কু।

আমি কোনদিকে যাবো
উপেক্ষায়, না আকুলতায় ॥

রমণী : চার

বিস্মৃতির গহীন অতলে
আজো কারো সজল দু'চোখ
মনে পড়ে নারী ?
কিছু কথা, কিছু হাসি,
কিছু মগ্ন শারীরিক
সুখ-অন্বেষণ
মনে পড়ে ?

...গরের জলে

সহ ...গরের জলে
স্ন...তা রমণীটি বিকেলের রোদে—
উজ্জ্বল রূপালী দ্যুতি
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল তীর ॥
চিকন মাছের বাঁক
কি সহজ চলা ফেরা তার।

আমি সেই রমণীকে দেখি
দেখি তার ...
আর ...
সাঁতা... ভঙ্গীর বিস্তার ॥
রূপা... ক্রমে
সোনা হয়, ...ার রঙ।

আকাশ অন্ধকার, অন্ধকার সাগরের জল
স্নানরতা রমণীটি ঘরে ফিরে গিয়েছে কখন
অন্ধকার ঢেউ শুধু অন্ধকার তটে ছুটে আসে
অন্ধকারে মেশে অন্ধকার।

জীবনী হয়না কবিতা হয়না / মতি মুখোপাধ্যায়

একেক মানুস আছেন, যাঁদের কোন জীবনী হয় না, কবিতা হয়না
লিখতে বসলেই সে সব মানুষকে ঘিরে ভিড় করে
পোকামাকড়, টিকটিকি, আরশোলা, ইঁদুর ইত্যাদি ইত্যাদি
ঘেরাও করে আটপৌরে ঘটনা
কবে যেন বাজার করতে গিয়ে দশটা টাকা হারিয়েছিলেন
ট্রেনের কামরায় কার পায়ে পা ফেলতেই গালি-গালাজ শুনতে হয়েছে
চোখটা গোলমাল করছে, ঘাড়ে ব্যাথা, কে জানে প্রেসার নাকি স্পণ্ডিলাইটিস
বউয়ের শাড়ি, মেয়ের স্কুল ড্রেস, ছেলের জিনস্
কাল সন্ধ্যে থেকে আজো আলো নেই
কলের জল রেশমী সুতোর মত মিহি হয়ে পড়ছে
এমাস থেকে ওভার টাইম একেবারে বন্ধ
সপ্তায় দুদিন বাড়ি এসে পড়াতে টিউটার [illegible], দেড়শো

অনেক দিন কোথাও যাওয়া হয়না
এবার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কি কোঅপারেটি[illegible] পূজার সময় দার্জিলিং কি পুরী গেলে মন্দ হয়না

এভাবে হাজার পাতা লেখা যায়, কিন্তু জী[illegible]না
তবু কি আশ্চর্য, এইসব মানুষের জীবনী না [illegible]লেও একটা জীবন আছে
লাউডগা সাপের মত গাছের রঙে রঙ মিলিয়ে বেঁচে থাকা
আলাদা নয়, হয়তো সে কারণেই আগ্রহী নয় জীবনী লেখকেরা
তাছাড়া
বিশিষ্ট না হওয়ার কারণেই হয়তো লোকটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে
হনুমানের মত নিজের লেজে আগুন লাগিয়ে
মুহূর্তেই ছাই করে দিতে পারে [illegible]ঙ্কা[illegible]ক

কিন্তু দেয়না
যেহেতু লোকটার ভেতরকার অ[illegible] [illegible]বান্[illegible] উ
বড় বেশী অন্যের কথা ভাবে, ভয়[illegible] [illegible]পের ছায়াকে
'পাপের চেতন মৃত্যু' শিশুকাল, [illegible] [illegible]া ইস্তক
দু' হাত ছড়িয়ে আগলে রাখে নিজেকে
যেন ধূলো ময়লা কীট পতঙ্গ
তার শুদ্ধ অথচ ব্যর্থ জীবনকে ছুঁতে না পারে
যেন তার জীবনী হীন জীবন নিষ্কম্প শিখা হয়ে থাকে ঝড়ের রাত্রিতে

উদ্ভিদ / রবীন সুর

যেখানেই পাঠাও না কেন
আমি আমার স্বভাবে
চারধারে ছড়িয়ে পড়বো।
অদলবদল যতো নিজের খাতায় টুকে রাখো
কেন না এসব হিশেবনিকেশ
আমি চুকিয়ে বসে আছি।

আমাকে যেখানেই পাঠাও
আমার সমস্ত কিছু সঙ্গে নিয়ে যাবো
এবং আমার যা কাজ
মোটেই আর কোন বিঘ্ন হবে না।

কিছু কিছু উদ্ভিদের বীজ আছে যারা
পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলে
যে কোন জল বাতাসে
ঋতু নির্বিশেষে অঙ্কুরিত হতে পারে।

আমার বুকের মধ্যেও অনুরূপ কিছু
প্রতিদিন উন্মোচিত হওয়ার বাসনা
যখন যেখানে খুশী
ঘরে ও বাহিরে
চেতনে অবচেতনে অনুভূতির ত্বক ভেদ করে
পল্লব ছড়াতে চায়।

তোমার যেখানে খুশী আমাকে পাঠিয়ে দাও
আমি নিজের স্বভাবে
চারধারে অনিবার্যভাবে ছড়িয়ে যাবো।

অথ বায়স কথা / কৃষ্ণসাধন নন্দী

সেই অশুভ ডাক শোনোই যদি রোজ
ছাদের কার্নিশে
তবে কি ঘনিয়ে এলো অন্ধকার ?
ভূষণ্ডীর যা কাজ তা করে।
বিমূর্ত ছায়ায় মিছে আত্মসমর্পণ, কষ্টবোধ
পাগলের মতো হুস্‌হাস্‌ শব্দ
ব্যতিব্যস্ত নিজে ও অপরে।

য[illegible] পরোয়ান। নিয়ে একি অনর্থখেলা
[illegible]া তা কেউ পারে কি ঠেকাতে ?
[illegible]ভাষা আছে কথা বলি বিভিন্নতায়।
সহ[illegible]ই কথা সারাদিন
স[illegible]শ্রীবন্দনায়. অভিসারে অথবা
[illegible]ত্যাবর্তনে ঘরে।

[illegible]মিছে মন খারাপ, অর্থ হয় না কিছু।

দুঃখ জনক / আবু আতাহার

যে কোন মৃত্যুই দুঃখজনক
সে আমার মিত্র অথবা শত্রুর।

একবারই পৃথিবীতে আসে মানুষ
একটাই জীবন নিয়ে তার ভোগ
রূপ রস গন্ধ
পৃথিবীর প্রেম বড় ম ময়
এই প্রকৃতি মায়ের মতোই স্নেহ দেয়
প্রেয়সীর মতো প্রেম দেয়
আলো বাতাস ফুলফল
সমুদ্রের উচ্ছল যৌবন পাখির কলতান
শুভ্রাবরণ বরফ চাদর গায়ে পাহাড়চুড়ো

শস্যশ্যামল অন্নপূর্ণা মাঠ
তা থেকে প্রস্থান
বড় দুঃখময়!

মিত্রর সঙ্গে আমার মিলনে সুখ
শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে আনন্দ
তাই মিলন ও লড়াইয়ের সমাপ্তি
আগুনে পুড়ে যাওয়া সুখী গৃহকোণের মতো
বড় বুকে বাজে

পরলোকে চলে গেলে ফিরে আ
পরিত্যক্ত বাগানের মতো পড়ে থা
এই সত্য জেনেছি এখন
বড় নির্মম।

তাই যে কোন মৃত্যুই দুঃখজনক
সে আমার শত্রু অথবা মৃত্যুর।
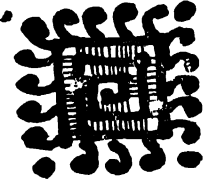
আমি আজ / সৌমেন অধিকারী

আমার নিহত স্বপ্নেরা সব
একে একে ভীড় করে
তাকিয়ে পাণ্ডুর চোখে,
ধীরে ধীরে
জলদ গম্ভীর স্বরে বলে :
অপঘাতে আমরা নিহত,
অথচ, ছিলাম বুকের মধ্যে
এবং তোমার কতো জন্মদিন কেটে গেল,
আয়ু থেকে প্রতিটি ঋতুতে
ধীরে ধীরে ঝরে গেলাম।
— তোমার সানন্দদিনে কোনো মুহূর্তেই
আমাদের পিণ্ডও দিলে না,—
আমরা আজ স্বপ্ন নই,
পিণ্ডহীন প্রেত।

বাজ পড়া বাড়ীর ছায়ায় বসে
নিহত স্বপ্নগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলাম।
বললাম : দেখ ভাই
আমার হৃদপিণ্ডটাও হারিয়ে ফেলেছি,
আমি আজ নষ্ট হয়ে গেছি॥

অযুত বছর ফুরিয়ে গেলেও / সন্তোষ কুমার মাজী

যতোই তুমি নিষেধ করো
অযুত বছর
ফুরিয়ে গেলেও
অযুত অযুত অযুত বছর
মজুত করে যতোই রাখো
থাকবে তারা।
তেমন ধারা বিষের ফলের
সুধার-শিশির
তোমার হাতে চুঁইয়ে পড়ে
বৃন্তচ্যুত হতেই হবে
তোমার হাতে।
মনে মনে মনে মনে
মনের মাঝে অন্তরালে
যতোই ভাবো
যতোই তুমি নিষেধ করো. নিষে[illegible]
তেমনি করে
নিষিদ্ধ ফল
টস্‌টসানো রসের ভারে
পড়বে নুয়ে
তোমার চোখে
চোখের পাতায়
শরীর বেয়ে, সকল শরীর বিছিয়ে দেবে……
অযুত বছর
যতোই যতোই যতোই ভাবো
যতোই তুমি নিষেধ করো
থাকবে তারা
আদম ও ইভ॥
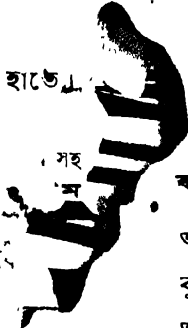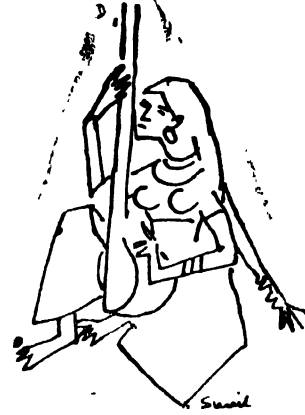
কার কাছে / শ্যামল কান্তি মজুমদার

আকাঙ্খার ছিপে তুমি বঁড়শি পরিয়েছ
বুকে বিঁধে আছে তার ফলা
অন্তলীন যন্ত্রনায় ক্ষয়ে যায় বেলা
রাত্রি ঝাঁপ দেয় করপুটে
আলোছায়া উঠোনের সাফল্য পেরিয়ে
[illegible] পড়ে দীর্ঘ দেবদারু—
[illegible] ইচ্ছার মতো নিস্পৃহ দাঁড়িয়ে।

[illegible] কাছে যাব শুশ্রুষায় ?
[illegible]হীন চেয়ে আছ তির্যক ভঙ্গিমা
[illegible]মুখে ভেসে আছে ব্যথা।

স্বপ্নের সাম্পানে নামে কান্না, হাহাকার
তোমাকে নির্মম হাত বারবার স্পর্শ করে যায়
কার কাছে যাব পরাজয়ে ?

অরুণ সরকারের যাবজ্জীবন

রবিবার গুলোয় শ্যামল একটু বেশীক্ষণ বিছানায় আটকে থাকে। ঘুম থাকেনা চোখে। শুধু পড়ে থাকা। ব্যতিক্রম না হলে ছুটি কিসের! এই রবিবার গুলোই ত একটু অন্যরকম হবার দিন। হপ্তায় একদিন লুডোর ঘুঁটির মতো ছকের বাইরে চলে যাওয়া। এর স্বাদই আলাদা। রবিবারের সুখ প্রেমিকার প্রথম দিনের ভালবাসা, সম্মতি দেওয়া লজ্জাতুর মুখের মতো। তবে সব রবিবার শ্যামলের কাছে সমান যায়না। শোভার রোদ্দুরের ওপরও কিছু নির্ভর করে। ডি এ. বাড়লে আনন্দ হয় এমন ত! মাসের শেষ দিকে তাই মাঝে মধ্যে সম্পর্ক যায়। তার ওপর বুড়ো বাপ মা! শোভার দিকে একটু লক্ষ্য থাকেই। সেটাও শ্যামলকেই হয়।

পড়শীর রেডিওতে সকালের নীলিমা সান্যাল। এর পর শুয়ে থাকলে শোভা ঝাঁপিয়ে পড়বে। সে বিছানা ছাড়ে। শরীরে রবিবারের ছুটির বর্ম থাকলেও শোভার অস্ত্র অতন্ত ধারালো। টিকবেনা। বিছানা থেকে নামতেই তার কানের কাছে ছুটির ভ্রমর গুনগুনিয়ে যায়— রবিবার রবিবার! মাকড়শার জালের ... আলস্য থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ... করে। খবরের কাগজ? নেই। ... এই চেয়ার টেবিল তার চাকরীর কৈশোরে ... টাইমপিস। রবীন্দ্রনাথ-লেনিনের ফটো। ... লেনিনের বুড়ো বয়সের ছবি নেই? তেমন চোখে পড়েনা। আর রবীন্দ্রনাথের বেলায় বিপরীত। যুবা বয়সের ছবি খুব কম। কেন যে সেই যুবক সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী ছবি লোকে রাখেনা!

ঘরের কোণে কোণে ঝুল। শোভাটা তেমন সময় পায় না। এক হাতে সব। খাটটা শোভার বাবা দিয়েছে। ওতেই ফুলশয্যা। আহা! সে এক দিন! ড্রেসিং টেবিলটা বন্ধুরা চাঁদা তুলে বিয়েতে দিয়েছে। ফুলশয্যার দিন খেটে ছিলো বটে কেশব! শেষ পর্যন্ত বেচারার খাওয়াই হলনা।

কেশবের কথা মনে পড়তেই শ্যামল একটু ভাবনায় পড়ে। আজ ওর মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করার দরকার। কেশব অনেক করে বলেছে। বেচারা এখন জেলে। কাল শ্যামল গিয়েছিলো। কি চেহারা হয়েছে দুদিনেই! নাও, এবার ইউনিয়ন করার ঠ্যালা সামলাও! কমীও করবে আবার অফিসারের সঙ্গে হাতাহাতি! ... জানিস না, অফিসাররা সব ঈশ্বরের সন্তান! মাইনে বেঁচে থাকা বাড়ানোর জন্যে তোর আন্দোলন কেন? তোর কে খাবে? বেকার-থাকা করিসনি! ওসব ঝুট ঝামেলায় কেন যাওয়া?

গতকাল শ্যামল যখন কেশবের সঙ্গে দেখা করতে যায় তখন এসব ... বলতে পারেনি। সে জানে কেশব তর্ক করবে। বরং। ওকে দেখে কেশব এগিয়ে এসে দুহাতে গরাদ ধরে দাঁড়ায়। শ্যামল সেই গরাদের বাইরে। কেশবের মুখে বাসি দাড়ি। এলোমেলো চুল। জামা কাপড় অপরিস্কার। চোখের কোলে কালচে ছোপ। বন্দী জীবন। ...র খুব কষ্ট হয়েছিলো।

—কেমন আছিস কেশব?

—ভালো।

—এখানে কেউ ভালো থাকে বলে ত শুনিনি—

—ঐ আর কি—! কম্বলটায় গন্ধ। ছারপোকা। মশা,

ধুলো—

—সিগারেট খাবি ?

—দে। অনেকক্ষণ খাইনি। মহিম এসে দু'প্যাকেট দিয়েছিলো, ফুরিয়ে গ্যাচে।

—শ্যামল ও দু'প্যাকেট কিনেছিলো। সেটা দিয়ে যায়।

—শ্যামল, কাল ত রবিবার, মাকে একটু দেখে আসিস।

—সোমবার খবর দিবি।

—তুই বেল পাবিনা ?

—পাবো হয়ত। তবুও একবার যাস—

—আচ্ছা।

ফিরে আসার সময় কেশব দু'হাতে গরাদ চেপে, সেই লোহার বাধার ওপর চোখ, নাক, মুখ রেখে দাঁড়িয়েছিলো। শ্যামল বুঝেছিলো বন্দীত্ব কারই বা ভালো লাগে তবু কেশব বিয়ে করেনি এখনও। ছেলের বাপ নয়।

এই নাও চা .. শোভা ডিস সমেত চা নামায় টেবিলে। শ্যামল ভাবনার জাল থেকে বেরিয়ে শোভার মুখের দিকে তাকায়। মেয়েলী গোঁপে পোকা ওঠা ঘামাচির মত ঘাম। মাথার সামনের চুল ফাঁকা হয়। কপালটা একটু বেঁধে এসেছে। সারা মুখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বয়স্ক ব্রণ। গলায় হাড়। চোখ তলিয়ে যাচ্ছে। রাতে গরমে কষ্ট পায়। পাখা ত নেই। রক্তহীন ঠোঁট।

কেশব চায়ে চুমুক দিতে দিতে গোড়াকে জরীপ করে। চা শেষ হ'লে শোভা প্রথম কথা বলে. কি দেখছো মুখের দিকে তাকিয়ে ?

—নাঃ, এমনি .. সাইকেলের পাম্প খোলার মত একটা শ্বাস পড়ে শ্যামলের।

.. চা খেয়ে বাজারটা এনে দাও।

—কিন্তু আমাকে যে একবার কেশবের বাড়ি যেতে হবে!

—সে পরে যাবে। এদিকে রান্নার কিছু নেই। বুবুনের আমূলও ফুরিয়েছে। মায়ের আবার আজ পূর্ণিমা। শোভা কাপ ডিস তুলে নেয়। আঙুলের লাগোয়া শিরাগুলি খিঁচিয়ে ওঠে। শ্যামল তার কপালের ঠিক নীচে অল্প শক্তির বাল্‌বটার সুইচ অন করে সামনেই লটকানো জীবনবীমার ক্যালেণ্ডারের ওপর আলো ফ্যালে। পঁচিশ তারিখ। ছাব্বিশ-সাতাশ আঠাশ—উঃ অনেক দেরী। সে উঠে পেরেকে ঝোলানো জামা পেড়ে নেয়। হাত-চিরুনী দিয়েই চুল। আয়নাটা ধারে। কিন্তু বাজার, মায়ের পূর্ণিমা ? সে ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলে—ব্যাগটা দাও—!

—ভাকো কোথায় আচে—আমার হাত জোড়া—! রান্নাঘর থেকে শোভা।

শ্যামল ব্যাগ খুঁজে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। মাথার ভেতর ছুটির ভ্রমর আবার গুনগুনিয়ে যায় রবিবার-রবিবার। কেশবের মা-রবিবার-বাজার!

রবিবারের বাজারে শ্যামল মাথার ঠিক রাখতে পারে মনে হয় সব্বাই জেনে গ্যাছে শ্যামল নামে লোক জীবন অসুবিধেয় আছে। তাছাড়া যদি সব জিনিসের দাম কেবল গাছে উঠতে তাহলে মাথার ঠিক রাখা যায়! ও কোনমতে ঝেড়ে বুড়ে বাজারটা করে। একটু দেরীও হয়ে যায়। রবিবারের বাজার চেনা মুখগুলোর সঙ্গে পরিচয় ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ। তাই তাদের সঙ্গে হাসি হাসি মুখ করে দু'একটা নিরস কথা বলতে হয়।

বাড়ীতে ঢুকেই শোনে নতুন লোকের কণ্ঠস্বর। দু'শাশুড়ী। কি বিপদ! এমন অসময়ে! এমন মাসের শেষে কোনও আত্মীয়র আ[illegible]। শ্যামল রান্নাঘরে বাজার লুকিয়ে [illegible] মত গুটি গুটি এসে দাঁড়ায়।

—জামাই [illegible] ভালো ত ? কতদিন খবর জাননি বলুন ত!

—ভালো আছো বাবা! থাক থাক, দীর্ঘজীবি হও! ভালো আছি ? ভালো ত থাকতে চাই। সবাই চায় কিন্তু থাকতে দিচ্ছ কোথায় ? মাসের শেষে এমন হামলা

করলে কোন শালা ভালো থাকে ? তোমরা কি বুঝবে। সব বোল্তার জাত ! খালি হুল ফোটানো আর বোঁ-বোঁ খবর রাখো-হাউ মেনি প্যাডিতে-হাউ মেনি রাইস।

ভেতরে একধরনের বিতৃষ্ণা নিয়ে শ্যামল পাশের ঘরে ঢুকতেই শোভা তাড়াতাড়ি এসে চাপা গলায় বলে কি গো, এই বাজারে হবে? একটু মাছ আনো, আর দই। জলখাবারের জন্য সিঙ্গাড়া।

শ্যামলের মাথায় মাসের শেষ সপ্তার বাজনা বেজে উঠে। তাহলে তোমার কাছে টাকা নেই ?

—না।

—থামো দেখি। শোভা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কয়েক মিনিট পরেই ফিরে আসে। কেঁচড়ে লুকিয়ে আনা লক্ষীর ভাঁড় বের করে ভেঙ্গে ফ্যালে। শ্যামল অবাক হয়ে শুধু দেখে যায়। এই মুহূর্ত্তে তার যেন অন্[illegible]ছু করার নেই।

আবার বাজার আসে। দই আসে। গল্প করতে করতে খাওয়া শেষ হয়। [illegible] মুছতে মুছতে এঁটো কুড়ায়।

—জামাইবাবু আজ একটা সিনেমা দেখলে হয় [illegible] দিদি ত বলছিলো কতদিন ছাখেনি।

—তুমি বাবা শোভাকে একটু ডাক্তার টাক্তার দেখাও। ওর শরীরটা দিন দিন —

—হ্যাঁ সিনেমা ত গেলেই হয়। তবে বাংলা ছবি আর দেখতে ভালো লাগেনা। উত্তমকুমার [illegible]

—হ্যাঁ, শোভাকে ডাক্তার দেখাবে ? কি [illegible] ত্যাতো করে বলি একটা কথাও শোনে না। [illegible] মত—

শ্যামলের রবিবারের দুপুর কা[illegible]ওয়ারি আলস্য নিয়ে। সিনেমার ব্যাপারটা শো[illegible] ম্যানেজ করে দিলে। দেবেই সে ত জানে। শ্যামলের পকেট এখন বেলুন। বাতাস-বাতাস।

শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সন্ধ্যে পার করে দিয়ে গ্যালো শ্যামল একবার ভদ্রতার খাতিরে থাকতে বলছিলো। থাকেনি। থাকবেনা শ্যামল জানত। তবু বলতে হয় তাই বলা। ওরা চলে যেতেই শ্যামল একটু আড্ডার জন্যে ধানি মাছ। তাছাড়া কেশবের মায়ের কাছেও একবার যাওয়া দরকার। কেশব ত জানেনা শ্যামলের মাসের শেষ দিকে অশৌচ চলে। কোনও দায়িত্ব দিতে নেই। তাকে সব সময় সুখী রাখতে হয়। শুধু কেশব কেন ? এটা হয়ত কেউই জানেনা। একমাত্র শোভা ছাড়া। তাও সে মাঝে মধ্যে নিরূপায় হয়। যেমন আজ। এসব ভাবতে ভাবতে শ্যামল আড্ডার জার্সি পরে বেরিয়ে যায়।

রবিবারের আড্ডা। শ্যামল সেই আড্ডার জাঁতিকলে আটকা পড়ে যায়। তাস-চা-সিগারেট। খুনসুটি। পঁচিশ-ছাব্বিশ-সাতাশ। মায়ের উপোস। কাল সকালে অফিস। কেশবের মা। শোভার লক্ষী-ভাঁড়। রবিবার—এসব কিছুই মনে থাকে না তার।

বাড়ি ফিরতে রাত হয়। সব্বাই ঘুমিয়ে। একজন ছাড়া। যার লক্ষী-ভাঁড় নেই। জামা-টামা ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসে।

—তুমি খেয়েছো ?

—না।

—তবে তোমারটাও নিয়ে নাও, একসঙ্গে খাই।

—আমার খিদে নেই তুমি খাও।

শোভা [illegible] এক কষ্টের সঙ্গে ভালোবাসার সুর মিশিয়ে কথাটা বলে। শ্যামলের তাই মনে হোল। তারও খেতে তেমন ইচ্ছে রইলো না। যদিও শোভা দুপুরে ভালোমন্দ বাঁচিয়ে রেখেছিলো ওর জন্যে। শ্যামল অনিচ্ছায় আঙ্গুল ভাত নিয়ে নাড়ে। শোভা উবু হয়ে দুই হাঁটুতে দুহাত, থুতনি আর [illegible]র মাঝামাঝি রেখে ছাখে।

এক সময় ঘরের আলো নেভে। ওরা শুয়ে পড়ে। শোভা একদম পাশ ফিরে। মাঝে ছেলে। বুবুন। এক বছরের। শুলেই শ্যামলের ঘুম আসেনা। সেও পাশ ফিরে ঘরের একমাত্র খোলা জানালার দিকে তাকায়।

জানালার পরেই খানিক খালি জমি। সেই জমিতে জ্যোৎস্নার মোম গলে গলে পড়ছে। আজ পূর্ণিমা। তাই পৃথিবীর ষোড়শী বাঁদী মনোরঞ্জন করছে রাতে। সেই আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তন্দ্রা। একটুপরে ঘুম। তারপর শ্যামলের ঘরে একজন একজন করে লোক আসতে থাকে। সকলের শরীরে কালো পোষাক। কিছু কিছু সাধারণ। শ্যামল সেই কালো কোট গায়ে লোকগুলোকে চিনতে চেষ্টা করে। সে চিনতে পারে। তার বাবা একটা উচুঁ চেয়ারে বসে। হাতে হাতুড়ি। পিছনে দাঁড়িপাল্লা। গান্ধিজী। শোভা একদিকে চুপচাপ। বিমর্ষ। মা কি সব কাগজ পত্র দেখছে। সেই সময় কে একজন চিৎকার করে—আসামী শ্যামল মুখার্জী হাজির—শ্যামলকে একটা কাঠের খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। একজন বই ছুঁইয়ে বলে, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না—এই সময় শোভা কালো কোট গায়ে উঠে দাঁড়ায়। সে চেঁচিয়ে বলে—ইওর অনার শ্যামল মুখার্জী একজন সৎ এবং নিষ্ঠাবান। ওকে আসামী হিসেবে চিহ্নিত করা— স[illegible] পোসাকগুলি হেঁসে ওঠে। শোভার কথা চাপা কা[illegible] যায়। সে বসে পড়ে। [illegible]
অর্ডার—হাতুড়ির শব্দ। বাবা মাথা নাড়ে। এ[illegible] একটা কাগজ তুলে পড়ে যায়— আমি সব বিষয়ে অবগত হইয়া-ন্যায় বিচারের স্বার্থে আসামীকে যা[illegible]বন কারা-দণ্ড দণ্ডিত করিলাম।

শ্যামল চিৎকার করে বলে -ইওর অনার এই আসামীকে ত আপনিই ·····

আবার হাসি। শ্যামলের ঘুম ভেঙ্গে যায়। শুকনো গলা, ভিজে শরীর। না[illegible]সে পেচ্ছাবের গন্ধ। বুবুনের কাণ্ড। মশাও কামড়ায়। ছেঁড়া মশারী বলে ঢুকে পড়েছে। সে মশারী তুলে মেঝেয়। ঘরের ভেতর তখন চাঁদের ফুলকি। জানালা খোলা পেয়ে চাঁদের নির্য্যাস এখন ঢুকে পড়েছে। শ্যামল অভিভূত। তার ভীষণ বাইরের আলোয় বেরিয়ে আসতে ইচ্ছে হয়। দরজা খোঁজে। পায়না। সে পাগলের মত দরজার সন্ধানে ঘরময়। সর্বত্র দেওয়াল। বাইরে কে যেন ঘুরে যায়। তার ভারী বুটের শব্দ। পাহারা? সে ক্লান্ত হয়ে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়ায়। বাইরে সেই ফাঁকা মাঠে চাঁদের মোম। তার খুব কষ্ট হয়। এমন চুপচাপ, নিথর রাতে সে একটু জ্যোৎস্না মাখতে পেলনা।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার নজরে আসে একজন মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে আপন মনে। জ্যোৎস্নার ভেতর ছুটছে। সাঁতার দিচ্ছে। খেলছে। কে লোকটা? ও কি পৃথিবীর না অন্য গ্রহের? এক সময় লোকটা জানালার কাছে এগিয়ে আসে। পরিষ্কার মুখ, পরিপাটি চুল। ধপধপে পোষাক।

[illegible] আছিস শ্যামল?

[illegible]

[illegible]ক কেউ ভালো থাকে!

[illegible] সহ [illegible]থাকা মানে—ঐ আর কি—

[illegible]গারেট খাবে?

[illegible]দে, অনেকক্ষণ খাইনি।

—এই ক'প্যাকেট রাখ। আজ চলি—

শ্যামল গরাদের ফাঁকে নিজের নাক, চোখ, মুখ, চেপে দাঁড়িয়ে থাকে। তখনই শোভা পিছন থেকে ওর পিঠে হাত রেখে বলে—কি করছো একা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে [illegible]ল চকিতে পিছন ফেরে। তারপর তার দশ অ[illegible] সমস্ত শরীর খুঁজতে থাকে—কোথায় তো[illegible]কাট, কোথায় তোমার ·— !

কবিতা বনাম লাল নিশান

উশীনর চট্টোপাধ্যায়

জোৎস্নার নাবিক / মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায় / কেতকী / দশ টাকা

লেনিনের উদ্দেশ্যে লেখা একটি কবিতায় মায়াকোভস্কি একবার ঘোষণা করেছিলেন, 'Now's no time for a lover and his loss'। রুশ বিপ্লবের ভরা জোয়ার-বলশেভিক পার্টি তখন বিদ্রোহের লাল নিশান উড়িয়ে যাত্রা শুরু করেছে। প্রায় অনুরূপভাবে, আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে, একটানা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী প্রেমময় রোম্যান্টিক গীতিকবিতার শাসনে বাঙালী পাঠক যখন স্বতই কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎই শিরদাঁড়ায় খোঁচা মেরে সমস্ত অবসাদ দূরীকরণের অস্ত্রস্বরূপ তার সর্বক্ষণের ... পরিণত হয়েছিল একরকম একটি পংক্তি: 'প্রি... খেলবার দিন নয় অদ্য'। আর প্রায় এরই স... ভাবধারাপুষ্ট আস্ফালন, অবক্ষয় আর ভাঙনে... আন্তরিক আবেদন এসেছিল যুদ্ধসাজে সজ্জিত... কিন্তু সাম্যবাদী ধারণা-ভাবনা কি সেই প্রথম এল বা... কবিতায়? কেউ হয়ত বলবেন, বহু আগেই তো নজরুল... অনুরণন তুলেছিলেন অগ্নিবীণায়, ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের সময় নিতান্তই প্রেমের কবি বুদ্ধদেবও কি পক্ষপাতী ছিলেন না হেমন্তলাল ছদ্মবেশ ছিন্ন করার? ঠিক, তবে সেই সকল ক্ষেত্রে সাম্যবাদ কি একটা ভাবালুতা-পূর্ণ অনুষঙ্গই জাগায়নি মাত্র? আর এই ...দের মনে পড়বে অশ্রু শিকদারের মত কো... ...লোচকের উক্তি, যাঁর স্মরণ করিয়ে দি... ...সেই সাম্যবাদের অস্তিত্ব লেনিনের রচনায় ছিল... ...দের কল্পনায়, মানবিক সহানুভূতিতে, বিমুখ বি... কবিদের বিরূপতায়। কিন্তু পদাতিকের রণধ্বজা উড়িয়ে, কবিদের বিশুদ্ধ ধ্যানের আসন আন্দোলিত করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যখন বাংলা কবিতার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তখন তাঁকে একটি রাজনৈতিক দলের মতবাদ সম্পূর্ণ সমর্থন করে, সেই মতবাদে দীক্ষিত হয়ে এবং দলভুক্ত রাজনীতির প্রতিনিধি হিসাবেই কোমর বাঁধতে হয়েছিল। তবে প্রথম আবির্ভাবেই তাঁর অপ্রত্যাশিত সমর্থন লাভের মূলে যেমন ছিল ঐতিহাসিক কারণাবলী, তেমনি একথা ভুললেও চলবেনা যে একই সঙ্গে তাঁর কবিতায় আমরা দেখেছিলাম দ্বিধামুক্ত আত্মবিশ্বাস সব সত্তেরো বছরী সজীবতার পাশাপাশি কলাকৌশল আর কারুকৃতির প্রবীণ পরিমিতি। ক্রমেই পথেই পা বাড়িয়েছেন অরুণ মিত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, রাম বসু, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরা।

তারপর দীর্ঘ তিরিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এই পরিসরেই আমরা পেরিয়ে এসেছি পঞ্চাশের কবিদের বিষণ্ণধর্মী আত্মরতিবিলাপ আর ফরাসী পরাবস্তুবাদীদের ...ঘাটের কবিদের পরীক্ষা-নিরিক্ষা এবং কবিতাকে ...কবিতা করে তোলার প্রয়াস-প্রচেষ্টার পর্বকে। কিন্তু ...ওরের প্রায় শুরুতেই আভাস পাওয়া গেল এক অস্থিরতাময় দশকের, এবং সত্তর দশকেই কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছেন বলে যাদের আমরা জানি তাদের অনেকেই বিষয়বিমুখিনতা বা এই সমস্ত ক্যাটেগরিকে পাশ কাটিয়ে আবার আঁকড়ে ধরতে চাইলেন সেই বিষয়কেই, মুখ ফেরালেন বস্তুনিষ্ঠতার দিকে। ঘোষণা করলেন কবিতা মূল্যবান কিন্তু জীবন তার চেয়েও মূল্যবান। কবিতার বিশুদ্ধ ...নিকেত আর এঁদের তৃপ্ত করতে পারলনা। ...উপলব্ধি ঘটানোর উপায় হিসাবে চিহ্নিত হলনা কবিতা, হতে চাইল জীবনপ্রতিষ্ঠার অস্ত্র।

তবে এই সরলীকরণে পা বাড়িয়ে এঁরা যে সকলেই কবিতাকে কএটি বিশেষ স্তরে পৌঁছে দিতে পেরেছেন একথা ভাবলে অবশ্যই ভুল হবে। জীবনের অন্তিম জয়

সম্পর্কে এঁদের আশার অন্ত নেই। এখানেই এঁদের শক্তির উৎস এবং দুর্বলতারও। কবিতার উদ্দেশ্য নিয়ে অধিক চিন্তিত বলেই এঁদের লেখায় আধুনিকতার ছাপ যতটা না পড়েছে, সাম্প্রতিকতার আভাস তার চেয়েও বেশী। কখনো কখনো কবিতা আর প্রাচীর পত্রের ব্যবধান ও এক নিমেষেই উধাও হয়েছে।

এসব কথা অল্পবিস্তর অনেকেরই জানা আছে। হয়তো বাগ্মিতার মতই শোনাবে কারো কাছে, কিন্তু মোহিনী মোহনের 'জ্যোৎস্নার নাবিক' কথাগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়, পুনর্লিখনে বাধ্য করে তোলে। ৭২-৮২ এই দশবছরের সময়কালে লেখা তাঁর কবিতাগুলি, যখন তাঁর পরিপার্শ্বের সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি প্রচণ্ড এক সংকটের সম্মুখীন। কবি হিসাবে মোহিনী মোহনের নতুন কোন পরিচয় দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা। বিগত দশ বারো বছরের যে কোনো সময়ের ছোট-বড়-মাঝারি যে কোন পত্র-পত্রিকার পাতা ওল্টালেই তাঁর অবিরল কাব্যচর্চার নিদর্শন আমরা অনায়াসে পেয়ে যাই। এই সময়ের দু-এক জনের কথা ছেড়ে দিলে ইদানীং এত বহুল কাব্যচর্চায় আর কোন কবি মনোনি[illegible] করেছেন বলে আমার অন্ততঃ জানা নেই। সেদিক দিয়েও পত্র-পত্রিকার পাঠকের কাছে মোহিনী মোহনের অন্যরকম একটা পরিচয় আছে বলে ম[illegible] হয়। কিন্তু কথাটা প্রান্তিক শোনালেও সুবিবেচক পাঠকেই বোধহয় সায় দেবেন যে, বহুল কাব্যচর্চার ফলশ্রুতি যেমন পাঠকের চোখের সামনে থেকে যাওয়া (যেটা আজকের বাঙালী কবিদের কাছে কবিতার নিত্য আঁতুর ঘরে পাঠকের চোখে নিজস্বতায় চিহ্নিত হবার সমস্যার একটা সমাধান হয়ে দাঁড়িয়েছে) তেমনি এক্ষেত্রে মস্তিষ্ক চালনার অবকাশ বোধ হয় বড়ই কম, যেখানে কবির ক্ষমতার আসল পরিচয় নিহিত বলে মনে করি। তবে মোহিনী মোহন যে জাতের কবি তাতে তাঁর ক্ষেত্রে কবিতার কারুকৃতি জনিত নতুন কোন ধারনায় পাঠককে অবতীর্ণ করা অপেক্ষা বাণীর মহিমা প্রচারই অধিকতর প্রিয় বোধহয়। সেদিক থেকে প্রসঙ্গের দাপটে অন্ততঃ তিনি একশ্রেণীর পাঠকের সমর্থন অর্জন করবেন ঠিকই। কিন্তু আমাদেরতো জানাই আছে যে, কবিতার প্রকৃত উত্তরণে প্রসঙ্গের প্রভেদ বলে আলাদা কিছু নেই, স্বরায়নের প্রভেদই সেখানে প্রসঙ্গের প্রভেদ। সন্দেহ নেই, মোহিনী মোহনের ইতিহাস বিবেক প্রখর। এক একটি অধ্যায়ের স্ফুলিঙ্গই শুধু নয়, ভস্মশেষটুকুকেও তিনি নেড়েচেড়ে দেখতে চান। কিন্তু কোথায় সেই গোয়েন্দা দৃষ্টি, যা একান্তভাবে তাঁরই? আটান্নটি কবিতায় ঘুরে ফিরে আসে মানুষের স্খলনের কথা, ঘৃণা, ধিক্কার আর ব্যাঙ্গ, সেই সঙ্গে প্রবল আত্মপ্রত্যয়, কাস্তে-হাতুরি-লালনিশান। সবই তো বুকের রক্ত ঢালা ন্যায্য অধিকার আর সামাজিক মানুষের প্রতি কর্তব্য! কিন্তু [illegible] প্রত্যয়ে চিড়বিড় করে জ্বলে উঠে কিছু অনুভব [illegible] আর তত্ত্ব সূত্রসার পরিবেশনই কি পাঠকের প্রতি [illegible] নিষ্ঠার প্রকৃত নিদর্শন? বক্তব্যনির্ভর কবিতা [illegible] কিন্তু তার গা থেকে নান্দনিক সমস্ত পোষাক [illegible] বিশেষে উদ্দেশ্যের দিকে চালিত করা কি পাঠকেরই উপজীব্য হওয়া নয়? কেননা পাঠক পরিতৃপ্তির মধ্যযুগীয় ভনিতাপর্ব যখন বাংলা কবিতা বহুদিন আগেই পিছনে ফেলে এসেছে তখন মতবাদের দালালি আর পাঠককে প্রার্থী বা শিক্ষার্থী ভেবে তারই করুনার পাত্রে রূপান্তরিত হওয়া তো সমার্থক ব্যাপার। অবশ্য কবিতার উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ নতুনতর কোন ব্যাখ্যা যদি কেউ দিতে চান তবে [illegible]। একটা কথা বলতে পারি যে, সংস্কার [illegible] য়ে যদি সদ্য অক্ষর পরিচয়প্রাপ্ত পাঠকের [illegible] যেতে হয় তবে তা এক অর্থে আত্ম অব[illegible]র আত্মহননেরই নামান্তর। বিষ্ণু দের মত [illegible] পদাতিক পর্বে কলা-কৌশল নিপুণ সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সতর্ক করে দিতে হয়েছিল যে, ফ্যাসিস্ট বিরোধি প্রচারে আর কমুনিষ্ট ব্যবহারে সুভাষের তদানীন্তন কবিতা অত্যন্ত মূল্যবান ও জরুরী ঠিকই কিন্তু তাতে কবিতার ক্ষতি কতটা সেটাও ভেবে

দেখা দরকার, আর আমরাতো জানিই যে, 'অগ্নিকোন' 'জবাব চাই'। ইত্যাদি কবিতা সুভাষবাবুর জনপ্রিয়তার কারণ হলেও, অক্ষমতারই পরিচয়। কেননা লাল নিশান ওড়ানো আর পাঠকের মগজের মধ্যে অধ্যাত্ম অস্বস্তির ঘুনপোকা ছাড়া এক ব্যাপার নয়; এবং শুনেছি লেনিন নাকি একবার একদল ছাত্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'মায়াকোভস্কি নয়, পুশকিন পড়।' আরার্গঁ বা এলুয়ারও একসময় ভেবেছিলেন যে, রাজনীতি থেকে কবিতাকে দূরে রাখাই শ্রেয়।

অবশ্য মোহিনীমোহন সম্পূর্ণ ভ্রূক্ষেপহীন নন। বরং অনেক ক্ষেত্রে আন্তরিক বলেই আমাদের অপেক্ষাতুর রাখেন ভবিষ্যতের কোন সৎ অধ্যায়ের জন্য। আশার কথা এটাই।

একটি অসংলগ্ন প্রয়াস :

শীতল চৌধুরী

● প্রাণে কেউ জেগে নেই / বিশ্ন[illegible]নিকা / মূল্য—এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

'প্রাণে কেউ জেগে নেই' কাব্যগ্রন্থটি বিশ্ব[illegible] দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। কাজেই, কবির কাছ থেকে [illegible] আমাদের আশা করা উচিত ছিল তা তিনি মোটে[illegible] করেননি। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই আমার [illegible] শুধু দুর্বলই মনে হয়নি, মনে হয়েছে অ-কবিতা দোষে দুষ্ট। না আছে এতটুকু শিল্প-নৈপুণ্য, না আছে কবিতার মধ্যে কবির স্বতস্ফূর্ত জীবনবোধ। যে জীবনবোধের ভেতরে আমরা সহজেই চিনে নিতে [illegible]কে।

কাব্যগ্রন্থটিতে যে কুড়িটি কবি[illegible]ছে, [illegible] মধ্যে বারো আনাই এ-দোষে দুষ্ট। [illegible]র আ[illegible] 'ছোট্ট সেই আগাছা' 'স্রোত নয় চৈ[illegible]তা' কবিতা তিনটি। একেবারে কাঁচা। ঠিক আ[illegible]রা [illegible]শু-কবির মতন। একতিলও ঘটেনি শব্দ-ব্যঞ্জনে দ্যোতনাময়তা ও অর্থবহ ব্যাপ্তি। যা পাঠে এনে দেয় কবিতার একটি নির্দ্দিষ্ট সৌন্দর্য। তবে দু একটি লাইন কবির হাতে হঠাৎ [illegible]হঠাৎ খেলেছে ভাল, মনে দাগ কাটার মতোন—

'আমাদের প্রাণে কেউ জেগে নেই,
আমাদের স্বপ্নে আর কেউ জেগে নেই'
('বিসর্জন')

'এসো প্রেম, আনন্দের জন্য এসো' (সংঘবদ্ধতা)

'ভালো[illegible]সার বিকল্প কিছু নেই,
একদিন তারা বোঝে,
('বোধ')

সবশেষে, এটুকু না বললে নয়—কবি বিশ্বনাথ দাস আদৌ কবিতার জন্য এখনও নিজেকে অগ্নিমন্ত্রে করেননি দীক্ষিত। [illegible] জীবনবোধের অগ্নির ভেতর দিয়ে তিল তিল করে অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে পোড় খেতে খেতে গড়ে ওঠে একজন সৎ কবি। আর এই অভাবের জন্যই আমরা বিশ্বনাথ বাবুর মধ্যে খুঁজে পাই না তাঁর স্ব-ভিটে ও নিজস্ব উচ্চারণ। যা চিনিয়ে দেবে তাঁকে স্বতন্ত্রভাবে।

গদ্যের তিনটি প্রয়াস

গৌর বৈরাগী

মহারাজ ও নোনা চকের ক্ষেত / অচিন্ত্যকুমার দাস ও বংশীলাল সরকার / পুস্তক বিপনী / দাম আট টাকা।

১। মোট ষোলটি গল্পের সংকলন। দুজন গল্পকারের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার দাসের গল্পগুলি আয়তনে তুলনামূলক ভাবে ছোট হলেও খুব তীক্ষ্ণ এবং ঋজু। অল্প কথায় অনেক বেশী বলার ক্ষমতা ইনি আয়ত্ত্ব করতে পেরেছেন ইতিমধ্যেই। ইনি মেজাজে রোমান্টিক। 'মহারাজ' গল্পের অন্তর্নিহিত বেদনা আমাদের স্পর্শ করে। দারিদ্র্য মানুষকে অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ করে, হীন করে না। এই পজিটিভ ভাবনা প্রায় সমস্ত গল্পেই পাওয়া যায় বিশেষ করে 'ফেরা' 'চাঁদ' 'চেনা মুখ' ইত্যাদিতে। ভূমিকায় গল্প নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ঐ অর্থেই 'সকালের রঙ' গল্পটির মধ্যেই কিছু প্রচেষ্টা দেখতে পাই। প্রচেষ্টাটি পুরোপুরি সার্থক একথা বলতে দ্বিধা রয়েছে গল্পটির ২য় পর্বের জন্য। প্রথম পর্বেই গল্পের ... বলা হয়ে গেছে তাই ২য় পর্বটি অতিরিক্ত মনে ... সব মিলিয়ে গল্পকারের প্রচেষ্টা ভাল। খুব শী... তাঁকে আরও জোরালো ভাবে পাবো এমন আশা করতে দ্বিধা হয় না। ২য় গল্পকার বংশীলাল সরকার কে গতানুগতিক মনে হয়। 'নোনাচকের ক্ষেত' এর মত গল্প আগে আগে অনেক বার পড়া হয়ে গেছে। 'তনিমার বেড়াতে যাওয়া' গল্পে তনিমার যে বেড়াতে যাওয়া হবে না এটা আগেই জানা গেছে। গল্পের শেষে তনিমার যথারীতি বেড়াতে যাওয়া হয়নি। ... বিনিময়ে শঙ্কর, ওর স্বামী, তনিমার ঘাম মুছিয়ে ... চুলে বিলি কাটে—এইতেই তনিমার মনে হয় বেড়ানোতে এর চে' বেশি সুখ নেই। এইসব গৃহপালিত ভালবাসায় আর কতদিন বুঁদ থাকতে হবে। 'সাধ' গল্পটির মধ্যে একটি ভাল গল্পের উপাদান ছিল। কিন্তু তাকেও যথাযথ ব্যবহার করা হয়নি। লতার আত্মহত্যার সঙ্গে সঙ্গে গল্পটিরও হত্যা হয়েছে। তুলনায় 'অফিসে রতনের একটি দিন' গল্পে ট্রিটমেন্ট ভালো। জানিনা গল্পকারদের এইটাই প্রথম প্রচেষ্টা কিনা। ভবিষ্যতে আরও ভাল লেখা দেখবার প্রত্যাশায় রইলাম।

২। আকাল আসছে / লক্ষ্মী দাস / শ্রীরাধা প্রকাশনী / পাঁচ টাকা

... সমাজ সচেতনতা এবং শিল্পের সচেতনতা দুটো ...র আলাদা জিনিস। শিল্পীর সমাজ সচেতন ...শ্চয়ই বাধা নেই। কিন্তু শিল্পের ঘাড়ে ... বোঝার মত সমাজ সচেতনতা চাপিয়ে দেওয়া ...য় তা ঠিক ঠিক শিল্পও হয় না। সমাজ বদলাতেও তেমন লেখাটেখার কোন ভূমিকাই থাকে না। যেমন—'এ দশকের একজন' গল্পের শেষে এই লাইনটা—"বদলাবে মানুষ—বদলাবে মানুষের ··· কালো পৃথিবীতে লাল রঙের ছবি একটা উঠবেই'। এরওপর মন্তব্যের দরকার আছে। ঐ গল্পেরই এক জায়গায় বলা হয়েছে সুরেন ... প্রায় পাঁচশো বিঘে জমির মালিক। এখনও ... মালিক আছে নাকি। গল্পের সব ...ম শহরের খুব গরীব আর নিম্নবিত্ত মানুষ। ...খ আর আশা আকাঙ্খা নিয়েই সব গল্প। প্রতি... আবেগ আর উচ্ছ্বাসের ছড়াছড়ি। কোন কোন গল্পের মধ্যে আধুনিক গল্পের ভ্রূণ রয়েছে, যেমন—'টি ভি' 'নেচার' 'আলোর সন্ধানে'। কিন্তু আবেগ আর উচ্ছ্বাসে উজ্জ্বলতাটুকু নষ্ট হয়ে গিয়ে কাঠ খড় বেরিয়ে এসেচে। গল্পের প্রাণটি উধাও। তবু সব মিলিয়ে

একট আন্তরিক প্রচেষ্টা এর জন্যে গল্পকারকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

৩। গল্প হলেও ইতিহাস / অচল ভট্টাচার্য / আশা প্রকাশনী / ছয় টাকা

গল্পে গল্পও আছে ইতিহাসও আছে। গল্পকার 'হাওড় জেলার ইতিহাস' রচনা করতে গিয়ে ইতিহাসের অনেক টুকরো ঘটনা ভাঙা গির্জা, এবং গ্রামগঞ্জের চালু কিংবদন্তীর ওপর কল্পনার রং দিয়ে গল্প সজিয়েছেন। পড়তে ভাল লাগে ইচ্ছে হয় ভাঙা রাজবাড়ির দেউড়িতে গিয়ে দাঁড়াতে। কোন কোন গল্পের ক্ষেত্রে বেশ কটা প্রচলিত গল্পের মধ্যে একটাকে তিনি বেছে নিচ্ছেন। যেমন কালাপাহাড় কে নিয়ে 'একটি ভুলে যাওয়া গল্প'। লেখকের কল্পনায় কালাপাহাড় প্রথম জীবনে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সন্তান। গল্পেও তেমন কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু কালাপাহাড়কে প্রথম জীবনে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সন্তান ভাবার থেকেও একজন অন্ত্যজ হিন্দু ছিলেন এমন ভাবনা কি বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। ভাষা বেশ সরল এবং স্বচ্ছ। শুধু ছোটরা নয় বড়রাও সমান আনন্দ পেতে পারে এ বইটি থেকে। বই-টির বহুল প্রচার কাম্য।

তিনটি ছড়ার বই

সমৎ মান্না

১। টাটকা [illegible] গল্প / শ্রীকর নন্দী / শব্দ, ৬ / [illegible] রোড, শিবপুর, হাওড়া-৩।

২। পুরানী [illegible] ব্রত ঘোষ / সুকান্ত [illegible] ১৪/২ ধর্ম[illegible] পুর, হাওড়া।

৩। তালের বড়া [illegible] পড়তে শেখান / খালোড়, বাগ[illegible] হাওড়া-৩।

১। প্রথম ফসলেই আমাদের গোলাঘর পূর্ণ করে দিয়েছেন শ্রীকর নন্দী।

এমন সময় ছুট্‌কে এসে ছুটকিদিদি [illegible]

ও দাদুভাই, ধামার মুড়ি সব তো[illegible]

'বললে' শব্দের সঙ্গে 'কল্‌লে' শব্দের [illegible] বাঝা যায় ছড়াকারের সতর্কতা। গ্রাম[illegible]তিক পরিবেশকেই ছড়ার বিষয়বস্তু নির্বাচন [illegible]ছেন তিনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। দু-একটি ছড়াতে ছন্দ মিল সামান্য টোল খেয়েছে মাত্র।

আমার নাম হলুদ বৌ, শিয়াল কাঁটার বৌদি
রোজ সকালে পাপড়ি মেলে মৌমাছিদের মৌ দি।

এমন মি[illegible]টি লাইন খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের ছুঁয়ে যায়[illegible] ছোট ছোট 'মজার ছড়াগুলি' খুবই মজার। প্রচ্ছদ এবং অলঙ্করণ ভালো। কিন্তু এতবড় ভূমিকা কেন? ছড়ার প্রত্যেকটি দুটি শব্দের পিছনে একটি শব্দ ভূমিকা, অর্থাৎ ছড়াগুলির মোট শব্দ সংখ্যা প্রায় দু-হাজার আর ভূমিকাতে ব্যবহার করা হয়েছে প্রায় একহাজার শব্দ। অবান্তর মনে [illegible]ছ।

২। রামায়ণ-মহাভারত থেকে এক একজন পাত্রপাত্রীকে তুলে এনে তাদের নিয়ে ছড়া লিখেছেন দেবব্রত ঘোষ। মহাভারতের দিকে ভীম একাই গদা ঘুরিয়েছেন। রামায়ণের অনেকেই আছেন কিন্তু রামবাবু বা সীতাদেবীকে

কোনো স্বতন্ত্র ছড়াতে এককভাবে পেলাম না। অথচ একা কুম্ভকর্ণবাবুকে নিয়ে তিন তিনটি ছড়া। প্রত্যেকটি ছড়াই খুব সুন্দর। অলঙ্করণ ভালো। ছড়া পড়তে যারা ভালোবাসেন, দেবব্রত ঘোষের এই সংকলনটি তাদের ভালো লাগবেই। এই সংকলনের 'ভীম পালোয়ান' ছড়াটি পড়লেই তারা বুঝতে পারবেন দেবব্রত ঘোষ যথেষ্টই পালোয়ান ছড়াকার।

৩। প্রকাশকের নিবেদনে জানতে পারলাম বিশ্বনাথবাবু একজন গ্রামীণ কবি। 'গ্রামীণ' নামে একটি ছড়াতে ছড়াকার লিখেছেন 'গ্রামেই আমার ঘরবাড়ী / গ্রামেই আমি থাকি / গ্রামকে নিয়েই ভাবনা চিন্তা / গ্রামের কথা লিখি'। অথচ আগাপাশতলা সংকলনটি পড়ে গ্রামের কোনো গন্ধ পেলাম না। যা খুব স্বাভাবিক ভাবেই আশা করেছিলাম। এর আগে 'উলটো ছিরি' নামে ছড়াকারের আর একটি সংকলন বেরিয়েছে। তারপরে এই দ্বিতীয় সংকলন— 'তালের বড়া'-র এমন উলটো-পালটা ছিরি দেখে খুবই হতাশ হলাম। দু-তিনটি মাত্র ছড়া কিছুটা ভালো লাগার মতো। বাকী অধিকাংশ ছড়াই ছন্দে মিলে বিশ্বনাথবাবুর ব্যর্থতাকেই তুলে ধরে। একটি নমুনা দিই। 'ঝুমা ঝুমা হেসে বলে / একবার হোকনা / মন বড় খুশি হবে / দেহ খাবে দোলনা'। হোকনা-র সঙ্গে দোলনা-র মিল কোনো দোলা দেয় কি?

সংবাদ :

শারদ সারস্বত সম্মেলন

ইয়ং রাইটার্স ও লিট্‌ল ম্যাগাজিন সম্পাদক সমিতি গত ২৯ অক্টোবর রবীন্দ্র ভারতীর রথীন্দ্র মঞ্চে শ[illegible] সারস্বত সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। সম্মেলনে লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনার মাধ্যমে যারা দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যের সেবায় বৃহত্তর পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে চলেছে এবং লিটল ম্যাগাজিনের প্রচার ও [illegible]রে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ২১ জন [illegible]ম্পাদক ও সংগঠককে সংবর্ধনা জানান হয়। নিঃসন্দেহে এটি একটি সাধু উদ্যোগ। বিশেষত কলকাতার আড্ডা মজলিস ও যোগাযোগ বা নানাবিধ সুযোগ সুবিধা ফিকির থেকে বহুদূরে গ্রাম-মফস্বলে যারা সহজ স্রো[illegible]ব মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিখাদ সাহিত্যপ্রে[illegible] উজ্জ্বল আদর্শ তাঁদের সংবর্ধিত করা, ইয়ং রাইটার্সের সম্পাদক যাকে বলেছেন শ্রদ্ধানিবেদন বস্তুত একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

উল্লেখযোগ্য ঐ ২১ জন সম্পাদক ও সংগঠকের মধ্যে আছেন গীতাময় রায় (শ্রীলেখা), হরেন ঘোষ, স্বদেশ রঞ্জন [illegible] রায় (লা পয়েজি), আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত [illegible]ন), শান্তনু দাশ (গঙ্গোত্রী), কিরণ শংকর [illegible]গুপ্ত (সাহিত্য চিন্তা), জগবন্ধু কুণ্ডু (সাহিত্য সেতু), [illegible]ত্র মুখোপাধ্যায় (কবিপত্র), অপূর্ব কুমার সাহা ([illegible]জাগরী), সত্য রঞ্জন বিশ্বাস (কণ্ঠস্বর), অসিত কৃষ্ণ দে (অতিথি), এ, এফ, সিরাজুল ইসলাম (বুলবুল), দেবকুমার বসু (দর্শক ও সময়ানুগ), দীপক দে (প্রবাহ), অশোক কুণ্ডু (সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী) অজিতেশ ভট্টাচার্য (মধুপর্ণী), দীনেশ [illegible] (বৃষানু), সুবোধ বসু রায় ( ), পান্না[illegible] (স্বদেশ) ও অশোক চট্টোপাধ্যায় [illegible] (গো[illegible]

[illegible]গাজিন সম্পাদক সমিতির সভাপতি শুদ্ধসত্ত্ব বসু [illegible] ম্যাগাজিনের আর্থিক সমস্যার দিকটি তুলে ধরেন। তাঁর ভাষণে জানা যায়, সরকারী বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে এই সমস্যা কিছুটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা চলেছে। রাজ্য সরকারের তথ্য মন্ত্রীর কাছ থেকে এ ব্যাপারে কিছু আশ্বাস পাওয়া গেছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর

সঙ্গেও এ সম্পর্কে কথাবার্তা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপনের জন্য কোন পত্রিকায় কমপক্ষে ২০০০ সার্কুলেশন থাকা প্রয়োজন। শ্রীবসু বলেন কোন লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ২০০০ সার্কুলেশন থাকলে সরকারি বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনই আর হয় না। এই সব শর্তবিধি তুলে নিয়ে, স্বল্প ব্যয়ে ডাক ব্যবস্থা ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে সরকারের উচিত লিট্‌ল ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা নেওয়া।

সম্মেলনের অন্যতম বিশিষ্ট বক্তা মৈত্রেয়ী দেবী বলেন লিট্‌ল ম্যাগাজিন কখনই ব্যবসায়িক পত্রিকা হতে পারে না। এটাই মূল কথা এবং অন্যান্য পত্রিকার সঙ্গে এখানেই তার মৌল তফাৎ। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দীর্ঘ তের বছর 'নবজাতক' পত্রিকা প্রকাশ করার অভিজ্ঞতা তিনি প্রসঙ্গত বিশদ ভাবে তুলে ধরেন।

বিশিষ্ট অতিথির ভাষণে ভবানী মুখোপাধ্যায় [illegible] ন, পাড়ার দুর্গাপূজার সুভেনিরে বড় বড় কোম্পা[illegible] দেখা যায়, অথচ অধিকাংশ লিট্‌ল ম্যাগাজি[illegible] তার ছিটেফোঁটাও জোটে না। লিট্‌ল ম্যাগ[illegible] পৃষ্ঠপোষণা সঠিক অর্থে আগামী দিনের সা[illegible] পৃষ্ঠপোষণা।

সভাপতির ভাষণে অন্নদাশঙ্কর রায় লিট্‌ল ম্যাগা[illegible] জিনের সম্পাদক ও সংগঠক এবং তরুণ লেখকদের আত্মবিশ্বাসী হওয়ার এবং লেখার মান সম্পর্কে সচেতন হওয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন।

ঋত্বিক মিত্র আধুনিক কবিতার [illegible] পরিবেশন করলেন। শারদ সারস্বত সম্মেলন [illegible]

রবিবাসরের পঞ্চদশ বার্ষি[illegible]

'রবিবাসর' শিল্প ও সাংস্কৃতিক [illegible] কেন্দ্রের পঞ্চদশতম বর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে গ[illegible] সেপ্টেম্বর ৮৩ রবিবার চন্দননগর ইনস্টিটিউট ভবনে অংকন বিভাগের ছাত্রছাত্রী দ্বারা আয়োজিত চিত্রকলা প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। ৪ থেকে ২৩ বছরের ছাত্রছাত্রীদের জলরঙ প্যাস্টেল মাধ্যমে আঁকা ১১২টি চিত্র প্রদর্শিত হয়। ৭ই সেপ্টেম্বর ৮৩ বুধবার প্রতিদিন ৫টা থেকে ৮টা পর্যন্ত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল। উদ্বোধন করেন চন্দননগর শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীপূর্ণেন্দু শেখর কর।

১১ই সেপ্টেম্বর '৮৩ রবিবার, চন্দননগর নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির ভবনে সংস্থার অংকন, নৃত্য, আবৃত্তি সংগীত বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওইদিন বার্ষিক পুরস্কার, মানপত্র বিতরণ ও হাতে আঁকা লেখা পত্রিকা 'অরুণোদয়' ষষ্ঠ বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর মহকুমা শাসক শ্রীকালিপদ পাল ও চন্দননগর মহকুমা তথ্য আধিকারিক শ্রীবিভূতি ভূষণ রায়। ছোটদের নৃত্যনাট্য 'আনন্দলোক' দর্শকদের আনন্দ দেয়। এতে অংশ গ্রহণ করে শুভশ্রি বসু, সোনালী নিয়োগী, বনানী ঘোষ, সুমিত্রা ঘোষ, দিপান্বিতা মোদক, মহুতা পাল ও অদিতি চট্টোপাধ্যায়।

স্বপন আশের পরিচালনায় আবৃত্তি আলেখ্য '[illegible]' ঐ দিনের অনুষ্ঠানের আর একটি উল্লেখযোগ্য [illegible]ষ্ঠান। ঐ অনুষ্ঠানের আবৃত্তিকার ছিলেন— [illegible] গোপাল কোলে, দীপালী সরকার, দেবদাস দাস, [illegible] কোয়েল চট্টোপাধ্যায়, মধাণ নন্দী, নবীন তেওয়ারী, নিলয় চক্রবর্তী, নির্মাল্য চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপস্থিত [illegible]দের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে।

পরলোকে সমাজসেবী সতীশচন্দ্র মান্না

ভদ্রেশ্বর, মানিকনগর নিবাসী শ্রীসতীশচন্দ্র মান্না নব্বুই বছর বয়সে তাঁর বাসভবনে ১৭ই জুলাই সকাল ৫-২০ মিনিটে [illegible]শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিপত্নীক শ্রী মান্নার [illegible] কন্যা বর্তমান।

সমাজসেবী, শিক্ষানুরাগী শ্রীমান্না বিভিন্ন সংস্থা ও স্কুল গঠনে সাহায্য করেছেন। নানান প্রতিষ্ঠানের ও বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে শ্রীমান্নার মরদেহে পুষ্পমাল্য ও স্তবক অর্পণ করা হয়।

O আশাকরি কুশলে আছেন। 'গোধূলি-মন' নিয়মিত পাচ্ছি। এই অসময়েও নিয়মিত ভাবে পত্রিকা প্রকাশ করে সাহিত্য রসিকদের কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেছেন। তাছাড়া 'শুদ্ধসত্ত্ব বসু সংখ্যা' ইত্যাদি প্রকাশ করে এবং আরো কিছু পরিকল্পনা মাফিক পত্রিকা প্রকাশের কথা জানিয়ে যে মহৎ দায়িত্ব পালন করছেন তার তুলনা হয় না এজন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ

মতি মুখোপাধ্যায়

কুলটি বর্ধমান

O লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে আমরা যারা বেঁচে আছি। স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে আছি। তুমি তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছো বেঁচে থাকা কাকে বলে। আমরা তোমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছি না বলে তুমি নিশ্চয়ই আত্মশ্লাঘায় ভুগছো না। তবে তোমার নিয়মানুবর্তিতা শেখার মতো 'গোধূলী-মন' এখন আমার মতে সবচেয়ে বেশী পঠিত পত্রিকা।

সশ্রদ্ধ প্রীতি ও প্রণাম সহ

অভিজিৎ ঘোষ

O 'ছড়া সংখ্যা'তে ভালো লাগল হাসান আজিজুল হকের তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও রেবতী ভূষণ ঘোষের 'নামমাত্র'।

মনের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ ও বেদনার সঞ্চার করে শ্রীসরল দেব 'আধ ডজন' ছড়ার প্রথমটির শেষ দুটি লাইন।

'গান্ধীবাবা, ভারত ভেঙ্গে
আমরা আজো কান্দি'॥

ভৌগলিক সীমাবদ্ধতা দেখছি শুধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়েরই নয় অনেকেই সেই রোগে ভোগেন। ইতিহাস জানেন না, না ইচ্ছাকৃত এই বিকৃতি। তবে আপনার কাছথেকে আরো পরিণতি ও কাণ্ডজ্ঞান সম্পাদনা আশা করেছিলাম। এ সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য জানতে পারলে বাধিত হব।

গোধূলি-মন-এর জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আপনার সতীর্থ ও আপনাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে শেষ করছি।

জ্যোতির্ময় বসু

কলকাতা-৩৭

O প্রীতিভাজনেষু, আশা করি ভাল আছেন। 'গোধূলি-মনের' শ্রাবন সংখ্যা এবং অল্পদিনের ব্যবধানে ভাদ্র সংখ্যা হস্তগত হয়েছে।

'গোধূলিমনের' ভাদ্র সংখ্যাটি বিশেষ ছড়াসংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে দেখলাম। সময়োচিত এবং চমকপ্রদ কিছু ছড়া বেশ ভালো লাগলো। অল্পসময়ের মধ্যে সংখ্যাটি করতে পেরেছেন দেখে আপনার নিষ্ঠাকে অভিনন্দন জানাই। আপনার প্রস্তাবিত আরো দুটি বিশেষ সংখ্যা শীঘ্রই হাতে পাবো বলে অপেক্ষা করে থাকছি।

বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়

বাঁকুড়া

O আপনার সঙ্গে কথামত আমি সোমবারে কবিতাটি করে নিয়ে আসি। সম্ভবত কোন কারণে আপনি আসতে পারেন নি, পরে বৃহস্পতিবার এসেও আপনাকে আশা করে পাইনি। যা হোক যখন আমার নাম সম্ভাব্য লেখক তালিকায় দিয়েছেন এবং নিজে এসেছিলেন, আমি ডাক মারফৎ লেখাটি পাঠিয়ে দিলাম, না পাঠালে কাজটা অকর্ত্তব্য হবে এই ভেবে। আপনার কাজে লাগলে বাধিত হব-না লাগলে একটা খবর পাবো এ ভরসা রাখি।

প্রসঙ্গত ছড়াসংখ্যায় আপনার ছড়াগুলি বেশ লাগলো—কিছুটা দুঃসাহসিক ও মনে হলো। প্রীতি শুভেচ্ছা সহ

প্রদ্যুম্ন মিত্র

চুঁচুড়া

O গোধূলি-মন' ছড়া সংখ্যা পেয়েছি। পরিকল্পনা ও সম্পাদনা প্রশংসার দাবী রাখে।

বহুদিন পর কাগজ পেয়ে খুব খুশী। আজকাল সংসার ও চাকুরী নিয়ে জড়িয়ে পড়েছি। কোথাও বড় একটা যাওয়া হয় না সাহিত্যিকের দায়িত্ব ও নিতে পারিনা। 'বিকাশ' বন্ধ।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ

প্রফুল্ল অধিকারী

MEMBER, All India Small & Medium News Paper Association, Delhi.
GODHULIMONE N.P. Regd. No. RN. 27214/75 Oct. '83 (কার্তিক '৯০)
Vol. 25. No. 10 Postal Regd. No. Hys-14 Price—Rupee One only

বামফ্রন্ট সরকার ব্যাপকভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণে সংকল্পবদ্ধ

শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে প্রসারিত করা এবং শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণের নীতিতে বামফ্রন্ট সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের শিক্ষাখাতে সর্বকালীন রেকর্ড পরিমাণ টাকা ব্যয় হবে এই বৎসর, প্রায় চারশ আঠার কোটি টাকা।

বামফ্রন্ট সরকার গত ৬ বৎসরে ৪,৬০০ প্রাথমিক ও ১৫০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। বাহাত্তর লক্ষ শিশু অর্থাৎ ছ[illegible]কে দশ বছর বয়সী শিশুদের তিরানব্বই শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে। এছাড়া[illegible]ক এখনও পর্যান্ত প্রথানুগ শিক্ষাব্যবস্থায় আনা যায়নি তাদের আংশিক সময়ের জন্য প্রথামু[illegible] কল্পের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ১৯৮২-৮৩ সালে একলক্ষ ষাট হাজার শিশুকে এই ব্যবস্থা[illegible]না হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাব্বিশ ল[illegible]লেও ছা[illegible]কে 'পুষ্টি কর্মসূচী'র আওতায় আনা হয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার সুফল পাচ্ছেন চার লক্ষ মানুষ।

আদিবাসী শিশুদের জন্য চারশ পঁচাশিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় [illegible] উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের তিন লক্ষ আশি হাজার ছাত্রছাত্রী [illegible] বৃত্তিদান প্রকল্পের সুবিধা পা[illegible]

নারী শিক্ষা এবং তফসিলী আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কলেজীয় শিক্ষা প্র[illegible]কও অব্যাহত রয়েছে।

রাজ্যের গ্রন্থাগারগু[illegible] প্র[illegible] পরিমাণে গ্রন্থ সরবরাহ করে গণশিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকার ব্যাপ[illegible]বে শিক্ষা সম্প্রসারণে সংকল্পবদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সরলা প্রিন্টার্স বড়বাজার, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও নতুনপাড়া, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

এই সংখ্যার লেখকেরা: সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর ঘোষ, জ্যোতির্ময় বসু, শ্যামা দে, সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর মণ্ডল ও ক্যাপ্টেন (ডাঃ) সমীর কুমার দত্ত

অগ্রহায়ণ ১৩৯০ সংখ্যা

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি মন

অন্য পত্রিকার চোখে

O.. .....এই পত্রিকাটি শুধু প্রকাশেই নিয়মিত নয়, নব নব দিক নির্ণয়ে এবং তা সংকলন ও সম্পাদনার বৈচিত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিছু কিছু শিশু সাহিত্য পত্রিকা ছাড়া বর্তমানে ছড়া—বিশেষ করে সুলিখিত ছড়া প্রকাশিত হয় অত্যন্ত কম। অথচ শিশু থেকে পরিণত বয়স্ক—সকলের কাছেই ছড়ার একটা আলাদা স্বাদ আছে, একটা অবদানও আছে। ছড়া আমাদের প্রাণের গভীরে ঘন্টাধ্বনির মতো একটা বিশেষ সুরের সৃষ্টি করে—যা এক পবিত্র অনুভূতি। এই বিশেষ সংখ্যাটির বিশেষত্ব সেখানেই। এতে লিখেছেন যেমন বিশিষ্ট কবিরা—অমিতাভ চৌধুরী, কৃষ্ণ ধর, হরেণ ঘটক, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, বিবেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রীতি ভূষণ চাকী, রেবতীভূষণ ঘোষ, তেমনি লিখেছেন উশীনর চট্টোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, মৃদুল দাশগুপ্ত, রবী[illegible]স্বর, গৌরাঙ্গদেব চক্রবর্তী, দ্বিজেন আচার্য, গৌর বৈরাগী, সরল দে, বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

—রবিবাসরীয় জনতা / ৬ নভেম্বর, ১৯৮৩

O..... চন্দননগর থেকে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদিত গোধূলি-মন মোটামুটি ভাল কাগজ। শারদীয়া সংখ্যার উল্লেখযোগ্য রচনা অজিত রায়ের 'জগদ্রামের সুলোচনা এবং মধুসূদনের প্রমীলা'। সিসিল ডেলুইসের কবিতার অনুবাদ করেছেন উশীনর চট্টোপাধ্যায়। রীণা দত্তের 'বিলাতের হাট বাজারে' লেখাটি সুখপাঠ্য।

— আজকাল / ১৩ই নভেম্বর, ১৯৮৩

O....... গোধূলি মন ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক নামটা লেখায় এবং রেখায় বজায় রাখার চেষ্টা করে। প্রতিটি লেখাই ক্লাসিকাল পর্যায়ে ভুক্ত করা যায়। প্রবন্ধ, অনুবাদ সাহিত্য, গল্প, ফিচার, কবিতা, ছড় ও লিমেরিক পত্র-পত্রিকার সমালোচনা, টুকিটাকি খবর পাঠকমনকে সজীব করে তুলবে। লেখক সূচীতে আছেন ডঃ হংস নারায়ণ রায়, জীবেন্দু রায়, অজিত রায়, উশীনর চট্টোপাধ্যায়, জগৎ লাহা, গৌর বৈরাগী, নব বন্দ্যোপাধ্যায়, রীণা দত্ত, সুশীল রায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, গোপাল ভৌমিক, রাখাল বিশ্বাস, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, কৃষ্ণ ধর, সমর দাস, হরপ্রসাদ মিত্র, গোপাল চক্রবর্তী, অশোক চট্টোপাধ্যায়, কাজল সরকার, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ইত্যাদি।

সম্পাদক মহাশয় পঁচিশ বছর একনাগাড়ে মাসিক পত্রিকা হিসাবে পত্রিকাটির নিয়মিত প্রকাশনার যে দুঃসাহসিক পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন তার জন্য তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

—দৈনিক আকর্ষণ / ১১ই নভেম্বর ১৯৮৩
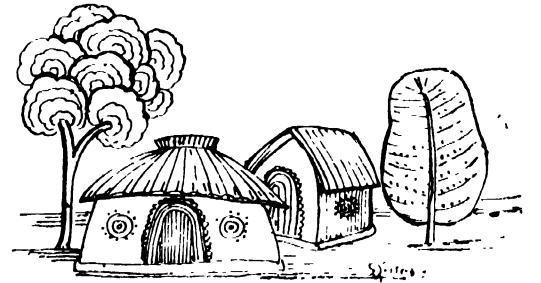
ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি-মন

২০ বর্ষ/১১শ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১৩৯০

প্রতি সংখ্যা এক টাকা
বার্ষিক (সডাক) দশ টাকা

সম্পাদকীয়

আজকাল কাগজ খুললেই দেখতে পাবেন কোথাও না কোথাও মহিলা নির্য্যাতনের খবর। এবং এই ধরণের নির্য্যাতনের নেপথ্যে রয়েছে পণ প্রথার প্রভাব। এক সময় বালিকা কন্যাকে শ্বশুর বাড়ীতে পাঠাবার সময় কন্যাকে নানারকম অলঙ্কার, খরচ করার মতো যথেষ্ট অর্থ, এমনকি দাসীও সঙ্গে পাঠাতেন। যুগ পাল্টে গেছে, সময় অনেক এগিয়ে গেছে—এখন খুবই কমক্ষেত্রে বালিকা বা কিশোরী কন্যাকে শ্বশুর বাড়ী যেতে হয়। আজকের পরিণত বয়সের কন্যাও শ্বশুর বাড়ী যাবার সময় সাজানো পণ নিয়ে যাচ্ছেন। অক্ষম পিতা কোন কোন সময় নিজেকে একেবারে নিঃস্ব করে, হয়তো একমাত্র বসত বাটীটিও বন্ধক রেখে কন্যার বিবাহের পণের ব্যবস্থা করেন; অথচ মেয়ের শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে মেয়ের ওপর চরম অত্যাচার চালিয়ে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটাচ্ছে।

এর প্রতিকার কি? আমার ধারণায় এ ব্যাপারে যা কিছু করবার মেয়েদেরই করতে হবে। তাদেরই নিজেদের উপযুক্ত করে তুলতে হবে, এই পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় মাথা উচুঁ করে বাঁচার জন্য। নিরাপত্তার কারণেও পুরুষদের ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে মেয়েদের। পাশ্চাত্য থেকে পোষাক ইত্যাদির অন্ধ অনুকরণ করলেও আমাদের সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশার অভাবও নারী নির্য্যাতনের অন্যতম কারণ।

: সম্পাদক :
অশোক চট্টোপাধ্যায়

● সম্পাদকীয় কার্য্যালয় ॥ নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর ॥ হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥ ভারত

● কলিকাতা কেন্দ্র : ৩৩/৬-জি, নাজির লেন, কলিকাত-৭০০০২৩

উপন্যাস সাহিত্যে শ্রেণীদ্বন্দ্ব চেতনার প্রথম ও সার্থক স্রষ্টা শরৎচন্দ্র

সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাসের সৃষ্টি মধ্যযুগে হয় নি ; হওয়া সম্ভবও ছিলনা। কারণ উপন্যাস পাশ্চাত্য সভ্যতার পথ বেয়ে আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস তাই নতুন সৃষ্টি। উপন্যাসের পদযাত্রা শুরু হয়েছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নববাবুবিলাস (১৮২৩) থেকে। তবে শিল্পের বিচারে বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী। এর আগে যে কটি উপন্যাস লেখা হয়েছিল সেগুলিকে উপন্যাস না বলে সমাজচিত্র বলাই ভাল। শ্রীমতী ম্যালেন্স রচিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২) কোন মৌলিক উপন্যাস নয়, 'দি উইক' গ্রন্থের অনুবাদ। খ্রীষ্টান নারীদের জন্য প্রচারমূলক রচনা। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরে দুলাল' (১৮৫৫) কে প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস বলা যায় না। কারণ গল্পের বাঁধুনি ভাল নয়। কাহিনী গুলি বিচ্ছিন্ন এবং চরিত্র সুপরিস্ফুট নয়। রামগতি ন্যায়রত্নের 'রোমাবতী' (১৮৬২) এবং গোপীমোহন ঘোষের 'বিজয় বল্লভ' (১৮৬৩) রূপকথা আর রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশ। মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'সুশীলার উপাখ্যান' কে ঠিক সামাজিক উপন্যাসের পর্যায়ে ফেলা যায় না। আসলে এই যুগটা বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের প্রস্তুতির যুগ। কাজেই শৈশব অবস্থাতেই পরিণতির লক্ষণ কখনই ফুটে উঠতে পারে না। এই সময় শ্রেণীদ্বন্দ্ব চেতনার ঘটনা যদিও কিছু কিছু ঘটেছিল তবুও এই ঘটনাকে সুষ্ঠভাবে রূপ দেবার জন্য আমাদের আর ও কিছু দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কারণ সামন্ততন্ত্র তখন শেষ হয়ে যাচ্ছে। তারই ভিতের ওপর গড়ে উঠছে বুর্জোয়া অর্থনীতির স্কাইস্ক্রেপার। গ্রাম থেকে দলে দলে কৃষকেরা শহরে আসতে শুরু করেছে দু পয়সা রোজগারের জন্য। বৃটিশ গভর্নমেন্টের শোষণে গ্রামজীবন তখন বিধ্বস্ত আর তার জায়গায় নাগরিকতার প্রতিষ্ঠা। কাজেই কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর জাগরণ তখনও সমাজে প্রবল ভাবে দেখা দেয়নি। তখনকার উপন্যাসে কলকাতা সমাজ, ইংরেজী শিক্ষার সুফল ও কুফল, খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচার, শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়বস্তু স্থান পেয়েছিল। আর সমাজ জীবনে কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুসংস্কার ও কুপ্রথার একটা বড় অংশ তখনকার উপন্যাসে স্থান অধিকার করেছিল। তাই বঙ্কিম পূর্ব উপন্যাসে শ্রেণীদ্বন্দ্ব চেতনার কথা কেউ চিন্তাও করেনি আর সম্ভবও ছিল না।

বঙ্কিমের যুগে এসে উপন্যাস সাহিত্য যৌবনে পদার্পন করলো। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বড় বড় চরিত্র। সেখানে সাধারণ মানুষের ব্যাপার নেই। শরৎচন্দ্র বা তারাশংকরের মত সাধারণ মানুষের কাছাকাছি তিনি আসতে পারেন নি। হাজার হলেও তিনি ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক। রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রে বলেছিলেন 'চন্দ্রশেখর প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় মানুষ এঁকেছেন। কিন্তু বাঙলী আঁকতে পারেন নি।' যে সব সামাজিক উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা বিবাহের কথা তুলেছেন সেখানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কঠোর সমালোচনা করেছেন। আসলে বিদ্যাসাগরের দেশব্যাপী জনপ্রিয়তা আর অসাধারণ খ্যাতি বঙ্কিমচন্দ্রকে কিছুটা আঘাত করেছিল। আর বহুবিবাহ সম্পর্কে যে সব চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র-এর উপন্যাসে পাই তা জনমত গঠনে কতখানি সাহায্য করেছে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস শ্রেণীদ্বন্দ্ব চেতনায় কোন

লক্ষণ ফুটে উঠলো না কেন? জমিদার আঁকলেন অথচ কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর সংঘর্ষকে পাশ কাটিয়ে গেলেন কেন? আসলে বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দ লাল ও নগেন্দ্রনাথের মত বড় বড় জমিদার আঁকতে যতটা দক্ষ, সাধারণ মানুষের চরিত্র অঙ্কন করতে ততটা সিদ্ধ নন। উত্তরটা বোধ হয় ঠিক হল না। কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে জমিদারের সংঘর্ষকে আঁকতে গেলে জমিদার শ্রেণীর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করতে হবে; কারণ সব জমিদারই ধোয়া তুলসী পাতা নন। আবার জমিদার শ্রেণীর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করলে যদি বঙ্কিমের স্বার্থে ঘা লাগে অর্থাৎ কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে এই ভয় বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। তাই তিনি শ্রেণীদ্বন্দ্বকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন, নিজের স্বার্থকে বাঁচিয়ে। শ্রেণীদ্বন্দ্ব চেতনার অভাব বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে ছিল একথা বলবো না। কারণ তিনি গ্রামে গ্রামে চাকুরী উপলক্ষে ঘুরে বেড়িয়েছেন। দূর থেকে বুদ্ধি দিয়ে সবকিছু উপলব্ধি করেছেন অথচ আঁকবার বেলায় জমিদার এঁকেছেন। জমিদারদের সমর্থন করেছেন। অনেকে হয়তো বলবেন—বাংলা সাহিত্যে তখন দেশপ্রেম ও জাতীয়তার নতুন জোয়ার এসেছিল। জাতির সম্মুখে ইতিহাসকে তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনে বঙ্কিমচন্দ্র আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন দেশের কাজে। খুবই সত্যি কথা; কিন্তু দেশপ্রেমই কি সাহিত্য রচনার একমাত্র মাপকাঠি। অন্য কোন বিষয় অবলম্বন করেও তো সাহিত্য রচনা করা যায়। সাঁওতাল বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, চোয়াড় বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ এগুলি কি ইতিহাস নয়। নিজের দেশের মাটিতেই অজস্র ইতিহাসের মাল মশলা ছিল। এগুলি কি দেশের জনগণের কাছে তুলে ধরা যেত না শ্রেণীদ্বন্দ্ব চেতনার মাধ্যমে। আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের ভয় ছিল। একবার বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশ চন্দ্র মজুমদারকে ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ প্রসঙ্গে বলেছিলেন—'আমার ইচ্ছা হয় একবার সে চরিত্র চিত্র করি। কিন্তু এক আনন্দমঠেই সাহেবরা চটিয়াছে, তাহা হইলে আর রক্ষা থাকিবে না'। তাছাড়া আর একটা কারণ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকে সমা-লোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে গড়ে তুলতে চান নি। অভি-জাত সম্প্রদায়ের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখতে চেয়েছেন। এর থেকে মধুসূদনের সাহস ছিল আর ও বেশী। কারণ 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে তিনি নিজেকেও ছেড়ে কথা বলেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর উপন্যাস সাহিত্যে যারা এলেন তাদের মধ্যে রমেশ দত্ত, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু, প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ, শিবনাথ ঘোষ, ত্রৈলক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি প্রধান। নামের তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। এদের উপন্যাসে সমকালীন সমাজ জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে এদের সাফল্য খুব কম। ব্যঙ্গাত্মক নক্সা লিখে অনেকে হাত মক্স করেছেন। অনে-কের লেখায় বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। শ্রেণীদ্বন্দ্ব চেতনায় এদের অনীহা প্রকাশ পেয়েছে। আসলে এঁরা কেউ শ্রেণী সচেতন ছিলেন না। আর সরকারী নিষেধাজ্ঞার ভয়ও এদের ছিল। তাছাড়া তখন স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদের ভরা জোয়ার নাট্য সাহিত্য ভরপুর। বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর জাতীয়তাবোধ ছাড়া আরও কতকগুলি ভাবধারা তখনকার উপন্যাসেও নাটকে প্রভাব বিস্তার করেছিল। যেমন ব্রাহ্ম-ধর্ম, নব হিন্দুধর্মের উত্থান ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ। এই পর্বের উপন্যাসিকেরা গ্রামজীবনকে উপন্যাসে স্থান না দিয়ে নগরজীবনের ফেনিল মদ্যপানে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। মধ্যবিত্তের পিছুটান এদের শ্রেণীদ্বন্দ্ব চেতনায় বাধার সৃষ্টি করেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল উপযুক্ত প্রতিভার অভাব।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস নামে নদীটি যেন রবীন্দ্র-নাথে এসে সাগর সঙ্গমে মিলিত হল। রবীন্দ্রনাথ এসে ঘটনাপ্রধান উপন্যাসকে মনোবিশ্লেষণ মূলক উপন্যাসের দিকে বাঁক ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি

গ্রামীণতার প্রভাব এড়িয়ে নাগরিকতার মাটিতে জন্ম নিয়েছে এবং দেশকালাতীত, সার্বভৌম জীবনাদর্শের আদর্শে গড়ে উঠেছে। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ধারায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। এ প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য' 'রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসের সাধারণ বিবর্তন ধারার বহির্ভূত। সেই বিবর্তন ধারা শরৎচন্দ্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ও তাহাকেই আশ্রয় করিয়া নতুন বাঁক লইয়াছে। ভবিষ্যৎ উপন্যাসের গতি ও উদ্দেশ্য প্রধানত শরৎচন্দ্রের দৃষ্টান্ত ও নির্দেশের অনুসরণ করিবে'। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের চরিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের সহজ জীবনচেতনার বহির্ভূত। বড় বড় চরিত্র আছে কিন্তু গ্রাম্যচাষার মত মধ্যবিত্ত চরিত্রের দেখা পাওয়া ভার। রবীন্দ্রনাথের বিরাট চিন্তাধারার ভার বইতে গিয়ে তার চরিত্রগুলি যেন সাধারণ মানুষ হয়ে উঠতে পারে নি। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যখনই রবীন্দ্রনাথের তুলনার কথা এসেছে তখন অধিকাংশ সমালোচক শরৎচন্দ্রের এই দিকটির কথা পাশ কাটিয়ে গেছেন। এই দিক বলতে আমি বোঝাতে চাইছি জমিদার ও কৃষকের সংঘাত এবং মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর জোটবদ্ধ আন্দোলনের দিক। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিতে শরৎচন্দ্রকে কি বলেছেন শুনুন—'বইখানি উত্তেজক অর্থাৎ ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে -.. আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম, আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখলাম একমাত্র ইংরেজ গভর্নমেন্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারের বিরুদ্ধে আর কোন গভর্নমেন্ট এতটা ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করে না ...— শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপ দেওয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোন প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার দ্বারা এটি হত না'। শরৎচন্দ্র এই চিঠি পেয়ে মর্মাহত হন। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে ইংরেজরা কি শরৎচন্দ্রকে সত্যিই ছেড়ে দিয়েছিল? না। তৎকালীন কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব শরৎচন্দ্রকে ডেকে আনিয়েছিলেন ইলিশিয়াম রো তে। ভয় দেখিয়েছিলেন, ধমক দিয়েছিলেন, অপমান করেছিলেন। বলেছিলেন—'You have given language to the revolutionarist! Your 'Sabyasachi' in Pather Dabi is their inspiration! I warn you, be carefnl'. এর সঙ্গে ছিল দাঁত খিঁচুনি। শরৎচন্দ্র অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছিলেন। এর পরেও কি বলবো ইংরেজরা তাঁকে কিছু বলেনি? আসলে 'পথের দাবী'র মানসিকত, সমাজ সচেতনতা আর বিদ্রোহী ভাবধারা রবীন্দ্রনাথকে আঘাত করেছিল। তিনি সহ্য করতে পারেন নি। তবে শরৎচন্দ্র এখানে বিদ্রোহের যে পর্যায়ে উঠেছেন তা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। গোরার উদার সার্বজনীনতাকে বাদ দিয়েই বলছি। রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতহীন শান্ত হৃদয়ের নিভৃতে শরৎচন্দ্রের জমিদার ও শ্রমিক শ্রেণীর সংঘর্ষ কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। প্রকৃত অর্থে বিদ্রোহী বলতে যা বোঝায় যদিও শরৎচন্দ্র ততটা নন। তবুও সমাজের বিধিনিষেধের চাপে যারা নিপীড়িত তাদের প্রতি সোচ্চার সহানুভূতিতে শরৎচন্দ্রের যে মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে সে মানসিকতা বিদ্রোহ মানসিকতা। রবীন্দ্রনাথে সেই মানসিকতা নেই। শরৎচন্দ্র যেখানে শ্রেণীদ্বন্দ্বের কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ সেখানে শ্রেণী সমন্বয়ের কথা বলছেন। কারণ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শ্রেণীসমন্বয়ের ধারক ও বাহক। সেই কারণেই রবীন্দ্র-উপন্যাসে শ্রেণীদ্বন্দ্বচেতনার সার্থক প্রতিফলন ঘটেনি।

যারা নিরপেক্ষ সমালোচক তারা কখনই ব্যক্তিপূজায় বিশ্বাসী নন। শরৎচন্দ্রকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেক জল ঘোলা হয়েছে। কেউ বলেছেন শরৎ সাহিত্য চোখের জলের সাহিত্য। কেউ বলেছেন শরৎচন্দ্র হৃদয়-সর্বস্ব লেখক। কেউ বলেছেন ভাবাবেগের আধিক্য। আবার কেউ বলেছেন শরৎচন্দ্রকে নারী-ভক্ত। কিন্তু

শরৎচন্দ্র শ্রেণীদ্বন্দ্বের একজন সার্থক স্রষ্টা। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ধারাবাহিকতায় শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রথম প্রয়াস শরৎচন্দ্রের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি যার ধারে কাছে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ আসতে পারেন নি। এমন কথা কজন বলেছেন জানতে ইচ্ছা করে। বাংলা সাহিত্যের অনেক রথী মহারথীরা শরৎচন্দ্রের মত জমিদারের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিরোধ এর চিত্র তুলে ধরতে পারেন নি। প্রশ্ন উঠতে পারে তাদের মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্ব চেতনার অভাব ছিল না শ্রেণীদ্বন্দ্ব চেতনাকে ফুটিয়ে তোলার মত ঘটনার অভাব ছিল। ঘটনার অভাব নিশ্চয়ই ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ চোয়াড় বিদ্রোহ, নীলচাষীদের আন্দোলন, উড়িষ্যার পাইক বিদ্রোহ ইত্যাদি ভুরি ভুরি ঘটনার নজীর তুলে দেখানো যেতে পারে। আসল কথা বড় বড় সাহিত্যিকরা নিজেদের মুখোশ ঢেকে রাখতে চেয়েছিলেন খাপে ঢাকা তলোয়ারের মতন। মনে করি একথা ভাবতে কোন বাধা নেই। এর পরেও প্রশ্ন উঠতে পারে শরৎচন্দ্র কেমনভাবে পারলেন শ্রেণীদ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলতে। আসল কথা মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানুষ হয়েও শরৎচন্দ্র ছিলেন শ্রেণী সচেতন। বঙ্কিমচন্দ্রের মত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তিনি ছিলেন না আবার রবীন্দ্রনাথের মত জমিদারও ছিলেন না। আজীবন দরিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে মানুষ হয়েছেন। মজঃফরপুরের সন্ন্যাসীর জীবন, ভাগলপুরের দুঃখের জীবন আর বার্মার কেরাণী জীবন, এর মধ্য থেকেই জন্ম নিয়েছিল সংগ্রামী মানসিকত। এই অভিজ্ঞতাই তাকে সাহায্য করেছিল জমিদারের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিরোধের চিত্র তুলে ধরতে। দীর্ঘদিনের সংস্কার আর শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মত মনোবল তিনি শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে যে ভাবে জাগিয়ে তুলেছেন সমসাময়িককালে তার নজীর বাংলা সাহিত্যে কই। তারাশংকর অনেক পরের ঘটনা। প্রতিবাদের সাহিত্য হিসেবে গ্রহণ করলে শরৎচন্দ্রকে সবার আগে স্থান দিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র যেমনভাবে ঈশ্বরগুপ্তকে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেমনভাবে বিহারীলালকে তুলে ধরেছেন এবং এঁরা যত বড় কবি তার চেয়েও বেশী মূল্য পেয়ে গেছেন। ঈশ্বরগুপ্ত ও বিহারীলালের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল বলতে হবে। তাই তারা ভাগ্যবান। শরৎচন্দ্রের দুর্ভাগ্য যে তার সাহিত্যকে প্রতিবাদের সাহিত্য, জমিদার ও কৃষক শ্রেণীর সংঘর্ষের সাহিত্য, প্রতিরোধের সাহিত্য বলার মত বড় সমালোচক বাংলা সাহিত্যে কই। খুবই সীমিত। এটা আমাদেরও দুর্ভাগ্য আর শরৎচন্দ্রের তো বটেই। তা না হলে পথের দাবী, মহেশ, দেনাপাওনা, জাগরণ প্রভৃতি উপন্যাসে জমিদার ও কৃষকশ্রেণীর সংঘর্ষকে তুলে ধরার মত সার্থক সমালোচনার ঘাটতি পড়বে কেন? যে সাহিত্য নিয়ন লাইট আর সোফাসেটের গণ্ডী ছেড়ে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নেমে আসতে পারলনা, যে সাহিত্য প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ কাকে বলে জানলো না সে সাহিত্য যতই কারুকার্যমণ্ডিত হোক না কেন তা কখনই জনগণের সাহিত্য বা গণতান্ত্রিক সাহিত্য হতে পারে না।

শ্রেণীদ্বন্দ্ব চেতনার সার্থক উপন্যাস 'পথের দাবী'। কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে জমিদারের লড়াই একটা বিস্ফোরণের সৃষ্টি করেছিল। শরৎচন্দ্র শ্রমিক জাগরণের জীবন্ত চিত্র 'পথের দাবী' উপন্যাসে যে ভাবে চিত্রিত করেছেন তার নজীর বাংলা উপন্যাসে কটা আছে? কয়ার মাঠের বিরাট জনসভায় রামদাস তলোয়ারকারের তেজোদীপ্ত ভাষণ শ্রমিক শ্রেণীর মনে প্রচণ্ড আঘাত এনেছিল। শোষকদের প্রতি বদলা নেবার জন্য এই অগ্নিদীপ্ত বাণীর প্রয়োজন ছিল। কারখানার মালিকদের শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের জোটবদ্ধ আন্দোলনের আগমনী গান প্রথম শরৎচন্দ্রই শোনালেন রামদাসের বক্তৃতার মাধ্যমে। 'এই ডালকুত্তাদের যারা আমাদের বিরুদ্ধে, তোমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে তারা তোমাদেরই কারখানার মালিকেরা। তারা কিছুতেই চায়না যে কেউ তোমাদের দুঃখ দুর্দশার কথা তোমাদের জানায়। তোমরা তাদের কল চালাবার, বোঝা বইবার

জানোয়ার, অথচ তোমরাও তো তাদেরই মত মানুষ, তেমনি পেটভরে খাবার, তেমনি প্রাণ খুলে আনন্দ করবার জন্মগত অধিকার তোমরাও যে ভগবানের কাছ থেকে পেয়েছ এই সত্যটাই এরা সকল শক্তি, সকল শঠতা দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে গোপন রাখতে চায়। শুধু একবার যদি তোমাদের ঘুম ভাঙে, কেবল একটিবার মাত্র যদি এই সত্য কথাটা বুঝতে পার যে তোমরাও মানুষ, তোমরাও যত দুঃখী, যত দরিদ্র, যত অশিক্ষিত হও তবুও মানুষ, তোমাদের মানুষের দাবী কোন অজুহাতে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারেনা। তাহলে এই গোটা কতক কারখানার মালিক তোমাদের কাছে কতটুকু'। শরৎচন্দ্র যেভাবে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন তা শরৎপূর্ব বাংলা উপন্যাসে কই? নির্লজ্জ শোষণকারীর বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র যেভাবে তার সাহিত্য মাধ্যমকে ব্যবহার করেছেন, কাজে লাগিয়েছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে। তখনকার দিনের উপন্যাস সাহিত্যে এটা দুর্লভ বস্তু। এছাড়া রেঙ্গুনের বস্তি এলাকা, শ্রমিক অধ্যুষিত ব্যারাকগুলির বর্ণনা। শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশা গ্রস্থ জীবনের বর্ণনা। ডাক্তারের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে শরৎচন্দ্র শ্রেণী শোষণের স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন এ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। শরৎচন্দ্র বোঝাতে চেয়েছেন দেশের প্রকৃত পরিবর্তন আনতে গেলে শুধু মধ্যবিত্তের সহযোগিতা থাকলে চলবে না; চাই শ্রমিক-কৃষকের সাহায্য। মধ্যবিত্তের পিছুটান সত্বেও শরৎচন্দ্র একথা সোচ্চারে ঘোষণা করে গেছেন।

'দেনা পাওনা, উপন্যাসে জমিদার জীবানন্দের বিরুদ্ধে হরিহর, সাগর সর্দার ও বিপিন সহ অন্যান্য কৃষকদের জোটবদ্ধ আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার মধ্যে শরৎচন্দ্রের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের জমিদাররা বঙ্কিমচন্দ্রের নগেন্দ্রনাথ নয়। জমিদারের হাত থেকে জমি রক্ষা করার জন্য কৃষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। 'শুধু গর্ভধারিণী মা নয়, যিনি পালন করেন তিনিও মা, যা হবার হবে। ঘরের মাকে আমরা পরের হাতে তুলে দিতে পারবনা'। এইভাবে কৃষক ও শ্রমিকদের সাথে জমিদারের বিরোধ একটু একটু করে উপন্যাস সাহিত্যে প্রবেশ করতে শুরু করেছে যার সার্থক সূচনা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে হয়েছিল। 'জাগরণ' উপন্যাসটি যদিও অসম্পূর্ণ তবুও এর মধ্য দিয়ে কৃষক-সমাজের কথা, জমিদারের বিরুদ্ধে অমরনাথের নেতৃত্বে জোটবদ্ধ আন্দোলনের কথা শরৎচন্দ্র সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন। শ্রেণীদ্বন্দ্ব চেতনার স্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা এই উপন্যাসে দেখতে পাই। 'পল্লী সমাজ' উপন্যাসে জমিদার বেণী ঘোষালের চক্রান্তে আর রমার মিথ্যা সাক্ষ্যে যখন রমেশের জেল হল তখন সমগ্র গ্রামের মানুষ জোটবদ্ধ হয়ে প্রতীজ্ঞা করেছিল রমার বাড়ীর দুর্গোৎসবে কোন মানুষ যোগ দেবে না। হয়েওছিল তাই। বেণী ঘোষালের মুখের সামনে বৃদ্ধ সনাতন হাজরা বলেছিল 'মায়ের প্রসাদই বলুন আর যাই বলুন, কোন কৈবর্তই আর বামুন বাড়ীতে পাত পাততে যাবেনা'। পীরপুরের দরিদ্র মুসলমান প্রজা ও হিন্দু প্রজারা সম্মিলিতভাবে তারা জমিদারের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রতীজ্ঞায় সোচ্চার হয়ে উঠেছে। জমিদার বেণী ঘোষালের মাথা ফাটলে জাগ্রত কৃষক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার সাহসই হয়নি। সামন্ততান্ত্রিক শোষণের পাশাপাশি কৃষক শক্তির প্রতিরোধের কথা এমনভাবে আর কেউ বলেননি। 'মহেশ' জমিদারের শোষণের চরম পরিণতি শরৎচন্দ্র চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এতবড় সত্য ঘটনা আর কোন্ সাহিত্যে আছে? গফুরের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। তার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য রাখা কয়েক কাহন খড় ও জমিদারের হাত থেকে রেহাই পায়নি। নিষ্ঠুর প্রহারে গফুরের ক্ষত-বিক্ষত দেহ ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। পরিনামে ভিটে মাটি পর্যন্ত ছাড়তে বাধ্য হয়েছে গফুর। কৃষক তার সর্বস্ব খুইয়ে কেমন ভাবে ধীরে ধীরে শ্রমিকে পরিণত হতে চলেছে নিষ্ঠুর লাম্পট্য জমিদারের জন্য তারই আগমণী গান শরৎ আমাদের শুনিয়ে গেলেন। এ জিনিস বাংলা সাহিত্যে কই।

এমন মর্মস্পর্শী কাহিনী যা পড়লে মানুষের রক্তে বিপ্লবের বন্যা বয়ে যায়। সাহিত্য আর জীবনের এমন নিকট সম্পর্কে এমন আত্মীয়তার বন্ধন শরৎচন্দ্র সৃষ্টি করে গেলেন যা ভাবলে অবাক হতে হয়।

শরৎচন্দ্র জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষক ও শ্রমিকদের জোটবদ্ধ আন্দোলনের যে দিকটি উদঘাটন করে গেলেন তার পরবর্তী প্রভাব কল্লোলের সাগরে এসে আছড়ে পড়েছিল। সৃষ্টি হয়েছিল নতুন নতুন দ্বীপের। শরৎচন্দ্র তিরোধানের পর নজরুল বলেছিলেন—

'অবমাননার অতল গহ্বরে যে মানুষ ছিল লুকিয়ে
শরৎচাঁদের জ্যোৎস্না তাদের দিল রাজপথ দেখায়ে।'

শ্রমিক জীবনের দুঃখ দারিদ্র, বিকৃতি ও ব্যাভিচারকে কেন্দ্র করে কল্লোলের লেখকরা শ্রেণীদ্বন্দ্ব চেতনায় অন্ধকারের দিককে মশালের আলোর আলোকিত করে তুলিছিল; এর পেছনে ছিল শরৎচন্দ্রের অবদান। শরৎচন্দ্রের শ্রেণীদ্বন্দ্ব চেতনার ঝরণা ধারা কল্লোলযুগে এসে বিরাট নদীতে পরিণত হয়েছিল এ সত্য অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসে কল্লোল গোষ্ঠি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে শরৎচন্দ্রের স্থান খুবই নিকট-বর্তী। সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক যে খুব বেশী দূরে নয় এটা তো শরৎচন্দ্রই প্রমাণ করে গেলেন। নজরুল, সুকান্ত এরা তো পরবর্তী ঘটনা।

প্রসঙ্গ : গোধূলি মন

আপনার প্রতিটি সংখ্যা নিয়মিত পাচ্ছি। আপনার এই প্রতিটি সংখ্যাই নিঃসন্দেহে মনোগ্রাহী, আধুনিক রুচীশীল লিট্‌ল ম্যাগাজিন হিসাবে গণ্য।

বিদ্বৎ সমাজে এই পত্রিকার বহুল প্রচার কাম্য।

শুভেচ্ছান্তে—

ধীরাজ কুমার দে (কলিকাতা)

গোধূলি-মন-এর সংখ্যাগুলি আমার খুবই ভালো লাগে। সম্পাদনায় আপনার নিষ্ঠা আছে। এবং সেইটেই পত্রিকার মান ও প্রাণ। আরো সুন্দর হোক গোধূলি-মন।

সৌমেন অধিকারী (শান্তিনিকেতন)

O .... সমস্ত সংখ্যাই নিয়মিত পাচ্ছি। এবং নিয়মিত পেতে পেতে এখন এমন হয়েছে. কোন একটি সংখ্যা আসাতে বিলম্ব ঘটলে অস্বস্তি বোধ করি। ভাবি, কই এখনো তো 'গোধূলি মন' এল না!

এ-সংখ্যার অনুবাদ কবিতা সহ অন্যান্য কবিতা এবং অরুন সরকারের গল্প ভাল লাগলো। অরুনের গল্প বলার ধরনটা বেশ উপভোগ্য। আলোচনা বিভাগে উশীনর চট্টোপাধ্যায় খুবই আন্তরিক। ইদানিং তো আলোচনা পিঠ চাপড়ানো নয়তো গরল উদ্গারের পর্যায়ে নেমে এসেছে।

গোধূলি মনে অনুবাদ বিভাগ টি জোরদার হলে মন্দ হয় না। কি ভাবছেন আপনি? রচনাগুলি উপস্থাপনায় যদি নতুনত্ব আনা যায় কিছুটা বৈচিত্রের স্বাদ মেলে।

অজিত বাইরী

যুবকের বেলাগান তুরগ

সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আজো নাকি যুবকেরা
অনিবার্য ভুল ছন্দে
বুকের রক্ত দিয়ে কবিতায়
কার জন্যে যেন মাতামাতি করে !

শুধু তার জন্যেই তারা
ঢেলে সাজায়, বাসর ঘর
মমতায় মোমমাখা ফুলের সহবাস ।

তাদের সম্ভ্রান্ত পরিধেয় না থাক,
তাপ্‌পি মারা খদ্দরে, এখনো দেখি
খামোশী খুনের খতিয়ান এবং
নিজস্ব কিছু দুঃখ শোক ।

আমার নাম কি ? / সমীর মণ্ডল

বহু পরিচিত রাস্তা
কিছুক্ষণ আগে এখানে তুমুল কোলাহলে
ছিল খুশীর সম্ভাবনায় ।
এখন একান্তই একা
ছায়ায় আচ্ছন্ন বিষণ্ণ অস্তিত্বে
ধূসর জীবন জটপাকায় ঔদাসীন্যে অবজ্ঞায় ।
একদিন দূরন্ত বাসনা ছিল ।
মনোজ্ঞ শিশুর পুতুল খেলার মতো
ক্রমশঃ গাঢ় বাস্তবতায়
নিগূঢ় কৌশলে স্মৃতিময় সময় নিহত হলো ।
ভুলেগেছি নিজের নাম, পিতৃ পরিচয়
স্মৃতিময় শৈশব শুয়ে উদ্বেগহীন ছায়ায় ।

কেউ আর নাম ধরে ডাকে না !

ওপার / জ্যোতির্ময় বসু

ছাত থেকে হাত বাড়ালেই আজন্ম নদী ;
মাঝখানের রাস্তা, চওড়া ফিতের মত মসৃণ ।
তিরিশ হাজার ফিট ওপরে কাঁচে বসা মাছিকে
যেমন আরেকটা-প্লেন বলে ভুল হয়
নদীর ওপারকে তেমনি স্বপ্নের সুরলোক ।
সেখানে যাবই বলে দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে
জলে নামলাম, লক্ষ্য স্থির রেখে ।
তীরের কাদা, গেরুয়া জলকে স্পর্শ করে
অনুভব করলাম স্রোতের টান,
পাশ কাটিয়ে যাই স্নানার্থীদের ।

কিন্তু জল থেকে ওঠার পর ?
ঐ যে সূর্যাস্তের অপরূপ সমুদ্রনীল আকাশ,
ঠাঁই ঠাঁই যার রঙ্গীন জাহাজ, ভেলা আর দ্বীপ
যারা দ্রুত নেমে আসছে ওপারের সবুজ পাড়ের ওপর
সেই স্বপ্নের হীরে-মাণিক-জ্বালা চাঁদোয়ার মতন
ছবিটাকে ধরে রাখা যাচ্ছে না ;
সে যেন সুদূর য্যান্‌ড্রোমিডার আলো,
দেখা যায় ছোঁয়া যায় না,
দূর থেকে বার বার কেবল ডাকে,
ওপার ! ওগো অধরা ওপার ।

কথা ছিল / অমর ঘোষ

কথা ছিল, জালের গায়ে 'চুমু' খাবো, জাল নিবদ্ধ হব না।
মহাযুদ্ধের মুণ্ডহীন ঘোড়া এখনো শো-কেশে
পুরোনো রীতির খেলা, অনুপর্ণা, তোমাকে মানায় না —

কথা ছিল, যা কিছু স্বাধীনতা দু'জনে চেটেপুটে খাব
বৃষ্টির জল ছেনে স্বচ্ছ স্ফটিক
সূর্যালোক ভরে দেবো সাপের গর্তে
নদীর আঁচল ছিঁড়ে আকাশকে দেবো
আকাশ-জ্যোৎস্না ধরে ভরাব সাঁওতালডিহি
কিস্তিওলাকে মন্ত্রী করে, মন্ত্রীকে বলব
তার শিক্ষানবিশ হতে—
আমি ডাকাতকে করব উদ্বাস্তু, উদ্বাস্তুকে অধ্যাপক
রোভার্সের 'রয়' কে খেলাব কোলকাতা লীগে
অরণ্যদেবের জন্য জমি রাখব তিলজলায় –...

এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা এনে, চারপাশে ধূপ জ্বেলে
চন্দনে চর্চিত করে
তোমাকে রবীন্দ্রনাথ, বলব : দেখুন তো, ঠিক ভেবেছি কি-না ?

কথা ছিল, জালের গায়ে 'চুমু' খাবো, জাল নিবদ্ধ হব না।

সময়ের সরলরেখায় / শ্যামা দে

কোলাহল থেকে সরে এসে
যখনই দাঁড়াই নির্জন জানালার পাশে
তখন হৃদয় বিস্তৃত দেখি—
উদার আকাশের মতো।

চোখের ছায়ায় নেমে আসে—
ছেলেবেলার রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্
বরষায় ভেজা খুশির প্লাবন।

তখন কেমন যেন নিজেকে—
অন্য এক অস্তিত্ব মনে হয়,
হাওয়ায় হাওয়ায় শুনি,
এক অস্ফুট রাগিনীর করুণ ঝংকার।
অদ্ভুত তন্ময় নীরবতা কাঁপায় তখন
সময়ের দীর্ঘ সরলরেখাকে—
হৃদয়ে আসে স্বপ্নের কথাকলি
এবং হাজারো শব্দের ইতস্তত:
ফুলঝুরি ॥

শারদ সাহিত্য সমীক্ষা

গোধূলি-মন-এর প্রতিবেদন

শারোদোৎসব উদ্‌যাপনের পাশাপাশি সাহিত্যের শারদ সংকলন প্রকাশ আমাদের দেশে প্রায় একশ বছরের ব্যাপার। কেন যে একদিন এদেশের প্রকাশক সম্পাদকরা এরকম বিশেষ একটি সময় নির্বাচন করে সাহিত্য পত্রের বিশেষ সংকলন প্রকাশের তাগিদ অনুভব করেছিলেন, তার সঠিক হেতু জানা নেই। হয়ত নতুন পোশাক পরিধানের পাশাপাশি সাহিত্যেরও নতুন আচ্ছাদনে আবৃত কলেবর দেখতে চেয়েছিলেন তাঁরা বাঙালীর একঘেয়ে মনোজগতকে। তবে ক্রমশ: আমরা দেখেছি যে, মানুষের বিবর্তিত রুচিকে কাজে লাগিয়ে তথাকথিত মাসিক বা সাপ্তাহিকের ক্ষেত্রে এ জাতীয় প্রচেষ্টার আড়ালে স্থূল ব্যবসায়িক মনোভাবই মূলত: সক্রিয় হয়ে আসছে; এবং আমাদেরও প্রয়োজন সময়ানুগ পরিচ্ছদের পাশাপাশি মানসিক ক্ষুধার নিবৃত্তি স্বরূপ এহেন অন্তত: একটি স্থূল মাসিক সংগ্রহ। কিন্তু সাহিত্যের এই বিশেষ উদ্দেশ্যপূর্ণ ধারাটির পাশে, খুব বেশীদিন না হলেও, আমরা দেখে এসেছি আর এক ধরণের প্রয়াস, বলা ভালো প্রতিরোধ। সে প্রতিরোধ প্রথানুগ রুচির বিরুদ্ধে, প্রচলিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে। সামর্থ এই প্রচেষ্টার সীমিত, আয়তন কৃশ, স্বল্পায়ু এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কিন্তু আন্তরিকতা আর উদ্দীপনা অপরিসীম। সে উদ্দীপনা পাঠকের মনোরঞ্জনে ব্যবহৃত নয়, পাঠক পরিশীলনে নিয়োজিত; লেখক আমন্ত্রণে ব্যগ্র সে নয়, লেখার সন্ধানে উৎসুক। সাহিত্যের অপ্রতিরোধ্য ক্ষুধা এই প্রচেষ্টার ঘাড়ে নেমে আসে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার চেয়েও বেশী ঋণের বোঝা নিয়ে, কবির ভাষায় 'তবু তার আঙুল নেভেনা'; বলা নিশ্চয় বাহুল্য, সাহিত্যচর্চার এই নতুন অথচ প্রত্যাসন্ন বৈপ্লবিক প্রয়াসটির পশ্চিমী নামকরণ 'লিট্‌ল ম্যাগ', তা সে আকার, প্রচার বা সামর্থে ছোট বলে নয়, ব্যাপক অর্থেই লিট্‌ল। দুঃখের বিষয়, শারদ সংকলন প্রকাশে এদেরও কোমর বাঁধতে হয়, প্রতিযোগিতায় সক্রিয় হতে নয়, যদি বাঙালী পাঠকের পূজা-বাজেটের ছিটেফোটাও এদিকে ছিট্‌কে আসে আশীর্ব্বাদের মত, যদি বিশেষ সময়ের সরকারী-বেসরকারী বিজ্ঞাপনের লঘুভারও সে বহণে সক্ষম হয়, তবেই এ রকম প্রচেষ্টাকে জিইয়ে রাখা সম্ভব। এই জাতীয় পত্র-পত্রিকার কিছু শারদ সংকলনই এখানে আলোচ্য বিস্তৃত পরিচয় দেবার সাধ থাকলেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা ছাড়া যার স্বরূপ উদ্ঘাটন প্রায় সাধ্যাতীত এই সীমিত পরিসরে।

কৌলকাতা থেকে আমাদের দপ্তরে এসেছে পাঁচটি পত্রিকা। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত 'যষ্টিমধু'। দীর্ঘদিন এ পত্রিকা সম্পাদনা করে আসছেন কুমারেশ বাবু। এ সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে কেবল বিদেশী হাসির গল্প নিয়ে। অনুদিত লেখকদের তালিকায় আছেন যেমন ডিকেন্স, হেনরী, মোরাভিয়া, জেরোম কে জেরোম, মোঁপাসা, চেকভ, মার্ক টোয়েন, এইচ. জি. ওয়েলস, তেমনি বয়েস হাউস, শেইলা, অগরাম, ষ্টিফেন লিককও। অজ্ঞাত লেখক এবং বিদেশী রূপকথা থেকেও কিছু গল্পের অনুবাদ আছে। অনুবাদগুলি বেশ ঝরঝরে। তবে একজন লেখকের একটি গল্পের অনুবাদ থাকলেই ভালো হ'ত। হাসির গল্প নিয়ে ডঃ ক্ষেত্রগুপ্তের লেখাটিতে হাসির গল্পের তেমন কোনো স্বরূপ উদ্ঘাটন হলনা। মোটের উপর প্রচেষ্টাটি সাধুবাদের যোগ্য।

কোলকাতা-১২ থেকে 'সাহিত্য ভারতী' সম্পাদনা করেন জগৎরঞ্জন মজুমদার। দীর্ঘ ন বছরের পত্রিকা। নামে সাহিত্য হলেও এতে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যা

সংক্রান্ত আলোচনাও স্থান পেয়েছে। কবি অমিতাভ দাশগুপ্তের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গোপালচন্দ্র ভৌমিক। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের রবীন্দ্র-প্রয়াণ বিষয়ক স্মৃতিচারণ ভাল লাগল। নচিকেতা ভরদ্বাজ, অশোক রায়চৌধুরি, মিলনেন্দু জানা ও অভিজিৎ ঘোষের কবিতা, ভগৎ সিং-এর চিঠি এবং জগৎ রঞ্জন মজুমদারের 'প্রবোধ কুমার স্মরণে' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অচল ভট্টাচার্য্যের 'সন্ধি রহস্য' আর বিমল মুখোপাধ্যায় ও আইভি বন্দোপাধ্যায়ের গল্পও আকর্ষণীয়। প্রবন্ধের দিকে আরো নজর দিলে ভালো হয়।

নির্মল বসাক সম্পাদিত ও বালিগঞ্জ থেকে প্রকাশিত 'ইন্দ্রাণী' মূলত কবিতা ও প্রবন্ধের কাগজ। কবিদের তালিকায় যেমন আছেন প্রবীণেরা তেমনি আনকোরা তরুণও। ফরাসী কবি আঁরি মিশো'র একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা অনুবাদ করেছেন অরুণ মিত্র। নন্দলাল সেনগুপ্তের প্রবন্ধে অসমিয়া সংস্কৃতির সেরকম কোনো নিবিড় পরিচয় পেলাম না। উমানাথ ভট্টাচার্য্যর ছন্দ ও ছন্দস্পন্দ সংক্রান্ত লেখাটিও তেমন কোনো নয়া ভাবনার খোরাক জোগায় না। এত কবিতা প্রকাশ না করে একটু উত্তম গদ্যের দিকে নজর দিলে ভাল হয়।

প্রীতি ও বন্ধুত্বের বিনিময়ে প্রচারিত অভিজিৎ ঘোষের 'সৈনিকের ডায়েরী' একটি দীর্ঘ আলোচনা ও দুটি মাত্র কবিতা নিয়ে। সোমনাথ বিশ্বামিত্র'র এই আলোচনাটি পুর্নমুদ্রিত। এতে সাহিত্যের বহির্বিষয়ক সমস্যা যতটা উন্মোচিত একেবারে ভিতরের তাত্বিক সঙ্কট ততটা নয়। লেখক কমিটেড কি নন্ কমিটেড তার চেয়েও বড় কথা কতটা আন্তরিক। পাঠকের সঙ্গে তার হার্দিক যোগাযোগ কতখানি সেটাই অনেকটা। কেননা শিল্পের উদ্দেশ্য সত্য কথন না মঙ্গল সাধন এ বিতর্ক আরিস্ততল-প্লেটোর সময় থেকেই চলে আসছে। তবু ভূরি-ভূরি কবিতা প্রকাশের চেয়ে এজাতীয় আলোচনা মূল্যবান ও জরুরী।

বরানগর থেকে প্রকাশিত ও ধীরাজ কুমার দে সম্পাদিত 'আগন্তক' একেবারেই আগন্তক নয়, দীর্ঘ পাঁচ বছর লিট্ল ম্যাগের পক্ষে বড় কম কথা নয়? তবে তেমন কোনো বিশেষ প্রয়াস চোখে পড়েনি। ছিমছাম সাতাশ পৃষ্টার কাগজ। কবিতা, গল্প, আলোচনা সব-গুলিতেই নতুন হাতের আঁচড় পড়েছে যেন। রবীন্দ্রনাথ কোন্ পত্রিকায় কী ধরণের ফুলস্ক্যাপ ব্যবহার করতেন এনিয়ে খবরের কাগজের ফিচার ভাল হয়। লিট্ল ম্যাগের মুল্যবান পৃষ্টা কি আরো কিছু ভিতরের জিনিষ দাবী করে না? আশা কোরব ভবিষ্যতে পত্রিকাটি নানা দিক থেকেই আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। চব্বিশ পরগনা থেকেও এসেছে পাঁচটি পত্রিকা। কোনোটিই বিশেষভাবে দাগ কাটার মত কিছু নয়। তবে তার মধ্যে মোটামুটি ভাল কাগজ 'তৃণাঙ্কুর'। শক্তিপুর, শ্যাম-নগর থেকে দীর্ঘ ন'বছর এ পত্রিকা সম্পাদনা করে আসছেন গৌরাঙ্গ দেব চক্রবর্ত্তী। কবিতার ছন্দ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু। আলোচনাটি অনেক ক্ষেত্রে ক্লান্তিকর। শুদ্ধসত্ত্ব বাবুর মত অভিজ্ঞ লোকের কাছে কি আরো কিছু আশা করা যায়না? মোটামুটি ভাল দুটি গল্প লিখেছেন প্রফুল্ল রায় ও অরুণ সরকার। কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণধর, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, রাখাল বিশ্বাস, কৃষ্ণসাধন নন্দী, অমল দাস, শ্যামলকান্তি মজুমদার, আবীর বরণ মুখার্জী, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার চক্রবর্ত্তী প্রমুখের কবিতা। আগামীতে পত্রিকাটির শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শক্তিপুর থেকেই প্রকাশিত আর একটি কাগজ 'উপলব্ধি' মোটামুটি মন্দ নয়। ডঃ বাধন সেনগুপ্তের বিষ্ণু দে সম্পর্কিত আলোচনা ব্যক্তিমানুষ বিষ্ণু দে কেও নতুনভাবে চেনায়না, কবি বিষ্ণু দেকে তো নয়ই। কল্যাণশ্রী চক্রবর্ত্তী'র 'চালচিত্র' গল্পটির দৃষ্টিকোণ বড় প্রথানুগ। কবিতাগুলি মোটামুটি ভাল। ইয়েট্স-এর একটি কবিতার ভাবাবলম্বণে বিষ্ণু দের কবিতা এবং

বিমলচন্দ্র ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, রাখাল বিশ্বাস, দ্বিজেন আচার্য, শ্যামলকান্তি মজুমদার প্রমুখের কবিতা উল্লেখযোগ্য।

শক্তিপুর থেকে প্রকাশিত আরও একটি ছোটদের পত্রিকা 'খিলখিল' সম্পাদনা করেছেন স্মৃতি চক্রবর্তী। ছড়া লিখেছেন কৃষ্ণধর, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, প্রীতিভূষণ চাকী, সমরমায়া, অমল দাস, দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, আশীষবরণ মুখোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, রবি রায় প্রমুখ। গৌর বৈরাগী'র 'আড়ি থেকে ভাব' গল্পটি বেশ উপভোগ্য। পশু-পাখীর আয়ুষকাল নিয়ে লেখা শতরূ মজুমদারের আলোচনাটিও সুখপাঠ্য। গৌরাঙ্গ দেব চক্রবর্ত্তীর গান এবং কৃপাণ' ছোটদের পক্ষে বড় গুরুগম্ভীর। আরো কিছু শিশুদের উপযোগী প্রসঙ্গ আগামী সংখ্যা থেকে স্থান পেলে ভাল হয়।

উচিলদহ থেকে প্রকাশিত 'কবিত পত্র' মোটামুটি অনামী দে'র লেখা নিয়েই। সাইকেল চালানোর বিশ্বরেকর্ড নিয়ে একপৃষ্ঠা আলোচনা করেছেন উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। শ্রীপতি চাকী'র রবীন্দ্র সঙ্গীতে দেশপ্রেম তেমন কোনো নতুন ভাবনা জোগায় না। গল্পগুলিও প্রথানুগ। মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত বাইরি, আবু আতাহার, আরতি দত্ত প্রমুখের কবিতা ভাল লাগে। সুন্দরবন অঞ্চলের পত্রিকা হলেও পত্রিকাটি একেবারে গ্রামীণ নয়।

(চলবে)

বিদেশী ফুলের সুবাস

ডাঃ (ক্যাপ্টেন) সমীর কুমার দত্ত

দমদমের চলন্ত সিঁড়িটার উপর দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম ব্রিটিশ হাইকমিশনের মেয়েটির কথা। 'পসেসন্সিপ্ ইজ নট দা গ্যারান্টি ফর এন্ট্রি ইনটু দা ইউ কে, নর দি ভিসা এ্যাণ্ড পাসপোর্ট। আমাদের প্রয়োজন আপনাকে যে কোন স্থানে যাত্রা ভঙ্গ করাতে পারে।' যাহোক সিকিউরিটি সেক্শনের গায়ে হাত দিয়ে কথা বলা পাসপোর্ট সেক্শনের অনিমেষ দৃষ্টিতে নাক মেলানো আর কাষ্টমসের স্ক্যানিং পর্ব মিটল দেহের অভ্যন্তর দ্রব্যের উদয়ে অবলোকন করে।

আকাশ পথের যাত্রীকে দু-ঘন্টা পরে বোম্বাইয়ের মাটি স্পর্শ করানো হোল পড়ন্ত আলোয়। সেখান থেকে করাচিতে কুবলাই খাঁয়েদের গতিবিধি তদারক করে প্রায় ঘুম চোখে নামলাম তাসখন্দ। লালবাহাদুরের মৃত দেহ আয়ুব খাঁ এবং ক্রুশ্চভ বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—দৃশ্যটা মনে পড়ল। রাশিয়ার ক্রু, পাইলট ও কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলবার সাহস থাকলেও শক্তির অভাব বোধ করলাম। কারন আমাদের দ্বিতীয় মাতৃভাষা ইংরেজী তাঁদের অজানা। কিছু জিজ্ঞাসা করলেই বলেন 'প্লিজ লুক অ্যাট দি বোর্ড'। ভোরের আলো ফুটতেই মস্কোর ইউক্যালিপটাস ভরা সুসজ্জিত এয়ারপোর্ট ফুটে উঠল চোখে। কর্মীরা সবাই ব্যস্ত নিজের কাজে। গল্পের জন্ম ব্যস্ততা কোথাও দেখলাম না। সমস্ত পাইলট, ক্রু, এয়ার হোস্টেস্ ও কর্মচারীরা প্লেনটা নিয়ে অন্যত্র চলে গিয়ে দিয়ে গেল আর একটা 'এরোফ্লোট' বিমান। আবার সেই সিকিউরিটি, পাসপোর্ট ও কাস্টমসের দৌরাত্ম্য। রাশিয়ার টয়লেটে গিয়ে আমার গোঁফ প্রদান করে ভেবেছিলাম বাবা মস্কো নাথ খুশিই হবেন আর মানসিকের মতন কাজ করবে। কিন্তু আমার গোঁফহীন বদনে পাসপোর্টের গোঁফ না দেখতে পেয়ে বাঁকা ও ভাঙা ইংরাজিতে প্রশ্ন 'ইজ ইট ইওর ফোটোগ্রাফ?' আমার সম্মতি শুনে একটা গোঁফ আঁকা হোল টিভির পর্দায় আমার মুখে। তারপর চলল সুর দৃষ্টিপাত—একবার আমার আননে, একবার পাসপোর্টের আসল গোঁফে আর একবার টিভির নকল গোঁফে। কিছুক্ষণ পরে আমাকে বলা হোল 'ওকে, গো এ্যাহেড।' কমুনিষ্ট দেশ বলেই কম অনিষ্ট করেছে আমার সময়। আমার গোঁফ নয় 'গোঁফের আমি'। সুকুমার রায় প্রমান করলেন।

মস্কোর জমি থেকে লণ্ডনের হিথ্রোর জমিতে পা ফেলতে লাগল চার ঘন্টা। ছোট ছোট খেলনার পাহাড়, নদী, মাঠ, গাছ, সমুদ্র প্লেনের সানগ্লাসের জানলা দিয়ে চলে গেল। এগিয়ে এলেন বিমান সেবিকা যেন 'সোভিয়েত নারী' পত্রিকার মধ্যে থেকে। 'ইওর ড্রিঙ্কস্ প্লিজ'। রাশিয়ান ভদকা আর রাশিয়ান স্যালাডের সাথে ফাষ্ট ক্লাস প্রোটিনের বিপুল সমারোহ। সিটের পেছনে ছোট টেবিলে বড় ভোজের আয়োজন। দীর্ঘ পথের মধ্যে যে পরিমান মাদক পেয়েছি, সেই পরিমাণে খাদ্যেরও ঘাটতি হয়নি। ডাক্তার হওয়ার অপরাধে ইমিগ্রেশান অফিসারের অসংখ্য প্রশ্নবান যখন কাটাচ্ছি সামনে থেকে, সে সময় পেছন থেকে হিমেল শর ও বর্ষিত হচ্ছে।

রোটারি ক্লাব, মিলিটারি আইডেনটিট কার্ড, রিটার্ন টিকিট ও স্পনসর দেখিয়েও যখন দেওয়ানি মামলার উকিলের জেরা থামল না, তখন ছুটী মঞ্জুরির তলব পড়ল। আমার বিরুদ্ধে একটাই অভিযোগ স্বদেশে ডাক্তারি ছেড়ে বিদেশে ডাক্তারি করাই নাকি আমি মনস্থ করেছি। 'জানি তোমার অজানা নাই গো কি আছে আমার মনে'। তবে জানিয়ে দিলাম আপনার মনের সব সংবাদই সঠিক নয়। শেষে এই বলে অপ্রসন্ন মুখে বিদায় দিলেন যে যদি আমি সত্যভঙ্গ করে বিলেতেই থেকে যাই তবে দুর্বাশা মুনির ক্রোধে আমার বন্ধুর ভস্ম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা স্পনসর নেওয়ার অপরাধে। কনভেয়ার বেল্ট থেকে ট্রলিতে মাল টেনে বন্ধুর ইটালিয়ান ফিয়াটে' তুলে জিজ্ঞাসা করলাম—ইমিগ্রেশন সমস্যা কি শুধু ভারত-বাসীকে নিয়েই না সব বিদেশীকেই।' বন্ধুর জবাবে জানলাম বেকারত্ব যখন স্বদেশের সমস্যা তখন কোন বিদেশীকেই পোষণ সমাধানের সৎমার্গ হতে পারে না। ইতিমধ্যে চারতলা পার্কিংপ্লেস থেকে গাড়ীটা স্লোপ দিয়ে রাস্তায় নেমেছে। রুম হিটারে আর ষ্টিরিওর গানে তপ্ত গাড়ীতে উত্তপ্ত মনে চলেছে ভাবনার মিছিল গ্রেভসেণ্ড যাওয়ার পথে। একটা সময় ছিল যখন সাগর পারে গেলে জাত যেত। আর আজ জীবনের মূল্যবোধ পাল্টে মানুষ সাগর পারে গিয়ে জাতে ওঠার চেষ্টা করছে—এটা কি মূল্যহীন? এই ইংরেজ জাতি যে এক-দিন পৃথিবীর অনেকাংশ শাসন করেছে, সেটা কি নেহাৎই ভাগ্যবশে না সেখানে বীরত্ব, বুদ্ধি, বিশেষ কিছু গুণেরও আছে আনাগোনা?

বন্ধু পত্নীর ও ছেলেমেয়েদের দরবারে স্বদেশের অনেক সন্দেশ বিদেশের বাসিন্দাকে সমর্পণ করে ইলেকট্রিক ব্ল্যানকেটের আওতায় কাটল বিলেতের গ্রীষ্ম রজনী। সেনট্রালি হিটেড বারান্দা থেকে সিঁড়ি বেডরুম ও বাথরুম পর্য্যন্ত রেড্ কার্পেটের মিছিল ও রেড্ কার্পেট ট্রীটমেন্ট। সুসজ্জিত ও সুদর্শন মানুষের ফুটপাথ দিয়ে শোভাযাত্রার মধ্যে লক্ষ্য করেছি সুদৃশ্য 'লিটার বিন্' গুলোর কি আকর্ষণী শক্তি! তা না হলে পোড়া সিগারেট, টুকরো কাগজ বা অপ্রয়োজনীয় জিনিষের সামান্য পরশ থেকে ফুটপাতও কারপাথ অর্থাৎ মোটর রাস্তা কেন বঞ্চিত হচ্ছে?

হাসপাতালেও রোগের নেই বিশেষ চলাফেরা। সুস্থ পরিবেশে অসুস্থ মেমসাহেবকে দেখছি গ্রেভসেণ্ড হাস-পাতালে ডাক্তার বন্ধুর সাথে। বিলেতে দশ বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে পরিচিতি কিনেছে সে। রোগী দেখার অন্তে 'হ্যালো' বলে এসে বসলেন ডাক্তার গোল্ডম্যান। বলছেন—'ডঃ দত্ত, ডাঃ ঘোষ সুখবর এই যে, আমার মেয়ে তার বয়ফ্রেণ্ডকে বিয়ে করছে অষ্ট্রেলিয়ায়। গত পাঁচবছর ধরে মালক্ষ্মীর সাথে বনিয়ে ওরা দুজনেই চাকরী করছে'। জিজ্ঞাসা কোরলাম—'কবে থেকে নিচ্ছেন ছুটি?' বললেন, 'আমি একটা গ্রিটিং টেলিগ্রাম পাঠাব ভাবছি। তবে মিসেস গোল্ডম্যান হয়ত যাবেন'। আমরা বেললাম, 'মেয়েকে জানাবেন আপনার দুজন ইণ্ডিয়ান সহকর্মি তাদের দ্বৈত জীবনকে জানিয়েছেন ভারতের উজ্জল রোদভরা শুভেচ্ছা'। চা খাওয়া শেষ করে 'ও. কে — বাই' বলে বিদায় নিলেন।

স্বর্গ রাজ্যের ধারণা পেতে গেলে গ্রেভসেণ্ড হস্পি-টাল ছাড়াও টেম্সের সৈকত, রয়্যাল বোটানিক্সের নিসর্গ, নর্থসী-এর বেলা ভূমি, বাকিংহাম প্যালেসের আভিজাত্য ও ট্র্যাফেলগার স্কোয়ারের বৈচিত্রও একটু খোঁজা দরকার। সারা-শহর-মোড়া প্রশস্ত ফুটপাথকে ভুলেও কেউ দোকানের প্রকৃষ্ট স্থান বলে মনে করেন না। আর 'কারপাথে' তো পদাতিকের যাওয়াই বেকার। কারণ আশি কি. মি. উপর বেগে ছুটছে তিনটে গাড়ী—স্বামী, স্ত্রী ও ছেলের। আত্মহত্যার প্রয়োজন না হলে রাস্তায় নামা অবান্তর। ডাউন পথে তিনটে চ্যানেলে চলেছে ভক্সহল, লিঙ্কন্ কনটিনেনটাল, সুজুকী, ডিলরি-য়েন, ডেম্লার, ল্যাগনডা, ক্যাডিলাক, রোলসরয়েস ইত্যাদির কনভয়। সুন্দরী গাড়ীর মিষ্টি কণ্ঠস্বর শোনার আশা করলে কিন্তু নিরাশ হতে হবে। কারণ ওদেশে

এ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার ব্রিগেড ও পুলিশ ভ্যান ছাড়া হর্ণ বাজানো আইন বিরুদ্ধ। আর বেআইনি হোল যত্র-তত্র গাড়ী পার্ক করা। রাস্তার দুপাশে আঁকা ঝকোঁচকানো 'ইয়েলো লাইন'—মানে 'নো পার্কিং'। 'মাদাম তুষোর মোমের ঘর' দেখতে গিয়ে গাড়ীটা রেখেছিলাম এক কি. মি. দূরে। অবশ্য কাছে রাখা যায় যদি পঞ্চাশ পাউণ্ড ফাইনের নোটিশ গাড়ীতে লাগাতে সাধ জাগে। অথবা টো-চেন করে বিনা পেট্রলে যাবে সে সুদূর পুরে। রাস্তায় নেই কোন ট্র্যাফিক পুলিশ—আছে শুধু ট্র্যাফিক সিগন্যালের জলন্ত চোখ! আর ফুটপাথ মথিত করছেন ট্র্যাফিক ওয়ারডেন—রাজ পোষাক পরিহিত রাজদূত—রাজদূতি। মালিণ্যহীন মানুষ, দোকান, বাজার, রাস্তা আর অট্টালিকার সারি দেখে ভাবছিলাম এঁরা সবকিছুকেই ঠাকুর ঘরের মতন পরিস্কার রাখার মানসিকতা কি করে গড়ে তুলছেন? আমরা নিজের ঘরটা যেমন রাখি সুন্দর ভাবে সাজিয়ে এঁরা ঘরের মতন ভেবে সারা দেশটাকে বেলুড় মঠের মতন করে রেখেছেন। ঘরের আবর্জনাকে প্লাষ্টিকের প্যাকেট বন্দি করে পাচার করেন ডাষ্টবিনের ঘরে। সপ্তাহে পাঁচদিন যে পরিমান কর্তব্য করেন সিরিয়াসলি, শনি রবিবার সেই পরিমানেই আনন্দ করে পরের সপ্তাহের রসদ সংগ্রহ করেন। আমাদের দেশের বড়সাবের উল্টো চেহারা দেখছি ইংরেজদের। বড়সাব হুকুম করেন। আর ইংরেজরা হুকুম করেন না এই জেনে যে তার হুকুম শোনবার লোকের বড় আকাল সেখানে। দেখছি এঁরা নিজের ব্যাক্তিত্বকে অটুট রাখতে এত সচেষ্ট যে সারাদিন অভুক্ত থাকলেও কখনও নাকে কাঁদেন না। আর অন্যের ব্যক্তিত্বকেও এত শ্রদ্ধা করেন যে কখনও গায়ে পড়ে সহানুভূতি দেখাননা। ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ টিউব রেলে, বাসে, রাস্তা ঘাটে আলোচনা করা পর্যন্ত সমাজ বিরুদ্ধ। টিউব রেলে আমার সহযাত্রির নীল চক্ষুর নীরব র্ভৎসনা কটাক্ষ আমাদের সরব সুখ-দুঃখের আলাপের উপর কতবার নিস্ফলে বর্ষিত হয়েছে মনে করলে আজও অনুতাপ হয়। সত্যিকারের প্রয়োজনে এঁরা কিন্তু সাহায্যের হাত বাড়াতে সর্বদাই প্রস্তুত।

আমাদের ধারণা যে হেতু আমরা তেত্রিশ কোটি দেবতা মানি আর শালগ্রাম শিলাকে সঙ্গে রেখে আমাদের সমস্ত সংস্কার সেহেতু আমরাই আধ্যাত্মিক। আর ইংরেজরা বস্তুতান্ত্রিক। কিন্তু বিবেকানন্দও এদেশে এসে বলেছিলেন "চব্বিশ ঘন্টা শাঁখ বাজিয়ে তেত্রিশ কোটি দেবতার পুজো করলেও আমরা হয়ে গেছি জড়, বস্তুতান্ত্রিক। আর এরা গির্জায় না ঢুকলেও অধ্যাত্ম। কাজের মধ্যে দিয়ে এরা আধ্যাত্মিক সাধনা করে। এরা কাজকে ধর্ম বলে গ্রহণ করেছে জড়তা আলস্যকে বিসর্জন দিয়ে। আমরা ভাঙা মন্দিরকে আঁকড়ে ধরে জড়তা, আলস্যকে আশ্রয় করে আছি। আমরা দুঃখে চিৎকার করি, ভিক্ষা করি, সহানুভূতি চাই। এরা দুঃখ প্রকাশ না করে সংগ্রাম করে দুঃখের সাথে। সকল কাজকে সমান মর্যাদায় গ্রহণ করার বুদ্ধি, দুঃখকে অস্বীকার করার নীরব বীরত্ব—এই হোল আসল আধ্যাত্মিকতা।" হাসপাতালের সুইপার, ওয়ার্ডবয়কে অনুরোধ করতে হবে—আদেশ নয়। এমনকি মিলিটারী অফিসারকেও অনুরোধ করতে হবে ব্যাটম্যানকে তার জুতোটা পালিশের জন্য। অন্যথায় শুনতে হবে ''মাই জব ইজ এ্যাস ডিগনিফায়েড এ্যাজ ইওরস্'।

সকালে হাসপাতালের টি রুমে বসে টিভি দেখছি বি. বি. সি. ফোর চ্যানেলে। নানা রঙের খেলা-খেলোয়ারদের গায়ে এবং পায়ে। রিমোট কন্ট্রোলে তিন নম্বর চ্যানেল টিপতেই আবির্ভাব ঘটল মিসেস থ্যাচারের। আর ঘরে আবির্ভাব হোলেন ডঃ গোল্ডম্যান। আলোচনা শুরু করলেন—"ডাঃ দত্ত আপনাদের দেশের সম্বন্ধে অনেক পড়েছি। রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও গান্ধীর দেশ বিশ্বকে আজও অনেক কিছু পারে দিতে।" বোললাম "বর্তমানে আমরা তো গভীর সমস্যার সাগরে ডুবে আছি, মাঝে মাঝে শুশুকের মতো ওপর উঠে সুখের শ্বাস নিয়ে আবার সমস্যার অতলান্তে। বললেন—"আমার মতে শত্রু সংখ্যা তিন। তোমাদের জনবল কমলে

মনোবল বাড়বে—এটাই প্রথম ও প্রধান। মানুষই মানুষের প্রয়োজন কমিয়ে আনছে। কারণ অফিসে যে চেয়ারে বসত মানুষ, সে চেয়ারে মেশিন বসে আরো বিশ্বস্তভাবে কম খরচে সেবা করছে। দুনম্বর হোল শিক্ষাকে যুগের উপযোগী না করতে পারলে যুগই তোমাদের ফেলে দেবে আবর্জনার স্তূপে। অন্য শিক্ষার মতো ডাক্তারীতেও আপনারা অপ্রয়োজনীয় জিনিষকে স্থানান্তরিত করে আধুনিক ও প্রয়োজনীয় শিক্ষাকে দিতে পারেন মর্য্যাদা। আর তিন নম্বরটা হোল একটু মানসিকতার পরিবর্তন। নোংরা জিনিষকে নোংরা জায়গাতেই দিতে হবে স্থান। আর সেই স্থান থাকবে নির্দিষ্ট ও আবৃত। ডাষ্টবিন আর অ্যাসট্রে একটু খুঁজে নিতে হবে কষ্ট করে। তবেই সুন্দর পরিবেশে মন ও দেহ সুন্দর হয়ে উঠবে। আর মানসিকতার মধ্যে সততাকেও একপাশে দয়া করে দিতে হবে ঠাঁই।

হাসপাতালের সিঁড়ি দিয়ে নেমে ফ্ল্যাটের সিঁড়িতে উঠছি আর সকলেই উইশ করছেন 'হ্যালো' বা 'গুড্ মর্নিং' বলে। তাঁরা সকলেই অপরিচিত কিন্তু একই ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। তাঁদের সৌজন্যবোধ আর ব্যক্তিত্বের কথা ভাবতে ভাবতে একটা দরকারে এলাম প্রতিবেশী মিসেস জোসেফাইনের ঘরে। বেল বাজাতে পনের মিনিট পরে সেই বৃদ্ধাকে যথারীতি দেখলাম পরচুল পরিহিতা, ওষ্ঠ রঞ্জিতা, সুবেশা, সুসজ্জিতা হয়ে দরজা খুলতে। যখন 'হ্যালো প্লিজ, কাম ইন' বলে হাসিমুখে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, মনে হোল আমার পনের মিনিট অপহৃত সময়কে উনি পূর্ণ সদব্যবহার করেছেন নিজের ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে। সুতরাং সেই নবীনা বৃদ্ধাকে আমার বন্ধু পত্র 'আন্টি' না বলে 'গ্র্যানি' বললে অবশ্যই তাঁর ক্ষুব্ধ হবার অধিকার আছে। কারণ তিনি সিক্সটিতে দাঁড়িয়েও আমাদের দেশের সুইট্ সিক্সটিনের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন।

(চলবে)

সংবাদ :

O····· আগামী ১৭ই থেকে ২১শে ডিসেম্বর ইউনাইটেড ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় পশ্চিমবঙ্গ খো-খো এ্যাসোশিয়শনের উদ্যোগে ভদ্রেশ্বরে অনুষ্ঠিত হবে ২১তম সিনিয়র জাতীয় খো-খো প্রতীযোগিতা।

এই প্রতিযোগিতাকে সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় শ্রীসুভাষ চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে একটি সংগঠন কমিটি গঠিত হয়েছে। পরিচালন কমিটির সভাপতি হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ মন্ত্রী মাননীয় শ্রী ভবানী মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও ক্রীড়া সংগঠকদের নিয়ে গঠিত হয়েছে ১৪টি বিভিন্ন উপ-সমিতি

সংগঠন কমিটি এই প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য সাড়ে তিন লক্ষ টাকার ১টি বাজেট অনুমোদন করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ও প: ব: সরকার যুগ্মভাবে পঁচাশী হাজার টাকা দেবেন। বাকী দু'লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা উদ্যোক্তাদের তুলতে হবে টিকিট বিক্রী ও বিজ্ঞাপন মারফৎ। সংগঠন কমিটি জনসাধারণের কাছে সহযোগীতার আহ্বান জানিয়েছেন।

O······'তৃণাঙ্কুর' এবং 'খিলখিল' পত্রিকার উদ্যোগে আগামী ৭ই জানুয়ারী '৮৪ শিশু সাহিত্য ও ৮ই জানুয়ারী '৮৪ কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে শ্যামনগরের ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগারে। উভয় দিনই অনুষ্ঠান শুরু হবে দুপুর ১টা থেকে।

সংবাদ ঃ

০ গোধূলি মনের বিজয়া সম্মেলন

৯ই নভেম্বর চন্দননগরের হাটখোলায় গোধূলি মনের নতুন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হোল এবারের বিজয়া সম্মেলন। অনুষ্ঠান শুরু হোল ডাঃ হিরণ্ময় ঘোষালের লোকসঙ্গীত দিয়ে। নিবারণ পণ্ডিতের লেখা তিনটে গান। তিনটি গানের মধ্যে জরুরী অবস্থাকালীন সময়ে লেখা ..... 'আমার মাঙ্গুর মাতো কণ্ট্রোল বোঝেন…' উপস্থিত শ্রোতাদের সব চেয়ে বেশী নাড়া দেয়। এরপর আবৃত্তি করে শোনালেন শ্রীমতী রীণা দত্ত। রবীন্দ্রনাথের দু'টি কবিতার পর শোনালেন অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'রবিবাসরীয় জনতা'য় প্রকাশিত গুচ্ছ কবিতা থেকে দু'টি কবিতা। শিশু শিল্পী মগাণ নন্দী প্রথমে কবি সুকান্তের কবিতা শোনাল। পর ২য় কবিতা সুকুমার রায়ের 'নোটবুক'। কবি ও ছড়াকার সনৎ মান্না 'চারণ' ও 'গোধূলি-মন' থেকে নিজের দু'টি ছড়া শুনিয়ে অনুষ্ঠানের মেজাজ জমিয়ে দিলেন। কবি-গল্পকার জগৎ লাহা যে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারেন—এ খবর অনেকেরই অজানা। কোলকাতার বিভিন্ন সাহিত্য সভায় গিয়ে কারো কারো মুখে শুনেছি তাঁর গানের কথা। এই প্রথম আমরা শুনলাম তাঁর ভরাট গলায় গমগমিয়ে ওঠা সুর। প্রথম গান 'বড় আশা করে এসেছিগো ......' তারপর 'কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে ...' তাঁর গানের রেশ তখনও বাতাস থেকে মেলায়নি এমন সময় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কেউ কথা রাখেনি' কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাল দীপালী সরকার। এর পর আবৃত্তি করে শোনাল গোধূলি-মন সম্পাদক কন্যা অদিতি চট্টোপাধ্যায়। সকলের আন্তরিক অনুরোধে জগৎলাহা দ্বিতীয় পর্য্যায়ে আবার গান শোনাতে এলেন। শুরু হোল 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে .... '। অনুষ্ঠানের শেষ গান শোনালেন 'তোমার হোল শুরু, আমার হোল সারা ....'।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গোধূলি-মন সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায়।

০ দূরবীণ পদ্ধতিতে বন্ধ্যাকরণ

৮৬'র ১৭ই নভেম্বর সকাল ৮টায় তেলিনীপাড়া ভদ্রেশ্বর হাইস্কুলে হুগলী জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সহযোগিতায় চন্দননগর রোটারী ক্লাব ও আই. এম. এ. চাঁপদানী ভদ্রেশ্বর শাখার উদ্যোগে ৩৪ জন মহিলাকে দূরবীণ পদ্ধতিতে বন্ধ্যাকরণ করা হয়। বিনা অপারেশনে ১০৫ টাকা সহ এই বন্ধ্যাকরণ করা হয়। ডাঃ বিমল চাটার্জী, ডাঃ বদ্রিনাথ শ্রীমাণী, ডাঃ সমীর কুমার দত্ত, ডাঃ চণ্ডীচরণ সরদার ও আই, এম, এ, ভদ্রেশ্বর-চাঁপদানী শাখার অন্যান্য চিকিৎসকেরা সক্রিয় ভূমিকা নেন। চন্দননগর আইডিয়াল নার্সিং হোমের সিষ্টাররাও প্রভূত সহযোগীতা করেন।

০ সফি ফতেহ আলী ওয়সী পীরের ৩৫তম স্মরণ উৎসব

অন্যান্য বছরের মতো এবারেও ২৪/১ মুন্সিপাড়া লেন, মাণিকতলায় সফি ফতেহ আলী ওয়সী পীরের স্মরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৭ই ডিসেম্বর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন আলহাজ হজরৎ মৌলানা জয়নুল আবেদীন আখতারী পীর কেবলা। অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ডঃ হীরালাল চোপড়া, ডঃ শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী, অধ্যাপক আবু মহঃফাজুল করিম মৌসুমী ও গোধূলি-মন সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত থাকছেন।

০ হুগলী জেলা সাংস্কৃতিক সম্মেলন

আগামী ১৭ই ও ১৮ই ডিসেম্বর হুগলী জেলা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে পিপুলপাতি হুগলীর 'বিচিত্রা'য়। সম্মেলনের পক্ষে সভাপতি শ্রীতারাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ও সম্পাদক সন্তোষ পাল এক বিবৃতিতে সংস্কৃতি প্রেমী সমস্ত মানুষকে সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

MEMBER, All India Small & Medium News Paper Association, Delhi.
GODHULIMONE N.P. Regd. No. RN. 27214/75 Nov.. '83 (অগ্রহায়ণ '৯০)
Vol. 25, No. 11 Postal Regd No. Hys-14 Price—Rupee One only

গোধূলি-মন এর আবু সয়ীদ আইয়ুব সংখ্যা

প্রকাশিত হবে জানুয়ারী '৮৪ তে

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে যে দু'জন ধাত্রীর সহযোগিতায় আধুনিক বাংলা কবিতা ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, প্রয়াত আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁদেরই একজন। সুদূর লক্ষ্ণৌ থেকে আগত এই মানুষটি মাত্র বারো বছর বয়সেই উর্দু ভাষায় গীতাঞ্জলি পড়ে আকৃষ্ট হন রবীন্দ্রনাথ ও সর্বোপরি বাংলা ভাষার প্রতি। আর অকুণ্ঠ উদ্যম নিয়ে অতি অল্প দিনেই এই ভাষা আয়ত্ত করে, রবীন্দ্র সাহিত্যের আধুনিক বিশ্লেষণ, সাহিত্যতত্ত্বের নবমূল্যায়ন এবং সাহিত্য সমালোচনায় বিজ্ঞান ও দার্শনিক চিন্তার প্রয়োগে বাংলা সাহিত্য আলোচনার পরিধিকে বিস্তৃত করার প্রয়াস নিয়ে যে লিখন শৈলী তিনি বাঙালী পাঠককে উপহার দিয়েছেন, তা আজও আমাদের ঈর্ষার বিষয়। দুর্ভাগ্য আমাদের যে, প্রচার বিমুখ, এই মানুষটিকে নিয়ে আলোচনা তো দূরের কথা, তাঁর নামই হয়ত শোনেননি বহু বিদগ্ধ পাঠক। শুধু মরণোত্তর শ্রদ্ধাঞ্জলি নয়, গোধূলি-মন তার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে আইয়ুবের সার্বিক মূল্যায়ণে আগ্রহী। বিশেষ এই গদ্য সংখ্যাটিতে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছেন

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, অতীন্দ্র মোহন গুণ, জীবেন্দু রায়, অমৃততনয় গুপ্ত, উশীনর চট্টোপাধ্যায়, মৈত্রেয়ী সেনগুপ্ত, শোভনা মিত্র ও গৌরী আইয়ুব প্রমুখ।

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সরলা প্রিণ্টার্স বড়বাজার, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও নতুনপাড়া, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

এই সংখ্যায়—

পৌষ ১৩৯০ সংখ্যা

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

O গোধূলি- মন 'ছড়া সংখ্যা' এবং 'শারদীয়া' দুটোই পেয়েছি। খুব খুশি হয়েছি প'ড়ে—কারণ, চয়ণ, রুচি ও পরিচ্ছন্নতায় গোধূলি-মন ভৈরবীর সুরে পৌঁছে দেয়। অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা রইলো।

প্রীতিভূষণ চাকী (নৈহাটি)

O আপনার শারদ সংখ্যা ও কার্তিক সংখ্যা ১৩৯৩ হাতে পেয়ে খুব খুশি হলাম। অনেক দিন ধরেই আপনার পত্রিকার নাম শুনেছি এবং দেখেছি ও পেয়েছি। আনন্দের বিষয় এই যে এই প্রথম আপনার পাঠান পত্রিকা হাতে পেলাম।

কেশবরঞ্জন দে (শ্যামনগর)

O গোধূলি-মনের ছড়া সংখ্যা পেলাম। ঐ দিন ডাকে বেশ কয়েকটি কাগজ এলেও আপনার পত্রিকাটিই নজর কেড়ে নিল। পর পর বেশ কয়েকটি ছড়া পড়লাম। সাজানো গোছানো, প্রচ্ছদ, ছাপা, কাগজ সব কিছু মিলে শিল্প শোভন। আপনাকে ধন্যবাদ। —ভেবে ভেবে ক্রমশই উৎসাহিত হচ্ছি। মাঝে মাঝে ভাবি কি হবে লিখে! কিন্তু আপনাদের মত দু'চার জন মানুষের আন্তরিকতা আমাদের মত তরুণদের উদ্যম বাড়িয়ে দেয়। গোধূলি-মন অনেক দিন বেঁচে থাকুক তার নিত্যনুতন বৈচিত্রের জন্য।

সোফিওর রহমান (মেদিনীপুর)

O গোধূলি-মন কার্তিক ১৩৯০ সংখ্যা পেয়েছি। পড়লাম। বেশ ভালো লাগলো। সব চে' বেশী ভালো লাগলো প্রচ্ছদের ছবিটা। যদিও স্কেচ ভালো বুঝিনা প্রচ্ছদ শিল্পীর নাম জানা গেলনা। গোধূলি-মনের দীর্ঘায়ু সহ আপনার সফলতা কামনা করি।

হাসান কামরুল (বাংলা দেশ)

আপনার পত্রিকা গোধূলি-মন কার্তিক সংখ্যা [illegible] সব সংখ্যাই পেয়েছি। [illegible] পুজো সংখ্যা পেলাম না। মাঝপথে হয়তো খোয়া গেছে। আমাদের ডাক ব্যবস্থার কি চমৎকার অবস্থা! কতজনের প্রেরণা, ভবিষৎ, উৎসাহ, আনন্দ সব কিছু কেমন উদরস্ত করে নেয় সহজে। আসুন না আমরা লিটিল ম্যাগাজিনের তরফ থেকে জোরালো কিছু বক্তব্য রাখি। এ ব্যাপারে পত্রিকায় পত্রিকায়। এটা আমাদের আমাদের দেশের একটা অন্যতম বিরাট সমস্যা।

দিপালি দে সরকার (হরিপাল)

O গোধূলি-মন ১৩৯০ ডাক যোগে পেয়েছি। প্রতিটী লেখাই ভালো লাগলো। আরো ভালো লাগলো সম্পাদকীয়। নিয়মিত গোধূলি-মন পেয়ে তৃপ্ত হই। নতুন পত্রিকার আবির্ভাব অনেক সময় ঘটে, অনেকগুলিই প্রায় ক্ষণজন্মা; সেদিক থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ২৫ বর্ষ অতিক্রান্তের পথে জেনে দেখে-শুনে বুঝি গোধূলি-মনের ভূমিকা অসামান্য না হলেও সামান্য নয়। শিল্প সাহিত্য তথা সাংস্কৃতির দিগন্তে একনায়কতান্ত্রিকতা সেও এক মুক্ত পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে তার সকল সাধ্য নিয়ে এটাই বা কম কথা কি। সাধনা কেমন করে সাধ্যের সীমাকে অতিক্রম করে যায় তারই পরিচয় এই গোধূলি-মন।

তপন দাশ (কলিকাতা)

O শরতের শিউলিঝরা প্রাণ মাতানো দিনের সঙ্গে শারদীয়া গোধূলি-মনের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে তা স্বচ্ছই প্রমাণিত হয় এ বছরের শারদীয়া সংখ্যাটি দেখে। পরিচিত সাহিত্যিক, কবি, লেখক বা সাংবাদিকগণের লেখা না থাকলেও এ বছরের সংখ্যাটির বেশির ভাগ অংশই অধ্যাপকগণের লেখায় ভরা। ফলে পত্রিকাটি উন্নত মানের হয়েছে বলা চলে।

শীতল দাস (চুঁচুড়া)

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি-মন

২০ বর্ষ/১২শ সংখ্যা

পৌষ ১৩৯০

সম্পাদকীয়

পৌষ মাস কারো কারো কাছে সর্বনাশের হয়ত; তবে আমাদের অনেকেরই কাছে পৌষ আজও ডাক দেয় ছুটে আসার! শহরতলী ছাড়িয়ে সবুজ দ্বীপের সেই শান্তিনিকেতনে। শ্যামলী, পুনশ্চ, উত্তরায়ণের বাগানে, ছাতিমতলায়, আম্রকুঞ্জে—যেখানেই ঘুরিনা কেন, মনে হয় সেই বিশাল মানুষটীর ছায়া সর্বত্রই। মনে হয় একটু আগেই ঘরে গেছেন এখান থেকে হয়তো বিশ্রামের প্রয়োজনে। কি গভীর মমতায় দিনে দিনে বাড়িয়েছেন একে বৃক্ষের মতো জল সিঞ্চিত করে—আজ সে বিশাল মহীরূহ।

কলাভবণের আশে পাশে রামকিঙ্করের সেই বুদ্ধমূর্ত্তি—ধ্যানমগ্ন—যেন কোন যুগের, কিছু দূরেই সুজাতা, মাথায় পায়েসের পাত্র। সৌমেন অধিকারীর কুমার আর কামারের জীবন্ত মূর্ত্তিতে ছড়িয়ে আছে প্রাণের উন্মাদনা, কর্মের দুরন্ত গতি, আর জীবনের ছন্দ।

এ সব ছাড়িয়ে শ্রীনিকেতনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে গিয়ে পড়লে আর এক বিস্ময়! পোড়ামাটির বাহারী কাপ, সৌখিন ফুলদানী, কিংবা মনোরম ছাইদানী—আপনাকে মুগ্ধ করবেই।

খোয়াইয়ের পথে চলুননা শীতের শীর্ণ কোপাই-এর ধারে গিয়ে বসি। ঠাণ্ডা বালির বুকে পা রেখে এগিয়ে যেতে যেতে আপনার মনে হবেই এর সর্বত্রই ছড়িয়ে আছেন তিনি। আর আমাদের দেখা সব কিছুই অনেক অনেক আগেই মুগ্ধ হয়ে আছে তাঁর অমর মায়াবী লেখনীতে গদ্যে বা পদ্যে, গানে বা নাটকে—কোথাও না কোথাও।

প্রতি সংখ্যা এক টাকা
বার্ষিক (সডাক) দশ টাকা

সম্পাদক :
অশোক চট্টোপাধ্যায়

● সম্পাদকীয় কার্যালয় ॥ নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর ॥ হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥ ভারত

● কলিকাতা কেন্দ্র : ৩৩/৬-জি, নাজির লেন, কলিকাতা-৭০০০২৩

সৌন্দর্যবোধ

শীতল চৌধুরী

কবিতা নির্মাণে কবির প্রধান কাজটি হল কবিতার ভেতরে এক অনাবিল সৌন্দর্যরসের উদ্ভাবন। যে রস কবির সত্যলব্ধ এক ভাব যা ভাষা ও শব্দ ব্যঞ্জনে উৎকৃষ্ট কাব্যরস। যে কাব্যরস কবিতার শরীরে আনে লাবণ্য। আর সেই লাবণ্যকেই আমরা সাহিত্যের সৌন্দর্য বলে চিহ্নিত করি। যিনি কবিতার প্রাণস্বরূপ এই কাজটি নির্মাণে সিদ্ধিলাভ করেন, তিনি মহৎ কবি রূপে আমাদের কাছে চিহ্নিত হন।

তবে সাধারণভাবে আমরা সৌন্দর্যবোধ বলতে তাকেই বেশী মর্যাদা দিই, যার ভেতরে লুকিয়ে আছে জীবনসত্যের সংকেত। মহৎকাব্য সব সময় কল্পনামণ্ডিত জীবনসত্যকেই প্রকাশ করে। এ সত্যের ভূমি কবির মনে তাৎক্ষণিকের কোনও ঘটনাকে আলোড়িত করে গড়ে ওঠে না, যা স্বপ্নলোক থেকে বাস্তব চেতনার ভেতরে শিহরিত হয়ে জীবনসত্যের প্রকাশ ঘটায়। এ সত্যই হল সৌন্দর্য, শব্দ-ব্যঞ্জনে ভাষায় যা লাবণ্যে ভরপুর, সতেজ। প্রকৃত সৌন্দর্যবোধের আস্বাদ আমরা যেমন পাই আধুনিক যুগের কবি জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী, শঙ্খ ঘোষ ও শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের কবিতায়। বিষ্ণু দে-র 'জল দাও', 'ঘোড়সওয়ার' তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি। কবিতার ভেতরে যেসব গুণাগুণ স্বয়ং সক্রিয়ভাবে থাকলে সৌন্দর্যরসের পরিপূর্ণ চেহারাটি পাওয়া যায়, তা পুরোপুরি পাওয়া যায় বিষ্ণু দে-র কবিতায়। বিষ্ণু দে-র অধিকাংশ কবিতা পঠনে আমাদের তৃপ্তি দেয়। কল্পনা মণ্ডিত জীবন সত্যের প্রকাশের সাথে সাথে শব্দ-ব্যঞ্জনায় রূপলাবণ্যে তা সতেজ। সাহিত্যের সৌন্দর্য বোধের বিরাট উপস্থিতি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। বলতে দ্বিধা নেই, এ-জন্যই বিষ্ণু দে মহৎ কবিরূপে চিহ্নিত। বিষ্ণুবাবুর কবিতায় শব্দ-ব্যঞ্জনে রস উপলব্ধিতে এতটুকু ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘটে না। তেমনি ঘটে না সুভাষ মুখোপাধ্যায়, রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরীর কবিতায়। রমেন্দ্র কুমারের 'আরশিনগর' তো জীবন সত্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শব্দ-ব্যঞ্জনে প্রকাশে ঘটেনি এতটুকু তার বিকৃতি। শব্দ-ব্যঞ্জনের বিচ্ছুরণেই শুধু আনন্দ দেয় না, দেয় জাগ্রত বোধলোকের ভেতরে এক নতুন সৌন্দর্যের দীপ্তি। উৎকৃষ্ট কাব্যরসে যা সতেজ, প্রাণময়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাতেও দেখি সে পূর্ণতা। বিশেষ করে 'অবনী বাড়ি আছো' কবিতায়। 'অবনী বাড়ি আছো ?'—এই লাইনটিই কী জীবনসত্যের প্রতিধ্বনি নয় ?

জীবনানন্দের বহু কবিতার মধ্যেই উৎকৃষ্ট কাব্যরসের সন্ধান পেয়ে থাকি। সেখানে সৌন্দর্যের বহুমুখী আবির্ভাবের লক্ষণ দেখা যায়। ভিন্ন পোশাকে, ভিন্ন চেহারায়। কখনও তা আত্মার ভেতর বাহিরে, কখনও তা আকাশ-রোদ্দুর প্রকৃতির লতা-ফুল-পাতার ভেতরে। তা জীবন সত্যের দ্যোতক, পূর্ণ অবয়ব। বুদ্ধদেববাবুও নীরেন চক্রবর্তীর কবিতাতে ও তার কিছু কিছু স্বাদ পাই।

আমাদের দেশে প্রাচীন আলংকারিকরা বলেছেন: বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম। কাব্য হচ্ছে সেই জীবন সত্যের বাক্য, রসই হল যার মূল আত্মা। কেননা, রসই হল সেই আনন্দময় উপলব্ধি, উৎকৃষ্ট কাব্যপাঠের ফলে পাঠকের হৃদয়ে যার জন্ম। কাজেই কবির লক্ষ্য রস। আর সে রস কবির ভাবনা-চিন্তাতেই লাভ করবে পরিণতি। বস্তুকে অবলম্বন করে কবির মনে যে ভাবের উদ্রেক হয়, কবি তাই কথা দিয়ে তার শরীর নির্মাণ করেন

শব্দ-ব্যঞ্জনায় কাব্যের ভেতরে প্রকৃত প্রাণের প্রবেশ ঘটিয়ে। মহাকবিদের বাণীতে বাচ্যার্থকে আশ্রয় করে অতিরিক্ত একটি যে প্রতীয়মান অর্থ অভিব্যক্তি দেখি— তাকেই আমরা 'ধ্বনি' বা 'ব্যঞ্জনা' বলি। মনে রাখতে হবে ভাষার এই ব্যঞ্জনা শক্তি না থাকলে কোনও কিছুই ভাবরসে জারিত হয়ে স্বার্থক কাব্যে রূপান্তরিত হতে পারে না। কেননা, কাব্যের প্রকৃত সৌন্দর্যের সাথে এটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা জানি, অনেক সময় শব্দ ও ব্যঞ্জনার গূঢ় অর্থ না বুঝলেও কোনও সৎকবিতা তার শব্দ-অলংকারে কানের ভেতর ঝংকৃত করে আনন্দ দান করে। এ-আনন্দের প্রকৃত কারণ হল, রচিত চিত্রকল্পগুলির অতুলনীয় সৌন্দর্য, শব্দবিন্যাসের অন্তর্নিহিত সংগীতধর্মিতা ও ছন্দের মধ্যে নৃত্যময় গতির চঞ্চলতা। এ-প্রসংগে এলিঅটের চিরস্মরণীয় উক্তি: 'Genuine Poetry can communicate, before it is understood.'

তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, কাব্যের সৌন্দর্যের সঙ্গে যে দুটি বিশেষ উপাদান ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেই ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার আসল গূঢ় অর্থ কী? এ-প্রশ্ন কবি-হৃদয়ে জাগা স্বাভাবিক। একমাত্র তখন অভিজ্ঞতার ব্যঞ্জনা ও ভাবের ব্যঞ্জনার কথা বলা ছাড়া ঠিক অন্য কোন সদুত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য ধ্বনিবাদীরা বলেন, এ-ব্যঞ্জনা রসের ব্যঞ্জন। পরক্ষণেই আবার মনের ভেতরে উঁকি-ঝুঁকি দেয় প্রশ্নটি—'রস' বস্তুটি কী? এর উত্তরেও এটুকু বলা যুক্তিসঙ্গত যে, কবি কর্তৃক বাক্যে প্রযুক্ত কাব্যে প্রযুক্ত শব্দমালা, সহৃদয় পাঠকের মধ্যে যা স্বাদের বীজ বপন করে অঙ্কুর সৃষ্টি করে। বিশেষ করে বলতে হয়, অর্থ বিন্যাস ও ধ্বনি বিন্যাস যখন একত্র মিলিত হয়ে কেউ কারুর ক্ষতি সাধন না করে একে অপরের অসম্পূর্ণতা দূরীকরণে পরস্পর পরস্পরকে সমৃদ্ধিশালী করে অর্থ ও ধ্বনিকে অতিক্রম করে মিলিত যে নতুন শক্তির জন্ম দেয়, তারই নাম ব্যঞ্জনা। আর তারই ফলে ভাব ভাবকে রসে পরিণত করে, আর তখনই ভাষা জাগিয়ে তোলে অন্তরাত্মাকে! সৃষ্টি হয় আসল কাব্য রসের।

একদা দেগা যখন দুঃখ করে মালার্মের কাছে বলেছিলেন যে তাঁর মনে ভাবের অভাব নেই, কিন্তু তিনি সারাদিন চেষ্টা করেও একটি কবিতা লিখতে পারছেন না, উত্তরে মালার্মে বলেছিলেন: 'One does not write a poem with ideas, one writes it with words' কাজেই একজন মানুষের জীবনের যা কিছু ঘটছে, সেটাই তার অভিজ্ঞতা নয়। কবির মন যখন তা রূপান্তরিত করে নেয়, তখনই তা অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়ায়। ইদানীং কালের অনেক কবিরাই এই ভুলটি করেন অধিক মাত্রায়। নিজের জীবনের অনেক ঘটনাকেই কাব্যের মধ্যে চালান করতে গিয়ে পানসে করে ফেলেন। কবি বিনয় মজুমদারের ইদানীং কালের কবিতার মধ্যে তা চোখে পড়ে খুব বেশী পরিমানে। 'ফিরে এসো চাকা'র কবিতায় তিনি যে কাব্যরসের সুষমা মণ্ডিত করে পাঠককুলকে প্রকৃত কবিতার রস সৌন্দর্যে আস্বাদিত করেছিলেন, এখন আর তা পারছেন না। এখনকার লেখায় তাঁর ভাষা ভাব ও শব্দ-ব্যঞ্জনায় বেশ বড় রকমের ফাঁক দেখতে পাই। নিজের ব্যক্তিগত সব অভিজ্ঞতাকেই কাব্যে রূপ দিতে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটাকেই পানসে করে ফেলছেন (আমার ব্যক্তিগত মত)। বিনয়বাবু যথেষ্ট ক্ষমতাশালী কবি। অথচ, তাঁর হাতে এরকম কবিতার নির্মাণ দেখে দুঃখ বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথের, বাল্মীকি প্রসঙ্গে কথাগুলি এ-ক্ষেত্রে বিশেষ করে স্মরণ যোগ্য। রবীন্দ্রনাথ-ই আমাদের শুনিয়েছিলেন, বাল্মীকির মনোভূমি রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য। এরকম রূপান্তর নির্ভর করে কবির ভাষা ও কবিতার ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতনতা এবং জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে গভীরতা।

কাজেই—কবিতা নির্মানের আগে কবিকে সর্বপ্রথম তৈরী করে নিতে হবে তার নিজস্ব এক মনোভূমি। যে

মনোভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি নির্মাণ করবেন শব্দ-ব্যঞ্জনায় উৎকৃষ্ট ফসল। যা ভাষা, ঐতিহ্য, সচেতনতায় এবং জীবন জগতের প্রতি গভীরতা, কাব্যগুণের প্রকাশ—আসল কাব্য সৌন্দর্য সেখানেই। রবীন্দ্রনাথের দুটি পংক্তি উল্লেখ করছি :

"ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু,
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু॥"

এই পংক্তি দুটির মধ্যে কবির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, কিন্তু কাব্যরসে পাঠককে স্বাদ এনে দেয় প্রকৃত সৌন্দর্য বা আনন্দের। কবিতার স্বার্থকতা এখানেই। মনে রাখতে হবে কখনও, কোন অবস্থাতেই প্রকাশের সময় যেন কাব্যে এতটুকু রসের ক্ষুন্নতা না ঘটে। আর এজন্য কবিকে হতে হবে ভাষা-ভাব ও শব্দ-ব্যঞ্জনায়, প্রকাশে সবচেয়ে বেশী সচেতন।

জীবনানন্দের একটী কবিতার বিশেষ ক'টি পংক্তিও এ-প্রসঙ্গে দেখান যেতে পারে। যা জীবনানন্দের মৃত্যু চেতনার প্রকাশ। কিন্তু প্রকাশে কোথাও ঘটেনি এতটুকু কাব্যরসের ক্ষুন্নতা। যার রস সিঞ্চনে অবগাহন করতে এতটুকু অসুবিধা ভোগ করেন না আধুনিক কালের যে কোনও সহৃদয় পাঠক। পংক্তি কটি—

"কাস্তের মত বাঁকা চাঁদ
ঢালিযাছে আলো,—
প্রণয়ীর ঠোঁটের ধারালো
চুম্বনের মত!"

উপনিষদে আছে, 'আনন্দরূপ মৃতং যদ্ বিভাতি,' যাহা প্রকাশ পাচ্ছে, তাহাই তাঁহার আনন্দস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ। ভুখণ্ডের ধূলি হতে আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত সমস্তই Truth এবং beauty, সমস্তই আনন্দরূপমমৃত। 'সাহিত্যের স্বরূপ'—এ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সত্যে তখনই সৌন্দর্যের রস পাই, অন্তরের মধ্যে যখন পাই তার নিবিড় উপলব্ধি—জ্ঞান নয়, স্বীকৃতিকে।' এই স্বীকৃতি কী? কবির কাছে জীবন সত্যের উপলব্ধি, যা ইতিপূর্বে বলেছি। জীবন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানই হল প্রকৃত কবির কাজ। তা বাল্মীকির মতো মনোভূমিতে হতে পারে। কাব্যের সত্য উপলব্ধিতে, বিষয় বস্তু ও জ্ঞানে নয়। যা কবির মনোলোকে আপনিই নির্মিত হয় কবির ভাব-ভাষার শব্দ ব্যঞ্জনের অমৃতরসে।

জীবনে আমরা যা কুৎসিৎ বলে ভাবি, তাও কাব্য-গুণে সুন্দর হয়ে উঠতে পারে উপযুক্তভাবে ভাষা ব্যঞ্জনায় যদি তাকে নির্মাণ করা যায়। কবিতার সমগ্রতা যেখানে ঐক্য—সেখানে কুৎসিত বা অসুন্দর বলে কিছু নেই। সবটাই কবির মনোভূমির ব্যাপার। কবি যদি প্রকৃত রসে তা প্রস্ফুটিত করতে পারেন, তা হলেই সুন্দর কাব্যে তা প্রকৃত সৌন্দর্যের আস্বাদ দিতে পারে। এর জলন্ত উদাহরণ ইউরোপীয় সাহিত্যে শার্ল বোদলেয়ার। যিনি জীবনকে কুৎসিত পাঁক থেকে তুলে এনে কাব্যের সৌন্দর্যের সন্ধান দেখিয়েছেন তাঁর সৃষ্ট কাব্যে। আর এও দেখি, অনেক সময় সৎচিন্তা-ভাবনাও কবির অক্ষমতায় অসুন্দর হয়ে যায়। কাজেই, স্বভাবতঃই আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি, কাব্যের সৌর্ন্দয কাব্যগুণে—কোনও বিশেষ বিষয়বস্তু বা জ্ঞানে নয়। কাব্যে সৌন্দর্যের গতি অবাধ, সূর্য কিরণের মত। ছড়িয়ে আছে ভূলোকের সর্বত্র। শুধু তার স্বরূপ চিনিয়ে দেওয়ার আসল কাজটি হল কবির। কবির অন্তঃকরণের মধ্যেই সুপ্ত থাকে সৌন্দর্যের আসল যাদুকাঠিটি। কবির একমাত্র কাজ হল—সেটি যথাযথ মূল্যায়নে উন্মুক্ত করা।

সেই তাজা কিশোরটি / ঈশিতা ভাদুড়ী

সদ্য কিশোরটি সুন্দর আঙুলে তার ঠিকানা লিখে
বলেছিলো : যমুনাদি চিঠি লিখো ;
হাসপাতালের বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে
সেই কিশোর তাকিয়েছিল এক নিমেষ,
পরমুহূর্তেই স্বপ্নে হাহাকার চাউনি
জানালার বাইরে .....
হয়তো সে ভেবেছিল, হাসপাতালের দরোজা
পার হয়ে
যমুনাদি, তার কথা রাখবে না। হয়তো সে
ভেবেছিল ....
কিন্তু সেই কিশোর নিজেই কথা রাখে নি।
সবুজ ফুল চিঠির জন্যে না দাঁড়িয়ে
হাসপাতালের জানালা ভেঙ্গে সেই তাজা কিশোর
এক লাফে আকাশে উঠে গ্যাছে।
চাঁদ আর নক্ষত্রেরা কি পৃথিবীর চেয়ে
বেশী স্নেহ দিতে জানে ?
তবে কেন 'যমুনাদি, চিঠি লিখো' বলে
অন্য ঠিকানায় চলে গেল সেই উজ্জ্বল কিশোরটি ?

চিরকুট ছিঁড়ে ফ্যালো / সিদ্ধার্থ পাল

চিরকুট ছিঁড়ে ফ্যালো, ছিঁড়ে করো কুটি কুটি
দু-চোখে জাগিয়ে রাখো
কুটিল ভিরকুটি :
তুমি এখন ভীষণ রাগ করেছো,
সারা শরীরের রক্ত এখন তোমার গণ্ডে
এঁকে দিচ্ছে বিচিত্র বর্ণালী ;
এখন তোমার মৌন বড় বেশি কথকতাময় :

এখন তোমার চলাফেরা প্রতি পদক্ষেপ
প্রত্যেকটি অঙ্গসঞ্চালন—তীব্র, তীক্ষ্ণ,
তরুণ তুর্কীর মতো ক্রুদ্ধ, শব্দময়।
চিরকুট ছিঁড়ে ফ্যালো করো কুটি কুটি
দু চোখে জাগিয়ে রাখো কৃত্রিম অনল,
জটিল ভ্রুকুটি :
তুমি এখন ভীষণ রাগ করেছো ॥

একজন / দেবাশিস প্রধান

ষ্টেশন ছাড়ার শাঁখ বাজিয়ে
অন্ধকারে শুন্‌শান দৌড়ে চলে গন্তব্যমুখী ট্রেন
শুধু একজন প্রিয় সাধ স্বপ্নের স্পর্শকাতরে
কোথায় ডুবে থাকে আবর্ত মোহে।
যেমন পাতারা কাঁদে টুপ্‌ টাপ্‌ বনমর্মরে
জলেরা জলের মতো চূর্ণ চূর্ণ হয়
স্বখ্যাত তন্ময়ে।

সবাই চলে যায় জানি,
তবুয়ো কেউ কেউ শিকড়ের ঘ্রাণ বুঝে নেয়
যেমন মানুষ চেনে গৃহের ঘরণী
চোখের গন্ধে ঠিক চিনে নেয় মানুষের চলন বলন
আন্তর প্রদেশ

কেউ কেউ আন্তরিক বিষে নীল হয়
আকণ্ঠ গরলে।.. ...

একা একা / বঙ্কিম চক্রবর্তী

একা একা নিঝুম পুরের দিকে চলে যায় ব্যস্ত মানুষেরা
পিছনে মিছিল, মেলা, লাগাতার যুদ্ধ ও বন্ধ।
পিছনে যাবতীয় দুঃখ, শোকের ম্লান তিথি ডুবে যায় একা একা
একা একা নজরানা দাখিল করে হিম ছায়ায়—
প্রতিবেশী স্বজনেরা হা-অশ্রু মালদা, নদীয়ায়

একা একা অক্ষর পুরুষ তবু চলে যায় নিরক্ষর অন্তর্জলি রথে।
পথে পাখির সাথেও কথা কাটাকাটি হয়,
বিবাদী নদীর কাছে হাফশার্ট রক্তে কেঁদে ওঠে।
কেঁদে ওঠে মায়াবী আয়না জলে শত কোটি ক্ষুধার্ত প্রণাম।
একা একা কারা তবু নিজেকে ঈশ্বর করে নিজেকে চুমায়?

আর যারা চলে যায় সাদা অন্ধকার মেপে দূর আন্দামান
আউটরাম ঘাটের থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ফুল—
নিজেকে পূজিত করে নিজের মন্দিরে একা একা নিঃশব্দ নিখিলে
সে মৌলী ছিঁড়ে বাদ দিলে পাঁজরে আগুন সেঁকে হেঁকে উঠিঃ
'তোমরা পিছনে এসো দেরী হলে দিন দিন সূর্য ডুবে যায়'।
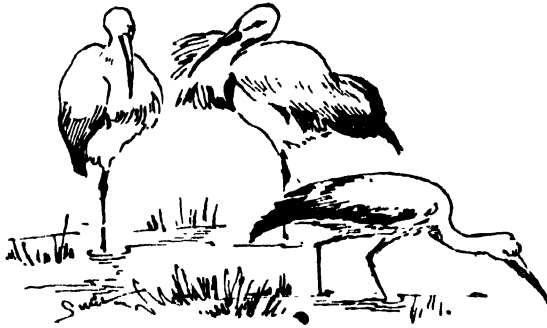
শান্তিনিকেতনের এক মানুষ

রীণা চট্টোপাধ্যায়

কোপাইয়ের তীরে বসে উদাত্ত গলায়
কে শোনাল এমন সঙ্গীত
তুমি, তাকে কতটুকু চেনো।
ঐ যে ছোট্ট নদী, হাঁটুজল
গোয়ালপাড়াকে ছুঁয়ে কিছু লোক
পার হয়ে যায়।
ঐ নদী জানে
গোয়ালপাড়াও জানে
আর জানে রাঙা ঐ ধুলো।
তারা জানে এ মানুষ
বাউল বৈরাগী
গৈরিক পাঞ্জাবী আর
লালমাটির কণা কণা রেণু
ছড়িয়ে আছে সাদা পাজামায়।

শক্র নিধন / সোফিওর রহমান

মাটিতে কেন নামল চিল?
এই নিয়ে তর্ক হ'তে হ'তে
অঞ্চল অফিসের খিল আঁটা ঘরে
বসল সালিস

মোড়ের মুখে কেন চিল্লাচ্ছে এত কাক?
তালাবন্ধ কিচেন ভেঙে কে দেখাল ভাত
সর্বনেশে বিভীষণের কথা ভাবতে ভাবতে
গরু আর জরু হারার দল
থানায় ঠুকল এফ-আই-আর

দুটি কবিতা / মেঘ মুখোপাধ্যায়

উপমা

ফুল আঁকতে গেলেই আমি দেখি তোমার
চক্ষু আঁকা যায়
পাখি ভেবে যা এঁকেছি পাখি নয়
তোমারই তো নাভি
স্বপ্নের বিমূর্ত চিত্রকলা তোমার ওষ্ঠের অনুরূপ
সেরকম কম্পমান, ধূমায়িত, স্বেদাক্ত ও
স্নিগ্ধ, সন্দিগ্ধ
ঝরণার বদলে গ্রীবা প্রপাতের পরিবর্তে আমি
তোমার ওই শিহরিত উরু ভিন্ন অন্য আর
কি আঁকতে পারি
রুমু, পদ্ম স্মরণে এলে আমার নয়নে ভাসে
তোমার চরণ।

পাপ

মৃত পতংগের কাছে আমার কি পাপ আছে
আমি তো জানি না, যদি থাকে
বলে দিও ওকে মর্মের ভিতরে এসে যেন সে
সংবাদ বলে যায়
আমি সেই অপেক্ষায় বুকের গহণে ধুনি জ্বেলে
রোজ রাতে নিদ্রাহীন জেগে আছি
কুমীরের দাঁতে।

এ্যান্না কার্ণ প্রিয়তমাষু

মূল—আলেকজাণ্ডার পুশ্‌কিন
ভাবানুবাদ –শামসুন্ নাহার লিলি

সেই সমস্ত আশ্চর্য মুহূর্ত আসে কখনও কখনও ;
যখন আমার স্বপ্নের ভেতর তুমি হয়ে ওঠে উজ্জ্বল—
জ্যোতির্ময়ী তুমি এক নাক্ষত্র-নারী,
কাঙ্খিত প্রহরগুলো পূর্ণ হয় শুধু তোমার প্রভায়।
দুঃখ-তরঙ্গের বিষণ্ন দোলায় দুর্বহ এ জীবন,
নৈরাশ্য আনে সদা প্রচণ্ড প্রদাহ-
তবু তোমার অনুপম প্রভায় হৃদয় আপ্লুত হয় অবিরত।
সেই সুমধুর স্বপ্ন এখন ঝড়ের বিক্ষুব্ধতায় বিলীন
তোমার সৌম্যমূর্তি আমার কাছে আজ অস্পষ্ট, আচ্ছন্ন,
হৃদয় আমার সুদূর পরাহত।
বর্ষণের সুললিত বীনায় কণ্ঠ তোমার
তরঙ্গায়িত হয় না আর,
বিষণ্ন ক্ষণগুলো ক্রমশঃ বর্ষ পেরিয়ে যায়,
নিঃসঙ্গ বিহ্বলতায় সময় পেরিয়ে যায় প্রেমহীন—
ঈশ্বর চ্যুত আমি এ জীবনের খেয়া পারাপারে
ক্লান্ত, অশ্রুসিক্ত –
সময়ের সিঁড়ি ভেঙে কখনো আবার সম্মুখে তুমি এলে
রমণীয় স্বপ্নে উজ্জ্বল হয় অন্তর।
মূর্তিমান স্বপ্নের আভায় ভরে যায় প্রশান্তিতে হৃদয়।
সুমধুর উল্লাসে ভরপুর আত্মা আমার শ্রদ্ধায়
বারংবার শুধু সেটুকুই চায়—
হৃদয় জেগে ওঠে চেতনায়, অনুপ্রেরণায়,—
জীবন, প্রেম ও অশ্রুজলের প্রতি সচেতন হই
ধন্য আমি তাই।

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়ের

জাগরণের আগে

বড্ড ঘুম আমার। এত ঘুম যে কোত্থেকে আসে! ছুটতে ছুটতে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে ট্রেনের ল্যাজ কামড়ে ঝুলে পড়া যাকে বলে, প্রায় সেরকমই ঝুলে পড়লাম রড ধরে। অফিস যাবো। লেট তো রোজের ব্যাপার। কিন্তু তারও তো একটা মাত্রা আছে। সুতরাং ছোটাছুটি, লাফ ঝাঁপ।

চার আঙুল জায়গা যারা দিতে রাজী ছিলনা, উঠে পড়েছি দেখে তা-ও দিল। উল্টে কোমরটাও ধরলো একজন। পাছে ছিটকে যাই। আমি বললাম, থ্যাঙ্ক ইউ দাদা। থ্যাঙ্ক ইউ। ভদ্রলোক খিঁচিয়ে উঠলেন, থ্যাঙ্কস্ পরে দেবেন। আগে ঠিক হয়ে দাঁড়ান। নাহলে আমি পড়ে যাবো।

পাশের জন বলে, এভাবে ওঠেন কেন? কোন্ দিন নিজেও মরবেন, সঙ্গে আরো দু'একটা—। আমি কিছু বললাম না। মিছি-মিছি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমার দেখতা এমন ঘটনা তো কদিন আগেই ঘটেছে।

বছর পঁচিশ হবে হয়ত বয়েস, রড ফসকে একজনের ঘাড় ধরে ঝুলে পড়ল। ফলে দুজনেই, একসঙ্গে। গাড়ীর ভেতর শুধু একটা হৈ-হৈ। তারপরই—। কি যে হ'ল, কেউ একবার দেখবারও সুযোগ পেলুম না।

আমার এই চুপচাপ সহযোগিতায় কাজ হ'ল কিছুটা আশপাশের কয়েকজন সামান্য নড়ে-চড়ে আমাকে দুটো পা রাখার মত জায়গা ক'রে দিলেন। আমি আবার ধন্যবাদ দিয়ে ফেললুম। কাকে দিলুম? বোধহয় সবাই-কেই। একজন রসিকতা ক'রেই বললেন, দাদা কি রিসেন্টলি ফরেন ট্যুর করেছেন?

আমার, কেন জানিনা, এ সময় কলার-ফাটা জামা আর তাপ্পি দেয়া স্যাণ্ডেলের কথা মনে পড়লো। তোবড়ানো গালে শোনপাপড়ি দাড়ির জন্যে লজ্জা হল। ইংরেজীটা ভালো ক'রে শিখতে না পারার একটা আফশোষ তো আছেই মনের মধ্যে। বিউলির ডাল আর খোসাশুদ্ধু আলুর তরকারি দিয়ে যে ক'মুঠো ভাত খেয়েছি, তাও তো মাটিতে বসেই। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে ঢুকে কি ঝামেলাতেই না পড়েছিলাম একবার। কাঁটা-চামচে ধরতেই জানতুম না। চাপা গালাগাল দিয়ে শিখিয়ে দিয়েছিল মন্মথ। আমি একটা মুচকি হাসি ভাসিয়ে দিলাম ঠোঁটের কোণে। বললাম, বেশ বলেছেন। রসিকতা আমার ভালোই লাগে। ভদ্রলোক বললেন, বটে। তারপর হা-হা হাসলেন।

আমার আবার ঘুম পাচ্ছিল। ফুরফুরে হাওয়া লাগছে গায়ে। যেটুকু ঘাম ছিল শুকিয়ে গেছে। কিন্তু দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছি। ঘুমুলে ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে যাবে। তবে, কাণ্ড একটা শেষ মশ ঘটলোই।

শরীরটা কেমন করছে, বলতে বলতে এক ভদ্র-মহিলা নেতিয়ে পড়লেন ভীড়ের মধ্যে। এরকম অবস্থায় চলন্ত গাড়ীতে কি-কি ঘটতে পারে, তা সকলেই জানেন। কিন্তু যে জিনিষটা জানেন না। সেইটেই বলি। সেটা আমার কথা। আপনার জানার কথা নয়। করলুম কি জানেন, ভীড়টা যেই একটু নড়ে-চড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সেঁদিয়ে দিলুম ভেতরে। মোটামুটি একটা সেফ্ জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালুম। পিঠ ঠেকাবার দেয়াল পেলুম পেছনে। হাওয়া খাবার পাখা পেলুম মাথায়। ওঃ, একেবারে রাজসুখ! চোখদুটো বুজে

ফেলার আগে দেখে নিলুম প'ড়ে যাবার কোনো চান্স আছে কিনা। ব্যাস্।

কিন্তু না। ব্যাস হ'লনা। দু'মিনিট কেটেছে কি কাটেনি, কানের কাছে বিস্ফোরণ, একিরে বাবা—ঘোড়া এল কোত্থেকে!

ঘোড়া ঢুকে পড়ল নাকি? ফট ক'রে চোখ মেললুম আর মেলেই দেখি কি—সবাই, হ্যাঁ প্রায় সব্বাই হাসছে। আমার দিকে তাকিয়ে। লজ্জা পেলুম। কেননা ব্যাপারটা বুঝতে আমার একটুও দেরী হ'ল না। আমি জানতুম, দাঁড়ানো-ঘুম একমাত্র ঘোড়াতেই ঘুমোতে পারে। ফলে—

চোখে চোখ রাখতে পারলুম না। ঘাড় ঘুরিয়ে ভেতরের দিকে তাকালুম। আর তাতেই আমার ঘুমের নেশা ছুটে গেল। একরাশ বসা-ঘুমের দিকে চোখ পড়ল আমার। কে কার কাঁধে, কে কার ঘাড়ে, কে কার কোলে ঢুলে পড়ছে হিসেব করা দায়। টপটপ করে নাল পড়ছে দেখলুম একজনের। হুঁশ নেই। কেউ এক কোয়ার্টার জেগে, তিন কোয়ার্টার ঘুমে। আবার কেউ এক কোয়ার্টার ঘুমে তো তিন কোয়ার্টার জেগে। অংশগতভাবে ঘুমে- জাগরণে কোনো সাম্যবাদ নেই। ফলে শ্রেণী-সংগ্রাম। চলবে না। চলবে না।

আপনি হয়তো ভাবছেন, এটা জাগরণের সংগ্রাম। ঘুমন্ত সকলকে জাগাবার জন্যেই—। আজ্ঞে না। সবাই চাইছে একটু নিরুপদ্রপ যাত্রা। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম। সামান্য স্বস্তি। পারলে ছটাক খানেক ঘুমও। বাঙালী ঘুমোতে চাইছে। কিন্তু পারছেনা। একজনের ঘুম অপরজনকে জাগিয়ে রাখছে। সে জেগে থাকতে থাকতে অপরের ঘুমকে ঈর্ষা করছে। ফলে স্লোগান, চলবেনা—চলবেনা। আর সেই চিৎকার কিছু মানুষকে ক্লান্ত করছে। আর আস্তে আস্তে ঢলে পড়ছে ঘুমে।

কি বলছেন? জাগন্ত মানুষ ঘুমন্ত মানুষকে ঈর্ষা করেনা? তা—না করলেই ভালো। ভুল হলে থাকলে উইথড্র ক'রে নিচ্ছি। কিন্তু একথাটা তো মানবেন, যে ঘুমন্ত মানুষ জাগন্ত মানুষের জেগে থাকায় ব্যাঘাত—সৃষ্টি করছে। আর তাই এই প্রতিবাদ। কিন্তু এভাবে প্রতিবাদ কতদিন চলবে? ঘুমের সংক্রমণ ঘটতে কতক্ষণ! হাজার হোক প্রতিবাদ তো ঘুরে ফিরে সেই স্বস্তির জন্যে, বিশ্রামের জন্যে। আর সেই বিশ্রাম যদি শেষমেষ ঘুম নিয়ে আসে, তাহলে আমাদের আর কি বলার আছে! অবশ্য এ'কথাটা ঠিকই, ক্লান্তির ঘুম আর শান্তির ঘুম এক কথা নয়। তফাৎ আছে। আর সেটা বোঝার ফলেই আজকের এই সংগ্রাম। চলছে—চলবে।

তা চলছে চলুক। সংগ্রাম চলুক। সংগ্রাম কে না চায়, কে না করে। সংগ্রাম অবশ্যই দরকার। আর দরকারী জিনিব আমিও ছাড়িনা। ক'র ফেলি। যেমন করলুম অফিসে ঢুকে বড়বাবুকে কাত করতে গিয়ে। আপনি হয়ত বলবেন, এ সংগ্রাম সে সংগ্রাম নয়। চাঁদের মাটিতে মানুষ হামা দেবার পর, বেশকিছু ধম্মোগুরুও বলেছিল, 'ই চাঁদ সি চাঁদ নয়'। অমন হ'য়েই থাকে। ওসব কথায় আমি কিছু মনে করিনা। আর খামোকা মনে করতে যাবোই বা কেন। সংগ্রামী মানুষ—সংগ্রামের কথা ছাড়া কিছু ভাবিনা, কিছু বলিনা, কিছু শুনিনা। সংগ্রামের বাইরে কিছু নয়। কিছু হয়না। কিন্তু ভেতরে হয়। অনেক কিছুই হয়। যেমন হ'ল আজ অফিসে।

অফিসে ঢুকতেই বড়বাবুর মুখোমুখি। ভয়ংকর ঘোড়েল লোক। চোখেমুখে কথা। তাই উনি কিছু বলার আগে ব'লে উঠলুম, ওঃ কি ভয়ংকর কাণ্ডটাই না আজ ঘটে যাচ্ছিল।

বড়বাবুর দু'চোখ হেসে উঠল। বললেন, ঘটে যাচ্ছিল বলছো কেন পরিতোষ, ঘটে গেছে।

আমি থমকে গেলুম। মিটি মিটি হেসে বড়বাবু বললেন' এ মাসে আরো একটা সি. এল কাটা পড়লো তোমার। ছুটি হয়ে গেল।

ছে:, তুচ্ছ সি, এল,-এর কথা থোড়াই বলছি আমি। আজ যে গোটা লাইফটাই কাটা পড়ছিল বড়বাবু। জন্মের মত ছুটি হ'য়ে যাচ্ছিল। আমি বললুম।

বড়বাবু এবার নড়ে-চড়ে বসলেন। কি রকম ?

আর কি রকম। ট্রেনের ড্রাইভারই তো ঘুমিয়ে পড়েছিল।

বলো কি। তারপর ?

তার আব পর কি। পাশে একজন ছিল, তাই—

সত্যি।

আর বলছি কি তবে। ড্রাইভার ঘুমে নেতিয়ে পড়তেই সে জেগে ওঠে। তাই রক্ষে। তা না হলে—

বড়বাবু উদাস হয়ে গেলেন এ সময়। দার্শনিকের মত গলা করে বললেন সত্যিই—এদেশ বলেই এসব সম্ভব। খানিক চুপ করে থেকে বললেন, এমন ঘুমন্ত রোজগার আর কোন দেশে পাবে ? আর জাগন্ত বেকারি ? আমি বলে ফেললুম। বড়বাবু বললেন, হ্যাঁ। তাও বৈকি। আবার খানিকটা চুপ। আমি ও কি বলবো. বানিয়ে উঠ ত পারলুম না।

তারপর বড়বাবুই বললেন, জানলে পরিতোষ একটা জাগরণ চাই। আবার একটা নব-জাগরণ দরকার।

আমি আবার কথা খুঁজে পেলুম। বুঝলুম বাঙালী জাগতে চাইছে। বললুম, সে তো বড় ভয়ানক ব্যাপার বড়বাবু! একসঙ্গে জেগে উঠতে গেলে তে আগে একবার একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়া দরকার। বড়বাবু বললেন, তাই হবে। এসব তারই লক্ষণ। আমি বললুম, তাহলে তো আমার সি-এলটা বাঁচানো দরকার। কাটা সি-এলটা—

বড়বাবু বললেন, জুড়ে দেবো।

থ্যাঙ্ক ইউ, বড় বাবু। থ্যাঙ্ক ইউ। বলে ফেললুম আমি।

বড়বাবু বললেন, থ্যাঙ্কস্ পরে দিও। আগে চেয়ারে গিয়ে বোসো।

আমি আবার ধন্যবাদ দিয়ে ফেললুম। কাকে দিলুম ? এবার বোধহয় নিজেকেও। তারপর গুটিগুটি চেয়ারে তখন সবে বসেছি কি বসিনি, এক হ্যাঁচকা। বলিহারি ঘুম বাবা। এত ডাকছি তখন থেকে। বলি উঠবে তো, নাকি—

'পৃথিবীর অসুখ' শেষ সত্য নয়

জীবেন্দু রায়

(১)

'সরল দর্পণে জড়' এই নামকরণের মধ্যে দিয়ে শীতল চৌধুরী বোধহয় তাঁর হতাশা আর স্বপ্নভঙ্গের, যন্ত্রণা আর পাণ্ডুরতার ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন। সেই সুবাদে বিষণ্ণতার মাত্রাই তাঁর ভারী। কবিতাগুলি খণ্ড রূপে উজ্জ্বল আকর্ষণীয়। যেখানে বিষণ্ণতা রয়েছে সেখানে তা এসেছে ভাবগত আকারে। শীতলের কবিতার কথা শরীরকে তা পীড়িত করেনি। তাঁর কবিতার নিয়মিত পাঠক হিসেবে আমার সবিশেষ অনুরোধ এই তরুণ কবি যেন মনের দিক থেকে দ্রুত বৃদ্ধ না হয়ে যান। জগতের নঞর্থক দিকের বিপুল আধিক্যে যে বার্ধক্য বাস্তবতই আমাদের হৃদয়ে শরীরে অকালে নেমে আসে। দুঃখ তো নির্মম সত্য, কিন্তু তাকে যদি অন্তত: ভাবগত ভাবেও পরাস্ত করার স্বপ্ন না দেখি তবে সব শিল্প সাধনাই এক অর্থে খণ্ডিত—অপূর্ণ।

যাক। এই কাব্যগ্রন্থের প্রায় সব কবিতাই আমি ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে পড়েছি। সুতরাং আমার কাছে এটি অবশ্যই সংকলন। যাঁরা সে সুযোগ পাননি তাঁদের কাছে নতুন কাব্যগ্রন্থ। নতুনই বটে। ঝকঝকে মুদ্রণ পারিপাট্য দেখবার। সেই সঙ্গে দামী শাদা কাগজ। এইসব বৈষয়িক নিতান্ত বস্তুগত দিকগুলি মোটেই উপেক্ষনীয় নয়।

কাব্যগ্রন্থে তিনটি ভাগ। প্রথম খণ্ডে বাইশটি, দ্বিতীয় খণ্ডে দশ এবং তৃতীয় খণ্ডে দশ—কবিতার মোট সংখ্যা হলো বিয়াল্লিশ। তিনটি আপাত দৃষ্ট বিভাজন রয়েছে ঠিক, কিন্তু ভাবগত সাযুজ্যতায় তাতে কোনো অন্তরায় হয়না। সে ঐক্য সূত্র অখণ্ড। কয়েকটি কবিতা ধরে সামান্য আলোচনা করছি। যেমন—'মায়ের উদ্দেশ্যে' কবিতাটি। ছোটো কবিতা। চমক এবং চমৎকারিত্ব দুইই রয়েছে। অন্তর্নীল হয়ে রয়েছে সন্তান হিসেবে এক ধরণের বেদনাবোধ। মা এতো বদলে গেলেন কেন? কেন কবির 'বিয়ের পরই' মা স্বর্গে যেতে চাইছেন'! স্বর্গের ছবি এতো বড় কেন? কবি কি অন্তরে অন্তরে সেই স্বপ্নেই বিভোর হয়ে থাকতে চান? চারদিকে এত ব্যথা বলে! 'ব্যথা' বললুম এই কারণে যে পরের 'পৃথিবী' কবিতাটিতে এক এলিয়টিয় ধ্বংসতার পরিব্যপ্ত আবহ। তবে আশার কথা: সেই ক্ষয়রোগে বেঁচে আছে।

একজন কবি—নতুন প্রজন্মের অপেক্ষায়; তার চোখে মুখে / অনন্ত ক্রোধ। / তিনি কোন মন্ত্রোচ্চারণ করেন না / তিনি কঠোর, রুক্ষ বদলা নিতে সর্বদা কান পেতে বসে আছেন / নিষিদ্ধ ঈশ্বর পুরুষের জন্য।

প্রশ্ন এই ক্ষয় রোগগ্রস্ত কবিই কি আমাদের কবি! সন্দেহ হয়। কেননা পরের কবিতাতেই যে 'আমিত্ব'কে শীতল আবিষ্কার করেন।

'তার শরীরে বসন্তের গুটি, তাকে চেনাই যায়না / হাড় পাঁজরা জিরজিরে ফ্যাকাসে তার মুখ / দু'চোখে কত রাত্রির যন্ত্রণা' / আর— 'মন কেমন করা বিষাদের চাদর তার গায়ে / মাথায় কুলকাঁটার বালিশ'।

'তালা' কবিতাতে এই আনুষঙ্গই—

'এখানে পথের বাঁকে মৃত্যুহিম জল;
নওল পাখির ডানা অসুখ ছড়ায়'।

দুঃখ আর বেদনার সঙ্গে যুক্ত হয় ভয় ও বীভৎসতার অনুসঙ্গ, শব্দচিত্র। তার সঙ্গে যোগ রয়েছে মূল কাব্যভাবের। 'কাছিম' কবিতায় যেমন রয়েছে 'হাড়গিলে রাত্রি' এর ইমেজ। 'চিতা' কবিতায় যেমন 'উইপোকা', 'ঠাণ্ডা অসুখ' বা 'পালক' কবিতায় 'শামুকের রাত'। 'রোবট পৃথিবী' থেকে সামান্য কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করছি, এই সূত্রে এর সঙ্গে সাযুজ্যতা বোধে:

চারপাশে ফুল উড়ছে। দাঁড়িয়ে আছি শূন্যে। শূন্য

/ থেকে ভাবছি : কোনদিকে যাবো ? কোনদিকে ? /নৈঋতে না ঈশানে ?

সেই শূন্যতার চিত্র 'সাপ' কবিতাতেও। 'শামুক রাত' যেমন কবিকে আষ্টে পৃষ্টে বাঁধে এ সাপও তেমনি 'ফোঁস ফোঁস করে / দূষিত করে চারপাশের বাতাস'। আর— 'সাপটার অস্তিত্ব ঘিরে আমি ক্রমশ একটা বিন্দু হতে / হতে মিলিয়ে যাই। শুধুই শূন্যতা—শূন্যতা গিলে / খায় পুণ্যের সব জ্যোতি রঙ, নৈবেদ্যের অলৌকিক / মায়াফুল'।

'ভালোবাসার পর্দা' এবং 'পৃথিবীর অসুখ' চমৎকার কবিতা। অন্যের কথা জানিনা। সাধারণ পাঠক হিসেবেই এ দুটি কবিতা পাঠে আমি আনন্দ আপ্লুত। সুযোগ পেলে এর স্বতন্ত্র আলোচনার পূর্ণ ইচ্ছা রইল।

(২)

বিসন্নতার পাশে রয়েছে দুঃসহ সময় আর জীবনকে অক্লেশে হেঁটে পার হবার উচ্চারিত অনুচ্চারিত প্রতিজ্ঞা সমন্বিত কিছু কবিতা, এরকম কবিতার মধ্যে রয়েছে 'সন্ন্যাস' চতুর্দশপদী'২, 'চোখ', 'শিল্পী', 'নগর থেকে কবি', 'তারকেশ্বর' প্রভৃতি। দু একটি দৃষ্টান্ত দিই। যেমন চোখ কবিতাটি। প্রথম স্তবকে রয়েছে :

'পাখির চোখ আঁকতে আঁকতে পেরিয়ে যাই ফণীমনসার / বন. জঙলী রাতের অন্ধকার। পাখির চোখ আঁকতে আঁকতে উড়িয়ে দিই নীল দিগন্তের ধূসর স্মৃতির স্তব / কঠিন অসুখ …।
পাখির চোখ আঁকতে আঁকতে আমি হেঁটে যাই সমুদ্রের দিকে—এক নিগূঢ় রহস্যের মুখোমুখি। কলিং বেল টিপি ঈশ্বর বাড়ির দরজায়।

এই একই মনোধর্মে তিনি কবি রমেন্দ্রকুমারকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

'ঝড়ো হাওয়ায় চোখ তাঁর কাঁপে না / ঝাউবনে বাঘ দেখে ধরে না পিস্তল / মৃত্যুকে চুম্বন করে শুধু / কামহীন বুনে যায় পৃথিবীর আদি অন্ত / অমলিন পোশাক।'

একটু সতর্ক পাঠক যদি এর সঙ্গে 'নগর থেকে কবি' কবিতাটি মিলিয়ে নেন তাহলে দেখবেন ছবিটা স্বতন্ত্র বটে কিন্তু অন্তর্প্রকৃতিতে একই কথা। তিনি বলেছেন। বিশেষ করে শেষ চারটি পঙ্‌ক্তি :

নগর থেকে বেরিয়ে এসেছেন কবি / হাতে আগুন-জল, খল-নুড়ি, পাথর / চোখের মণিতে / সাম্ ঋক্ মন্ত্র।

কবির টুপি, চশমা, হাতের ছড়ি, শখ-শৌখিনতা, ইচ্ছে প্রশ্ন যতকিছুই লুপ্ত হোকনা শেষ পর্যন্ত এইসব 'সাম-ঋক-মন্ত্র'ই তাঁকে বাঁচাতে আশ্বস্ত করে, তাঁর পাঠককেও।

(৩)

কিছু চমৎকার টাটকা বাক সম্ভারের উল্লেখ করি। শব্দ নির্মাণে কবি যথেষ্ট শ্রমের পরিচয় দিয়েছেন। সামান্য কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। জলজলতার মূল রোম ; ঝিনুকের শরীরেও বিপ্লব; পবিত্র রুমাল; কাফ হাউসের চামচে বাজানো আড্ডা ; নওল দেবদূত, দশ আঙুলে বাজাবেন সভ্যতার ব্যঙ্গ, প্রজন্মের যাকু ইত্যাদি।

শব্দে যেখানে শীতল রঙ ও প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন সেখানে জীবনানন্দের প্রভাব বেশ প্রত্যক্ষ। নওল নতজানু খল শব্দগুলির পুনরাবৃত্তি প্রয়োগ রয়েছে। কবি হয়ত শব্দগুলির প্রতি একটু বেশী মমতাময়। তাঁর ভাষা অত্যন্ত সহজ। এ কথা বলছিনা যে সহজ ভাষা শ্রেষ্ঠ কবিতার অভিজ্ঞান। কিন্তু সহজে যে স্বতঃ-স্ফূর্ততার অবকাশ রয়েছে অন্তত আবেগ বা বক্তব্য বিষয়ে একথা অস্বীকার করি কি করে? আমরা চাই শীতল সহজ কবিতাই লিখুন। সহজ মানে জটিলতার অনুপস্থিতি। বোধ হীনতার প্রকাশ বোঝায়না। বোঝায় এগুলির সঙ্গে সহজ এবং শক্তভাবে মোকাবিলার ক্ষমতা। শীতল তা পারবেন। তাঁর কবিতাতেই সে সামর্থের প্রকাশ অতিপ্রত্যক্ষ। দর্পণে জঙের সত্যতা আপেক্ষিক ও সাময়ীক। তা স্থায়ী নয়। সরলতাই শেষত জয়ী। এ সরলতার অর্থ পূর্ণ জীবনের প্রতিমা।

সরল দর্পণে জঙ্, শীতল চৌধুরী, গোধূলি প্রকাশনী, নতুন পাড়া, চন্দননগর।

শারদ সাহিত্য সমীক্ষা

গোধূলি মন-এর প্রতিবেদন
(২য় পর্ব)

বসিরহাট থেকে প্রকাশিত এবং পান্নালাল মল্লিক সম্পাদিত 'স্বদেশ' বেশ ছিমছাম হলেও ছাপা, প্রচ্ছদ, মলাট সবকিছুতেই ঝকঝকে। ভেতরের বস্তুগুলো আর একটু উন্নতমানের হলে বাজার মাতিয়ে দিত। আদিবাসী ও গ্রামীণ সমস্যা সম্পর্কিত কয়েকটি লেখা মন্দ নয়। পান্নালাল মল্লিকের নন্দলাল ও পিকাসো সম্পর্কিত আলোচনাটি এক সংখ্যায় সমাপ্ত হলেই ভালো হত। অনিল ঘোষের গল্প বলার হাত বেশ বলিষ্ঠ। তবে গল্পের পটভূমি নতুন নয়। কবিতাগুলিতে আন্তরিকতা যা আছে প্রতিবাদের কথা তার চেয়েও বেশী। আরো কিছু উন্নতমানের লেখা ভবিষ্যতে আশা কোরব।

হাওড়া থেকে এসেছে চারটি পত্রিকা। তার মধ্যে আকার-আয়তনে বেশ স্থূল সাইজের পত্রিকা 'মাধ্যম'। সম্পাদনা করেছেন কাজল সেন। তবে পত্রিকাটির ভেতরে মন কেড়ে নেওয়ার মত তেমন কিছু নজরে এল না। ডঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্তের 'রামকৃষ্ণের মানবতাবাদ' কি মানবতাবাদের নতুন কোনো পরিচয় তুলে ধরে না রামকৃষ্ণকে নতুন করে চিনিয়ে দেয়—কোন্‌টি? শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাটি বেশ ভাল লাগল। গল্পগুলি নতুন কোনো পরিচয় নিয়ে উপস্থিত হয় না। উপন্যাস দুটিও অনেকটা সেই দোষেই দুষ্ট। শঙ্করী প্রসাদ বসুর 'ফ্রাঙ্ক ওরেল' আর মহিলা মহলে কবিতা সিংহ প্রমুখের লেখা মন্দ নয়। চলচ্চিত্র জগতের তথ্যগুলিই শুধু সাজান হয়েছে, নতুন কথা কিছু এতে নেই। পত্রিকাটির আদ্যন্ত পরিকল্পনা পাঠকের মনকে ভুলিয়ে রাখার মত মনে হয়।

রেবা ঘোষ সম্পাদিত 'অনির্বাণ' মোটামুটি ভাল কাগজ। পত্রিকাটির দুটি বিভাগ, একটি কিশোরদের অপরটি পরিণত পাঠকদের জন্য। নেরুদার একটি কবিতা অনুবাদ করেছেন অসিত সরকার। প্রবন্ধগুলির প্রসঙ্গ উত্তম সন্দেহ নেই, কিন্তু নতুন কোনো দৃষ্টিকোণ উন্মোচিত হল না, এটাই আক্ষেপের। সৈয়দ জগলুল আবেদীন-এর আন্তন চেকভের নিঃসঙ্গ প্রেম' আমাদের জানা ব্যাপার হলেও পড়তে ভালই লাগে। 'বাংলাদেশের পাতা'কে আলাদা করা কেন? কবিতা ও গল্পগুলি মনের মধ্যে স্থায়ী কিছু রেখে গেল না। কিশোরদের পাতাটি সুখপাঠ্য, তবে শুধু ছড়া ভিন্ন আরো কিছু বিষয় থাকলে ভাল হত।

মোহনলাল কাপড়ি সম্পাদিত 'আলেয়া'র উল্লেখযোগ্য লেখা বি দে'র 'বস্তুবাদী ভারত' আর পরিমল ঘোষের 'সুব্রহ্মণ্য ভারতী'। পত্রিকাটি এরকম দুটি প্রবন্ধ নির্বাচনের পিছনে যে সিরিয়স মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, গল্প-কবিতা নির্বাচনের ব্যাপারে কিন্তু সেরকম মনে হল না। তবে সুনীল হাজরা, অজিত বাইরি প্রমুখের কবিতা ভালো লাগে। শ্রীকান্ত পাল আর তরুণ তপন করের কবিতা ছোট হলেই বেশী কমপ্যাক্ট হোত।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মণিমুক্তা' প্রকৃত অর্থেই শিশুদের কাগজ। লেখা ও রেখা সবই শিশুদের উপযোগী। তবে শেষ পর্যন্ত হয়ত কিশোররাই এর পাঠক হয়ে থাকে। পত্রিকাটির আগামী সংখ্যায় আরও কিছু নতুন প্রসঙ্গ পেতে উৎসুক। কেবল ছড়া আর গল্প ছাড়া আর কি কিছু দেওয়া যায়না শিশুদের? তবে বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনা আদ্যন্ত প্রশংসার দাবী রাখে।

হুগলী থেকে আসা আটটি পত্রিকার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য বাঁশবেড়িয়া থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য সেতু' এ সংখ্যাটি শুধুমাত্র বিশিষ্ট সাহিত্যিক সমরেশ বসু

সম্পর্কিত লেখানিয়ে। বহুদিন বাদে সাহিত্যসেতু এরকম একটি উৎকৃষ্ট সংখ্যা পাঠককে উপহার দিল। এতে কালকূট ও সমরেশ বসুর উপন্যাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন আনন্দ বাগচি, প্রদ্যুম্ন মিত্র, বাঁধন সেনগুপ্ত, সমীর মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা বসু, পার্থপ্রতিম বন্দোপাধ্যায়, সত্যজিৎ চৌধুরি, অজয় মিশ্র প্রমুখ। সবদিক থেকেই সংকলনটি লেখক সমরেশকে বিশেষ ভাবে উপস্থিত করেছে।

হুগলীর আর একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা ভদ্রকালি থেকে প্রকাশিত 'বর্তমান'। বয়সে নবীন হলেও পত্রিকাটি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট মনস্কতার পরিচয় দিয়েছে। গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ সবই শাসানো ভঙ্গীর। দীর্ঘ একটি কবিতা লিখেছেন অরুন কুমার চক্রবর্ত্তী। গৌর বৈরাগীর গল্পটি বেশ তাজা ধরনের। সম্মোহন চট্টোপাধ্যায়, সমর বন্দোপাধ্যায় প্রমুখের প্রবন্ধ আর বিনয় মজুমদার, বীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায়, সনৎ মান্না, অমল দাসের কবিতা পাঠককে নয়া ভাবনার খোরাক জোগাবে। পত্রিকাটির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত আর একটি ভাল পত্রিকা 'কোরক'। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ সবই বেশ ঝরঝরে। তবে গল্পের দিকে আর একটু নজর দিলে ভাল হয়। প্রবন্ধ দুটি সুলিখিত। তবে নিলয় সরকারেয় প্রবন্ধটির মূলবক্তব্য যথেষ্ট প্রথাসিদ্ধ নয়। সনৎ মান্না', শীতল চৌধুরী, সনৎ দে, দীপক রায়ের কবিতা বেশ ভাল লাগল।

কোন্নগর থেকে প্রকাশিত, মায়া দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'চারন'-এর শারদ সংকলনই প্রথম সংখ্যা হলেও আবির্ভাবেই এটি যথেষ্ট মনস্কতার পরিচয় দিয়েছে। প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ইত্যাদি একেবারে প্রথম শ্রেণীর না হলেও সিরিয়স মনোভাবের পরিচয় আছে। বেশ ঝরঝরে আর ভিন্ন স্বাদের একটি ছড়া লিখেছেন সনৎ মান্না। সুখেন্দু ভট্টাচার্য্য শেষ পর্যন্ত গল্প বললেন না কবিতাই লিখলেন সেটা স্পষ্ট হলনা। তবে মনোরঞ্জন হাজরা আর চঞ্চল রায়ের প্রবন্ধ দুটি কিছু নতুন চিন্তার খোরাক জোগাবে।

একটি ঘোষণা :

কাগজের দাম বেড়েছে হু হু করে, ছাপার হার বেড়েছে—অথচ এতদিন আমরা সাধারণ সংখ্যা অথবা গ্রাহক-চাঁদা বাড়িয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালী পাঠকের ওপর চাপ সৃষ্টি করিনি। কিন্তু অর্থনৈতিক চাপে নিরুপায় আমরা আগামী জানুয়ারী ১৯৮৪ থেকে বার্ষিক গ্রাহক-চাঁদা সডাক পণের টাকা ও সাধারণ সংখ্যা দেড়টাকা করছি। আশাকরি আমরা আমাদের প্রিয় গ্রাহক-পাঠকদের সহযোগিতা পাবো।

সংবাদ ঃ

॥ সারা ভারত ছোট ও মাঝারি সংবাদ পত্র সমিতির পূর্বাঞ্চলীয় অধিবেশন ॥

২৭শে ডিসেম্বর কোলকাতার গ্রাণ্ড হোটেলের ভাইসরয় হলে অনুষ্ঠিত হোল সারা ভারত ছোট ও মাঝারি সংবাদ পত্রের পূর্বাঞ্চলীয় অধিবেশন। অনুষ্ঠানের কার্যকরী সভাপতি 'জনসংসার' সংবাদ পত্রের প্রধান সম্পাদক শ্রীগীতেশ শর্মা অধিবেশনের সূচনা করে বলেন—বড় সংবাদ পত্রে যে সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়না, ছোট কাগজে তা গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বড় সংবাদপত্রের নিরীক্ষা মিথ্যা প্রমাণিত করে ছোট পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সাম্প্রতিক প: বঙ্গের মধ্যবর্ত্তী নির্বাচন সম্পর্কীয় ফলাফল সেই সত্যই প্রমাণ করেছে।

সমিতির সভাপতি শ্রীপ্রেমচাঁদ ভার্মা তাঁর ভাষণে বলেন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাঁর তথা ছোট মাঝারী সংবাদপত্র সমিতির বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলে আমরা সমস্ত সময়েই তীব্র প্রতিবাদ জানাবো।

পূর্বাঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীরাম কারণ পোদ্দার তাঁর ভাষণে ছাপার জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া নিউজ প্রিন্ট প্রসঙ্গে স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের গাফিলতিকে দায়ী করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির ভাষণে কেন্দ্রিয় তথ্যমন্ত্রী শ্রীএইচ. কে. এল ভগৎ বলেন— পূর্বাঞ্চলে কংগ্রেসের ৭৭তম অধিবেশন চলছে। এই সময় এখানে এসে পুরানো দিনের অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্ব। ছোট সংবাদ পত্রের মাধ্যমে সেদিনের মানুষকে তাঁরা জাগিয়ে তুলেছিলেন। সেই সমস্ত ছোট সংবাদ পত্র আজ বড় সংবাদ পত্রে রূপান্তরিত। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীভগৎ কিছু কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন সংবাদ পত্রের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে সংবাদ মারফৎ সমাজের ক্ষতি হয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা লাগতে পারে—সে ধরনের সংবাদ প্রকাশ করা উচিত নয়। শ্রীভগৎ আরও বলেন—বড় সংবাদপত্র, বেতার ও দূরদর্শনের প্রবণতা সহর কেন্দ্রিক। যদিও ছোট পত্রিকাই গ্রামীণ সংবাদ প্রাধান্ত দিয়ে প্রকাশ করে থাকে, তিনি আরও বেশী গ্রাম কেন্দ্রিক সংবাদ ও বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত গ্রামীণ মানুষের অনুষ্ঠানাদির সংবাদ পরিবেশনের আবেদন করেন। তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, দূরদর্শন ও বেতারের প্রসার হওয়া সত্ত্বেও সমাজে সংবাদ পত্রের আবেদন কখনই কমবেনা।

শ্রীভগৎ পাঁচটা নাগাদ তাঁর ভাষণ শেষ করে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে চলে যাবার পর শুরু হোল পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ছোট ও মাঝারী সংবাদপত্রের সম্পাদকদের বিভিন্ন অভিযোগ সম্পর্কীয় আলোচনা। 'লাইট অফ্ আন্দামান' কাগজের সম্পাদক শ্রীপরশুরাম অভিযোগ করেন ৫০০ কেজি কাগজের দাম বাবদ পুরো টাকা জমা দেওয়া সত্ত্বেও তিনি এস. টি. সি. মারফৎ মাত্র ৩০০ কেজি কাগজ পেয়েছেন। তিনি আরও বলেন আন্দামানের মতো দ্বীপে সংবাদ সংগ্রহ খুবই কষ্টকর। সরকার কোন সহযোগিতা করেন না, সরকার এবং সংবাদপত্র সমিতির সহযোগিতা পেলে তিনি আরও ভালকরে সংবাদপত্রটি প্রকাশ করতে পারেন। বিহারের 'অনুগামিনী' সম্পাদক তাঁর ভাষণে বলেন—বড় কাগজের সঙ্গে মাঝারী ও ছোট সংবাদপত্রকেও বিহার সরকার সমানহারেই বিজ্ঞাপণ দিয়ে থাকেন।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ সম্পাদক শ্রীতালুকদার তাঁর বক্তব্যে কেন্দ্রিয় সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, একদিকে ডি. এ. ভি.

-শি. বিজ্ঞাপনের হার কমাচ্ছে, অন্যদিকে পালেকার কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংবাদপত্রের কর্মীদের বর্দ্ধিত হারে বেতন দেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করছেন। এর ফলে মাঝারী সংবাদপত্রের নাভিশ্বাস উঠছে।

O **শ্রীরামপুর পুষ্পমেলা**

১০ই জানুয়ারী থেকে ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮৪ সকাল ৯টা থেকে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে শ্রীরামপুর পুষ্পমেলা, শ্রীরামপুরের জে, এন, লাহিড়ী রোডের শ্রীরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে। মেলায় দেশ বিদেশের ফুল, বাহারে পাতা, ক্যাকটাস, অর্কিড ডালসহ ফুল (কাট ফ্লাওয়ার), ইকাবানা (জাপানী প্রথায় পুষ্পসজ্জা) প্রভৃতি থাকবে।

ভদ্রেশ্বরে জাতীয় খো-খো আসর

ভদ্রেশ্বরের ইউনাইটেড্ এ্যাথেলেটিক ক্লাবের প্রশংসনীয় ব্যবস্থাপনায় চাঁপদানি পৌর সভার মাঠে ১৭ই থেকে ২১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হোল ২১ তম জাতীয় খো-খো প্রতিযোগিতা। খো-খো খেলার মতো স্বল্প পরিচিত খেলা ইউনাইটেড এ্যাথেলেটিক ক্লাব সাধারণ মানুষের কাছে কতটা জনপ্রিয় ক[রে] তুলেছিলেন খেলার ক'দিন, বিশেষ ক[রে] ফাইনাল দিনে মাঠের অবস্থা দেখে এবং আকাশবাণীর ভাষ্যকারের প্রশংসা বাণীতেই সে কথা ধরা পড়েছি[ল]। উদ্বোধনের দিন পঃ বঙ্গের রাজ্যপাল [ও] সমাপ্তির দিন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি ব[সুর] থাকার কথা ছিল। কিন্তু তাঁদের অনুপস্থিতি ঢাকা পড়ে গেছে উদ্বোধনী [ও] সমাপ্তি অনুষ্ঠানের বর্ণোজ্জ্বল শোভা যাত্রায়,ছোটদের নাচে-গানে। শোভা যাত্রায় প্রথম হয়েছে মণিপুর। পু[রুষ] বিভাগে বিজয়ী হয়েছে মহার[াষ্ট্র] মহিলা বিভাগেও। পুরুষ বিভাগে [দ্বিতীয়] স্থান পেয়েছে কর্ণাটক, মহিলা বিভাগে মধ্যভারত। উদ্যোক্তা পশ্চিমবঙ্গ মহিলা বিভাগে ৩য় স্থান অধিকার করেছে।

বিশদফাতে
বলছে লোক
পরিবার সব
ছোট হোক

davp-83/31D

MEMBER { All India Small & Medium News Paper Association, Delhi.
Little Magazine Editors Association, Calcutta.
Hooghly Dist. Patra Patrika Somity, Hooghly. }

GODHULIMONE N.P. Regd. No. RN. 27214/75 Dec. '83 (পৌষ '৯০)
Vol. 25, No. 12 Postal Regd No. Hys-14 Price—Rupee One only

গোধূলি-মন এর আবু সয়ীদ আইয়ুব সংখ্যা
প্রকাশিত হবে জানুয়ারী '৮৪ তে

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে যে দু'জন ধাত্রীর সহযোগিতায় আধুনিক বাংলা কবিতা ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, প্রয়াত আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁদেরই একজন। সুদূর লক্ষ্ণৌ থেকে আগত এই মানুষটি মাত্র বারো বছর বয়সেই উর্দু ভাষায় গীতাঞ্জলী পড়ে আকৃষ্ট হন রবীন্দ্রনাথ ও সর্বোপরি বাংলা ভাষার প্রতি। আর অকুণ্ঠ উদ্যম নিয়ে অতি অল্প দিনেই এই ভাষা আয়ত্ত করে, রবীন্দ্র সাহিত্যের আধুনিক বিশ্লেষণ, সাহিত্যতত্ত্বের নবমূল্যায়ণ এবং সাহিত্য সমালোচনায় বিজ্ঞান ও দার্শনিক চিন্তার প্রয়োগে বাংলা সাহিত্য আলোচনার পরিধিকে বিস্তৃত করার প্রয়াস নিয়ে যে লিখন শৈলী তিনি বাঙালী পাঠককে উপহার দিয়েছেন তা আজও আমাদের ঈর্ষার বিষয়। দুর্ভাগ্য আমাদের যে, প্রচার বিমুখ, এই মানুষটিকে নিয়ে আলোচনা তো দূরের কথা, তাঁর নামই হয়ত শোনেননি বহু বিদগ্ধ পাঠক। শুধু মরণোত্তর শ্রদ্ধাঞ্জলি নয়, গোধূলি-মন তার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে আইয়ুবের সার্বিক মূল্যায়ণে আগ্রহী। বিশেষ এই গদ্য সংখ্যাটিতে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছেন—

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, অমলেন্দু বসু, শিবনারায়ণ রায়, অতীন্দ্র মোহন গুণ, জীবেন্দু রায়, অমৃতময় গুপ্ত উশীনর চট্টোপাধ্যায়, মৈত্রেয়ী সেনগুপ্ত, শোভনা মিত্র ও গৌরী আইয়ুব প্রমুখ।

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সরলা প্রিন্টার্স, বড়বাজার, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও নতুনপাড়া, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ স্কেচ : রামকিঙ্কর বেইজ।

চৈত্র ১৩৯০ সংখ্যা

প্রসঙ্গ : গোধূলি-মন
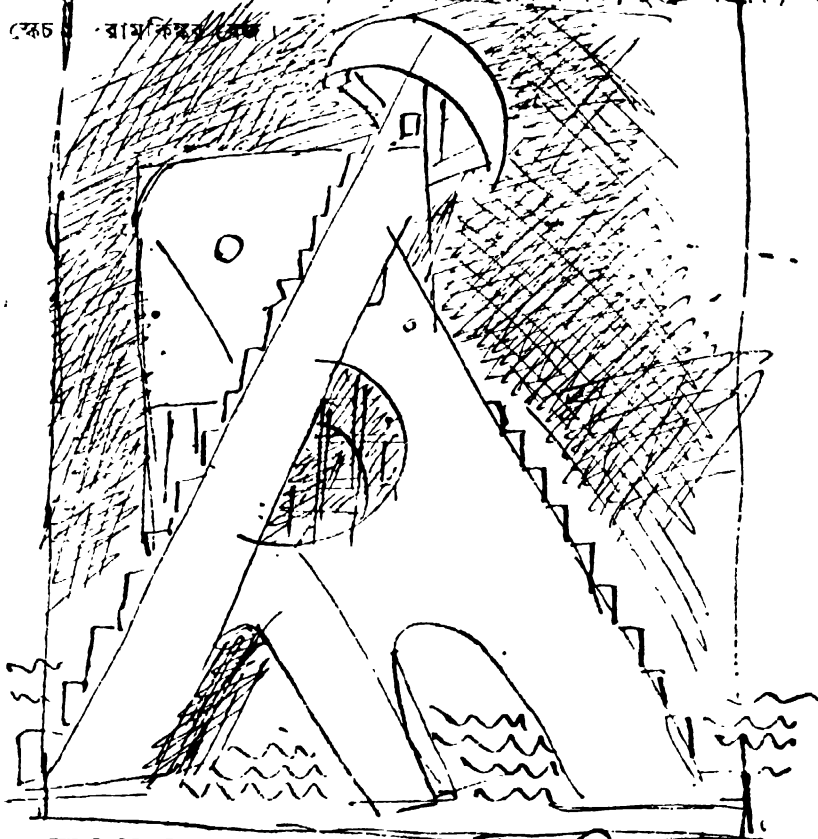
O ফেব্রুয়ারী সংখ্যা পেয়েছি। 'হায় নীল —... কালিমা' খুব ভাল লাগলো। অথবা 'অশ্রু কি খনিজ তেল? কাছে গেলে আগুনের বাড়ায় পরিধি'—সুন্দর। এমনি আরো কিছু কবিতার কিছু লাইন আমার প্রিয় যেগুলির উদ্ধৃতি দেওয়া থেকে বিরত রইলাম।

প্রীতি জানবেন
অজিত বাইরী
হাওড়া

O স্বর্গীয় আইয়ুব সাহেব ও আমি প্রায় সমবয়সী, দীর্ঘদিন ধরে আমাদের বান্ধবতা ছিল, আমি যখন ১৯৬১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীর প্রধান অধ্যাপক হয়ে আসি তখন থেকে আমাদের সম্পর্ক হয় ঘনিষ্ট, যদিও পরস্পরের আবাস দূর হওয়ার জন্য Personal contact কম হয়। তারপরে আইয়ুবতো চলেই গেলেন। আপনাদের Plan ভালো, তবে আমাকে বাদ দিন, কেননা আগামী এপ্রিল পর্যন্ত আমার হাতে এত কাজ স্তুপীকৃত যে আরো একটি বিষয়ে ভাবনা সম্ভব হবেনা।

অতএব কিছুট ভারাক্রান্ত চিত্তে একাজ থেকে ছাড় চাইছি। আপনাদের পত্রিকার কিছু কবিতা ভালই লাগলো। পত্রিকার উন্নতি প্রার্থনা করি।

শারদীয়া ১৩৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅজিত রায় লিখিত জগদ্রামী রামায়ণ—মাইকেলের প্রমীলা প্রবন্ধটি খুব ভাল হয়েছে।

—ইতি, ভবদীয়, অমলেন্দু বসু
নিউ আলিপুর / কলিকাতা—৫৩

O 'গোধূলিমন' ১৩৯০ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পেলাম। প্রথমেই অজিত রায়ের ফিরাখ গোরখপুরীর উপর লেখা প্রবন্ধটি পড়লাম। মননশীল ও মূল্যবান একটি রচনা উপহার দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রবন্ধে কয়েকটি ভুল নজরে এল।

প্রথমত :—'গুলে-নগ্‌মা' কাব্যগ্রন্থে, ফিরাক গোরখপুরী সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন এবং এই কাব্যগ্রন্থেই জ্ঞানপীঠ পুরস্কারও পেয়েছেন। 'জু-এ নজম' কাব্যগ্রন্থে নয়। যেমনটি অজিত রায় মহাশয় লিখেছেন।

দ্বিতীয়ত :— তাঁর অনূদিত কবিতা / গজল আমার বিশেষ ভাল লাগেনি কারণ মূল সুরটি সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বনিত হয়নি। যেমন শেষের নগ্‌মাটি Coming generation আপসোস করবে যখন জানতে পারবে যে তুমি ফিরাক কে দেখেছিলে (হায় আমরা তাকে দেখতে পারলাম না।) অর্থটি এরকম হবে। মূল কবিতাটি নিম্ন প্রকার—

'আনে ওয়ালী' নস্লে তুম পর
রস্ক করেঙ্গী হম অসরো
জব উনকো মালুম ইয়ে হোগা
তুমনে ফিরাক কো দেখা থা।'

নস্লে :— Coming generation
রস্ক :— অমুক ব্যক্তি ওরকম আমরা কেন
ওর মত হতে পারলাম না।

উক্ত কবিতাটি অনুবাদ করা একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ শের ও গজলে between the lines অন্য একটি মানে থাকে সেই অর্থটি না বুঝে অনুবাদ করলে শের / গজলের ঐশ্বর্য ঠিকমত বোঝা যায় না।

রেখা নাথ, এলাহবাদ

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি-মন

২৬ বর্ষ / ৩য় সংখ্যা

চৈত্র ১৩৯০

প্রতি সংখ্যা দেড় টাকা
বার্ষিক (সডাক) পনের টাকা

: সম্পাদক :
অশোক চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

এই সম্পাদকীয় লেখার সময়ে বই মেলা শেষ হয়ে গেছে। আমাদের মনে কোন রেশ রেখে গেছে কি, এবারের বইমেলা? এর উত্তর—না। পাবলিশার্স এণ্ড বুকসেলার গিল্ডের পক্ষ থেকে অন্যান্য বছরের মতো সংবাদ পত্রের পাতায় নাটক আকর্ষণকারী সে রকম বিজ্ঞাপন ছিলনা—যেমন থাকে অন্যান্য বছর। পাঠক ক্রেতার তরফ থেকে আগের মতো সে রকম প্রাণের স্বতস্ফুর্ততার অভাবও প্রচণ্ডভাবে লক্ষিত এবারের বইমেলায়। এক সারিতে বড় মাপের কিছু প্রকাশনী সংস্থার ষ্টল প্রধান ফটকের সামনে থাকায় কিছুটা ভীড়। ছোট ও মাঝারী ষ্টল এবং টেবিলধারীদের ফেলে রাখা হয়েছে একপ্রান্তে। খুব কম লোকই ঘুরতে ঘুরতে সেখানে গিয়ে পৌঁছেছেন। এবারে টেবিল স্পেসের ক্ষেত্রেও স্কোয়ার ফুট প্রতি ১ টাকার মতো বেশী লেগেছে। অথচ সেই তুলনায় গতবছরের চেয়ে আয় অনেক কম।

বইমেলায় গোধূলি-মন আবু সয়ীদ আইয়ুবের ওপর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল এবং ঐ সংখ্যার প্রচার উদ্দেশ্যে একটি প্রচারপত্রও বিলি করেছিল। বলাবাহুল্য অন্যান্য পত্র-পত্রিকার মতো গোধূলি-মনের এই বিশেষ সংখ্যাটিরও ভাগ্যে আর্থিক সাফল্যের পরিমাণ খুবই সামান্য।

এখন থেকেই সমীক্ষা করার দরকার কি কারণে এবারের বইমেলা তেমন সফল হয়ে উঠলনা।

● সম্পাদকীয় কার্যালয় ॥ নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর ॥ হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥ ভারত

● কলিকাতা কেন্দ্র : ৩৩/৬-জি, নাজির লেন, কলিকাতা-৭০০০২৩

মনে পড়ে / গোপাল চক্রবর্তী

মাধুরী, জীবনের টুকরো টুকরো-কথা গুলো, মনে পড়ে
নদীর স্রোতের মত, ভাসতে ভাসতে চলে যায় দূরে
নদী থেকে সমুদ্রে, তারপর হাওয়ায় মিলে যায়
এমনি কত কথা হয়েছিল, তোমার আর আমার ;
কৈশোর থেকে যৌবনে, কখনও বেতস কুঞ্জে ;
অথবা সেই একটি দুটি করে বকুল কুড়োতে কুড়োতে
মনে পড়ে, গ্রামে যখন প্রথম বর্ষার ভেজা দিনে
আঁচল দিয়ে আমায় মুছিয়ে দিয়ে বললে
জ্বর না হোক, সর্দি কাশি হ'তে পারে তো ?
এখন তাই বয়সের ভারে নুব্জ মাঝে মাঝে
পুরনো স্মৃতি গুলো মনের দরজায় উঁকি মারে —
আর যখন সন্ধ্যার আবছায় কপোত কপোতী
দাঁড়িয়ে মন দেওয়া নেওয়া ক'রে, তখন শুধু ভাবি
প্রকৃতি তুমি কত সুন্দর, অপরূপে ভরে দাও এই
মানুষের মন একই ভাবে, আমি আমার পিতৃ পুরুষের
দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি, কারণ এখন আমি
ষ্টেশন থেকে বহু দূরে চলে এসেছি তাই শুধু
স্মৃতি রোমন্থন, মাঝে মাঝে চোখের পাতায়
সে দৃশ্যপট্ ফুটে ওঠে, ওটা অনাদি কালের
মানুষের প্রেম, স্বর্গীয়, তারই সুষমায় পৃথিবী
তুমি, আমি, মাধুরী, এ মাটিতে শুধু খেলা করি ।

তোমার চোখে / কাজল সরকার

খরায় জ্বলে মাঠ পুকুর
রাত দুপুর
তফাৎ নেই
সবুজ মাটি শুকনো থাক
মেঘ পালায় দূর পানেই ।

শুকনো বুক, মাতৃ মুখ,
অবাক্ দৃষ্টি দিগন্তে
মরদ গেছে শহর পানে
আসবে কি সে
মাসান্তে ?

রক্তারক্তি ঢেউ তুলে
সূয্যি ঢলে
পশ্চিমে
তোমার চোখে আষাঢ় কিন্তু
থমকে আছে ভুলছিনে ॥

খুঁজে নেয়া / মিলনেন্দু জানা

এই নদী, ফুলবন
মৃদু চোখে কোনোদিন ডেকে নিলে ফের—
তোমার নির্জন মুখ
আমি ঠিক খুঁজে নেবো বিনিদ্র আলাপে।

এই পাখি গন্ধমাটি
পাশ ঘেঁষে রেখে গেলে বিনম্র আলাপ—
এই রোদ, হাওয়া জুড়ে
ফেলে গেলে খেলাঘরে প্রেমের কুলুপ—
সকল ধানের ক্ষেতে
সেদিন আমিই নেবো তোমার ঠোঁটের বাঁকে
গোপন মন্থন।
শির্ শিরে হাওয়া মাখা সংগীতের শেষে,
ডাক দিয়ে যায় যদি কোকিল দোয়েল কোনো
বনাণীর ফাঁকে—
অথবা ভোরের হাতে
কোনো মেঘ দিয়ে গেলে ঝড়ের চাবুক,
ধূসর দুপুর ভেঙ্গে
আমি ঠিক খুঁজে নেবো
তোমার বাসর॥
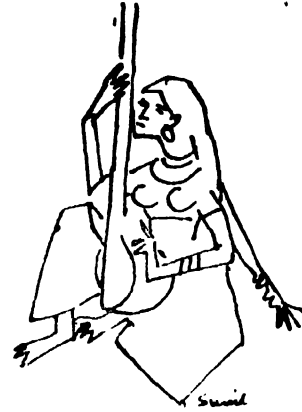
আরও গভীরে / গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

আরও নিচু হয়ে জেনে নেবো তোমার উপস্থিতি
পুরোন এ্যালবাম স্মৃতির জানালা খুলে দেয়
উড়ে আসে কোথাও কোন টুকরো খবর
যদি কোনদিন
সীমাহীন স্পর্শের আঁধার পাওয়া যায়
এখন অলক্ষ্যে কাটে সারাদিন
আমার গোপন স্বভাব লুকিয়ে থাকে
মেঘনীল আকাশ একাকী বিশাল
যদি কখন উদ্বেল হয়ে উঠি
যদি স্বপ্ন ঝর্ণা রঙিন ফানুস চোখে ভাসে
তখন আরও নিচু হতে হবে
আরও সত্ত্বহীন হয়ে তোমার অপেক্ষায়
কেটে যাবে দিন ....

কবি বঙ্কিম

অজিত রায়

প্রবন্ধের আরম্ভে একটা কথা অনেক ভেবেচিন্তে রাখা যেতে পারে, সেটা হলো : আজকের বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব ক'টি বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে যতদূর এগিয়েছে, এতটা এগোনো সম্ভব ছিলনা যদি বঙ্কিমচন্দ্র না লিখতেন। কোনো শিল্পস্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্বের একটি প্রধান লক্ষণই এই যে সেই সৃষ্টি পরবর্তী বহু নতুন সৃষ্টির পথ পরিষ্কার করে দেয়।

এগারো বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা কবিতার দিকে আকৃষ্ট হন এবং সেই সময় ভারতচন্দ্র ও জয়দেবের গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর ক্ষীণ পরিচয় ঘটে। জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার বছরে (১৮৫৩) বঙ্কিম 'সংবাদ প্রভাকর-কবিতা প্রতিযোগিতায় 'কামিনীর উক্তি' নামে কবিতা লিখে ২০ টাকা পারিতোষিক পান। বোঝা যাচ্ছে, সাহিত্যের জমিতে বঙ্কিমের প্রথম পদক্ষেপ কবিতা লেখক হিসেবে। তাঁর প্রথম ছাপা বই 'ললিতা' (১৮৫৬) এবং 'মানস' (ঐ) দুটি কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু কবিতা লেখা আর কবিত্ব করা এক জিনিস নয়। কাব্যগ্রন্থ ছাপা হওয়া মানেই কবি হওয়া নয়। বঙ্কিমের এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ দুটিও তাঁর কবিত্ব শক্তির যথার্থ পরিচায়ক হয়ে উঠতে পারেনি। এ দুটি ছিল ঈশ্বর গুপ্তের পন্থানুসারী গতানুগতিক রচনা মাত্র। স্থায়ী সাহিত্যের লক্ষণ তাতে ছিলনা। বঙ্কিম নিজেই বলেছেন, 'অনেকেই অল্প বয়সে এরূপ কবিতা লিখিতে পারে।' তাই এ-সব কবিতার পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যাহা অপাঠ্য, তাহা বালক প্রণীত হউক, তুল্যরূপে পরিহার্য্য'।

কিন্তু এতে অনুমান করা যায় যে গোড়ার দিকে বঙ্কিম কবিযশঃপ্রার্থী ছিলেন। কিন্তু, ঠিক ওই সময়েই 'বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজ'-এর ঘোষিত পুরস্কারের জন্য পর পর দু-খানি গদ্যগ্রন্থ রচনা ও সেগুলির ব্যর্থতার পরেও তাঁর অন্যান্য গদ্য রচনা প্রমাণ করে যে, কবিতার প্রতি তাঁর কোনো ঐকান্তিক পক্ষপাত ছিলনা। 'ললিতা ও মানসে'-এর পর ১৮৭৮-এ তাঁর 'কবিতা-পুস্তক' নামে আরেক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু ওই গ্রন্থে কবিতার গুরুত্বকে তিনি খুব খাটো করে ফেলেছিলেন। এরপর মাইকেলের সুউচ্চ চূড়া ডিঙিয়ে কবিখ্যাতি অর্জন করা একরকম অসম্ভব বিবেচনা করেই হয়তো বঙ্কিম আর সে-পথে এগোন নি। কিন্তু ছোটবেলার কবিতা লেখার স্বাভাবিক বাঙালী-প্রবণতা শেকড় তাঁর মধ্যে এমন গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছিল যে তাঁর উপন্যাসের পরিকল্পনায়, ভাষা-প্রয়োগে ও সংলাপ রচনায় তার সুস্পষ্ট চারা দেখা দিয়েছে। কবিতা বার-বার আবর্তিত হয়েছে তাঁর কথাসাহিত্যকে-ঘিরে। বঙ্কিমের কবিভাষাই তাঁর গদ্য-সাহিত্যকে বিস্ময়কর আস্বাদ্যমানতা দান করার ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বঙ্কিমের কাব্যপ্রবণতা গোটা বঙ্কিম-সাহিত্যেই আগাগোড়া সংক্রামিত। বিশেষ করে, 'কপালকুণ্ডলা' ও 'চন্দ্রশেখর'-এর পরিকল্পনা ও ভাষা-ব্যবহার, 'রাজসিংহ'-এ স্বকপোলকল্পিত মুসলিম বিদ্বেষের মধ্যেও জেবউন্নিসা চরিত্রের উন্মোচন ও বিকাশ, ব্যক্তিগত সংস্কার ও কাঠিন্যকে অস্বীকার করে রোহিণীকে রক্তমাংস-মজ্জাময় করে আঁকা আর 'আনন্দমঠ'-এর বন্দেমাতরম্ গানটি তাঁর দুর্লভ কবিত্ব শক্তিরই নিদর্শন।

কাব্যধর্ম আর গীতিধর্ম এক বস্তু নয়। 'কাব্যধর্ম কাব্যের সাধারণ গুণ, গীতিধর্ম বিশেষ এক শ্রেণীর কাব্যের গুণ।' (প্রমথ নাথ বিশী)। উপন্যাস-সাহিত্য কাব্যধর্মী হতে বাধা নেই। উপন্যাসের উপন্যাসত্ব বাস্তবের

যথাযথ বর্ণনায় বা ঐতিহাসিকত্বে বা নৈতিক সদুপদেশে সীমাবদ্ধ নয়। ঔপন্যাসিক প্রথমে কবি, রসস্রষ্টা। কেননা উপন্যাস যে অংশে কাব্য, সেই অংশেই উপন্যাস। আর এখানেই অর্বাচীন 'সাহিত্য' শব্দটির প্রাচীন পরিভাষা 'কাব্য'-এর সার্থকতা। নারায়ণ চৌধুরী মহৎ কবি এবং ঔপন্যাসিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে না পেয়ে লিখেছেন, 'বড়ো কবি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে জীবন ও জগতের তাৎপর্য উপলব্ধি করেন, বড়ো ঔপন্যাসিকও তাই করেন।' (সাহিত্য ভাবনা) ইংরেজ কবি নির্ভেজাল উপলব্ধিতেই হয়তো বুঝেছিলেন —Our greatest thought come from the heart অর্থাৎ উঁচুমানের শিল্পসৃষ্টির জন্যে মননশক্তির প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'ঝাঁতের কথা বার বার করে দেখাতে হবে।' এটা প্রজ্ঞাবোধ আর উপলব্ধির কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের সে ক্ষমতা পুরোমাত্রায় ছিল। তাই তিনি কথা-সাহিত্যিক হয়েও কবি। বাস্তবকে পাশ কাটিয়ে যে-রসধারা তাঁর উপন্যাসে বইছে, সেটা কাব্যরস।

সাহিত্যেরও আয়ুর সীমারেখা আছে। জীবন অস্থায়ী, মানুষের রুচিবোধ চিরন্তন নয়, সমাজরাষ্ট্র জীবনাদর্শ পরিবর্তনশীল ; মহাকালের দরবারে সাহিত্যের অমরত্বের আর্জিখানাই বা গ্রাহ্য হবে কেন ? সাহিত্য জীবনের আলেখ্য বা criticism of life, জীবনাদর্শ যেখানে নিত্য বদলায়মান, সেখানে বঙ্কিম-সাহিত্যের নিত্যস্থায়ী আবেদন আশা করা যায় না। মানুষ সহজাত জৈব প্রেরণার তাগিদেই পেছনে-পড়ে-থাকা ঔপন্যাসিকের সঙ্গ পরিহার করবে এ কথা সত্য। কিন্তু আজও বঙ্কিম-সাহিত্য পাঠ করলে তার এক দশমিক অংশও কি আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেনা ? আজও বঙ্কিম বঙ্গীয় যুবকের চরিত্রনির্মাণে অংশী— একথা অস্বীকার করবার যো নেই। তাঁর কবিত্বশক্তির সার্থকতা এখানেই।

বঙ্কিমের উপন্যাস-দেহে প্রাণের মতো কাব্যত্বের অভাব নেই। চিত্তশুদ্ধি ঘটলে গদ্যময় জীবনেও আসে কবিত্ব। 'উত্তরচরিত'এ বঙ্কিম লিখেছেন, 'কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষের চিত্তোৎকর্ষসাধন— চিত্ত শুদ্ধিকরণ। .. সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।' যাতে রূপেন্দ্রিয় সংযোগে আমাদের চিত্তরঞ্জনী (Aesthetic) বৃত্তি উদ্রিক্ত হয় সেটাই তো সুন্দর। যে চোখে বায়রণ সমুদ্রসৌন্দর্য দেখেছেন, বিহারীলাল সমুদ্র-নিসর্গ সন্দর্শন করেছেন, মধুসূদন নীলকান্ত অম্বুনিধির পরপারবর্তী ইংলণ্ডের স্বর্ণরেখা উপকূলটির জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন, সেই দৃষ্টিতেই দিগ্‌ভ্রান্ত বিপন্ন নৌকাযাত্রীদের মধ্যে নিরুদ্বেগ নবকুমারের কণ্ঠে কালিদাসের 'দূরাদয়শ্চক্র নিভস্য তন্বী' আবৃত্তি বস্তুত বঙ্কিমেরই নিসর্গনিষ্ঠ কবিমনটির প্রকাশ।

কবির মুগ্ধ দৃষ্টিতে সন্ধ্যাপ্রদীপ সমুদ্রের সৌন্দর্য এবং আলুলায়িত-কুন্তলা রমণীসৌন্দর্য একাকার হয়ে গিয়েছে। সামনে সমুদ্র, 'কানন কুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ', আর পেছনে অপূর্ব রমণী মূর্তি, 'মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায়'। (কপালকুণ্ডলা)। ললিতা কাব্যে একটি অরণ্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম লিখেছিলেন, 'অন্ধকার মহাস্তব্ধ, বহে নিরবধি'। পরবর্তী কালে লেখা 'কপালকুণ্ডলা'য় বনচারিণী মৃণ্ময়ীও নবকুমারের কাছে হয়ে থাকে চিররহস্যাবৃত' এই নারীও 'অন্ধকার মহাস্তব্ধ, বয়ে নিরবধি।'

নিসর্গকে কবি শুধুই সৌন্দর্য হিসেবে দেখেন নি। কবি অরণ্যকে মানুষী শঠতা থেকে বাঁচার আশ্রয় হিসেবেও চিন্তা করেছেন : 'বিষয়ে বিরক্ত হয়ে স্নিগ্ধ কুঞ্জবনে যেই জন বাসকরে সুখী সেইজন' (সমাচারদর্পণে, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৫২)। শীতের সিক্ত বাতাসকে তাঁর মনে হয়েছে 'মানুষী বিশ্বাস ঘাতকতার চেয়ে অধিকতর স্বস্তিকর।' (বিরলে বাস)।

বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো নায়ক বা নায়িকার ভাই নেই। দু-একটি বোন অবশ্যি আছে। গোবিন্দলালের মা এলেন, কিন্তু তিনি কোনো গোল বাধাবার আগেই চটপট

উদ্যোগ করে তাঁকে কাশী পাঠানো হলো। গোবিন্দের পিতৃব্যপুত্র হরলালকেও কলকাতায় রাখা হয়েছে। বঙ্কিমের উপন্যাসে সৌভ্রাত্র, পিতৃ ও মাতৃ ভক্তি, জ্ঞাতিদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ইত্যাদি পারিবারিক অনুরাগের মধ্যে আছে কেবল দাম্পত্য-প্রেমের আধিপত্য। বঙ্কিমের কবিচিত্ত বধির ছিল না, ছিল খুব সজাগ। তাই 'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'পতঙ্গ'-এর লেখক আয়েষা, দলনী, শৈবালিনীর স্রষ্টা রোমান্টিক ভাবাবেগের তরঙ্গ-গীত বিষাদময় সংসারের পাড়ে বসে শুনেছেন আর শোনাতে পেরেছেন যে প্রেমে দগ্ধ হবার মধ্যেও একটা অবর্ণনীয় অনির্বচনীয় মহত্ত্ব আছে, একটা বিষাদঘন সৌন্দর্য আছে। কবি বঙ্কিম রোমান্টিক অনুরাগকেই পরম শ্রেয় ও প্রেয় বলে দেখান নি। প্রণয়ের কবি বঙ্কিম স্বভাবের সৌন্দর্য অনুভব করতে শিক্ষা দিয়েছেন। বাঙলার সুন্দর দিকটা তিনিই প্রথম কবির চোখে দেখেন। হীরার বাড়ির দেয়ালে পাখি আঁকা থেকে সূর্যমুখীর বিচিত্র-চিত্র বর্ধিত গৃহ—কোনো সৌন্দর্যই তাঁর চোখ এড়িয়ে যায় নি।

রোমান্স-প্রবণতা বঙ্কিমের শিল্পকুশলতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর উপন্যাসে যেখানে রোমান্স-ঘটনা আছে ইতিবৃত্তের অস্পষ্টতার মধ্যে কবি-বঙ্কিমের কল্পনারশ্মি পতিত হয়ে এক ধরণের মনোমোহন কুহকের সৃষ্টি করেছে। রোমান্সের অপরূপ মায়ার পাশে ইতিহাসও নিতান্ত ক্ষীণ ও বিশেষত্ববর্জিত হয়ে পড়েছে—তার প্রমাণ 'কপালকুণ্ডলা'।

'কপালকুণ্ডলা'র ভাবজগৎ বিশেষ অর্থে রোমান্টিক বা মুক্তস্বাধীন কবি-কল্পনার বিশিষ্ট রসে সমুজ্জ্বল। উপন্যাসটি পাঠে একটি বিশুদ্ধ কাব্যেরই প্রেরণা আছে। উপন্যাসের গরজে নরনারীর সাধারণ ভাগ্য বা চরিত্রকেই এতটা উচ্চ কল্পনায় মণ্ডিত করার প্রয়োজন ছিল না। কাব্যধর্মী ভাষাই 'কপালকুণ্ডলা'কে যথার্থ উপন্যাস হতে দেয় নি।—একটি গদ্যরীতির কাব্যনাটক হয়ে রয়ে গেছে। যে বিরাট অদৃশ্য শক্তি মানুষের জীবনকে বেষ্টন করে তার শুভাশুভ নির্ধারণ করে চলেছে, তারই রহস্য-গম্ভীর মহিমা ভাষার অত্যধিক গাম্ভীর্যে এবং ভাবের ততোধিক লিরিক মূর্ছনায়, এটিকে ট্রিক্র কাব্যের রসসাদৃশ্য দান করেছে।

প্রসঙ্গত একটি কথা, বঙ্কিমী উপন্যাসের কলাকৌশল বিস্ময়কর রকমের সমৃদ্ধ হওয়ার প্রধান কারণ হলো, সেগুলি লেখকের জীবিতকালেই একাধিক সংস্করণে মুদ্রিত হবার সময় যথেষ্ট পরিমার্জিত, পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণের অসতর্কতাজনিত শিথিলতা পরবর্তী সংস্করণে সুনিপুন ভাবে পরিমার্জিত হয়েছে। তার অসংখ্য নিদর্শনের একটি এখানে উদাহৃত করছি:

'কপালকুণ্ডলা'র শেষ দৃশ্যে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের এই চিরতরে হারিয়ে যাবার ঘটনা প্রথম সংস্করণে ছিল না। প্রথম সংস্করণে ছিল: 'নবকুমার সন্তরণে নিতান্ত অক্ষম ছিলেন না। কিছুক্ষণ সাঁতার দিয়া কপালকুণ্ডলার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাহাকে পাইলেন না, তিনিও উঠিলেন না।' এর পরেও ভগ্নবাহু কাপালিক কর্তৃক নবকুমারের জীবন্ত দেহ উদ্ধারের বর্ণনা ছিল। পরের কোনো সংস্করণে সেটি পরিবর্তিত করে তৎপরিবর্তে বঙ্কিম মাত্র একটি বাক্য লিখলেন: 'সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে, বসন্ত-বায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?' শিল্পবিচারে এই পরিবর্তন অনেক সুচারু, ব্যঞ্জনাধর্মী ও সন্তোষজনক হয়েছে। নবকুমারের আত্মবিসর্জনের হেতু কি? প্রেমিকা ছাড়া এ জীবন নিরর্থক—আধুনিক প্রেমিকসুলভ এই মনোভাবই কি নবকুমারের আত্মবিসর্জনের কারণ নয়? মৃত্যুর পরেও বাঞ্ছিত-মিলন ঘটে, এই সূক্ষ্ম বাসনাই কি ছিল না স্রষ্টার অবচেতন মনে?

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের দৃষ্টি কবির দৃষ্টি। শব্দে উপহিত নরনারী বাস্তবেরই নরনারী, কাব্যের শাব্দিক জগতের মধ্যেই রয়েছে বাস্তব জগতের ছবি। তবু সেই শাব্দিক চরিত্রগুলি, সেই জগতের কথা আমরা যখন বঙ্কিম সাহিত্যে পড়ি তখন বুঝতে পারি—আমাদের

আপনজনদের আমরা যতটুকু চিনতাম তার চেয়ে অনেক বেশি চেনবার রয়েছে। যাদের পরিচয় শিল্পী দিচ্ছেন তারা আমাদের অ-পরিচিত নয়, অথচ সেই সাহিত্য পড়লে আমরা বুঝতে পারি, আমাদের দেখার মধ্যেও রয়েছে আমাদের অ-দেখা।

'ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা নিরীহ ভালমানুষের মত আপনমনে গঙ্গাস্তব করিতেছেন, পূজা করিতেছেন এক একবার আকণ্ঠ নিমজ্জিত কোন যুবতীর প্রতি অপাঙ্গে চাহিয়া লইতেছেন।' নৌকাযাত্রার পথে নগেন্দ্রনাথের চোখে, পূজার ফাঁকে ফাঁকে ব্রাহ্মণ ঠাকুরের যুবতী রমণীকে দেখে নেওয়ার মধ্যে যতই ব্যঙ্গ থাক, শিল্পী বঙ্কিমের রয়েছে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয়। তাই তো অন্ধ রজনী শচীন্দ্রের প্রেমে পড়ে বলে. 'বহুমূর্তিময়ি বসুন্ধরে, তুমি দেখিতে কেমন, শচীন্দ্র দেখিতে কেমন!' এ দেখবার আকাঙ্খা কার?—একজন কবির।

শুধু দেখা নয়, বলার মধ্যেও ঔপন্যাসিক-বঙ্কিমের লেখনী চুঁইয়ে কবি-বঙ্কিমের কাব্যরস সচ্ছন্দ গড়িয়ে পড়েছে। তাঁর গদ্যকে কবিতা আকারে ধরলে কি রকম দাঁড়ায় তার একটি নিদর্শন দিচ্ছি:

'পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে,
তবে সে স্বামী
পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে
তবে সে স্বামী
পৃথিবীতে যদি কোন কিছু সম্পত্তি থাকে,
তবে সে স্বামী
সেই স্বামী কুন্দনন্দিনী আমার হৃদয় হইতে
কাড়িয়া লইতেছে।'

(সূর্যমুখী: বিষবৃক্ষ)

চিত্র ও সংগীতই কাব্যের উপকরণ। যে-কণ্ঠস্বরে কপালকুণ্ডলা সেদিন নবকুমারকে বলেছিল, 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' সে-কণ্ঠস্বরে নবকুমারের হৃদয়বীণা ঝংকৃত হয়ে উঠেছিল; কেননা তা বাণী নয়, সংগীত। কবিতা ও গানের ফারাক হলো একের সুরহীনতা, অন্যের সুরযুক্ততা। এ-ভাবে যেমন এগিয়েছে বঙ্কিমী কাব্য ধারা, তেমনি এগিয়েছে উপন্যাসের গল্পচ্ছন্দ।

'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) প্রকাশের মধ্যদিয়ে আত্ম-কেন্দ্রিক স্রষ্টা বঙ্কিম প্রকাশ্যে জাতিগঠনের বৃহত্তর দায়িত্বে অবতীর্ণ হলেও, তাঁর ভাষা কিন্তু বদলায় নি তেমন বৈপ্লবিক ভাবে। স্রষ্টার সৃষ্টি তো তাঁর নিজের অভিপ্রায়েরই বাণীরূপ। সেই অভিপ্রায়ের অনুকূল গল্প, চরিত্র, ঘটনা ও অন্যান্য অনুষঙ্গের উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমের ভাষার ও একটা পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তেমন হয়নি। হয়নি বলেই বঙ্কিম আমাদের আরও আপন হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। সাহিত্যিক বঙ্কিম আজও তাই আমাদের প্রধান নীতিশিক্ষক। এই প্রসঙ্গে অনেকের কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বঙ্কিম-সমালোচনা মনে পড়ে যেতে পারে; কিন্তু আমি তর্কবিলাসী নই। আমার ধারণা, উপন্যাসে বঙ্কিম যেমন ঋজু ও প্রয়োজনানুগ গদ্যের ব্যবহার করেছেন তেমনি সাংকেতিকতায়, ধ্বনিচাতুর্যে ও শব্দের দ্বৈত কিংবা বহুভঙ্গিমা ব্যবহারে তাকে কবিতারও কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন। কোকিলের কুহুস্বর মিষ্ট, কিন্তু 'সুকণ্ঠ বলিয়া কাহারও পিছু ডাকিবার অধিকার নাই'। এই সুকণ্ঠী কোকিল রোহিণীর সঙ্গে উদাহৃত হয়েছে। তাই রোহিণীকে চুম্বন করবার মুহূর্তে বিড়ালকে মারতে গিয়ে ভ্রমরের কপালে আঘাত লেগেছে।

ইন্দিরা'য় সুভাসিনী ইন্দিরাকে চুম্বন শিখিয়েছিল। সেই স্মৃতি স্মরণ করে ইন্দিরা বলেছে, যা শিখাইয়াছিলে, তার মধ্যে একটা বড় মিষ্টি লাগিয়াছিল—সেই মুখ-চুম্বনটি। এসো আর একবার শিখি।' কবি বঙ্কিম এই ভাবে চুম্বকে শিল্প-প্রকৃতির রূপ দিয়েছেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ রোহিণী 'সুধাপূর্ণ অধরযুগলে, গোবিন্দ-লালের চুম্বনের মাধ্যমে বংকিমচন্দ্র এ-প্রক্রিয়াকে আরো বেশি জীবনধর্মী ও শিল্পমণ্ডিত করে তুলেছেন। সে বর্ণনা শুনলে কেউ কি বলবেন, 'চুম্বন হইতে সাবধান,

[এরপর ১৫ পৃষ্ঠায়]

ফ্রানজ্ কাফ্কার

অনুবাদ: অমল হালদার

ডাক্তারবাবু
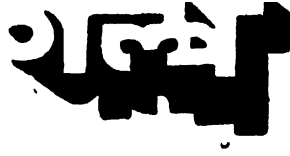
(অষ্ট্রিয়ার ফ্রানজ কাফকা ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাহায় জন্মেছিলেন। বড় দুই ভাই মারা যাবার পর তৃতীয় কাফ্কাই হয়ে ওঠেন জ্যেষ্ঠ এবং এই চমৎকার রূপবান বিনীত কিশোরটির সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন তাঁর ছোট বোন ওটা। কাফ্কার স্বভাবটি ছিলো তাঁর মামার বাড়ির প্যাটার্ণের। কাল তাঁদের সামাজিক অভিজাত্যের জন্য নয় তাদের আধ্যাত্মিকতা ইনটেলেকচুয়াল একগুঁয়েমি এবং বিষন্নতার প্রতীক হিসাবে। কাফ্কার বাবা ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া, কাজ এবং ব্যবসাই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান-ধারণা ফলে তাঁর চরিত্রের কাঠিন্য অনেক খানি ছায়া বিস্তার করেছিলো কাফ্কার ওপর। অথচ এই কাফকা, মৃত্যুর আগে সমস্ত লেখাকে অস্বীকার করে চিঠি লিখেছিলেন, তাঁর বন্ধু ম্যাকস্ব্রডকে, ব্রড তোমরা পুড়িয়ে ফেলো আমার সমস্ত লেখা, ছাপা এবং না ছাপা যা কিছু দেখা পাবে আমার লেখার টেবিলে, দেরাজে, আলমারীতে, সমস্ত পাণ্ডুলিপি এবং বই নষ্ট করে ফেলো। বন্ধুদের কাছে যে সব লেখা এবং চিঠি-পত্র আছে, তাও। ফ্রেন্জ কাফ্কার শতবর্ষ উপলক্ষে এই গল্পটি অনুবাদ করা হল। অনুবাদক

মহা মুস্কিলে পড়েছি। এক্ষুনি বেরোতে হবে, দশমাইল দূরের এক গ্রামে অত্যন্ত অসুস্থ একটি রুগী আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের দুজনের মাঝের সমস্ত জায়গাটা তুষার ঝঞ্ঝায় তাড়িত আবৃত। পাহাড়ী রাস্তায় চলার উপযোগী হাল্কা, বড় চাকাওয়ালা গাড়ী একখানা আমার আছে। গায়ে গরম কোট চাপিয়ে ওষুধের বাক্স হাতে নিয়ে বেরোবো বলে উঠোনে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু ঘোড়া নেই, একটাও ঘোড়া নেই।

আমার নিজের ঘোড়াটা সারা শীতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে কাল মারা গেছে। আমার ঝি একটা ভাড়াটে ঘোড়ার জন্য গ্রামময় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমি জানি কোন আশা নেই তাই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ক্রমশই বরফে জমে যাচ্ছি; আরও অনড় হয়ে যাচ্ছি। লণ্ঠন দুলিয়ে মেয়েটি একাই গেটের সামনে ফিরে এলো। স্বাভাবিক, আমার এখন যাত্রার জন্য কে আর ঘোড়া ধার দিতে যাবে।

উঠোনময় পায়চারি করতে লাগলাম কোনো উপায় খুঁজছি না। অন্যমনস্ক ভাবে, বিরক্ত হয়ে বহু বছরের পুরানো অব্যবহৃত শুয়োরের খোঁয়াড়ের ভুণধরা দরজাটায় পা-দিয়ে ধাক্কা দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেটা শব্দ করে খুলে গেল, আবার কব্জায় ঠেকে বন্ধ হয়ে গেল। ভেতরে ভ্যাপসা গরম কেমন একটা গন্ধ অনেকটা ঘোড়ার গায়ের মত। খোঁয়াড়ে দড়ি দিয়ে ঝুলোনো একটা লণ্ঠন মিটমিট করছে। দেখলাম, একটা লোক নিচু চালার তলায় হামাগুড়ি দিয়ে বসে আমার দিকে তার নীলাভ চোখ মেলে তাকিয়ে আছে।
'ঘোড়াগুলো গাড়িতে জুতব— ?
হামাগুড়ি দিয়ে বেরোতে সে আমায় প্রশ্ন করল। কোনো জবাব দিতে পারলাম না, শুধু নিচু হয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম খোঁয়াড়ে আর কি আছে। আমার ঝি আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিল; 'আপনার নিজের বাড়িতে কি আছে না আছে কিছুই দেখছি আপনি জানেন না।'
সে হাসতে হাসতে বলল, আমিও হাসলাম।
'নমস্কার দাদা, নমস্কার দিদি।'

বলে উঠল সহিসটা। ছুটো চওড়া তেজী ঘোড়া তাদের পা গুলোকে শরীরের কাছে গুটিয়ে নিয়ে মাথা ছুটো উটের মত্যে নিচু করে একটার পিছনে আরেকটা কোনোরকমে দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল। দরজা জোড়া তাদের আয়তন—তাই শরীরটাকে কোনোরকমে গুটিয়ে ছোটো করে তারা বাইরে এলো। বাইরে এসেই তারা খাড়া হয়ে দাঁড়াল, পাগুলো লম্বা হয়ে গেল, শরীর ঘামে ভিজে উঠল।

'নাও, ওকে সাহায্য করো, ঝিক বললাম। সে ঘোড়ার সাজগুলো নিয়ে লোকটার কাছে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। কিন্তু সে তার কাছে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই সহিসটা তাকে জড়িয়ে ধরে গালের ওপর মুখ নিয়ে গেল।

চিৎকার করে মেয়েটি আমার কাছে দৌড়ে এলো। ছুপাটি দাঁতের দাগ লাল হয়ে মেয়েটির গালে ফুটে উঠেছে। রেগে চেঁচালাম, 'এই শুয়ার' চাবুক মারব তবে ঠিক হবে?'

কিন্তু তক্ষুনি মনে হলো লোকটা অপরিচিত, কোথা থেকে যে এলো তা জানিনা, তা ছাড়া আর কেউ যখন সাহায্য করল না তখন এই লোকটাই স্বেচ্ছায় সাহায্য করছে। লোকটাও যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারল তাই কোন গণ্ডগোল করল না, শুধু ঘোড়াগুলোকে গাড়িতে জুততে জুততে একবার আমার দিকে তাকাল।

'উঠে পড়ুন' সে বলল; সত্যিই সব কিছু তৈরী। দেখলাম, এমন চমৎকার ঘোড়ার গাড়িতে আমি আগে কোনদিন চড়িনি। খুশি মনে চড়ে বসলাম। বললাম, 'কিন্তু আমি চালাব তুমি তো আর রাস্তা চেনো না।' 'নিশ্চয়ই।' সে বলল, 'আমি আপনার সঙ্গে যাব না-আমি রোজার সঙ্গে থাকব।'

'না-না' রোজা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে বাড়ির মধ্যে দৌড়ে ঢুকে গেল- পরিষ্কার বুঝে নিল তার ভাগ্যে কি অপেক্ষা করছে অনিবার্য ভাবে শুনতে পেলাম সে দরজায় শেকল টেনে দিল ঝন ঝন করে, খট করে দরজায় খিল লাগিয়ে দিল; দেখলাম হলঘরের বাতি সে নিভিয়ে দিল তারপর ছুটে ছুটে আর সব ঘরের আলোও নিভিয়ে দিল যাতে তাকে খুঁজে না পাওয়া যায়।

সহিসটাকে বললাম, 'তোমাকে আসতে হবে আমার সঙ্গে নয়ত আমি যাব না- যতই দরকার থাক না কেন, তবু যাব না। আমার যাওয়ার বকশিস হিসেবে মেয়েটিকে তোমায় দিতে হবে এ আমি ভাবতেও পারিনা।'

'এই হ্যাট, হ্যাট, ছোট' সে একবার হাততালি দিয়ে বলল আর অমনি স্রোতের টানে ভাসা কুটোর মতো গাড়ি আমার ছুটে চলল। আমি এখনো শুনতে পাচ্ছি সহিসটার আক্রমনে আমার বাড়িটা ফেটে পড়ছে, ভেঙে পড়ছে,; তারপর একটা প্রচণ্ড শব্দ আমার প্রতিটা ইন্দ্রিয়কে বিবশ করে দিল।

কিন্তু সেও মাত্র এক মুহূর্তের জন্যে; কারণ আমি এরই মধ্যে রুগীর বাড়িতে এসে গেছি, যেন তার উঠোনটা ঠিক আমার বাড়ির উঠোনের সামনে আবির্ভূত হলো। ঘোড়াগুলো নিশ্চল, বরফ পড়া বন্ধ হয়ে গেছে, আবার চাঁদের আলো। রুগীর মা-বাবা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন তাঁদের বাড়ি থেকে, তাঁদের পেছনে এলো তার বোন। তাঁরা বলতে গেলে আমাকে তুলে নিয়ে এলেন গাড়ি থেকে; এলোমেলো কি যে বললেন কিছুই বুঝলাম না। রুগীর ঘরের ভেতরের আবহাওয়ায় নিশ্বাস নেয়া কষ্টকর। অবহেলিত চুল্লী থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

জানলাটা খুলতে হবে; কিন্তু প্রথমে রুগীকে দেখতে চাই। খালি গায়ে ডিগডিগে রোগা ছেলেটা ফ্যালফ্যাল চোখে বিছানার ওপর উঠে বসল; জ্বর নেই, গাটা না ঠাণ্ডা না গরম। সে আমার গলা জড়িয়ে ধরে কানে কানে বলল, 'ডাক্তার বাবু, আমাকে মরতে দিন।'

চারদিকে তাকিয়ে দেখি কেউ শুনতে পেল কিনা;

না তার বাবা-মা সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে চুপ করে অপেক্ষা করে আছেন-আমার কথা শুনবার জন্ত। ব্যাগটা রাখবার জন্তে বোনটি একটি চেয়ার নিয়ে এসেছে। ব্যাগ খুলে যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতে লাগল। বিছানা থেকে ছেলেটি আমাকে হাত বাড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে তার ইচ্ছেটা আবার মনে করিয়ে দেবার জন্তে। ছোটো একটা চিমটা নিয়ে বাতির আলোর সামনে ধরে পরক্ষা করলাম, তারপর আবার সেটা রেখে দিলাম।

নাস্তিকের মত ভাবি; এই সব অবস্থায় দেবতারা আমাদের সাহায্য করেন, হারিয়ে যাওয়া ঘোড়া পাঠিয়ে দেন, একটা নয় দুটো পাঠান, কারণ অবস্থাটা জরুরি 'এমন কি শোভনীয়তার জন্তে সহিসও দেন তোমাকে' কেবল্ এখনই আমার রোজার কথা মনে পড়ল; আমি কি করতে পারি, কি করে উদ্ধার করতে পারি তাকে, আমার গাড়িতে দুটো অবাধ্য ঘোড়া জোতা, দশমাইল দূর থেকে আমি কেমন করে তাকে সহিসটার তলা থেকে টেনে বার করতে পারি!

এই ঘোড়াগুলো ইতিমধ্যে কি জানি কেমন করে-লাগাম টাগাম খুলে ফেলে বাইরে থেকে জানালাগুলো খুলে দুজনে দুটো জানালা দিয়ে মুখ গলিয়ে রুগীটি কে দেখছে। পরিবারের সবাই যে আতঙ্কিত তাতে তাদের ভ্রুক্ষেপও নেই। আমি ভাবি, 'আমি এক্ষুণি গাড়ি চালিয়ে ফিরে যাব' যেন তারা আমাকে কিছুতেই নিয়ে যাবে না। কিন্তু ভীষণ গরমে আমার কষ্ট হচ্ছে ভেবে রুগীর বোনটি যখন আমার গরম কোটটা খুলতে এলো আমি তাকে বাধা দিলাম না।

আমার পাশে এক গ্লাস মদ রাখা হলো; বুড়ো ভদ্রলোকটি আমার পিঠে একটা চাপড় মারলেন, এমন, দাইম দিচ্ছেন যখন, তখন এমনি একটু আত্মীয়তা দেখানো তো স্বাভাবিক। মদ খাওয়ায় অসম্মতি জানিয়ে আমি মাথা নাড়ি কারণ বুড়ো ভদ্রলোকটির সঙ্কীর্ণ চিন্তাশীল কক্ষপথে আমি অস্বস্তি বোধ করব। রুগীর মাটির বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে সেখানে ডাকছেন।

আমি গেলাম আর আমার ঘোড়াটা ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে শব্দ করা সত্ত্বেও আমি ছেলেটার বুকে মাথা রাখলাম; আমার ভিজে দাড়ির ছোঁয়ায় সে থরথর করে কেঁপে উঠল। যা ইতিমধ্যেই জেনেছি সেইটাই নিশ্চিত; ছেলেটা মোটামুটি সুস্থ, সামান্ত একটু রক্ত চলাচলের গোলযোগ আছে, তার উৎকণ্ঠিতা মা তাকে ঠেসে কফি গিলিয়েছেন, যাই হোক সুস্থ; আর সবচেয়ে ভালো কাজ হচ্ছে এখন তাকে লাথি মেরে বিছানা থেকে উঠিয়ে দেয়া।

কিন্তু আমি পৃথিবীর সংস্কার করতে আসিনি অতএব সে শুয়েই থাক। আমাকে জেলা থেকে নিয়োগকরা হয়েছে কিছু চিকিৎসা করবার জন্তে, খুব বাড়াবাড়ী রকমের না হলেও মোটমুটি চিকিৎসা করবার জন্তে। মাইনে পাই কম তবু আমি উদার, গরীবকে সাহাষ্যের জন্ত সদা প্রস্তুত। আমাকে এখনো রোজাকে দেখাশুনা করতে হবে; তারপর এই ছেলেটার যা হয় হবে এবং আমিও মরতে চাই। এই অফুরাণ শীতে আমি এখানে কী করছি?

আমার ঘোড়াটা মারা গেছে আর গ্রামে এখন কেউ নেই যে আমাকে তার ঘোড়াটা ধার দেবে। শুয়োরের খোঁয়াড় থেকে আমাকে ঘোড়া পেতে হবে, আজ যদি ঘোড়া না বেরোতো তাহলে আমাকে মাদী শুয়োরের গাড়িতে চড়তে হতো।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই। পরিবারের সবাকার দিকে তাকিয়ে আমি মাথা নাড়ি। তারা এর কিছুই জানেন না, আর জানলে বিশ্বাস করত না।

প্রেশকিপশান্ লেখা সোজা, কিন্তু অন্ত সব বিষয়ে লোকদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসা দুরূহ। যাক্ গে, আমার কাজ সম্ভবত শেষ। মিছিমিছি আবার এরা আমাকে বিরক্ত করেন, কিন্তু আমি এতে অভ্যস্ত; রাত্রে বাড়িতে ঘন্টা বাজিয়ে জেলাশুদ্ধ লোকে আমাকে জ্বালাতন করে।

কিন্তু এইক্ষেত্রে ঘোড়াকেও ছাড়তে হলো, আমি প্রায় লক্ষই করিনি—বছরের পর বছর আমার বাড়িতে কাটিয়েছে যে মেয়েটা সে কত সুন্দর—এই ত্যাগ সত্যিই বিরাট। বুদ্ধিমানের মতো কোন রকমে ব্যাপারটা মেনে নিতে হবে নয়তো এই পরিবারের সঙ্গে আমি ঝগড়া বাধিয়ে বসব—এবার আর যতই চেষ্টা করুক, রোজাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিতে পারবেনা। ব্যাগ বন্ধ করে গরম কোটটা ফেরৎ চাইলাম। ওরা সবাই দাঁড়িয়ে রয়েছে, বাবা হাতে ধরা গ্লাসটা শুঁকছেন, মা'টি আমার সম্বন্ধে সম্ভবত হতাশ হয়েছেন।

আচ্ছা লোকেরা আমার কাছে কি আশা করে? তিনি দুচোখে জল নিয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর বোনটি রক্তমাখা একটি তোয়ালে নাড়াচ্ছে; বর্তমান অবস্থায় স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে—ছেলেটি অসুস্থ। তার কাছে এগিয়ে গেলাম সে আমার দিকে তাকিয়ে, যেন আমি তার কাছে ঝালমশলা দেওয়া ঝোল নিয়ে যাচ্ছি।

আহ্ এইবার দুটো ঘোড়াই শব্দ করছে, যেন আমায় পরীক্ষা করার সময় আমাকে সাহায্য করার জন্য কোন মহান শক্তি তাদের এই রকম করতে বলেছেন। হ্যাঁ এইবার দেখলাম,—ছেলেটা অসুস্থ। তার শরীরের ডানদিকের কোমরে আমার হাতের তালুর সমান একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। তলাটা কালো, ধারগুলো ফিকে, নরম ক্ষতটার রঙ্ নানান স্তরের—গোলাপী—অল্প বিস্তর জমাট বাঁধা রক্ত—খনি গহ্বরের মতো হাঁ করা। দূর থেকে এই রকম দেখতে। কাছে গিয়ে আরো এক বিপত্তি দেখা গেল।

এ জিনিষ দেখতে দেখতে কার না আস্তে শিষ্ দিতে ইচ্ছে করে? আমার কড়ে আঙুলটার সমান মোটা আর লম্বা; গোলাপী রঙের চেহারা তাছাড়া গা-ময় রক্ত ছোটো পা-ওলা অনেকগুলো পোকা ক্ষতের ভেতরে বাসা বেঁধে কুঁকড়ে আলোর দিকে চলেছে।

আহা বেচারা বালক। তোমার জন্য কিছু করবার নেই। তোমার গভীর ক্ষত আমি আবিষ্কার করেছি, তোমার শরীরে একধারের এই ফুলোটা তোমাকে ধ্বংস করছে। আমাকে কর্মরত দেখে পরিবারের সবাই খুশি। বোনটি তার মাকে এ বিষয়ে কি বলল, মা বললেন বাবাকে, বাবা বললেন কতিপয় অতিথিকে যাঁরা দুহাত বাড়িয়ে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে চাঁদের আলোয় খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকলেন। জীবন্ত ক্ষতের দরুণ হতবুদ্ধি বালকটি ফোঁপাতে ফোঁপাতে ফিস ফিস করে বলল, 'আপনি আমাকে বাঁচাবেন?

আমার এখানকার লোকেরা সবাই এমনি; ডাক্তারের কাছে তারা সব সময় অসম্ভব কিছু আশা করে। অন্ধ বিশ্বাস তাদের আর নেই, পুরুতঠাকুর তার নামাবলি একটার পর একটা ছিঁড়েটুকরো টুকরো করে ফেলেন। কিন্তু ডাক্তার বাবুকে দেখে সবাই আশা পেলো পারদর্শী হাতে অসাধ্য সাধন করবে। বেশ, যা বলেন তাই নিজে কিছুই বলিনি। আপনাদের ধর্মীয় কোনো ব্যাপারের জন্য যদি আপনারা আমাকে উৎসর্গ করেন, আমাকে তাও মেনে নিতে হবে।

একটা গ্রামের বুড়ো ডাক্তার, যার ঝিটি পর্যন্ত হাতছাড়া হয়েছে—সে এর বেশি আর কি আশা করতে পারে? এইবার গ্রামের মোড়লা আর বাড়ির সবাই এসে আমার জামা-কাপড় খুলে নিল। স্কুলের একদল ছেলে তাদের মাষ্টারমশাইকে সামনে রেখে বাড়ির সামনে খুব সাদামাটা সুরে সমবেত কণ্ঠে গান জুড়ে দিলে:

'ওকে নগ্ন করো তবে ও অসুখ সারবে।
যদি তা-না-পারো তবে ও প্রাণটি হারাবে
ও-তো শুধু-ডাক্তার।'

আমি নগ্ন; মাথা নত করে, দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে শান্তভাবে লোকগুলির দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি সম্পূর্ণ সুস্থির এবং ওদের সবার চেয়ে উন্নত এবং আমি এমনি ভাবেই থাকব যদিও তাতে আমার কোনো লাভ হবে না কারণ এইবার তারা আমাকে পাঁজকোলা করে তুলে বিছানায় নিয়ে চলল। দেওয়ালের

ধারে ক্ষতটির পাশে আমাকে তারা শুইয়ে দিল। তার পর তারা সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ; দরজাটা বন্ধ করা হলো , গানটা মিলিয়ে গেল।

চাঁদ মেঘে ঢেকে গেলো, আমার চারিধারে ছড়ানো বেড-কভারের গরম তাপ ফাঁকা জানালায় ঘোড়াদুটোর মাথা ছায়ার মতো দুলতে লাগল। আমার কানেকানে কে যেন বলল শুনলাম, 'জানো, তোমার উপর আমার আস্থা অতি কম।'

সত্যি বলতে কি, আগেই কোথাও তুমি ফুরিয়ে গেছ, ও পা দুটো তোমার নিজস্ব নয়। কোথায় সাহায্য করবে, না আমার মৃত্যু শয্যায় জায়গা জুড়ে শুয়ে আছে। আমার কেবল ইচ্ছা করছে তোমার চোখ দুটো আঁচড়ে খুবলে নেই।'

'সত্যিই' বলি, ব্যাপারটা লজ্জাকর। কিন্তু আমি একজন ডাক্তার। আমি কি করবো ? বিশ্বাস করবো, ব্যাপারটা আমার পক্ষেও খুব আরামের নয়।'

এই জবাবেই কি আমাকে সন্তুষ্ট হতে হবে ? ও, মনে হয় আমাকে তাই হতে হবে। আমাকে সব সময় সন্তুষ্ট হতেই হবে। সুন্দর একটা ক্ষত নিয়ে আমি পৃথিবীতে এসেছি ; এটাই আমার একমাত্র সম্বল ছিল।'

'দ্যাখো ভাই, 'আমি বলি, 'তোমার দোস এই যে তুমি সমস্ত ব্যাপারটা জানোনা। আমি আশেপাশে সব রুগীর ঘরে গেছি, আমি তোমাকে বলছি তোমার-আঘাতটা এমন কিছু খারাপ নয়। কুড়ুলের কোণ দিয়ে দুবার মারায় এই ক্ষতের সৃষ্টি। অনেকেই তাদের শরীর এগিয়ে দিতো কিন্তু বনে কুড়ুলের শব্দই শুনতে পায় না ; তাদের সংস্পর্শে আসা তো দূরের কথা ;

'সত্য বলছ, না, আমার জ্বরের সুযোগ নিয়ে ধাপ্পা মারছ ? সত্যি বলছি-আমার-মর্যাদার দোহাই, সরকারি এক ডাক্তারের এই কথাটা বিশ্বাস করো।' সে বিশ্বাস করে শান্ত হলো। কিন্তু এইবার নিজেকে বাঁচাবার কথা ভাববার সময় উপস্থিত হয়েছে। ঘোড়াগুলো এখনো বিশ্বস্তভাবে নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে। জামাকাপড় গরম কোট ব্যাগট্যাগ সব টেনে জড়ো করলাম ; জামাকাপড় পরে সময় নষ্ট করাও আমার ইচ্ছে নয়। আমার মতো এখনও যদি ঘোড়াগুলো সেই বেগে ছোটে তাহলে বলতে গেলে আমি এই বিছানা থেকে আমার বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ব।

অনুগত ভাবে একটি ঘোড়া জানলা থেকে সরে গেল ; পুঁটলিটা গাড়ির মধ্যে ছুঁড়ে দিলাম ; গরম কোটটা একটু বেশি ছিটকে গেল বলে শুধু তার একটা হাতা গাড়ির একটা হুকে আটকে গেল। এই যথেষ্ট। ঘোড়ায় চড়ে বসলাম। সাজগুলো আলগা, আলগা, একটা ঘোড়ার সঙ্গে আরেকটা অত্যন্ত শিথিল ভাবে লাগা, গাড়িটা পিছনে এলোমেলো ভাবে আসতে লাগল।

আর সবার পিছনে তুষারের মধ্যে আমার গরম কোটটা। 'এই হ্যাট্ হ্যাট্ ছোট' আমি বললাম কিন্তু এ ছুটল না। বুড়োর মতে ধীরে-ধীরে আমরা সেই নির্জন তুষারের মধ্যে চলতে লাগলাম। অনেকক্ষণ ধরে আমাদের পেছনে সেই শিশু কণ্ঠের নতুন অথচ ভুল গানটা আমরা শুনতে পেলাম।

'শোনো রুগীগণ, শুভসংবাদ।
পাশে শুইয়েছি ডাক্তারকে, সেও যাবে নাকো বাদ!'

এ রাস্তা দিয়ে আমি কখনোই বাড়ি পৌঁছব না। আমার জমজমাট পসার নষ্ট হয়ে গেল। আমার পরবর্তী কোনো ডাক্তার আমাকে প্রতারণা করছে।

কিন্তু-বৃথা, কারণ সে আমার জায়গায় বসতে পারবে না। বাড়িতে বদমাইশ সহিসটা রোজার ওপর ক্ষেপার মতো ব্যবহার করছে, আমি এ নিয়ে আর ভাবব না। নগ্ন, বৃদ্ধ আমি এই অসুখী-কালের তুষার ঝটিকায় অনাবৃত, পার্থিব গাড়ি ও দুটি অপার্থিব ঘোড়া নিয়ে ঘুরে মরছি।

আমার গরম কোটটা গাড়ির পিছনে ঝুলছে কিন্তু আমার হাত তাতে পৌঁছচ্ছে না, আর-নমনীয় রুগীদের একজনও একটা আঙুল পর্যন্ত নাড়ল না বুজরুকি, বুজরুকি। একবার যদি রাত্রির এই মিথ্যে ঘণ্টায় সাড়া দেয় তাহলে আর রক্ষে নেই।

কবি বঙ্কিম। (নয়-এর পাতার শেষাংশ)

চুম্বন আয়ুক্ষয় ঘটায় ?

আজকের দেহবাদী লেখকদের সোনাবৌদিদের রিরিংসাকে অনেকেই 'সাহিত্য' বলতে নারাজ। অথচ আজ থেকে ১১৮ বছর আগেই বঙ্কিমবাবু এ জাতীয় নারী দেহের তাজা বর্ণনা দিয়ে ফেলেছিলেন—তার প্রমাণ 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম সংস্করণে নারীর উরু ও নিতম্বের বর্ণনা; যা পড়লে আজকের গোঁড়া পণ্ডিতের দল অশুভ গন্ধ-শোঁকা বুনো ঘোড়ার মতো ঘাড় ফিরিয়ে নেবেন।

বঙ্কিমের কাব্যরশ্মি সংযমের সঙ্গেও বিচ্ছুরিত হয়েছে। 'হেমন্ত বর্ণনাচ্ছলে স্ত্রীর সহিত কথোপকথনে' স্বামী কর্তৃক ভার্য্যার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এই রকম :

'নব পল্লবিত ফলে সুশোভিত
তুমি তরু করি জ্ঞান।
অধরতে তব নবীন পল্লব।'

পরের স্তবকে নারীর স্তন 'শ্রীফল' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এটা ওল্ড টেস্টামেন্টের 'রাজা সোলেমানের পদাবলী'র সঙ্গে তুলনীয় :

'দীর্ঘ তোমার দেহখানি যেন তালতরু
পুঞ্জিত দ্রাক্ষার স্তবক তোমার
স্তনযুগল।'

(অনু : সুরেশচন্দ্র সরকার)

কাব্যের এই বাণীই বঙ্কিম-উপন্যাসে পেয়েছে ঈষৎ ভিন্ন ব্যঞ্জনা। 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম সংস্করণে প্রসাধন-রতা বিমলার উন্মুক্ত স্তনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে কবি বলছেন : 'কাঁচুলি শূন্য বক্ষস্থল কালজয়ী কিনা দেখ।' এর সঙ্গে তুলনীয় সেলিম সারোয়ারের : 'দুর্বিনীত স্তন যাকে লুকোবার মত পর্যাপ্ত আঁচল নেই।'

আগেই স্বীকার করেছি, আধুনিক সাহিত্যে আমাদের প্রধান নীতি-শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র। আলংকারিকেরা বলেছেন, বেদের উপদেশ আজ্ঞা, পুরাণের উপদেশ বন্ধুর পরামর্শ, কিন্তু কাব্যের উপদেশ কান্তার মতো। গল্পের ছলে মন কেড়ে নিয়ে উপদেশ প্রদান করাটা সত্যিই অমোঘ। বঙ্কিমের উদ্দেশ্য স্বদেশানুরাগ ও সামাজিক সুখ। তাঁর কমলাকান্ত একাধারে কবি, প্রেমিক ও স্বদেশপ্রেমিক। তার ধর্মপ্রচার (Preaching) বড়ো উঁচু দরের, তার প্রমাণ দপ্তরের রচনা গুলি। কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি ভাব-প্রচারের যন্ত্রমাত্র নয়, 'মানবজীবনেরই সুখ-দুঃখের কাব্য। ভাগ্যবিড়ম্বিত রোহিণী সম্পর্কে গোবিন্দলাল বলেছেন—'কেন তোমার বিধাতা এত রূপ দিয়া পাঠাইয়া ছিলেন, দিয়াছিলেন তো সুখী করিলেন না কেন ?' এ যেন স্বয়ং বঙ্কিমেরই হাহাকার—'তোমরা একবার আহা বলগো।' এই হৃদয় দ্রাবী সহানুভূতি ঔপন্যাসিককে কবি করেছে।

পরিশেষে, গঙ্গা জলে গঙ্গাপূজার পন্থা অনুসরণ করি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন : 'এক্ষণকার কবিগণ জ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিদ।' এই 'কবিগণ,-এর মধ্যে এক কবি কি বঙ্কিম নিজেই নন ?

পুস্তক সমীক্ষা

বিবিক্ত নির্বেদ থেকে সংহত প্রতীতি

উশীনর চট্টোপাধ্যায়

'বিস্ফোরিত পঙক্তিগুলি' * রমানাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিগত বিশ বছরে লেখা কবিতার সংকলন ; এবং পূর্ণাঙ্গ হিসাবে প্রথম। যদিও আজ থেকে আটাশ বছর আগে প্রকাশিত 'তিন আকাশ' নামের সংকলনে অপর দুই কবির সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল তাঁরও বারোটি কবিতা, তবু সেই সংকলন পাঠের সৌভাগ্য আমার হয়নি। কাজেই তাঁর ধারাবাহিকতা বা উত্তরণ বিষয়ে আমার ধারণা সর্বত্র খুব স্পষ্ট নয়। কবি হিসাবে তাঁর যাত্রা শুরু বিশ শতকের পঞ্চম দশকে, বাংলা কবিতা যখন বিশেষভাবে আঁকড়ে ধরেছিল বোদলেয়ারীয় বিবংসা আর বিবমিষার বিষয়বিমুখ আত্মরতিবিলাপকে। চল্লিশের চর্বিত-চর্বন মার্কসবাদ বা অন্য কোনো তাত্ত্বিক প্রত্যয় তেমনভাবে ছিলনা এই সময়ের কবিতায়, ছিলনা সংক্রোকের মত কোনো অকুতোভয় বিশ্বাস। তবে একথা ভাবলেও অবশ্যই ভুল হবে যে, এই সময়ের কবিতায় প্রকট হয়ে উঠেছিল বিশ্বাসের ঘাটতি। বরং বিশ্বাস কবিরা যথেষ্টই খুঁজেছিলেন, কিন্তু মানসিক স্বাধীনতাকে নির্বাসন দিয়ে নয়। তাই কবিতার অন্তরঙ্গ অপেক্ষা বহিরঙ্গেই প্রকট হয়ে উঠেছিল বিশ্বাস আর স্বাধীনতার রেষারেশি, ব্যক্তি আর সভ্যতার বিরোধ, আঙ্গিক আর মর্মের দ্বিধাগ্রস্তা, আর এভাবেই nonideational বা অতাত্ত্বিক কবিতাই হয়ে উঠেছিল তাঁদের একটা প্রধান আশ্রয়। রমানাথ চট্টোপাধ্যায় যদিও তাঁর কবিজীবনের প্রথমস্তরে নিঃসম্পর্কিতের উদাসীন নির্লিপ্ততা নিয়ে ক্ষয়, নৈরাজ্য আর নিস্ফলতার মানচিত্র এঁকেছেন, তবু এই নিঃসঙ্গতায় তেমনভাবে ব্যক্তিগত বিলাপের ভাবালুতা বা আত্মকরুণা নেই, আছে ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতাকে নৈর্ব্যক্তিক একাকীত্বে রূপান্তরিত করার বেদনা, বিষয়ী নির্ভরতাকে বিষয়ানুগত্যের শিরোপা পড়ানোর আকুতি এবং অধিকাংশ কবিতাই নাটকীয়তার সামীপ্য দাবী করতে পারে। একদিকে সমাজপতিদের বিচ্ছিন্নতা, সর্বসাধারণের সঙ্গে সংলগ্ন হওয়ার অনীহা, অন্যদিকে তাদের নির্বেদ ও নির্বেদের গ্লানি সমস্তই বিম্বিত হয়েছে ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতার প্রতিবিম্বে ; এবং যদিও তিনি বোঝেন যে নিঃসঙ্গ একাকীত্বে বা ব্যক্তিপুরুষের কেন্দ্র যে আশ্রয় তা নিরাশ্রয়ের নামান্তর তবু প্রগতি সচেতন মানুষ প্রগতির বিনষ্টি দেখে আর কোথাই বা আশ্রয় পেতে পারে? তাই অন্তর্গত রক্তক্ষরণের মধ্যে এই নেতির জগতে সমস্ত সদর্থকতাই তিনি প্রত্যক্ষ করেন আপাত ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে : 'বিস্ত হায়! অনেক নাটক হলো, ঝাঁপাঝাঁপি তদপেক্ষ প্রচুর / বৃথা শিহরণে ধরিবারে যাই মেদনম্রা কুকুটিরে যেমন ॥' [মার্চের স্মারক, ১৯৬৭] বস্তুত স্বভাব কবিত্বের প্রসাদমুক্ত বলেই তিনি তাঁর সচেতন ধীশক্তি নিয়ে এও অনুভব করেন যে, নিজের চৈতন্য অনুভূতিকে কালজ্ঞানী ইতিহাসের প্রচ্ছদে অর্পিত করা সহজ সামর্থ ব সহজাত প্রবৃত্তির (instinct) কাজ না, তার জন্য প্রয়োজন কবিমনীষার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের আভিজাত্যচেতনা, যা নিজের সীমা বা মহিমা কোনোটা সম্পর্কেই ঠিক উদাসীন বা নীরব নয়। তাই ইতিহাস চেতনা বা কালজ্ঞান তাঁর ক্ষেত্রে কিছুটা নিয়তিবাদের রূপ নিয়েছে। একে ঠিক হিন্দুশাস্ত্রের কর্মফলবাদ হিসাবে সনাক্ত করা যায়না, যা জন্মান্তর বা সুকৃতির শেষে পুরস্কার সম্পর্কে আশান্বিত। বরং এই নিয়তিবাদ মানুষের হাত থেকে চূড়ান্ত বিশ্বাসের সমস্ত আশ্রয় হরণ করে নিরঙ্কুশ এক শূন্যতাকেই ফেলে গেছে, য অন্ধ আর যান্ত্রিক, ন্যায় অন্যায় বিষয়ে নির্বিকার আর উদাসীন: 'যা কিছু গুছিয়ে রাখি জড়ো করি স্নিগ্ধ তৃণভূমি / ভেঙে দাও গৃহস্থালি হাঘরের নম্র ছিটেবেড়া / কে হে তুমি চতুর

জলধি ? / কে হে তুমি !' [চতুর জলধি]

কিন্তু এই প্রচ্ছন্ন নিয়তিবাদ থেকে তিনি ক্রমশঃই এক সংহত প্রতীতির সন্ধান করেছেন বিশেষত বিগত দশকের উপান্তে লেখা কবিতাবলীতে, যাকে কিছুটা সাম্যবাদের পৃষ্টপোষণ বললে অত্যুক্তি হয়না। অবশ্য এই সাম্যবাদ কেবল আবেগভাবালুতাপূর্ণ অনুষঙ্গ জাগিয়েই শেষ হয়ে যায় না, বা নিছক কবিকল্পনার মানবিক সহানুভূতিতেও আস্থাশীল নয় তা, আবার কিশোর সুলভ দর্পিত আর দ্বিধামুক্ত আত্মবিশ্বাস বা অকুতোভয় উল্লাসও সেখানে সংক্রমকের কাজ করেনা, কিম্বা মার্কস-এঙ্গেলস লেনিনের রচনাতেও তাকে সার্বিক ভাবে তার অস্তিত্ব পাওয়া যাবেনা, বরং ক্রমশঃই তিনি মানুষের অনন্ত শক্তি ও সম্ভাবনার প্রতি আস্থাশীল হয়ে ভালোবেসে ফেলেন তাঁর একদা বঞ্চিত গৃহস্থালী জীবনযাপনকেও আর সেখান থেকেই তাঁর কবি নায়ক আর সমস্ত অন্যায় অবিচারকেই নিয়তি নিয়ন্ত্রিত বলে মেনে নিতে পারেনা, প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে : 'দৃঢ়মূল শাল কি অর্জুনের মতো মুষ্টিবদ্ধ হাত / যতই ওপরে ওঠে চলকে যায় বিষের থলিটা। / সমাবিষ্ট মুষ্টিবদ্ধ হাত স্থির রেখে / বাঁ হাতে ছড়াতে হবে লালমাটির দুই রেখায় / কার্বলিক এ্যাসিড বিস্তর' [মহাবাক্যের চূড়োয় পৌঁছতো তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই আত্মপ্রত্যয়ে চিড়বিড় করে জলে ওঠা, বা এই প্রতীত শানিত কবিতাবলী তাঁর কবিস্বভাবের যথার্থ আনুকূল্য দাবী করেনা, ঈষৎ চেষ্টাকৃত ও আত্মবিজ্ঞাপিত মনে হয় এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা আর অভীষ্ট সংকল্পের সংমিশ্রণ শ্রমসাধ্য জেনেও তিনি মাঝে মধ্যে চাতুর্য্যের দ্বারস্থ হন। তবে সুখের কথা এই যে, যেখানে তিনি সত্যই সফল, সে জাতীয় কবিতাই এখানে বেশী, এবং তা ওই স্বভাবের বৈপরীত্যই ঘোষণা করে। কেননা বস্তুর বিলাস বাহুল্য আর নির্বস্তুক পুরুষসিদ্ধি যেমন একাসনে বসার যোগ্য, তেমনি কবিতায় বোধহয় তারা প্রকৃত বিশ্ববীক্ষার কিছুটা পরিপন্থী। অংশত তাঁর কবিতায় অসার আত্ম প্রকাশের গরজ নেই বলেই তা মাঝে মধ্যে অসরল, স্বাতন্ত্র্য আর উৎকটতার ভেদাভেদহীন ; এবং প্রকৃত কবিতার গদ্যভাষা যেহেতু একরকম অসম্ভব তাই এই সংকলনের শ্রেষ্ঠ কবিতাদ্বয় 'বিস্ফোরিত পংক্তিগুলি' এবং 'বিপ্লব ইত্যাদি শব্দ' সম্পর্কে আমি কোনো ব্যাখ্যায় করলামনা।

আসলে তিনি যথার্থই নিরাভরণ আর উক্তি প্রধান কবি, উপমা প্রধান নন। সচরাচর চিত্রকল্পের সাহায্য না নিয়ে, শুধু সরল প্রার্থনা বা বিবৃতিকে ছন্দোবদ্ধ করেন। তাঁর উপমাকে কাব্যদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়না, তা প্রবিষ্ট হতে থাকে পরতে পরতে, কাজ করে যায় গোপনে, ফলিয়ে তোলে তাঁর অনুভূতিগুলিকে, তাঁর ইন্দ্রিয়বোধ অতীন্দ্রিয় আনন্দ-বেদনাকে, তারা কবিতাকে অভিজ্ঞান প্রদান করেনা, কিন্তু কবিতার দ্বারা প্রত্যয়িত হয়। এইজন্য তাঁর কোনো উপমা স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখযোগ্য নয়। যা উল্লেখ্য, তা একটি কবিতা বা কবিতার স্তবক বা পংক্তি বা অংশ। তাঁর কবিতায় যে ধ্রুপদী লক্ষণ চোখে পড়ে তাও মূলত কাব্যরূপে সংযম ও সুমিতির ব্যবহারে। কবিতার সংগঠন যে অংকশাস্ত্রের বিন্যাস বা ঐতিহ্যগত উপাদানে নির্মিত স্থাপত্যের সংগঠনের মতো বা উদ্ভিদের বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধির নিয়মে সম্পাদিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধারণায় তাঁর পূর্ণ আস্থা আছে। তাছাড়া যুক্তি-বুদ্ধি এবং চৈতন্যকে তিনি সবার উপরে স্থান দেন ; এবং একাধিক ধ্রুপদী কবির মতো এও মনে করেন যে, inspiration is a mere hypothesis.

* বিস্ফোরিত পংক্তিগুলি / রমানাথ চট্টোপাধ্যায় / শব্দবর্ণ / দশ টাকা।

সংবাদ

'চুঁচুড়া কল্লোল সাংস্কৃতিক সংস্থা' একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্বের ধারা বজায় রাখতে পারেন নি।

চুঁচুড়া কল্লোল সাংস্কৃতিক সংস্থা' পশ্চিমবাংলার অন্যতম সাংস্কৃতিক চেতনা সম্পন্ন ঐতিহ্যমণ্ডিত নাট্য সংস্থা। ইতিপূর্বে এই প্রতিষ্ঠানটি সারা বাংলায় যে প্রগতির পথ দেখিয়েছেন—তা একান্তই বিরল। কিন্তু সম্প্রতি চুঁচুড়া রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ বর্ষ একাংক নাটক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কিছুটা ভাটার টান লক্ষ্য করলাম। যদিও এঁদের অনুজ বিভাগের সঙ্গে আমি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আছি তথাপি সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিকে আগের মত তেমন উদ্দীপ্তভাবে কাজ করতে লক্ষ্য করলাম না, অবশ্য এর নানা কারণ আছে।

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ৮৪ থেকে ২৫শে ফেব্রুয়ারী ৮৪ পর্যন্ত একাংক নাটক প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল, প্রতিদিন গড়ে ৪টি করে একাংক নাটক পরিবেশিত হয়, কয়েকটি নাট্য সংস্থা শেষ মুহূর্তে অংশে গ্রহণ করেননি।

১৮ বর্ষ একাংক, প্রতিযোগিতার যে স্মরণীকা প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায় যে 'ধ্রুপদী' (বালি). 'সপ্তর্ষি' (নৈহাটি) 'উল গুনান' (কোন্নগর, 'চিনসুরা কালচারার, (চুঁচুড়া), 'রম্বস' (বেলঘরিয়া), 'চরিত্রায়ণ' (কাঁচড়াপাড়া), 'অভিনেয়. (বালি), 'পরিচায়ক' (বালি), 'কোরাসগ্রুপ' (কলিকাতা), 'অর্পণ' (হাওড়া), 'কলাকেন্দ্র' (চন্দননগর), 'নিমগ্রম' (কলিকাতা). 'অনুক' (কলিকাতা), 'আতপুর নবীন সংঘ' (আতপুর), বৈশাখী' (চুঁচুড়া), 'প্রতিদ্বন্দ্বী' (যাদবপুর), 'জাগৃতি' (আতপুর). 'এরণা' (চুঁচুড়া), 'বৃশ্চিক' (ত্রিবেণী), 'উজান' (শেওড়াফুলি), 'ইউনিট থিয়েটার' (উত্তরপাড়া), 'নীহারিকা' (ব্যারাকপুর), 'চিনসুরা লিটল থিয়েটার গ্রুপ' (চুঁচুড়া) 'অভিযাত্রী' (পানিহাটি), 'থিয়েটার প্রজেক্ট' (বেলুড়), 'নন্দন' (হাওড়া), কালপুরুষ নর্থ' (সালকিয়া), 'তরুণ সংঘ' (চুঁচুড়া), অংশ গ্রহণ করেন।

২৬-২-৮৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দেখা যায় ১ম স্থান অধিকার করেছেন 'জাগৃতি' আতপুর (নাটক—ক্রীতদাস, ২য় স্থান—'ইউনিট থিয়েটার' উত্তরপাড়া নাটক—তোতাকাহিনী এবং ৩য় স্থান—'রম্বস', বেলঘরিয়া (নাটক: পাখি)। দশম স্থান পর্যন্ত মানপত্র দেওয়া হয়।

এছাড়া শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি ইত্যাদির ও পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন বর্দ্ধমান বিভাগের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের অধিকর্ত্তা এবং অতীতের বিখ্যাত অভিনেতা ডঃ প্রমোদ মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি হিসাবেউপস্থিত ছিলেন হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষ বিশিষ্টসমালোচক শ্রীপ্রশান্ত কুমার ঘোষ। এঁদের বক্তব্য অত্যন্ত মূল্যবান ছিল।

ঐদিনে সংস্থার অনুজ বিভাগ কর্তৃক শ্রীপাচু গোপাল দাসের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গুরু' নাটকটি সার্থকভাবে পরিবেশিত হয়। এছাড়া অগ্রজ বিভাগ মঞ্চস্থ করেন কবি গিরীশ ঘোষের নাটক 'য্যায়সা কি ত্যায়সা', পরিচালনা মানবেন্দ্রনাথ পাল।

এ বছর 'কল্লোল সাংস্কৃতিক সংস্থা' আয়োজিত একাঙক নাটক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কাহিনীকার বা পরিচালকের ত্রুটি থাকতে পারে। এমন কিছু নাটক পরিবেশিত হয়েছে যে গুলি রবীন্দ্রভবন কেন পাড়ার চৌকিপাতা ষ্টেজেও পরিবেশিত হওয়ার মত নয়।

তাছাড়া যে ধরণের বক্তব্য মানুষের মনে রেখাপাত করতে পারে সে ধরণের বক্তব্য মাত্র কয়েকটি

ছাড়া নবে কোন নাট্য সংস্থার মধ্যে ছিলনা। মনে হলো যে প্রতিযোগী দলগুলি স্থির করতেই পারেননি যে কি ধরনের বক্তব্য বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে রাখা যায়। বেশ কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করেছি।

অবশ্য এর জন্য 'কল্লোল সাংস্কৃতিক সংস্থা'কে দোষ দেওয়া যায় না। তাঁরা তো আহ্বায়ক মাত্র।

রবীন্দ্রভবনে এই নাটক প্রতিযোগিতায় তেমন দর্শক মেলেনি। বহু আসন শূন্য ছিল। এ থেকে কি বোঝা যাবে যে মানুষের মনে অনীহা এসেছে? কিন্তু কেন? মানুষ কি তাঁর মনের মত কিছু পাননি? হুগলী-চুঁচুড়ার সমঝদার দর্শক তো এতদিন এমন করেন নি। বিগত ১৭ বছরে এমনসময় গেছে যে সমস্ত দর্শকের স্থান দেওয়াও দুরূহ হয়েছে। আয়োজক সংস্থার সকল সভ্য সভ্যাও প্রতিদিন ছিলেন না। এইরূপ হবে কেন?

দর্শকের আসন থেকে অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্ত কুমার ঘোষ যে বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখেছেন তা অত্যন্ত মূল্যবান এবং ধ্রুব সত্য। তাঁর মত বিশিষ্ট সমালোচক বিরল। উপলব্ধিবোধ এত বেশী যে প্রতিটি সংস্থার পরিবেশনাকে সাবলীল ভাবে সমালোচনা করেছেন।

কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, যাত্রা, থিয়েটার এমন কি একাঙ্ক নাটক পরিবেশনার মধ্যে দিয়ে এমন কিছু ইঙ্গিত থাকবে যা সাধারণ মানুষকে ভাবিয়ে তুলবে। এবারের প্রতিযোগিতায় যা দেখলাম—সবই যেন ভুলে গেলাম। তবু তাকিয়ে রইলাম আগামী বছরের দিকে।

—শীতল দাস

সাহিত্য সেতুর আহ্বানে প্রাঙ্গনে কবি মেলা

১৯শে ফেব্রুয়ারী বেলা দু'টায় ডানলপের স্কাউট ডেন-এ বসেছিল সাহিত্যসেতুর কবিমেলা। বসন্তের এই মধ্যাহ্নের কবিমেলার এসে জড়ো হয়েছিলেন কোলকাতা, হাওড়া, নদীয়া ও অন্যান্য জেলার কবিরা। হুগলী জেলার কবিরাতো ছিলেনই। 'লিটল ম্যাগাজিন' বিষয়ক সন্দীপ দত্তের কবিতায় সুর দিয়ে গেয়ে শোনান ঋত্বিণ মিত্র। কবিতা পাঠের আসর শুরু হলে এ'ক এ'ক কবিতা শোনাতে আসেন—পিনাকী ঠাকুর, শীতল চৌধুরী, অশোক মুখোপাধ্যায়, কার্ত্তিক মোদক, সুনীল মাজী, অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্য, বীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায় যদুপতি মল্লিক, কৃষ্ণা বসু, অরুণ চক্রবর্ত্তী, সনৎ মান্না ও আরো অনেক।

কবি কুমুদ রঞ্জনের ১১২ তম জন্মদিন

পল্লীকবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের নিজস্ব বাসভূমি বর্দ্ধমান জেলার কোগ্রামে কবির ১০২তম জন্মদিন পালন করা হয় ৩রা মার্চ দুপুর দু'টা থেকে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে। বহু বিশিষ্ট ও তরুণ কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ঐদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কবির প্রতি তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অমর শহীদ গোপীনাথ সাহার মর্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা

বিগত ১লা মার্চ শ্রীরামপুর রেল ষ্টেশন সংলগ্ন গান্ধী ময়দানে শহীদ গোপীনাথ সাহা স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে শহীদ গোপীনাথ সাহার একটি আবক্ষ ব্রোঞ্জ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতিবসু।

আবক্ষ মূর্তিটির আবরণ মোচন করেন শহীদ সাহার তৎকালীন সহকর্মী, বর্তমানে লোকসভার সদস্য শ্রীবিজয় মোদক। ঠিক ষাট বছর আগে ঐ দিনটিতে ১৯২৪ সালের ১লা মার্চ গলায় ফাঁসির দড়ি ঝুলিয়ে শ্রীসাহা শহীদের মৃত্যু বরণ করেন।

MEMBER { Little Magazine Editors Association, Calcutta.
Hooghly Dist. Patra Patrika Somity, Hooghly.
GODHULI MONE N.P. Regd. No. RN. 27214/75 *March '84* (চৈত্র '৯০)
Vol 26, No. *3* Postal Regd. No. Hys-14 Price—*Rs. 1 50 only*

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সরলা প্রিন্টার্স, বড়বাজার, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও নতুনপাড়া, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি-মন

২৬ বর্ষ / ৪র্থ-৫ম সংখ্যা

বৈশাখ / ১৩৯১

প্রতি সংখ্যা দেড় টাকা
বার্ষিক (সডাক) পনের টাকা

: সম্পাদক :
অশোক চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

আরও একটি রবীন্দ্র জয়ন্তী এল। এবং অন্যান্য বছরের মতো এবারেও বেশকিছু হুজুগে মানুষ যথারীতি ভীড় জমালেন রবীন্দ্রসদনে জোঁড়াসাকোয়। আপনি তাদের পাশে কিছুক্ষণ বসে আলোচনা শুনলেই বুঝতে পারতেন তাদের আলোচনায় সবকিছু থাকলেও রবীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে অনুপস্থিত। যেভাবে মহিলারা উলের গোলা নিয়ে খেলার মাঠে যান শীতের দুপুরে। তফাৎ শুধু এই এটা প্রখর গ্রীষ্ম। নানা রঙের বাহারী ছাতায় উৎসব রঙিন। কৃষ্ণচূড়ার সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে প্রখর নীলিমা। আজানুলম্বিত আলখাল্লা এবং শ্মশ্রুমণ্ডিত সেই বৃদ্ধ এইসব দেখতে দেখতে সম্ভবত হেসেই ফেলেন। অর্বাচিনদের কাণ্ডকারখানা।

বিকেলে রবীন্দ্রসদনের আমন্ত্রিত কবি সম্মেলন—সেখানেও কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী। কিছু প্রবীন কবির সাত-আট পাতার সুদীর্ঘ কবিতা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়েছেন সকলেই। শুধু আকারেই বড় সেজন্য না. সেগুলি অতি নিকৃষ্টমানের কবিতা। অমন কবিতা কোন তরুণ কবি পড়তে সাহস করতেন না। তরুণেরা ছোট কবিতা পড়েছেন—সুন্দর কবিতা, পড়াও সুন্দর। একজন তথাকথিত বামপন্থী কবি সম্মান-দক্ষিণা মাত্র কুড়ি টাকা দেওয়ায় ঝামেলা শুরু করলেন। এবং এইভাবেই আরো একটি রবীন্দ্রজয়ন্তী অতিক্রান্ত।

শুধুমাত্র কিছু রাবিন্দ্রীক প্রতিষ্ঠান এবং কিছু গবেষক ছাড়া রবীন্দ্র চর্চার আন্তরিকতা আজ আর কোথাও নেই।

সোফিওর রহমানের কবিতা

জীবন্ত প্রতিক্রিয়ার কবিতা

সাদা ফেনার মুকুট মাথায়
এক হুল্লুড়ে মানুষ
সময়কে শ্মশান জেনেও
মাঝ সমুদ্রের নীলে কেবলি ভাসছে
কে যেন বলল—
উত্থানে পতনে বসতে বাণিজ্যে
শূন্যের সমবাহিকা বিন্দু
কোথায় লিপ্ত উল্লাস ?

অথচ প্রতি লোমকূপে
শত সহস্র বুদবুদ—
যেন জীবন্ত প্রতিক্রিয়ার মুকুট,
কার্যমথিত ফেনার পৃথিবী
শুধু বাইরেটুকু কুসুমের হাসি ।

অভিমানী মানুষের কবিতা

গুমোট মেঘ, অন্ধশিখা দুপুর
এই শুনশান উদ্যানে
কেউ কি আসবে না পাশে ?
অথচ অভিমানে অলংকারে কাকে যেন আশা……

ঝরণা থেকে আনা এক কলসী সুন্দরী পাণিতে
অকৃপণ বাহু দিয়ে কেউ যদি
একতিল প্রতিক্রিয়া এঁকে দিত বুকে…
পয়ারে বেঁধে দিতাম অভিমানে সব স্বরলিপি,
বছরভোর ডায়েরীর প্রতিটি পাতা ।

পণ্ডশ্রম / নয়নকুমার রায়

কবি, তোমার সৃষ্টিতে
মানুষের সু-ঘ্রাণ নেই
আছে প্রচুর নর্দমার পাঁক ।

তোমার শ্রম, পণ্ডশ্রমে ঝরে যায়
কালের গহ্বরে ।

তোমার ফসল কেউ ঘরে তোলেনা
তের পার্বণ নবান্ন উৎসবে ।

তোমার সৃষ্টি অন্ধকারে তলিয়ে যায়
বিস্মৃতির ইতিহাসে
মুক্তিকামী মানুষ থেকে
লক্ষ মাইল দূরে…… ।

●

শেষ দৃশ্যাবধি / অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

এই মাটিতে ফসল ফলে সবুজ-সোনা
মন টেকেনা এই মাটিতে তবু আমার—
মনের মাটি সবুজ তো নয়, শস্যকণা
এই মাটিতে গরল ছড়ায়, বুকের খামার
শস্যবিহীন স্বর্ণবিহীন, মরুভূমির
বালির ভেতর লাফিয়ে বেড়ায় ধূর্ত কুমির
কোথায় যাবার ছিলো কোথায় ছিলো নামার—
এই নিয়ে শেষ দৃশ্যাবধি প্রহর গোনা !

আয়না–১ / নির্মল বসাক

যে কথা বোঝাতে অনুবাদকের ঘাম ছুটে যায়
শিল্পী আঙুলে কেঁপে বেঁকে যায় রেখা
কবির কবিতা তুচ্ছ তোমার কাছে   শব্দে রেখায় কথার বাঁধনে
যুগপৎ তুমি হাসো   শিশিরের চোখের পাতাটি ভিজে ওঠে কান্নায়
পরিবেশনায় যেমন রয়েছ তেমনি রয়েছ রান্নায়

তাই সভাসদ সভা ফেলে ছুটে পুষ্পপরাগে
অনুরাগে তুমি ডাকো পাতা পল্লবে   আমাদের নিঃশ্বাস
সব বিশ্বাস একাকার হয়ে দুঃখ বা স্মৃতি কীরকম করে যায়
তুমি চলে গেলে   শিল্পী বসায় মনের মতন রঙ   কবিতা শব্দ পথ খুঁজে পায়
দশদিকে ছুটবার   অভিমানীনী একটু দাঁড়াতে যদি
অনুবাদকেরা অনুবাদ করে   শব্দ শরীর পিছল জোছ্‌না যেন

যেটুকু ভ্রম বা বিভ্রম আছে সেটুকু পূরণ কর
ডেমনষ্ট্রেশনে একটি আঙুল ঠোঁটের ওপর ছোঁয়ায় ।

মহানিমগাছ / সংযম পাল

আমি আজ একা আছি, বুকের ভেতর থেকে খ'সে পড়ে নীল মানবতা,
আমার ভেতরে রক্ত খুব উঁচু উঠে যায়, কণাকণা তার
ফেণা ও স্বাদের গন্ধে নারী খুব কাছে আসে, মহানিমগাছ
বাতাসে দুলিয়ে পাতা যে তিতো ছড়ায় তাকে ভালোবাসি আমি ।

আমার এ' একাগান কে আর শুনবে, যদি নারী কাছে এসে
না ছায় মাখন, গাঢ় হলুদের আরোচনা, আবাদ খয়েরী,
যদি না ছায় প্রাণের তাপ, তবে আমি ক্রমশই আরো নীচে নেমে
একারক্তে শুয়ে থেকে মৃত্যুকে চিনবো, আর মরণ কোথায় !

নারী আজ কাছে এসে আমাকে ছিনিয়ে নিক্‌, একা সেই যম
ডেভিলের কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিক্‌, আমি ভালোবাসা
তাকে দেবো নবচিহ্ন, তাকে আমি আমার আকাশ
হাত ভ'রে তুলে দেবো, যদি সে বাঁচায় এসে আমাকে, মরণ ?

ভাঙন / রবীন সুর

জোয়ার অথবা ভাটা তার কোন বিশ্রাম দেখি না
যদিবা সিন্ধুর স্বপ্ন কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে
তখন উৎসের খোঁজে দ্বিগুণ আয়ত
পাহাড় পাহাড়তলি আরণ্যক উপত্যকা পেরিয়ে ক্রমশ
জন্মের মুহূর্তগুলি
যত দিকে যত শাখা ও প্রশাখা
অশ্রুত ঘণ্টার শব্দে পেয়েছে বিস্তার
কোনোদিন দাঁড়িয়ে থাকে না
অথচ প্রায়ই
আমাদের সমস্ত প্রার্থনা
উদয়াস্ত অস্তোদয় সময়ের মধ্যে উপক্রম
কোথায় দাঁড়াব কিছুক্ষণ
ঠাণ্ডা স্থির জলে অবগাহনের
পরিতৃপ্তি কোথায় রয়েছে
এখন নির্মাণ
অথচ জোয়ার অথবা ভাটায়
যে কোন স্রোতেই
সে কোথাও দাঁড়াতে জানে না
অবিরাম যাতায়াতে তার ভাঙা গড়া
অপেক্ষার দুর্দম নিঃশ্বাসে
আমার সমস্ত কিছু ভেঙে যাচ্ছে
কোনোদিকে নির্মাণের সমাচার বাতাসে ওড়ে না !

প্রতিচ্ছবি / বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

নীরবতা গান গায়,
রাত্রি ঘুমায় ।
সারেঙ্গী মত্ত অবসাদে,
নূপুরের অশ্রু ঝরে
রাধানাম স্মরে ।
মালকোষ সুর ভাসে
নিভে যাওয়া ধূপের মতো ।

যে সাজে সাজো না তুমি
আমি দেখি, অপলকে দেখি
দেয়ালে টাঙানো ওই মৈত্রেয়া মুখ
তোমার মুখে,—
বড় বিস্ময় জাগে ।

আর এক সকালে—
নিজেকে দেখে নাও
বিন্দু বিন্দু শিশির দর্পণে,
আরক্তিম সূর্যে ।

'সব পথ এসে মিলে গেল শেষে তোমার দুখানি নয়নে'

সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

আবু সয়ীদ আইয়ুব নানা কারণেই বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। বিশেষ করে রবীন্দ্র সমালোচনার ইতিহাসে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। মোহিতলাল মজুমদার একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন — 'এই দীর্ঘকালেও রবীন্দ্রকাব্যের একটি সুসঙ্গত আলোচনা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইল না, এ পর্যন্ত যাহা কিছু হইয়াছে তাহাতে কোন সাহিত্যিক আদর্শের সন্ধান নাই; তাহা ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাস সমালোচনা নয়, গুণালোচনা মাত্র।' খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে মোহিতলাল আজ আমাদের মধ্যে নেই। থাকলে তিনি একথা হয়তো বলতে পারতেন না। কারণ আবু সয়ীদ আইয়ুব এই অভাব পূরণ করে গেছেন।

রবীন্দ্রপ্রেমিক, প্রচারবিমুখ ও রবীন্দ্র পুরস্কারধন্য এই মানুষটি কিভাবে উর্দু, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষার বেড়া টপকে বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথে এসে পৌঁছলেন এটাই বর্তমান প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়। 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে আইয়ুব লিখেছিলেন 'প্রথমে উর্দুতে এবং পরে ইংরেজিতে গীতাঞ্জলি পড়ে মুগ্ধ হয়ে মূল ভাষায় গীতাঞ্জলি পড়বার দুর্দম আগ্রহই আমাকে বাংলা শিখতে বাধ্য করে। মাস কয়েক খুব অল্প পরিশ্রমের ফলেই আমি গীতাঞ্জলির সরল বাংলা বুঝতে সক্ষম হই।' এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে আইয়ুব-এর বয়স যখন তের বছর তখনই তিনি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির উর্দু অনুবাদ পড়েন। এত অল্প বয়সে তিনি গীতাঞ্জলি পড়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি তার প্রেম ও অনুরাগ জন্মেছিল এটা ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। এই উদ্যম খুবই প্রশংসনীয়। কারণ এই বীজ ভবিষ্যৎ মহীরুহে পরিণত হয়েছিল। যদিও তিনি বলেছিলেন বাংলা কাব্যচর্চা গীতাঞ্জলি পাঠের পর আর বেশিদূর এগোয়নি। বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রথম পর্ব এইভাবেই শেষ হয়েছিল। মাঝখানে উর্দু ও ফরাসীর প্রতি তার আগ্রহ বেড়ে গিয়েছিল। তখন তিনি গালিব, মীর, দদ, ওমর খৈয়াম এবং হাফিজ-এর কাব্যরসে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন।

বাংলা ভাষা শিক্ষার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছিল কলেজ জীবনে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে তিনি যখন আই এস সি পড়তে শুরু করলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। তিনি নিজে বলেছেন 'কলেজে ভর্তি হবার পর সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা সহজ মসৃণগতিতে এগোচ্ছে না, চলছে এবড়ো-খেবড়ো পথ দিয়ে। বার বার বিঘ্নিত হচ্ছে। আমি ইংরেজি বলে যাচ্ছি সহজেই, তারা কিন্তু সহজে ইংরেজিতে উত্তর দিতে পারছে না। কাজেই তারা বাংলাই বলছে, তবে ইংরেজি মিশিয়ে। এই অস্বাভাবিক অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়ে আমি স্থির করলাম যে আমাকে কথোপকথনের উপযুক্ত বাংলা শিখতে হবে।' যেই ভাবা সেই কাজ। বাড়ীর অনতিদূরে ছিল তালতলা লাইব্রেরী। তুঁহারা মাসিক চাঁদা দিয়ে সেখানকার সভ্য হয়েছিলেন। সেখান

থেকে শরৎচন্দ্র, সীতাদেবী, শান্তাদেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া প্রমুখের উপন্যাস ও গল্প সংকলন নিয়ে এসে পড়তেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ ও গোরা তিনি নিজেই কিনে ফেলেছিলেন। তবে ভাষা শিক্ষার দিক থেকে সবচেয়ে বেশি উপকার তিনি পেয়েছেন গোরা উপন্যাস থেকে। একথা তিনি নিজেও স্বীকার করে গেছেন। গোরা উপন্যাসটি তিনি চারবার পড়েছিলেন।

বাংলা ভাষা শিক্ষায় আবার ক্ষণিক বিরতি। কারণ এইসময় তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন ফিজিক্স-এ অনার্স পড়ার জন্য। তখন আবার ফরাসী, উর্দু, নরউইজিয়ান-এর ইংরেজী অনুবাদ পড়তে শুরু করেন। মাঝেমধ্যে পুনবী থেকে কিছু আবৃত্তি করতেন আবার কখনও কখনও বাড়ীর পাশে ছিল মুসলিম ইনষ্টিটিউট। সেখান থেকে প্রবাসী পত্রিকা সংগ্রহ করে বাংলা প্রবন্ধ পড়তে শুরু করেন। এইভাবে বাংলা ভাষা চর্চা করে চলতেন মাঝে মাঝে। তবে তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে দর্শনই হবে তার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিষয়। কিন্তু এহো বাহ্য। উপযুক্ত দার্শনিক মণ্ডলের অভাব তাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এল আবার সাহিত্যে।

কিন্তু এখানেও দেখা দিল সমস্যা। একটা প্রশ্ন তাঁর মনে উঁকি দিত। সেটা হল কোন্ সাহিত্য অবলম্বন করে তিনি লিখবেন এবং কোন্ ভাষায় লিখবেন। ইংরেজীতে লিখে আন্তর্জাতিক মহলে সাড়া জাগানো খুব কঠিন কাজ। এর কারণ তিনি হাতেনাতে পেয়েছিলেন। একটি ইংরেজী প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'Calcutta review'তে। নাম 'Philosophy and the Foundations of Science'। কোন সাড়া জাগায়নি কারু মনে। কেউ লিখিতভাবে বা মুখে প্রশংসা বা নিন্দা কিছুই করেননি। এরপর আসে উর্দু। এ সম্বন্ধেও তিনি বলেছেন 'যদি উর্দু ভাষার কেন্দ্রস্থল এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, বা আলিগড়ে জন্মাতাম অন্তত বড় হয়ে সেইখানে শিক্ষালাভ করতাম কিন্তু কলকাতায় আজন্ম বাস করে সেটা সম্ভব নয়।' আর এটাও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না করলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দ্বার সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হওয়া সম্ভব নয়।

এইভাবে মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব তাকে প্রতিনিয়ত আঘাত করতো। 'হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোনখানে।' আবার শুরু হল বাংলা ভাষা শেখার তৃতীয় পর্ব। এই বাংলা ভাষায় দেশে সংস্কৃতি উত্থানের জীবন্ত রক্ষ হচ্ছে সাহিত্য এবং তৎসংশ্লিষ্ট চিন্তা ভাবনা। সেই উদ্দেশ্য মনে নিয়ে বাংলা ভাষা ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের স্বরূপ, কালান্তর, রাশিয়ার চিঠি প্রভৃতি মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করেন। শুধু তাই নয়, পুরোনো বইয়ের দোকানে গিয়ে ত্রৈমাসিক পরিচয় পত্রিকা কিনে প্রতি সংখ্যা পড়তে থাকেন। এই ভাবে ধীরে ধীরে মন স্থির হয়ে ওঠে। এক সময় সুধীন্দ্রনাথের ধ্বনি ঝংকৃত সন্ধি সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দ সমৃদ্ধভাষা আবু সয়ীদ আইয়ুবকে আকৃষ্ট করে বসে। সেই সঙ্গে কিছুটা সচেতন প্রভাব। তবে সে প্রভাব তিনি কাটিয়ে উঠেছিলেন পরে। এই 'পরিচয়' পত্রিকাতেই আবু সয়ীদ আইয়ুবের প্রথম প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। নাম "বুদ্ধি বিভ্রাট ও অপরোক্ষানুভূতি" আর এই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রচর্চার সূত্রপাত অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বের আলোচনা। তারপর হুমায়ুন কবিরকে সঙ্গে নিয়ে আইয়ুব গিয়েছিলেন পরিচয়-এর শুক্রবারিক সান্ধ্য বৈঠকে। সেখানেই সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। সুধীন্দ্রনাথ বলেছিলেন Your article was so excellent that I wanted to make it the leading article. I hope you did not mind the delay." সুধীন্দ্রনাথ দত্ত গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখাটি পড়ে শোনান। শুনে রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়ে

বলেছিলেন এঁকে দিয়ে আরও লেখাও। যে তেরো বছর বয়সে আইয়ুব আকৃষ্ট হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের উর্দু গীতাঞ্জলি পড়ে। সেই রবীন্দ্র প্রেমিক এই ভাবেই রবীন্দ্র চর্চার সূত্রপাত করলেন লেখার মাধ্যমে। এই প্রেম আরও গভীর হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর "Rabindranath Tagore—Portrait of a Poet" এবং বাংলা গ্রন্থ 'কবি রবীন্দ্রনাথ' পড়ে। একথা তিনি নিজেও বলেছেন।

রবীন্দ্র প্রেম আরও গভীর হয়েছিল ১৯৩৭ সালে যখন তিনি ভাল একটি গ্রামোফোন কেনেন এবং তার অনেকগুলি রবীন্দ্রনাথের গানের রেকর্ড—কণক দাস, অমিতা সেন, রাজেশ্বরী, বাসুদেব, কণিকা মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। একদিকে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মহৎ কবি ও অপরদিকে মহৎ সুরকার–এর এক বিস্ময়কর সাফল্যে আবু সয়ীদ আইয়ুব আকৃষ্ট না হয়ে পারেন নি। এছাড়া পুরবী, কল্পনা, ক্ষণিকা ও খেয়া কাব্যগ্রন্থ আইয়ুবকে মুগ্ধ করেছিল। পরিশেষ ও পুনশ্চ পড়ে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। এই অভিভব টিকেছিল শেষলেখা পর্যন্ত। তারপর শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় দত্ত প্রভৃতি নবীন কবিদের লেখার মধ্যে শেষ পর্বের রবীন্দ্রকাব্যের সোচ্চার অবমূল্যায়ন এবং অননুশীলন আইয়ুবকে চ্যালেঞ্জরূপে উপস্থিত করলো। তখন থেকে আইয়ুব-এর মনের মধ্যে একটি দাবী দুর্বার হয়ে দেখা দিল রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে কিছু লিখতেই হবে। আইয়ুব বলে গেছেন—'রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমি বিশদভাবে বলতে আরম্ভ করি ১৯৬৪ সালে শেষ করি ১৯৭৭ সালে।' এই তের বৎসর ধরে আইয়ুব-এর মন ও মত বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে নানা পবিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই সময়ের মধ্যে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কথা আলোচনা করে গেছেন। যেমন আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, poetry and truth, গালিবের গজল থেকে, পান্থজনের সখা ইত্যাদি। দেশ পত্রিকায় আবু সয়ীদ আইয়ুব গীতাঞ্জলি কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার নাম 'নয়নে কেন আঁধি'। এই নাম খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথের 'শেষ লেখা' কাব্যগ্রন্থ পড়ে সেখান থেকে গ্রহণ করেছিলেন। 'শেষ লেখা'র ৫০ সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

'যদি গগনে জাগিল আলো
কেন নয়নে লাগিল আঁধি।'

এই 'আঁধি' শব্দটি তাঁকে খুব আকৃষ্ট করেছিল। এছাড়া 'দেশ' পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রবিষয়ক প্রবন্ধ। যেমন পথের শেষ কোথায়, শুধু ধুলি শুধু ছাই, ভাষা শেখার তিন পর্ব এবং প্রসঙ্গত, শান্তি কোথায় মোর তরে হায় ইত্যাদি। 'পান্থজনের সখা' বইখানি পড়ে এক বন্ধুস্থানীয় ভদ্রমহিলা বলেছিলেন 'আপনি রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে ভালবাসতে শিখিয়েছেন আমাদের, সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো।' এই আন্তরিকতা আবুসয়ীদ আইয়ুবকে প্ররোচিত করেছিল রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আরও লিখতে এবং তিনি নিজেও তার পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করেছিলেন। খুব সম্ভব ১৯৮৩ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার পক্ষ থেকে কয়েকজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও অধ্যাপককে প্রশ্ন করা হয়েছিল বিগত বৎসরে প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে কোন্‌টি ভাল এবং কেন ? উত্তরে অল্প কথায় অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত 'পান্থজনের সখা' সম্পর্কে যে ভাবটি প্রকাশ করেন সেটা পড়ে আবুসয়ীদ আইয়ুব তার পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করেছিলেন। 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' সম্পর্কে কয়েকজন লেখকের সমালোচনা বিভিন্ন পত্রিকায় বেরিয়েছিল যেমন 'গ্রন্থ পরিক্রমায়' প্রকাশিত সুকুমারী ভট্টাচার্যের লেখা,

'দেশ'-এ প্রকাশিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা এবং 'কলকাতা' পত্রিকায় প্রকাশিত অরুণ সরকারের সমালোচনা। এছাড়া কয়েকটি উৎসাহপূর্ণ চিঠিও পেয়েছিলেন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক ও সমালোচকদের কাছ থেকে। এই সমস্ত আলোচনা, সমালোচনা ও প্রশংসা আইয়ুবকে প্রেরণা দিয়েছিল, উৎসাহ যুগিয়েছিল রবীন্দ্রপথপরিক্রমায়। শুধু তাই নয় আইয়ুব বলে গেছেন 'রবীন্দ্রনাথ আমার মনকে প্রসারিত করেছেন, হৃদয়কে সুন্দরসগ্রাহীও সংবেদনময় করেছেন।' এইভাবেই তিনি রবীন্দ্রনাথে এসে পৌঁছেছিলেন। তবে মনে একটা আক্ষেপ নিয়ে আবু সয়ীদ আইয়ুব চলে গেলেন। গালিবের ভাষায় প্রকাশ করি—'চলে যাচ্ছি জীবনের শত অপূর্ণ বাসনার / ক্ষতচিহ্ন বুকে নিয়ে, / আমি এক নির্বাপিত প্রদীপ, মহফিলে / রাখার যোগ্য নই আর।'

চোখ থেকে

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

'ধর্মনিরপেক্ষতা নিজের ধর্মকে জলাঞ্জলি দেওয়া নয়।' সকালের খবরের কাগজে প্রথম পাতার নিচের দিকের শিরোনামে চোখ আটকে গেল অনিন্দ্যর। লেখা—দ্বারকা ও যোশী মঠের উনষাঠ বছর বয়সী ছয় ফুট তিন ইঞ্চি দীর্ঘদেহী শঙ্করাচার্যের আসল ব্যক্তিত্ব তার দীপ্তিময় অথচ প্রশান্ত চোখ দুটিতে। জনৈক সাংবাদিকের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তার মতে আপেক্ষিক! আমরা সবাই খুঁজছি। খুঁজছি পূর্ণজ্ঞান স্থিতপ্রজ্ঞ হবার জন্য। অনিন্দ্য মনে মনে বলল, খোঁজা থেকে জ্ঞান। জ্ঞান থেকে নির্নিমেষ আনন্দ। পাতা উল্টে কোলকাতার কড়চা। ছবি: জনৈক বিজ্ঞানী রাধারমণ রায়ের। নিবন্ধে লেখা—বছর তিনেক আগে আমেরিকার একটি কাগজে একজন বাঙালীর নাম শিরোনাম হয়েছিল: রাধারমণ রায়। পারমাণবিক আবর্জনা অপচয়কে তেজস্ক্রিয়তা মুক্ত করার এক পদ্ধতির আবিষ্কারক। অনিন্দ্য মনে মনে বলল, খোঁজা থেকে গরল সিঞ্চন তার ওপর অমৃতের প্রলেপ। শঙ্করাচার্যের খোঁজা, রাধারমণ রায়ের খোঁজা রাম, শ্যাম, যদু, মধুর খোঁজা··· অনিন্দ্যর খোঁজা সুমিত্রার খোঁজা······।

আচ্ছা সুমিত্রা, দেখা থেকে খোঁজা আসে। খোঁজা থেকে আসে চাঞ্চল্য। অথচ দেখ আজ সকালে দেখলাম শঙ্করাচার্য বলেছেন, খোঁজা স্থিতপ্রজ্ঞ হবার জন্য। সুমিত্রা কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকাল অনিন্দ্যর দিকে তারপর বলল, কি জানি। কথাগুলো বড্ড জটিল। তবে আমার মনে হয় যেখানে দেখার শেষ সেখানে চাঞ্চল্যেরও শেষ! অনিন্দ্য, সুমিত্রা তখন ময়ূরাক্ষীর বাঁধের ওপর। ময়ূরাক্ষীর ছলাৎ ছলাৎ জলের শব্দ। পাখীরা আসন্ন অন্ধকারে আস্তানার খোঁজে ব্যস্ত। হঠাৎ সুমিত্রা নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে প্রশ্ন করল, আচ্ছা অনিন্দ্য বলতে পার চোখ থেকে মানুষ কি পায়? অনিন্দ্য ময়ূরাক্ষীর জলে নিজের চোখের প্রতিচ্ছবি দেখার চেষ্টা করল। কিছুক্ষণ বাদে অস্ফুটে বলল, কি আবার, দেখা - দেখা থেকে খোঁজা।—শুধুই খোঁজা, ব্যাস? সুমিত্রা গলার মধ্যে একটা গভীরতা এনে জিজ্ঞেস করল। বলল ভাব অনিন্দ্য—আরও ভেবে বল। ময়ূরাক্ষীর বাঁধে গোধূলিকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছিল সন্ধ্যার আবছায়া। আধো অন্ধকারে ফিকে নীল শাড়ীতে সুমিত্রাকে সামুদ্রিক বলে মনে হয় অনিন্দ্যর। অনিন্দ্য হঠাৎ নরম গলায় উদাস ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করল, তুমি সমুদ্র দেখেছ কোনদিন? হুঁ দেখেছি। আলতো ঘাড় নাড়ে সুমিত্রা। আচ্ছা তুমি সমুদ্রের গভীরতা বোঝ?— না বুঝি না। অনিন্দ্য গম্ভীর হয়ে বলে, সমুদ্রের গভীরতা বোঝ না অথচ সমুদ্র দেখেছ! ময়ূরাক্ষী দেখেছ অথচ ময়ূরাক্ষীর কান্না বোঝ না!— ময়ূরাক্ষীর কান্না? সুমিত্রা অবাক হয়ে তাকাল অনিন্দ্যর দিকে। অনিন্দ্য বেশ জোরে ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ কান্না। দেখছ না এই

বাঁধের পাড়ে ময়ূরাক্ষীর জলের দিনরাত আছড়ে পড়া কান্না। আসলে গভীরতা নেই বলেই এই বাঁধন। গভীরতা নেই বলেই এই বাঁধনের কান্না। সুমিত্রা বাঁধের নীচে আছড়ে পড়া জলের শব্দ শুনছিল।— আসলে তুমি ভাল করে দেখতেই জাননা। তাই চোখের ভাষায় অন্য কিছু চাও। সুমিত্রা এই বার হেসে ফেলল। বলল, বুঝলাম তুমি শুধুই দেখ। অনিন্দ্যর চোখ এখন সুমিত্রার চোখে। অনিন্দ্য হয়তো অন্য কিছু খুঁজছিল। কিছুক্ষণ পর বলল, ঠিক আছে পরে একদিন এর সঠিক উত্তর দেব। অনিন্দ্য কোলকাতার ছেলে কর্মসূত্রে এখন এখানে। সুমিত্রা ময়ূরাক্ষীকে দেখছে জন্মের পর থেকে। অনিন্দ্য ছুটির দিনে কোলকাতায় ফিরে যায় তার পরিচিত-জনের কাছে।

অনিন্দ্য দোকানে ঢুকে এককাপ চায়ের অর্ডার দিল। শীতের দুপুরে দোকানের স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকারে লোকজন প্রায় ফাঁকা। ছুটির দিনে কোলকাতায় ফিরে অনিন্দ্য এই দোকানটায় আসে প্রায়ই।— অ্যাই অনিন্দ্য, এদিকে আয়। এই টেবিলে বোস। পরিচিত কন্ঠস্বরে অনিন্দ্য ঘাড় ফেরাল। টেবিলে মুখোমুখি এখন অনিন্দ্য, সুজয়। কেমন আছিস অনিন্দ্য?

ভাল, তুই কেমন?

ব্যস্ত। একটা গভর্ণমেণ্ট কনট্রাকট নিযে লড়ালড়ি করছি।

তুই কি ছিলি সুজয় আর এখন কি হলি। চেহারার মধ্যে কি প্রচণ্ড পরিবর্তন। বিশেষ করে তোর চোখে।

চোখে? কেন নতুন কিছু দেখলি। এই শোন ভাবছি বাড়িতে একটা ফোন নেব। একটা মোটর বাইক অলরেডি—। আচ্ছা অনিন্দ্য তোর ছেলেবেলার স্কুলের কথা মনে পড়ে?

পড়ে, তবে কেমন যেন ফ্যাকাসে।

আচ্ছা তোর অচিন্ত্যকে মনে পড়ে অনিন্দ্য? জানিস তো—ও এখন লণ্ডনে। ছেলেবেলায় ওকে আমরা কত ক্ষ্যাপাতাম বড়লোক বাপের লালু ছেলে বলে। তোর সঙ্গে ওর কত পার্থক্য ছিল। অথচ তা সত্ত্বেও—।

তা সত্ত্বেও পার্থক্যতো আছেই। ও টেমসের ধারে কাছে—আমি ময়ূরাক্ষীর। আসলে অনিন্দ্য তুই চার-পাশটা একটু ভালকরে তাকিয়েও দেখলি না তা নাহলে—।

তা নাহলে কি? আমার ছেলে আর তোর ছেলেতে দূরত্ব থাকবে ময়ূরাক্ষী থেকে টেমস্?

হ্যাঁ ঠিক তাই। আসলে কি জানিস—আমি জানি আমায় কিছু পেতে হবে। চারপাশটা দু-চোখ ভরে দেখছি আর বুঝছি দু-কদম এগিয়ে গিয়ে কিছু পাওয়াটাই দেখার আসল উদ্দেশ্য।

অনিন্দ্য এখন হাঁটছে কোলকাতার ফুটপাত ধরে। দু-পাশে গাড়ি, মানুষ, কথা, চোখ দৃশ্য চোখ—শব্দ, চোখ—। আসলে কিছু পাওয়া। বেশীরভাগ চোখেই অনিন্দ্য দেখছে দু-কদম এগিয়ে গিয়ে কিছু পাওয়ার প্রচেষ্টা।

গোধূলি বিকেল। রংচংয়ে শনিবারের শেষ বেলা। এই পার্কটা অনিন্দ্যর বড় চেনা। পশ্চিমে ঢলে পড়া লাল সূর্য পার্কের মধ্যে ছড়ানো কদমগাছটাতে আবীর ছড়িয়েছে। মৃদু ঝোড়ো হাওয়া পুরোনো দিনের কদমগাছটা থেকে পুরোনো দিনের কথা বয়ে অনিন্দ্যর মাথার চুলে আকুলি বিকুলি করছিল। পুরোনো দিন, পুরোনো কথা—। এখন অচিন্ত্য লণ্ডনে, সুজয় গভর্ণমেণ্ট কনট্রাকটর, অপূর্ব ইউনিভারসিটির লেকচারার, কমল কোলকাতা রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা,

প্রণব—আমি, আমি—সুমিত্রা—ময়ূরাক্ষীর বাঁধ— । আসলে চোখ থেকে মানুষ কি পায়? অনিন্দ্য মনে মনে বলে ওঠে, চোখ থেকে আসে শুধুই চাওয়া। একটা বিরাট রাজনৈতিক মিছিল চলেছে পার্কের পাশ দিয়ে। অনিন্দ্য তাকাল মিছিলটার দিকে। মিছিলে মানুষ, জোড়া জোড়া চোখ, মুখে শ্লোগান, কেউ তেমন করে পেছনে তাকাচ্ছে না। সামনের চক্চকে কালো রাস্তা ধরে চলেছে দু-চোখের অভিব্যক্তির মিছিল।

অনিন্দ্য যখন বাড়ি ফিরল রাতের অন্ধকার তখন বেশ গাঢ়। তোর একটা চিঠি আছে অনিন্দ্য। মা চিঠিটা অনিন্দ্যর হাতে তুলে দিল। সুপ্রিয়র চিঠি। সুপ্রিয় জিওলজিস্টের চাকরী নিয়ে এখন বিহারে। লিখেছে—'বিহারের এই পাহাড়ী গ্রাম আমাকে টেনেছে বড্ডবেশী। পাথর নিংড়ে সম্পদ বের করব বলে এখানে এসেছি। এখানকার সৌন্দর্য দেখছি। কালো পাহাড়ের চূড়ায় সূর্যের শেষ বেলার রঙ দেখছি। খুঁজছি পাথর। কিন্তু এখন দেখছি এই পাথরের পাশাপাশি রয়েছে জীবনের অন্য এক শব্দ। তাই ভাবছি একদিন শেষবেলায় ঐ পাহাড়ের চূড়ায় যাব। এক নজরে এই গ্রামের দিনান্তকে দেখব পাথর খোঁজার পাশাপাশি।" অনিন্দ্য চিঠিটা নিয়ে বিছানায় রাখল। সুপ্রিয়র পাথর খোঁজা থেকে জীবনের শব্দ শুনতে পাওয়া। চোখ থেকে কি আসে—দেখা? নাকি খোঁজা? নাকি অন্য কিছু। সুমিত্রা কি ঠিক বলেছে। শঙ্করাচার্যের দেখা থেকে খোঁজা। খোঁজা স্থিতপ্রজ্ঞ হবার জন্য। তাই তিনি ঘর ছাড়া। চলছেন এবং খুঁজছেন। দেখছেন এবং চলছেন। রাধারমণ রায়ের খোঁজা। রাধারমণ রায় ঘর ছাড়া। বাংলা দেশ থেকে সুদূর আমেরিকা। অচিন্ত্য লণ্ডনে অনিন্দ্য ভাবছে—সুজয় সুজয়ের দেখা থেকে পথচলা, আরও পাওয়া। অনিন্দ্য কোলকাতা থেকে ময়ূরাক্ষী। সুপ্রিয় সেই ছোট্ট পাহাড়ী গ্রামে জীবনের অন্য শব্দ দেখে পাহাড়ের চূড়ামুখি। এখন অনিন্দ্যর ঘুম পাচ্ছে—ঘুম—ঘুম থেকে স্বপ্ন।

অনিন্দ্য দেখছে বিভিন্ন রঙ। একটা পাহাড়ী উপত্যকা উঁচু নিচু মালভূমি। মালভূমির বুক চিরে একটা কালো রাস্তা। রাস্তার ওপর আলোর রঙ বদলাচ্ছে। বেগুনী থেকে নীল। নীল থেকে আসমানী। আসমানী থেকে সবুজ। সবুজ থেকে ক্রমশঃ লাল, ঘোর লাল তারপর সাদা। সুপ্রিয় পাথর খুঁজছে, জীবনের রঙ খুঁজছে এক ঝাঁক সবুজের মধ্যে। সুপ্রিয় হাঁটছে, এগিয়ে চলেছে। সুজয় এক রাশ নীলিমার মধ্যে এক-কদম, দু-কদম করে এগোচ্ছে। এগিয়ে চলেছে অচিন্ত্য, প্রণব......ভিন্ন রঙের আলোর মধ্যে দিয়ে। রাধারমণ রায়ের খোঁজা এবং চলা, শঙ্করাচার্যের খোঁজা এবং চলা, রাম, যদু, মধুর খোঁজা এবং চলার রঙ-বাহারী রোশনাইয়ে কালো চকচকে বন্ধুর রাস্তায় এখন সাত রঙের নাচন। তার চূড়া বরফে ঢাকা। সাদা ধপধপে সাদা হিম শীতলতা। সেখানে রঙবাহার নেই। নেই রঙের চাঞ্চল্যের উন্মত্তা। এই চূড়ায় উঠে সমস্ত মালভূমির জীবনের রঙ এক লহমায় দেখা যায়। অনিন্দ্য দেখছে কালো রাস্তা ধরে হাঁটছে সবাই। প্রত্যেকের চোখ দুটো সোজা এবং পাহাড়ের চূড়ার দিকে। সবাই ভাবছে সমস্ত মালভূমির জীবনের রঙ দেখবে একনজরে। বেগুনী থেকে নীল। নীল থেকে আসমানী। আসমানী থেকে সবুজ, তারপর ক্রমশঃ হয়তো বা শুধুই সাদা। অনিন্দ্যর হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। দরদর করে ঘামছে অনিন্দ্য। বিছানা থেকে উঠে দেখল জানালার পাশে রাস্তার সামনের ল্যাম্প-পোষ্টের মৃদু স্থির আলো অনিন্দ্যর বিছানায়। অনিন্দ্য জানালার সামনে এলো। নিঃস্তব্ধ কালো রাত্রি। জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখল এই মুহূর্তের মাথার ওপর আকাশের আসমানী রঙ ওর কাছে খুব শীতল এবং শান্ত। ছুটির দিন কালকেই শেষ। আবার কাজ। ময়ূরাক্ষীর কাছে ফেরা।

দিনের কাজের শেষে অনিন্দ্য ময়ুরাক্ষীর বাঁধের ধারে বেড়াতে আসে প্রায়ই। দূর থেকে অনিন্দ্য দেখল সুমিত্রা বাঁধের ওপর স্থির অচঞ্চল। অনিন্দ্য ধীরে ধীরে এখন সুমিত্রার কাছে। দু জনের কারও মুখে কথা নেই। বাঁধের গায়ে আছড়ে-পড়া জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। শেষ বেলায় সূর্যের রঙ বাঁধের গায়ে জলের ঢেউয়ে মিশছিল। অনিন্দ্যই প্রথম কথা বলল। বলল, সুমিত্রা আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর হয়তো পেয়েছি। সুমিত্রা মুখ তুলে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, কি? অনিন্দ্য বলল, চোখ থেকে আসে খোঁজা, খোঁজা থেকে আসে যাওয়া। সুমিত্রার মুখে এখন যেন এক অলৌকিক হাসি। অনিন্দ্য বলল, কি ঠিক বলিনি বল? আসলে চোখ থেকে আসে যাওয়া। মানুষ চোখ থেকে পায় যাওয়ার প্রেরণা। সুমিত্রা আলতো করে ঘাড় নাড়ল, বলল, যাওয়াটাই বড় কথা।

এখন সুমিত্রা, অনিন্দ্য হাঁটছে। প্রথমে বাঁধের ওপর দিয়ে। তারপর বাঁধ পেরিয়ে ওপারে। সামনেই গ্রাম, মাটি, জীবনের সোঁদা গন্ধ। পাশেই ময়ুরাক্ষীর জলের স্রোত। ওদের দুজোড়া চোখ আসন্ন সন্ধ্যের আবহায় কেমন যেন আসমানী রঙে রাঙানো মন হচ্ছিল।

SUSOBHAN RAFI
1 Chha 4 Housing Board Colony
Bhagat ki Kothi
Jodhpur-342001
7 Apr 84

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি মন

মাননীয়েষু,

আজকেই আপনার পত্রিকা গোধূলি মন পেলাম এবং প্রথমেই আমার আকণ্ঠ ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। শ্রীযুক্ত আবুসয়ীদ আইয়ুবের উপর এ ধরণের সংখ্যা বের করা রীতিমত সাহস ও কষ্টসাধ্যের ব্যাপার। সেটি আপনারা সফল করেছেন জেনেই আবার আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রতিটি রচনাই মননশীল এবং শ্রীআয়ুবের উপর আলোচনা করতে-গিয়ে নিবন্ধ লঘু হয়ে যায়নি। যদিও সেটি হওয়ার আশংকা অনেক বেশী ছিল। পশ্চিমবংগে বুদ্ধিজীবী ও বোদ্ধার সংখ্যা বিরল না হলেও শ্রীযুক্ত আয়ুবের অনন্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে বলার মত ক্ষমতাবান ব্যক্তি বিরল। যাঁরা তাঁকে হৃদয় দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছেন, শুধু পাঠক হিসেবে লেখা পড়েই ক্ষান্ত হননি, তাঁকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন সার্বিক দিক থেকে তাঁরাই কিছু বলতে পারবেন। আমার মতে তাঁর মূল্যায়ন আজ নয় এখন হতে পঞ্চাশ বছর পরেই সম্ভব। এখনও সেরকম পাঠক তৈরী হয়নি। আমরা তাঁর তীব্র দ্যুতির প্রভার অংশটুকু নিতে পেরেছি মাত্র গভীর উৎসে পৌঁছানো অনেক দূর। তাঁর সমাহিত চেতনা বা চৈতন্যের স্তরে পৌঁছানো আজই সম্ভব নয়।......আপনাকে, লেখক কবি শিল্পী সবাইকে এই প্রচেষ্টার জন্য নমস্কার রইলো। এবং আপনাদের সঙ্গে আমিও তাঁর প্রতি অবনত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও ভক্তি জানাচ্ছি।

আপনাদের অভীলিপ্সাই আপনাদের পত্রিকার মান স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে একটি পত্রিকার মান নির্ভর করে 'পত্রিকা তৈরীর আর্ট' জ্ঞানের উপর নয়। নির্ভর করে পত্রিকার পিছনে যে পরিশীলিত মন বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজন আছেন তাঁদেরই জীবনবোধ; জীবনচেতনা—সমাজসচেতনতা ও বিশুদ্ধ শিল্প সচেতনার উপর। শিল্প মানবউদ্ভূত ব্যাপার হলেও মানব তথা মানব সমাজের বাইরের জিনিষ। যার রূপ-শক্তি সব সময়ই মঙ্গলাত্মক। তাইই বস্তুগ্রাহ্য পৃথিবীর সমাজের হুবহু দর্পণ কিংবা আংশিক কল্পনামিশ্রিত দর্পণই শিল্প নয়। কোনো শিল্প পাঠক বা দর্শককে অন্য এক চেতনার স্তরে পৌঁছাতে না পারলে তা শিল্প হয়ে ওঠে না—কালোত্তীর্ণ তো নয়ই। শিল্পের টেকনিক্যাল অর্থাৎ কলাকৌশল বিষয়টির গুরুত্ব সেখানে নিতান্ত গৌন। কেননা সেটি আপেক্ষিক এবং পরিবর্তনশীল, সীমাহীন। এই টেকনিকাল সংপৃক্ততাই এখনকার কবি সাহিত্যিক, শিল্পী পরিচালকদের একমাত্র দুর্বলতা বর্তমান বাংলায়। যা তাঁদের বারংবার শিল্পের আসল সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেবে এবং দিচ্ছে। এবং বৃহত্তর জনসমষ্টির সংযোগ হারাচ্ছে। যেটি ঘটেছে বিশেষভাবে বর্তমান ভারতীয় চিত্রকলায়। টেকনিক্যাল সংপৃক্ত চিত্রকলা (অন্ধ পাশ্চাত্য রীতি অনুকরণ) জীবনহীন হয়ে পড়ছে। অথচ দোষারোপ হচ্ছে জনগণের।

প্রিয় সম্পাদক আপনার সম্পাদনা ও পত্রিকা প্রশংসা দাবী রাখে এই কারণে যে—এই অবস্থাতেও আপনার এখনও বিশুদ্ধ শিল্পচেতনার কাছে অবনত। তার প্রমাণই : আবুসয়ীদ আইয়ুব সংখ্যার সাহসী প্রকাশ।

ধন্যবাদ ও নমস্কার জানবেন।
নিবেদন ইতি
সুশোভন রফি

'গোধূলিমন' নিয়মিত পাচ্ছি। লিটিল ম্যাগাজিনের ইতিহাসে আপনি একটা বিপ্লবের নজীর সৃষ্টি করেছেন—এর নিয়মিত প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। তাছাড়া বাঙলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষদের নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের কারণে আমার মতো অসংখ্য পাঠকের উষ্ণ অভিনন্দন আপনার প্রাপ্য।

কুলটি
৫।৫।'৮৪

আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ
মতি মুখোপাধ্যায়

সুহৃদেষু,

আবুসয়ীদ আইয়ুব সংখ্যার জন্য কেবল ধন্যবাদ নয়, অভিনন্দন রইল। ছোট পত্রিকার সম্পাদক হয়ে যে অসাধ্য সাধন করেছেন তার তুলনা মেলা ভার। নামী দামী পত্রিকা যে দায়িত্ব কর্ত্তব্য পালন করতে পারে না, তাই করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষায়—লিটিল ম্যাগাজিন আকাশের বিদ্যুৎ, আমি বলি—না লিটিল ম্যাগাজিন ঘরের প্রদীপ। নেভাতে পারো আমায়, নিয়ন আলো জ্বেলে, জ্বালাতে পারো মোমবাতি লোডশেডিং-এ। জ্বাললে একমুখী হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে আলো বিকিরণ করেই যাই। 'গোধূলিমন' ছোট পত্রিকার গর্ব, বড় পত্রিকার ঈর্ষা। আমার অন্তত তাই মনে হয়।

নমস্কারান্তে—
দীপালি দে সরকার 'ঊর্মি'

পুস্তক সমীক্ষা

দুটি কবিতা-সংকলন/দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

● আলোর দরজা/অরুণ কুমার চক্রবর্তী ও অমিত গুপ্ত, বর্তমান প্রকাশনী ভদ্রকালী, হুগলী। ৩·৫০ টাকা

দুই কবির আঠাশটি কবিতা নিয়ে দু'ফর্মার শীর্ণ সংকলন গ্রন্থ। শেষ মলাটে কবিদ্বয় এবং কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা নিতান্তই একটি কাঁচা বিজ্ঞাপন; যা সম্পূর্ণরূপেই বাহুল্য বলে মনে হয়। প্রচ্ছদটিও তেমন মনোরম নয়। কিন্তু গ্রন্থটির অভ্যন্তরে প্রবেশের পর বহিরঙ্গের ঐ অসঙ্গতিগুলোর প্রকৃতই ক্রম-বিস্মরণ ঘটে। বেশকিছু তাজা ঝরঝরে কবিতা পড়ার সুযোগে মন তৃপ্ত হয়।

জীবনের অবলম্বন বলতে খুব সহজে আমরা যা বুঝি—নিসর্গ—রূপ, ভালোবাসা, সময়-চেতনা, স্ত্রী-পুরুষের নৈসর্গিক আকর্ষণ এবং মনুষ্যজীবন সম্পর্কে একটা সামগ্রিক মূল্যবোধ; বিষয় হিসাবে আলোচ্য গ্রন্থের কবিতাগুলি এ সব কিছুকেই ছুঁয়ে আছে বলা যায়।

অরুণকুমার চক্রবর্তী কবি হিসাবে রোমান্টিক। তাঁর যোলটি কবিতার মধ্যে ছড়া-কাম-পদ্য ছন্দের কবিতাই বেশি। যেমন মিষ্টি সুরে ডাকলে দূরে দুই পাহাড়ের ছাওয়ায়/পাহাড় তো নয় জমাট মগন্ জাল ফেলেছি হাওয়ায়। উদ্ধৃতিটি যে কবিতার, তার শিরোনাম 'একটি অশ্লীল কবিতা'। শিরোনাম কবিতাটির রসগ্রহণে বাধা দেয়। অন্য ছন্দের দুটি লাইন—'এত পাপ জমেছে এখানে, জমে জমে পাহাড় হোয়েছে,/শীর্ষদেশে কোনমতে টলোমলো ভারসাম্যে আছি…'। কিংবা 'পাপ মানে ব্যক্তিগত সুখ, অজস্র অসুখ সে/নির্মম পাঠিয়েছে অন্য কোন মানুষের ঘরে ও দুয়ারে'। এ ধরণের কিছু বোধ ও বোধির মিলনে গড়ে উঠেছে কবির কবিতা। আধুনিক প্রকাশভঙ্গীর সাথে সাথে কবি বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তায় বাংলা কবিতার সনাতনী রূপটিকেও অনায়াসে মিশিয়ে দিতে পারেন, এবং শব্দ-ব্যবহারের উদার ও সাবলীল সতর্কতায় কবিতার স্থাপত্য কর্মেও যে তিনি যথেষ্ঠ নিপুণ, তা সহজলক্ষ্য। তবু বলবো, আত্মমগ্নতাই বিধৃত হয়ে আছে তাঁর বেশির ভাগ কবিতায় এবং তিনি যুগ-কালকে ছুঁয়েছেন খুবই অপ্রত্যক্ষভাবে, যার পরিচয় রয়েছে 'অন্যহাত', 'ঘাড়', নষ্ট নির্মাণ', এবং 'আলোর দরজা', নামক কবিতায়। শেষোক্ত কবিতার প্রথম দুটি শব্দ "ধূসর অস্তিত্বের" ধূসরকে বড় ক্লিশে লাগে।

অমিত গুপ্ত আশির দশকের নবীন কবি। প্রকৃত' অরণ্য দূরে' কবিতায় তিনি বলেছেন, "প্রাকৃতিক আবাসনে ধরেছে ফাটল জেগেছে সংঘাত, পরমাণু মানুষ কাঙাল" এবং তারপর "বিস্মরণ যদি ভালো লাগে তবে এসো/সূর্যোদয়ের মুখে দাঁড়াও এবার। অথবা 'এভাবেই প্রতিদিন' কবিতায় 'নিবাসে শরীর ছিল, প্রবাসে মনন'। এরকম প্রবাসীমন নিয়েই আশাবাদে

জারিত কিছু কবিতা তিনি উপহার দিয়েছেন। কবিতায় নিজস্ব কোনো স্বর না থাকলেও, খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা আছে। ছন্দের হাতও মোটামুটি ভালো। আর বড় কথা হল, ক্লিষ্ট জীবনযাপনের ছবি আঁকলেও প্রত্যয় এবং ক্ষীণ হলেও একটা আস্থার সুর রয়ে গেছে তাঁর কবিতায়। কিছু কিছু পংক্তি প্রোজ্জ্বল সুন্দর। প্রতিশ্রুতিময় কবির কাছে আরো ভালো কিছু পাবার প্রত্যাশা রইল না। সবশেষে উল্লেখ্য, গ্রন্থের কোনো কবিতাই দুর্বোধ্য বা দুরূহ নয়। কেবল কিছু বানান ভুল পীড়াদায়ক হয়েছে।

● **পদ্য-টদ্য/অরুণকুমার চক্রবর্তী, অমিত গুপ্ত, বিষ্ণুদেব গাঙ্গুলী, বিশ্বজিৎ বাগচী ও প্রদীপ গাঙ্গুলী বর্তমান প্রকাশনী ভদ্রকালী, হুগলী। ১ টাকা**

ছোট কবিতার ছোট্ট সংকলন। মোট কবিতা চৌদ্দটি। হাইকু জাতীয় কবিতা লিখেছেন অরুণকুমার চক্রবর্তী। 'রাতের ট্রেন যাত্রী' কবিতাটি ভালো। বিষ্ণুদেব গাঙ্গুলীর 'নৌকাও উপুড় হয় মানুষও' এবং বিশ্বজিৎ বাগচীর 'বৃষ্টি ছুঁয়ে নারী' কবিতা দুটিও মন্দ নয়। বাকিগুলি সাদামাটা।

সংবাদ

● জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারের ১২৫তম বর্ষপূর্তি উৎসব

উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার পুরানো দিনের অন্যান্য গ্রন্থাগারের পর্যায়ে ঠিক পড়ে না। পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক জীবনে এব একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে। একসময়ে আমাদের দেশের বহু বিদগ্ধ মনীষী এর সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে মানুষের চেতনা জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। এই গ্রন্থাগার আজ আর শুধু এই অঞ্চলের গ্রন্থানুরাগী মানুষের গ্রন্থ পাঠের জায়গা নয়। এ এক অমূল্য গবেষণাকেন্দ্র। কিন্তু দুঃখের কথা, এমন গুরুত্বপূর্ণ যে প্রতিষ্ঠান নানান ঝড় ঝাপটা সহ্য করে একশ' পঁচিশ বছর ধরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, স্বাধীনতার পর ডাঃ বিধান রায়ের আমলে সেই গ্রন্থাগারকে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার বলে ঘোষণা করা ছাড়া তার জন্য আর কিছুই করা হয়নি। তাই শিক্ষা-সংস্কৃতির বিশিষ্ট পীঠস্থান এই জয়কৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগারকে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদাদানের যে দাবী উঠেছে—আমরা তাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীপ্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়ও এ দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন। আমরা তাঁর সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করব। কিন্তু যতদিন এই গ্রন্থাগারের ভাগ্যে সে স্বীকৃতি না জোটে, ততদিন আমরাই চেষ্টা করব এই গ্রন্থাগারের জন্য আরো বেশী কিছু করা যায় কি না।

জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারের একশ' পঁচিশতম বর্ষপুর্তি উৎসবের তৃতীয় ও শেষ পর্যায়ের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে আজ উপরের এই কথাগুলি বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু।

তিনি আরো বলেন, এই গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাজী রক্ষা করতে হবে। নতুনরা অনেক কিছুই জানে না। এ গ্রন্থাগারে রক্ষিত জাতীয় ইতিহাস।

মুখ্যমন্ত্রী এইদিন গ্রন্থাগার ভবনের পুর্বদিকে এই গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের এক আবক্ষ মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। মূর্তিটি তৈরী করেন নবদ্বীপের ভাস্কর শ্রীরমেন পাল।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে রাজ্যের পুর্তমন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী ও পরিষদীয় মন্ত্রী শ্রীপতিতপাবন পাঠক।

● সত্যালোক আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

শ্রীরামপুর--২২শে এপ্রিল : অশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে হুগলী জেলার বলিষ্ঠ সাপ্তাহিক পত্রিকা সত্যালোক আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আজ সন্ধ্যায় গোপীনাথ স্মৃতি কিশোর সংঘ প্রাঙ্গণে শেষ হয়। গত ২০শে এপ্রিল রাজ্যধরপুর নেতাজী বালিকা বিদ্যালয়ে শুরু হয়েছিল এই প্রতিযোগিতা। শেষ দিনে এই প্রতিযোগিতা একসাথে শ্রীরামপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও গোপীনাথ স্মৃতি কিশোর সংঘ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিনের এই প্রতিযোগিতার ন'টি বিষয়ে প্রায় ৪০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। সবচেয়ে বেশী প্রতিযোগী ছিল কুইজ কনটেষ্ট ও লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায়। সহস্রাধিক দর্শক ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে এই প্রতিযোগিতাগুলি প্রাণভরে উপভোগ করেন।

বিভিন্ন বিষয়ে বিচারকের আসন অলংকৃত করেন সর্বশ্রী প্রভাত ঘোষ, বাণী চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ কাঁড়ার, বিমান লাহিড়ী, অশোক রুদ্র, বিনয় ভট্টাচার্য, দিলীপ বাগ, স্বরাজ ব্যানার্জী ও সত্যালোক সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র ভড়। কুইজ কনটেষ্ট পরিচালনা করেন সাংস্কৃতিক উৎসব কমিটির সম্পাদক কার্তিক দত্ত বণিক। কৃতী প্রতিযোগীদের নাম সহ চূড়ান্ত ফলাফল আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। পুরস্কার বিতরণী উৎসব আগামী ২০শে মে শ্রীরামপুর টাউন হলে বিকাল ৫টায় অনুষ্ঠিত হবে।

● বারাসত অনাথ ভাণ্ডার (চন্দননগর)

সম্প্রতি বারাসত অনাথ ভাণ্ডারের তত্ত্বাবধানে দরিদ্র দিগের জন্য বিনামূল্যে একটি চক্ষু চিকিৎসা শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়।

চক্ষুর বিভিন্ন রোগের ইহাতে চিকিৎসা করা হয় এবং ছানি অপারেশ ৯ করা হয়।

বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ এম. বি. তালুকদার বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসার ভার নেন এবং ডাঃ রমেন পাল তাঁহার নার্সিংহোমে বিনামূল্যে রোগীদের তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করেন

অনাথ ভাণ্ডারের পক্ষ হইতে প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারের দ্রব্য ক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ও অপারেশনের মাধ্যমে সমাজের দুঃস্থ মানুষের দৃষ্টি লাভে সহায়তা করার এই প্রশংসনীয় প্রয়াস জনসাধারণের আর্থিক সাহায্য লাভ করিলে আরও অধিক পরিমাণে সফল করা যাইতে পারে।

● "দূরবীণ পদ্ধতিতে বন্ধ্যাকরণ"

বিগত ·৪শে মার্চ শনিবার ভদ্রেশ্বর হাইস্কুলে ২য় পর্যায়ে দূরবীণ পদ্ধতিতে বন্ধ্যাকরণ করা হোল ৭জন মহিলাকে। আই. এম. এ ভদ্রেশ্বর শাখা ও চন্দননগর রোটারী ক্লাবের যুগ্ম উদ্যোগে এটি অনুষ্ঠিত হলো। ডাঃ বলাই দাস, ডঃ সমীরকুমার দত্ত, ডাঃ বৈদ্যনাথ শ্রীমানী, ডাঃ বিমল চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ চণ্ডী সরদার, ডাঃ কার্ত্তিককুমার ঘোষ, ডাঃ রঞ্জিত ব্যানার্জী, ডাঃ খগেন্দ্র ঘোষ, ডাঃ অখিল মজুমদার প্রমুখের আন্তরিক সহযোগিতায় চুঁচুড়া হাসপাতালের সার্জেন ও তাঁর সহকারীদের সাহায্যে উক্ত অস্ত্রোপচার শিবির সফল হয়ে ওঠে। জেলা পরিবার পরিকল্পনা আধিকারিক ডাঃ সুভাষ ঘোষ ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ ছিলেন উক্ত শিবিরের মুল উদ্যোক্তা।

● হুগলী জেলা পত্র পত্রিকা সম্পাদক সমিতির স্মারকলিপি পেশ।

হুগলী জেলা পত্র পত্রিকা সমিতির পক্ষ থেকে ১৫ দফা দাবী সম্বলিত এক স্মারকলিপি হুগলী জেলা শাসক শ্রীনিখিলেশ দাস সমীপে পেশ করা হয়।

MEMBER { All India Small & Medium News Paper Association, Delhi.
Little Magazine Editors Association, Calcutta.
Hooghly Dist. Patra Patrika Somity, Hooghly. }

GODHULI-MONE N. P. Regd. No. RN. 27214/75 April-May '84 (বৈশাখ ১৩৯১)

Vol. 26, No. 4 Postal Regd. No. Hys-14 Price—Rs. 1·50 only

সংবাদপত্র নিবন্ধিকরণ আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি ঃ

পত্রিকার নাম ঃ গোধূলি-মন

ভাষা ঃ বাংলা

প্রকাশকাল ঃ মাসিক

মুদ্রাকর / সম্পাদক / প্রকাশক / সত্বাধিকারী ঃ অশোক চট্টোপাধ্যায়

জাতি ঃ ভারতীয়

ঠিকানা ঃ নতুনপাড়া / চন্দননগর / হুগলী / পশ্চিমবঙ্গ

আমি, অশোক চট্টোপাধ্যায় এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি, যে উপরোক্ত বিবরণাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

১৪ ৫ ৮৪ (স্বাক্ষর) অশোক চট্টোপাধ্যায়

শুধুমাত্র মহিলাদের লেখায়-রেখায় সেজে প্রকাশিত হচ্ছে

গোধূলি মন

মহিলা সংখ্যা

এ সংখ্যার প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ছড়া সমস্তই মহিলাদের দ্বারা। এমনকি মহিলাদের লেখা বই নিয়ে আলোচনা করছেন মহিলারাই। আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হবে সংখ্যাটি। দাম যথারীতি দেড় টাকাই থাকছে।

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পপুলার প্রিণ্টার্স, বারাসত, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও নতুনপাড়া, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ : ছবি : শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়
নামাঙ্কন : সুবোধ দাশগুপ্ত

জ্যৈষ্ঠ/১৩৯১

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

ফ্ল্যাট ২, ব্লক ডি
৮২ বেলগাছিয়া রোড-৩৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

প্রথমেই আপনাকে অভিনন্দন জানাই; গত পৌষ সংখ্যার শান্তিনিকেতন তথা পৌষের ডাক নিয়ে সম্পাদকীয় আমার মনে 'নবীন মেঘের সুর' নিয়ে এসেছিল। সবচেয়ে ভালো লাগল কবিতাকে অতিক্রম করা' এই গল্পটি 'ঠাণ্ডা বালিব বুকে পা রেখে এগিয়ে যেতে যেতে আপনার মনে হবেই এর সর্বত্রই ছড়িয়ে আছেন তিনি।' বুঝলাম যদিও আমি আপনার সমকালীন নই তবুও সমকালীন কথাটি আপেক্ষিক—অন্ততঃ আমার 'চিরকালের' রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে।

'আবু সয়ীদ আইয়ুব সংখ্যা'র জন্য কোন প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। প্রথমতঃ আপনাকে নমস্কার জানাই ইতিহাস চেতনার জন্য; তারপরে নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে আপনার নিজস্ব ঐকান্তিকতার জন্য।

একদিন বালক রবীন্দ্রনাথকে পিতা দেবেন্দ্রনাথ পুরস্কার দান প্রসঙ্গে বলেছিলেন 'দেশের রাজারই উচিৎ ছিল তোমাকে পুরস্কার দেওয়া।' আজ আমিও (যদিও কোন অর্থেই দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তুল্য বা তুলনীয় নই) ঐ সংখ্যার জন্য আমার সাধ্যমত সামান্য সম্মানদক্ষিণা আপনার করকমলে অর্পণ করলাম। দয়া করে গ্রহণ করে কৃতার্থ করবেন; বর্তমান দেশের রাজাকে দোষারোপ করব না। ইতি—

জ্যোতির্ময় বসু

০

লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক সমিতি
১০/২, টেগোর ক্যাসল ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রীতিভাজনেষু,

গোধূলি-মন বৈশাখ সংখ্যা ১৩৯১ পেলাম। লেখায়, সম্পাদনায় ও সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতায় পত্রিকাটির এ সংখ্যাটিও সুন্দর। সম্পাদককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই তাঁর চিন্তা ও কর্মনিষ্ঠতার জন্য।

সপ্রীতি শুভেচ্ছান্তে
নবকুমার শীল

০

৪৬ বি, রিচি রোড,
কলিকাতা-৭০০০১৯

সবিনয় নিবেদন,

'গোধূলি-মন' বৈশাখ সংখ্যা পেয়েছি। অনেক ধন্যবাদ। আপনি আমাকে মনে রেখেছেন একথা ভাবলেই আনন্দ হয়। বিভিন্নরূপে সজ্জিত এই ছোট পত্রিকাটি আপনার নিঃশব্দ নিষ্ঠা ও আন্তরিক সাহিত্যানুরাগে সমৃদ্ধ।

'গোধূলি-মন' দীর্ঘজীবী হোক।

নমস্কার জানবেন।

বিনত—
নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়

০

মাননীয় অশোকবাবু,

'অভিনব অগ্রণী'র পক্ষ থেকে লিখছি।

আপনার পাঠান 'গোধূলি-মন' আমাদের দপ্তরে ঠিকমতই আসছে। আপনার পত্রিকায় সাহিত্যের সংগে বিভিন্ন সংবাদ থাকায় পত্রিকাটি যেন আরো সুন্দর হয়েছে। নামী ও দামী পত্রিকা যে দায়িত্ব পালন করতে পারে না, আপনি তাই করছেন।

অপূর্ব সেনগুপ্ত

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি-মন

২৬ বর্ষ / ৬ষ্ঠ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ / ১৩৯১

প্রতি সংখ্যা দেড় টাকা
বার্ষিক (সডাক) পনের টাকা

সম্পাদক : অশোক চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

কিছু কিছু মানুষ আছেন যাঁরা ভাল কাজকে সমর্থন না করে পারেন না। এগিয়ে এসে শ্রদ্ধা জানাতে কুণ্ঠিত হন না। আর তাঁদের আন্তরিকতায় ভাল কিছু সৃষ্টি কবার নেশা যাঁদের— তাঁরা নতুন করে আবার কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েন। 'আবু সয়ীদ আইয়ুব সংখ্যা' প্রকাশ করার পর স্বভাবতই আমরা ভেবে নিয়েছিলাম বেশকিছু বাঙালী বুদ্ধিজীবি মফস্বলের এই অসাধারণ প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাতে কুণ্ঠিত হবেন না। সংখ্যাটি প্রকাশের পর মাস তুয়েক পরেও যখন কোন ভাল আলোচনা পত্র-পত্রিকায় কিংবা বোদ্ধা মানুষের কাছ থেকে পেলাম না, আমরা তুঃখ পেয়েছিলাম। ঠিক এমনি সময়ে বেলগাছিয়া থেকে ডাঃ জ্যোতির্ময় বসু একটি সুন্দর চিঠি পাঠিয়ে আমাদের তুঃখী অন্তরে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছেন। পাশের পাতার প্রথমেই চিঠিটি মুদ্রিত করেছি আমরা—প্রিয় পাঠক পড়ে দেখবেন। চিঠির সঙ্গে পাঠানো তাঁর পঁচিশ টাকার চেকটি শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা মাথায় তুলে নিয়েছি।

এই প্রসঙ্গে আমাদের তুজন কবি বন্ধুর নাম উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। তাঁদের একজন কোলকাতার 'সৈনিকের ডায়েরীর' অন্যতম সম্পাদক কবি অভিজিৎ ঘোষ এবং অন্যজন চন্দননগরের কবি অরুণ চক্রবর্ত্তী। দেখা হলেই উচ্ছসিত অভিনন্দন জানান তুজনেই।

সংকীর্ণমনা এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও এইরকম কিছু কিছু মানুষই আমাদের সৃষ্টির প্রেরণা।

● সম্পাদকীয় কার্যালয় ॥ নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর । হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥ ভারত

ছাতা / মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সশস্ত্র দুর্দিনে আজ আমি যেন বড়ো অসহায়
মাথার উপরে কোন ছাতা নেই ভালবাসা নেই
আমার বিমর্ষ চোখে টোল খায় ভয়ঙ্কর গ্রহণের ছায়া
রোদ্দুর মাথায় নিয়ে প্রতিদিন বহুপথ একা একা হাঁটতে হয়েছে ।
পৃথিবী গম্ভীর বড়ো মাঝে মধ্যে চোখ তুলে দেখেছে কৌতুক···
আমার সৌখিন ছাতা কতদিন হলো ভেঙে গেছে
পড়ে আছে কিছু স্মৃতি নষ্ট কঙ্কাল ঃ
আমার স্বপ্নেরা সব বহুদিন বেড়াতে গিয়েছে
দীঘা কিংবা বকখালি—এখনো ফেরেনি ।
ঝরাফুল নিয়ে আমি একটিও কবিতা লিখিনি
ফুটন্ত ফুলের স্বপ্ন কবিতা আমার ।
ঘাতে প্রতিঘাতে রোদের চাবুক খেয়ে তাই আমি ভেঙেও ভাঙিনা
জলে ভিজে রুটির সংসার ।
আমারো তো ছাতা ছিলো একবুক ভালবাসা ছিলো
শিউলি ফুলের চিঠি হাতে দিতো স্নিগ্ধ রূপসীরা—
মাথার উপরে আজ রোদ বৃষ্টি মুষল প্রহার
সশস্ত্র দুর্দিন এসে শক্ত হাতে চাবুক ঘুরায় ।
পরিত্রাণের নীল সেতু চাই দুঃখের ভিতর দিয়ে দুঃখ পার হওয়া
আগুনের মতো দুটি পা ।
আমার দুখেরা সব বিষন্ন ডালে ডালে রক্তকরবী
ছিঁড়ে ছিঁড়ে কে সাজাবে সময়ের বিশাল ক্যানভাস ?
ভালবাসা চুরি করে চোরাপথ দিয়ে দূরে পালায় রোবট
ক্লান্ত দিনলিপিগুলি অশ্রু-ভেজা রৌদ্রে নীলিমায় ।
প্রতিজ্ঞা কঠিন হলে রোদে পুড়ে জলে ভিজে কঠিন রাস্তায়
হঠাৎ কখন দেখি শক্ত মুঠোর মধ্যে ছাতা এসে যায় ঃ
ভালবাসা ঠোঁট ঘসে— একবুক জল থেকে হেসে ওঠে ডুবন্ত সংসার ।

ভ্রমণ / মঞ্জুভাষ মিত্র

রত্নপূর্ণ জাহাজ চলেছে সারারাত ধরে নীল সাগরের বুকে
আঁধার আকাশে ডানা মেলে ওড়ে ক্রমাগত এক সুবৃহৎ সাদা পাখী
নারিকেল-দ্বীপে সংগীতরত বৃক্ষলতারা ঝংকার ধ্বনি করে
একটি বালিকা নাচের সময় আলো দান করে দামী পাথরের বুকে
আমার বুকের হাড়ের ভিতর বহমান যেন মানুষের সভ্যতা
নদীর মতন মানবীর দল, ডানা ঝাপটায় শান্তির শাদা পাখী···

চাঁদের নরম তানপুরা বাজে বনের ফুলের ভিতর আঁধার রাতে
আকাশে তারার দু'টি কালো চোখ অপলকভাবে চেয়ে চেয়ে দেখে কাকে ?
বালির বুকের উপর স্থাপিত ধাতব ঘড়ির ঘণ্টারা বাজে
সময়ের বুকে প্রাচীন দিনের জাহাজের শাদা পালগুলি বহমান
প্রতিজ্ঞা এক আমার আকাশে তারার মতন জ্বলে যায় বহুকাল
সংগীতরত নীল দ্বীপে যাবো বনের দ্বাদশ গোলাপের হাত ধরে

একটি বালিকা তার ঘন চুল এবং নাভির গোলাপসমূহ ছেঁড়ে
সংগীত তার শত্রু : সে যে জেনে গেছে ছায়া নাবিকের কালো ভালবাসা
গুরুগর্জনে ঝড় নেমে আসে ফুঁপিয়ে কাঁদছে জলের বন্ধ্যা ঢেউ
সবুজ দ্বীপের স্তম্ভ এবং খিলানের নীচে ফুলের ঘণ্টা বাজে
বিলুপ্ত সুখ প্রেত সমূহের ঠাণ্ডা ধাতব নিঃশ্বাস পড়ে গায়ে
ভয়ের ভিতর দিয়ে এ ভ্রমণ সৌন্দর্যকে শুধু পেতে হবে বলে ।

অমল দাসের কবিতা

পরিচিতি : প্রচারবিমুখ কবি অমল দাস সহজে কোথাও লেখা পাঠান না। লেখার কিন্তু বিরাম নেই। আশেপাশের ঘটনা, সুখ-দুঃখ কিছুই এড়িয়ে যায় না তাঁর দৃষ্টি থেকে। মাথার ওপর বিরাট এক সাংসারিক দায়িত্ব নিয়েও কবিতাকে তিনি জড়িয়ে রেখেছেন গভীর মগ্নতায়।

আড়াল

শীত নীল রোদ থেকে
মুঠিমাত্র সম্মতি পেলে
সেও সবুজ হত মানুষের দ্বীপে
দু'চোখ অটল রেখে
সেও যেন বলেছিল
ছোঁনাচ ছায়ার অন্তরা
সুখ ফেলে ভেতর অবধি।

সখের জীবন থেকে
ঝ'রে যায় টুপ টুপ সুখ
সুখের আড়ালে।

যুবতী ছোঁয়ার মত

খুব নেমে আসা মানেই
কান্নাটা কাগজেরই
সাবালক হ'তে হ'তে নেই।

এইভাবে কত রাত
যুবতী ছোঁয়ার মত হয়
উন্মুখ পাতারা কি জানে।
শব্দেরা সবাক হয়
নাগরিক হলে
এবং বৃষ্টিপাত ভিজিয়ে প্রসব
কাগজে কাগজে ভরা—
টেলিপ্রিণ্টার
হয়ত ইশারা ভেবে
রোজ রোজ ভুল শিহরণ।

সর্বনাশ ভুলে

সমর্পিত মুখ দেখে
নিরুচ্চার তৃষ্ণা বাড়ে
ক্রমাগত দীন এই বুকে
ওই মন ওই ভালবাসা
পাওয়ারইত সুখে
একবার ফের সেই পিছুটান ভুলি
কতকাল আরণ্যক রোদ পেয়ে
যাত্রাপথে মাড়িয়ে গোধূলি
হেমন্ত হিমেল হয়
মেঠো ঘ্রাণ ছুঁলে
ভালবাসা কেনা যায়
সর্বনাশ ভুলে।

খোঁজা / শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়

স্বার্থকে স্বাক্ষী করে ভালোবেসে নিয়ে ছিলে
বিবাদি মন ।
আজ আর অবকাশ পায় না খুঁজে
ওদিকে নিজেকে ।
এদিকে রূপময়ী আকাশে বাতাসে যখন
কাবোর দিন
কুঁড়িরা রচনা করে রাশি রাশি ফুল ।
তোমার বিবেক তখন । বিবাদ । পাহাড় ।
প্রাচীরে ইট গুনে গুনে
তোমার দেহেরই বয়স বাড়লো
তারপর কিছুই রাখোনি বাজি
আরো আরো কিছু দিন গুনে ।
একদিন ঘুমিয়ে যাবে
ফুলের শয্যা নিয়ে, চন্দন চিতার বুকে ।
পবিত্র চিতার আগুন এইবার জ্বলবে
সেই সু-গন্ধ ছড়াবে, এখন বাতাসে ।।
তোমার এ কাব্যহীন দেহ
নিতে কি পারবে বুকে সে পবিত্র গন্ধ ।
ঐপথ সে তো কবে বেঁকে গেছে ; ঐ দূরে
ধূলায় ছিটান ফেলে আসা কিছু সুর শুধু ।
তা যদি না পারো নিতে—
তখন কি কাঁদবে না, বল তুমি তোমায় খুঁজে নিতে

শিল্প বিষয়ক / অশোক মণ্ডল

চুম্বন শিল্প হয়, যদি তুমি
ওষ্ঠে রাখো ভালবাসা
কেউ কেউ, হয়ত সবাই, হেঁটে যায়
নিজস্ব ঢঙে, অহঙ্কারে ।
স্থির এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, তুমি
কতদূর গিয়েছে নিজেকে ভেঙে ?
মানুষেরা কথা বলে, জেনেছো প্রচুর ।
পাখি হাওয়া নদী
সবাই কথা বলে । কিন্তু নীরবতা যখন
কথা বলে
তখনই শিল্প হয় ।
উৎসুক জানলায় রেখেছো চোখ ।
ফিরিয়ে নাও ।
ভিতরের আগুন নিভে ছাই হোল কিনা, দ্যাখো ।
এইভাবে তুমি তারপর
শিল্পের অধিকারে চলে যাও ।

সুপারিশ / কৃষ্ণসাধন নন্দী

যে গদীতে আসে, লোকটাকে গিলে খায়
আসলে ওর কোন আকার নেই, স্বাতন্ত্রতা
সুযোগ সন্ধানী শুধু ।
পা চাটে, ল্যাজ নাড়ে
প্রভুভক্ত জীবের মতন—
একদিন দেখি লোকটা অনেকদূর উবে গেছে
লিফটম্যানের পা ধরে ।

ক্ষুধিত প্রজন্মের কবি ও কবিতা

অজিত রায়

ভারতের নিজভূমিতে কোনো রেনেশাঁ ঘটে নি। কারণ উনিশ শতকের মনীষীরা যেন ধরে নিয়েছিলেন যে প্রাচীন ভারতবর্ষে যা-কিছু ছিল তা-ই মহিমান্বিত। তাঁরা অতীতকে শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছিলেন, বাচাই করতে শেখান নি। তাঁদের মুখে আমরা শুনেছি শুধু বর্তমানের নিন্দা আর লুপ্ত তপোবনের স্তবগান। (১) এই মনোভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ। নিতান্ত কৈশোর-রচনা বাদ দিলে তাঁর এমন কাব্য বিরল, যার মধ্যে কালিদাসের অনুষঙ্গ অনুপস্থিত। তবে, উনিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ দান একটি নতুন সত্যের আবিষ্কার— শাস্ত্রের চেয়ে মানুষ বড়ো, সবার ওপরে মানুষ, মানুষের জন্যই কাব্য। অর্থাৎ মানুষের জীবন, তার ধর্ম-কর্মের ওপর ঐকান্তিক গুরুত্ব আরোপ করা, পরম-পুরুষার্থকে স্বীকার করা। এটাই ছিল সে-যুগের মানববাদ বা Humanism, আর বিশ শতকের দাপাদাপি Neo-Humanismকে নিয়ে। তারই বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে জন্ম নিয়েছে এক একটি কাব্য-আন্দোলন, যার মধ্যে প্রথম ও অন্যতম হল হাংরি জেনারেশন গোষ্ঠির আনডার গ্রাউণ্ড মুভমেণ্ট। প্রতি-ষ্ঠান-বিরোধী সাহিত্য ও কাব্যকে জমির কাছাকাছি নিয়ে যাবার তাগিদে ভারতবর্ষের বুকে এখনও অব্দি এটাই প্রথম এবং একমাত্র বৈপ্লবিক আন্দোলন।

নিবন্ধের শিরোনামে ইংরেজি Hungry কথাটা চালানো যেত। কিন্তু তার কয়েকটি প্রতিশব্দ রয়েছে, 'নিকৃষ্ট', 'অনুর্বর' ইত্যাদি। কিন্তু 'ক্ষুধিত' বললে আমরা সেইসব বাগী ও উগ্র কবিদের স্মরণ করতে পারি, যাঁরা আক্ষরিক অর্থেই সত্তর দশকের গোড়ার দিকে বিহারের রাজধানী থেকে বীট (শাসন-না-মানা) কবিতার আন্দোলন চালিয়ে সমস্ত প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক সাহিত্যের প্রচলিত নিয়ম-কানুন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সেই দিক থেকে 'হাংরি জেনারেশন' কথাটার বাংলা তর্জমায় 'ক্ষুধিত প্রজন্মের কবি' চালু করলে আপত্তির ওজর থাকে না। প্রশ্ন হল, এই হাংরি-কবিতার আন্দোলনের জন্মের প্রয়োজন বা কারণটা কী ছিল, কেন একে ধ্বংস করার বিরাট চক্রান্ত হয়েছিল, আর এই আন্দোলনের নিদারুণ অপমৃত্যুর কারণটাই বা কী? এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর-অনুসন্ধা-নেই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা। এই প্রশ্নগুলির উত্তর পেতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে চলতি শতকের একেবারে গোড়ার দিকে।

বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে আমাদের সাহিত্যজগতে কিছু নতুন লক্ষণের জন্ম হল। এর আগে লেখকেরা কিছুটা দুঃসবরণের জন্য তৈরি হয়েই এ জগতে আসতেন। সেকালের মা-বাবারা কোন সাহিত্যিকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইতেন না। কেননা, তা হলে মেয়ের ভবিষ্যৎকে ক্ষুধার হাতে সমর্পণ করতে হবে। এই শতকের দ্বিতীয় দশকে সাহিত্যিকেরা দেখলেন যে সাহিত্য একটা চমৎকার জীবিকা হতে পারে। তিরিশ দশক থেকে নানা ধরণের পুরস্কার, বৃত্তি, খেতাব ও সরকারী অনুকূল্যের পাশাপাশি

সাহিত্যক্ষেত্রে এক ধরণের মনোপলির সূচনা ঘটল। চল্লিশ থেকে লেখকরা নিয়ন্ত্রিত হতে লাগলেন 'আনন্দ-বাজার' 'দেশ' 'যুগান্তর' এবং কিছুটা 'অমৃত' নামক এক একটি গোষ্ঠি দ্বারা (২)। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার চরিত্র পালটে ক্রমে জন্ম নিল সাহিত্যের ব্যবসা। পঞ্চাশেও লেখক এবং পাঠকের একটা বিরাট অংশ, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বদলাতে লাগল। তাদের অভ্যেস একটা নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে পাক খেতে লাগল। ক্রমে একটা Visual Circle তৈরি হল। লেখকদের অর্থাগমের সুযোগ থাকায় তাঁরাও লিখতে লাগলেন দু-হাতে। তখন থেকেই আমাদের সাহিত্যিককুলের একটা বড়ো অংশ ভাবিত হলেন কি পরিমাণে উপস্থিতির প্রমাণ তাঁরা দিতে পারছেন তার ওপর। কোনো কোনো লেখক এক বছর সেই সংখ্যক উপন্যাস লিখেছেন যা বিশ্ববন্দিত কোনো কোনো ঔপন্যাসিক গোটা জীবনেও লিখতে পারেন নি। সৃজনশীলতার জন্য দুঃখবরণ করতে তখন থেকেই আর কোনো সাহিত্যিকই প্রস্তুত নন। আর এই প্রতিষ্ঠান-মুখী স্থূল সাহিত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতেই ১৯৬০—এ জন্ম নিয়েছিল বীট কবিতা।

অবশ্যি, তার অনেক আগেই বাংলা কাব্যক্ষেত্রে ঘটে গিয়েছিল আর-এক বিদ্রোহ, 'আধুনিক কবিতা'র জন্ম। সে-ইতিহাসের কথা সকলেরই জানা। অর্বাচীন বাংলা কবিতার প্রধান স্তম্ভ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার ভাস্বর দীপ্তির পানে তাকিয়ে বাঙালি বলতে বাধ্য হয়েছিল—'গগন নহিলে তোমায় ধরিবে কেবা ?' রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা যেন একটি সুউচ্চ পর্বতচূড়া, যা থেকে শতযুগের উপজীব্য বহু বিচিত্র কাব্যধারা বিগলিত হয়েছে। (৩)। কিন্তু আমাদের কাব্য-সাহিত্য যদি একা রবীন্দ্রনাথের কীর্তিতেই যবদ্ধ থাকত, তবে আমরা আনন্দের মধ্যেও বিষাদ অনুভব করতাম। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে 'রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিতা' বা 'আধুনিক কবিতা' নামে যে কবিতার ধারা সৃষ্টি হয়েছে, রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে যাওয়া বা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহেই তার উদ্ভব। রবীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে প্রথম দিকে বিদ্রোহ করেছিলেন মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথের মত লেখা ছাড়াও যে কবিতা লেখা যায়, তার দৃষ্টান্ত নিয়ে এরা এক একটি নতুন দিগন্তে উপনীত হয়েছিলেন।

প্রথম মহাসমর-পরবর্তী এবং রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত কাব্যই আধুনিক কাব্য। কিন্তু (যতীন্দ্রনাথকে স্মরণে রেখেই বলছি), এ বিদ্রোহ ছিল শুধুমাত্র আঙ্গিকের (Form) ক্ষেত্রে, ভাবের (Content) ক্ষেত্রে ছিল সেই রবীন্দ্র-ধারারই অনুগামী। আর বেশির ভাগ কবিই ছিলেন প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক।

১৯৬০-এর মাঝামাঝি কলকাতার কিছু কবি প্রথম অনুভব করলেন, বাংলা কবিতাকে এভাবে আর গত যুগতিক ধারায় চলতে দেওয়া উচিত হবে না ; এর পরিবর্তন চাই। ব্যাস্, সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাবনার বারুদ ছড়িয়ে পড়ল তরুণ কবি-লেখকদের মধ্যে। পরিবর্তন চাই ! পরিবর্তন চাই ! কবিতা নিয়ে আন্দোলন চাই ! দিকে দিকে সংক্রামিত হয়ে গেল সেই অনুভব। প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক সাহিত্য আর নয় ; এবার কবিতাকে মাটির কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে, জীবনের সঙ্গে এক করে দেখতে হবে। কবিতার ভাষায় নতুন শব্দ দিতে হবে, সমস্ত ব্যাকরণ ঝেঁটিয়ে ফেলো, চালু বিধিনিয়ম আর ধারণাকে উল্টে দাও। কবিতা শুধু কলম নয়, তাকে তলোয়ার করে তোলো— এইরকম জোরালো আর বিদ্রোহী দাবানলের ফুলকি ছড়িয়ে একদল কবি এই হাংরি জেনারেশন গোষ্ঠির কর্মকাণ্ডের সূচনা করেছিলেন।

সূচনা-পর্বে এই গোষ্ঠির পাণ্ডা ছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মলয় রায়চৌধুরী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়,

সুবিমল বসাক, দেবী আচার্য, শম্ভু রক্ষিত, সুবো আচার্য, সুভাষ ঘোষ, শৈলেশ্বর ঘোষ, অরুণেশ ঘোষ, সমীর রায়চৌধুরী, অরণি বসু, প্রদীপ চৌধুরী, দেবী রায় প্রমুখ এবং বিহারের প্রখ্যাত হিন্দী আঞ্চলিক কথাকার ফণীশ্বরনাথ রেণু ও কবি হংসকুমার তিওয়ারী। তবে, এই আন্দোলনকে যিনি প্রথম ইন্ধন জুগিয়েছিলেন তিনি হলেন আমেরিকার বিখ্যাত বীট-কবি অ্যালেন গীন্সবার্গ।

এই গীন্সবার্গ এবং তাঁর কাব্য ও কবিপ্রকৃতির পরিচয় নিতে হলে আমাদের তিনটি বিখ্যাত উদ্ধৃতির সাহায্য নিতে হবে। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়, অ্যালেন গীন্সবার্গ হলেট 'বীট বংশের এক নম্বর কবি কেরুয়াকের পরেই আদি বীট যিনি, আর কেরুয়াকের সঙ্গে এই উন্মুখর আন্দোলনের স্রষ্টা।' (৪)

গীন্সবার্গের 'Howl and other Poems' গ্রন্থের কবি-পরিচিতি অংশে বলা হয়েছে, 'Allen Ginsbarg's Howl and other Poems was originally published by City Lights Books in Fall of 1956. Subsequently seized by U. S. customs and the San Fransisco police, it was the subject of long Court trial at which a series of poets and Proffessors persuaded the Court that the book was not obsence. Over 200,000 copies have been sold…' (৫)

তৃতীয় উক্তিটি বিখ্যাত প্রাবন্ধিক এম এল রোসেনথালের : 'Ginsbarg hurls not noly curses but everything-his own purporated memories of a confused, squalid, humiliating existence in the 'underground' of American life and Culture, mock political and sexual 'Confessions' (together with a childlishly aggresive vocabulary of obscenity), literary allusions and echoes, and the folk-idiom of impatience and disgust ; (৬)

এমনিতে 'বীট' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, শাসন না মানা বা এক গ্রাস খাবার। কিন্তু গীন্সবার্গ পরিচালিত মার্কিন জীবনে ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ, নগরসভ্যতার অভিঘাত, প্রেম-সৌন্দর্য-ধর্ম বিষয়ক প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে অনাস্থা ও জীবনযাত্রার সংঘবদ্ধতার চরমে পৌঁছনোর প্রতিবাদে এই আন্দোলনে 'বীট', 'বীটচ্যাড', 'বীটনিক' প্রভৃতি শব্দগুলি সেই অস্থির উত্তপ্ত প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে চেনাতেই ব্যবহৃত হয়েছিল। বীট কবিতা আন্দোলনের পর্বে (১৯৫৫—৬০) আমেরিকায় যে সব পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, যেমন 'বীটচ্যাড্‌স্', 'পকেট পোয়েটস সিরিজ' 'এভারগ্রীন রিভিয়্যু প্রভৃতির মধ্যে তথাকথিত সামাজিক ধ্যানধারাণর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও প্রচণ্ড রকমের অনীহা অভিব্যক্ত হয়েছিল। প্রচলিত শিল্প-কৌশল, বিষয়গত এবং প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে যাঁদের কবিতায় আপোষহীন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁরা হলেন লরেন্স ফেরলিঙ্গেটি (১৯১৯-এ জন্ম), জ্যাক কেরুয়াক (১৯২২), অ্যালেন গীন্সবার্গ (১৯২৬) এবং গেগরী করসো (১৯৩০)। এছাড়া এই গোষ্ঠির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন হেনরী মিলার, ই ই কামিংস, কেনেথ রেকসথ প্রমুখ এবং পল গুডম্যান ও নরম্যান মেইলার। ডব্ল্যু বেরনহার্ড ফ্রিশম্যান এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'If beat poetry has any common denominator apart from the proclevity of its authors to make it recitable to the accompaniment of Jazz, this would consist in its exaltation of ecstatic, visionary states emotion and appreciation ? (৭) এই আন্দোলনের জোয়ার আছড়ে পড়েছিল বার্লিন, প্যারি,

কোপেনহেগেন ; এবং তারই একটা উত্তাল তরঙ্গ এসে আঘাত করেছিল জোব চার্ণকের মানসভূমি কলকাতার তটভূমিতে। সময়টা ছিল ১৯৬০-এর জুলাই-আগষ্ট।

এইসময় অ্যালেন গীন্সবার্গ পাটনায় আসেন ফণীশ্বরনাথ রেণুর সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে। গীন্সবার্গ, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং মলয় রায়চৌধুরী এই তিনজনের যোগাযোগসূত্রে জন্ম নিল 'হাংরি জেনারেশন' গোষ্ঠি। আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের নাম আগেই উল্লেখ করেছি। ১৯৬১তে পাটনায় মলয় রায়চৌধুরী ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের যোগাযোগে বাংলা কবিতার রদবদলের যে প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল, তারই প্রথম প্রকাশ ঘটল কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর শক্তি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক একটি প্যাম্ফলেট প্রকাশের মাধ্যমে। ওই ঘোষণাপত্রে হাংরি কবিদের ভবিষ্যৎ কাব্যচর্চার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। ফণীশ্বরনাথ, শৈলেশ্বর ঘোষ প্রমুখ বিভিন্ন বাংলা ও হিন্দী পত্রিকায় সেই ইঙ্গিতকে আরও আলোকিত করে তুলেছিলেন প্রবন্ধ ও নিবন্ধের মাধ্যমে। জামসেদপুরের 'কৌরব' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে জনৈক প্রাবন্ধিক দাবী করেছিলেন যে দেশীয় অর্থনীতির সঙ্গে কবিতার যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টায় 'বাংলা সাহিত্যে একটা হুল্লোড় পড়ে যায়।'

প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামের ঐকান্তিক অভীপ্সায় হাংরি জেনারেশন গোষ্ঠির জন্ম ঘটেছিল। শৈলেশ্বর ঘোষের ভাষায়, 'আন্দোলন তাকেই বলা যায় যা প্রতিষ্ঠিত চিন্তা-ভাবনাকে বা তার ধারক প্রতিষ্ঠানকে প্রবলভাবে ধাক্কা দেয়, প্রতিষ্ঠানের অন্তঃসারশূন্যতা ও মিথ্যাচারকে ধরিয়ে দেবার জন্য আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং সে আন্দোলন শক্তিশালী হলে প্রতিষ্ঠানের একাধিপত্য নষ্ট হয়ে যায়। (৮)

হাংরি জেনারেশনের কবি ও কবিতার অন্যতম প্রতিনিধিত্বকারী পত্রিকা 'ক্ষুধার্ত' দাবী করেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভে বহির্বিশ্বে বাংলা সাহিত্যের পরিচিতির পর হাংরি জেনারেশন আন্দোলনই সারা পৃথিবীর সামনে বাংলা সাহিত্যকে আবার তুলে ধরে। ভারতীয় সাহিত্যের সব ক'টি শর্তকে পুরণ করে বলেই এটি এখনও অব্দি প্রথম এবং একমাত্র আণ্ডারগ্রাউণ্ড আন্দোলন। যার সঙ্গে কলেজ-ইউনিভার্সিটির এবং খবরের কাগজের পয়দা করা সাহিত্যের পার্থক্য সুমেরু-কুমেরু। জন্মকালেই এই আন্দোলনকে ধ্বংস করার বিরাট চক্রান্ত হয়েছিল এই জন্যই।' (৯)

'ক্ষুধার্ত' ছাড়াও সেই সময়-সীমায় হাংরি জেনারেশনের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন 'আর্তনাদ' 'জেব্রা', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'চিহ্ন', 'স্বাক্ষর' প্রভৃতি পত্রপত্রিকা। এই পিরিয়ডের ফসল হিসেবে পাওয়া যায় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও রাজমোহন', মলয় রায়চৌধুরীর 'জখম', শৈলেশ্বর ঘোষের 'জন্ম-নিয়ন্ত্রণ', সুভাষ ঘোষের 'আমার চাবি', সমীর চৌধুরীর 'খেলোয়াড়', উৎপলকুমার বসুর 'পুরী সিরিজ' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ।

অ্যালেন গীন্সবার্গ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ফণীশ্বরনাথ রেণু, মলয় রায়চৌধুরী এঁদের মত প্রতিভাবান স্রষ্টার উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও হাংরি জেনারেশন গোষ্ঠি বা তার বীট-কবিতা আয়ুষ্মান হল না। কেন, তা আলোচনা করবার আগে এরই সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আরেকটি তথ্য যাচাই করে নিতে চাই। সেটা হল : কল্লোলের আবির্ভাব ও অকালমৃত্যু।

রবীন্দ্র-বিরোধী কবিতা দিয়ে যেমন হাংরির সূচনা, ঠিক সেইভাবেই গল্পক্ষেত্রে কল্লোলের পথ চলা শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের প্রস্থানভূমি থেকে।

'কল্লোল' পত্রিকার আয়ু মাত্র সাত বছরের। (১০)। কিন্তু আর সব ক'টি সংখ্যা পাঠ করলে বোঝা যাবে যে তরুণ গল্প লেখকেরা এই প্লাটফর্মে জড়ো হয়েছিলেন শুধুমাত্র সময়কে স্পর্শ করবার তাগিদেই নয়, বরং তখন সমাজ ও জীবন যে অস্থির টানাপোড়ন আর উচাটন অবস্থার শিকার হয়ে চলেছিল, প্রথম মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কুফল তখনকার মানব সমাজকে যেভাবে বহন করে নিতে হয়েছিল, সেই অস্থিরতা ও উচাটনের তরঙ্গে তাড়িত হয়ে সেইসব তরুণ লেখকেরা 'জীবনগত ও সাহিত্যশিল্পের প্রবণতা'গুলিকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন, দেশ-সমাজের অন্তরঙ্গ চালচিত্র তৈরী করেছিলেন। এ জিনিস হয়তো নতুন ছিল না, শরৎচন্দ্রই এই চিন্তাভাবনার পথিকৃৎ ছিলেন (১১)।

ফর্মের দিকটাও ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ধার করা; তবুও এইভাবে জীবনগত ও সাহিত্যশিল্পের প্রবণতাগুলিকে রূপ দেবার এমন ব্যাপক প্রচেষ্টা তার আগে দেখা যায়নি।

কল্লোল গোষ্ঠির প্রায় সব লেখকের লেখার মধ্যেই 'We, of the Kallol-clan' (১২) সুরটি ধ্বনিত হয়েছিল। ব্লুমসবেরি গোষ্ঠির সঙ্গে কল্লোল-পন্থীদের তফাৎ এখানেই। (১৩) কল্লোলের সবচেয়ে শক্তিমান লেখক অচিন্ত্যকুমারকে প্রেরণা জুগিয়েছিল নিরাপত্তা-হীন নিরাশ্রয় মানুষ। 'বিবাহের চেয়ে বড়ো', 'গুমোট', 'কাঠ খড় কেরোসিন' এইসব গল্পগ্রন্থই তার প্রমাণ। 'কল্লোলে' প্রথম প্রকাশিত গল্প 'সংক্রান্তি', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'শুধু কেরাণী', 'স্টোভ', 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' প্রভৃতি গল্পের মাধ্যমে প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন একজন শক্তিশালী গাল্পিক হিসেবে। আর স্বয়ং বুদ্ধদেব বসু, যাঁর গদ্য আমাকে বেশ প্রভাবিত করে, তিনি আবর্তিত হয়েছিলেন মূলত রোমান্টিকতা ও আদর্শবাদকে ঘিরে। জগদীশ গুপ্তকে বিস্মৃত লেখক বলব কোন্ যুক্তিতে, যাঁর 'দিবসের শেষে', 'পয়োমুখম্', 'আদি কথার একটি', 'হাড়' প্রভৃতি আজও সরাসরি বক্তব্যের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে। অবশ্যি, তাঁর ব্যর্থতার কারণ হল, গল্পের শিল্পসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব। আর রবীন্দ্রনাথ যাঁর 'লেখবার শক্তি'র প্রশংসা করেছিলেন, অচিন্ত্যকুমারের ভাষায় যাঁর সাহিত্য ছিল 'নিঃস্ব, রিক্ত, বঞ্চিত জনতার প্রথম প্রতিনিধি', সেই শৈলজানন্দও ছিলেন কল্লোল যুগের এক বিশিষ্ট গাল্পিক। এবং 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী'র লেখক যুবনাশ্ব ওরফে মনীশ ঘটক যেভাবে নিম্নবিত্ত মানুষের কাছা-কাছি গিয়ে তাদের নোংরা ও কদর্য জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছিলেন তার তুলনা আজ কোথায়?

কিন্তু এতো সত্ত্বেও, কল্লোলকে বাঁচানো গেল না কেন? আন্তরিকতার তো অভাব ঘটেনি, তবু কেন কল্লোলের আয়ু দীর্ঘায়িত হয় নি? এ প্রশ্নের জবাবে ড: রবিন পাল (১৪) যে ফিরিস্তিই দিন না কেন, একথা স্বীকার করতেই হবে কল্লোলের আন্দোলন ছিল একটা 'যৌবনের হুজুগ'। তবে কি এইরকম হুজুগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে হাংরি জেনারেশনেও অপমৃত্যু ঘটেছিল? অনেকটা তাই। এই গোষ্ঠীর জন্মলগ্নে যে অস্থির মানসিকতা কাজ করেছিল (তুলনীয় পরবর্তী দশকের নকশাল বিদ্রোহ) সেটাই একে ভেঙে ফেলেছিল। নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'আন্তরিক' পত্রিকার শারদীয়া ১৯৮২ সংখ্যায় মুদ্রিত তাপস মুখো-পাধ্যায়ের প্রবন্ধে যথার্থই বলা হয়েছে, 'রবীন্দ্রনাথের পর এই আন্দোলনই বাংলা সাহিত্যের ধ্রুবতারা হিসাবে বিশ্বের দরবারে মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে কিংবা আণ্ডারগ্রাউণ্ড সাহিত্য আন্দোলন, চক্রান্ত–উত্তীর্ণ সাহিত্য হিসাবে হাংরি গোষ্ঠীর সাহিত্যচর্চা মৃত্যুঞ্জয়ী — এই ধরণের উক্তি হাংরি জেনারেশন গোষ্ঠীর প্রকৃত হিতৈষীর দায়িত্ব পালন করে কিনা তাতে ঘোরতর সন্দেহ আছে। একদা আলোড়ন সৃষ্টিকারী, বর্তমানে

বিচ্ছিন্ন এবং প্রায় বিস্মৃত এই আন্দোলন বাংলা সাহিত্যের কোন মোড় ফেরাতে পারে নি। বাক-সর্বস্বতা, গোষ্ঠিপ্রিয়তা এবং অন্য কবিদের সম্পর্কে ভুল মূল্যায়ন, প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার যুক্তিহীন ঝোঁক—এগুলিই এই আন্দোলনের তথাকথিত দুর্বলতার দিক'। (১৫)

অবশ্যি, ক্ষুধিত গোষ্ঠির ভাঙনের মূল কারণটা অন্যখানে নিহিত। প্রাগুক্ত ইতিহাস অন্বেষণ করলে দেখা যায়, কল্লোলের মত হাংরি কবিরাও এক জায়গায় এসে জড়ো হয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যকে একটা মোড় দেবার তাগিদেই। কিন্তু ভাষা ও শব্দের বেয়াড়া ঘোড়াকে ছুটিয়ে তাঁরা যেভাবে নির্মোহ হয়ে নিজেদের বিশ্লেষণ করার মধ্যে দিয়ে 'আত্মপ্রচার' করতে শুরু করেছিলেন, তাতেই শোনা গিয়েছিল এই গোষ্ঠি-সাহিত্যের বিসর্জনের বাজনা। ইতিহাস অন্বেষণ করলে আমরা তাই এটাও দেখতে পাই, আন্দোলনের ওপর পুলিশী দমন শুরু হতেই গোষ্ঠি যায় ভেঙে। পুলিস যখন ক্ষুধার্ত কবিদের ধরে ধরে পেটাচ্ছে, তখন প্রথমেই সরে দাঁড়ালেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। ফেঁসে গেলেন মলয় রায়চৌধুরী। দু বছর মোকর্দমা চলার পর ২০০ টাকা জরিমানা দিয়ে তিনি যখন আদালত থেকে বেরিয়ে এলেন তখন কেউ আর সেখানে নেই। শক্তি তখন 'পদ্য' লিখে স্তাবক-পরিবৃত হয়ে পড়েছেন, প্রদীপ চৌধুরীর হাত পড়েছে নারীর নিতম্বে, অরুণেশের কলম নির্দ্বিধায় খোঁচা দিয়েছে রমণীর স্তনবৃন্তে, শৈলেশ্বর হাত রেখেছেন কিশোরীর কটিদেশে, এইভাবে সুবো আচার্য, সমীর, উৎপল, সুবিমল, সুভাস প্রমুখ ফিরে গিয়েছেন নারী-প্রদেশের এক একটি নিষিদ্ধ অঞ্চলে। এর বাইরে তখন একমাত্র আশার প্রদীপ দিলেন 'কৃত্তিবাস' সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কেননা, সরকারী পক্ষের প্রধান সাক্ষী শক্তি চট্টোপাধ্যায় কাঠগড়ায় দাড়িয়ে যখন হাংরিদের সাহিত্যিক 'অশ্লীল' বলেছেন, তখন সুনীল ছিলেন হাংরিদের পক্ষে। (১৬)

সুনীল যে হাংরি জেনারেশনকে বুঝেছিলেন, তাও নয়। এখানেই তাঁর স্ববিরোধ। অন্তত তাঁর একটি অভিমত এই কথাই প্রমাণ করে: 'এই প্রকার কোনো আন্দোলনে আমরা বিশ্বাস করি না।...হাংরি জেনা-রেশন আন্দোলন ভাল কি খারাপ জানি না। ঐ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য নেই। এ পর্যন্ত ওদের প্রচারিত লিফলেটগুলিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কীর্তি চোখে পড়েনি। নতুনত্ব প্রয়াসী সাধারণ রচনায় কিছু কিছু হাস্যকর বালকসুলভ ব্যবহার দেখা গেছে। এ ছাড়া সাহিত্য সম্পর্কহীন কয়েকটি ক্রিয়াকলাপ বিরক্তি উৎপাদন করে। তবে ঐ আন্দোলন যদি কোনদিন কোন নতুন সাহিত্যরূপ দেখাতে পারে—আমরা অবশ্যই খুশী হব।' (১৭) এ মতে সুনীলের সঙ্গে আমরা একমত হলেও এটা পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য।

এখানেও একটা কথা স্পষ্ট করতে চাই। কিছুদিন আগে অব্দি 'কৃত্তিবাসে'র নিরপেক্ষতার নামে যে সোর গোল উঠেছিল, তার সঙ্গে সুনীলের চরিত্রের (লেখকীয়) সাদৃশ্যের কোনো সংশ্রব নেই। ওটি বরং তাঁর স্তাবক-বন্ধু-অনুচর-প্রবন্ধিকের জন্য তোলা থাক, যাঁরা 'কৃত্তিবাস' ও 'দেশে' লেখার সুযোগ নিয়েই ও-কাজে নেমেছিলেন। যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একদিন বলেছিলেন, 'কৃত্তিবাসের পুরানো ফাইল ওল্টালে দেখা যাবে, এই পত্রিকার কবিরা কখনো নিজেদের প্রশংসা প্রচার কিংবা দলবদ্ধভাবে আর কারুকে আক্রমণ বা নিন্দা করতে যায়নি। এরা নিজেদের প্রাণের আনন্দেই মেতে ছিল।' (১৮) সেই সুনীলই এখনও বলে চলেছেন, 'যারা অন্যকে গালমন্দ, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি,

ও রবীন্দ্রকবিতা।' (২৫)। আর আজকের সজাগ কবিও সময়কে গভীরভাবে স্পর্শ করার মধ্যে দিয়ে লিখতে পারেন :

'আমি যেমন করে কলমে কবিতা লিখে থাকি
সময়ে তার চেয়েও দ্রুত বন্দুক তুলে নেব।'
['সময়ের বুকে হাত রেখে'—নিখিলেশ বিশ্বাস]

'আরতি, সাগরদীঘিতে বসে
নতুন সূর্য ওঠার আষাঢ়ে
গল্পটা কেন শুনিয়েছিলে তুমি—?
এখন সাগরদীঘি কেবলি তোমার মতো
আমাকেও যে টানে !!'
['আরতি তোমাকে'—সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়]

'চন্দনা, আমার প্রথম সন্তানটি
যদি ছেলে হয়
তবে তার জন্যে
প্রথম যে দুধটুকু, ওর মুখে
সযত্নে তুলে দেবে
তার মধ্যে আমার বুকের রক্ত
ভালো করে মিশিয়ে দিও।'
['অস্তিত্বের মুখোমুখি'— স্বপন সাহা]

এইসব কবিকে খুব 'বড়ো' মনে করবার কিছু নেই। এসবও একধরণের হুজুগের ফল। অতীতের অনেক উদাহরণই আমাদের সামনে রয়েছে। যাঁরা এককালে গাঁ-গঞ্জে ঘুরে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লোককবিতা লিখতেন, তাঁরাই আজ ঘরের দেয়ালে মানিপ্ল্যান্ট সাজিয়ে রেখে, কিংবা শহরে তিতিবিরক্ত হয়ে গ্রামে দিন কতকের জন্যে হাওয়া বদলাতে গিয়ে, অথবা সত্যজিৎ-মৃণালের ছবিতে শালবীথি ধানক্ষেত দেখে লোককবিতা লিখছেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। তাই 'দেশ' প্রভৃতি বড়ো বড়ো প্রাতিষ্ঠানিক কাগজে লেখবার সুযোগ ও ক্ষমতা নেই বলেই যাঁরা 'হাংরি' বা ওই ধাঁচে এক একটি গোষ্ঠির জন্ম দিচ্ছেন, তাঁদের আমি কোনরকম কনসেশন দেবার পক্ষপাতী নই। এঁদের ওপর আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কেননা, আগেই বলেছি, একসময়ের বীট-হাংরি কবিরা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও তাঁরা নিজেরাই এখন এক একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে বসে আছেন। এখন যাঁরা দেশ, আনন্দবাজার, শিলাদিত্য, মহানগরকে গাল দিচ্ছেন তাঁরাই যে বুড়ো বয়সে সুনীল-শক্তির মতো প্রতিষ্ঠান হয়ে পড়বেন না, এ গ্যারান্টি কে দেবে ? বুদ্ধদেব বসু যথার্থই লিখেছেন, যা কিছু প্রতিষ্ঠানিক তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে এই বীট কবিরা নিজেরাই এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলেন, তাই এঁদের আর বিদ্রোহী বলা যায় না।··· কবিদের যা সবচেয়ে শত্রু, তা দারিদ্র্য নয়, অবহেলা নয়, উৎপীড়নও নয়, তা অত্যধিক সাফল্য, তা বহুবিস্তৃত বিজ্ঞাপন। (২৬)

তাই বলছিলাম, গোষ্ঠি-আন্দোলনে আর যাই হোক কবিতা হয় না। কবিতা কল্পনাপ্রসূতা, বারুদ-গোলা তার আঁতুব-ঘর নয়। ওর কোমল তনু নিয়ে নাড়াচাড়ায় ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী। রবি ঠাকুরের মত সকল কবিকেই এটা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে জীবনের সকল সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান কবিতা। কবিতাই জীবন, জীবন ব্যতিরেকে কবিতাও নয়। এবং তাকে তলোয়ার বানানোর বাসনা কখনও পূর্তি পায় না। অতীতের একস্-রে করলে এটা ধরা পড়ে যে, যাঁরাই কবিতার কমনীয়তাকে বিস্মৃত হয়ে নতুন পথসন্ধানে পা বাড়িয়েছেন সাফল্য সর্বদাই তাঁদের করায়ত্ত হয় নি। কাব্য বাঁক নেয় নিজের মর্জি মাফিক, জোর করে তাকে মোড় দেওয়ার চেষ্টায় কবি স্বয়ং পতিত হন। ব্যক্তিগত ভাবে এটাই আমার উপলব্ধি। কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে আমার কলমের বৈরিভাব থাকলেও, তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্নে এ যাবৎ ঢের রিসার্চ করেছি এবং এটাই

মনে হয়েছে — ভালো কবিতা কোন সময়, কোন বাঁকের কন্যা নয়। আজকের শক্তি-সুনীল-অমিয়-নীরেন্দ্র-পূর্ণেন্দু-সুভাষ থেকে শুরু করে শান্তনু দাস, ঈশ্বর ত্রিপাঠী, সমীর মণ্ডল, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, পরেশ মণ্ডল, মতি মুখোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, রাখালরাজ মুখোপাধ্যায়, অমিয়কুমার সেনগুপ্ত, প্রফুল্ল অধিকারী, রীণা চট্টোপাধ্যায়, শান্তি রায়, দেবদাস আচার্য, সিদ্ধার্থ সিংহ, অজিত বাইরী, সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎ বসু, অরুণকুমার চক্রবর্তী, সোফিওর রহমান, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুখেন্দু মজুমদার, অভিজিৎ ঘোষ, মানবেন্দ্রনাথ দত্ত, যুথিকা দাসগুপ্তকে ভালো লাগা সেই অনুসন্ধানেরই ফল।

তথ্যসূত্র ঃ

(১) বুদ্ধদেব বসু—'কালিদাসের মেঘদূত', ভূমিকা

(২) দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — 'সাহিত্য যখন পণ্য', কবিতীর্থ, পুজা সংখ্যা ১৯৮৩

(৩) অজিত রায়—'টপ্পা গান কি অশ্লীল', পরিবর্তন, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২

(৪) বুদ্ধদেব বসু—'বাঁটিবংশ ও গ্রীনিচ গ্রাম', প্রবন্ধ সংকলন

(৫) Allen Ginsbarg — 'Howl and other Poems'

(৬) M L Rosenthal — 'Understanding Poetry',

(৭) W Beronhard Flishman — 'Princeton Encyclopedia of poetry and poeticy'

(৮) শৈলেশ্বর ঘোষের চিঠি—কৌরব, জুলাই ১৯৮০

(৯) ক্ষুধার্ত — ষষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই ১৯৬৩

(১০) তাপস মুখোপাধ্যায় – 'সাহিত্যে প্রগতি', দেশ, ১৪ নভেম্বর ১৯৮১

(১১) সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়—'উপন্যাস সাহিত্যে… শরৎচন্দ্র', গোধূলি মন, নভেম্বর ১৯৮৩

(১২) বুদ্ধদেব বসুর উক্তি - প্রবন্ধ সংকলন

(১৩) Elizabeth French Boed —'Bloomsberry Haritage'

(১৪) ডঃ রবিন পাল — 'কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান্য প্রবন্ধ'

(১৫) তাপস মুখোপাধ্যায় —'অ্যালেন গিন্সবার্গ, বীট কবিতা ও হাংরি জেনারেশন', আন্তরিক, অক্টো ডিসে. ১৯৮২

(১৬) দিলীপ ঘোষ—'হাংরি জেনারেশন : ফোড়া বিষফোড়া' কৌরব, আশ্বিন ১৩৮৮

(১৭) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—কৃত্তিবাস সেপ্টেম্বর ১৯৬৩

(১৮) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় — কৃত্তিবাস, এপ্রিল-জুন ১৯৭৩

(১৯) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—কৌরব, জুলাই ১৯৮২

(২০) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—স্বর্গ নগরীর চাবি'

(২১) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—কলেজ স্ট্রীট, জুলাই ১৯৮৩

(২২) ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি—এবং, মে-জুলাই ১৯৮৩

(২৩) Anna. E. Balakian—Dadaism

(২৪) দিলীপ ঘোষ—'হাংরি জেনারেশন : ফোড়া বিষফোড়া', কৌরব, আশ্বিন ১৩৮৮

(২৫) মৃদুল দাশগুপ্তের উক্তি—এবং, মে-জুলাই ১৯৮৩

অশোক চট্টোপাধ্যায়ের দু'টি কবিতা

মধ্যরাত / তিন

গতকাল ঠিক এই সময় কামার্ত পুরুষ এক
কুরে কুরে খাচ্ছিল সুখ
একা বিছানায় শুয়ে রমণীর নিদ্রাহীন
সময় কাটে না ।
কত তুচ্ছ খুঁটিনাটি কথা, ছোঁয়া-ছুঁয়ি
শরীরে-শরীর, ওষ্ঠে ওষ্ঠ
সে সুখ পরশ তাকে কাঁটা হয়ে
শরীরে ফোটায় ।
অথচ কালও এ সময়
ভরা ছিল পূর্ণকুম্ভ-সুখ
মাত্র গতকাল !

মধ্যরাত / চার

এণ্টেনায় জ্যোৎস্না-ধোওয়া লক্ষ্মীপেঁচা
সারারাত ডেকেছিল তাকে
সে আসেনি ।
নারকেল পাতার ফাঁকে চাঁদ
হাতছানি দিয়েছিল কত
সে দেখেনি
সবুজ শিশির-মাখা ঘাস
শিউলির আঁচল বিছিয়ে
বলেছিল এইখানে বস
সে বসেনি ।
শুধু সারারাত ধরে
শব্দহীন বমণে সিক্ত এক নারী
জানালা গরাদ ধরে স্থির ।

মরু-মল্লার / জ্যোতির্ময় বসু

ঝড় উঠল তিনটে রাত্তিরে ;
তারপর ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি ।
চোখ থেকে ঘুম গল উড়ে
মনটা হল ফাঁকা মাঠ ।
বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে
টগরের মাথানাড়া সর্বাঙ্গ খুসীকে
বৃষ্টি-থামা আগুন রং-এর আকাশটাকে
ভাবছি কেমন করে বন্দী করব ?
প্রথম বর্ষণে গাছের যে আনন্দ ।
তা আজও গানের মত পৃথিবীতে বয়ে চলেছে
সে গানকে বোঝা সোজা
ধরা যায় না অক্ষরের খাঁচায় ।

ভোর / পান্নালাল মল্লিক

জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে খুব কাছে
পাহাড়ের মাথায় সূর্যোদয় দেখছিলাম···
জল পাহাড়ী তিস্তার বুক জলে
পায়ের সাথে মাছের খুনসুড়ী অসহ্য ।
জল ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই—এক থাল লাল সূর্য
তিস্তায় ডুব মেরে আমায় নজর দিল ।
সেদিন বেসামাল নিজেকে হারিয়ে
তিস্তার বুকে একটা সকাল ভিজিয়ে নিলাম,
মনে মনে অনেক সকাল ধরে দেখবো বলে ।

সংবাদ

হজরৎ ওয়সী পীর কেবলার ৩৫তম স্মরণ উৎসব

উভয় বাংলার মহান সাধক, ফার্সী ভাষার বাঙালী মহাকবি বস্থলে নোমা পীর শাহসুফি সৈয়দ ফতেহ আলি ওয়সী পীর কেবলার ৩৫তম স্মরণসভা কলিকাতা মাণিকতলা ২৪/১ মুনশীপাড়া লেনস্থ মাজার সংলগ্ন মসজিদে গত ২০শে অগ্রাণ (৭ই ডিসেম্বর '৮৩) মহা সমারোহের সহিত হয়ে গেল। উক্ত সভায় ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশ থেকে অগণিত জ্ঞানীগুণী ভক্তরা সমবেত হয়েছিলেন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে। বিভিন্ন বক্তা হজরত ওয়সী পীরের বাস্তব জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন ও তাঁর লিখিত কাব্যের উপরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। দিওয়ানে ওয়সী ফার্সী কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের গুরুত্ব আরোপ করেন। বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব আমিনুল ইসলাম এসেছিলেন ঐদিন হজরত ওয়সী পীর কেবলাকে শ্রদ্ধা জানাতে। সভায় সভাপতিত্ব করেন নিখিল ভারত ওয়সী মেমোরিয়াল এ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আলহাজ হজরত পীর মওলানা জয়নুল আবেদিন আখতারী সাহেব। সভাটি নিখিল ভারত ওয়সী মেমোরিয়াল এ্যাসোসিয়েশন দ্বারা আয়োজিত হয়। ঐদিন হজরত ওয়সী পীর কেবলার জীবনের বিভিন্ন দিক এবং বাংলার সুফীদের উপরে একটি প্রদর্শনী দেখান হয়।

বুধবাসরীয় বৈঠকে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব

২৬শে বৈশাখ '৯১ বুধবার সন্ধ্যায় 'অভিনব অগ্রণী'র হাওড়া অফিসে 'বুধবাসরীয় বৈঠকে' 'রবীন্দ্র জয়ন্তী' উপলক্ষে আলোচনা, কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠের আসর বসে। অচল ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে শোভন শেঠ, অজিত দাস, আভাস মজুমদার, সঞ্জিত প্রধান, স্বপন নন্দী ও দিলীপ বাগ অংশ নেন।

সারা ভারত হাতের লেখা প্রতিযোগিতা

চন্দননগর, লক্ষ্মীগঞ্জ, বিচুলিপট্টির বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব স্বামী বিবেকানন্দের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে এক হাতের লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ ২৫শে আগষ্ট, ১৯৮৪।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

এবারের কবিপক্ষে রবীন্দ্রসদনে কবিতা পাঠের জন্য আমন্ত্রিত কবিদের মধ্যে আমাদের ঘনিষ্ঠ এবং লিটিল ম্যাগাজিনের আপনজন মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণকুমার চক্রবর্তী এবং পান্নালাল মল্লিক আমন্ত্রিত হওয়ায় আমরা আনন্দিত এবং গর্বিত।

কবি সনৎ মান্না গোধুলি-মন গোষ্ঠির অন্যতম একজন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে ২য় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের জন্য অর্থ মঞ্জুর করেছেন। ইতিপূর্বে 'তৃণাঙ্কুর' সম্পাদক বন্ধুবর কবি গৌরাঙ্গদেব চক্রবর্তী, সনৎ মান্নার ১ম কাব্যগ্রন্থ 'বেজে ওঠে বিশাল পিয়ানো' প্রকাশ করেছেন।

চন্দননগরের গৌর বৈরাগীর নেতৃত্বে 'গল্পমেলা' এবং শ্যামনগরের গৌরাঙ্গদেব চক্রবর্ত্তীর সাহিত্যসভা অনেক তরুন এবং প্রবীণ মানুষকে সাহিত্যপ্রেমী করে তুলেছে। তাঁদের অনেকেই গল্প কবিতা নিয়ে গভীরভাবে ভাবছেন।

MEMBER { All India Small & Medium News Paper Association, Delhi.
Little Magazine Editors Association, Calcutta.
Hooghly Dist. Patra Patrika Somity, Hooghly.

GODHULI-MONE N. P. Regd. No. RN. 27214/75 June '84 (জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১)
Vol. 26, No. 6 Postal Regd. No. Hys-14 Price—Rs. 1·50 only

শুধুমাত্র মহিলাদের লেখায়-রেখায় সজ্জিত

গোধূলি মন

মহিলা সংখ্যা

প্রকাশিত হবে জুলাই / ১৯৮৪ (আষাঢ় ১৩৯১)
দাম যথারীতি দেড় টাকাই থাকছে ।

বিষয়সূচীতে থাকছে : গল্প / কবিতা / প্রবন্ধ / ছড়া / আলোচনা ও পুস্তক সমীক্ষা

লেখিকাদের তালিকায় আছেন : অধ্যাপিকা গৌরী আইয়ুব, অধ্যাপিকা গৈরিকা ঘোষ, অধ্যাপিকা কৃষ্ণা বসু, রীণা চট্টোপাধ্যায়, দীপালি দে সরকার, নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়, রীণা দত্ত, আরতি দত্ত, যুথিকা রায়, শ্যামা দে, ধীরা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামলী হালদার ।

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পপুলার প্রিন্টার্স, বারাসত, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও নতুনপাড়া, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত ।

এই সংখ্যায় :

প্রচ্ছদ : শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়

আষাঢ়/১৩৯১

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

অরুণ মণ্ডল
৬৪/২৩, বেলগাছিয়া রোড
কলিকাতা-৩৭

○ সবিনয় নিবেদন,

গদ্য-পদ্য যা হয় কিছু চেয়েছেন। জবাবী খাম প্রেমপ্রার্থী পরোয়ানার মতো। মনে হচ্ছে খুবই তাড়া আছে। মূলতঃ আমি গদ্য-লেখক। কিন্তু কিছুই লেখা নেই। গদ্য লিখতেও একটু সময়ের দরকার হয়।

কবিতা দু'একটা তৈরী আছে। একটি পাঠালুম। কবিতাটি আমার প্রিয়। আপনার পত্রিকায় স্থান পেলে খুশী হবো। ……আপনার পত্রিকা নামেই লিটল ম্যাগাজিন—আইডিয়াতে বৃহৎ। এক একটি সংখ্যা এক একটি রূপে আবির্ভূত হচ্ছে। আপনার মহিলা সংখ্যা অভিনব হোক এই প্রার্থনা করি। আমাকে মনে রেখেছেন এজন্য ধন্যবাদ। নমস্কার।

বিনত—
নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়

○

○ আশা করি ভালো আছেন।

আপনার পত্রিকা নিয়মিত পাই এবং অত্যন্ত যত্ন নিয়ে পড়ি। আমার ভাবতে অবাক লাগে কোন্ অজানা মন্ত্রবলে সুদীর্ঘ দিন নম্রভাবে পত্রিকা প্রকাশ করছেন। বিষয়বৈচিত্র্যও ভাবনার খোরাক যোগায়।

'মহিলা সংখ্যা'র জন্য আমি দুটি কবিতা পাঠালাম। এঁরা দুজনেই আমার সহপাঠিনী ছিলেন। মনীষা মুরমু মেদিনীপুরের গড়খাসের একজন আদিবাসী সাঁওতাল যুবতী. ওর কবিতা আমার ভালো লাগে, সেই সুবাদে আপনাকে পাঠালাম। মণিমালা থাকেন চুঁচুড়ায়- ওর কবিতা আমার কাছে ছিল। যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে প্রকাশ করবেন।

নমস্কার জানিয়ে শেষ করছি।

অরুণ মণ্ডল
রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন

○

○ চন্দননগর হুগলী থেকে প্রকাশিত ও অশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'গোধূলি-মন' পত্রিকাটি সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। নিষ্ঠায়, দায়িত্ব-বোধে 'গোধূলি মন' সকলের মন জয় করেছে। পত্রিকাটির বিশেষ আকর্ষণ অজিত রায়ের প্রবন্ধ। এমন পরিশ্রমী প্রবন্ধ আজকালকার গতানুগতিকার যুগে একটি দৃষ্টান্ত। একই কথা বলা যায় জীবেন্দু রায় সম্পর্কে।

- অমৃতলোক (মার্চ, ১৯৮৪)

○

○ সুহৃদ্বরেষু,

আশা করি আপনার সর্বাঙ্গীন কুশল। বিস্ফোড়ায় ভুগছি।

গোধূলি-মনের মহিলা সংখ্যার পরিকল্পনাটি সুন্দর। প্রকাশের অপেক্ষায় রইলুম। গোধূলি-মন এই ধরণের আরো পরিকল্পনা নিলে ভালো হয়।

এদিকে বর্ষা সুরু হয়ে গেছে। সারাদিন বৃষ্টি মেঘ রোদ্দুর হাওয়া।

শুভান্তে,
সৌমেন অধিকারী
45·B, Rischie Rd.
Cal-7000019

○

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি-মন

২৬ বর্ষ / ৭ম সংখ্যা

আষাঢ় / ১৩৯১

প্রতি সংখ্যা দেড় টাকা
বার্ষিক (সডাক) পনের টাকা

সম্পাদক ::
অশোক চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

প্রিয় পাঠক, আবার আমরা দুঃখিত এবং লজ্জিত। দুঃখিত এই কারণে—বর্ত্তমান সংখ্যাটি মহিলা সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করার কথা বিজ্ঞপিত হওয়া সত্ত্বেও এবং অনেককে চিঠি দেওয়ার পরও উপযুক্ত লেখা পাওয়া যায়নি। অনেকে লেখা দিতে পারছেন না সে কথা জানানোর কষ্ট স্বীকার করার মতো সৌজন্যটুকুও দেখাননি। হাতে আর অপেক্ষা করার মতো সময় না থাকায় জুলাই সংখ্যাটিকে সাধারণ সংখ্যা হিসাবেই প্রকাশ করা হোল।

আগষ্ট সংখ্যা (শ্রাবণ) মহিলা সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে। বিজ্ঞাপনে যাঁদের নাম দেওয়া হয়েছে তাঁদের অনেকের লেখা না পাওয়া গেলেও দু'বাংলার অনেকেরই কবিতা পাওয়া গেছে। গদ্য মাত্র চারটি—যূথিকা রায়, রীণা দত্ত, ঈশিতা ভাদুড়ী ও নিবেদিতা ভৌমিকের। প্রচ্ছদ এঁকেছেন চন্দননগর 'রবিবাসর' শিল্পকেন্দ্রের কোয়েল চট্টোপাধ্যায়।

গোধূলি মন-এর পূজা সংখ্যার দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকেন একদিকে যেমন বোদ্ধা সমালোচকেরা, অন্যদিকে তেমনি নিষ্ঠাবান পাঠকেরা। মনন-ঋদ্ধ প্রবন্ধ, সমাজসচেতন কবিতা, গল্প, ব্যঙ্গ ছড়া ও ছবিতে এবারেও অনন্য সাজে সাজাবার পরিকল্পনা চলছে। সংখ্যাটি মহালয়ার দিন বের হবে।

রাধা ও কৃষ্ণ/ফারুক নওয়াজ

হে বাউল, লালনের দেশে তুমি জন্মেছো ; তুমি তো লালন !
তোমার শরীরে মাখা পদ্মার কাদামাটি ঘ্রাণ,
শ্রীপুর-হরিশপুর-যশোরের মেঠোপথে তুমি চলে যাও
হে বাউল, চলে যাও—চলে যাও হে উদাস প্রাণ ।

পিতামহ, প্রোপিতামহের দেশ একদিন ছিলো এই ভূঁয়ে
জানি জানি মাতামহীর শবদেহ প্রোথিত এখানে ;
ঠাঁই নেই-ঠাঁই নেই-ঠাঁই নেই   হে বাউল এখানে তবুও
শকুনী 'মঙ্গল কোর্ট' দেবে না তোমাকে ঠাই এই স্থানে !

ও রাধা, ও কৃষ্ণ বিষাদের একতারা বাজাও বাউল
তোলো-তোলো বিচ্ছেদ বিরহের মূর্ছনা তোলো—
ডাইনে পীরের পুকুর, বাঁয়ে রেখে বিবির পুকুর ; চলে যাও সোজা
আঠারোওলীর মাজার চুমু খেয়ে চলো ফিরে চলো ।

হে বাউল লালনের দেশে তুমি জন্মেছো তুমি তো লালন !
যেখানে তোমার নাড়ি পোঁতা আছে সেইখানে যাও,
যে মাটি তোমার লালক, তাকে তুমি ভুলে যাও কেনো ?
যে তোমায় চায়না কভু, আহা তুমি তাকে কেনো চাও ?

এখানে ঘুঘুর ডাক আচমকা নাচাবেনা তোমার হৃদয়
এখানে স্বপ্ন আছে ; সুখ আছে ; ভাবাটাই ভুল ।
শ্রীপুর-হরিশপুর-যশোরের মেঠোপথে চলে যাও তুমি
ও রাধা, ও কৃষ্ণ একতারা বাজাও বাউল ।

আমরা/দেবব্রত ব্যানার্জী

হোটেল ওয়েসীসে
যখন দিনের প্রথম সূর্য ওঠে,
তখন আমরা
দলে দলে ভীড় জমাই ।
এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের
চিত্রগুপ্তের খাতায় নাম
লেখানোর সঙ্গে সঙ্গে,
আমরা 'ভোর হোল দোর খোল
বলতে ভুলে গেছি ।
রাজনীতি, বিশ্বকাপ, ডিস্কো নি
চায়ের টেবিলে ঝড় তুলি ।
রাস্তায় হেঁটে যাওয়া
দু-একটা রঙিন শাড়ি পরা
ফানুশকে দেখলে,
'জানে মন তুম কাঁহা'
বলে আওয়াজ দিই ।
মরুভূমির যাযাবরদের মত
এক গ্লাস চায়ে
দুজন তৃষ্ণা মিটাই ।
আমাদের সুন্দর বর্ত্তমান
ফুটপাতের উপর,
চা খাওয়া ভাঁড়ের পাহাড়ে
ভেতর ডিম পাড়ছে ।
পূর্ণদার বিড়ির বাণ্ডিলে
আমরা ভবিষ্যতের
নতুন সূর্য ওঠার
স্বপ্ন দেখি ।

একটুখানি জীবন নড়ে/মতি মুখোপাধ্যায়

সন্ধ্যা হলেই রূপবিলাসী বারাঙ্গনার মতোন সাজে
হ্যালোজেনের আলো যেন প্রথম সোনারোদের যাত্
উজাড় করে জ্যোৎস্না কেমন ছড়িয়ে দিচ্ছে মার্কারিতে
স্টেশন জুড়ে সুখী মানুষ
দেখছে ট্রেনের আসা কি যাওয়া
একটু থামা কিংবা প্রবল ঝড়ের মাত্রা ছন্দ জেনে
কাঁপিয়ে মাটি ওই যে গতি
পুকুর ঘাটের জলের মতো জীবন নড়ে
দেখছে ওরা সবুজ কি লাল কিংবা হলুদ জ্বললো বাতি
পুরোহিতের ঘণ্টা শুনে লেভেল ক্রশিং বন্ধ হতে
যাত্রী সজাগ জীবন সজাগ
ট্রেন আসছে অনেক দূরের
শাল মহুয়ার গন্ধ-মদির অচেনা এক পাহাড়তলীর
হয়তো কোন অনাম্নী এক রতিকান্ত পাখির গানে
ঠোঁট মিলিয়ে বাজ্‌ছে বাঁশী
বিদায় বিদায় সবুজ রুমাল
সুখের এসব ভাবনা আসে।

বাদবাকি যা দুঃখ যেসব
লোডশেডিঙে চোরের মতো ফিরবে ওরা
দেখবে ফিরে পুকুরঘাটের জলে কেমন নড়ে
একটুখানি জীবন নড়ে
একটুখানি জীবন নড়ে।

বসত/উদয়ন সরকার

মেয়াদ ফুরোলেই চ'লে যেতে হবে
বাসা বদল ক'রে অন্য কোথাও
সেরকমই নিয়মজানি অথচ
আমার মনের বসতে
অন্তর্গত সত্তা ও রক্তের গভীরে
প্রাণপ্রিয় সেই বসতও গেড়েছে এক অলৌকিব
তাকে ছেড়ে যাই কোথায়?
বসতহারা হ'লে বাস্তুহারা বলে অভিধানে
মানুষের ভেতরেও যে বসতের বসতি
তাও যদি যায় চলে
তবে তো মুস্কিল খুব বেঁচে থাকা—
মধ্যবিত্তের লালিত জীবনে
কে আর বোঝে হায়—
পুরণো বসত কতপ্রিয় স্মৃতি-রক্ত-গন্ধময়
তবু চলে যেতে হবে যেতেই হবে ফুরালে মেয়াদ
বাসা বদল ক'রে অন্য কোথাও ॥

শৃঙ্খল/লিউ পো-চিয়েন

[বিপ্লবী
লিউপো-চিয়েন, কাইশেকের কারাগারে ১৯৩৫ সালের ১১ই মার্চ এই কবিতা লেখেন, এরপর মাত্র নয় দিন তিনি বেঁচে ছিলেন, ২০ মার্চ তাঁকে হত্যা করা হয়।]

১) শৃঙ্খলে বাঁধা আমার পদযুগল, রাজপথে
চলেছি তাই হাসের মতোই। আমি চলেছি,
পা আমার গতিশীল। ফেটেপড়া সাধারণ মানুষের
চোখ আমার দিকেই। কিন্তু আমার অন্তরকে
করেনি আচ্ছন্ন অপমানের চিহ্ন মাত্রও।

২) প্রধান রাস্তা দিয়ে চলেছি আমি
শৃঙ্খলিত। পা ফেলতে বেজে উঠছে
শৃঙ্খলের বেড়ি ; আর পথের মানুষের
সারামুখ গম্ভীর সওয়ালে
কিন্তু স্বস্তির স্পর্শে ভরা হৃদয় আমার।

৩) আমি যখন চলেছি শৃঙ্খলিত রাজপথে
সংগ্রামী চেতনা আমার উঠেছে জেগে
বর্ধিত কলেবরে।
শ্রমিক আর কৃষকের মুক্তির যুদ্ধে,
সুখী আমি চির কারাগার।

অনুবাদ তপন দাস

এত বিনম্র তুমি, অথচ/ভবেশচন্দ্র বসু

এত বিনম্র তুমি, অথচ
অবিরাম সংহার ও জলোচ্ছ্বাস
তোমার রমণীয় প্রতিমার
স্থির চিত্রে
অন্ধকার রেখে গেল।

চূড়ান্ত দাবদাহে
কৈশোরের পাঁচিল বিদীর্ণ করে
যাকে সিংহাসনে আবিষ্ট করলে
সেও ভেঙে খান খান
কাঁপা কাঁপা দংশনে
অথবা আশ্চর্য এক
সকরুণ মায়ায়।

ঐখানে শিকল জড়িয়ে
অজস্র উৎসব
বাঁকা পথে ভূমিষ্ঠ হয়
বিপরীত হাওয়ায় ;
আসরে বলে
পৃথিবীর নীচে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গেও
সারারাত খুলে দিয়েছিলে
সমুদ্র বন্দর
না কি তোমার গোপন হৃদয় ?

এত পবিত্র তুমি, অথচ

আপটন সিনক্লেয়ারের ঃ সাহিত্য চিন্তা

অমল হালদার

আমাদের দেশে চারিদিকে দুর্নীতি দেখে প্রায় মনে হয় এ-দেশে আপটন-সিন্‌ক্লেয়ারের মতো একজন লেখকের আবির্ভাব কেন ঘটছে না। আপটন সিনক্লেয়ার—উনআশিটি বই লিখেছেন। এর অধিকাংশই আমেরিকার জীবনের এক একটি দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান… !

এই অভিযান উপন্যাসের মাধ্যমে হলেও আমেরিকায় প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। দুর্নীতির বিরুদ্ধে ক্রমাগত আক্রমণ চালাবার ফলে—রাষ্ট্রের কর্ণধারবৃন্দ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

রুজভেল্ট বলেছিলেন, 'সিন্‌ক্লেয়ার কিছু দিন চুপ করে থাক, আমাকে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে দাও।" সিন্‌ক্লেয়ারের অভিযান অনেক ক্ষেত্রেই সফল হয়েছিল। সরকারকে জনমতের চাপে পড়ে দুর্নীতি দূর করবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল।

এদেশের লেখকরা চোখের সামনে এত দুর্নীতি দেখেও, নতুন বিষয় বস্তুর উপর—লেখার প্রেরণা কেন লাভ করেন না জানি না… ?

কয়েক বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে "দি অটোবয়োগ্রাফি—অব আপটন সিন্‌ক্লেয়ার" এই আত্মচরিতটি পড়লে সিন্‌ক্লেয়ারের সাহিত্য জীবনের মর্মকথা উপলব্ধি করা যায়।

সিন্‌ক্লেয়ারের প্রথম জীবন কেটেছে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। বাবার আয় ছিল সামান্য। তার উপর তাঁর ছিল পানাসক্তি। উপার্জনের টাকা প্রায় মদ খেয়ে উড়িয়ে দিতেন। মদের প্রভাবে সংসারের এই দুরাবস্থার কথা সিন্‌ক্লেয়ারের মনে এমন আঘাত দিয়েছিল যে, তিনি জীবনে কখনো মদ্ স্পর্শ করেন নি।

দারিদ্র্যের জন্য তাঁদের কোনো স্থায়ী বাসস্থান ছিল না। সস্তা ভাড়ার ঘরে এখানে-সেখানে কেবল ঘুরে বেড়াতে হত। অনেক রাত্রি সিন্‌ক্লেয়ারকে জেগে কাটাতে হত ছারপোকা মেরে। এই দারিদ্র্যের মধ্যেও সিন্‌ক্লেয়ার নিয়মিত পড়াশুনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভর্তি হলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের পড়াবার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

একজন অধ্যাপক তাকে বলেছিলেন, ইংরেজী রচনা সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না। আর একজন সাহিত্যের বিখ্যাত অধ্যাপক বায়রণের কবিতায় ব্যাকরণ ভুল আবিষ্কার করে উল্লেখিত হয়ে উঠেছিলেন। শেলীর কবিতাও নিশ্চয়ই এমন ভুল আছে, সিদ্ধান্ত করে তিনি নতুন করে তাঁর রচনা পড়তে আরম্ভ করলেন ভুল বের করবার আশায়।

কলেজে পড়বার সময় একটি ইহুদি ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল সিন্‌ক্লেয়ারকে সেই ছেলেটি যখন একদিন জানাল যে, তার একটি গল্প ছাপা হবে, তখন, সিন্‌ক্লেয়ার ভাবলেন, ও যদি লিখতে পারে আমিই বা পারব না কেন ?

এই প্রেরণা থেকেই তিনি পাখির উপরে একটি ছোট গল্প লিখে ফেললেন। 'আর্গসি' পত্রিকায় এই

লেখাটি ছাপা হল এবং পারিশ্রমিক পেলেন ১২০ টাকা। গল্প এত সহজে প্রকাশিত হলেও প্রথম উপন্যাস 'স্প্রিং টাইম' প্রকাশক পাণ্ডুলিপি প্রত্যাখান করার পর সিনক্লেয়ার নিজেই বই প্রকাশ করলেন টাকা ধার করে। পরবর্তী বইগুলির জন্য তাঁর পক্ষে প্রকাশক পাওয়া কঠিন হয়েছিল।

এমন কি, তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'দি জাঙ্গল' পাঁচজন প্রকাশক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। এ বই চাঁদা তুলে ছাপাবার ব্যবস্থা করবার পর তিনি প্রকাশক পেয়েছিলেন।

উপন্যাসের বিতর্কমূলক প্রকাশকরা তাঁর পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করতে দ্বিধা করত। 'দি জাঙ্গল' প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে। এ বই প্রকাশিত হবার পর সিনক্লেয়ারের খ্যাতি অকস্মাৎ আমেরিকায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। 'দি জাঙ্গল' আমেরিকার প্রথম প্রোলিটেরিয়ান উপন্যাস, এ কথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না।

'দি জাঙ্গল' চিকাগো শহরের মাংস প্যাক করবার শিল্পের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ। নায়ক জুর্গিস রুডকুস লিথুয়ানিয়ান; স্ত্রী ওনা এবং অন্যান্য আত্মীয়দের নিয়ে আমেরিকায় এসেছে জীবিকার সন্ধানে। তারা সবাই কাজ পেল প্যাকিং ফ্যাক্টরীতে। কাজের পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, পারিশ্রমিকও খুবই কম। অথচ খাটুনির কমতি নেই। ফ্যাক্টরি কাজ করতে করতে অনেকের ক্ষয়রোগ হল। বাবা ও স্ত্রী মারা গেল, জুর্গিস নিজেও ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে মদ ধরল। এর পর থেকে অধঃপতন শুরু হল দ্রুতগতিতে। এক সমাজবাদী নেতার বক্তৃতা শুনে জুর্গিস মুক্তির সন্ধান পেল।

এই উপন্যাস মাংসের ব্যবসায়ে দুর্নীতি, ভেজাল এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর পরিবেশের যে বাস্তবানুগ চিত্র পাওয়া গেল, তাতে সমগ্র দেশ স্তম্ভিত হয়ে গেল। তাতে রুজভেল্টের দপ্তরে প্রত্যহ এই সম্পর্কে শ'খানেক করে চিঠি আসতে লাগল। সংবাদ পত্রে, পথে-ঘাটে সর্বত্র কেবল এই নিয়েই আলোচনা। হাজার-হাজার কপি (বই) 'দি জাঙ্গল' বিক্রী হল।

যত টাকা পেলেন সিনক্লেয়ার, তা দিয়ে তৈরি করলেন হেলিকন হল; এই হলকে তিনি করে তুললেন আদর্শ বাসস্থান। সিনক্লেয়ার লুইস নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, (১৯৩১ সালে) কিছুদিনের জন্য হেলিকন হলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। কিছুদিন পরে আগুন লেগে হেলিকন হল পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

আপটন সিনক্লেয়ারের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে 'কিংকোল' ও 'অয়েল' এর কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। এ দুটি বই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লেখকের অভিযান।

১৯১৪ কি ১৫ সালে কলোরাডোর কয়লার খনিতে যে ধর্মঘট হয়েছিল তার উপর ভিত্তি করেই 'কিং কোল রচিত'। কয়লাখনির শ্রমিকদের শোচনীয় জীবনযাত্রার কথা বলা হয়েছে। এ কাহিনীতে 'অয়েল' এ আছে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার তেল শিল্পের দুর্নীতির কাহিনী।

সিনক্লেয়ারের উপন্যাসের বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হয়েছে তার জীবনের শেষার্ধে। তিনি সাম্প্রতিক জীবনের বৃহৎ পটভূমিকায় দশখণ্ডের একটি উপন্যাস লিখেছেন। এই দশখণ্ডের মোট শব্দ সংখ্যা ত্রিশ লক্ষেরও বেশী।

প্রথম খণ্ডের নাম 'ওয়ার্লডস্ এণ্ড' নায়ক ল্যানি বাডের যৌবন ও শিক্ষা এই খণ্ডের বিষয়বস্তু। সর্বশেষ খণ্ডে আছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা। দশ লক্ষ ডলার ব্যয় করে একটি রেডিও ষ্টেশন স্থাপন ল্যানি বাডের এই পরিকল্পনার মধ্যে কাহিনীর বিস্তার ঘটেছে। এই রেডিও ষ্টেশনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তির বাণী প্রচার করা হবে। 'লানি বাড' সিরিজের

দশ খণ্ডের উপন্যাসে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের ইতিহাস ধরা পড়েছে।

জোলার প্রভাব স্পষ্টই দেখা যায়, 'দি জাঙ্গল', 'কিং হোল' ইত্যাদি গ্রন্থে। জোলার মতো তাঁর রচনা বাস্তব ধর্মী…'কিং কোল' এবং 'জার্মিনালে' জোলার ছায়া পড়েছে। সিনক্লেয়ার কাহিনীর ঘটনাস্থলে বাস করে সবকিছু নিজের চোখে দেখে বাস্তব ছবি এঁকেছেন।

---

(1) Sinclair, Upton (1878) American Novelist. He made his name by writing The Jungle in 1906. His other works include the METROLIS, KING COAL, OIL ETS.

(2) Sinclair Lewis (1885) American Novelist of widefame. He was awarded Nobel Prize for literature in 1931.

সমান্তরাল কেন/বিশ্বজিৎ বাগচী

সমান্তরাল কেন বসে থাকো প্রেম
আকৈশোর জল খুঁজে গেলে
পাখীও তো হতে পারো
নির্লোভ ওড়াউড়ি বেশ ভালো

যেমন খুবই ভালো শ্মশানে মশানে
রুকস্যাকে কবিতার বুক
বুক না চিবুক ?
ভালবাসা চিবুকে ছড়িয়ে গেলে
ক্রমশঃ ধূসর হয়ে যায়

সমান্তরাল তুমি বসে আছো প্রেম
বেশ ভালো এরকমই মগ্ন থাকা অবিরল
নদীতে নদীর মতো অটুট উজ্জ্বল—

আত্মচরিত্ত/শেখ মহরম আলি

এখন আমার কবিতার বয়স বাইশ।

বয়স আমার হিসেব-নিকেশ ভুল
বসে আছি নিয়ে ভুলের স্মৃতি।

ধরুণ, ঐ পাখীটার ইচ্ছে আকাশ দেখা।
পাখীর বয়স কত? না জানে ঐ আকা
আকাশ এমন বোবা !

ভাবুন, গঙ্গা নদীর জল, পদ্মা নদীর না

পদ্মে থাকেন দেবী গপ্পো এবং বয়স
আপনিও ঠিক জানেন।

আমার বয়স কত? পুত্র তুমি বলো -

ধৃতরাষ্ট্র বয়স, ভীষ্ম যদি শরীর
বংশ-রক্ত ক্ষত্রিয়, মানুষ মানে সাহস।

হালিদে আদিবের তুর্কী গল্প ধর্মান্তরণ

যুগের হাওয়া খুব উলটো পালটা চলছে, সেজন্যই এক মুসলিম মেয়ে খ্রীষ্টান ছেলেকে ভালবেসে ফেলল। ওর প্রেমিক পেরেগ্রিনীর মা হঠাৎ মারা গেলে দুঃখে সে কাউকে কিছু না বলেই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেল। রাবিয়ার মনে হল—সে আর ফিরবে না।

মুসলিম মেয়ের বিধর্মীর সঙ্গে প্রেম করা পাপ, রাবিয়া জানে। তাই সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে, মনে হয়—এই ভুলের জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। অথচ মন থেকে পেরেগ্রিনীকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছে না।

রাবিয়ার অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে দেখে রাকীম ও পেরেহ চিন্তিত হয়ে পড়ল। আগেকার হাসিখুশী চঞ্চল মুখ আর নেই। সারাদিন নানা চিন্তায় গম্ভীর হয়ে থাকে, যেন কোন শত্রু ওর সব কিছু কেড়ে নিতে চাইছে……।

সে আর স্বপ্নে পেরেগ্রিনীকে দেখতে পায় না। স্বপ্নে ইমামের মুখ বারে বারে ভেসে ওঠে। লো টা সব সময় ওর উদ্দেশ্যে কোরাণ থেকে বিড়বিড় করে উদ্ধৃতি পড়ছে। দেখতে পায় মায়ের জিভ সাপের জিভের মত হয়ে তাকে কামড়াতে আসছে। কোন অচেনা লোক তাকে বলছে, 'তুমি যদি মন থেকে বিধর্মীয় স্পর্শ মুছে না ফেল, তবে তোমাকে নরকের আগুনে পুড়ে মরতে হবে।'

ঘোর অনিশ্চয়তা ও অন্ধকারের মধ্যে শেষপর্যন্ত একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল,—এই ভয়ঙ্কর অস্থির জীবন থেকে মুক্তি পেতে হবে। যেভাবেই হোক পেরেগ্রিনীকেই বিয়ে করবে।

সে এই সিদ্ধান্ত নেবার কদিন পর পেরেগ্রিনী গ্রামে ফিরে এল। দোকানে এসে রাকিমকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি রাবিয়ার সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! সোজা উপরে চলে যাও।'

পেরেগ্রিনী উপরে উঠল।

"রাবিয়া! আমি একটা জরুরী আলোচনা সারতে চাই।…তুমিতো জানই মা মারা গেছেন—এখন আমি দুনিয়ায় একেবারে একা। তোমাকে বিয়ে করে আমার একাকীত্ব দূর করতে চাই।"

রাবিয়া কোন উত্তর দিল না। পেরেগ্রিণী স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ রাবিয়ার টানা টানা চোখ দুটি বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। ভরাট গলায় বলল, "আল্লা তোমায় দীর্ঘজীবি করুন, প্রিয় আমার! আমিও আমার একাকীত্ব দূর করতে চাই। কিন্তু আমরা কিভাবে বিয়ে করব! আমাদের ধর্ম যে আলাদা আলাদা।"

"তাতে কি হয়েছে? বিয়ের পর আমরা এখান থেকে বহুদূর চলে যাব……সেখানে কেউ ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না।"

ধরা যাক, সাহস করে সে যদি নিজেকে ধার্মিক সংস্কার থেকে মুক্ত করে নেয়—তাহলেও যে গ্রামে তার জন্ম হয়েছে, যেখানে বড় হয়েছে, যার বাইরের জগৎ সে কখনো চোখে দেখেনি—সেখান থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসবে?

পেরেগ্রিণীতো ভবঘুরে ধরণের ছেলে! আজ এখানে কাল সেখানে সব জায়গায় থাকতে পারবে। কারণ সে কোন নির্দিষ্ট স্থান বা সংস্কারে আবদ্ধ নয়। কিন্তু-রাবিয়া কি করে গ্রাম ছেড়ে তার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে?

রাবিয়া কোন উত্তর দিল না। কি বলবে, কি ভাবে বলবে কিছুই বুঝতে পারছে না।

'ক'মিনিট চিন্তা করে পেরেগ্রিণী বলল, "মনে হচ্ছে তোমাকে বিয়ে করতে হলে আমাকে ধর্মপরিবর্তন করতে হবে—আমি মুসলিম হতে রাজি আছি।"

"আমি যে কোন অবস্থায় তোমার স্ত্রী হতে চাই।" রাবিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল।

পেরেগ্রিণী এগিয়ে এসে রাবিয়ার হাতে চুমু দিল।

দুবার জন্ম হয় পুরুষদের। একবার মা জন্ম দেয় দ্বিতীয়বার প্রেমিকা।"

রাবিয়ার একটা প্রাচীন প্রবাদ মনে পড়ল—'কপালে যার নাম লেখা থাকে তার সঙ্গেই বিয়ে হয়।'

বেহবী রাবিয়াকে ডেকে বললেন, "পেরেগ্রিণী কাল আমার কাছে এসেছিল। সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তোমাকে বিয়ে করতে চায়, নিজের নতুন নামও ঠিক করে নিয়েছে—উস্মান। আমি তোমার মতামত জানতে এসেছি।"

রাবিয়া উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু করে বসে থাকল। বেহবী হেসে বললেন- আশা করি তোমাদের ভালবাসা নিখাদ। সহজে নষ্ট হবে না।

রাবিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "আমি ওই কাফের ইতালিয়ানকে ছেলেবেলা থেকে ভালবাসি সে যদি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব না দিত, তাহলে আজীবন কুমারী থেকে যেতাম।"

—"আল্লার খেয়াল কেইবা বুঝতে পারে!" বেহবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন।

আমার ভাগ্যে হয়তো এটাই লেখা ছিল." রাবিয়া বলল, "ভাগ্যের লেখা কখনো সখনো ইচ্ছাতেও পরিণত হয়। যাক তুমি কবে বিয়ে করতে চাও?"

"যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ততই ভাল।" বলতে বলতে নিজেই লজ্জা পেল। হায় আল্লা! নিজের মুখে কি একথা বলা উচিৎ হল! তাও বয়জ্যেষ্ঠ বেহবীর সামনে! কেমন লজ্জাহীনা তুই রাবিয়া!

বেহবী চলে যাবার পর বৃদ্ধ কাকা বাড়ির কাজে ওর কাছে এলেন। রাবিয়া তাকে বলল, "চাচা-জান! আমি আপনার পরামর্শ মেনেছি…আমি বিয়ে করছি।"

"বিয়ে? কাকে?"

"উস্মানকে—আগে যে পেরেগ্রিণী ছিল। ধর্ম বদলে আমাকে বিয়ে করছে," "হায় আল্লা, ক্ষমা কর! সে তো ধর্মকে সিনেমার টিকিট মনে করেছে, টিকিট কাটো আর তামাশা দেখ।"

বিলাস নামে এক যুবক রাবিয়াকে বিয়ে করবে, এই আশায় দিন কাটাচ্ছিল। সে এই ব্যাপারটা শুনে ঈর্ষায় রাবিয়াকে শুনিয়ে শুনিয়ে সবাইকে বলতে লাগল, "যতক্ষণ রাবিয়ার যৌবন আছে ততক্ষণ তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখবে। পরে না সে স্বামী থাকবে, না থাকবে মুসলমান।"

এদিকে উস্মান (পেরেগ্রিণী) ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত হয়ে রাবিয়াকে বিয়ে করতে এসে বেহবীর কাছে শুনল, "বিয়ের আগে রাবিয়ার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না, রাবিয়াও তোমার ফটো পর্যন্ত ঘরে রাখতে পারবে না।

উস্মানের মনে হল—"আমি কি সত্যি সত্যিই খ্রীষ্টান থেকে মুসলিম হয়ে গেছি? ইসলাম আমার কাছে কোন ধর্ম নয়, একটা লেবেল মাত্র। একটা মানবিক সম্পর্কের সেতু ছাড়া কিছু নয়। যদিও সবার চোখে আমি মুসলিম, তবু আমার নিজের জীবন নিজের ভাবনা চিন্তা তো আসলে আমার নিজস্বই থাকবে।"

অনুবাদ—অনিন্দ্য সৌরভ

শতদ্রু মজুমদারের এখন অতীত

'হ্যাঁ হ্যাঁ ওই বাড়িটাই।' দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একজন বলল। দরজাটা অল্প খোলা ছিল। তবু তারা কড়া নাড়ল। উঁকি মেরে দেখল।

হঠাৎ একজন বলে উঠল, 'ঐ তো শোনা যাচ্ছে।' তবে যে বললি বাজায় না?'

কান পাতল বাকি ক'জন। সবাই চুপ।

ভেতর থেকে বেহালার সুর ভেসে আসছিল।

'সুবোধ বাবু' গলা ছেড়ে ডাকল।

আবার ভেতরের দিকে চোখ। কে যেন এগিয়ে আসছে। 'ঐ তো কে আসছে—'

খোলা দরজার দুপাশে সবাই সরে দাঁড়াল।

একটা মেয়ে এসে জিগ্যেস করল, 'কাকে খুঁজছেন?'

'সুবোধ বাবু আছেন?'

'হ্যাঁ—'

'একটু দেখা হবে?'

'আপনারা কোত্থেকে আসছেন?'

'অনন্তপুর।'

একটু ভেবে বলল, 'আসুন।'

মেয়েটাকে অনুসরণ করে সকলে ভেতরে ঢুকল।

পুরানো আমলের বাড়ি। সামনে ফাঁকা জায়গা। কটা গাছপালা ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ। চারদিক নিস্তব্ধ। গা-ছমছমে পরিবেশ।

লম্বা দালান পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এল।

সিঁড়িটা অন্ধকার। সরু। একজন আর একজনের কাঁধে হাত রাখল।

চাপা গলায় পেছনের ছেলেটা বলল, 'ওঃ শিল্পীর কী অবস্থা—'

সামনের জন, 'আস্তে—'

'আসুন—'

একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েটা বলল।

ঘরে ঢুকতেই সুবোধ বাবুর মুখোমুখি।

ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছেন। ওদের দেখেই একটু নড়ে-চড়ে বসলেন। গায়ে একটা পাতলা চাদর এলোমেলো। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। অবিন্যস্ত রুক্ষ চুল।

'বাবা এঁরা তোমার কাছে এসেছেন—'

মেয়েটা বেরিয়ে গেল, বাবার কোন মন্তব্য শোনার অপেক্ষা না করেই।

আলাপ-পরিচয় শেষ হতেই একজন বলল, আগামী ৩রা মার্চ আমাদের ক্লাবের সমাবর্তন উৎসবে আপনাকে সম্বর্ধনা জানাতে চাই।'

'আমাকে?' একটু অবাক গলায় তিনি বললেন।

হাসলেন অল্প। বোঝা গেল, কষ্টের হাসি ভাল দেখালো না।

'আপনি একজন প্রবীণ শিল্পী', অন্য একজনের কথা শেষ হবার আগেই তিনি বলে উঠলেন, 'প্রবীণ বলেই কি?' একটু রুক্ষ শোনালো।

'না তা ঠিক নয়। দীর্ঘকাল ধরে আপনি গান বাজনার সংগে যুক্ত ছিলেন—আমাদের মনে হয়েছে স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে আপনিই যোগ্য ব্যক্তি।'

মুখস্থ করা পাটের মত এক নিঃশ্বাসে বলে, ছেলেটা উত্তরের অপেক্ষায় থামল।

সুবোধ বাবু জানতে চাইলেন, ক্লাবটা কিসের?'

'নাটকের।'

'তাহলে একজন অভিনেতাকে দিলেই ভাল হত না? শশধর বাবুর নাম শুনেছো?'

'শশধর চৌধুরী?'

'হ্যাঁ। উনি শিশির ভাদুড়ীর সংগে অভিনয় করেছেন। অভিনয় ভালবাসেন মন-প্রাণ দিয়ে।

চটপট বলে দিল একজন, 'আপনিও তো সংগীত ভালবাসেন—'

'বাসতাম। গান বাজনার সংগে আমার সম্পর্ক এখন খুব ক্ষীণ। যেটুকু বাজাই, ঐ মেয়ের জন্যে।'

'আপনার মেয়েও বেহালা বাজায় নাকি?'

'না ও গান গায়। ওর হুকুম, চুপচাপ বসে থাকা চলবে না—শিল্পীরা চুপচাপ বসে থাকলে কষ্ট পায়।'

'ঠিকিই বলেছেন।'

'হ্যাঁ মেয়ে তো, বাবার কষ্ট একটু বোঝে। ছোটি-বেলা থেকেই ছড় টানতে দেখে আসছে। থাক এসব পারিবারিক কথা—'

এতক্ষণ নীরবে বসে-থাকা একটা ছেলে বলল, 'আপনার নামটাই প্রস্তাবে উঠেছে। আমরা আপনাকেই সংবর্ধনা দিতে চাই।'

'জোর করে?'

'আপনি যদি বলেন, তাই।'

আবার হাসতে চাইলেন।

'কিন্তু আমার শরীরের যা অবস্থা, আমি কি যেতে পারবো?'

'সে দায়িত্ব আমাদের।'

মেয়েটা চা নিয়ে ঢুকল।

সুবোধ বাবু বললেন 'নাও চা খাও—'

ওরা পরস্পর হাত বাড়ালো।

আবার কে বলল, 'আপনি তাহলে রাজী তো?'

বেরোতে গিয়ে দরজার কাছে মেয়েটার পা থেমে গেল।

'কী আর বলি—'

মেয়েটা সরে গেল এবার।

চা-এ চুমুক দিয়ে সুবোধ বাবু বললেন, 'বেশির ভাগ শিল্পীই খ্যাতির কাঙাল। এক সময় আমিও ছিলাম। এখন আর নয়।'

অন্যমনস্কে কে বলল, 'কেন?'

'কাউকে ঠিকমতো শোনাতেই পারলাম না। আগে তবু ক্লাসিকের রেওয়াজ ছিল—'

'আমাদের ইচ্ছে আছে একটা ক্লাসিক ফাংশন করবার।'

'খবরদার নয়। ওসবের কদর আর নেই।'

কোণের দিকে বসে-থাকা একটি ছেলে বলল, 'আপনার যদি কোনো অসুবিধা না থাকে, একটু বাজান—না'

'কী হবে—'

'একটু শুনতাম—খানিক আগে তো বাজাচ্ছিলেন।'

'ও কিছু না।'

দু'একজন নাছোড়বান্দা হলে, 'তাই—ই শুনবো।'

'বেশ, হবে। আসলে কী জানো, শিল্প নিয়ে থাকলে অনেক কিছু ভুলে থাকা যায়। বয়স হলে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা বড় বেশি মনে পড়ে। মনটা ভাবী হয়ে ওঠে— সে আরো কষ্টের—আমি সব কিছু ভুলে থাকতে চাই।

কথা বলতে গিয়ে গলা ভারী হয়ে আসছিল। ব্যক্তিগত দুঃখের কথাগুলো বলে ফেলছিলেন। হয়তো, এসব থামিয়ে দেবার জন্যেই, একজন বলে উঠল, 'আপনি একটু বাজাবেন বলেছিলেন।'

কিন্তু তিনি থামলেন না। অনর্গল বলে চললেন। পারিবারিক কথাবার্তা। দুঃখ-কষ্টের। শিল্পী জীবনের হতাশা আর ব্যর্থতার কথা।

পঙ্কজ মল্লিকের গানে বেহালা বাজিয়ে ছিলেন। রেডিওতে-ও প্রোগ্রাম করেছেন। সবই কিংবদন্তির পর্যায়। সুবোধ চট্টোপাধ্যায় নামে একজন বেহালা বাদক ছিল, এটাই খবর। গান-বাজনার আসরে এখন তাঁর স্থান নেই। পাড়ায় সখের থিয়েটারে নেপথ্যে বসে দু চারটে দৃশ্যে ছড় টেনেছিলেন। সেও একদা।

উত্তেজনার মুখে একজন বলে উঠল, 'তবু তো আপনি বাজান—

'এটা তো সময় কাটানোর জন্যে।'

'তা-ই বা কম কী ?'

'কিন্তু আমি তো সাধনা করেছিলাম আরো দূর এগোবার জন্যে—'

'যেটুকু আপনি দিতে পেরেছেন, তাতেই তো অনেকে আপনাকে ভোলেনি।'

'ভুললেও ক্ষতি খুব একটা ছিল না অনেক কিছুই তো আমরা ভুলে যাই।'

ছেলেরা একটু বেহালা শুনতে চেয়েছিল। তিনি বোধ হয় এড়িয়ে যাচ্ছেন। এটা অনুমান করা গেল। একজন তাই আবার বলল, 'আপনি একটু বাজাবেন বলেছিলেন।'

'ও, হ্যাঁ—'চাদরের খুট দিয়ে কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছলেন। পাশ থেকে বেহালাটা তুলে নিলেন। অলস হাতে।

ঘরের পাঁচ জোড়া চোখ তখন তাঁর দিকে অপলক। সবাই উৎকর্ণ।

দুলাল চট্টোপাধ্যায়ের

ভালবাসার রং ঘোলাটে

একটা নিঃশব্দ বেদনায় ভরে গেছে শিশিরের মনটা। এটা অনেকদিন আগেই ভরা উচিত ছিল। কিন্তু সেটা ভরেনি। শুধু শিশিরের নিজের জন্যেই ভরেনি। কারণ শিশির এক অন্য জগতের মানুষ। সে কাউকে ভুল বুঝতে শেখেনি। কেবল ভুল বুঝেছে নিজেকে। প্রতিটি পদে ভুল করেছে। জীবনের প্রতিটি পরিচিত প্রাণী তার কাছে ভুল হয়ে দেখা দিয়েছে। ভুলে-ভরা কাজ-কর্মকে সে সংশোধন করতে চেয়েছে। তাই একজনকে নির্বাচনও করেছে, সেই কাজে লাগাবে বলে। সে তার কাছে চিরনূতন এবং পুরাতন দুইই। না, ভুল হয়ে যাচ্ছে। সে শিশিরের চিরকালের আপনার, একেবারে আপনজন। সেই আপনজনকে নিয়েই এ গল্প।

শিশির নিজে খুবই হতভাগা। তাই অকালে মাকে খেয়ে ফেলেছে। বাবা বর্তমান। কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রীর সোহাগে সবসময় গদ গদ তার শরীর ও মন। সুতরাং শিশিরের কিছু দেখবার তার সময় হয় না। কিন্তু যত-দিন কলেজে পড়েছে শিশির, নিঃশব্দে তার বেতনটা ফেলে দিয়েছেন তিনি। তিনি বোধহয় ভেবেছেন এইটেই তার কর্তব্য। কিন্তু তবুও শিশির বি. এস. সি পাশ করেছে, নির্য্যাতিত হয়েই। পড়াশুনার কোন আঘাত সৃষ্টি করতে পারেনি তার মনটা। জগতে খুবই একা। বাবা দেখে না। মা ডাকে না, ভাইবোনেরা পাত্তা দেয় না। তাই জগতে নিঃসঙ্গ বিহঙ্গের মত ঘুরে না বেড়াতে পেরে একজন ছাত্রী যোগাড় করেছে। সে ছাত্রী পরবর্তীকালে তার বড় আপনার জন হিসাবে দেখা দিয়েছে। শিশির বার বার বলেছে—'দেখ নীতা, লাঞ্ছিত বঞ্চিতের তুমিই আছ। তোমার কাছ হতে যদি বড় রকমের আঘাত কিছু পাই কোনদিন, তাহলে সেদিন বোধহয় পৃথিবীতে একা করে দিয়ে আমায়...... ।

নীতা বলে—এ-সব কথা ছাড়া তুমি বোধহয় আর কোন কথা জান না, সত্যিই তুমি একটা কি বলবো ভেবে পাই না......Most Peculiar ।

—আর কিছু ?

—নিশ্চয়ই জোগাচ্ছে না তাই। না হলে কত বিশেষণ লাগিয়ে দিতুম ঠিক নেই ।

—যাও বিশেষণ লাগাবে পরে—সামনে ফাইনাল পড়গে ।

—নাহলে তোমার টাকাগুলোর কোন মূল্য থাকবে না, এই তো ?

—আমার টাকার কথা ছাড় ! তোমার ভবিষ্যত কি করে গড়বে ?

—আমার ভবিষ্যত তৈরী হয়ে গেছে ।

—একটি Perfect কুলবধূ ।

—সব সময়, যাও পড়গে ।

গোধূলি-মন/আষাঢ় '৯১ পনের

নীতাকে পাশ করতেব হবে বি. এটা। না হলে সত্যিই শিশিরের সমস্ত পয়সা জলে চলে যাবে। যখন শিশির নিজের বলে কাউকে পায়নি তখন পরকে নিজের করেই তার কাছে আনন্দ। কিন্তু কোথায় আনন্দ, যদি সে নীতাকে নিজের করে পায় তবেই না।

সে কথাতো নীতার বাড়ীতে বসে নীতার মায়ের কাছে শুনেই এসেছে শিশির।

—তুমি খুব করেছ শিশির। তোমার দেনা কি করে যে শোধ করবে৷ জানিনে। নীতার বাবার আশা তুমি পূর্ণ করতে চলেছ। যাই হোক তুমিই ওর আশা, তুমিই ওর ভরসা। নীতার সমস্ত ভার যদি তুমিই নাও শিশির তাহলে আমি পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ত হই! আমার সমস্ত উদ্বেগের অবসান হয়।

দরজার আড়াল হতে নীতা শুনছিল সবই। মনটায় এইমাত্র কে যেন এককোঁটা আতর ঢেলে দিয়ে গেল। সুরভিতে ভরে গেল চারিদিক। অনবরত এই প্রজাপতিটা তাকে ধাক্কা মেরে চলেছে। সেও মজা পেয়েছে বোধহয়। তুলে নিল ঠিক যেন লুফে নিল প্রজাপতিটাকে।

বার বার জিজ্ঞেস করলো তাকে—হ্যাঁরে তুই আমার জন্যে কোন খবর এনেছিস? সত্যি বলছিস, আমায় শিশিরদা জীবন-সঙ্গিনী করে নেবে? না অন্য কেউ তার জন্যে অপেক্ষা করছে বলনা। কি বললি আমি যদি চাই। আমার না চাওয়ার কি আছে? কেনই বা চাইব না? সে যে আমার জন্যে এত করছে। এমন ক'জন করে একটা পর মেয়ের জন্যে। এখন কি সম্পর্ক আমার তার সঙ্গে?

এ নিয়ে কত কথা হয়ে যাচ্ছে শিশিরের বাড়ীতে। শিশির কিনা এত বড় বাজে হয়ে গেছে। বাজে মেয়েটার সঙ্গে মিশছে। তার মা তাকে নাকি মন্ত্রপুত করেছে। শিশির অবশ্য একথা জানতো। অনেকেই অনেক কথা বলবে। তবুও এইটেই তার সন্তুষ্টি। দুনিয়ায় একা হয়ে মানুষ কতদিন বেঁচে থাকতে পারে? একটা দিন তার কাছে অনেকগুলি দিন বলে মনে হয়। তাই একাকীত্বকে বিসর্জন দিতেই তার এই উদ্যোগ। কারও কথা সে কানে নেয় না। নীতা বা ওর মায়ের সম্পর্কে কেউ কিছু বললে সে যেন শুনেও শোনে না। সে জানে বাড়ীতে অনেক কথা হবে বা হচ্ছে। তাই বাড়ীর মুখাপেক্ষী না হয়ে সে একটা চাকরীও নিয়েছে জাহাজ কোম্পানীতে। অত বড়লোকের ছেলে, সে কিনা বাবার ব্যবসা না দেখে চাকরী করছে। এটাতে সে ভাল বুঝলেও তার বাড়ী ভাল বোঝেনি। তাই বাবা একদিন যখন ডেকে বলেছিলেন · এই মাইনেটা যদি তোমায় আমিই দিই?

উত্তরে সে বলেছিল —থাকবোনা আপনার কাছে, সেইজন্যেই তো চলে যাওয়া। বাবা একটি কথাও বলেননি। এমনই সে জড়িয়ে পড়েছিল নীতার পরিবারের সঙ্গে।

কেন সেইদিনও তো মীনাক্ষী বৌদি মানে তার সাহেবের স্ত্রী যখন বললো —'আচ্ছা শিশির তুমি বিয়ে করছো না কেন?

— করবো।

—আমি জানি তুমি নীতাকে বিয়ে করবে। কিন্তু করছো না কেন?

—সে বি. এ-টা পাশ করুক। একটা চাকরী—

—তার আবার চাকরী কি দরকার? সবই তো তোমার উপর, সে চাকরী করে করাবে কি?

· তাহলেও! তার চাকরীর ইচ্ছা আছে বৌদি। তাছাড়া পাশটা।

—সেতো Result পেয়েই যাচ্ছে শিগগীর।

সত্যিই পেয়ে গিয়েছিল খবর। নীতা পাশ করেছে। সে খুসীতে মীনাক্ষী বৌদি তার কাছে মিষ্টিও

খেয়েছে জবরদস্তি। সঙ্গে সঙ্গে একটা নীল খামও ধরিয়ে দিয়েছে শিশিরের হাতে।

শিশির খুব মন দিয়ে পড়ছে খামের ভেতরের লেখাটা। মীনাক্ষী বৌদি জিজ্ঞেস করছেন কি লিখেছে বলনা?

—লিখেছে ও নাকি রাঁচীতে একটা বড় কোম্পানীতে Interview পেয়েছে। যাবার খরচ হিসাবে কিছু টাকা চেয়েছে।

—দিওনা, বলে দাও রাঁচী ওকে যেতে হবেনা। তার চাকরীর কোন প্রয়োজন নেই।

—সে কি শুনবে?

—নিশ্চয়ই শুনবে। কৃতজ্ঞতা নেই?

—লিখেছিল শিশির। জবাব আসেনি কিছু।

শিশির এখন একা। নিতান্ত একা। কোনদিক হতে কোন খরচ আসে না। কেউ প্রয়োজনও রাখে না একটু খবর নেবার। তাই মীনাক্ষী বৌদির অনুরোধে গত কয়েকদিন আগে একটা চিঠি লিখেছিল সে। লিখেছে নীতাকেই। তার কর্তব্য চিঠি দেওয়া। এতদিন কর্তব্য করে এসেছে। আজও করছে। ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে শিশির। সিগারেটের প্যাকেটটা কখন শেষ হয়ে গেছে মনে নেই। চেয়ারের হাতলে পড়ে ঘুমিয়ে গেছে সে।

—একি দেখলো শিশির। নীতা একজন অবাঙালী ছেলের হাত ধরে হাসতে হাসতে তার পাশ দিয়ে চলে গেল।

—নীতা, একটা কথা শোন এক মিনিট।

ঘুম ভেঙে গেল শিশিরের। চাকর লেটার বাক্সটা খুলে একটা চিঠি তার টেবিলে রেখে গেছে। খুললো শিশির। তাতে শুধু লেখা আছে,—আমি এখানে সরোজ প্যাটেল নামে আমার কোম্পানীর এক পার্টনারকে বিয়ে করেছি। আমায় ভুলে যাও।

চীৎকার করে উঠলো শিশির—হ্যাঁ ভুলে যাব, নিশ্চয় ভুলে যাব। তুমি আমার কে?

সামনে মীনাক্ষী বৌদি দাঁড়িয়ে। তার চোখেও জল। মুখে অনুরোধ—ভুলে যাও শিশির—তুমি ওকে ভুলে যাও। শত সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়লো শিশিরের বুকে। শুধু রেখে গেল নীতার স্মৃতির ফেনাটুকু।

— ——

আলোচনা ঃ কয়েকটি পত্র-পত্রিকা

আমাদের কার্যালয়ে প্রতিদিনই এসে জড়ো হচ্ছে বিভিন্ন জেলার, অন্য প্রদেশের এবং বিদেশের বাংলা পত্র-পত্রিকা তারই সামান্য কিছু অংশ নিয়ে এবারের আলোচনা।

O আলোচনার প্রথমেই রাখছি সুদূর সুইডেন থেকে প্রকাশিত গজেন ঘোষ সম্পাদিত 'উত্তর-প্রবাসী'। ১৫ই জুন সংখ্যাটি সদ্য আমাদের হাতে এসেছে। ইতিপূর্বে প্রকাশিত সব সংখ্যা দেখার সুযোগ না হলেও, অনেকগুলি সংখ্যা কোলকাতায় সন্দীপ দত্তের লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরীতে দেখার সুযোগ হয়েছে। এ সংখ্যার সম্পাদনা অকুণ্ঠ সাধুবাদ পাবার যোগ্য। দু'বাংলার পত্র-পত্রিকা থেকে বেশ কিছু গল্প-কবিতা বাছাই করে ছাপা হয়েছে। রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যিকদের ছবিসহ একটি সংক্ষিপ্ত ইংরাজী

আলোচনা করেছেন অধ্যাপক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। মৃদুল দাশগুপ্তের শামসুর রাহমানকে নিয়ে আলোচনাটিও একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 'গোধূলি-মন' থেকে এ সংখ্যার তেবটি কবিতা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। কৃষ্ণা বসু, প্রবালকুমার বসু, দ্বিজেন আচার্য্য, অরুণকুমার চক্রবর্ত্তী, অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের কবিতা। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে এ সংখ্যার প্রচ্ছদ। সম্পাদক গজেনবাবু পৃথিবীর সমস্ত বাঙালী লেখকদের কাছে লেখা পাঠাবার আমন্ত্রণ করেছেন। লেখা পাঠাবার ঠিকানা: UTTAR PROBASHI, Box-2061, S-44502 SURTE-2, SWEDEN।

O তরুণ সাংবাদিক, কবি, ছড়াকার হিসাবে সমীরণ মুখোপাধ্যায়ের নাম গোধূলি-মন-এর পাঠকদের কাছে খুবই পরিচিত। সম্প্রতি 'জনজীবন' নামক একটি পত্রিকার সম্পাদনার সূত্রে সমীরণ মুখোপাধ্যায় আবার সবার দৃষ্টি কেড়েছেন। প্রচ্ছদে ছাপা দু'টি পাশাপাশি ছবি—একদিকে খাবার টেবিলে পাত্র সাজিয়ে কুকুরের জন্মদিন পালনের আয়োজন অন্যদিকে অর্ধনগ্ন থালা-হাতে মানুষের ভীড় লঙ্গরখানায়। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়ে স্পষ্ট ভাষায় সমীরণ উল্লেখ করেছেন—অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁদের লেখনী গর্জে উঠবে। আমরাও এই নবজাতক পত্রিকার দীর্ঘজীবন কামনা করি। পত্রিকাটিতে চাষবাস, খেলাধুলা, জ্যোতিষচর্চ্চা, সংস্কৃতি সংবাদ ইত্যাদি সবকিছু বিভাগই আছে।

O শুধুমাত্র প্রীতি ও বন্ধুত্বের বিনিময়ে সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে হাজার খানেক পত্র-পত্রিকার মধ্যে যোগাযোগ রচনার সেতু বেঁধে চলেছেন তরুণ কবি ও সৈনিকের ডায়েরীর সম্পাদক বন্ধুবর অভিজিৎ ঘোষ। সম্প্রতি একাদশ বর্ষের প্রথম-দ্বিতীয় যুগ্ম সংখ্যাটি আমাদের দপ্তরে এসেছে। এ সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য তিনটি চিঠি লিখেছেন চিত্রশিল্পী শ্যামল সেন, কবি নির্মল বসাক এবং কবি অশোক চট্টোপাধ্যায় (হুগলী)। কবিতা লিখেছেন সামসুল হক্, অলকেন্দুশেখর পত্রী, রথীন সেনগুপ্ত, প্রদীপ রায়চৌধুরী, অভিজিৎ ঘোষ প্রমুখ। এ সংখ্যার প্রচ্ছদ নীরোদ মজুমদারের আঁকা।

O মাল-মশলায় উত্তরোত্তর ধনী হচ্ছে হুগলী জেলার 'বর্তমান'। এ সংখ্যায় দেশ-বিদেশে চলতি কুসংস্কার নিয়ে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছেন অমিয় ভট্টাচার্য্য। চারজন সাম্প্রতিক কবির (রবীন সুর, কৃষ্ণা বসু, শীতল চৌধুরী ও সনৎ মান্না) কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আলোচনামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন উশীনর চট্টোপাধ্যায়। চার কবির চারটি কবিতাও সংকলিত হয়েছে। ছটি গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গৌর বৈরাগীর 'কথার মানে', সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'কাফ' ও বিশ্বজিৎ বাগচীর 'যুধিষ্ঠিরের কুকুর'। অরুণকুমার চক্রবর্তীর বইমেলা উপলক্ষ্যে লেখা কবিতা 'বইমেলাকে যাব-স নাই' ছাপা হয়েছে প্রথম প্রচ্ছদে। অমিত গুপ্ত, পার্থ চক্রবর্তী, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অমল দাস, ভক্তিব্রত চক্রবর্তী, দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় ও অজিত ভড় প্রমুখ বাইশজন কবির কবিতা রয়েছে এ সংখ্যায়।

সংবাদ

● তথ্যমন্ত্রী সমীপে হুগলী জেলা পত্র-পত্রিকা সমিতি

বিগত ৬ই জুলাই হুগলী জেলা পত্র পত্রিকা সমিতির সম্পাদক কমলচন্দ্র ভড় মহাকরণে তথ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রভাস ফাদিকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর হাতে কয়েকটি দাবী সম্বলিত এক স্মারক-লিপি প্রদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় প্রায় বৎসরাধিক-কাল আগে কার্যোপলক্ষ্যে শ্রী ফাদিকার হুগলী জেলা তথ্য দপ্তরে এলে সেই সময় তাঁকে একটি স্মারক-লিপি দেওয়া হয়। তিনি সেই সময় দাবীগুলি বিবেচনার আশ্বাস দেন। ৬ই জুলাই মহাকরণে সম্পাদক সমিতির দাবীগুলির মধ্যে—জেলাস্তরে জেলার সংবাদপত্র, সম্পাদক ও সাংবাদিকদের প্রেস এ্যাক্রিডিটেশন কার্ড দেওয়া, স্বল্পসঞ্চয় বিভাগের বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে জেলা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ নেওয়া, ছোট সংবাদপত্রে দ্রুত সংবাদ প্রেরণের জন্য নিউজব্যুরোকে শক্তিশালী করা এবং জেলার উন্নয়নমূলক কাজকর্ম জেলার সংবাদপত্রের সাংবাদিক-দের সরেজমিনে দেখানোর জন্য জেলা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ নেওয়া ইত্যাদি দাবীগুলি পূরণের আশ্বাস দেন।

● সাহিত্য ভারতীর দশম বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান

বিগত ১৭ই জুন ১৯৮৪ রবিবার বিকেল পাঁচটা থেকে কলেজ স্কোয়ারের স্টুডেন্ট হলে বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক-প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হল সাহিত্য ভারতী পত্রিকার দশম বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা বিগত দশ বছরের নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের সেবা করার জন্য সাহিত্য ভারতীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। 'সাহিত্য ভারতী' সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে জ্যোৎরঞ্জন মজুমদার সকলকে ধন্যবাদ জানান।

● বন্যাত্রাণে আই, এম, এ ভদ্রেশ্বর ও চন্দননগর রোটারী ক্লাব

সম্প্রতি বন্যাবিধ্বস্ত হুগলী জেলার হারীট গ্রাম-পঞ্চায়েত অধীনস্থ কয়েকটি গ্রামে চিকিৎসা করার জন্য আই, এম, এ ভদ্রেশ্বর শাখা ও চন্দননগর রোটারী ক্লাব এক উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ওষুধ-পত্র ও ইনজেকশন-সহ আই, এম, এ ভদ্রেশ্বর শাখার চার চিকিৎসক ডাঃ সমীরকুমার দত্ত, ডাঃ চণ্ডী সরকার, ডাঃ বলাই দাস ও ডাঃ বিজন খ শ্রীমানী নৌকাযোগে বিভিন্ন বন্যা-বিধ্বস্ত গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা করেন। আই, এম, এ ভদ্রেশ্বর শাখা এবং চন্দননগর রোটারী ক্লাবের যুগ্ম উদ্যোগে ইতিপূর্বে খুবই স্বল্প সময়ের মধ্যে সমাজসেবার বেশ কিছু উদ্যোগ সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করেছে।

● পরলোকে প্রীতি রঞ্জন সেনগুপ্ত

বিগত ৭ই জুন ২-১৫ মিনিটে চন্দননগরের ইউনাইটেড নার্সিং হোমে ৫৮ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন আমাদের প্রিয় প্রীতি রঞ্জন সেনগুপ্ত। গোন্দলপাড়া ডাকঘরের প্রধান থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে 'গোধূলি' পত্রিকাগোষ্ঠির ঘনিষ্ঠতা গাঢ় হয়। গোধূলি গোষ্ঠির সমস্ত আড্ডাতেই সেই সময় তাঁর সরব উপস্থিতি আজও আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। তাঁর অনেক ছোট গল্প 'গোধূলি'-তে প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যুকালে তিনি তিন কন্যাকে রেখে গেছেন।

MEMBER { All India Small & Medium News Paper Association, Delhi.
Little Magazine Editors Association, Calcutta
Hooghly Dist. Patra Patrika Somity, Hooghly.

GODHULI-MONE N. P. Regd. No. RN. 27214/75 July '84 (আষাঢ় ১৩৯১)
Vol. 26, No. 7 Postal Regd. No. Hys-14 Price—Rs. 1·50 only

— গৌরবময় সাত বছর —

সাম্প্রদায়িকতাবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিভেদপন্থীদের স্থান নেই পশ্চিমবাংলায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনেক সংগ্রামের আগুনে পোড় খাওয়া পশ্চিমবাংলার মেহনতী মানুষেরই সৃষ্টি বামফ্রন্ট সরকার।

বামফ্রন্ট সরকার কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র, বঞ্চিত ও অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের স্বার্থে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে কাজ করে চলেছে। গণতন্ত্রের সুরক্ষা ও সম্প্রসারণে এই সরকারের প্রয়াস সর্বদা অবিচল আছে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের মানুষ যেভাবে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন তা সারা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ এবং শিক্ষা-সংস্কৃতিগত বিষয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী প্রবর্তনের চেষ্টা সচেতন মানুষের কাছে সপ্রশংস স্বীকৃতি পেয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার গৃহীত অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থাগুলির সুফল জনগণের কাছে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত, দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতিতে বামফ্রন্ট সরকারের প্রচেষ্টা অভিনন্দিত হয়েছে। শিল্প বিরোধের ক্ষেত্রে সরকারী ভূমিকা সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে উপকারী হয়েছে এবং রাজ্যে শিল্পে মোটামুটি-ভাবে শান্তি বিরাজ করছে। শ্রমিকশ্রেণী তাঁদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে আরও মজবুত করতে পেরেছেন। নাগরিক জীবনের সুখ সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির ও সি এম ডি. এর মতো সংস্থার মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ, পরিবহন ও জনস্বাস্থ্যের মত ক্ষেত্রে অসুবিধাগুলির মোকাবিলায় বামফ্রন্ট সজাগ রয়েছে।

পশ্চিমবাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনা এখন অনেক উন্নত হয়েছে এবং বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁরা আজ এগিয়ে যেতে সংকল্পবদ্ধ। জনগণের এই অগ্রগতিকে জোরদার করতে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পশ্চিমবাংলা এগিয়ে চলেছে।

॥ **পশ্চিমবঙ্গ সরকার** ॥

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পপুলার প্রিন্টার্স, বারাসত, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও নতুনপাড়া, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

হুগলী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি-মন

২৫ বর্ষ / ৮ম সংখ্যা

শ্রাবণ / ১৩৯১

প্রতি সংখ্যা দেড় টাকা

বার্ষিক (সডাক) পনের টাকা

সম্পাদকীয়

যেহেতু এটি মহিলা সংখ্যা এবং আমি মহিলা এবং সম্পাদক সহধর্মিনী— তাই আমার উপরেই ভার পড়েছে এ সংখ্যা সম্পাদনার। ছোটদের কিছু কিছু কাগজে গল্প লিখেছি কিছু, বড়দের কাগজে কবিতা। কিন্তু সম্পাদনা এই প্রথম। গোধূলি-মন গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে প্রবীণা বেশ কয়েকজন কবি/সাহিত্যিকাকে এই সংখ্যার লেখার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কেউ কেউ লেখা দিয়েছেন, কেউ জবাব দেবার প্রয়োজন পর্য্যন্ত বোধ করেননি।

যাহোক আমাদের ৩৭-তম স্বাধীনতা দিবসের পুণ্যলগ্নে প্রবীণা-নবীনা কিছু মহিলা কবি সাহিত্যিকার লেখায় রেখায় সাজিয়ে হাজির করলাম—মহিলা সংখ্যা। এত অল্প সময়ের মধ্যে সর্বাঙ্গসুন্দর একটি সংখ্[illegible] [illegible]কাশ করা সম্ভব নয় কোনমতেই। আমরাও এ অন্যায় দ[illegible] [illegible]করি না। প্রিয় পাঠক-পাঠিকা একই মলাটের মধ্যে বিভিন্ন [illegible]সে[illegible] বিভিন্ন জাতি বর্ণ ও ধর্মের মহিলাদের ও [illegible] চিন্তাধারা ভাব [illegible] ধরে রাখার প্রয়াস কি উপেক্ষনীয় ?

হা[illegible]

: সম্পাদিকা :

দীপা চট্টোপাধ্যায়

রীণা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

○ ব্যক্তিগত জীবনে গোধূলি-মন সম্পাদক ও কবি অশোক চট্টোপাধ্যায়ের জীবনসঙ্গিনী রীণা চট্টোপাধ্যায় সাংসারিক ব্যস্ততার মধ্যে লেখার জন্য সময় পান খুবই কম। এক সময় ছোটো[illegible]র পত্রিকায় গল্পও লিখেছেন। মূলতঃ [illegible] লিখে থাকেন। এ সংখ্যায় প্রকা[illegible]র কবিতাগুলির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে উষ্ণ নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী, আর কিছু স্বগত উচ্চারণ।

॥ ম্যালে সকাল ॥ (১)

এইমাত্র যে মেঘটি ভিজিয়ে গেল আমাদের
ম্যালের রাস্তায়
সে এখন জল হয়ে শুয়ে আছে
ঘোড়া, আর মানুষের পায়ে।
আমাদের শিশুকন্যা ঘোড়ার
উপরে বসে ছবি তোলে।
টাই আর হ্যাট পরা মধ্যবয়সী এক
ভয়ে ভয়ে জড়িয়ে আছে
নিজস্ব ঘোড়াটির গলা।
ঘোড়া মানে গতি
নাকি! ঘোড়া মানে ভয়।
আমার যে কি রকম হয়
বোঝাতে পারি না।

॥ লাভ কুঠিতে দুপুর ॥ (২)

কাঁচের সার্শিতে ঘেরা
বাঙলোটি
একদম ছবির মতোন।
বাড়িঘিরে
সবুজের গালিচা বিছানো
আমরা ক'জন গিয়ে
পা ছড়াই
প্রকৃতির কাছে।
পাহাড়কে ঘিরে ঘিরে
নেমে গেছে
[illegible]র রাস্তা
কিছু বাস, কিছু অন্য গাড়ি।
দেখতে দেখতে মেঘ
নীচে থেকে উঠে এসে
পর্দা টানলো

॥ দার্জিলিং বাজারে বিকেল (৩)

সারি সারি তিব্বতী রমণী
ছোট ছোট দোকান সাজিয়ে
বিকিকিনি সারে।
চীন দেশ থেকে আনা
মেয়েদের স্কার্ট, রঙিন পাথর
আর পাথরের মালা।
নতুন যা কিছু দেখি ছবির ড্রাগন,
লাল লাল আলু বখরা—মনে হয়,
নিয়ে যাই স্মৃতি।
দার্জিলিং চায়ের সুবাস
সেতো কিছু সঙ্গে নিতে হবে।

॥ হিমাচলী হোটেলে সন্ধ্যা ॥ (৪)

সারাদিন ঘুরে ঘুরে
সকলেই ক্লান্ত হয়ে আছি।
বিশ্রামের মেজাজ নিয়ে
এককোণে তাসের আসর,
অন্যদিকে গল্প আর গান।

সারাদিন চড়াই-উৎরাই ভেঙে
দলবদ্ধ বেড়ানোর
বাসি স্মৃতি নিয়ে সময় কাটাই।
কমলা লেবুর বন
অবচেতনের থেকে ডাকে
চলে আয়—এইখানে আয়।

ধীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা

○ ব্যক্তিগত জীবনে স্কুলের শিক্ষয়ত্রী ধীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবসর সময় কাটে সাহিত্য চর্চায়। গল্প, কবিতা, ফিচার সব কিছুই উঠে আসে তাঁর স্বচ্ছ লেখনী থেকে। পশ্চিমবঙ্গের ছোট বড় বহু পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যের সভা সমিতিতে নিয়মিত যোগদান করেন। এখনও গ্রন্থাকারে তার কোন রচনা প্রকাশিত হয়নি। হা[illegible]মোহরের রেলওয়ে কোয়ার্টার্সে সুন্দর সাজানো তাঁর সংসারে কবি/সাহিত্যিক, সাংবাদিক/সম্পাদকদের উপস্থিতি লেগেই আছে।

মাজদিয়ার কবি-সম্মেলন

জুতসই একটা কবিতা লেখার
তোড়জোড় করছি।
কলকলিয়ে ঢুকে পড়ে তারা
রোদের লম্বা ফালি ছিলো
বারান্দায়।
মুছে যায় এক সময়।
[illegible]জদিয়ার কবি-সম্মেলন
শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত
যান নি।

গেদে-লোকালের ঘুমন্ত স্বপ্ন
চাকার তলায় পৃষ্ট হয়।
স্নেহলতাও কথা রাখেনি।

মফঃস্বলের ব্যবহার
চাঙ্গা করে তোলে
কেউকেটা মনে হয় নিজেকে-ই।
কেউ না যাওয়াতে-ই একচেটে
—অধিকার !!

নদীর সাথে কথা

কতকগুলো গোলমেলে
ব্যাপারের সঙ্গে
নিজেকে জড়িয়ে ফেলা
তল পায় না
নদী বয় নিজস্ব নিয়মে-ই।

আশি সাল অনেক নিল
শূন্যতায় ঘুরপাক খাওয়া
দীর্ঘশ্বাস ভারী হয়
ঈশ্বরের কাজে-ও অনিয়ম।
টুকরো টুকরো হয়ে যায় কাঁচ-মন
হাতের বাইরে চলে যায় ফলাফল
নিয়ত-ই চলা কেউ বসে নেই।
বুকের ভেতর তোলপাড়।

বিদ্রূপ, বঞ্চনা, অবহেলা
ঠেলে ঠেলে বেরিয়ে আসা
নদীতে প্রতিবিম্ব তার
তিরতির কাঁপে
মাঝরাতে নদীর সাথে কথা।

তুমি দিলে

তুমি দিলে
একমাঠ রোদ ; সবুজের আকর্ষণ
নীলিমার নীল
কয়েকঘণ্টার সুখ
যা স্বপ্ন হয়।

একশো আট শিব

বর্ধমানেশ্বর এবং রাজবাটি
ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রশস্ত জি. টি, রোড
বাতাসে মিলিয়ে যায়
দীর্ঘশ্বাস— !
টের পাও— ?

এইভাবে-ই দিয়েছো অনেক
কোথায় যে লুকিয়ে রাখা !
পরিপূর্ণতা নাই বা থাকুক
তুমি থেকো— !

মাসে একটা বা দু'টো দিন
ভরে থা[illegible] এই মন
[illegible] । হয়ে যাও
কেন যাও— ?
ভুলে যাও
বয়েসে ধরেছে পাক !!

রাত

গভীর রাত
নিঃশব্দ চারদিক !
সারশি আঁচড়াচ্ছে বৃষ্টি
এক নাগাড়ে !

কেউ জেগে নেই
তুমি ভোর না দেখেই
ছাড়বে না ?
কতো কথাই ওঠে নামে
এক মনে-ই !

হতাশায় ম্লান বৃদ্ধ পিতা
ওরা বহাল তবিয়তে-ই আছে
স্ত্রী গেছেন কয়েক বছর
চারিদিকে-ই শূন্যতা !

কাদের মুখ চাও ?
হাসিমুখে অভ্যর্থনা—
করোনি কেউ-ই
অথচ হৃদয় ওই দিকেই !

বৃষ্টি ধুতে পারে সব ?
সারা যায় পবিত্র স্নান ?
তবে এসো ! সারশি খুলে
বৃষ্টিতে নামো
কেটে যাক রাত !!

শান্তা দেবী চিরকালের আধুনিকা

গৌরী আইয়ুব

রবীন্দ্রনাথ একবার জনৈকা আধুনিকাকে মৃদু তিরস্কার করে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে 'আধুনিকা ছিল না কো হেনকাল ছিল না।' জন্মসূত্রে যে পরিবেশ পেয়েছিলেন শান্তা দেবী সীতা দেবী তাতে ভাবনাচিন্তায় ও কাজে আধুনিকা না হওয়াই তাঁদের পক্ষে কঠিন ছিল। তার ওপর আবার জন্মসূত্রেই যে প্রতিভার উত্তরাধিকার তাঁদের মধ্যে বর্তেছিল তার জোরে রবীন্দ্রনাথের অবশিষ্ট উক্তিটিও তাঁরা অনায়াসেই দাবী করতে পারেন :

'কখনো দিয়েছে দেখা হেন প্রভাশালিনী।
শুধু একালিনী নয়, যারা চিরকালিনী।'

সীতা শান্তা নাম দুটি বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে শ্যামদেশীয় যমজের মতন দেখা দিয়েছিল এক নান্দনিক মাধুর্য নিয়ে। আর কিছু না হোক অন্তত হিন্দুস্থানী উপকথার দৌলতেই এই একজোড়া নাম আগামী শতাব্দীর শিশুদের দরবারেও পৌঁছে যাবে। অবশ্য ১৯১৮ সালে 'উদ্যানলতা' উপন্যাসের লেখিকা হিসাবে "সংযুক্তা দেবী" নামের আড়ালে এই দুই সহোদরা তাঁদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পর্যন্ত লুপ্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ভাবনায় ও আত্মপ্রকাশে এই দুজনের যতই কেন মাধুর্য থাকুক না, এঁরা মানুষ হিসেবে স্পষ্টতই [illegible] খুব ভিন্ন ধরণের ছিলেন, বিশিষ্ট চারিত্র্যমণ্ডি[illegible] পৃথক ব্যক্তি সত্তা। তাই এঁদের একজনের বিষয়ে কিছু বলতে গেলেই অপরের উল্লেখ যেমন অপরিহার্য তেমনি আবার দুজনের সম্বন্ধে এক যাত্রায় সব কথা বলে ফেলাও অসম্ভব। কিন্তু একটা কথা দুজনের সম্বন্ধেই সমান জোর দিয়ে বলা যায় যে এই লেখিকা দুটির বিস্মৃতপ্রায় রচনাগুলি যদি আমরা আর একবার ঝেড়ে বেছে তুলে লুপ্তির গ্রাস থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করি তবে বাংলা সাহিত্যের কিছু চিরন্তন সম্পদ রক্ষা পাবে।

আপাতত শান্তা দেবীর কিছু রচনার উল্লেখ করি যার মূল্য সমসাময়িক কালেই নিঃশেষ হয়ে যায়নি। সম্প্রতি প্রবাসীর কিছু কাটাকাটা প্রাচীন সংখ্যা[illegible] শান্তা দেবীর কয়েকটি প্রবন্ধ পড়লাম। প্রবন্ধের বিষ[illegible] বিতর্কিত এবং এই বিতর্কের আজো অবসান হয়নি। শান্তা দেবীর নিজের ভাষাই পেশ করি : "মুক্ত মন, জাগ্রত দৃষ্টি ও পূর্ণ অধিকারই মানুষকে নিজ প্রকৃত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর করিতে সহায়তা করে। মানব জাতির অর্দ্ধাংশেরই কি কেবল এই লক্ষ্য লাভ করা দরকার ?" মানবজাতির বঞ্চিত অপরার্দ্ধের পক্ষ থেকে এই প্রশ্ন করেছিলেন শান্তা দেবী ১৩৩০ সালে প্রবাসীতে লেখা একটি প্রবন্ধের উপসংহারে। না, বরং বলা উচিত এক জোড়া প্রবন্ধের, ঐ বৎসরেই পৌষ আর মাঘ মাসে প্রকাশিত। নাম : "নারী [illegible]"। এই নামকরণ বিষয়েও লেখিকার মন্তব্য [illegible]গা : "জগতের সকল রকম জ্ঞানলাভের, সকল নির্মল আনন্দ উপভোগের, সর্বদেশ ভ্রমণের ও প্রাপ্ত-

বয়স্ক হইলে, নিজ জীবনের সকল কাজে স্বমত প্রতিষ্ঠার অধিকার মানুষের থাকা উচিত। এই অধিকার আমাদের নাই বলিয়া, শুনিতে পাই, অনেকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্বদেশ উদ্ধারে লাগিয়া গিয়াছেন। সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তিদেরই যদি 'মানুষ' শব্দের সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে উত্তরে আমরা যাহা শুনিব, তাহাতে নারীকে মানুষ মনে না করিবার কোনো কারণ থাকে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ন্যায়শাস্ত্রে এই প্রকার লোকেদের জ্ঞান যথেষ্ট থাকিলেও নারীর শিক্ষা, নারীর স্বাধীনতা, নারীর বিবাহ ও বৈধব্যের কথা উঠিলেই ইহাদের অধিকাংশের বুদ্ধিভ্রংশ হইতে দেখা যায়। কাজেই 'নর সমস্যা' বলিয়া যদিও কোনো কথার সৃষ্টি হয় নাই, তবু 'নারী সমস্যা'র কথা শুনিতে শুনিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়।"

১৯২৩ সালেই ত্রিশ বৎসর বয়স্কা এই লেখিকা নাকি শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন নারী সমস্যার কথা শুনতে শুনতে। তার পরেও তাঁর জীবিতকালের আরো ৬১ বছর ধরে অবিশ্রান্ত চলেছে এই সমস্যার আলোচনা বিশ্বজুড়ে। ইতিমধ্যে সমস্যাটার চেহারাও হয়ত পালটেছে কিছুটা কিন্তু পৃথিবীর বিরাট অংশে এর একটা কাজ চলা গোছের সমাধান আজও দূর অস্ত। হয়ত চিরদিনই তাই থাকবে, অতএব এই বিতর্কেরও শেষ হবে না, যতই কেন তা শ্রান্তিকর ঠেকুক। আমরা যারা জন্মাবধি পুরুষদের তুল্য সমানাধিকার পেয়ে এসেছি এবং সমাজের অপেক্ষাকৃত সুবিধাভোগী অংশের যারা মানুষ সেই আমাদের কাছে নারী সমস্যা নিয়ে বাড়াবাড়ি সব সময়ে ভালো লাগে না সত্যিই। ব্যক্তিগতভাবে আমি অন্তত Feminist নই এবং আমার কাছে বঞ্চিত অসহায় মানুষদের তালিকায় সর্ব প্র[illegible] মহিলারা আসেন না। কিন্তু প্রতি তুলনায় শান্তাদেবীর সমসাময়িক কালের ছবিটা যখন তাঁর লেখার মারফৎ আর একবার মনে পড়ে যায় তখন স্বীকার না করে পারি না যে কলম হাতে করে সম্মুখ সমরে নামা ছাড়া তাঁদের উপায় ছিল না। আজ যখন গলিতে গলিতে বি-এ, এম-এ পাস করা মেয়েদের ছড়াছড়ি তখন কি সব সময়ে খেয়াল থাকে যে বেথুন ইস্কুলের ছাত্রী হওয়াটাই এককালে কী দুঃসাহসের ও বিদ্রূপের বিষয় ছিল! সেই কালটা খুব দূরবর্তী কাল নয়, আমাদেরই মায়েদের বাল্যকাল এবং বিদ্রূপ মাঝে মাঝে শালীনতা ভব্যতার সব সীমা ছাড়িয়ে যেত।

শান্তাদেবী নারী সমস্যার সমসাময়িক ও চিরন্তন দুটি দিকই বেশ শক্ত হাতে ধরেছিলেন। সমসাময়িক কালের যে আপত্তিগুলি বিতর্কে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল প্রথমে তার উল্লেখ করবো। বেথুন স্কুল কলেজে যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁরা যে তখন গৃহে ও সমাজে কী সর্বনাশা বিপ্লব ঘনিয়েছিলেন তাই নিয়ে সনাতন পন্থী প্রতিপক্ষ বেশ সরব হয়ে উঠেছিলেন। উত্তরে শান্তাদেবী লিখেছিলেন, "কিছুদিন হইল কয়েকটি মাসিক পত্রে প্রায় প্রতি মাসেই এইরূপ যুক্তিতর্কহীন ভ্রান্তিপ্রমাণপূর্ণ প্রবন্ধাদি দেখা যাইতেছে। লেখক-লেখিকার রচনা দেখিয়ে বোধহয়, আমাদের দেশে বুঝিবা অন্তত দু'চার লাখ মেয়েই হাতা বেড়ি ফেলিয়া শামলা মাথায় দিয়া উকিল ব্যারিস্টার জজ ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া বসিয়াছেন, কম করিয়া ১০/১৫ হাজার অন্তঃপুরিকা হয়ত বুট ও বনেট পরিয়া রাজপথে দিবারাত্রি টহল দিয়া বেড়াইতেছেন, দেশব্যাপী স্কুল কলেজে মেয়ে আর ধরে না, অফিসে আদালতে মহিলা কর্মচারীর ভিড়ে হাঁটা চলা দুষ্কর এবং ঘরে ঘরে [illegible] বঞ্চিত শিশুপাল দিবারাত্রি মুখব্যাদান করি[illegible]য়া কাঁদিয়া মরিতেছে। তাই সদয়হৃদয় লেখক-লেখিকারা দেশের এই ঘোর দুর্গতি নিবারণ করিবার জন্য দুই হাতে কলম লইয়া সব্যসাচী

হইয়া সমরে নামিয়াছেন। কিন্তু হায়রে বিড়ম্বনা! এই শিশুমাতৃক নিরক্ষর দেশের মুষ্টিমেয় বালিকার 'বোধোদয়' ও 'স্টেপ বাই স্টেপ'-এর বিরুদ্ধে এ বিরাট অভিযান কেন ?"......

'স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা, যৌবনবিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি কয়েকটি সমস্যা লইয়া এইসকল লেখক-লেখিকার আহার নিদ্রা ঘুচিয়া গিয়াছে।'

রক্ষণশীলদের সেই বিরাট অভিযান যে ব্যর্থ হয়েছে তাতো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আজ আমরা। ঐ বুট আর বনেটটুকু বাদ দিলে সনাতনীদের কাল্পনিক বিভিষিকার বাকিটা এই ষাট বছরেই বাস্তবে পরিণত হয়েছে, শুধু এই মহানগরে নয়, ছোট ছোট মফঃস্বল শহরেও। তাঁরা যে আশঙ্কা করেছিলেন 'এই চাকুরী সমস্যার দিনে শিক্ষিতা রমণীরা পুরুষের সহিত ভিড় করিয়া সমস্যা জটিলতর করিবেন' তাকে শান্তাদেবী তখন অযথা ভয় বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেল এই প্রজন্মকালের মধ্যেই ভয়টা সত্য হয়ে উঠলো —দেশবিভাগ তার একটা মস্তবড় কারণ যা তাঁরা কেউই তখন কল্পনা করতে পারেননি। সে যাইহোক, প্রতিপক্ষের ভয়কে বিদ্রূপ করে স্ত্রী স্বাধীনতার যে ভয়াবহ ছবি শান্তাদেবী এঁকেছিলেন দেখা গেল উভয় পক্ষকেই অপ্রস্তুত করে দিয়ে সেই বিভীষিকাই এখন বাস্তব হয়েছে কিন্তু যত বড় সর্বনাশের আশঙ্কা সনাতনীরা করেছিলেন ততবড় হয়নি দেশের, কিংবা সনাতনীরা দলে কমে গিয়ে আজ এমন কোণঠাসা হয়ে গিয়েছেন যে সেদিনের মতন সরবে ধিক্কার দেবার সাহসই আর তাঁদের নেই। এক দেশবিভাগেই স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা যৌবনেবিবা[illegible]ত্যাদি সম্বন্ধে যত বিরূপতা ছিল সব ভাসিয়ে নি[illegible]বটে কিন্তু 'নারীসমস্যা' একটা রয়েই গেছে। তার চেহারা বদল হয়েছে মাত্র।

নানা সামাজিক অর্থ-নৈতিক চাপে স্ত্রীশিক্ষা আজ একটি স্বীকৃত চাহিদা—সমাজের যে স্তরে খাওয়া পরার চাহিদা মেটে না সে স্তরে শিক্ষার চাহিদাও মেটে না ঠিকই তবে আধুনিক শিক্ষা মেয়েদের ক্ষতি করে একথা মনে মনে যাঁরা ভাবেন ভাবুন, খুব সংকীর্ণ অশিক্ষিত মানুষ ছাড়া কেউ মুখ ফুটে বলতে সাহস করেন না আর। স্ত্রী স্বাধীনতার কুফল নিয়ে এখনও মাঝে মধ্যে কথা ওঠে ঠিকই তবে চিরকাল স্বাধীনতা পেয়েও তার অপব্যবহার আর উচ্ছৃঙ্খলতার আকর্ষণ বহু পুরুষ মানুষ যদি এখনও সংবরণ করতে না পেরে থাকেন তবে অতি সম্প্রতি অর্জিত স্ত্রী স্বাধীনতার কোনো অপব্যবহার হবে না এটাই বা কি করে আশা করা যায়? স্ত্রী স্বাধীনতা বিষয়ে শান্তাদেবীর একটি মন্তব্য লক্ষ্য করুন: "একটা বিদেশী জাতি আমাদের জাতিকে স্বাধীনতা দিবে কি না দিবে ভাবিতে বসিলে আমাদের রাগ হয়; আমরা বলি, আমাদের স্বাধীনতা কি উহাদের লোহার সিন্দুকের মোহর যে কৃপা করিয়া উহারা না দিলে আমরা পাইব না। অথচ নিজেদের ঘরে বসিয়া আমরা সর্বদাই মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছি 'তাইত, স্ত্রীলোককে কি স্বাধীনতা দেওয়া উচিত? স্ত্রীলোক নিজেও ভাবিয়া পাইতেছেন না যে তাহার জীবন সম্বন্ধে তিনি নিজে ব্যবস্থা করিবেন কিনা।"

বাল্যবিবাহের সমস্যাটা অবশ্য জাতিভেদ অস্পৃশ্যতা ইত্যাদির মতোই আমাদের পিছিয়ে পড়া গ্রামীন সমাজের দেশজোড়া অশিক্ষা আর কুসংস্কারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, আলাদা করে ওটাকে উগড়ে ফেলা সহজ নয়। তবু শহরে মানুষের দেখাদেখি গ্রামের মা[illegible], অন্তত পশ্চিমবাংলায়, কন্যার বিবাহের বয়স [illegible]র চেয়ে অনেকটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। বাল্য-বিবাহ যত কমেছে বাল্যবিধবার সংখ্যাও ততই

কমেছে। বিদ্যাসাগরের কালেও এই সমস্যাটা প্রধানত উচ্চবর্ণেরই সমস্যা ছিল। নিম্নবর্ণে বিধবার বিবাহ সেকালেও অনেকটা ছিল, একালেও আছে। উচ্চবর্ণের মেয়েরা যেহেতু আজ অনেকেই পড়াশোনা করছে আগের মতন অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ বা বৈধব্য ঘটছে না তাই এই সমস্যাটা আর বিরাট সামাজিক আকার নিচ্ছে না, নেহাৎই ব্যক্তিগত সমস্যা হয়ে থাকছে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে। হিন্দুরমণীর জন্ম-জন্মান্তরের বিবাহবন্ধন আজ অবলীলায় আলিপুর কোর্টে জজসাহেবের এক রায়েই কেটে দেওয়া যাচ্ছে। তাই পুনর্বিবাহ, সে বিধবারই হোক বা ডিভোর্সিরই হোক, কিছু স্বল্পস্থায়ী মুখরোচক পরচর্চার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় না।

অথচ এই সমস্যাগুলিই তখন কী প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করত। খড়্গহস্ত রক্ষণশীলরা আধুনিক আধুনিকাদের প্রতি যে বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করতেন তার ঠিকমতন মোকাবেলা করার জন্য শান্তাদেবীর মতন আধুনিকাদেরই দরকার ছিলো। লেখিকার যুক্তি, তথ্য আর সুরুচিসম্পন্ন সরস উপহাস উদ্ধৃতিযোগ্য: "আধুনিক লেখক-লেখিকাদের কাহারও কাহারও ধারণা যে যতদিন হিন্দু নারীর অক্ষর পরিচয়, বিশেষ করিয়া ইংরেজি অক্ষর পরিচয়, না হয়, ততদিন পর্যন্ত তাঁহারা প্রত্যেকে একাধারে সতীলক্ষ্মী সীতাসাবিত্রী পদ্মিনী অহল্যাবাঈ লক্ষ্মীবাঈ হইয়া ঘরে ঘরে বিরাজ করেন; কিন্তু যে মুহূর্তে এ বি সি ডি-র সাক্ষাৎ পান, অমনই সকল গুণ গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়া 'সখের মেম সাহেব' হইয়া ওঠেন। আশ্চর্য, যে হিন্দু নারী কতশত রাবণ দুর্যোধনের প্রলোভন এড়াইয়া কর্তব্যপথে অবিচলিত হইয়া আছেন, কত ঝঞ্ঝা ঝড়েও 'প্রাতে অঙ্গণে গোবর ছড়া' দিতে বিরত হন না, যে হিন্দু নারী [illegible]ক অঞ্চল চাপা না দিয়া 'জাগাইয়া চেতন করিয়া দিতেছেন', যে হিন্দু নারী শত শত 'শয়তানের শয়তানী পদ্মিনীর মত পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিতেছেন', সে হিন্দু নারী 'অবরোধ প্রথা' 'বিবাহ বিবাহ' প্রভৃতি বাজে, চিন্তার' দিকে ভ্রূণাভরেও মন দেন নাই, সেই হিন্দু নারীই সামান্য দুইখানা বর্ণপরিচয় ও ইংরেজি প্রাইমারের ধাক্কায় সকল কর্তব্য ভুলিয়া কুপথের পঙ্কিলতায় গড়াইয়া পড়িতেছেন!! শুধু তাহাই নহে, মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় যাঁহারা শতশত রাবণ দুর্যোধন-মর্দিনা, দৈনিক পত্রের পৃষ্ঠায় দেখা যায় তাহাদেরই অনেকে গ্রামে গ্রামে কাপুরুষ ও পাষণ্ডের হাতে অপমানিতা ও লাঞ্ছিতা; মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় যে বঙ্গনারী সেবাপরিচর্যায় পুরুষের 'সকল জ্বালা যন্ত্রণা' জুড়াইয়া দিতেছেন, আদমসুমারির রিপোর্টে দেখা যায় তাহারাই প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া, কলেরা, ক্ষয়কাশ, বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতির নির্মম হাতে স্বামীপুত্রকে তুলিয়া দিয়া চক্ষের জলে ভাসিতেছেন। আদর্শ মাতা বঙ্গরমণীর ক্রোড় হইতে প্রতি বৎসর দুইটি নয়, দশটি নয়, ৫০, ৬০ লক্ষ দুগ্ধপোষ্য শিশু যমালয়ে যাইতেছে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দেই বাংলাদেশে পাঁচ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক ৫৯,৭৬,৫২৭টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। এত অধিক মৃত্যু কেবল মায়ের দোষেই হয় না; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, দেশে যথেষ্ট সুশিক্ষিতা ধাত্রী থাকিলে এবং মাতা ও তাঁহার সম্পর্কীয়া মহিলারা সূতিকাগার ও শিশুপালন সম্বন্ধে সুশিক্ষিতা হইলে অনেক শিশুর মৃত্যু নিবারণ করা যাইত।" ["মাসিক পত্রে দেখিতে পা[illegible] 'ভীরু পুরুষ নারীর অঞ্চলের শরণ লইলে, হিন্দু নারী তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া' তাহাকে জাগাইয়া চেতন করিয়া দিয়াছে! কিন্তু খেলার মাঠে ফিরিঙ্গির হাতে লাঞ্ছিত জাতভাইকে ফেলিয়া সহস্র [illegible] যখন ঊর্দ্ধশ্বাসে নারীর অঞ্চলের শরণ লইতে [illegible]দেন, তখন কয়জন নারী তাঁহাদের ফিরাইয়া দিয়াছেন জানিতে পারি কি? পথে একটা গুণ্ডার চোরার ভয়ে রাস্তার দুই ধারের পুরুষ যখন

দরজায় হুড়কা দিয়াছেন, তখন কয়জন নারী দ্বার খুলিয়া স্বামীপুত্রকে বিপন্নের উদ্ধারের কাজে পাঠাইয়াছেন, শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হয়। হিন্দু নারী নাকি 'কখনও অন্যায় ও ভণ্ডামি সহ্য করিতে পারে নাই', তাই আহারে বিহারে কথায় কাজে হাঁটিতে চলিতে পুরুষদের 'নিষ্ঠাবত্তার' আর অন্ত নাই।...... ধর্মপ্রাণ কত ধুরন্ধর যে কলিকাতার স্থান-বিশেষে নিশাচরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভুভারতের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন, তাহারই বা কে ঠিকানা রাখে? দেবী নাম দেয়া কত হিন্দু নারী যে শাশুড়ি, ননদ ও স্বামী প্রভৃতির প্রীতির আতিশয্যে আদালত ও যমালয়ের শরণ লইতেছেন, তাহাও প্রতিদিনের দৈনিক পত্রিকার ফাইল ঘাঁটিলেই দেখা যায়। আমাদের ঘরে ঘরে 'যেসব পদ্মিনীরা শয়তানের শয়তানী পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিতেন' বলিয়া মাসিক পত্রের লেখিকাদের কাছে শুনি, আজকাল খবরের কাগজে দেখি তাঁহারা পিতাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিবার আশায় কিংবা স্বামীকে চরিতার্থ করিবার সদুদ্দেশ্যে যখন তখন কেরোসিন গায়ে ঢালিয়া নিজেরাই পুড়িয়া মরিতেছেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ৩৫৫০টি রমণী বাংলাদেশে আত্মহত্যা করিয়াছে। 'অবরোধপ্রথা'-ও নাকি আমাদের মধ্যে নাই, তাহা 'পূর্বে মুসলমান নবাব বাদশার হারেমে ছিল।' 'অসূর্যম্পশ্যরূপা', 'অন্তঃপুরিকা' প্রভৃতি কথাগুলি তাহা হইলে আরবী কি ফারসী! তবে রেলপথে সঙ্গী পুরুষের মুখ না দেখিয়াই আহ্বান শুনিয়া প্রতারকের পিছনে গাড়ি ছাড়িয়া নামিয়া যায়, এরূপ স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় সত্য ঘটনা কোন দেশের? পুরুষ ডাক্তারের চি[illegible]র ভয়ে বা লেডি ডাক্তারের অভাবে ক্ষয়কাশ, সুতিকা ও নানা স্ত্রীরোগে ভুগিয়া অকালে মাতৃহীন অপোগণ্ড শিশুদের ফেলিয়া যমলোক যাত্রা করে কাহারা?......

'বাংলাদেশে নারীর প্রকৃত অবস্থা যাহা, তাহা আমাদের সকলেরই লজ্জার বিষয়। তাহার বর্ণনায় গৌরবও নাই, আনন্দও নাই। কিন্তু কল্পনার আবরণ দ্বারা তাহা লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা অধিকতর লজ্জা ও দুঃখের বিষয়।"

এমন চমৎকার তেজী লেখা যে, সরাসরি তার আস্বাদ আপনাদের দিতে না পারলে ভালো লাগত না। এ জাতীয় অসংখ্য রচনা প্রাচীন মাসিক পত্রের পাতা থেকে তুলে এনে সংকলন করা হবে কিনা জানি না, তাই কীটের পাকস্থলীতে চিরকালের মতন তা জীর্ণ হবার আগে আমাদের পাতে আরো কিছু তুলে আনি। আধুনিক শিক্ষাবস্থার সংক্ষিপ্ত সুন্দর একটি পরিকল্পনা পরিবেশন করার সময় সনাতনপন্থী শিক্ষাকে আঘাত করতে ছাড়েননি :...লেখকের মতে বেথুন কলেজের শিক্ষার পরিবর্তে মহাকালী পাঠশালার শিক্ষার প্রচলন ঘরে ঘরে হইলেই বাংলা স্বর্গরাজ্য হইয়া উঠিবে। মহাকালী পাঠশালার নিন্দা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, উহা যে প্রশংসার যোগ্য তাহা অবশ্যই উহাকে দেওয়া উচিত। কিন্তু মহাকালী পাঠশালার এমন সব ভক্ত থাকিতেও তাহা যে কেন ভুতলে স্বর্গ না আনিয়া অকালে স্বর্গযাত্রা করিতে বসিয়াছে, তাহা তাঁহারাই জানেন। লেখক একজন মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীর শিবপুজা, শাশুড়ি-ভক্তি ও অন্নপূর্ণাভক্তের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া বেথুন কলেজের শিক্ষিতাকে পাঠককে 'কল্পনা' করিয়া লইতে বলিয়াছেন। বাস্তবকে যে 'কল্পনার চক্ষে' দেখিয়া সমালোচনা করিতে হয় তাহা আমরা ইতিপূর্বে জানিতাম না। লেখকের কল্পিতা বধূ প্রথম তাঁহার [illegible] প্রবেশ করিলেন বুট ও বনেট পরিয়া, তাহার পর অশুচি হস্তে পুজার সামগ্রী ছুঁইয়া ও আরো অনেক অঘটন ঘটাইয়া শাশুড়িকে খানসামা

করিয়া লেখকের মস্তিষ্ক-রঙ্গমঞ্চের যবনিকাপাত করিলেন। শাশুড়িকে খানসামা করিতে যদিও কোন শিক্ষিতাকে দেখি নাই তবু ধরা যাক শাশুড়ি, পুত্র ও পুত্রবধুকে পরিবেশন করিয়া কোথাও খাওয়াইয়াছেন। হিন্দুনারী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পতিপুত্রকন্যাকে খাওয়ানোটা চিরকাল গৌরবের বস্তু মনে করেন, পথের কাঙালকেও রাঁধিয়া খাওয়ানো তাঁহার কাছে শ্লাঘার বিষয়। তবে বেচারা বধু এমন কি অপরাধ করিল যে, তাহাকে যত্ন করিয়া পরিবেশন করিয়া খাইতে দিলেই শাশুড়ির সম্ভ্রমের হানি হইবে? বেথুন কলেজের শত শত ছাত্রীকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বনেট কাহাকেও পরিতে দেখি নাই, বুট ও দুই চারিটা দুগ্ধপোষ্য বালিকা ছাড়া কাহারও পায়ে দেখি নাই।... বাংলাদেশই ভারতবর্ষের সবটা নয়, বাঙালি হিন্দুই একমাত্র হিন্দু বা নিষ্ঠাবত্তম হিন্দু নহেন। অন্য অনেক প্রদেশের হিন্দু মহিলাদিগকে চামড়ার জুতা পরিতে দেখিয়াছি। বাঙালি হিন্দু পুরুষেরা তো ঠনঠনে তালতলার চটির পরিবর্তে বুট পরেন। তাহাতে তো হিন্দুত্ব লোপ পায় না।...

"বেথুন কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে শতাধিককে স্বহস্তে রন্ধন করিতে দেখিয়াছি এবং একজনেরও হিষ্টিরিয়া আমি দেখি নাই। কিন্তু অগণিত নিরক্ষর স্ত্রী লোকেরও হিষ্টিরিয়া হয়।...বাজে কথার উত্তর না দিয়া স্ত্রী শিক্ষার সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা আছে।"

তাঁর এই অনেক কথা অল্প পরিসরের মধ্যেও এমন সুন্দর গুছিয়ে বলেছেন যে সর্বকালের স্ত্রীশিক্ষার জন্যই এর একটা স্থায়ীমূল্য আছে। আজও মেয়েদের Vocational guidance দেবার সময় এগুলি মনে [illegible] অত্যন্ত দরকার। রচনার এই অংশটাই অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত এবং এর একটা স্থায়ী মূল্য রয়েছে। আজকের দিনেও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাঠক্রম বা Curriculum স্থির করার সময় লেখিকার ব্যবহারিক পরামর্শগুলি কাজে লাগবে। কি ধরণের শিক্ষা মেয়েদের অত্যন্ত প্রয়োজন তার আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই সনাতনীদের একটি দাবী মেনে নিয়ে বলছেন, "এমন কি গৃহই স্ত্রীলোকের সমস্ত জীবনের একমাত্র কেন্দ্র যদি হয় তাহলে এই গৃহধর্ম পালন করিতে হইলে কি কি বিদ্যা জানা উচিত তাহা একবার ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখা যাক।"..."রমণীদের কাজ সংসার পরিচালনায় স্বামীকে সর্ব প্রকারে সাহায্য করা, সন্তানদের গড়িয়া তোলা ও জীবনযুদ্ধের উপযোগী করা, বৃদ্ধবৃদ্ধা পীড়িত আত্মীয়দের পরিচর্যা করা, তৎসঙ্গে দেশীয় শিল্পের প্রসার, অবসর মত কাব্যসাহিত্য চর্চা করা" ইত্যাদি। এই প্রত্যেকটি কাজের জন্যই যে বিজ্ঞান সম্মত প্রশিক্ষণ বা ট্রেনিং-এর প্রয়োজন সেই কথাটিই ধৈর্য ধরে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন লেখিকা।

মহিলাদের গার্হস্থ্য ভূমিকাকেই প্রধান স্থান দিয়ে এবং সেই ভূমিকাকে অহরহ কত চিন্তা, পরিশ্রম ও যত্ন দিয়ে পালন করতে হয় তার বিশদ বর্ণনা করে অবশেষে মৃদু কণ্ঠে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে "সংসার ধর্ম পালনের পর বহু স্ত্রীলোকেরই অবসর থাকে। এই অবসর কালটা নিজের ও পরিবার পরিজনের পক্ষে সুখকর ও আনন্দময় করিয়া তুলিবার জ্ঞান থাকা স্ত্রীলোকের দরকার। যে পরিবারে অর্থাভাব আছে সেখানে অবসর কালে অর্থকরী বিদ্যার চর্চাই বুদ্ধির কাজ।" তাছাড়া বেশ সাবধানেই একথাও বলেছেন যে "বিবাহের পূর্বে এবং সন্তানসন্ততি বড় হইয়া গেলে মেয়েরা যদি গৃহে [illegible] হিরে কোনো অর্থকরী বিদ্যার অনুসরণ করেন [illegible] শ ও সমাজ হিতকর কাজ করেন তাহাতে দেশের ক্ষতি অপেক্ষা লাভই ত বেশি হইবে।' গার্হস্থ্য পরিবেশে স্ব-নিযুক্ত অর্থকরী কাজ কি কি

করা যায়, ঘরের বাইরে কোন্ কোন্ কাজে পুরুষের সহকর্মী হয়ে তার ভার লাঘব করা যায় এবং শিক্ষকতা ও নার্সিং ছাড়াও একালে আরো কত অসংখ্য কাজের পক্ষে মেয়েরা বিশেষভাবে উপযুক্ত—এ সব কথাই লেখিকা ভেবেছেন, এসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং আগ্রহী নারী পুরুষকে পথ দেখিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিতে ভোলেননি যে গৃহে ও সমাজে কর্মবিভাগ, শ্রমবিভাগের প্রয়োজন অবশ্যই আছে তবু অধিকাংশ কাজই এমন যে তাকে পুরুষালি বা মেয়েলি বলে চিহ্নিত করে দেওয়া যায় না। মেয়েদের কোন্ কাজের অধিকার দেওয়া সঙ্গত হবে বা হবে না সে তর্কের উত্তরে এমন কথাও বলেছেন, 'মানুষের প্রতিভা ও বুদ্ধির মাপ অনুসারেই যদি তাহাকে অধিকার দিতে হয় তবে বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের চেয়ে নির্বোধ পুরুষের অধিকার কম হওয়া উচিত। এই মাপ অনুসারেও বহু পুরুষের অধিকার হরণ ও বহু নারীকে অধিকার দান করা চলে।'

শেষকালে এসেছে সেই বহু উচ্চারিত প্রসঙ্গ : আজ পর্যন্ত "নারী পুরুষের মত উচ্চদরের সৃজনী শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই এবং পারিবেনও না। অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান পুরুষদের প্রতিভার তুলনায় সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালিনী নারীদের প্রতিভা অতি ক্ষীণপ্রভ এবং সংখ্যায়ও এই সকল নারী ঐ জাতীয় পুরুষদের অপেক্ষা অনেক কম।" এই যুক্তি-শরে যেহেতু আজও মহিলারা ঘায়েল হয়ে থাকেন তাই এর জবাবে শান্তা দেবী যা যা বলেছেন সেগুলি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করা দরকার।

প্রথমতঃ "সমগ্র পুরুষ জাতি[illegible]য়া যদি বিচার করি, তাহা হইলে দেখিব, সাধারণ মানুষের তুলনায় জগতের সর্বদেশে ও সর্বকালেই অসাধারণ ও উচ্চদরের প্রতিভাবান মানুষের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।...অথচ মানুষের সৃষ্টিকাল হইতে পুরুষ শিক্ষার ও কর্মক্ষেত্রের সুযোগ পাইয়া আসিতেছেন। নারীরা সেরূপ এবং ততটা সুযোগ আগে তো পানই নাই, এখনও পাইতেছেন না।...সর্বাধিক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রতিভাবান ও অমরকীর্তিমান পুরুষের সংখ্যা যদি এতো কম হয়, তাহা হইলে সুযোগহীনা নারীর অমরকীর্তি না-থাকাটা লজ্জার দুঃখের বা বিস্ময়ের বিষয় হইত না। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও নারীর অমরকীর্তি আছে।"... "সুতরাং, একজন অহল্যাবাই, একজন ঝান্সীর রাণী কি একজন জোয়ান অব আর্ক অথবা একজন ম্যাডাম কুরী হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের উৎকর্ষ অস্বীকার করিবার কোনো কারণ ঘটে নাই।"

শান্তা দেবীর দ্বিতীয় উত্তর : "জগতে মুষ্টিমেয় মহামানব লইয়াই মানুষের জীবনচক্র চলে না। মহামানবগণ যে মহামনীষার কীর্তি যুগে যুগে অগ্নিশিখার মত এক একবার এক এক স্থানে জ্বালিয়া দিয়া যান, তাহাকে সাধারণ মানুষই তাহার ক্ষুদ্র প্রতিভার সাহায্যে নিত্য ব্যবহারের বস্তু করিয়া তুলেন।"..."নারীর যদি সৃজনী শক্তি নাই থাকে, তবু পুরুষের সৃষ্টিশক্তির প্রকাশে তো সে সাহায্য করিতে পারে। সুর শিক্ষার ফলে নারী যদি সুর সৃষ্টি করিতে না পারে, তবু কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে সুরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তো দেখাইতে পারে বিজ্ঞান—রাজ্যে কোনো নূতন আবিষ্কার যদি নারী নাই করিতে পারে তবু ফলিত—বিজ্ঞানের সাহায্যে জগৎ সংসারের বহু কার্যসিদ্ধি তো সে করিতে পারে।"

লেখিকার তৃতীয় উত্তর : 'সচরাচর একটি তর্ক শোনা যায়, যে, গৃহের বাহিরের কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের উপরে তো উঠতেই পারেন না, এমন কি সমকক্ষও হই[illegible]রেন না। রাজনীতিক্ষেত্রে, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, সর্বত্রই পুরুষ নারীর অনেক উপরে স্থান লাভ করিয়া আছে।"..."বহির্জগতের কোনো কর্ম-

ক্ষেত্রেই নারী পুরুষের সমান কৃতিত্ব দেখাইতে পারে না, ইহা বলা আজকালকার দিনে আর শোভা পায় না।" (এখানে জনান্তিকে বলা যায় যে গোল্ডা মায়ার ইন্দিরা গান্ধী ও মার্গারেট থ্যাচারের আবির্ভাবের পর পুরুষরা আর বোধহয় এক্ষেত্রে একাধিপত্যের দাবী করবেন না।)। যাইহোক শান্তাদেবী স্বল্পকাল পূর্বেকার প্রথম মহাযুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখেছেন, 'সমগ্র ইয়োরোপ জুড়িয়া যে সর্বগ্রাসী সমরানল কয় বৎসর পূর্বে জ্বলিয়াছিল, তখন ঘর সংসার পুত্রকন্যা স্ত্রী ভগ্নী মাতা সকলকে ফেলিয়া, বাণিজ্য ব্যবসায় শিল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের চর্চা ভুলিয়া, চিকিৎসা সেবা অন্নসংস্থান বস্ত্র যোগান দূরে ঠেলিয়া,—এক কথায় সভ্যজগতের সমস্ত দায়িত্ব ও জ্ঞানানুশীলন পিছনে রাখিয়া, পূর্ণবয়স্ক নীরোগ ও শক্তিমান পুরুষ মাত্রই যে যুদ্ধদানবের সর্বনাশী অগ্নিলীলার ইন্ধন যোগাইতে ছুটিয়াছিল, একথা কি শিক্ষিত মানুষ মাত্রই জানেন না? কিন্তু সমস্ত পুরুষশক্তির এই নির্মম অবহেলার ফলে ইয়োরোপের বৃদ্ধবৃদ্ধা শিশু ও নারীগণ কি জহরব্রত করিয়া একসঙ্গে পুড়িয়া মরিয়া বিরহ-বেদনা ও সংসারভার মোচন করিয়াছিল?...বর্তমান ইয়োরোপের চলতি ইতিহাস তো সে সাক্ষ্য দেয় না। এই বিরাট মহাদেশের জটিল জীবনযাত্রা-পথের সকল প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়াছিল ইয়োরোপের নারীরা; তাহারা ক্ষুধিতের অন্ন যোগাইয়াছিল, বস্ত্রহীনের বস্ত্র বুনিয়াছিল, নিরানন্দের হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করিয়াছিল। বাণিজ্য ব্যবসায় আপিস আদালত যানবাহন, কলকব্জা, চিকিৎসা সেবা, দেনা পাওনা, কাগজপত্র, হিসাবনিকাশ, সকল ব্যাপারের তত্ত্বাবধানই তাহারা করিয়াছিল।......ব্রিটিশ এ্যাডজুটান্ট জেনারেল ... ফোর্জেজ বলিয়াছিলেন, 'প্রায় সকল কার্যক্ষেত্রেই মেয়েরা যে পুরুষের স্থান দখল করিয়া সফলতা দেখাইতে পারে, তাহা তাহারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।' ......'প্রথম প্রচেষ্টার অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহারা পুরুষদের প্রবর্তিত পথে কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। হইতে পারে, এই পথ চলার ব্যাপারে কোনদিন তাঁহারা নিজেদের জন্য নূতন রকম পথ আবিষ্কার করিবেন, যে পথের শেষে তাঁহারা হয়ত এমন সকল সৌন্দর্য ও জ্ঞানের সন্ধান দিতে পারিবেন যাহা পুরুষোচিত মাপকাঠির মাপে ঠিক পুরুষের অর্জিত বিত্তার তুল্য হইবে না, কিন্তু তাহাতে এমন কিছু নূতনত্ব বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য থাকিবে যাহা পুরুষ দেখাইতে পারেন নাই, এবং সেজন্যই তাহা অমূল্য হইবে।' এই উত্তরের শেষাংটিতে অভিনবত্ব আছে স্বীকার করতেই হবে।

চতুর্থ উত্তরটিও ভালো: 'শৃঙ্খলিত দেহমনে স্ত্রীলোক যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, মুক্ত অবস্থায় তাহার অপেক্ষা বেশি দেওয়াই স্বাভাবিক। তাঁহার মানসিক শক্তি ও প্রতিভাকে পূর্বে যেখানে কেবল সংসার রচনায় লাগাইয়াছিলেন, নারী এখন তাহার কিয়দংশ অন্য কাজে দিতে পারিবেন।' এখনও তো বেশির ভাগ দেশেই মহিলাদের এই উদ্বৃত্ত শক্তিকে নানা ক্ষেত্রে নিয়োগ করার মতন যথেষ্ট সুযোগই সৃষ্টি হয়নি, তাই এই নিয়োগ থেকে যে সুফল ফলতে পারে তাকে গোলায় তুলবার সময় এখনও আসেনি, বলাই বাহুল্য।

আমি লেখিকার রচনায় ক্রমবিন্যাস খানিকটা ভেঙ্গে তাঁর শেষ উত্তরটি এবার পেশ করি। মহিলাদের প্রতিভা বুদ্ধি ও শক্তি এখন পর্যন্ত যে ক্ষেত্রে অবারিত উৎসারের সুযোগ পেয়েছে সেখানে তাদের সিদ্ধি যে পুরুষের সিদ্ধিকে ছাড়িয়ে গিয়েছে সে কথাটিই মনে করিয়ে দিয়েছেন ...: 'মাতৃস্নেহ জগতে যতখানি আদর্শ স্থানে পৌঁছাইতে পারিয়াছে—পিতৃস্নেহ তেমন পারে নাই। পাতিব্রত্যে নারী যে আদর্শ দেখাইয়াছেন,

পত্নীপ্রেমে পুরুষ তাহা দেখাইতে পারেন নাই। ভক্তিতে নারী যেমন নিষ্ঠা দেখাইয়াছেন, পুরুষ তাহা পারেন নাই। স্নেহপ্রেম ও ভক্তির নিকট নিজ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকে নারী যেমন নিঃশেষে সঁপিয়া দিয়াছে পুরুষ তাহা পারেন নাই।'……'বহির্জগতেও মাতৃস্নেহের এরূপ কার্যক্ষেত্র আছে, যেখানে পুরুষেরা এখনও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই।'

উদ্ধৃতির বাহুল্যে আপনাদের শ্রান্ত করে তুলেছি কি? আমার কিন্তু এখনও আশা মেটেনি। প্রবন্ধগুলি যদি আদ্যোপান্ত তুলে দিতে পারতাম তবেই বোধহয় ঠিকমতন বোঝানো যেত তথ্যে রসে ও যুক্তিতে এই লেখিকার রচনা কত সমৃদ্ধ! আরো একটি ছোট্ট প্রবন্ধের উল্লেখ করি যার শিরোনাম: নাম। এই প্রবন্ধের বক্তব্য: আমরা যদি ইংরেজের দেখাদেখি 'মিস' ও 'মিসেসের' সমাদর না করিতাম তাহা হইলে আমাদের দেশে নারীর অধিকারের একটা বড় সমস্যার সহজেই সমাধান হইয়া যাইত। বাঙালী মেয়ের নামের গায়ে বিবাহিতার ছাপ মারিয়া তাহাকে সম্পত্তির সামিল করিয়া দেওয়ার নিয়মও এ দেশে ছিল না। তাঁহারা সকলেই শ্রীমতী; মিস অথবা মিসেস নহেন।'

তাই লেখিকা সমাধান দিয়েছিলেন: 'তাঁহারা আজীবন দেবী লিখিলে ঘরের কি বাহিরের খুব বেশি ক্ষতি হইবে না, উপরন্তু নিজস্ব নাম চিরকাল বজায় রাখিবার গৌরবটা থাকিবে।' একজন পাঠক এর উত্তরে যা লিখেছিলেন তা আরো যুক্তিসঙ্গত: 'স্ত্রীলোক মেয়ের নামের সহিত দেবী এই কৃত্রিম শব্দের dead uniformity সৃষ্টি করবার প্রয়োজন কি?… 'দেবী' শব্দ ব্যবহারে অহিন্দুর আপত্তি থাকিতে পারে এবং তজ্জন্য তাহা সকলের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। পদবীহীন নাম ব্যবহারে কোনো সম্প্রদায়ের আপত্তির কারণ নাই। স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য-প্রয়াসী বাঙালী মহিলাগণ এই নূতনত্ব প্রবর্তন করুন; ইহাতে সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।" ষাট বছর আগেকার এই সব আলোচনা আজও অপ্রাসঙ্গিক নয়।

যাই হোক আজ এই লেখিকার বেশি পরিচিত রচনাগুলির কোনো আলোচনা করি নি। বছর দশ বারো আগে ইউনিভার্সিটি উইমেন্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকেই যখন কয়েকজন জ্যেষ্ঠা লেখিকা, শান্তাদেবী, সীতাদেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, গিরিবালা দেবী এবং শৈলবালা ঘোষজায়াকে সম্বর্দ্ধিত করার আয়োজন হয়েছিল তখন শান্তাদেবীর পরিচয় দান উপলক্ষ্যে ("পঞ্চদশী") আমি তাঁর 'চিরন্তনী' 'জীবনদোলা' 'সিঁথির সিঁদুর' 'অলখ ঝোরা' ইত্যাদির অল্প একটু উল্লেখ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ঐ সমগ্র রচনাবলী পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব কোনো ব্যবসায়ী প্রকাশক গ্রহণ করবেন তার আশা কম। কিন্তু কোনো একটি সাময়িক পত্রিকা যদি বিগতযুগের সৎসাহিত্য থেকে সংকলন করে নিয়মিত উপহার দেওয়া স্থির করেন তবে উৎসাহী পাঠকের অভাব হবে না এবং এঁদের রচনার সঙ্গে পরিচয় হলে সাহিত্য-রুচিরও প্রসার ঘটবে।

শান্তাদেবীর কলমে কথাসাহিত্যই যদিও আমরা বেশি পেয়েছি, আমার ধারণা তাঁর মন ও তাঁর কলম প্রবন্ধ রচনায় আরো সিদ্ধহস্ত ছিল। প্রবাসীর পৃষ্ঠায় কয়েকটি ছোট গল্প পড়লাম যেগুলি নেহাৎ গল্প নয়, যাতে প্রবন্ধের উপাদান রয়েছে। কোনোটাতে আছে চা বাগিচার আড়কাঠিদের উৎপাতের কথা কোনোটাতে বা গণযৌতুকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী কোনো কন্যার কাহিনী। হয়ত ঠিক একই কালে তাঁর প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে আড়কাঠিদের কি করে উৎসাদন করা যায় তার পরিকল্পনা দিচ্ছেন শান্তা দেবীর পরিণত বয়সে রচিত পিতৃজীবনী 'রামানন্দ ও

অর্দ্ধ শতাব্দীর বাংলা' গত শতকের শেষ পঁচিশ বছরের এবং এই শতকের প্রথমার্দ্ধের একটি মূল্যবান দলিল। এই দলিল রচনায় তিনি নৈর্বক্তিকতা, তথ্যনিষ্ঠা ও মৃদু রসবোধের যে পরিচয় দিয়েছেন তারই প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সাময়িক পত্রের প্রবন্ধগুলিতেও। প্রবাসী ও Modern Review তো কেবলমাত্র দুটি পত্রিকা ছিল না রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রীপুত্রকন্যাদের পক্ষে, ছিল একটা সামগ্রিক জীবন-পরিবেশ। রমেশ মজুমদার বলেছিলেন 'রামানন্দ জনগুরু।' তবে জন-শিক্ষার জন্য তিনি যতই আত্যন্তিকভাবে নিজেকে দিয়ে থাকুন না কেন গৃহকে তিনি অবহেলা করেননি। তার সুফল তাঁর পুত্রকন্যাদের মধ্যে বর্তেছিল। তা ছাড়া ছিল ব্রাহ্ম সমাজের প্রগতিশীল আবহাওয়া। আর শৈশবে বাংলাদেশের বাইরে এলাহাবাদে মানুষ হওয়ার ফলে এঁদের চারিত্র্যে আর একটি মাত্রা যুক্ত হয়েছিল। এ সবেরই সম্মিলিত ফল ঐ মুক্তিনিষ্ঠ চিরপ্রগতিশীল মন।

আজ একে একে রামানন্দের পুত্রকন্যারা সবাই চলে গেলেন। কিন্তু সপরিবারে রামানন্দ সাহিত্যে, সাংবাদিকতায়, স্বাদেশিকতায় যে কীর্তিটুকু রেখে গেছেন তাকে অবহেলায় নষ্ট না করার দায়িত্ব আমাদের। আমার এই রচনা শেষ করতে গিয়ে আর একবার মনে পড়ছে, পূর্বোক্ত জ্যেষ্ঠা লেখিকা সম্বর্দ্ধনা সভায় সীতাদেবীর সেই প্রশ্ন: 'আমাদের যুগে মেয়েদেব মধ্যে পড়াশোনা কত কম ছিল, আর কত বাধা ছিল মেয়েদের। তবু তো আমরা অনেকে তখন লিখেছি। কিন্তু আজকে যখন স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতার এতোখানি প্রসার হয়েছে তখন লেখিকার সংখ্যা এতো কম কেন?' এতোদিন ধরে ভেবে ভেবেও একটা সদুত্তর দাঁড় করতে পারিনি আজো?

ইউনিভার্সিটি উইমেন্স এসোসিয়েশান আয়োজিত শান্তাদেবী স্মরণ সভায় পঠিত।

নন্দনতত্ত্ব ঃ কিছু প্রশ্ন

মায়া দাশগুপ্তা

আঠারশো সাতান্ন সালের মহাবিদ্রোহ ভারতীয় জনমানসে এক যুগান্তকারী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং সে সময়কার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে চিনিয়ে দিয়েছিল ভারতীয় কৃষক সাধারণের মিত্র ও শত্রুদের। যদিও আমাদের আজকের মূল বিষয় এটি নয় কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রথমতঃ ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ জনমানসে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে তার ফল সুদূরপ্রসারী। কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া থেকেই যায় যা—পরবর্তী ঐতিহাসিক অগ্রগতিকে প্রভাবিত করে। এ যেন বিধ্বংসী বন্যার মতো। বন্যা শেষে যেমন একদিকে ধ্বংসের তাণ্ডব অপর দিকে তার সৃজনশীল অবশেষ। ক্রন্দন এবং উদ্যমের সহাবস্থান তেমনি। মহাবিদ্রোহ যেমন ভারতীয় জনমানসের স্থবিরতাকে চাবুক মেরে সচেতন করেছিল, তেমনি সেদিনের বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বেশকিছু মানুষের চিন্তাচেতনার দৈন্যতাকে উলঙ্গভাবে প্রকাশ করেছিল। আর প্রায় সেই সময় থেকেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (মধ্যবিত্তদের শ্রেণী বলায় অনেকের আপত্তি থাকতে পারে কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য শ্রেণী হিসেবেই উল্লেখ করছি) জন্ম। অভিজাত ধনী-সম্প্রদায় ও শ্রমিক কৃষকের মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরণের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্ম হ'ল। এর ভিত পাকাপোক্ত করে তুলতে লর্ড [illegible]লিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম হ'ল। রাজা-উজীর যারা বাঙালী মধ্যবিত্ত তথা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ইংরাজদের মোসাহেবীতে পরিণত হ'ল। যার কদর্য বহিঃপ্রকাশ ঘটলো এক ধরণের 'বাবু' কালচারে। সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ, ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন, ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক সংস্কারের মুক্তির জোয়ার বইলো। চারিদিকে মুক্তি, চারিদিকে জাগরণ, সারা দেশে আলোয় মোড়া। কিন্তু কার মুক্তি কিসের জাগরণ কোথায় আলোয় ফেরা জানলো না সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। এমনি করেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী চরিত্র বার বার মূল সমস্যার বাহিরে থেকে বার বার সংস্কার সংগ্রামের নামে চোর-পুলিশ খেলেছে। এ এক বিশেষ ধরণের সুবিধাবাদ। এ সুবিধাবাদ বার বার সমাজে নানাভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে আজও। আরও সুক্ষভাবে, আরও সচেতনভাবে এরই উন্নত পুনরাবৃত্তি চলছেই। তারই ফলশ্রুতি সমাজের সর্বাত্মক অবক্ষয়। অথচ এ অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে কোন সৎপ্রচেষ্টা তো হল না বরং নানাভাবে নানারূপে এর পুষ্টিসাধন আজও চলেছে। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে যে সুস্থ পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল, বাঙালীর যে মানসিকতা সারা ভারতকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা আজ প্রায় নিঃশেষিত। কেন এমন হ'ল ?

অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে কিন্তু আমরা সবাই সোচ্চার। কিন্তু তবুও অপসংস্কৃতির ভূত আমাদের ঘাড়ে আরও চেপে বসেছে। আসলে অপসংস্কৃতির কি তার সত্তা কি আমাদের কাছে পরিষ্কার না, অথবা আমাদের বুদ্ধি-

জীবীরা যে সুবিধাবাদ উত্তরাধিকার সূত্রে ভেবেছেন সেই সুবিধাবাদই আসল প্রশ্ন থেকে আমাদের দূরে রাখছেন। যেমন সমাজের মূল সমস্যা থেকে দূরে থেকে সতীদাহ বিরোধী বিধবা বিবাহ আন্দোলন নিয়ে মেতে-ছিলেন। অথচ সামন্ততন্ত্রের জগদ্দল পাথরটা, যার মূলে ঐ কুসংস্কার তার বিরুদ্ধে কথাটি বলেননি। কারণ তাহলে যে নিজেদের গায়ে হাত পড়ে। আজও তেমনি একই গপ্পো। আধা সামন্ত আধা ঔপনিবে-শিক ব্যবস্থাই যে এ অবক্ষয়ের কারণ সে কথা বললে অথবা ঐ ব্যবস্থাকে উৎখাত করার সচেষ্ট প্রয়াস হলে নিজেদের সুবিধাবাদী অবস্থান থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। মূলত: অপসংস্কৃতি বলতে কি বুঝি তার মূল প্রতিক্রিয়া কেমন ভাবে কাজ করে? অনাবৃত নারী-দেহ প্রদর্শন অথবা সাহিত্য সংস্কৃতিতে অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ কি একমাত্র অপসংস্কৃতির মাপকাঠি? অপসং-স্কৃতির বিরুদ্ধে আক্রমণ যারা চালান তাঁরা মূলত: মূল সমস্যা থেকে দূরে থাক্তে অথবা সাধারণকে দূরে রাখতে চান অথবা যারা রক্ষণশীলতার পর্য্যায় রয়েছেন।

আসল কথা সংস্কৃতির যে যে সব বিভাগ সৃষ্ট নীতির ও রুচির বিকৃতি সাধনে মানুষের মনকে প্রভা-বিত করে অথবা সচেষ্ট হয় তাই অপসংস্কৃতি। যদিও নীতি ও রুচির প্রশ্নে বিতর্ক আসতে পারে। কারণ যারা সমাজের প্রগতিকামী তারা নীতি ও রুচির অপরিবর্তনীয়তায় অবিশ্বাসী। আমরা চাই বা না চাই সমাজ নিত্য পরিবর্তনশীল পরিবর্তন ঘটছে যান্ত্রিক সভ্যতার আক্রমণে।

বড় বড় প্রকাশন সংস্থাগুলি এ খেলায় বিপদজনক রূপে মেতে উঠেছে। মানুষ দিয়ে আমাদের দেশে সুবিধা হচ্ছে না কারণ বাঙালী পাঠক দর্শক স্ব[illegible]। তাই দেবতাদের যৌন জীবনের রগ রগে গল্প ফাঁদা হচ্ছে।

কিছুদিন আগে কাগজে একটি খবরে প্রকাশ এক বিবাহিতা মহিলা কয়েকজন তরুণ কর্তৃক অপহৃত হয়েছেন এবং অনভিজ্ঞ তরুণদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে তাঁদের আসল শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন আমরা পড়লাম, পড়ে হেসেছি এবং কেউ কেউ হয়তো বলেছি সাংঘাতিক প্রগতিশীলা তো। কিন্তু আসল প্রতিক্রিয়ার প্রতি খুব কম মানুষই লক্ষ্য করেছেন। তরুণপ্রাণে এ ঘটনার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে বাধ্য। এ খবরের মধ্য দিয়ে হ্যারল্ড রবিন্স এবং এ্যাল্বার্তো মোরাভিয়া উঁকি ঝুঁকি মারছেন বলে আমরা ভেবে-ছিলাম। মনে রাখা সর্বাগ্রে প্রয়োজন দেহের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সৃষ্টি না করেও সাহিত্য শিল্প মনের জগতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। ল্যাঞ্জিনাস বলেছেন উৎকৃষ্ট সাহিত্য পাঠক মানসে তীব্রপুলক সৃষ্টি করতে সক্ষম। এই পুলক কোন ইন্দ্রিয়জাত সম্ভোগের দ্বারা সম্ভব নয়। অপসংস্কৃতির বিশেষত্ব হলো তার আবেগ বা আবেদন মূলত: শারীরিক স্তরে সীমাবদ্ধ রাখা। বাস্তব জগতে ইন্দ্রিয়-জাত সম্ভোগের বাহুল্য যেমন দেহ ও মনকে ব্যপ্ত করে তেমনি অপসংস্কৃতিজাত শিল্প সাহিত্য একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তি অপসংস্কৃতির চূড়ান্ত ফলশ্রুতি।

সৎ সাহিত্য মূলত: মানস অভিজ্ঞতা এবং গঠনা-ত্মক মস্তান বাহিনী তৈরীতে অপসংস্কৃতির অবকাশ কম নয় হিন্দি ফিল্ম এবং বেশ কিছু বাংলা ছবি একাজে মদত দিচ্ছে।

কিন্তু এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন sex ও violance স[illegible]ত্যও আছে। কিন্তু তার প্রকৃতি ভিন্ন। সৎ সাহিত্যে sex জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে আসে বলে পাঠকের মনকে অন্যভাবে প্রভাবিত

করে এবং মানস অভিজ্ঞতাকে আরও বাস্তব সম্মত করে।

লক্ষ্যহীনতা অপসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কারণ। কিছুকাল আগে থেকে আমাদের রাজনীতিতে হিংসার প্রচণ্ড কলরবে আত্মপ্রকাশ। বহুলোক এই রাজনৈতিক দাবা খেলায় শিকার হয়েছেন। উপযুক্ত রাজনৈতিক পটভূমিকায় এই রক্তাক্ত দিনগুলির ছবি তুলে ধরতে পারলে তা উৎকৃষ্ট সাহিত্যের উপকরণ হিসেবে পরিগণিত হতে পারতো। কিন্তু বেশ কিছু শিল্প সাহিত্যে এগুলিকে ব্যক্তিবিশেষের প্রবণতা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে অপসংস্কৃতির অন্যতম প্রতিক্রিয়া চিন্তায় হতাশা আনে, এগুলি মূলতঃ রাজনৈতিক দলগুলির কাজ কারবার থেকে জন্ম নিচ্ছে। নেতাদের আদর্শহীন মিথ্যা প্রচারও এক ধরনের অপসংস্কৃতি। কোন নেতা বললেন, আমাদের ভোট দিলে আমরা দশ বছরের মধ্যে বেকার সমস্যা দূর করবো। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা, দূর হওয়া তো দূরের কথা বরং বেকারের সংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। তারা বলছেন না প্রচলিত মুনাফাভিত্তিক কাঠামো ভেঙে না ফেললে বেকারত্ব দূর করা যায় না। কারণ বিপুল বেকারবাহিনী সস্তায় মজুত শ্রমের ভাণ্ডার। স্বভাবতই তরুণমন পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার হতাশায় ভেঙে পড়ে এবং চূড়ান্ত অবক্ষয়ের স্বীকার হতে বাধ্য হয়, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই-এর প্রধান লক্ষ্য প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই। একে উৎখাত না করলে অপসংস্কৃতির ভূতকে কোনদিন নামানো যাবে না। আজ আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ নানা রূপে রঙে। স্বভাবতই ঐ শোষণের সঙ্গে সঙ্গে তার সংস্কৃতিরও অনুপ্রবেশ নিয়ত ঘটে চলেছে। আমাদের দেশনেতারা মুখে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বুলি নিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে পূর্ণমাত্রায় নানা কায়দায় মদত দিয়ে চলেছেন। স্বভাবতই এঁরাই এবং এঁদের অনুগ্রহপুষ্ট নীতিহীন শিল্পী সাহিত্যিক অপসংস্কৃতিকে শক্তিশালী করছেন নানা বুলি আর নর্তনকুর্দনে। এদের বিরুদ্ধে সচেতন না হলে অবস্থা আরও বিপর্যয়কর হতে বাধ্য।

দেশপ্রেমিক প্রতিটি মানুষের সচেতন হওয়া প্রয়োজন আজ অনেক বেশী। কারণ চোখ বুজে বসে থাকলে সমাজে সময় ও সংস্কৃতির অপ্রতিহত নীতিকে রোধ করা যাবে না। উটপাখিরা ভুলভাবে বাঁচার চেষ্টা করে বেশী করে মৃত্যুকে ডেকে আনে। আমরা চোখ বন্ধ রাখলে আমাদের আগামী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।

১

চলতে চলতে/কেয়া মুখোপাধ্যায়

চলতে চলতে এখানে থেমেছে পথ,
নেই সেই কোলাহল, এ যেন অন্য জগত ।
সামনে আমার সাগরের অথৈ জলরাশি,
ঢেউয়ের তালে মন ছুটেছে সুদূরে ভাসি ।
গোধূলির আবিরে রাঙানো আকাশ
কি যেন গোপন কথা জানালো দক্ষিণা বাতাস ।
অবাক চোখে তাকিয়ে দেখি সাগরে মিশেছে আকাশের নীল
ভাবি বসে জীবন আমার হবে কি এমন স্বপ্ন রঙিন ।
ক্লান্তদিনের শেষে, প্রকৃতির অপরূপ শোভায়
হারানো আমি, নতুন করে খুঁজে পেলাম আমায় ।
ওগো প্রকৃতি, তুমি কত অসীম সুন্দর
দু'চোখ ভরে দেখে তোমায়, স্বর্গীয় সুষমায় ভরে যায় অন্তর ।

সুমিষ্ট বরষা/শ্যামলী হালদার

এসো বরষা : সুমিষ্ট বরষা,
এই ঋতুতেই পাই আমি বাঁচার ভরষা ।
এর রিম ঝিম সঙ্গীতময় কলতান,
করে নতুন সবুজেরই উত্থান ।
ক্ষুদ্রতম বৃষ্টিকণার নেই কোন বাঁধ,
শুধু এই তৃষ্ণার্থ পৃথিবীর আশীর্বাদ ।
সুক্ষ জলবিন্দুগুলো মুক্তার মতো নিটোল,
প্রাচুর্যপূর্ণ সু-পরিপুষ্ট দুনিয়ায় আজও অটোল ।
বর্ষণ শেষে সূর্য করে আমায় করুণা,
সাক্ষী তার সুন্দর সজীব অগণিত নবারুণ ।
বৃষ্টি কার আঁখির জল ? কে সেই কন্যা,
যার জন্য বাহিত হয় হৃদয়ে আনন্দের বন্যা ?

এই মুহূর্তে/বহ্নিশিখা ভট্টাচার্য

এই মুহূর্তে মৃত্যু আপন—
খেয়ালী কল্পনা
বেদনায় ব্যথাহত ।
সুদূরের স্বপ্ন
নির্মম আশাহত
মুহূর্তটি যেন মৃত্যুর স্বপ্ন
খোলা আকাশের নীচে
রঙের খেলা
তার প্রচ্ছদপটে
তোমার ছবি আঁকা—
মুহূর্তটির নিবিড় আলিঙ্গন—
উন্মুক্ত প্রান্তর
পথহারা পথিক,
শ্রান্তিহীন ক্লান্তির নিকট
আকূল আত্মসমর্পণ--
স্তব্ধ মুহূর্ত
ব্যাকুল আঁখিতারা ॥

প্রতিরোধ/মণিমালা রায়চৌধুরী

বিবিক্ত দিনে রাতে অবসরের গান ।
ছেঁড়া পাল তোলা ফুটো নৌকো ।
জল বাড়ছে নদীতে—
ঘরে ফেরার আশা আছে ?
উত্তাল ঢেউ ভাঙছে আর ভাঙছে ।
সনসনে বাতাস আর হাড় কাঁপায় না ;
অজস্র বৃষ্টির তীক্ষ্ণতম ফোঁটা গায়ে লাগে না ।
দুর্ভেদ্য বর্ম আঁটা — প্রতিরোধ গড়া আছে ;

অদিতি চট্টোপাধ্যায়ের ছড়া

অদিতির বয়স এখনও ছয় ছোঁয়নি। ইতিমধ্যেই বাড়িতে কবি/সাহিত্যিক/ছড়াকারদের আড্ডা বসলে সেখান থেকে নড়তে চায় না। ওর বয়সী অন্য সকলে যখন খেলায় ব্যস্ত। ছড়া শুনে শুনে ছড়ার কান তৈরী হয়ে গেছে কিছুটা। ওর ছড়ায় ওর পরিচিত শব্দাবলীর ঘোরা-ফেরা।

চন্দননগর থেকে হাওড়া যাওয়ার পথে লিলুয়া স্টেশন দেখে ওর ছড়া :

যদি যাও লিলুয়া,
তবে পাবে তিলুয়া।

বাড়িতে সত্যনারায়ণ পূজা। উপকরণ প্রস্তুত। পুরুতের দেখা নেই। সেই উৎকণ্ঠার মধ্যেও মুখে মুখে ছড়া বানায়—

পুরুত যদি পাখী হতো
ফুড়ুৎ করে উড়ে যেতো

সম্প্রতি অদিতি গোবরডাঙা ঘুরে এসেছে। যাবার আগে ওর ধারণা ছিল গোবরডাঙা বুঝি গোবরে ভরা। বাস্তবে তা দেখতে না পেয়ে ওর ছড়া : –

॥ গোবরডাঙার দাদু ॥

গোবরডাঙায় থাকেন মায়ের কাকা
তিনি আমার দাদু
গোবরডাঙায় গোবর কোথাও নেই
শুধু আছে সন্দেশ খুব স্বাদু।

সিনেমা হল, খেলার মাঠ
কলেজ এবং স্কুল
সবই আছে
আরও আছে বাগান ভরা ফুল।

প্রিয় সুনীল/নিভা দে

প্রিয় সুনীল,
এ আশ্চর্য সংসারে
'কেউ কথা রাখে না' বলে ক্ষোভে রোষে
অভিমানে হয়েছ তুমি নীললোহিত—
বড় বেশী অভিমানী বালক তুমি—
নয়ছয় গাঢ় ক্রোধে উলঙ্গ ভাষাকে দাও তুমি
আশ্চর্য মহিমা—তোমার কবিতায়—
যা ইচ্ছে লিখে যাচ্ছো তারুণ্যের চপলতায়
অথচ তবু কিছু যেন হ'য়ে ওঠে সেই সব উচ্ছৃঙ্খল অনুভূতি।
শতধা ইচ্ছার চূর্ণরেণু মেখে
ওহে সুনীল,—ছুটে চলেছো তুমি
দ্রুতগতি অশ্বারোহী হ'য়ে ভাষার সব দিগন্ত ছুঁয়ে··· ।
কী মনোরম স্বেদ আর কল্পনায় গড়া 'সেই সময়'
'সূর্য' বা 'অর্জুন' আছে মনে লেগে আমাদের—
মৃদু ফিক ব্যথার মতো— । কলকাতাকে ভালবেসে
অযথা দিওয়ানা তুমি,— সুনীল···
তাই কলকাতা তোমার রক্তে মজ্জায় বারবার
ভালবাসার গাঢ় কঠিন দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে—
'হঠাৎ নীরার জন্য' তোমারই মতো আজ
আরও কোন কোন যুবা
বাসষ্টপে অপেক্ষা করে শুধু তিন মিনিট নয়
অনন্তকাল··· । ওহে প্রগল্ভ, যৌবনের কবি—
তোমার অনন্ত সৃষ্টির আবহ সঙ্গীত কে করে রচনা ?
কোন নীরা, সুলেখা বা স্বাতীর রক্তনীল আঙুলায় হয় তা লেখা ?

যন্ত্রণা কত স্মৃতিময়/শ্যামা দে

নিভিয়ে তুমি দিওনা যেন
ঐ মাটির প্রদীপখানি,
তোমার একটি ফুৎকারে—
হৃদয় আমার ক্লান্ত বড়ই
ব্যস্ততার ঐ চীৎকারে ॥

দিনটা না হয় গড়িয়ে গেল,
রাতটা তো গো আছেই বাকি—
তোমরা শুধুই শব্দ কর
আমিই কেবল নিঃশব্দে থাকি ॥

ভোরের বেলা দোর খুললেই
পায়রা কত দেখি —
ঐ ডালিমগাছের তলে,
তখন দেখো আমার হৃদয়
নির্জনে ঐ ছায়ার সাথে—
স্মৃতির খেলা খেলে ॥

প্রিয়দর্শী তোমার জন্যে/নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রিয়দর্শী—সেই তোমাকে
তোমার চোখে
কৃষ্ণচূড়ার লকলকে রঙ
লেকের ধারে মশলা মুড়ি
প্রিয়দর্শী! কালচে ঠোঁটে
ট্যারচা হাসি
দেখবো বলে—তোমার জন্যে—
সব দিয়েছি, সব করেছি
ঘর ছেড়েছি প্রিয়দর্শী!
ম্যান্‌ডোলিনে ক্যালিপ্‌সো সুর
শুনতে শুনতে
কুল-মান-ঘর নির্বাসনে
দূর করেছি!
তোমার জন্যে—ঘর বেঁধেছি
ছিন্ন সার্টে তাপ্পি মেরে
স্বপ্ন স্বপ্ন আধখানা ফ্ল্যাট
গড়বো বলে দিন গুনেছি!
প্রিয়দর্শী— সেই রোম্যানটিক
হৃদয়টিকে ধরবো বলে
এই ফাগুনের পঁচিশ রোদের
নতুন সবুজ ঝলমলে ঘাস
ঘাস মাড়িয়ে--
বকুল ফুলের গন্ধ নিয়ে
পিছন ফিরে খোঁজ করেছি—
হন্যে হয়ে
তোমার জন্যে।
প্রিয়দর্শী! স্থির করেছি
সার্টের হাতায় লিপস্টিক-ছাপ
ওল্‌ড ফ্লেমেরই উষ্ণতাকে
খুঁজবো বলে—হন্যে হয়ে
প্রিয়দর্শী!
কোথায় তুমি?
নদীর পাড়ে ক্লাস পালানো
মন হারানো
হৃদপিণ্ডের ধুকধুকুনি
শুনতে গিয়ে!
কালোচুলে এলোমেলো
হাওয়ার খেলা দেখতে গিয়ে!
প্রিয়দর্শী!
এই কি তুমি?
এক্সেকিটিভ ফাইল-ঝাঁকে
টেলেক্স মিটিং কন্‌ফারেন্সে
অবসন্ন চোখের তারায়
অতীত আলো!
ললাট শীর্ষে ধূসর ছায়া
প্রিয়দর্শী—কোথায় তুমি?
নীল ফিয়েটে ছাই-রঙা স্যুট
ভারিক্কি চাল—সিগার-টানা?
কোন হাওয়াতে—
হারিয়ে গেলে
প্রিয়দর্শী!
ম্যান্‌ডোলিনে আকুল করা
মন কেমনের ক্যালিপসো সুর
কোথায় পাবো—কোন অতীতে
প্রিয়দর্শী!
সেই তোমাকে?
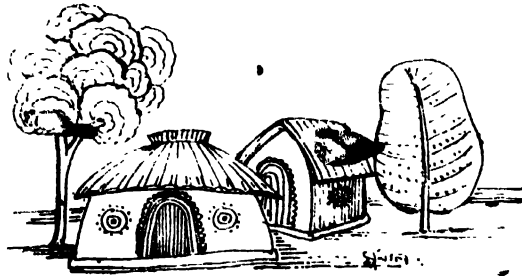
ঘুমন্ত সময়ে পিঠ রেখে/দীপালি দে সরকার

ঘুমন্ত-সময় শিমূল পলাশে মাথা রেখে
আতসবাজির স্বপ্ন দেখে দিনরাত।
চোরাবালিতে সাবধানী গাড়ির চাকা
বন্ বন্ করে ঘুরতে ঘুরতে ছুটে চলে।

যাদু-সম্রাট খেতাব পাওয়া বাতাস
হর্ষতালি কুড়োতে কুড়োতে
বিবেকের নত-মাথায় ঝাপট লাগিয়ে
শন্ শন্ বয়ে যায়।

দাম্ভিক কিছু কাক গলা সাধে—
কা কা কা।

এখন তাই বিবেকের ঘুম
এখন তাই চেতনার ঘুম
এখন তাই বেদনার ঘুম
এখন তাই আশার ঘুম
এখন তাই ভালবাসার ঘুম।

ঘুমন্ত-সময়ে পিঠ রেখে কে জাগে ?
কে ?
আসন্ন-প্রসবা হিরণ্যগর্ভা কেউ কি কোথাও ?

হয়তো/স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়

কাল সন্ধ্যায় কথা ছিল দেখা হবে,
তখন আকাশ নীল আর নীলিমায়
প্রথম তারাটি আবছায়া কথা কবে
ঝর্ণার সুর রক্তের ফোয়ারায় !

হয়তো কখন দক্ষিণ হাওয়া এসে
আমাকে খুঁজবে তোমার আঁখির পাতে,
সাগরের ঢেউ কৌতুকে যাবে ভেসে
একটি ঝিনুক উপহার দিয়ে হাতে।

মুকুতার পাঁতি হয়তো সেখান থেকে
আবিষ্কারের পণ যে তোমার মনে,
সোনার প্রদীপ আঁধার যদি বা ঢাকে
তবুও মণিকা নেবে তুমি ঠিক চিনে।

জানি মানতেই হবেই তখন হার
এই সর্তেই তোমার অধর পারে,
সোহাগে, আদরে, চুম্বনে তাও আর
বর্ষার মতো পড়তেই হবে ঝরে।

নিয়েছে বিদায় সন্ধ্যা বালুকা তীরে
স্বপ্ন-মাধুরী মনে হয় শুধু ভুল,
পাখির কাকলি হয়তো বা যাবে ফিরে
যেখানে প্রেমের সমাধিতে ঝরা ফুল !

একশো বছরের রুশ সাহিত্যের স্রষ্টা ও সৃষ্টি

যূথিকা রায়

জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকে অনেক বক্তব্য রেখেছেন। সাহিত্য জীবনের ভাষ্য ছবি। সাহিত্য-জীবন অর্থ মেলে ধরে। এ'গুলির মধ্যে কোন একটির অভাব হলে তা সাহিত্যের পর্যায় পড়ে না। অন্যান্য ললিতকলার মতো সাহিত্যকলার নৈপুণ্য কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

ভারতবর্ষের সাহিত্যকলা অসাধারণ। এর ঐশ্বর্যের কোন পরিমাপ হয় না। কেবলই বেশ বদল করে চলেছে—ফিরে ফিরে নতুন করে দেখছে—নতুন কণ্ঠে নতুন রাগিনী গেয়ে চলেছে। সাহিত্য উন্মেষ কাল থেকে আজ পর্যন্ত রূপসাগরে অবগাহন করে অপরূপ সুন্দরের দিকে খেয়া পাড়ি জমিয়েছে। এই যুগে সাহিত্যজগৎ ও জীবনের যে সত্য উপলব্ধি করিয়েছে তা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে।

সাহিত্যরসিকের দৃষ্টি সর্বব্যাপী। পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যকলার নৈপুণ্য মুগ্ধ বিস্ময়ে অনুভব করতে গিয়ে বলতে ইচ্ছা করে—

চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি
ধরার বন্ধন হতে নিয়ে যাক হরি
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্যের ডিটেক্শন নির্ণয়ে একবার ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে গিয়ে, রুশ সাহিত্যের কয়েকজন দিকপালের সাহিত্য প্রতিভার অবদানের কথা স্মরণে আসে।

প্রাক্‌বিপ্লব পর্যন্ত একশো বছরের গল্প সাহিত্যের বিশেষ রচনাগুলি সম্বন্ধে সামান্য কিছু উপলব্ধি করলে বিশ্ব সাহিত্যে কি পেয়েছি ভাবলে বিস্ময় লাগে।

রুশ সাহিত্য পৃথিবীর প্রথম সারির সাহিত্যরূপে গণ্য। প্রায় সমস্ত গল্পে তীক্ষ্ণ সমাজবোধ, সূক্ষ্ম মনোস্তত্ত্ব এবং মানুষ যে সমাজবদ্ধ জীব এ সত্যটি প্রকটভাবে প্রতীয়মান। সর্বোপরি রয়েছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মন—সে মন নারী বা পুরুষ যেই হোক না কেন সে প্রত্যাখ্যান করে, ভালবাসে, ঘৃণা করে, বিদ্রোহ করে। সমস্ত গল্পের প্রাণমূলে পাবেন ব্যাপক বেদনা, সমাজ-চেতনা, স্বপ্নফসিল। মানুষের হৃদয় অনুভূতি কত বিচিত্র পথে নিজেকে বিস্তার করে, কত জটিল আবর্তে নিজেকে উপলব্ধি করে তার সাক্ষ্য রয়েছে। মূলতঃ ঘটনার নাটকীয় সংঘাত এখানে প্রায় স্তিমিত। অনুভূতি বা দিব্যদৃষ্টি প্রাধান্য পেয়েছে।

রুশ সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে ব্যর্থতা ও বেদনার সহানুভূতিশীল অনুভূতি—চিরদিনই তা মানবিক ধর্মে বলীয়ান। আমাদের দেশে যা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনাগুলির মধ্যে প্রতীয়মান। শরৎ সাহিত্যের মতো রুশ সাহিত্যও উঠে এসেছে একেবারে নীচুতলা থেকে ওপরতলায়। মুড়ি-মুড়কির মতো চারিদিকে ছড়ানো [illegible] এর বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত গ্রন্থগুলি। এই রুশ সাহিত্য বিশ্বজনীন সম্মানলাভের অনিন্দ্য যোগ্য।

১৮২৫ থেকে দেশের অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয় স্তিমিত লেখকের চিন্তাধারা। তারপর বিপ্লবের শাণিত লেখনী নানান ঘাত-প্রতিঘাতে, জীবন-ব্যবস্থায়, আচার-আচরণে ফুটিয়ে তোলে বিচিত্র সাহিত্য শিল্পরূপ। কেউ নিয়ে এসেছেন বেদনা ব্যর্থতা; কেউ এনেছেন ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, হাসি; কেউ বা আদর্শ। ঝাঁকিয়ে তোলা সাহিত্য চরম নৈপুণ্যে সুতীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। রুশ সাহিত্যে যারা আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই লাল ফৌজের সারিতে। যুদ্ধ শেষ হলে সোভিয়েত পক্ষের বিজয়ে এই সমস্ত সাহিত্য-শিল্পীরা সর্বাগ্রে তুলে ধরেন অতীত সত্য, বিয়োগাত্মক সত্য, জীবনসত্য। সেইসমস্ত জনগণকে স্মরণ করেছেন; যাঁরা বীর্যের সৌন্দর্য নিয়ে সামাজিক ন্যায়ের আদর্শে দুঃখ সহ্য করেছেন। রোমান্টিসিজমের সঙ্গে ট্রুথ লাইফের অসাধারণ মুগ্ধতা ও স্বার্থহীন উন্মুক্ত ত্যাগ ও ভালবাসার জমায়েত মন্দিরে মিলন—এটাই হল বিংশ শতাব্দীর রুশ সাহিত্যের সাধারণ ধারা। গোর্কী, টুর্গেনিভ, ডস্টয়েভস্কি, গোগোল, শেখভ প্রভৃতি সাহিত্য স্রষ্টিকারীরা প্রকৃত রুশীয় চিন্তাধারায় পুষ্ট জীবনীচিত্র আঁকলেন।

এলেকজাণ্ডার সার্গেভিচ পুশকিন (১৭৯৯—১৮৩৭):

এর জন্ম ১৭৯৯ সালে মস্কোতে। ফরাসী শিক্ষায় শিক্ষিত। রাশিয়ায় এঁর স্থান ইটালির দাঁতে ও জার্মানীর গোথের মতই। চাকুরী জীবন থেকে লেখা শুরু। রুশ ভাষার মাধ্যমে মার্জিত গীতি কবি হিসাবে এর লেখা মনোরম। উপন্যাস' গীতিকাব্য, কবিতা ছাড়াও ছোটগল্প লিখেছেন। এঁর প্রধান উপন্যাস 'দি ক্যাপটেন'স ডটার, ইভেগান অনেগিন। ছোট একটি বিখ্যাত গল্প 'দি কুইন অফ স্পেড'।

পুশকিনের কিছু সময় নষ্ট হয় ফ্যাসন দস্তুর সমাজে ডুবে যাওয়ার ফলে। স্বদেশী কবিতা লেখার জন্য দক্ষিণ রাশিয়ায় বন্দী থাকেন। এরপর ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ককেশাসে বসবাস করেন। আবার তাঁর সাহিত্য প্রতিভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ককেশাসের অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্য তাঁর কাব্যধারাকে নিয়ে যায় কবি বায়রণের দিকে। রচনা করেন বিখ্যাত গ্রন্থ 'জিপসি', 'দি প্রিজনার অফ ককেশাস্', 'বাক্‌সিচারি'স ফাউণ্টেন'। পুশকিনকে পূরবর্তী রোমান্টিক ও নন্ ডেমোক্রাট যুগের সর্বশেষ সুপরিণত অধ্যায় বলা যেতে পারে। এঁর কল্পনারাজ্যের নাগরিক হচ্ছে খুব সামনে থেকে দেখা পাহাড়, ঝর্ণা, নদী, বরফ, লতাপাতা, গাছ, গ্রাম, মাঠ, বন।

গোগোল (জঃ ১৮০৯—মৃঃ ১৮৫২):

নিম্নস্তরের চরিত্রগুলির সঙ্গে গোগোলের যেমন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে তেমনি আছে অসীম সমবেদনা। যাকে যেমন অবস্থায় দেখেছেন সেইভাবে তাদের সামগ্রিক আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন। গোগোল নিজেও ছিলেন সহানুভূতির অধীন, তাই পুশকিনের সৌহার্দ ও বন্ধুত্বে সাহিত্যজীবন শুরু করেন। তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার চৈতন্যকে সেক্সপীয়ার বা কালিদাসের মতো কল্পনার রঙিন জালে বুনে সীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি করেননি।

রুশ সাহিত্যের প্রাণশক্তি রিয়ালিজমের জন্মদাতা গোগোল। সাহিত্যের বিষয়বস্তুকে প্রথম উচ্চমঞ্চ থেকে নিয়ে এসেছেন অপাংক্তেয় সাধারণের মন্দিরে। তিনি কথা বলেছেন হাসতে হাসতে। সমাজের কদর্যতা, বিকৃতি, অশালীনতার কথা বলেছেন খুব সাধারণভাবে।

গোগোলের জন্ম সেরোচিণ্টাস্কিতে, ১৮০৯ সালে, সম্ভ্রান্ত ইউক্রেনীয় কসাক পরিবারে। এঁর জীবন বড় বিচিত্র। প্রথম রচনা একটি কবিতা। দারুণ আক্রমণাত্মক সমালোচনা হয়। রাগ করে আমেরিকা

চলে যান আবার ফিরেও আসেন। এঁর 'তারাস্ বুলবা' ও 'ওভারকোট' বিখ্যাত ছোট গল্প। ওভারকোট গল্পটি আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের এক আত্মা, এক কেরাণীর স-করুণ জীবনছবি। এঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'ডেথসোল'। গ্রামজীবন ও পল্লী-প্রকৃতির অপূর্ব চিত্র এঁকেছেন—যা আমাদের দেশের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পল্লী-প্রকৃতি রচনাগুলি বা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর অন্তজীবনের একটি দুর্লভ অনুভূতির অমৃত স্পর্শ লাভ করেছে উপন্যাসের প্রতিটি ছত্র।

আশ্চর্য এই জীবনীকার গোগোল তাঁর সমস্ত রচনাগুলি ধর্ম-ক্ষেপামির সংস্পর্শে এসে নষ্ট করে ফেলেন। রোমান্টিসিজমের সঙ্গে ট্রুথ লাইফের অপূর্ব সংযোজনে গোগোলের সাহিত্যমালা সমৃদ্ধ।

১৮৩৬ সালে রচিত 'ইনেস্পেক্টর জেনারেল' রুশ কমেডির মধ্যে অন্যতম। চমৎকার বিদ্রূপ। ভারতবর্ষের ফিল্মে এই বইটি 'থানা থেকে আসছি' এই না[illegible] দেখানো হয়েছে।

টলষ্টয় (১৮২৮—১৯১৭):

১৮২৮ সালে ইয়াস্নায়া জমিদারের উচ্চ বংশে এঁর জন্ম। কজোন ও মস্কোতে শিক্ষালাভ। ইনি চঞ্চল জীবনযাপন করতে করতে একসময় বিরক্তি ও ঘৃণাবশতঃ সৈন্যবিভাগে নাম লেখান। পরে পদত্যাগ করেন। এরপর শুরু হয় তাঁর সাহিত্যজীবন। কিছুদিনের মধ্যে আশ্চর্যভাবে তাঁর জীবনের পরিবর্তন হয়। ঘরে বাইরে বিরূপ সমালোচনা সহ্য করতে না পেরে তাঁর ষোড়শী কন্যার হাত ধরে রাস্তায় নামেন। সৈন্যবিভাগ থেকে পদত্যাগ [illegible] দেশে ফিরে— নিজের দেশের, নিজেরই জমিদারী, কৃষাণদের মধ্য থেকে তাদের সঙ্গে সমস্ত ভোগ ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে অতি দীন ও অহিংসভাবে দিন যাপন করেন। শেষে তাও ত্যাগ করে মেয়ের হাত ধরে পথে বের হন। কিন্তু পথেই একটি রেলষ্টেশনে পীড়িত হয়ে মারা যান। এঁর জীবনও বড় বৈচিত্র্যপূর্ণ। রচনাও বৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রত্যেকটি লেখার মধ্যে রয়েছে জীবন মতবাদ। যা রবীন্দ্রোত্তর যুগকে বাদ দিয়ে অধুনা আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রতীয়মান। 'ওয়ার এণ্ড পিস,' চাইল্ড হুড, বয় হুড, অ্যানা কারানিনা, রেজারেকশন, ট্রাৎ পিলগ্রিমস্ ইন আর্ট, সিবাষ্টোপল এবং বিখ্যাত রচনাগুলির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। ইনি জগদ্বিখ্যাত রুশ লেখক।

গোর্কী (জ: ১৮৮৬—মৃ: ১৯৬৩ :

গোর্কীর পুরো নাম এলেক্সি ম্যাক্সিভিচ পেশকভ। ইনি আছেন রুশ সাহিত্যের প্রথম সারির প্রথম চিহ্নে। অধঃপতিত সমাজ, সর্বহারাদের প্রতি লেখকের আন্তরিক দরদের গভীর আস্বাদন প্রতিটি রচনার মধ্যে। গতিশীল সামাজিক পরিবর্তনকে তিনিই স্বীকৃতি দিয়েছেন। স্বজাতপ্রীতি, লোকসংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন। মানুষকে ভালবেসেছেন। খুব সাধারণ একজন মানুষ থেকে একদিন জগদ্বিখ্যাত প্রতিভাবান লেখক হিসেবে গণ্য হয়েছেন।

গোর্কীর পিতাব মৃত্যু হলে মা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন এবং ওঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। পিতামহের ঘরে অতি দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হন। দারিদ্র্যের জন্য মাত্র নয় বছর বয়সে রুজি-রোজগারের চিন্তায় কর্মক্ষেত্রে নামতে হয়। কখনো ডকশ্রমিক, কখনো ফেরিওয়ালা, কখনো কুলীর জীবনের মধ্য দিয়েও এঁর প্রতিভা প্রকাশ পায় পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে। সুনাম আর যশ বিখ্যাত করে তুললো [illegible]র পাশাপাশি সাহিত্যচর্চ্চার মাধ্যমে।

অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করতেন না। এরপরে যোগ দেন সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলে এবং

বন্দী হন। ১৯০৫ সালে বিদ্রোহী সাম্যবাদী দলে যোগ দেন। রাশিয়া বিজয়ের পর তাঁকে বিশেষ পদে অভিষিক্ত করা হয়।

এঁর নিপীড়িত জনগণের ওপর লেখা বিখ্যাত উপন্যাস 'দি মাদার'। বিখ্যাত 'চেলকাশ' ও 'রোমান্স' গল্প দুটির মধ্যে অপূর্ব রিয়ালিজমের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। ট্রাজেডিকে পরিতুষ্টি ও ভয় দু'ভাবেই দেখিয়েছেন। Abercrombieয়ের মতানুসারে Tragedy satisfies us even in the moment of distressing। গোর্কীর ক্ষেত্রে একথা বাস্তবিকই সত্য। পাঠকের চোখ অশ্রুতে আপ্লুত হওয়ার পূর্বেই তা শুকিয়ে জমাট বেঁধে যায়।

ফিওডর সোলেগাব (জ: ১৮৬৩—মৃ: ১৯২৭) :

বর্তমান লেলিনগ্রাডে এঁর জন্ম, ১৮৬৩। এঁর আসল নাম ফিওডর কুজামিক টেটাঁনিকভ। মা করতেন পরিচারিকার কাজ। মায়ের মনিবের কাছে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। শিক্ষকতা করেন পঁচিশ বছর।

১৮৯০ সাল থেকে রুশ সাহিত্যের চরম বিকাশের যুগ। সোলেগাবের জনপ্রিয়তার কারণ সৌন্দর্যবাদ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধ। এঁর সাহিত্যে অনেকে হৃদয় ধর্মের কথা বলেছেন। এ কথা বলে তাঁকে অবমাননা করা হয়েছে। দেখতে হবে হৃদয়ধর্ম যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তাকে অতিক্রম করে গিয়েছে কিনা! এর বিখ্যাত উপন্যাস 'দি লিটল ডেমন'। পল্লীজীবনের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনার মধ্যে রয়েছে বৃহৎ এক ফিলোজফিক্যাল সিমবল। কাজেই এর কাহিনী নিছক সেন্টিমেন্ট্যাল বলে উড়িয়ে দেওয়াটা ঠিক নয়।

সোলেগাব প্রোজ সিমবলিষ্ট লেখক। উপ[illegible] নাটক ও অনেকগুলি ছোট গল্প আছে। স্বদেশী রচনার প্রথম সারিতে এঁর নাম।

আলেকজাণ্ডার পুশকিন (জ: ১৮৭০—মৃ: ১৯৩৮) :

চরিত্রচিত্রণে স্পষ্টবাদিতা, বাস্তবতা ও নির্মম নৈপুণ্য কুপ্রিনের রচনায় বিদ্যমান। সমাজ, পরিবার, প্রেম, ত্যাগ, ভালবাসা, বিশ্বাসের সবকিছু কাঠামো বদলে দিয়েছে এঁর লেখায়। ১৮৯০ সাল থেকে রাশিয়ায় নবজাগরণ শুরু। অনেক মূল্যবোধ ও আচার, ধ্যান-ধারণা যে অচল তা' কুপ্রিনের লেখাগুলি পড়ে অনুধাবন করা যায়। গোর্কীর মতো ইনিও সাম্যবাদে দীক্ষিত। কুপ্রিন গোর্কী ও টলষ্টয়ের মতো প্রগতিপন্থী না হলেও প্রাচীনপন্থী ছিলেন।

এঁর লেখাতে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও করুণ বিচিত্র রসের টইটম্বুর উচ্ছ্বাস দেখা যায়। এনার জীবনধর্মী রচনাগুলি ঘটনাবহুল ও অত্যন্ত স্পিডী। রাশিয়ায় ইনি অত্যন্ত জনপ্রিয়। কুপ্রিনের দর্শন, সে দর্শন পরিবেশন করতে যতো ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও রসিকতা, হৃদয়রসের শর্করা সংযোজন করুক না কেন, সে দর্শন নিরবিচ্ছিন্নভাবে মনুষ্যপ্রেম।

ইসাসা পতিতাদের জীবন নিয়ে বিখ্যাত উপন্যাস সাশা, দি লাইফ লিভার বিখ্যাত রচনা।

বরিস লাভ্রেনিওভ (জ: ১৮৯১) :

হের্সন শহরে জন্ম। ইনিও রাশিয়ান সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রাচীন পুরুষদের ভেতর থেকে নির্বাচিত হতে পারেন। এঁর লেখায় জীবন স্ব-বিরোধ রোমান্টিসিজমের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে অসাধারণ জীবনবোধ। উপন্যাস কবিতার চেয়ে ছোটগল্পে ও কাহিনীর লেখক হিসেবে'এর খ্যাতি প্রচুর। নাট্যকার হিসেবেও জনপ্রিয়। ইনি গণতন্ত্র অনুরাগী, লাল ফৌজের সার্থক সমর্থক। সামরিক বিভাগে কাজ করার সময় রুশ সৈন্যের সাহচর্য ও সহানুভূতি সম্পন্নের জলন্ত প্রমাণ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রথম কবিতা রচনা করেন। বিখ্যাত একটি হৃদয়গ্রাহী বাস্তব গল্প নাম্বার

ফোরটি ওয়ান। রোমান্টিক বলিষ্ঠ চরিত্র, অসাধারণ উপস্থাপনায় গল্পটি বাস্তব জীবনবোধে অপূর্ব। গল্পটি বিয়োগান্ত।

মারিউৎকা সামান্য এক জেলে মেয়ে। দু'জন প্রেমাস্পদ। দু'জনেই তরুণ বলবান। একজন স্বার্থপরতার উর্দ্ধে, মানবিক প্রেমের চেতনায় আচ্ছন্ন। অন্যজন ব্যক্তি চেতনায়, নিজ স্বার্থে আচ্ছন্ন। ওদের মধ্যে একরকম প্রতিযোগিতা জাগে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ওরা এক নির্জন দ্বীপে চলে যায়। অনিচ্ছাকৃত প্রতিযোগিতার হাতিয়ার হিসাবে ওরা রক্তবিন্দু দিয়ে নিজ নিজ মত সমর্থন করতে তুলে নেয় অস্ত্র। অশিক্ষিত জেলে মেয়ে নিঃস্বার্থ অনুসরণে শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দেয়; পালিয়ে-আসা নির্বাচিতের নিরাপত্তাকে ঘৃণা করে। লেখক সবসময় মেয়েটির সমর্থনে। দুই বৈরী বিশ্ববীক্ষার মধ্যে এক বৈপ্লবিক সংগ্রামে ধ্বংস পায় তরুণ দুটির সুন্দর চরিত্র। যুক্তিহীন এক সেকেলে আদর্শের সংঘাতে অপরিহার্য এক মূল্য দিতে হলো তাদের ভাগ্যকে। রুশ সাহিত্যিক প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ জীবনদর্শী। অবশ্য আমি যে ক'জনকে জানি তাঁদের সাহিত্য অনুভব করেই বলছি।

এ্যান্টন প্যাভলভিচ শেখভ (জঃ ১৮৬০—মৃঃ ১৯০৪):

শেখভের জন্ম টাগানরভে। মার্জিত ও সমৃদ্ধ এর গল্পগুলি। সাইকোলজির চেয়ে এর গল্পে চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। বিখ্যাত গল্প কোরাস গার্ল, ডার্লিং, স্কুল মিস্ট্রেস, নাইটমেয়ার, ডুয়েল, পার্টি হ্যাপিনেস প্রভৃতি গল্পের সংখ্যা অনেক। বিখ্যাত উপন্যাস, মাই লাইফ। চেরি অর্চার্ড্ সুবিখ্যাত রূপকধর্মী নাটক। জীবনের বিচিত্র মুহূর্ত ও নানান চরিত্র নিয়ে জীবন-দর্শনের সবল সুন্দর চমৎকার গুচ্ছ। শেখভের গল্প উপন্যাসের কেন্দ্রমূল বিশেষ আবেগ বা মুড। সহানুভূতি আছে দুর্বল, দীন, অবহেলিত ও উৎপীড়িতদের প্রতি। তিনি সুন্দর, সবল, দৃঢ় ও সরল করে এঁকেছেন তাঁর নরম তুলির টানে প্রতিটি চরিত্র।

লেখক ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসা ধরেননি। তাঁর রচনার বিশেষত্ব বেদনা, ব্যথা, কান্না, হতাশা নয়। মুডি লেখক বলে এর লেখায় বেদনাকে জয় করার জবরদস্ত কারবার নেই।

শেখভের রচনা পড়ে তাঁর জীবনাদর্শের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করে বলতে ইচ্ছা করে:

ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার
চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার
সে তো নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা—
এই তোর নবউৎসবের আশীর্বাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।—রবীন্দ্রনাথ

সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি বোধহয় একেই বলে। ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে আছে জীবন, দর্শন, সত্য সবকটি উপাদান। তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে কারো তুলনা করতে চাই না। সত্য মানুষকে বলিষ্ঠ ও ভদ্র করে। মানুষ এবং সাহিত্যের সম্পর্ক তাই একই সত্য, সুন্দরকে প্রকাশ করা। সত্যভিত্তিক সাহিত্য চিরকালই বরণীয়, সমৃদ্ধ, আদরণীয়। বেনারসী শাড়ীর মতো দামী, উজ্জ্বল ও যত্নের প্রতীক। রুশী সাহিত্য পৃথিবীতে তাই এতো আদরণীয়, বরণীয়, জীবনের সঙ্গে একাত্ম। তাই পৃথিবীর সর্বত্র রুশী সাহিত্য সর্বজনীন মর্যাদা, সম্মান ও আন্তরিক সমর্থন ... করেছে।

০ ০ ০

ভূমধ্য সাগরের তীরে

মিসেস রীণা দত্ত

এখানে কি মিস ফিলিপাইন, মিস্ নিউজিল্যাণ্ড, মিস্ আমেরিকা ইত্যাদি সুন্দরীদের একত্রে আহ্বান করা হয়েছে সূর্য্যস্নান করার জন্য স্পেনের সমুদ্রতীরে ৷ অনেকক্ষণ প্রকৃতির সৌন্দর্য আর মানুষের দেহ সৌষ্ঠব দেখে ভাবছিলাম—
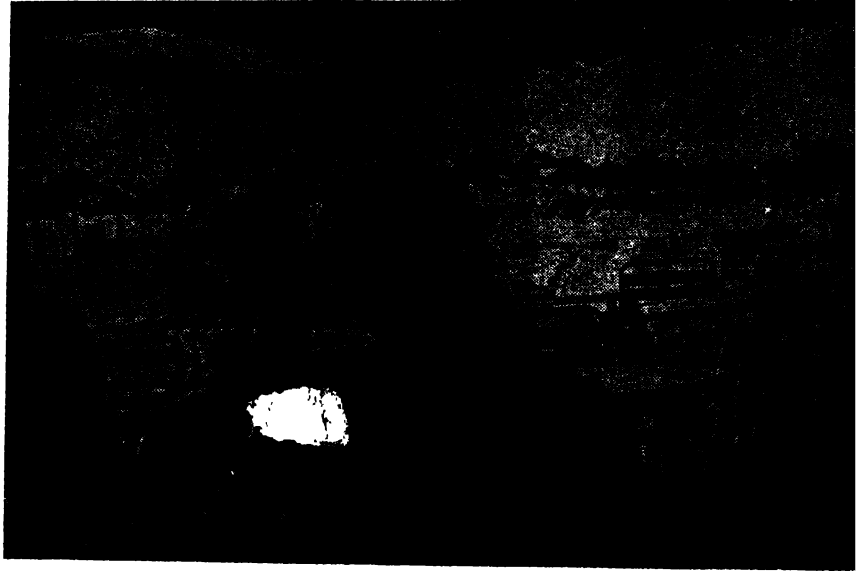
O স্পেনের সমুদ্র সৈকতে জনৈকা বিদেশিনীসহ লেখিকা

'সাগরজলে সিনান করি
সজল এলোচুলে
বসিয়াছিলে উপল উপকুলে ।'

লণ্ডনের 'গ্যাট উইক' এয়ার পোর্ট থেকে স্পেনের পথে পাড়ি দিলাম 'মোনোরেলে' চেপে প্লেনের দোরগোড়ায় । আর দরজার মধ্যে ঢুকেই 'ড্যান এয়ার'-এর বিমান-সেবিকার হাতছানি । লণ্ডন থেকে স্পেনের '[illegible]-র দুরত্ব মাত্র দু'ঘণ্টা হাওয়াই জাহাজের দৌলতে । স্পেনের মাটি যখন স্পর্শ করলাম তখন লণ্ডন সময় রাত দুটো আর স্পেনে ভোর চারটে । শুকতারা সবে আঁখি মেলে চাইছে । আমাদের ট্রাভেল কোম্পানীর বাসের সেবিকা প্রত্যেককে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে-দিলেন । 'যাত্রীদের মধ্যে এক সাহেবকে দেখি লাগেজটা বাসের মধ্যে রেখেই নিজের স্যুইট-এ প্রবেশ করার আগেই সমুদ্রের জলে প্রবেশ করলেন একটুকরো ব্রীফ পরে । [illegible] মনে বোধহয় আশঙ্কা ছিল সমুদ্রের জল যদি শেষ হয়ে যায় অগস্ত্য মুনির গণ্ডুষ পানের ফলে । অথবা সাগর সুন্দরীরা যদি রাতারাতি বেলা-

ভূমিকে বয়কট করেন। সেই সময়ও আমাদের চোখে পড়েছে প্রচুর ছেলেমেয়ে নাচগান সেরে নিজের নিজের হোটেলে ফিরছেন। অবশেষে বাহন এসে দাঁড়ালো আমাদের টেমপোরারী সুইট হোমে—'হোটেল সলিমার'। ম্যালেরকা রাজ্যে অবস্থিত এই 'এল অ্যারিনাল' শহরটি পালামা এয়ারপোর্ট থেকে ১২ কিমি. দূরে গিয়ে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। হোটেলের নাড়ী টিপে বুঝলাম যে আমাদের এখানকার যে কোন নামী স্টার হোটেলের সঙ্গে পাল্লায় বসালে স্পেনের এই সাধারণ হোটেলটির ওজনই হবে ভারী। প্রাসাদোপম হোটেলের সুদৃশ্য লাউঞ্জে বিরাট মূল্যবান সোফার ছড়াছড়ি। সঙ্গে রঙীন টিভির পর্দায় রংবেরঙের অনুষ্ঠান। আরেক প্রান্তে রকমারী ভি. ডি. ও গেমসের সাহায্যে অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা। তারি একপাশে বার ও রিসেপসনিষ্ট। একেবারে অষ্টমতলে অষ্টম-প্রহর সুইমিং পুলের হাতছানি। রিসেপসনিষ্ট মিষ্টি-মুখের মিষ্টি হাসি দিয়ে ওয়ান ফোর্থ স্প্যানিশ ও থ্রি ফোর্থ ইংরাজী মিশিয়ে জানিয়ে দিলেন আমাদের রুমটি ফিফ্‌থ্‌ ফ্লোরে আর হাতে দিলেন চাবি। রুম নম্বর নিয়ে অটোমেটিক লিফটের কৃপায় প্রবাসজীবনের আস্তানায়। ঘরের ভেতর টেলিফোনসমেত দুগ্ধফেনিল শয্যা আর সুন্দর সংলগ্ন টায়লেটে টিস্যু পেপার, গরম জল, ঠাণ্ডা জল আর বাথটাবের সমারোহ। প্রাতরাশের টাইম ছিল আটটা থেকে দশটা। তার মধ্যে না গেলে ডাইনিং রুমে শুধু চেয়ার টেবিলের দেখাই মিলবে। প্রার্থিত জিনিষটি চাইলেও বরদানে দেবী হবেন বাম। কারণ ডিউটির সময়ে বোর্ডারের সহযোগিতাও ওঁরা ডিউটি বলে বোধ করেন। ডিউটি আওয়ারের মধ্যে গেলে আপনার ফার্ষ্ট ব্রেক করার মধুর ধ্বনি পাবেন তাঁদের আতিথেয়তায়। বান্‌, বাটার, চিজ, জ্যাম, হানি, দুধ এবং চায়ের মেলায় পছন্দ অপছন্দ সম্পূর্ণ আপনার। খাবার ঘর থেকে লাউঞ্জে নেমে দেখি একজন স্প্যানিশ ভদ্রমহিলা এসেছেন স্পেনের দ্রষ্টব্য স্থানগুলোর মহিমা শোনাতে। কোন্‌দিন কোন্‌জায়গা দেখানো হবে তার একটা সুন্দর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে, মধুর হেসে প্রত্যেককে ওয়াইন পরিবেশন করে টা-টা করলেন। সেইসঙ্গে জানালেন যে দুপুরের ভোজ এই 'সলিমারে' নয়, পাশের হোটেল 'স্যানডিয়াগোতে'—একটা থেকে দুটোর মধ্যে। এই 'স্যান-ডিয়াগো' 'সলিমারের' আপন বোন, সুতরাং দুজনের মালিক একই। আর রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করবে ছোট বোন সলিমার—আটটা থেকে নটার ভেতরে।

রাস্তায় বেরিয়ে দেখি—

"নিরাবরণ বক্ষে তব নিরাভরণ দেহে
চিকন সোনা লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।"

ভারতবর্ষীয় চোখ ও মন কিছু সময় নিল ধাতস্থ হতে [illegible]কার টপ্‌লেশ দৃশ্য দেখে। আর যে সব মহিলারা [illegible]লেশ নন্‌ তাঁরাও কিন্তু কাপড়ের ইকনমি করে পরে আছেন বিকিনী। যেন পুরুষ আর মহিলারা রোদ মাখার প্রতিযোগিতায় নেমে গেছেন, দেহের সর্ব অনাবৃত অঙ্গে সূর্য্য কিরণ লাগিয়ে চামড়ার পুষ্টিবিধানের জন্য। সেই অবস্থাতেই কারুর দিকে দৃষ্টিপাত না করে তাঁরা তাঁদের কেনাকাটা, খাওয়া, সমুদ্রের ধারে বসে, শুয়ে ম্যাসাজ করছেন এবং মাঝে মাঝে নীলসাগরের হাতছানিতে সাড়া দিয়ে তার বুকে খানিক খেলা করে আসছেন। আবার বেলাভূমিতে ফিরে গল্প—সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত। প্রায় সব বিদেশী মেয়েরাই এসেছেন কেউ বয়ফ্রেণ্ড, কেউ স্বামী বা কেউ গার্ল-ফ্রেন্ডের সাথে 'ট্যার্ণ অয়েলের' প্রলেপে সূর্য্যস্নান করে কাটাতে এই ট্যান অয়েল সাদা রঙকে করে উজ্জ্বল বাদামী আর আনে এক মসৃনতার পরশ। যেন সমুদ্রের মাঝে ও তার আশে পাশে নানা দেশের

প্রতিযোগিতা লেগেছে কার দেহ কত সুন্দর এবং তন্বী তা দেখাবার জন্য। আমাদের অনভ্যস্ত চোখও সুদূর ইংল্যান্ড, জার্মানী, হল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, আমেরিকা, নরওয়ে প্রভৃতি প্রায় সমস্ত পৃথিবীর ক্রশ সেক্শনে এইভাবে নগ্ন সূর্যস্নান দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তাদের দেশে কিছুরই নেই অভাব সূর্য্যালোক ছাড়া। ভাবছিলাম রবীন্দ্রনাথকে—

"সেই যেখানে উর্বশী উঠছে সমুদ্র থেকে
তারপরে বালির পরে বসল পাশাপাশি
সামনে দুলছে নীল সমুদ্রের ঢেউ
আকাশে ছড়ানো নির্মল সূর্য্যালোক।"

এইভাবে সমুদ্রতীরে প্রত্যেকদিন নিত্য নূতন মানুষদের দেখতে দেখতে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমিই এদের মধ্যে একমাত্র শাড়ী পরিহিতা। এই পরিবেশে নিজেকে মনে হচ্ছিল যেন অন্য গ্রহের মানুষ। তাই স্বভাবতই বহু বিদেশী এবং বিদেশীনি আমার ছবি তাঁদের মুভিক্যামেরায় এবং টেলিস্কোপিক ক্যামেরায় বন্দী করে নিয়েছেন।

এখানে সব থেকে অসুবিধে লাগছিল ভাষার। কারণ স্পেনের মানুষেরা জানেন না ইংলিশ, জানেন শুধু স্প্যানিশ এবং মিউজিক। স্পেনে আমাদের এখানকার মতন বা লণ্ডনের মতন ট্যাপওয়াটার কেউই খাননা। কারণ জলে নাকি কোন রাসায়নিক তারতম্য আছে যা স্বাস্থ্যের অনুপযোগী। সেটা অজানা থাকায় প্রথম দিন লাঞ্চে অনবরত ইংলিশে ষ্টুয়ার্ডদের অনুরোধ করছি খাবার জল দেবার জন্য। কিন্তু সবাই দেখি জলের বদলে মিষ্টি হেসে দিয়ে পাশ কাটাচ্ছেন। শেষে নানা ইশারার সাহায্যে বোঝাবার পর 'খামুস আপের' বোতলের মাপে এক বোতল জল দিলেন। নাম 'মিনারেল ওয়াটার' এবং তার সঙ্গে একটা বিল—'চল্লিশ পাসাতো'। লণ্ডনের টাকা পয়সা যেমন পাউণ্ড ও পেন্স ওরা বলে পাসাতো। একশো পাসাতো মানে পঞ্চাশ পেন্স বা আধ পাউণ্ড বা ভারতীয় আট টাকা। ভাষা বিভ্রাটে আরেকটা মজার অভিজ্ঞতা ঘটেছিল। সমুদ্রতীরে শায়িত সানবাথ বেডগুলো সূর্য কিরণের মতই বিনা মূল্যে পাওয়া যায় ভেবে যখন শুয়ে আমেজ বোধ করছিলাম তখন ছন্দপতন ঘটালো কেয়ার টেকারের বিল—আশি পাশাতো। তবে তার পরে কেয়ার টেকারকে ডোন্ট কেয়ার করেও সূর্য্যদেবের দান পেয়েছি অফুরন্ত—সোনালী বালির বিছানায়।

এইভাবে ঘোরা, খাওয়া ও ভাষার বৈচিত্র্যময় দিনগুলো থেকে একটা দিন গেল 'বুলফাইট' ও 'ফ্লেমিংগো ডান্স' দেখতে। পৃথিবীখ্যাত বুলফাইট স্পেনের জাতীয় খেলা আর জাতীয় নাচ ফ্লেমিংগো এ দেশের ভারত নাট্যম্। বুলফাইট দেখে মানুষের শক্তি ও বুদ্ধির উপর বিশ্বাস আরও বেড়ে গেল। এক একটা ষাঁড় পাঁচশো থেকে সাড়ে পাঁচশো কেজি ওজনের। এইসব বিশালাকারদের সঙ্গে লড়াই করা সত্যিই দুঃসাহসিক। আর যাঁরা লড়াই করছেন তাঁরা সবাই সুন্দর, স্লিম এবং প্রচণ্ড চটপটে। আমাদের দেশে যেমন সারকাসে বাঘসিংহের খেলা হয় খাঁচার ভেতরে, বুলফাইট কিন্তু হয় অতি প্রশস্ত ঘেরা প্রান্তরে দর্শক পরিবৃত গ্যালারীতে। প্রথমেই একটা বুলকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ওই জায়গায়। সঙ্গে আবির্ভূত হন বুল ফাইটার। বুলটাকে লাল কাপড় দেখিয়ে রাগানোর পরই দুজন ঘোড়সওয়ার বর্ম পরিহিত ঘোড়ায় চড়ে দুটো বর্শা নিয়ে ঢোকেন এবং ষাঁড়টির শিরদাঁড়ায় আঘাত করার চেষ্টা করেন। এইভাবে বার বার চেষ্টায় বুলের পিঠে বর্শা গেঁথে যায় এবং ঘোড়সওয়ার নেয় বিদায়। এই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ষাঁড়টি প্রচণ্ড ক্ষেপে নিঃসঙ্গ পদাতিককে শিং দিয়ে যতই এফোঁড় ওফোঁড় করবার চেষ্টা করেন ততই ওই যোদ্ধা নানা কায়দায়

সরে যান আর লাল কাপড় দেখান। যখন ষাঁড়টি ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছোয়, বুলফাইটার দুটো ছোট বর্শা মেরুদণ্ডের দুপাশে ঢুকিয়ে দেন। এইভাবে ছটা থেকে আটটা বর্শা বিদ্ধ বুলটা পিঠে রক্তক্ষরিত অবস্থায় টলতে টলতে মাটিতে পড়ে যায় আর গ্যালারী থেকে ওঠে হাতের হর্ষধ্বনি। দুটো ঘোড়া এসে বুলটাকে টেনে বাইরে নিয়ে যায়। তবে মাঝে মাঝে যোদ্ধাও আহত হন ষাঁড়ের শিংয়ের গুঁতোয় আর তখন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন আরেকজন ফাইটার। এটা আপাতদৃষ্টিতে নৃশংস হলেও শিক্ষা ও বীরত্বের পাঞ্চ থাকায় খুবই ইনটারেসটিং। কারণ এদেশের ষাঁড়েরাও খাঁড়ার আড়ালে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বীরত্বের সঙ্গে মৃত্যু বরণকেই বেশী কাম্য বোধ ক'রে বলে মনে হয়। তারা জানে নিঃশেষে প্রাণ দান করে যে তার ক্ষয় নেই। বরং ক্ষয়পূরণ করতে এইভাবেই বীফের ষ্টিক হয়ে চলে আসে ডিনার টেবিলে।

এবার রক্তারক্তি ছেড়ে দিয়ে চলুন যাই একটু নাচের ফ্লোরে। এখানকার ফ্লেমিংগো ডান্স আমাদের ভারত নাট্যমের মত স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। স্প্যানিশ ছেলেমেয়ে উভয়েই নাচে আর সঙ্গে থাকে স্প্যানিশ গীটার আর বিউগলের মত বাঁশি। মেয়েদের নাচের পোশাক সত্যিই অবাক করে। বিরাট ঘের দেওয়া এবং কোমর থেকে পা পর্যান্ত থাক থাক কুঁচি দেওয়া গাউন, পায়েতে পিন্ পয়েণ্টেড হাইহিল জুতো আর কানেতে দুল। একহাতে থাকে কাঠের তৈরী ছোট বিশেষ বাদ্যযন্ত্র। নাচের সময় ওরা মুখে সামান্য আওয়াজ করেন মাঝে মাঝে। আর আরেক হাত দিয়ে গাউনটা নানা কায়দায় তুলে ধরেন হরেক ফুলের আকারে। ছেলেরা নাচেন টাইট প্যাণ্ট, কোট, বো এবং টুপি পরে। তাঁরাও নাচের সময় টুপিটা নানা কায়দায় খোলেন পরেন। এইসব দেখতে দেখতে বারম্যান হবেন হাজির এবং আপনাকে ওয়াইন দিয়ে যাবেন এক বোতল করে। চোখের সঙ্গে মুখও চলবে আর নাচের সঙ্গে বোতল। গ্লাসের টুংটাং শব্দ ভালই সঙ্গত করবে। গিয়েছিলাম ট্যাক্সিতে এসে-ছিলাম বাসে সমুদ্রের ধার দিয়ে অ্যাবিনাল পর্য্যন্ত। বাসগুলো এতই সুদৃশ্য, ফাঁকা ও আরামদায়ক যে আমাদের অনভ্যস্ত চোখ হঠাৎ ধাঁধিয়ে যায়।

আরেকদিন বারঘণ্টার প্রোগ্রাম নিয়ে বেরিয়েছিলাম ট্রাভেল কোম্পানীর বাসে করে কন্‌ডাক্টেড ট্যুরে—পারলফ্যাকটরী, ক্রিষ্টাল কেভ ও ওলিভ আর্ট। সকাল সাতটায় হোটেলের সামনে থেকে যাত্রা শুরু। এই টুরিষ্ট বাসটিতে অনেকটা প্লেনের মতন সিটের ব্যবস্থা। ড্রাইভারের হাতে বাসের দরজা বন্ধ ও খোলার সুইচ। তিনিই কাণ্ডারী—সব কিছু দেখা-শোনা করছেন। তবে সঙ্গে আছেন একজন মহিলা [illegible] হোটেল থেকে প্রত্যেককে ওয়েলকাম করছেন [illegible] দরজা পর্যন্ত। এইভাবে হোটেল অ্যারিনাল, হোটেল প্যারাডিস্‌কো, হোটেল স্যানফ্যানসিস্‌কো প্রভৃতি বিভিন্ন হোটেলের লাউঞ্জ থেকে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বয়সী সাহেবমেমদের হাসিমুখে জানাচ্ছেন কাউকে 'হ্যালো' কাউকে 'গুডমরনিং'।

প্রথমে গেলাম ক্রিষ্টালকেভ। দেশীয় নাম "কেভ ড্রাচ-ই-স্থ মস্" ঐ গুহার মধ্যে চোখ দিয়ে ছবি তোলাই নিয়ম। ক্যামেরার প্রবেশ অনধিকার। ভিতরে ঢুকে যা দেখলাম তার স্মৃতি ভুলে হয়ত থাকবো কিন্তু ভুলে যাওয়া অসম্ভব। গুহার মধ্যে চারিদিকে ঝুলছে স্বচ্ছ পাথর আপনার মাথার উপর, ডানদিকে, বাঁদিকে সামনে, পেছনে সর্বত্রই। বিশাল গুহার উজ্জ্বল স্ফটিক-মণ্ডিত ছাদ ও দেওয়াল যেন ময়দানবের সৃষ্টি। চারিদিকে এবড়ো খেবড়ো ক্রিষ্টালের মধ্যে থেকে সামান্য জল চুঁইয়ে পড়ে ভেতরে সৃষ্টি হয়েছে ছোট

ছোট হ্রদের। গভীর অন্ধকারের মধ্যে সেই লেকের জলের উপর ক্রিষ্টালের দেহ রঙবেরঙের ছোট টুনি দিয়ে করা হয়েছে স্বল্প আলোকিত। আর লাজুক প্রতিবিম্ব জলের তলায় ক্রিষ্টালকে ভালবাসছে। সত্যিই অপূর্ব, ভাষাতীত! ক্রিষ্টালের গুহার ভেতরে যেতে যেতে একসময় দেখি খানিকটা জায়গা চেয়ার দিয়ে সাজানো। একজন গাইড টর্চের সাহায্যে আমাদের বসতে সাহায্য করছেন ঠিক সিনেমা হলের মতন। আর জানিয়ে দিলেন যে আমরা শীঘ্রই স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করব। আমাদের সামনে প্রায় দুশো মিটার লম্বা একটা লেক তৈরী হয়েছে আর সেই লেকের জলে তিনটে বজরা আলোর স্রোতে পাল তুলে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে সুন্দর ছোট টুনির মালা পরে। আর প্রতি বজরায় চারজন সুসজ্জিত স্প্যানিশ যুবক যুবতী পিয়ানো, বাঁশী, স্প্যানিশ, গীটার এবং একরডিয়ানে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুরের [illegible] তুলে সমস্ত দর্শকের কানের ভিতর দিয়ে মরমে [illegible] করছে। মনে ভাবছিলাম গুহার অভ্যন্তরে বিন্দু [illegible] জলের সাহায্যে তৈরী হ্রদে সুসজ্জিত আলোকিত বজরায় 'গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে'। দেখে কিছু চিনতে পারার অবকাশ নেই—আলো আঁধারের খেলায়। বজরার অনুষ্ঠানটি ছিল মাত্র পনেরো মিনিটের জন্য। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মানুষের বৈচিত্র্যপূর্ণ রুচির মিলনের এক বিরল দৃষ্টান্ত। আলোর তরী চলে গেল—'ও আমার আঁধার ভালো'। কিছুক্ষণ পরে বজরার পুনরাগমন। মাইকে ঘোষণা হোল—

'আমি তরী নিয়ে বসে আছি হ্রদ কিনারে।
ওগো তোরা কে যাবি পারে।'

বেশীরভাগ দর্শকই গেলেন বজরায়। হ্র[illegible]লের উপর বজরায় আমরা, আর আমাদের উপর ঝুলছে রাশি রাশি অসমতল ক্রিষ্টাল বা স্বচ্ছ পাথর এবং ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে তার থেকে। প্রকৃতি মা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে স্বর্গীয় আনন্দের পরশ দিলেন তার জন্য সৃষ্টিকর্তাকে নত শিরে স্মরণ করলাম। বজরায় যেতে যেতে ক্রিষ্টালগুলোর স্পর্শ পাওয়ার জন্য হাত বাড়াচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম—

'এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়,
যে প্রাণ তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়,
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব দিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে।'

হ্রদের ওপারে গুহার বাইরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে পা দিয়ে স্বপ্নরাজ্য থেকে বাস্তবে এসেই 'ক্ষুধা' নামক দুটো দুর্বল অক্ষরের শক্তিশালী টান অনুভব করলাম। মন দিল সান্ত্বনা কিন্তু পেট করল জ্বালাতন। সুতরাং চলুন আমরা যাই এখন অলিভ আর্টে। সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে ড্রাম ড্রাম ওয়াইন। ফ্যাকটারীর দরজায় পা দেওয়া মাত্রই প্রত্যেকের হাতে একটা করে জলপাই কাঠের ছোট ওয়াইন গ্লাস ধরিয়ে দিচ্ছেন এক স্প্যানিশ ভদ্রলোক। ভিতরে দেখি টাপ লাগান সারি সারি ড্রাম আর তাতে লেবেলিং করা কোন্‌টা কোন্‌ ফলের সুরা। লেখা আছে চেরী, ম্যাকাও, ব্যানানা, পাম ইত্যাদি—কিন্তু নেই কোন মূল্য তালিকা। আমার দাদামণি ডাঃ হৃদয় ঘোষ ওয়াইনের মেলা দেখে প্রত্যেকটি টেষ্ট করতে লাগলেন আর আমাকে বললেন—'এইটা খা খুব টেষ্টি, ওইটা খা খুব মিষ্টি।' সে সময় সত্যিই আনন্দের সাগর হতে বাণ এসেছিল। কারণ বিনি পয়সার ভোজে ফ্যাকটারি কর্তৃপক্ষ অনেক লাইট এনটারটেনমেণ্টের ব্যবস্থা করেছেন। অনেকের কাছে ওটাই হয়ে গেল হেভী। এই অলিভ আর্ট ফ্যাকটরীর হাতে আছে পরশ পাথর যা দিয়ে অলিভ গাছের সামান্য গুঁড়ি থেকে বেরুচ্ছে অসামান্য সৃষ্টি। চেহারা তাদের বিভিন্ন। কেউ ট্রে,

অ্যাসট্রে, ফোটোফ্রেম, গহনার বাক্স আবার কেউবা খোদাই করা মূর্তি, কারুকার্য্য বা ওয়াইন গ্লাস। এইসব অমূল্য শিল্প কিন্তু ওয়াইনের মতো অ-মূল্যে যায় না পাওয়া। গায়ে লেবেল দেখেই বোঝা যায় কত পাসাতো। অলিভ ফ্যা টারীর ওয়াইন খাওয়ার পর খিদেটা বেশ জমে উঠেছে আর তা বুঝেই স্প্যানিশ গাইড ভদ্রমহিলা নিয়ে গেলেন একটা হোটেলের সামনে লাঞ্চের আহ্বানে। ওখানকার ডিস 'মোলাস্কা' বা ঝিনুক নিয়েছিলাম এক প্লেট। বেশ বড় বড় খোলাসহ সিদ্ধ করা মশলা ও শস্‌ যোগে অন্যান্য মেনুর সাথে লাঞ্চ হোল। 'যস্মিন দেশে যদাচার' : অনুসরণ না করলে বিদেশের বৈচিত্র্য পেটে ও মনে স্থান পাবে কি করে? আশেপাশের দোকানে স্পেনের বিখ্যাত চামড়ার জিনিষ দেখে আবার 'ইউরো' বাসে করে পথপ্রদর্শিকা নিয়ে চললেন ম্যানাকোরে অবস্থিত পৃথিবীখ্যাত 'ম্যাজোরিকা পাল ফ্যাকটারি'।

মুক্তো ফলের লোভে ধীবরের মত অতল জলে ঢোকার ক্ষমতা না থাকায় যেখানে ঢুকলাম সেটা হোল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুক্তোর কারখানা। অসংখ্য সাহেব মেম নীরবে কাজ করে চলেছেন। প্রথম অপারেশানে মুক্তো তৈরী করেছেন কিছু মেয়ে পুরুষ একত্রে। সেই মুক্তো কালচার করতে পাঠানো হচ্ছে আরেক ডিপার্টমেন্টে স্বয়ংক্রিয় মেশিনে। সেখান থেকে মুক্তো যাচ্ছে কারিগরদের হাতে—যারা কাল্পনিক মহিলাকে বলেছেন 'পরো পরো ডরলিং গয়না পরো'। আর গড়ে উঠেছে বিচিত্র সুন্দর হার, দুল, ব্রিষ্টলেট ইত্যাদি নানা অলঙ্কারের নানা ডিজাইন। আবার সেগুলি সাজাচ্ছেন কোনটা রুপোর সাথে, কোনটা বা রোল্ডগোল্ডের ওপর সওয়ার হবার জন্য। শেষে ওগুলো সুদৃশ্য বাক্সে বন্দী হয়ে চলে যাচ্ছে পাশের শো রুমে। শো রুমটা মুক্তোর হার দিয়ে এবং মুক্তোর নানা গয়না দিয়ে এত সুন্দর সাজানো যে মনে হচ্ছিল কোনটা মুক্তোর তৈরী গাছ, কোনটা মুক্তোর তৈরী নারীমূর্তি। অপরূপ, অভূতপূর্ব। এর মধ্যে থেকে কিছু কেনাকাটা করে চলুন তাড়াতাড়ি যাই বাসে করে ঘরের অভিমুখে। কারণ মুক্তোর যে এত আকর্ষণী শক্তি আছে তা বুঝলাম ভ্যানিটি ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে। ব্যাগটা ক্রমেই হালকা থেকে হালকাতর হয়ে যাচ্ছিল।

বাসের কথা ভাবতে না ভাবতেই দেখি বাস আমাদের ডাকছে। সারাদিনের মনোরম জায়গাগুলি দেখানোর পর বাহনটি আবার অস্থায়ী বাসস্থানে 'গুড নাইট' বলে প্রত্যেককে পৌঁছে দিল। তারপর শান্ত নীল সমুদ্রের ধারে বেঞ্চে বসে ভাবতে লাগলাম যে জিনিষ দেখলাম তা কি কখনো স্মৃতির মণিকোঠা থেকে মুছে যেতে পারে? এই সাগরে কী শুধু পার্থিব সম্পদের রাজত্ব? অপার্থিব সম্পদ বা চিত্তের খোরাক তার কিছু কম নেই। সাগর বেলায় শুধু ঝিনুকই কুড়োইনি, মুক্তোও পেয়েছি। ভাবতে ভাবতে মনের সাগরে তুফান উঠল।

স্পেনের বিদায়ী দিনে এলো বিদায়ী আমন্ত্রণ। লাউঞ্জের পেছনে, বিলিয়ার্ডের গা ঘেঁসে, লিফ্‌টের পাশে ধুলোর উপর বিছানো বিশাল তৃণের আঁচল। অনেক স্প্যানিশ ফুল সেই আঁচলের বুকে। 'বুফে ডিনারে' ছিল কন্‌টিনেন্টাল ডিশের ভীড়। মাইনস্ট্রোন স্যুপ থেকে রাশিয়ান স্যালাড, চিকেন অ্যালকিয়েভ. ফ্রেঞ্চ স্যানডুইচ থেকে স্কচ এগ, গ্রেপফ্রুট কক্‌টেল আর সুইডিশ অ্যাপেলপাই—কিছুই প্রায় বাদ ছিল না। মেনুগুলো যে মাল থেকে হয়েছে তৈরী তারা কেউ বিফ্‌, পর্ক, হ্যাম কেউবা মটন্‌, চিকেন, প্রণ, এগ বা মোলাস্কা। পাঠকের যেটা অভিরুচি সেটাই রইল উপহার—এই ভেবে যে লেখাটা মধুর না হলেও খাওয়াটা হোক মধুরেণ সমাপয়েৎ।

ঈশিতা ভাদুড়ী

খেলাঘরের কথা

'তুমি আসবে, না, আমি যাব ?'

লবণ হ্রদে দাঁড়িয়ে মনে মনে খেলছে অনন্যা।

মেঘাঞ্জন দূরে, কিছুটা দূরে।

'বলো মেঘ, তুমি আসবে; না, আমি যাব ?'

ধীরে ধীরে স্বগতোক্তি—'তুমিই এসো।'

নীরবে উচ্চারণ। তবু সেই হৃৎপিণ্ডে পৌঁছেছে বার্তা।

সে এল।

এসেই, "আপনি না একটা"...

চোখে চোখ রাখা হ'ল।

পুনরায় উচ্চারণ।—"আপনি না একটা"...

অনন্যা শুনছে—'তুমি না একটা'...

এবার তার প্রশ্ন—"কী ?"

—"অদ্ভুত"—শব্দটা যখন কানের মধ্যে দিয়ে বুকে গেল,—'অদ্ভুত'টা তখন কোন্ অদৃশ্য মায়াবলে 'পাগলী' হয়ে গেছে !

অর্থাৎ, 'তুমি না একটা পাগ্‌লী' !

চোখে চোখ রেখে উপলব্ধি।

লবণ হ্রদে দাঁড়িয়ে সেই ছেলেটি এবং সেই মেয়েটি, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে—লবণহ্রদ না হয়ে [illegible] গোবরডাঙাও হ'তে পারে। স্থান অথবা কাল গল্পের বিষয়বস্তু নয়। পাত্র পাত্রীও নয়।

ধরা যাক্, আমিই অনন্যা আর তুমি মেঘাঞ্জন। যেন, এই প্রচণ্ড বৃষ্টিতেই আমার তোমার কথা মনে পড়ছে ভীষণ। তাই স্মৃতির সুতো ধরে টানছি আমাকে, তোমাকে, সেইসব ঘটনাকে যে সব ঘটনা অনন্যা এবং মেঘাঞ্জনের জীবনে কখনো এসেছিল !

হঠাৎ ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। এত বৃষ্টি ! বৃষ্টি দেখলেই তোমার কথা মনে হয়। সেই চব্বিশে অগ্রহায়ণ কাছে আসে। তুমি সেদিন আমাকে একটা কবিতার বই দিয়েছিলে—"জলের কবিডর ধারে"—অত জলের মধ্যে—যথার্থ উপহার হয়েছিল ! সেদিন তোমার জন্মদিন ছিল। কি প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি ! তার মধ্যে আমাদের পাগলামি।

শিলা বল্ল—"না, মেঘাঞ্জন, আপনি একা এত খাওয়াবেন না।"

তুমি তৎক্ষণাৎ বল্লে : "আজ আমাকে খাওয়াতে দিন। অনন্যা জানে আজ আমি কেন খাওয়াতে চাই।" আমি তোমার দিকে তাকালাম। উপস্থিত সকলে আমাকে এবং তোমাকে দেখল। কেন ?

তখনো তো শুরুই হয়নি, কিংবা তার অনেক আগেই শুরু হয়েছিল !

কবে প্রথম আমরা দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়েছিলাম ! কবে প্রথম আমরা দু'জনে দু'জনের

কথা শুনেছিলাম। কবে প্রথম পরস্পরকে বুঝেছিলাম। কবে প্রথম।

সেই যে তুমি প্রথম যেদিন এলে, একটা মেরুণ আর কাল চেক শার্ট, চুল সাধারণভাবে আঁচড়ান। সেইদিনই? নাকি তার অনেক পরে?

জানো, সেদিন মহুয়া তোমার পুরানো একটা ছবি দেখে বলছিল, "মেঘাঞ্জনদা আগে অন্যভাবে চুল আঁচড়াত!"

'তোমার মনে আছে মেঘ? আমরা কোথা' থেকে ফিরে খুব ক্লান্ত হয়ে বসেছিলাম। তুমি নিজের চুলে হাত বোলাতে বোলাতে চুলটা অন্যরকম করে দিলে। আমি বল্লাম—"বেশ লাগছে তো!" ব্যস্, তারপর থেকে তোমার চুলের কায়দা বদ্‌লে গেল। মেঘ, সেই প্রথম?

নাকি, অন্যদিন? যেদিন আমরা, আমি, তুমি, আরো অনেকে লবণহ্রদে গিয়েছিলাম! ভাষণ শুনছি। আমার পাশে প্রবীরদা। তুমি এসে প্রবীরদাকে উঠিয়ে দিলে। বল্লে—"আমার জায়গা" (তোমার জায়গা কেন মেঘ? বলো মেঘ, তোমার জায়গা কেন? যদি তোমার জায়গা হয়, তবে আজ তুমি কোথায় মেঘ?)। আমি তোমার দিকে তাকালাম। তুমি আমার দিকে। এমন পূর্ণদৃষ্টিতে কি ছাখ তুমি?

ভাষণের পরে তুমি ঘাসের ওপরে শুয়ে আছো। তোমার পাশে সব্যসাচী, শেখর। আমি দূরে বসে। তুমি আমাকে দেখছো।

এবং আমি তোমাকে। তোমার গভীর দৃষ্টি, তোমার হাসি, তোমার কথা বলা···

তোমার মনটাকে ছুঁতে চাইছি—মন কোথায় থাকে, মেঘ? আবার সেই পুরানো প্রশ্ন। আমি বলি মন থাকে হৃৎপিণ্ডে, তুমি বল মগজে। আসলে কোথায় মেঘ?

ছাখো, এত বৃষ্টি হ'চ্ছে। আমার সামনে মহুয়া বসে। ও আজ বাড়ী যেতে পারেনি। এই বৃষ্টিতে কি করে যাবে? ওর সামনে বসে আমি তোমার সাথে কথা বলছি। তুমি কেমন আছ মেঘ? কতদিন দেখিনি তোমায়। হয়তো আর কখনো দেখবও না। তবু, ইচ্ছে হয়; এখনো।

তোমার মনে আছে, একদিন এসে বল্লে "অনন্যা, আমি কার্সিয়াঙে চাকরী পেয়েছি। ভাবছি চলেই যাই।" না, মেঘ, না। মন তাই বল্ল।

অথচ, মুখ কত ভণ্ডামিই জানে। অনায়াসে মুখ, জিহ্বা বল্ল—"ভালই তো।"

হায়! তোমার মত ছেলেও তখন বলতে পারল—"ভাল কিনা, সে তো চোখ বেশ বলছে।"

—কি কাণ্ড! তুমি কি আমার সবটুকু কেড়ে [illegible] সব তুমি জেনে নেবে?

[illegible] বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে এক রোববারের কথা [illegible]ল। বাড়ীতে বসে বৃষ্টি ঝ'রে যাওয়া দেখছি। মনে মনে ভিজছি। দু'জনেই। আমি বলছি তোমাকে—'অনেকদিন তোমার সেই নীল-সাদা শার্টটা পর না।'

—'অনেকদিন? কতদিন?'

হাসছি। দু'জনেই হাসছি।

এক সময়ে বৃষ্টি চলে গেল। তুমি এবং তোমার স্বপ্নটাও। পরেরদিন স্বপ্নে নয়, সত্যি, তোমার গা-এ সেই শার্টটা। এরকম আরো একদিন। আমি ভাবছি মেঘের গা-এ সেই ধূসর গেঞ্জিটা অনেকদিন দেখি না। পরেরদিন, ঠিক তার পরেরদিন গা-এ সেই [illegible]রতা। বিস্মিত হয়ে বলেই ফেললাম—"কালই ভাবছিলাম এই গেঞ্জীটার কথা"।

—"গেঞ্জীর কথা? আমার কথা নয়?

হাসলাম! শুধু হাসাহাসিতেই মিটে যাক্।

এই বৃষ্টি! মেঘাঞ্জন, মেঘ, হঠাৎ তোমাকে ভীষণ

দেখতে ইচ্ছে করছে! কেন যে এই অকারণ ইচ্ছে! বহুদিন তো সব শেষ হয়ে গেছে। শেষ?

সেইদিন?

সেই যে আমরা এক দঙ্গল ছেলে মেয়ে হাঁটছি। শেষে কোন সময়ে দু'জনে একা একা। (দু'জনে একা হওয়া যায়?) কানে এল—"এদিকে এলে আমার বাড়ী যেতে অসুবিধে হয়"। আমিই আছি পাশে। আমার উদ্দেশ্যেই উক্তি বর্ষণ।

"কে আসতে বলেছিল!"—নেহাৎই কথার পিঠে কথা।

সঙ্গে সঙ্গে—"উ-উ, তাই তো! কে আসতে বলেছিল!"

হুঁ, এ'যে একেবারে শিলাবৃষ্টি! আমাকেই বল্লে তো! কি আশ্চর্য! মনে মনে যা উচ্চারিত হয় সবই তোমার হৃৎপিণ্ড শোনে নাকি?

বল্লাম—"বাস এসেছে"।

—"আসুক", মিটিমিটি হেসে তাকিয়ে রইলে।

তাহলে মেঘ তুমিও? দু'জনেই খেলছি, তবু...

মেঘ, সেইদিন? নাকি, আরও আগে? সেই যে, আমি, তুমি, সব্যসাচী, সুপর্ণা হাঁটছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি। হাঁটছি। ট্রাম এল। সুপর্ণা উঠে গেল। সব্যসাচীও। আমরা মাটিতে দাঁড়িয়ে। আমি আর তুমি। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে। ট্রেন ছেড়ে দিল। আমরা উঠতে পারলাম না। উঠতে পারলাম না? নাকি, উঠলাম না? লুকোচুরি! আমার সঙ্গে তোমার? নাকি, নিজেদের সঙ্গেই?

আমাদের এই খেলাধুলায় সব্যসাচী নেমে এল। সুপর্ণা চলে গেল।

তুমি, আমি, মাঝে সব্যসাচী। ঘাসের উপর বসে আমরা তিনজন

তোমার হাতে দু'চারটে লাল পিঁপড়ে কামড়াল। আমারই সামনে তোমাকে কামড়াচ্ছে। অথচ, আমি চুপচাপ বসে। পিঁপড়েগুলোও তাড়াতে পারলাম না। নিদেনপক্ষে একটু হাত ছুঁইয়ে আরামও তো দিতে পারতাম! অথচ, তুমি প্রথম আমাকেই দেখিয়েছিলে। তোমার হাতটা আমার হাতের কাছেই প্রথম এনেছিলে। তবুও......

সেইদিন? কিংবা তার আগে, অথবা, পরে? অথবা, তার আগেও না, পরেও না, কখনোই না, কোনদিনও না?

কি জানি মেঘ! তবুও তো, এক আধটা জেদ, দু'চারটে অবাধ্যপনা, প্রচণ্ড টান। প্রশান্ত নীরবতা। তার মাঝে হঠাৎ যখনই মুখ তুলে তাকাই তখন তোমার চোখে একটাই কথা: 'এত ভুলও বোঝে মানুষ!'

আর এই চোখে: ভুল নয়। অভিমান। এটাও কেন বোঝে না মানুষ!

সময় পার হয় নীরব স্রোতে।

কে প্রথম কথা বলবে?

তুমি। না, আমি! না, তুমিই বল!

মনে মনে উচ্চারণ। সঙ্গে সঙ্গে 'অনন্যা......'

—আর কিছু জানি না।

শুধু তুমি এবং তোমার কণ্ঠস্বর——

"অনন্যা, অনন্যা অনন্যা...।"

কত কথা!

'অনন্যা, কাল সুপর্ণা আমাকে অপেক্ষা করতে বলছিল। আমি করিনি।' (তো কি? আনন্দে নাচি?)

আরো কথা। কত! অনেক। কথার পরে কথা। আরো কথা!

'অনন্যা, সেদিন আনন্দবাজারে সুনীলের 'অন্ধের ঝড়' গল্পটা বিষম ভাল ছিল'......

"অনন্যা, আমরা কি একসাথে 'মারীচ-সংবাদ' দেখতে যাব ?" (যাবো, যাবো, যাবো, তুমি যেখানে বলবে সেখানে।)

জানিনা মেঘ, শুরু অথবা শেষ কোথায়। তবুও-তো মনে মনে খেলা। এবং খেলতে খেলতে কখন এমন হয়ে গিয়েছিল : যে কোন ব্যাপারে পরস্পরকে সাক্ষী মানা, পরস্পরের চোখে চোখ রাখা, একসাথে হাসাহাসি......

তখন হয়তো ভেবেছিলাম :

এমনি করেই যায় যদি দিন যাক্ না

মন উড়েছে উড়ুক না রে......

অ্যাই জান, মহানির্বাণ মঠের সামনে একটা বিশাল গাছ পড়েছে। তাই ত্রিকোণ পার্কের সমস্ত বাস বন্ধ। আমরা, আমি আর মহুয়া হাঁটিতে হাঁটিতে গোল-পার্কে গেলাম। গোলপার্কটা পুকুর হয়ে গেছে। সেখান থেকে ঢাকুরিয়া। ঢাকুরিয়াতে তোমাদের সাধনের সঙ্গে দ্যাখা। তারপর আবার গড়িয়াহাট। এবং বাড়ী।

অনেকদিন দেখিনি তোমাকে।

তুমি কেমন আছ ? তুমি আদৌ আছ ? কখনো ছিলে ? কতদূরে আছ তুমি ? অনেকদিন দেখিনি তোমায় ? হঠাৎ ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। দ্যাখো, এবার অ্যাতো বৃষ্টি হচ্ছে, মনে হয় ভেসে যাব সবাই মিলে।

আর এই বৃষ্টি......

বৃষ্টি মানেই চব্বিশে অগ্রহায়ণ।

এবার চব্বিশে অগ্রহায়ণ কেমন কাটালে তুমি ? আমি তো সারাদিন, সারাক্ষণ চুপচাপ বসে অন্যান্য চব্বিশে অগ্রহায়ণ-এর কথা ভেবেছি। মেঘ দ্যাখো, সময় চলে যাবে ক্রমশ। আমার কটা সাধ তোমাকে জানিয়ে রাখি এখন ! তোমার পঞ্চাশ বছর পুর্তি উপলক্ষে তোমার সাথে আমার যেন একবার দেখা হয়। তোমার পঁচিশ বছরে আমি তোমার সাথে সারাদিন ছিলাম। পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনে আমাকে একবার ডেকো, মেঘ। আমি তোমাকে দেখতে চাই। আজ নয়, কাল নয়, পরশুও নয়। আজ থেকে অনেকদিন পরে তোমার পঞ্চাশ বছরের চব্বিশে অগ্রহায়ণ আমি তোমাকে একবার দেখতে চাই, মেঘ।

মেঘ, সব হয়তো বা শেষ হয়ে গেছে। সব পাগলামি, সব ভালবাসা (ভালবাসা শেষ হয় কখনো মেঘ ?), সব হাসাহাসি, তবুও ঘটনাগুলো তো থেকেই গেছে। একের পর এক সেগুলো হাওয়ায় ভাসে।

মেঘ, সেই ছেলেটা আর সেই মেয়েটার সেই কথনটা মনে আছে তোমার ?

ছেলেটা বলছে—'কাল আমরা একটা সিনেমা যাব।'

তৎক্ষণাৎ মেয়েটা বল্ল—'না'।

ছেলেটা বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। শেষে—কেন ?'

—'আমার ব্যারাকপুর থেকে একা রোজ রোজ আসতে ভাল লাগে না।'

ছেলেটা বলল—আমি গিয়ে নিয়ে আসব।'

আচ্ছা উন্মাদ তো ! মেয়েটা ভাবতে ভাবতে বল্ল —'যাওয়ার সময় তো একা যেতেই হবে।'

—'তা কেন ? আমি পৌঁছে দিয়ে আসব।'

—না।'

—'হ্যাঁ।'

তখন মেয়েটা কিছুই না বলতে পেরে বল্ল—'ধ্যাৎ।'

মেঘ, সেই ছেলেটা, সেই মেয়েটা হারিয়ে গেছে

বিপন্নতা/মনীষা মুরমু

গভীর রাতে বাতাসের শব্দের সাথে
পৃথিবীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ করুণ
বড়ো করুণ মনে হয় ।

গভীর নৈঃশব্দে পৃথিবী তার
হিসাবের খাতা খোলে ।
মানুষ্যত্ব আজ জলের দরে বিকোয়
শিশির তাই দু'চোখে ঝাপ্‌সা হয় ।

তবুও উত্তর আকাশে কালপুরুষ
সস্নেহে ঘুমন্ত মানুষদের পাহারা দেয়
সমস্ত রাত সপ্তঋষি গণনায় রত
আগামীকাল কেমন যাবে ?
সেখানেও বিরাট জিজ্ঞাসার ক্ষত !

—●—

আশা/শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়

আশা ছিল জীবনে তার
গায়ক হবার
তাই তো সে সকালবেলায়
ধরত ভৈরবী রাগ
পূরবীটা ধরত সন্ধ্যায়
রাতে মালকোষ
কিন্তু হায় জীবনে
পেলনা সন্তোষ
ধরল দুরন্ত রোগ
গলায় ক্যান্সার ।

পুনর্জাত হ্যামলেট/সামসুল নাহার লিলি

সীজার ! মিত্র আমার !
নরকের গর্ভে মনুষ্যত্ব বলির
ইতিহাস বলো,
ছুঁড়ে দাও তোমার সত্তায়
বর্বরতার বিষবাণ,
[illegible]রণ করো আমার হৃদপিণ্ড,
[illegible]মার বীভৎস কারাগারে
তুমিই নমস্য আমার !
হিটলার ! বন্ধু আমার !
আমাকে বর্বরতার মন্ত্র দাও
ভৃগুর বীর্য আমার বক্ষে,
আমার রক্তে, আমার মত্ততায় ।
পরশুরাম !
আমায় দীক্ষা দাও গুরু—
'পিতা স্বর্গ ! পিতা ধর্ম ! পিতহি পরমন্তপঃ—'
তা পরমেশ্বর !
আমি অপাপবিদ্ধ হতে চাই ;
আমার অস্ত্র অনড়, লক্ষ্য স্থির !

হ্যামলেট— ইতিহাস হোক !
পুনর্জাত হ্যামলেট !

প্রচ্ছদ ফটো : বিশ্বরূপা দাস।

কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ—১৩৯১

০ প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি মন ০

প্রিয় সম্পাদক,

পুজা ১৩৯১ সংখ্যাটি কোন ভাবে আমাদের হাতে এসেছে। পড়া শেষ হবার পর অনিবার্য্য ভাবে কয়েকটি কথা বলতে ইচ্ছে করলো।

(১) কবিতা—প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে কবিতায় মুগ্ধ করেছেন মতি মুখোপাধ্যায়, অজিত বাইরী, ঈশিতা ভাদুড়ী, রীণা চট্টোপাধ্যায় এবং এনাক্ষী আচার্য্য। কবিতার সিদ্ধিপথে এ'দের কার অধিষ্ঠান কোথায় আমরা জানিনা—তবে সুকুমার শিল্পের প্রকাশ পৌরুষের এঁরা উজ্বল বাকী সব প্রণব-বাসুদেব-মোহিনী-তারকরা আটপৌরে লেখা করে বন্ধ করবেন ?

(২) গল্প : ক) দুটি পর্বে ছয় জন গল্প-লেখকের মধ্যে শতভ্রু মজুমদার ও সোফিওর রহমানের লেখা দুটি অন্য দিগন্তের। সোফিওরের গল্প "কঙ্কনা, সময় কি পাথর হয় ?" শীর্ষক গল্পটির বিশ্লেষণ ও আত্মজাত-জিজ্ঞাসা এই সময়ের গল্পের প্রকৃত পাঠককে মুগ্ধ করবে। কঙ্কনা নামক প্রতীকী নামটি এই সময়ও সমস্যার দ্বৈত পথ ধরে পাঠককে পৌঁছে দেয় সোফিওরও সায়ন্তন নামক দুই বিপরীত ধর্মীর তরুণের সময়-নামক ব্যালান্সের দুই প্রান্তের দুই বিন্দুতে। মন্ত্রের মত দুটি লাইন—"ঐ দ্যুতি তুমি দেখেছ। আজ দেখালে।" কিংবা—'প্রেম আত্মবিজ্ঞানের বহুমুখী উৎস" অথবা "দুরকম অন্ধকারের ব্যাখ্যা" কার না ভালো লাগবে ? সত্যি কথা বলতে কি একজন কবির দ্বারাই সম্ভব হয়েছে এরকম গল্প লেখা। (খ) শতভ্রু মজুমদারের গল্পটিতে সব অর্থে একট ছোট গল্পের চেহারা ফুটে উঠেছে "পুরুষের লাশ" "বন মহোৎসব উপলক্ষে স্কুলের হাফছুটি" এবং "দেবী মাষ্টার"—এই তিনটি দ্যোতনা আজকের পাঠককে ভিন্ন চিন্তা ভাবনার খোরাক দেবে। "এ. বি. সি. একটি ত্রিভুজ"—এই সূত্র ধরে পাঠক যদি চিন্তা করেন তাহলে চল্লিশের দশকের এক গল্পকারকে নতুন করে মনে করতে বাধ্য করায় শতভ্রু। আসলে, এই দুজনের ক্ষেত্রে আমরাই সমস্ত পাঠকের কথাই বলছি যাঁরা মেধা ও মনন দিয়ে আজকের তরুণদের লেখা পড়ে থাকেন।

(৩) ফিচার :—সমীরণ মুখোপাধ্যায় ও শুদ্ধসত্ব বসু ভীষণ ধরণের আন্তরিক। এঁদের মধ্যে কোন কপটতা নেই। যতটা কপটতা আছে কিছু কিছু পত্র লেখকের মধ্যে। তবে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, জ্যোতির্ময় বসু এবং অজিত রায় লিট্‌ল ম্যাগাজিনের প্রকৃত বন্ধু।

(৪) সবশেষে বলি, যখন হাজার হাজার লেখক বাংলা সাহিত্যকে দুর্বল করছে, যখন বাণিজ্যিক কাগজগুলি বাংলা-সাহিত্যে মরুভূমি তৈরী করেছেন, তখন "গোধূলি-মন" পত্রিকাটি দেখলে এব পড়লে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদকের শ্রম ও নিষ্ঠার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জাগে। আমরা নতুন ফসল পেয়ে আবার মুগ্ধ হয়ে ফিরে তাকাই বাংলা সাহিত্যের নতুন প্রভাতের দিকে। আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানবেন।

ইতি—

সুমিতা চৌধুরী, শ্যামল দত্ত রায়
খড়্গপুর/মেদিনীপুর

পুন: সম্ভব হলে একদিন আপনার সঙ্গে দেখা করে আলাপ করবো।

০ ০ ০ ০

প্রিয় সম্পাদক,

আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ ভাই। শারদ সংখ্যা পড়ে উপকৃত হলাম। "কঙ্কনা, সময় কি পাথর হয় ?' গল্পটি ভেতর থেকে অভিভূত করেছে। একজন সৎ কবিই পারেন এ ধরণের গল্প লিখতে। ভাবতে ভালো লাগে গোধূলি মন, পঞ্চমা, রৌরব এবং কৌরব প্রভৃতি little magazine এখনো বাংলাদেশে আছে বলেই এদেশে সৎ সাহিত্য বলতে কিছু আছে।

আপনার দীর্ঘজীবন কামনা করি। শুভম্

সমীর রায়

প্রযত্নে : ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কলকাতা-৭০০০২৭

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি মন

২৬ বর্ষ, ১০ম-১১শ সংখ্যা
কার্তিক—অগ্রহায়ণ/১৩৯১

প্রতি সংখ্যা দেড় টাকা
বার্ষিক (সডাক) পনের টাকা

অশোক চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক

সম্পাদকীয়

যে সমস্ত বৃহৎ শক্তিবর্গ দিনে দিনে ভারতবর্ষের প্রচণ্ড জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত এবং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল, শেষ-মেষ জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের ব্যাপক সাফল্যের পর তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। চক্রান্ত দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল, কিভাবে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যায়। তাদেরই সৃষ্ট আসাম, কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের আন্দোলন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রচণ্ড বুদ্ধি দূরদর্শিতা এবং অমোঘ ব্যক্তিত্বের কারণে কোন সমস্যাই আমাদের অখণ্ড ভারতকে ভাঙতে পারেনি। সেই অশুভ শক্তির সাময়িক জয় সূচিত হোল ৩১শে অক্টোবর সকালে। আপন দেহরক্ষীর গুলিতে জর্জরিত ভারতমাতা আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী প্রয়াতা হলেন। শোকে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষের মানুষ। কিছু মানুষের শোক রূপান্তরিত হোল ক্রোধে। সেই সুযোগে বিশেষ এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সমাজ বিরোধীর দল।

শাসকদল সারা বিশ্বকে চমক জাগিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নতুন নেতা নির্বাচন করে ফেললেন। প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর সুযোগ্য পুত্র শ্রীরাজীব গান্ধী দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই দাঙ্গা দমনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং মন্ত্রীসভার প্রথম চার সদস্যের মধ্যে বুটা সিংকে স্থান দিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিলেন।

প্রয়াতা প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতবর্ষকে অখণ্ড রাখতে আপন রক্তে রঞ্জিত করে গেছেন এই ভারতের মাটি— একথা আমরা যেন না ভুলি।

সম্পাদকীয় কার্যালয় ॥ নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর ॥ হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥ ভারত
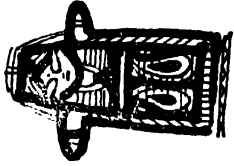
কবিতা : কবিতা : কবিতা :

আকাশ বাগান/গৌরীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশ বাগানে থামে কোন রথ
কেউ নেই শুধু জেগে থাকা
ফুলের বল্লরী জড়ানো মেঘের ছায়া
নিচে ছায়ায় ছায়ায় খেলা চলে

ওখানে কোন ধ্বনি শুনি
রঙিন নিশানে প্রজাপতি ওড়ে
আর কোন শব্দ নেই
দূর মেঘে দেখি সঘন চিকুর
আলোর ঝিলিক গানে আকাশ বাগানে

কবিরা/ফারুক নওয়াজ

কবিরা চায়না তেমন কিছুই ; চায়না টয়োটা, শোভন গৃহ,
চিরদিন এরা অল্পতে খুশী কবিরা শান্ত—কবিরা নিরীহ।
চায়না কবিরা জড়োয়া ভূষণ, ইন্টিমেটের ঝাঁঝালো ঘ্রাণ :
এরা চায় শুধু বিশ্ব-মানব হোক এক জাতি, একটি প্রাণ ॥

কবিরা চায়না উচ্চ খেতাব, গোলাপ গুচ্ছ, সোনার লকেট,
কবিরা চায়না টাকার পাহাড়, চায়না ডলারে বাজুক পকেট
কবিরা বড্ড শান্তপ্রাণ, শান্তির খোঁজে কবিরা চলে—
কিন্তু—সমাজে অনাচার হলে কবিদের চোখে আগুন জ্বলে।

কবিরা তখন থাকেনা শান্ত বুকের ভেতর তুফান ওঠে
তখন এদের কলমে-কলমে মহাযুদ্ধের বোমারু ছোটে ॥
কবিরা সহজে যুদ্ধ চায়না ; রক্ত-হত্যা যুদ্ধ মানে
কিন্তু একটা সফল যুদ্ধ স্বৈরাচারের ধ্বংস আনে ॥

রক্তের মধ্যে সুর

অশোক চট্টোপাধ্যায়

রক্তের মধ্যে খেলা করো
হে রমণী—অন্যমনে
বিটোফেন—নবম সিম্ফনী
যে ভাবে বাজান।
অন্যকোন লোকে যেতে যেতে
মেঘের ভেলায় ভাসি শুধু
রক্তের মধ্যে খেলা করো
হে রমণী—
রবিশংকরের হাতে বেজে যায়
মিশ্র খাম্বাজ।

জীবন সায়াহ্ন/সমর দাস

জানি
তুমি তো আসবেই
তাই, সময়ের প্রহর গুনি
শীতের বিদায় কোণে
তোমার গুণ গুণ শব্দ শুনি।

শত ব্যথা শত যন্ত্রণায়
কোকিল, তুমি আছ সর্বদাই
আমারই মনের আঙিনায়
বয়সের বিষণ্ণতায় জীবন ক্লান্ত
তবু মন সবুজ হয়ে ওঠে
তোমার কণ্ঠে
গুন গুন গান শুনে।

শীতের গুঞ্জন
উষ্ণতায় কাঙালপণায় মগ্ন
সেখানে তোমার আমার গোপন সঙ্গ
কোকিল, তুমি আমার কাছে
চিরকালের রোমাঞ্চ।

স্বজনের দিন/প্রফুল্ল মিশ্র

আমার বুকের মধ্যে লাফিয়ে ওঠে তিমির পাখনা সাপটানি নিয়ে
দুর্নিরীক্ষ্য কম্পাসের দূরবীন
দূর সাগরের ঘষা কাচ দ্বীপ
জীবন বায়ুর স্রোতে কেঁপে ওঠে

লিভিং স্টোনের ক্লান্তিহীন পা মাঝে মাঝে
বুকের নিলয়ে চালায় দুরমুশ
অনুরাগী জলপ্রপাতের দেনা সাতরঙা ধনুকের ছিলায়
ঝরিয়ে যায় অনুরক্ত জল :
একরাশ মেঘমালা নগরাজের শৈলমায়ার অঞ্জন
চোখে মাখাতে ছুটে আসে দৃঢ়-পদক্ষেপী তেনজিং এর দড়ি
মুক্তাদানের কোন বন্ধন ছায়ায় :

অথচ আশ্চর্য আমি বাড়িয়ে দিতে পারি না আমার
দুধের উথালি মতো পা—এই সামান্যতম শরীরী উচ্ছ্বাস—
রূপোলী ডানের ছায়া ভালোবাসার
খড়কুটো ঠোঁটে ধরা চড়ুই-সকাল
জীবনের অন্যতর কোন অনুরাগে ট্রেলারের মতো জুড়ে দেয়
কখন ছুঁড়ে দেয় আমাকে কোথায়
আমার বুকের মধ্যে দাপাদাপি করে যায়
বাতাসের মতো দুর্বার দরিদ্র মেঘ

এই মায়ার ছায়ায়, এই স্ববিরোধের পাল্লায়
ভারী হয়, জারি হয় কাছে-দূরে স্বজনের দিন
আমি স্বপ্নভাঙা মিনারের জন্য চিৎকার করে উঠি
স্বজন···স্বজন···স্বজন।

যেতাম। তাই একদিন বিকেলে গড়ের মাঠের সবুজ মখমলে বসে বাদাম ভাঙতে ভাঙতে ও বলল—বেড়াবার সঙ্গী হিসেবে তুমি খুব ভালো।

আমি কিছু না বলে বোকার মত হাসলাম। ও আবার বলল তোমার বাড়ির গল্প ত বল না।

তেমন গল্প বলার মত কিছু নেই। আমি ভীষণ মধ্যবিত্ত। তবে তোমার কাছে থাকলে সব ভুলে যাই।

—বাড়িতে তোমার খুব দায়িত্ব?

—হ্যাঁ।

—তুমি ভীষণ ভালোমানুষ। তাই ভালো লাগে। ও হাসল। ঘাড় কাঁপিয়ে। আমি কথা না বলে দেখি।

—কি দ্যাখো এমন করে?

—তোমাকে।

—আমাকে কি আর দেখার আছে। সামান্য একটি মেয়ে। আমি বলতে পারতাম—তুমি সামান্য নও। তুমি আমার দুঃখ্যু ঙসে নেবার ব্লটিং। আমার অন্ধকার ঘরে, দমবন্ধ বিছানায় অক্সিজেন। কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না। শুধু বোবা দৃষ্টি। ও একটা বাদাম ভেঙে বলল হুঁ কর।

আমি মুখ খুলতেই সেটা আমার মুখে ছুঁড়ে দিয়ে বলে—জানো, কাল থেকে ছুটি নিচ্ছি।

ক' দিনের।

—দিন পনের। তবে বাড়াতেও পারি।

—ছুটি নিচ্ছ, তাহলে আবার কবে দেখা হবে?

– কি জানি। তবে হয়ত একদিন। এখন শুধু অপেক্ষা।

এরপর যেদিন অফিস গেছি, সেদিনই মনে হয়েছে রেণু আসবে। না হলে টেলিফোন। প্রতিদিন এভাবেই প্রত্যাশার গাঢ় বড় হয়। মনে মনে শেষ ট্রেন ফেল করা কষ্ট। মন একেবারে পরিত্যক্ত পাখীর বাসা। সেই রকম মানসিক অবস্থার মধ্যে একদিন বড়বাবু আমাকে ডেকে বললেন—মিস্ রেণু খাস্তগীরের সার্ভিসবুক দিল্লী পাঠিয়ে দিন।

আমি বোকার মত বললাম কেন?

– সেকি, উনি ত দিল্লী ট্রানস্‌ফারড্, আপনি জানেন না! বড়বাবু এমনভাবে বললেন যেন রেণুর সব খবর আমার নখে! কিন্তু রেণু যে আমার কাছে তার হাজার দুয়ারী মনের একটা দরজাও খোলেনি—আমি বুঝলাম।

কিন্তু তার শেষ কথাটা বড় টানত। সে বলেছিল একদিন দেখা হবে। তাই তাকে আমি খুঁজি। কোলকাতা শহর/নগর বড় রহস্য লুকিয়ে রাখে। সে নিশ্চয়ই রেণুকেও কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। এই শহরের শরীরে একদিন তাকে খুঁজে পাবো। একদিন ছেলেবেলার চোর-চোর খেলার স্বভাবে কোন গোপন জায়গা থেকে সে বলে উঠবে—অমল,—টু-কি। তখনই একরাশ মুনিয়া জেগে উঠবে আমার বুকে।

রেণুকে খুঁজতে খুঁজতে একদিন বালিগঞ্জ পাড়ার এক ছিমছাম দোতলার জানালায় একটা মুখ আটকে থাকতে দেখলাম। সেই মুখ আমাকেই ডাকছে। আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। এমন পরিপাটি শহরে পাড়ায় কে ডাকে! দেখি সে গেট খুলে বাইরে।

—তুই—, তুই অমল না।

– হ্যাঁ, কিন্তু—

—আরে আমি সুতপা। তোর সেই তপা—আমি চিনলাম। একসময় স্কুলে পড়েছি। অনেকদিন ওরা শহরে চলে এসেছে—তাই প্রথমটায় চিনতে পারিনি। আমি অবাক হয়ে বলি—তুই—! আমাকে চিনতে পারলি?

—বাঃ, তোকে ভোলা যায় নাকি? আজকাল এই রাস্তায় তোকে প্রায়ই দেখি। প্রথম প্রথম সন্দেহ

ছিল। ক'দিন দেখার পর ভাবলুম-ঠিক তুই অমল। কোথায় যাস রোজ রোজ। বলেই হাত ধরে হিড় হিড়। বাড়ীর ভিতর। আমি ওকে পাল্টা জিজ্ঞেস করি—বাড়িটা তোদের ? তোর এখনও বিয়ে হয়নি !

ও হাসতে হাসতে বলল—বাড়ি অবশ্যই আমাদের। বিয়ে—! ধুস্, দু'দিন যাক।

এবার ওকে দেখি। একদিন এই মেয়েটাই লুকোচুরি খেলতে খেলতে আমাকে জড়িয়ে লুকিয়ে ছিলো। শ্লেটে লেখার মত সেইসব কৈশোরের দিন কবেই মুছে গ্যাছে। আবছা আদুরে মেয়ের স্মৃতি আছে শুধু।

একটা সাজানো ঘরে বসলাম। সুতপাও।

—হ্যাঁরে, কোথায় যাস এদিকে বললি না ত ?

—একটু ঘুরি, কোলকাতার ত তেমন কিছুই চিনি না।

—বাজে কথা।

নারে, সত্যি।

ধ্যাৎ, নিশ্চয়ই তোর কোন এ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকে। কোন মেয়ের—

—কি যে বলিস, আমার এমন চেহারায় কেউ কি—ও কিছু না বলে হাসে। চোখ দিয়ে আমার বুকের ভল্ট খুলবার চেষ্টা করে যেন। তারপর উঠে যায়। এক সময় জলখাবার নিয়ে।

—খেয়ে নে। টিফিন করিসনি মনে হচ্ছে। মুখটা শুকনো শুকনো।

তুই খাবি না ?

না, আমার এখন খাবার সময় হয়নি।

আমার ব্যাগের মধ্যে স্নেহমাখা রুটি। আলুভাজা। বিধবা মায়ের শ্রম, স্নেহ। ভুলে যাই। ও খুব গাঢ় গলায় বলে—কতদিন পরে তোকে পেয়ে দারুণ ভালো লাগছে। এসময় আমি বাড়িতে একা থাকি। বন্দ্বুবের মধ্যে আমার বাড়ি পেরিয়ে নাইবা গেলি।

—রোজ আসবো ?

—ক্ষতি কি ! তুই ত আমার ছোটবেলার

কয়েকদিনের মধ্যেই রেণুকে ভুলে যাই। সুতপা ঠিক সময়ে জানালায় বসে। আমি যাই। প্রথম দিনের খুশী উছলে পড়ে। একদিন কথায় কথায় ও আমাকে বলল অমল, তোকে আমার খুব ভালো লাগে।

এ কথায় আমার বুকের ভেতর জ্বলন্ত বারুদ ছড়াতে ছড়াতে একটা হাওয়াই সাঁ করে আকাশ পানে। কাঁপা কাঁপা স্বরে বলি—আমারও তোকে।

তোর বাড়ির খবর ত বললি না একদিনও।

কি আর বলব। যেমন ছোটবেলায় ছিলো। বড়ই মধ্যবিত্ত অবস্থা। বাবা নেই। তবে তোর কাছে এলে ভালো থাকি। ও একটু গম্ভীর। তারপর ওর দুটো দিঘী—আমার দিকে মেলে বলে—অমল, তুই আমাকে খুব—তাই না ?

আমি বোকার মত বলি—হ্যাঁ, তুইও আমাকে।

একথায় ও হাসল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে। চুল নাচিয়ে। হাসতে হাসতে বলল—তুই ভীষণ ভালো মানুষ, তাই তোকে দারুণ ভালো লাগে। বলতে বলতে ও আলমারী খোলে। একটা কাগজ বের করে আমাকে দেয়। বলে দ্যাখ, তোকে বলা হয়নি। আমি ভাঁজ খুলে দেখি। অবাক হয়ে ওর দিকে।

—পাশপোর্ট, আমেরিকার ! এতে ফটোটা তোর, কিন্তু নামটা—

—এম্যা, আমার নাম ত রেণুই। সুতপা নাম বড্ডো সেকেলে, তাই কোর্ট থেকে—

তুই আমেরিকা যাবি

—হ্যাঁ, দাদা থাকে ত।

—তাহলে কবে আবার দেখা হবে ?

—ঠিক বলতে পারব না। তবে হবে হয়ত একদিন।

এরপর আবার সেই কষ্ট ঘামে ভেজা পুরোণ গেঞ্জী

হয়। অক্সিজেনে টান পড়ে। বিছানায় শ্বাস কষ্ট। কোলকাতায় আর কাউকে খুঁজি না। তবু বেণুকে স্মৃতি থেকে খারিজ করতেও পারিনি। মন তখন নির্জনরাতে গ্রাম্য রেল স্টেশন। তাই নিয়ে অফিস যাই। বাড়ি আসি। রাতে খাবার সময় মা যখন বলেন —খোকা বড় রোগা হয়ে যাচ্ছিস। তোর ওপর বড্ডো ধকল যাচ্ছে। সারা সংসার একসময় মায়ের এসব পুরোন কথাই কেমন প্রেরণা দিত। সারাদিন এই স্নেহের স্পর্শে লালায়িত থাকতাম। এখন কেমন একঘেয়ে।

অফিসেও কাজে মন বসে না। তাই মাঝে মাঝেই সীট ছেড়ে অন্য সীটে গল্প। না হলে অফিসের রাস্তার উল্টোদিকে ভোলার চায়ের দোকানে। একদিন দুপুরে সেরকম বসেছিলাম। অফিসপাড়া। অন্য অফিসেরও কিছু লোক। কিছু রাস্তায় ঘোরাঘুরি। টিফিনের সময়। তবে সময়ের কোনও নির্দিষ্ট মাপ নেই। বিশেষত সরকারী দপ্তরে। তাই গল্পগুজব। এদিক ওদিক। অনেকক্ষণ। বসে থাকতে থাকতে দেখি সামনের রাস্তা দিয়ে একটা লতা-পাতা শাড়ী, ছাতা খুলে হাটছে। হাটা খুব চেনা চেনা। চেনা মনে হতেই রাস্তায় নেমে পড়ি। ডাকব কি ডাকব না ভাবতে ভাবতে ডাকি অতসী! শাড়ী দাঁড়ায়। আমি পৌঁছে যাই।

আমাকে দেখে ও হাসল। আমিও।

—এখানে তুমি!

—তুমিও ত।

—আমি এখানে সবে ট্রান্সফার নিয়ে এসেছি।

—আমি ত গোড়া থেকেই।

—তাই নাকি, তাহলে খুব ভালো হল। কিন্তু তুমি চিনলে কি করে অমল?

আমি হাসতে হাসতে বললাম – কেন, তুমি ত বলেছিলে একদিন দেখা হবে।

ও হাসে।—বলেছিলাম বুঝি!

—কেন মনে নেই? তাছাড়া বেশীদিন ত আমরা কলেজ ছাড়িনি।

—তা ঠিক। তবে তুমি বদলাওনি অমল। একই আছো। তুমি আসবে আমার অফিসে, এইত সামনেই।

—রোজ!

—ক্ষতি কি!

রোজ না হলেও যেতে থাকি। গল্প হয়। ও আমাকে টিফিন খাওয়ায়। বেশ ভালো টিফিন আনে অতসী। আমি খাবায় একটু বেশী বেশী। মিষ্টি, ডিম— এসব প্রায়ই। তবে আমার নিজের টিফিন ওকে কখনও দিতে পারিনি। লজ্জায়। মা কত যত্ন করে দিলেও, সেই আলুপোস্তর খাবার অতসীকে দিতে বা ওর সামনে খেতে লজ্জা করত। তাই স্নেহমাখা খাবার ব্যাগের মধ্যে। এইরকম দেখাশোনা, যাওয়া-আসায় বয়স বাড়ে। ওর আমার। একদিন ও বলল,—

অমল, তোমার নিজের খবর কিছু বল।

—কি বলব, নিজের বলতে কিছু নেই।

—বাজে কথা, নিশ্চয়ই কিছু আছে।

—কিযে বলো, গেঁয়ো মানুষ, এই চেহারায় আবার—

- বাড়ীর খবর।

আমি ভীষণ মধ্যবিত্ত। তবে তোমার কাছে থাকলে ভালো থাকি।

—তুমি খুব ভালো মানুষ, আমার খুব ভালো লাগে।

আমি হাসি। ও আমার হাসির স্বাদ নেয়। এই ভাবে আরও বয়স বাড়ে।

একদিন গল্পের মধ্যে ও বলল– আচ্ছা অমল, আমি যদি এই চাকরী না করি, বা অন্য কোথাও বদলী হয়ে যাই!

আমার বুক পুরোন ব্যাথার ভয়ে কাতর হয়। অবাক হয়ে বলি—কেন, এমন বলছো, কেন?

ও চুল ঝাঁকিয়ে হাসে। কানের দুল সেই হাসিতে 'কখনও না'—'কখনও না'—দোলে। বলে—তুমি বুঝি আমাকে খুব!

—তুমিও কি নও! এতোদিনে?

—ওসব কথা এখন থাক অমল—বলতে বলতে ওর ব্যাগ থেকে একটা হলুদ ছোঁয়ানো কার্ড বের করে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলে—তুমি ঠিক যাবে কিন্তু, নাহলে ভীষণ কষ্ট পাবো।

আমি এখন যেন নির্জন রাতের ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে। কষ্টের ইটগুলি সারি সারি সাজিয়ে ফেলি। এখন কাউকে খুঁজি না। কিন্তু রোজই রেণুদের সঙ্গে দেখা হয়। কোলকাতার গুটিকেটে প্রজাতির মত তারা বেরিয়ে আসে। ফরফর চারপাশে আমার। তবু রেণু বলে কাউকে ডাকি না। অথচ রাত্রে আমার দমবন্ধ বিছানায় যেন এরাই অক্সিজেন সিলিণ্ডার হাতে এসে দাঁড়ায়। বলে—তুমি ত পুরুষ অমল! তুমি ভালো মানুষ অমল! তোমাকে কি ভোলা যায়!

আমি গ্রাম্য মানুষ। সত্যি কথাই আবার বলে ফেলি—জানো আমি ভীষণ—! তবে তোমাদের কাছে যতক্ষণ থাকি—ভালে থাকি॥

॥ জাপানী এন্‌কেফালাইটিস্ সম্বন্ধে জরুরী তথ্য ॥

জাপানী এনকেফালাইটিস একটি ভাইরাস জনিত ব্যাধি। প্রথমে সামান্য এবং পরে প্রবল জ্বর এই রোগের প্রথম লক্ষণ। অসুখ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় ও পিঠে যন্ত্রণা, অস্থিরতা এবং ঘাড়ের কাঠিন্য দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে হাত পায়ের খিঁচুনি হয়ে রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়তে পারে।

এই রোগ গরু, মহিষ শূকর থেকে মশার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ছড়ায় এই সব রোগাক্রান্ত প্রাণীর রক্তপান করে মশা সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ালে তার এই রোগ হতে পারে। কিন্তু একজন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি থেকে অন্য একজনের এই রোগ হবার সম্ভাবনা নেই। এই রোগ ছোঁয়াচে নয়। সাধারণতঃ ১০ বছরের কম বয়েসের ছেলেমেয়েদের এই রোগ হবার সম্ভাবনা বেশি থাকলেও সব বয়েসের মানুষেরই এন্‌কেফালাইটিস্ হতে পারে যেহেতু মশার কামড় থেকে এই ব্যাধি হয় সেজন্য নিম্নলিখিত প্রতিরোধ ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করলে রোগের ঝুঁকি অনেকটা এড়ানো যেতে পারে।

বাড়ির চারপাশে জল জমে যাতে মশা ডিম না পাড়তে পারে সেদিকে নজর রাখুন।

বাড়ির ভেতরে ও বাইরে গ্যামাক্সিন এবং ম্যালাথিয়ন স্প্রে করুন। তিন। কাছাকাছি গোয়াল বা শূকরের খোঁয়াড় থাকলে সেগুলিকে দূরে সরাবার জন্য ব্যবস্থা নিন এবং সেখানেও স্প্রে করান।

চার। শূকর বা গবাদি পশুর সঙ্গে একঘরে থাকা বন্ধ করুন।

পাঁচ। মশার কামড় এড়াবার জন্য রাত্রে শোয়ার সময় মশারী ব্যবহার করুন।

মনে রাখবেন—রোগের প্রতিকার অপেক্ষা আগাম প্রতিরোধ ব্যবস্থা সর্বদাই শ্রেয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শারদ সাহিত্য ঃ সমীক্ষা

O আমাদের দপ্তরে এসে জড় হয়েছে অজস্র ছোট পত্রিকা। তাদের মধ্যে থেকে আলোচনার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে কিছু। দীর্ঘদিন পত্রিকা সম্পাদনা করা সত্বেও অনেক সম্পাদকের সম্পাদনার প্রাথমিক জ্ঞান পর্যান্ত নেই। অনেকের প্রচ্ছদও সাজানোর ধারণা উনবিংশ শতাব্দীতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কারো কারো রচনা নির্বাচন প্রসঙ্গেও এ কথা মনে হয়। বলা বাহুল্য আলোচনার যোগ্য বিবেচিত হয়নি সে সমস্ত পত্রিকা।

সম্পাদক ॥ গোধূলি-মন

O **ঈগল**
সম্পাদক : অশোক চট্টোপাধ্যায়
২৮, কিষণলাল বর্মণ রোড, হাওড়া-৬

O **কেতকী**
সম্পাদক : মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
শিয়ালডাঙ্গা, পোঃ মণিহারা, পুরুলিয়া

O **সম্প্রতি**
সম্পাদক : প্রণব মাইতি
পোঃ কণ্টাই, মেদিনীপুর

O **কবিতাপত্র**
সম্পাদক : অরুণ মৈত্র
উচিলদহ, ২৪ পরগণা

O **কোরাস**
যুগ্ম সম্পাদক : উদয়ণ সরকার, আশিসতরু সরকার, রামনগর, বাঁকুড়া

সবগুলিই শারদীয়। ক্ষুদ্র পত্রিকা। এদের মধ্যে প্রথম তিনখানির বয়স একটু বেশি, পরিচয় কিছু বিস্তৃত। বাকি দুখানি অল্প বয়েসী, কিন্তু প্রচারে প্রথম তিনখানির মতোই, কমবেশি মধ্য বয়সী, যত্নশীল, সচেষ্ট।

ঈগলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য : ক্রোড়পত্র; প্রয়াত-কবি-সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের রচনা, চিঠি, সাহিত্য ও জীবনী, সেইসঙ্গে সম্পাদকের স্মৃতি-চারণা ক্রোড়পত্র সন্নিবেশিত। ধন্যবাদ, অশোকবাবু। একটা কাজের কাজ করেছেন। যা অনেকের করা উচিত ছিল, কর্তব্য ছিল। ছোটো কাগজের সম্পাদক না হয়ে আপনি যদি সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের মন্ত্রী হতেন। আপনার সম্পাদকীয় পড়তে পড়তে বারবার মনে হচ্ছিল, আমরা কবি-লেখকেরা কি পরিমাণে আত্মবিস্মৃত, স্বার্থপর। শৈলেশবাবুর কবিতাদুটো চোখে আঙুল দিয়ে কি তা-ই দেখিয়ে দিচ্ছে না?

তোমাদের সঠিক পরিচয় কেউ নিশ্চয় জানে
সোনাগাছির গুলাবির মত
এখন কোলকাতার ম্যানহোল খুললে
বিট কবিদের দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসে

তোমাদের বানানো কবিদের ষ্টিগিও
এক লাথি মেরে ভেঙে দিয়ে
পঞ্চম পর্দায় চলে যাবো আমি।

শৈলেশবাবু, আমাকেও ক্ষমা করবেন।

কবিতা প্রলাপ নয়, হয়তো আলাপ। কিন্তু এখন কবিরা বড্ড প্রলাপ বকছেন। আমার বারবার মনে হয়, কবিরা বড়ো বেশি মুখর, যখন-তখন মুখ খুলছেন, যা খুশি লিখছেন, থামতে-থামতে লিখছেন না, ভাবছেন না।

পড়ন্ত বেলায় এসে সেইমান সন্ত ন দেখেছ

[মা/জয়ৎ সেন : ঈগল]

আনন্দবাজার পত্রিকার মতো একটি সংবাদ দৈনিক যখন অনেকদিন বন্ধ পড়ে থাকে রাজনৈতিক চাপে।

পরীক্ষার্থ ১৯৮৩-৮৪/সোফিওর রহমান : ঈগল]

বুকের মধ্যে মনের মধ্যে ও শিশু ও বাবার মধ্যে
সব চাওয়া না চাওয়ার পাওয়ায়
ঘুমে নির্ঘুমে
পাপের ভেতরে পাপ জন্ম নেয়

[পাপ/কানাই কুণ্ডু : ঈগল]

দৃষ্টি ভেঙ্গে পুরনো প্রেমিক
দিচ্ছে পাড়ি
ক্রম ঢালু নিসর্গের দিকে,
সেও বুঝি প্রথা উলটিয়ে
আলো মেখে হেঁটে যাচ্ছে অবিকল সুখে

[রুদ্ধ হাওয়া/রথীন সেনগুপ্ত : ঈগল]

আরো দৃষ্টান্ত চাই? লিটিল ম্যাগাজিনের কবির নাম মুখস্থ হয়ে যায়, একটা পংক্তিও মুখস্থ হয় না।

কিছু পরিশ্রম, চিন্তা, মনস্কতা পেলাম শম্ভু রক্ষিতের কবিতায়।

এবং এখানে এক পাপেট-রমণী
কেঁদে কেঁদে পাপেট-রমণী মৃতের মাথার ওপর
পুরুষাঙ্গ এঁকে দেয়
হিম ঝঞ্ঝা পাথরকুচি হয়ে যোবে...

[পারমার্থিক মৌনতা/শম্ভু রক্ষিত : ঈগল]

কেদার ভাদুড়ীর 'অরোয়া কোরিয়ালিস' সব মিলিয়ে 'হয়ে' উঠেছে, সবটাই উদ্ধৃতিযোগ্য, কিন্তু পৃথকভাবে একটি পংক্তিও নয়।

সন্তোষ মাজীর 'তুমি এলে : ৫৮' (যদিও-৫৮ বার তুমি এলে, না ৫৮-র বা ৫৮ বছরে এলে—বুঝলাম না। হয়তো কবির এই পর্যায়ের ধারাবাহিক কবিতাগুলো যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা বুঝেছেন) ছিমছাম লিরিক্যাল লাগল।

অতীন্দ্রিয় পাঠকের গল্প কবিতার মত করে পড়া গেল। গল্প শেষ করে স্বস্তি পেলাম : মনে হল শীতের ভয়ঙ্কর ধোঁয়াশা মাঠ পেরিয়ে ধোঁয়াহীন ফাঁকা জায়গায় পৌঁছেছি।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের 'কুড়ি বছর পরে' দীর্ঘ কবিতা, কিন্তু খুব স্বচ্ছন্দে পড়া গেল। কবির সঙ্গে অনেকক্ষণ নিজের মধ্যে নিমগ্ন থাকা গেল। মৃণাল বসু চৌধুরীর অনেকগুলো কবিতা পড়ার সুযোগ হল এক কাগজেই। মৃণালের খেদ ও বিলাপ সারাক্ষণ খাদেই বেজেছে, একটু চড়লে ওঠা-নামা করলে আরো ভালো লাগত।

অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার চরিত্র -যেমন ঋজু নামে, তেমনি ঋজু ভাষায়। সমস্ত কবিতাটা বারবার পড়া যায়, আয়নায় নিজেদের মুখ দেখে নেওয়া যায়। অশোকবাবুর এই ধরণের সহজ অথচ জটিল উচ্চারণ সবসময়ই বিশেষত্বকারী। পরিচ্ছন্নতা, ছাপা এবং নানান সৌন্দর্যে 'ঈগল' আদর্শ ক্ষুদ্র পত্রিকা।

'কেতকী' সুদূর পুরুলিয়ার অজ-গ্রাম থেকে নিয়মিত বের করে যাচ্ছেন নিরলস নিঃসঙ্গ কবি-সম্পাদক মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। অথচ কি ছিমছাম সুন্দর সাজানো-গোছানো সুমুদ্রিত কাগজখানি! বর্ষীয়ান্ কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অরুণ ভট্টাচার্য সুশীল রায় প্রথম পৃষ্ঠায় ছোট্ট ছোট্ট কবিতায় সমগ্র জুড়ে আছেন। তিনটি কবিতাই রত্নকণিকা।

এছাড়া কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, সুধীর কুমার, চরণ, কৃষ্ণধর, উত্তম দাশ, রবীন সুর, অজিত বাইরী প্রমুখ কবির কবিতা আছে। বাংলা দেশের আল মামুদ, মহাদেব সাহা প্রমুখ কবির কবিতা এ সংখ্যার বাড়তি গৌরব। সুসম্পাদিত পত্রিকা। তবে অনেক কবিতা আছে যেগুলির স্থানাভাব অবশ্যই পূরণ করা যেত অন্য ভালো কবিতা দিয়ে।

'সম্প্রতি', তুলনায় বড়ো, কয়েকটি গল্প—নলিনী বেরা, শিশির গুহ, অলোককুমার মুখোপাধ্যায়, কল্যাণ জানা, গোবিন্দ শেঠ ও সলিল বেজ— পড়ে হতাশ হতে হয় না, তবে অমিতেশ মাইতির শ্রম ও প্রয়াস উল্লেখ করার মতো। কবিদের মধ্যে আনন্দ ঘোষ হাজরা বাসুদেব দেব, দেবী রায়, গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তম দাশ, সমীরণ মজুমদার, রবীন সুর, ঈশ্বর ত্রিপাঠী সন্তোষকুমার মাজীর কবিতা পড়ার মতো, অনেক কবিতা ছাপার অক্ষর ছাড়া আর কি। তুলনায় পুলিন দাস, প্রশান্ত প্রামাণিক, বিষ্ণু সামন্ত, সুনীলকুমার ঘোষের পদ্য লেখা উত্তম। সম্পাদনায় গর্ব করার মতো কিছু নেই।

'কবিতাপত্র'-এ একরাশ গদ্য-পদ্য আছে, অনেক কবিই অন্যান্য ছোট কাগজ-পত্রের মতো এ-কাগজেও জুড়ে বসেছেন। আবু আতাহারের লেখা পেলাম। সম্পাদকের (অরুণ মৈত্র) যত্ন নেওয়া উচিত রচনা নির্বাচনে ও সম্পাদনার খুঁটিনাটিতে।

'কোরাস' খুবই সংহত, কিন্তু বেশ রুচিমাফিক। শিবশম্ভু পাল, ঈশ্বর ত্রিপাঠী, কেদার ভাদুড়ী, আনন্দ ঘোষহাজরা, অরুণ চক্রবর্তী, অজিত বাইরী, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, পুণ্যশ্লোক দাসগুপ্ত, শিখা মল্লিক প্রভৃতির কবিতা আছে। শিবশম্ভু, কেদার, ঈশ্বর, অজিত, অরুণ-এর কবিতা একটু ভিন্ন স্বাদের। সম্পাদকদ্বয় উদয়ন সরকার ও আশিসতরু সরকারকে কবিতা নির্বাচনে যত্ন নিতে বলি।

সম্প্রতি বাংলা কবিতা কিছু দীন হয়ে পড়েছে। সাট থেকে এই মন্দা চলে আসছে। মনে হয় কবিদের ভাববার দিন এসেছে। ভালো কবিতা হচ্ছে না। কবিতা-ই হচ্ছে না। অল্পসল্প যা হচ্ছে বড়ো কাগজ-গুলো শুষে নিচ্ছে। লিটলম্যাগাজিনে নাম পা কবিতা পাচ্ছি না, অনেকদিন।

—জগৎ সাহা

○ একক (শ্রাবণ-আশ্বিন '৮৪)

কবিতার সোনালী ফসলে বোঝাই এবার এককের ডালিতে অন্যতর সংযোজন পাকিস্তানের স্বেচ্ছা নির্বাসিত কবি আহমদ ফরজ এবং ওড়িশি কবি দুর্গা-মাধব মিশ্রের কবিতা। কবিতা পাঠকের কাছে জীবনানন্দের কবিতায় ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলির বৈজ্ঞা-নিক সমীক্ষার কতটা প্রয়োজন এসব কূট তর্কে না গিয়েও জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়ের স্বল্প পরিসর নিবন্ধ-টির অভিনবত্ব অস্বীকার করা যায় না।

○ ঊর্মি (বার্ষিক-১৩৯১)

কবিতা, ছড়া, গল্প, রম্য-রচনা ও প্রবন্ধ দিয়ে বার্ষিক ঊর্মির এই সংখ্যাটি সাজানো। কবিতা, ছড়া, এবং প্রবন্ধ পড়া যায়। গল্পগুলি এবং রম্য-রচনা (রম্য-কল্পনা ?) নিতান্তই বালখিল্য সুলভ। অভিজিৎ বসুর 'জজের জানালা দিয়ে……' গল্পের এক জায়গায় 'হ্যান্ডিক্যাপ্‌ড্' শব্দটির 'হ্যান্ডিক্র্যাপ্ট' রূপ নেহাৎই ছাপার ভুল বলে মনে হয় না।

○ সাহিত্য সংক্রামক (নব পর্যায় ২)

আসানসোল থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির অগোছাল আঙ্গিক বড় কষ্ট দেয়। প্রকাশনার সময় নির্দেশ নেই। তবে প্রয়াত নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ব্যতিত একটি পৃষ্ঠা দেখে ধরে

নিতে হয় প্রকাশনার সময় কাল। পত্রিকায় প্রকাশিত চলনসই কিছু কবিতা, একটিমাত্র গল্প, প্রবন্ধ (?) ইত্যাদি এবং সম্পাদকীয়—'আঞ্চলিক সাহিত্যের প্রতি উদার হউন' পাঠের পর আমাদের বক্তব্য —কমার্সিয়াল পত্র-পত্রিকা গোষ্ঠিদের দাপটের রাজত্বে 'মহৎ-সাহিত্যের পরিবেশ' সৃষ্টির দায়িত্ব নিতে হবে লিটিল ম্যাগাজিন গোষ্ঠিদেরই। তাই বলে কিছু ফীচার ধর্মী রচনাকে প্রবন্ধ নাম দিলে আর ছেলেমানুষী গপ্পোকে গল্পের মর্যাদা দিলে সেই 'মহৎ সাহিত্যের পরিবেশ' যে হাল্কা হাওয়ায় মিলিয়ে যায় —এই সত্যটুকু আঞ্চলিক পত্রিকা বা লিটিল ম্যাগাজিনের পরিচালকদের মনপ্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করার সময় এসেছে।

○ মরীচি (শারদ সংকলন '৮৪)

অনেক সুন্দর কবিতা এবং চিন্তাশীলতায় সমৃদ্ধ দুটি প্রবন্ধ এই সংকলনটির মর্যাদা বাড়িয়েছে। 'কবিতার জন্ম ও কবিতা' —এই পর্যায়ে ছটি কবিতায় কবিতাগুলি রচনার পশ্চাৎপট আঁকার মধ্যে কেমন একটা ছেলেমানুষী গন্ধ পাওয়া যায়।

○ স্বতন্ত্র জোয়ার (১৩শ বর্ষ-১ম সংখ্যা)

নয়টি কবিতা এবং ছয়টি গল্প দিয়ে সত্যিই একেবারে নয়-ছয় কাণ্ডই বাধিয়েছেন স্বতন্ত্র জোয়ারের পরিচালক গোষ্ঠি। প্রায় সবকটি গল্পই উন্নত মানের। সবকটি কবিতাই কবিতা হয়ে উঠতে চেয়েছে। একটি দুটি বাদে প্রায় সব কবিতাই পাঠককে একটা বোধের দরজায় পৌঁছে দেয়। তবুও অনুযোগ—প্রবন্ধ নেই কেন?

○ কোটচাঁদপুর সাহিত্য (ষান্মাসিক-৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা-জুলাই '৮৪)

বাংলাদেশ থেকে শামসুদ্দিন আহমদ সম্পাদিত পত্রিকার আলোচ্য সংখ্যাটি কোটচাঁদপুর পৌরসভার শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ পৌরসভা সংখ্যা হিসাবে চিহ্নিত। 'জন্মকথা' নিবন্ধে এই অঞ্চলটির সম্পর্কে আকর্ষণীয় এমন অনেক তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, যা সত্যিই আগ্রহ উদ্রেক করে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা জানাই। রবীন্দ্রনাথের 'এনেছিলে সাথে করে/মৃত্যুহীন প্রাণ/মরণে তাহাই তুমি/করে গেলে দান'—এই কবিতাটি দেশবন্ধুর প্রয়াণ উপলক্ষ্যেই রচিত হয়েছিল। তাই 'সম্ভবত:' রচিত হয়েছিল এমন ধারনার কোনও কারণ নেই। 'ছোটদের পাতা' অংশে রোসেনা চৌধুরীর ছড়া—'আমার জন্য দুঃখ আমার/আমার জন্য কষ্ট'—ছোটদের পাতায় বড়ই বেমানান। অন্যান্য কবিতায় বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কাব্য-চর্চার পরিচয় পেতে গিয়ে কিন্তু হতাশই হতে হয়। নুরুন্নাহার সাঈদ এর 'ফিরে এসো' কবিতার একটি ছত্র—'কোথাও আমার হারিয়ে যেতে নেই মানা/ছায়া সে তো, কায়ার সাথেই/রয় জানা'—এ সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন মনে করেও সম্পাদককে অনুরোধ —ভবিষ্যতে রচনাবস্তু চয়নে যেন আরও সাবধান হন এবং যেন যত্নবান হন ছাপার চক্ষুপীড়াদায়ক ভুলগুলির সংশোধনে।

○ ল্যাকেটু (শারদ সংকলন ১৯৮৪)

চৈতন্যপুর, মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত এই পরিচ্ছন্ন শারদীয়া সংখ্যায় এক ঝাঁক কবিতার উজ্জ্বল উপস্থিতি। গল্প প্রসঙ্গে—আমাদের লিটিল ম্যাগাজিন গুলি গল্প নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে যে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে, তার কোন ছাপাই গল্পগুলিতে চোখে পড়ে না। শুধুই আবেগ আর কিছু জলো বক্তব্য—এই নিয়েই বেশীর ভাগ গল্প। মৃত্যুঞ্জয় মাইতির 'ভাঙা বেহালা' গল্পের ট্যাক্সি 'নীল সিগনাল পেয়ে সোজা বেরিয়ে গেল'। সম্পাদক কিন্তু দরাজ হাতে এই ধরণের গল্পগুলিকে প্রকাশের জন্য সবুজ সিগনাল দিয়েছেন। পত্রিকার একটিমাত্র প্রবন্ধ গোকুলেশ্বর গুমটিয়ার—'কালিদাসের চেতনায় ঋতুরাজ বসন্ত' নতুন কোনও ইঙ্গিত বহন করে আনতে পারল না।

আশিসকুমার ভট্টাচার্য

কিশোর বাংলা/সম্পাদক : সন্তোষ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম/৪০, শ্রীরামকৃষ্ণ রোড
পোঃ রিষড়া/হুগলী

যে কোন বড় পত্রিকার সঙ্গে সমানে পাল্লা দেবার মতো পত্রিকা কিশোর বাংলা। ধীরেন্দ্রলাল ধর, সলিল মিত্র ও সুনীতি মুখোপাধ্যায়–তিনজনের উপন্যাসই পাঠকদের আগাগোড়া টেনে রাখতে পেরেছে। হাসির গল্পের লেখকেরা প্রায় সকলেই হাজির এ সংখ্যায়। সম্পাদকের কৃতিত্ব এখানেই—তিনি শুধু নামীদের দিকেই লক্ষ্য রাখেননি, অনামীদেরও দামী লেখা যত্নে জোগাড় করেছেন। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, শৈল চক্রবর্তী, অজয় রায়, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দর গল্প লিখেছেন। শেখর বসু ভালো অনুবাদ করেছেন থ্রি মাস্কেটিয়াস'। অনিল কর্মকারের 'অরণ্যরাজ' এবং প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দণ্ড বায়সের কবলে' আমাদের টেনে রাখে। জ্যাঠামশাই–কে নিয়ে একাংক নাটক লিখেছেন নির্মলেন্দু গৌতম। এই ধরণের নাটকে যাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তা বেতার–দূরদর্শনে ছড়িয়ে পড়েছে। এবারে ছড়া ও কবিতার কথায় আসি। সরল দে 'টুকুই'কে নিয়ে অসাধারণ একটি ছড়া লিখেছেন। যার শেষের কিছুটা অংশের উদ্ধৃতি না দিয়ে পারছি না—টুকুই আমার ভাগ্নে বটে/আমি একটা মামা,/আদর নিতে আসছে নাকি ?/থামা থামা থামা—! ভবানী প্রসাদ মজুমদারও অল্প সময়েই ছড়াকার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। এ সংখ্যায় তার 'লিমেরিক'। লিমেরিক।' দারুণ হয়েছে।

এ সংখ্যার আর একটি অসাধারণ ছড়া লিখেছেন স্বয়ং সম্পাদক সন্তোষ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়—'বেপরোয়া ভাস্কর'।

সোপান/সম্পাদক—স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়/কৃষ্ণগঞ্জ/
বিষ্ণুপুর/বাঁকুড়া/৭২২১২২

শ্যামলেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের লিনোকাট করা ল্যাণ্ডস্কেপ এবং প্রকাশ কর্মকারের প্রচ্ছদলিপি আঁকা শারদ সোপান। ছাপা, রচনা নির্বাচন এবং সম্পাদনা সোপানকে অন্যতম লিটিল ম্যাগাজিন হিসাবে স্বীকৃতি দেবে। ব্যক্তিগত গদ্য হিসাবে চিহ্নিত ভগীরথ মিশ্রের রচনাটি অবশ্যই বাস্তিকে ছুঁয়ে যায়। প্রবীন কবিদের কবিতা বিবৃতিধর্মী, তুলনায় তরুণতম অনেক কবিদের কবিতা আমাদের নাড়া দিয়ে যায় শব্দ নির্বাচনে, চিত্রকল্পের চমকে এবং সর্বোপরি সহজ ছন্দের দোলায়। এ প্রসঙ্গে জহর সেন মজুমদার, সোফিওর রহমান, অরবিন্দ দাশগুপ্ত, প্রমোদ বসু প্রমুখের নাম করা যায়। প্রচেতা ঘোষের পল্ এলুয়ার এবং সি, পি, ক্যাভাফির দু'টি অনুবাদই খুব ঝরঝরে।

কালবেলা/সম্পাদক—নিতাই জানা
হরিদাসপুর, তমলুক, মেদিনীপুর

এ সংখ্যায় রুকুনর, দিলীপ রায় ও অলোকরঞ্জনের কাব্যনাট্য নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচনাটি নিটোল হয়ে উঠতে পারেনি। এক অহংকারী অঙ্গীকার সহ সোফিওর রহমানের দু'টি কবিতা এ সংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সংযম পালের পাঁচটি কবিতাও গতানুগতিক কবিতার ভীড়ে স্বাতন্ত্রের দিশারী। কবিতার এতো বেশী বানান ভুল, ভীষণ চোখে লাগে।

সুচেতনা/সম্পাদক—নিরঞ্জন মিশ্র/
অমৃতবেড়িয়া, মেদিনীপুর

এ সংখ্যার একমাত্র প্রবন্ধ প্রভাসচন্দ্র চৌধুরীর 'বাংলা প্রাচীন চিত্রকলা'। সোফিওর রহমানের এ সংখ্যায় প্রকাশিত চারটি কবিতা নিয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন মঙ্গল বন্দ্যোপাধ্যায়। সোফিওর রহমানের চারটি কবিতা পড়ার পর, সোফিওর যে এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কবি সে সম্পর্কে দ্বিধা থাকেনা। সম্পাদনা ও প্রচ্ছদ প্রশংসা পাবার মতো। তবু প্রুফ দেখার ব্যাপারে আরো একটু যত্নবান হওয়া দরকার।

অশোক চট্টোপাধ্যায়

সংবাদ

○ ইন্দিরা গান্ধী স্মরণ সভা

বিগত ৩রা নভেম্বর সন্ধ্যায় গোধুলি-মন কার্য্যালয়ে এক ভাব গম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হোল ইন্দিরা গান্ধী স্মরণ সভা। খুবই স্বল্প সময়ের মধ্যে উদ্যোগ নেওয়া সত্বেও স্থানীয় কবি/সাহিত্যিক/সাংবাদিক/চিত্রশিল্পী ও সঙ্গীত শিল্পীদের উপস্থিতিতে সভাগৃহ ভরে ওঠে।

কবি অরুণকুমার চক্রবর্তী সভাটি পরিচালনা করেন। সভার প্রথম বক্তা ছিলেন গল্পকার গৌর বৈরাগী। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, মোটামুটি দু'টি বৃহৎ শক্তি বর্ত্তমানে গোটা বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করছে। তাদেরই একপক্ষের হাতে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু হোল। পরবর্তী বক্তা আশীষ ভট্টাচার্য্য বলেন, বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন বিপরীত মেরুর লোক। কিন্তু সম্প্রতি তাঁর কার্য্যপন্থা এবং বর্ত্তমান ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করে ক্রমে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যু আমাকে মূক করে দিয়েছে। রবিবাসর অঙ্কণ শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় বলেন—'আমার নিজের মায়ের মৃত্যুও আমাকে এতটা নিঃস্ব করে দেয়নি, আমি মাতৃহারা হয়েছি। গোধুলি-মন সম্পাদক কবি অশোক চট্টোপাধ্যায় তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন—'কংগ্রেসের বহু অধিবেশনে এবং জনসভায় তাঁকে দুর থেকে দেখেছি বহুবার। তাঁর ব্যক্তিত্বপুর্ণ চেহারায়, কণ্ঠস্বরের যাদুতে, প্রত্যয়-দীপ্ত উক্তিতে মুগ্ধ হয়ে ফিরেছি প্রতিবারই। সাংবাদিক সমীরণ মুখোপাধ্যায়, অমল দাস, দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, শতদ্রু মজুমদার, সুদর্শন দত্ত প্রভৃতি আরো অনেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপণ করেন। কবি অরুণকুমার চক্রবর্তী ছিলেন সভার শেষ বক্তা। তিনি ইন্দিরা গান্ধীর আমলে আমাদের বিজ্ঞানের অগ্রগতির কথা বিশ্লেষণ করেন। তাঁর আমলে খেলাধুলার উন্নতির কথাও উল্লেখ করেন।

সভার শেষে রবীন্দ্র সঙ্গীত—'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু' পরিবেশন করেন তাপস মুখোপাধ্যায়।

○ গল্পমেলার গল্প

১৫ই নভেম্বর চন্দননগরের যোগীপাড়ায় গল্পকার আশীষ ভট্টাচার্য্যের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হোল গল্পমেলার পঞ্চদশতম গল্পমেলা। এবারের মেলায় পাঁচজন গল্পকার গল্প শোনালেন। এরা হলেন—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, আশীষ ভট্টাচার্য্য, গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, শতদ্রু মজুমদার ও দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

গল্পমেলার বৈশিষ্ট অনুসারী হয়ে এবারেও উপস্থিত সকলেই পঠিত গল্পগুলির তাৎক্ষণিক আলোচনায় মেতে ওঠেন।

○ সঙ্গীতশিল্পী বনশ্রী সেনগুপ্তকে সম্বর্দ্ধনা

চুঁচুড়ার বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী, বেতার, দুরদর্শনের নিয়মিত অংশগ্রহণকারীণী এবং চলচ্চিত্রের নেপথ্য গায়িকা শ্রীমতী বনশ্রী সেনগুপ্তকে সম্বর্দ্ধনা জানালেন চুঁচুড়া কনকশালী রিক্রিয়েসান্ ক্লাব গত ১৪ই অক্টোবর চুঁচুড়া রবীন্দ্র ভবনে।

এই ভাব গম্ভীর অনুষ্ঠানে রিক্রিয়েসান ক্লাবের সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবি শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঘোষ শ্রীমতী সেনগুপ্তকে পুষ্পস্তবক, প্রতিকৃতি ও উপহার প্রদান করেন। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিমল কুমার নিয়োগী বিশেষ ভুমিকা নেন এ ব্যাপারে।

শিল্পী শিশির দত্তের রবীন্দ্র সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তারপর সংস্থার শিশু শিল্পীরা নৃত্য প্রদর্শন করেন। সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য হলো শ্রীশ্রী-দুর্গা (মহিষাসুরবধ) নৃত্যানুষ্ঠানটি। এ ব্যাপারে নৃত্য নির্দেশিকা শ্রীমতী যুথিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুখ্যাতি করতে হয়।

এরপর চলে সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠান। শ্রীমতী বনশ্রী সেনগুপ্ত সংস্থাকে ধন্যবাদ দেন এবং চুঁচুড়ার জীবন কথা তুলে ধরেন। সবশেষে তিনি ৬খানি সঙ্গীত পরিবেশন করে উপস্থিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।

O প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি মন O

সংকৃত 'ক্ষুধিত প্রজন্মের কবি ও কবিতা' নিবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে যেসব চিঠি গোধূলি মনের মহিলা ও শারদীয়া সংখ্যায় বেরিয়েছে সেগুলি পড়া গেল। সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীবাসুদেব দেব এবং পত্রিকা সম্পাদক শ্রীশ্যামলেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের চিঠিতে প্রশংসার উগ্র গন্ধ। বিরত রইলাম তাঁদের জবাব দিতে। ধন্যবাদ জানিয়েও তাঁদের প্রীতির মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করব না। 'অমৃত-লোকে'র সমালোচকের প্রশংসাতেও আমি শ্রদ্ধাবনত।

শ্রীমতী নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠিতে অহেতুক জ্ঞান দেবার চেষ্টা ছিল। জ্ঞানগ্রহণে আমি নতমস্তক। কিন্তু যত্রতত্র নয়। জ্ঞানদাত্রীকে পরখ করেই তাঁর কথা শুনবো। এক্ষেত্রে নীলিমা দেবী অকৃতকার্য। তাঁর চিঠির শুরুতে আমিও হোঁচট খেয়েছি। তাঁর ফ্রেঞ্চ জ্ঞানের বহর দেখে আমি বিস্মিত। রেনে-সাঁস ফরাসী শব্দ, এমন হাস্যকর উক্তি আপনি করতে গেলেন কেন? 'শাঁস' থাকলেই ফরাসী হয় না। ওটির ব্যুৎপত্তি ইতালিতে। সঠিক উচ্চারণ 'রেনেনশা' বা 'রেনেশা'। ফরাসী উচ্চারণে বিকৃত হয়ে 'রেনেসাঁস' 'রেনেশাঁস' 'রেনেশাস' ইত্যাদি হয়েছে। আর আমাদের সামনের জানালাটা যেহেতু ইংরেজি, এবং ইংরেজি যেহেতু ফরাসীর খুব কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিল, তাই এদেশীয় বড়ো বড়ো আভিধানিকদেরও ইংরেজি Renascence বা Renaissance শব্দের অনুকরণে লিখতে দেখা যায়—রেনেশাঁস, রিন্যাসেন্স, রেনেসাঁস, রেনেস্যান্স ইত্যাদি। অবশ্যি রেনেশাঁ বা রেনেসাঁ যে কেউ লেখেন নি, এমন নয়। নীলিমা দেবী দয়া করে আশুতোষ দেবের ইংরেজি-বাংলা অভিধান এর (Students' Favourite Dictionary, 17th Edition, 1960) পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৪৮ দেখে নিন। আমি কিন্তু এটাকে 'অশিক্ষিত বাঙালীদের অতিরিক্ত বিদেশী উচ্চারণ জ্ঞানের নিদর্শন' মনে করি না। নীলিমা দেবীর এক নম্বর ভুল এখানেই।

নীলিমা দেবী মল্লিখিত নিবন্ধটি পড়েই বুঝে গেছেন যে 'Allen Ginsbers কে অনুসরণ করে ক্ষুধার্ত sex নিয়ে হৈ চৈ করে কাব্যসমুদ্রে তরঙ্গ তুলেছে —বাংলা কাব্যকে neo contemporaryর পর্যায়ে এনেছে।' প্রথমত, Ginsbers নয়, Ginsberg হবে। দ্বিতীয়ত, আমি কোথাও বলিনি যে হাংরিরা sex নিয়ে আন্দোলন করেছেন। আমি শুধু তাঁদের সাম্প্রতিক কাব্যচর্চার কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম। পত্রলেখিকার এই বিপরীত-অবধানটা আমাকে বিড়ম্বিত করেছে। তাঁর তিন নম্বর ভুলটা হলো, তিনি 'পাঠকৈবল্যের' ইংরেজি করেছেন 'পড়া for the sak of পড়া'। কথাটা sak নয়, sake. এ ছাড়া, তাঁর ধারণা 'বাংলা কবিতা গল্প উপন্যাস সাধারণত মেয়েরাই বেশি পড়ে'। তবে ছেলেরা সাধারণত কি পড়ে—প্রবন্ধ, নাটক, না অন্যকিছু? সর্বোপরি, নীলিমা দেবী আমার নিবন্ধের বক্তব্য-বিষয় সম্পর্কে কিছুই লেখেননি। অবশ্যি, নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা চেয়ে আমার কাছে একটি চিঠি লিখেছেন। সবিনিত চিত্তে সে চিঠির উত্তর তাঁকে আমি দিয়েছি।

শ্রীদেবী রায় নমস্য, কিন্তু তাঁর চিঠি নয়। নিবন্ধটি প্রকাশের পরে বুঝলাম, হাংরিদের অনেকে আজ পুরোদস্তুর 'প্রতিষ্ঠান বনে গিয়েও বিশ বছর আগেকার সেই মরা ঐতিহ্যের মোহ কাটাতে পারেননি। তদুপরি সেই সুপ্ত কালসর্পটি এমনই সজাগ যে তার ঢাকা-দেওয়া ঝুড়িটিও যারপরনেই স্পর্শকাতরতাগ্রস্ত; ছুঁতে না ছুঁতেই ফোঁস করে ওঠে। সম্ভবত এসব অনুমান করেই 'পথের পাঁচালী' সম্পাদক দীপংকর রায় 'এবং' পত্রিকার সম্পাদক ধূর্জটি চন্দকে একটি গোপনীয় চিঠিতে লিখেছিলেন: 'হাংরিদের নিয়ে যখন আমি কাজটায় হাত দিই তখন অতি তরুণ থেকে প্রৌঢ় পর্যন্ত অনেক লেখকই আমাকে এই নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে নিষেধ করেন।...তাঁরা আমাকে ভয় দেখিয়েছিলেন যে এর ফলে নাকি পঞ্চাশের লেখকরা মনোক্ষুণ্ণ হবেন। মূলতঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় খুব চটে যাবেন।'

ইত্যাদি। বাসব দাশগুপ্তকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে মলয় রায়চৌধুরীও ওই আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। সুনীল ও শক্তির বিরুদ্ধে অনেক খারাপ কথা মলয় লিখেছেন। নীলিমা দেবীও লিখেছেন, আমি নাকি সুনীলকে নীচে নামিয়েছি আর শক্তিকে ওপরে উঠিয়েছি !!…চুরাশির শারদীয় 'মহাদিগন্তে' হাংরিদের নিয়ে লেখার আগে উত্তম দাশ হুমকি পেয়েছিলেন কিনা, জানতে খুব ইচ্ছা করছে। নিবন্ধটি লেখার সময় আমাকেও এরকম যুযুর ভয় দেখানো হয়েছিল। তোয়াক্কা করিনি। লেখাটি প্রকাশের পর ব্যক্তিগত ভাবে আমি ইতিমধ্যে জনা আষ্টেক হাংরি কবির (যাঁরা এখন বাংলা সাহিত্যের শীর্ষাসনে) হা রে রে শুনতে পেয়েছি। দেবী রায় 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'র কৌশলটাও চাপা দিতে পারেননি। তাঁর ক্ষোভের অদৃশ্য সূত্রটাও এ থেকে ধরা যাচ্ছে। ভুলভাল রেফারেন্স হয়তো আছে, কিন্তু আপনার রাগটা তো আরও ভুল। আপনারা না থাকলে আমরা কি আশির জমি পেতাম? মতান্তরে শ্রীবাসুদেব দেবের চিঠির আবার বলি : 'সর্বদা একমত না হলেও লেখাটি খুবই সময়োপযোগী ও জরুরী ছিল।…কিন্তু রঙিন সৌখিন বেলুন ফুটো করার মত কাজ দরকার।'

পরিশেষে একটি গল্প বলি। প্রখ্যাত হিন্দি সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ত্যাগী 'অশুদ্ধ হিন্দী' নামে একটি রচনায় 'স্তর' (standard) শব্দের বদলে অনবধানতা বশত লিখে ফেলেছিলেন 'স্তন' (breast)। তিনি লিখেছিলেন, কবি মীনা জয়সওয়ালের তুলনায় হিন্দি কাব্যসাহিত্যে মহাদেবী বর্মার স্তন অনেক উঁচু।' আমার নিবন্ধটিতেও ওইরকম একটি মারাত্মক ভুল ঘটে গেছে তা কেউ লক্ষ্য করেন নি। এই অবকাশে সেটির শুদ্ধরূপ উল্লেখ করে চিঠি শেষ করছি। Beat কথাটির অর্থ দিতে গিয়ে আমি Bit শব্দের অর্থ (শাসন-না-মানা) দিয়ে ফেলেছি। বস্তুত তার অর্থ হবে 'বারংবার আঘাত করা ; strike repeatedly.'

অজিত রায়

নির্মল ভবন, লুবি সার্কুলার রোড ; ধানবাদ ৮২৬০০১

W/7 Maniktala Govt. Housing Estate,
V I P Road, Calcutta : 700054, Sept. 5, 1984

O মহিলা সংখ্যা 'গোধূলি মন' এক বিস্ময়কর সুন্দর স্বাদ নিয়ে এলো। সম্পাদিকা কল্যাণীয়া শ্রীমতী বীণা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাবলী বিশেষ উপভোগ করলাম। যাঁর লেখনীতে এমন সুন্দর ফুল ফোটে, তিনি নিজেও ফুলের মতো ; তাঁর লেখনী থেমে থাকে কেন? ছোট্ট মামণি অদিতি যেমন মিষ্টি, তার ছড়াগুলিও তেমনি। ছয়েই যদি এই, ষোলোয় না-জানি তবে আকাশ স্পর্শ করবে! সেই কামনাই করি। প্রচুর লেখার চাইতে নির্বাচিত কিছু লেখায় এ সংখ্যাটি সাজাবার ফলে প্রতিটি রচনার প্রতিই আমাদের গভীর লক্ষ্য পড়ে। এজন্য কবিদম্পতিকে স্বতস্ফূর্ত প্রশংসা করি। আমার প্রীতি ও শুভকামনা জানবেন। ইতি শুভার্থী—

রণজিৎ কুমার সেন

MEMBER { All India Small & Medium News Paper Association, Delhi.
Little Magazine Editors Association, Calcutta
Hooghly Dist. Patra Patrika Somity, Hooghly. }

GODHULI–MONE N. P. Regd. No. RN. 27214/75 Oct.–Nov. '84 (আশ্বিন-কার্তিক ১৩৯১)
Vol. 26, No. 10×11 Postal Regd. No. Hys–14 Price—Rs. 1·50 only

আমাদের প্রিয় প্রয়াত প্রধান মন্ত্রী

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্মরণে
চিত্রে, গদ্যে ও পদ্যে নিবেদিত হবে
ডিসেম্বর ১৯৮৪ সংখ্যা।

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পপুলার প্রিণ্টার্স, বারাসত, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও নতুনপাড়া, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

গোধূলি-মন
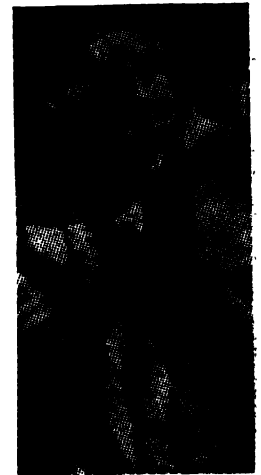
এই সংখ্যায় ঃ

ইন্দিরা গান্ধী সংখ্যা

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

O 'গোধূলি-মন' নিয়ে গর্ব করার মত আমাদের বলতে লিট্ল ম্যাগাজিন-এর প্রকৃত বন্ধুদের কথাই বলছি। যাঁরা লিট্ল ম্যাগাজিনকে শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন, প্রচার ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন, নিঃস্বার্থভাবে ব্যক্তিগত লাভ ইত্যাদির উর্দ্ধে উঠে বন্ধুর মত মনটাকে মুখে নিয়ে এসে প্রতিটি লিট্ল ম্যাগাজিনকে নিজের পত্রিকা মনে করে বুক দিয়ে আগলে রাখেন, আমি তাঁদের কথাই বলছি।

আমরা জানি এই ক্রমবর্দ্ধমান বাজারমূল্য বৃদ্ধির চাপে নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ করা কি দারুণ কঠিন ব্যাপার। কিন্তু এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে 'গোধূলি মন' সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে কটি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে সেই সব পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলী ও সংশ্লিষ্ট শিল্পকর্মী বন্ধুদের প্রতিটি 'লিট্ল ম্যাগাজিন' প্রেমিক-এর পক্ষ থেকে অবশ্যই বিশেষ অভিনন্দন প্রাপ্য। যাঁরা শুধু মাত্র আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য নিয়মিত তো দুরের কথা, বছরে একটি সংখ্যা প্রকাশ করতে দেনায় ডুবে গেছেন তাঁদের কথা আন্তরিকতার সঙ্গে ক'জন ভাবেন। এঁরা তো শুধু ধূপের মত নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে পুড়িয়ে পবিত্র গন্ধ বিলিয়ে গেলেন। না, এঁরা কিছু আশা করেন নি। --তা করলে 'লিট্ল ম্যাগাজিন' নয় অন্য ম্যাগাজিন করতেন।

এসময় একটা দুঃখজনক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তা হল 'লিট্ল ম্যাগাজিন' কে কেন্দ্র করে কিছু আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত বক্তা ও তাঁদের অনুরাগীদের 'লিট্ল ম্যাগাজিন' কেই হেয় করার চেষ্টা বিশেষ করে মফস্বল ও গ্রামাঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রিকার এবং যে সমস্ত পত্রিকার সঙ্গে প্রভাবশালী ব্যক্তি, গোষ্ঠী তথা এসময়ে শিল্পের ধারক বাহকেরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে নেই। এইসব আলোচনা সভায় কিছু বক্তার বক্তব্য শুনে খুবই বিস্ময় বোধ করি। কারণ এঁদের মধ্যে অনেকে পত্রিকা সম্পাদনা করেন বা এক সময় করতেন। এঁদের লেখা বিভিন্ন লিট্ল ম্যাগাজিনে নিয়মিত প্রকাশও হয়। কিন্তু এঁরাই আবার বিরূপ সমালোচনা করেন। আমি একই সঙ্গে আন্তরিক আনন্দ ও গর্ব অনুভব করতাম, যদি এঁদের [বিরূপ সমালোচকদের] গল্প-পদ্য সেই সব পত্রিকার সার্থক উত্তরণ ঘটাতে পারতো এবং এসময়ের সাহিত্য রস পিপাসু পাঠক-পাঠিকাদের মনে তাঁদের প্রতিটি সৃষ্টি স্থায়ী দাগ কেটে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে স্থায়ী সংযোজনের দাবী রাখার যোগ্যতা অর্জন করতো। প্রকৃত গঠনমূলক সমালোচনার নিশ্চয় প্রয়োজন আছে। কিন্তু যে সমালোচনা শুধু আঘাত দেয় একজনকে অপরদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে, কী হবে সেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত আলোচনায়। আমার সীমিত চিন্তায় মনে হয়---একজন আলোচক এর আলোচনা-সমালোচনা তখনই সার্থক বসতীর্ণ হতে পারে, যদি এর 'তাত্বিক' ও 'ক্রিয়াত্মক' দুটি দিক এর ভারসাম্য বজায় থাকে। বেশ কিছু পত্রিকা হয়তো উপযুক্ত মানের নয়। তবু আগ্রহ উৎসাহ ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে যাঁরা পত্রিকা প্রকাশ করছেন, তাঁরা কী 'Pornographer' দের চেয়ে বেশী পাপ করছেন? এর উত্তরে কিছু বিদগ্ধ জন ও তাঁদের স্নেহ ভজনরা হয়তো বলবেন তুমি কী সাহিত্যিক? সাহিত্য পত্রিকা নিয়ে এত মাথা ব্যাথা কেন? সত্যিই আমি সাহিত্যিক নই সাধারণ মানুষের শিল্পী। তাইতো বলতে পারি আমি দাঁড়াবো তোমার সমর্থনে ক্ষত-বিক্ষত ভূপতিত হলে তুমি। আমি যে তোমার সব বেদনা বুঝি। তোমার দুঃখে আমি কাঁদি, তোমার ক্ষত আমার রক্তপাত। আমি যে তোমার সব চিন্তাই জানি। তাই দাঁড়াবো তোমার সমর্থনে ক্ষত-বিক্ষত ভূপতিত হলে তুমি॥

আজ এই পর্যন্ত। আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন সহ

ঋষিণ মিত্র
১৪/১ বি, বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রতি সংখ্যা দেড় টাকা
বার্ষিক (সডাক) পনের টাকা
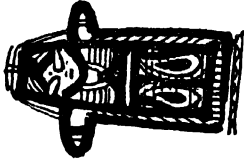
ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি মন

২৬ বর্ষ/১২শ সংখ্যা

ডিসেম্বর/১৯৮৪

কোন আততায়ীর অমোঘ বুলেট
মুছতে পারবেনা
আমাদের হৃদয় থেকে
তাঁর অমলিন হাসি।

কোন বৃহৎ শক্তি
(তা সে যত বৃহৎই হোক্ না কেন)
আমাদের আসমুদ্র হিমাচল
ভারত-সংসারে
পারবেনা ভাঙনের আগুন জ্বালাতে।

তাঁর প্রতিটি রক্তবিন্দু, দেহাবশেষ
মিশে রয়ে গেছে
এ মাটির অনুতে অনুতে।
আমরা যেখানেই থাকিনা কেন
প্রতি মুহূর্তে তাঁর স্পর্শ পাচ্ছি।

জীবন–পঞ্জী

১৯১৭—১৯ নভেম্বর : এলাহাবাদে ইন্দিরার জন্ম।

১৯২১—৬ ডিসেম্বর : জওহরলালের প্রথম কারাবাস।

১৯২২—সবরমতীতে গান্ধী আশ্রমে কয়েক মাস।

১৯২৬—মার্চ : বাবার সঙ্গে প্রথম ইউরোপ যাত্রা।

১৯২৭—ডিসেম্বর : এলাহাবাদের সেণ্ট মেরী কনভেণ্টে ভর্তি।

১৯২৮—গান্ধীজীর চরকা সংঘের শিশু বিভাগে যোগদান।

১৯৩০—'বানর সেনা' গঠন।

১৯৩১—১ জানুয়ারী : কমলা নেহরুর কারাবরণ। ২ ফেব্রুয়ারী : লখনউতে মোতিলাল নেহরুর মৃত্যু।

১৯৩৪—এপ্রিল : ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। জুলাই : শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীতে ভর্তি।

১৯৩৫—এপ্রিল : মায়ের সঙ্গে ইউরোপ যাত্রা।

১৯৩৬—২৮ ফেব্রুয়ারী : কমলা নেহরুর মৃত্যু।

১৯৩৭—মে : বাবার সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপ সফর।

১৯৩৮—জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান। ফেব্রুয়ারী : ব্রিস্টলের ব্যাডমিণ্টন স্কুলে ভর্তি। ৫ সেপ্টেম্বর : জার্মানী পরিদর্শন।

১৯৩৯—মার্চ : চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যাণ্ড যাত্রা।

১৯৪১—ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, লণ্ডন, আফ্রিকা ও বম্বে সফর। ফিরোজ গান্ধীর সঙ্গে পরিচয়।

১৯৪২—২৬ মার্চ : ফিরোজ গান্ধীর সঙ্গে বিবাহ। ৮ আগস্ট : বম্বেতে এ আই সি সি অধিবেশনে যোগদান। ১০ সেপ্টেম্বর : এলাহাবাদে কারাবরণ।

১৯৪৩—১৩ মে : জেল থেকে মুক্তি।

১৯৪৪—২০ আগস্ট : বম্বেতে রাজীবের জন্ম।

১৯৪৬—১৪ ডিসেম্বর : সঞ্জয়ের জন্ম।

১৯৪৭—১৪ আগস্ট : ভারত বিভাগ ও পাকিস্তানের জন্ম।

১৯৪৮—২৯ জানুয়ারী : গান্ধীজীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকার। ৩০ জানুয়ারী : গান্ধীজীর মৃত্যু।

১৯৫৩—প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিদর্শন। এপ্রিল : বান্দুং সম্মেলনে যোগ দিতে ইন্দো-নেশিয়া যাত্রা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'মাদার' উপাধি লাভ।

১৯৫৫—ফেব্রুয়ারী : কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ প্রাপ্তি। ১৯ সেপ্টেম্বর : কংগ্রেস কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটির সদস্য মনোনীত।

১৯৫৬—২২ সেপ্টেম্বর : এলাহাবাদ নগর কংগ্রেসের সভাপতি।

১৯৫৯—ফেব্রুয়ারী : কংগ্রেসের সেণ্ট্রাল পার্লামেণ্টারি বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত।

১৯৬০—৮ সেপ্টেম্বর : ফিরোজ গান্ধীর দেহাবসান।

১৯৬৪—২৭ মে : জওহরলালের মৃত্যু। ২ জুলাই : শাস্ত্রী মন্ত্রিসভার তথ্য ও বেতারমন্ত্রী পদে নিযুক্ত। ২০ আগস্ট : রাজ্যসভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত।

১৯৬৬—১৯ জানুয়ারী : মোরারজী দেশাইকে পরাজিত করে সংসদীয় কংগ্রেসের নেতা নির্বাচিত। ২৪ জানুয়ারী : প্রধান মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ। ২১ অক্টোবর : দিল্লিতে টিটো, নাসের ও ইন্দিরার মধ্যে ত্রিপাক্ষিক শীর্ষ বৈঠক।

১৯৬৭—৮ জানুয়ারী : ভুবনেশ্বরে বক্তৃতা দানকালে ইন্দিরার নাক জখম। ১৬ ফেব্রুয়ারী : ইন্দিরার নেতৃত্বে লোকসভায় ৫২০টির মধ্যে ২৮১টি আসন জিতে কংগ্রেস দল আবার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত। ২১ ফেব্রুয়ারী : রায়-বেরিলি কেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত। ১২ মার্চ : আবার কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত। ১৩ মার্চ : দ্বিতীয়বার প্রধান মন্ত্রী হিসেবে কার্যভার গ্রহণ। ৬-৮ নভেম্বর বিপ্লবের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মস্কো গমন।

১৯৬৮—২৪ ফেব্রুয়ারী : রাজীবের বিবাহ ইটালিয়ান সোনিয়ার সঙ্গে। ১৪ অক্টোবর : রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে ইন্দিরার ভাষণ।

১৯৬৯—জুলাই : মন্ত্রিসভা থেকে মোরারজী দেশাইয়ের পদত্যাগ। ১৯ জুলাই : ব্যাংক জাতীয়-করণ। ২৩ জুলাই : রাজন্যভাতার বিলোপ-সাধন। ২০ আগস্ট : ভি ভি গিরি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত। ১২ নভেম্বর : এ আই সি সি কর্তৃক ইন্দিরার সদস্যপত্র বাতিল। ১ ডিসে-ম্বর : ইন্দিরার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস (জ) দলের সভাপতি হিসেবে জগজীবন রামের নির্বাচন।

১৯৭০—১৭ মার্চ : কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেত্রী নির্বাচিত। ১৮ সেপ্টেম্বর : লুসাকায় তৃতীয় গোষ্ঠি-নিরপেক্ষ শীর্ষ বৈঠকে যোগদান।
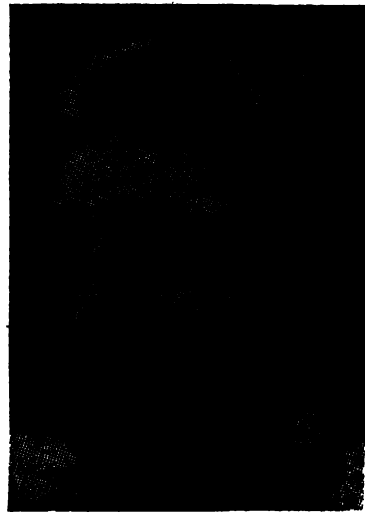
O মতিলাল নেহেরুর পরিবারের কয়েকজন

• নভেম্বর : আনন্দ ভবনকে নেহরু স্মৃতি-ভাণ্ডারের অছিদের হাতে সমর্পণ।

১৯৭১—৬ জানুয়ারী : লোকসভা বাতিল হওয়ায় প্রধান মন্ত্রী হিসেবে থাকার বৈধতা সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টে আপিল। ১৪ মার্চ : ৫০৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস (ই) দলের ৩৫০টি আসন লাভ। ১৮ মার্চ : নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ। ২৭ মার্চ : বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রামকে সমর্থন বার্তা। ৩১ মার্চ : লোকসভা উপনির্বাচনে জয়লাভ। ৯ আগস্ট : বন্ধুরাষ্ট্র রাশিয়ার সঙ্গে কুড়ি বছরের 'শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি' সম্পাদন। ২৭ নভেম্বর : বাংলাদেশ সমস্যার 'রাজনৈতিক সমাধান ও মুজিবের মুক্তির জন্য পাকিস্তান-প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহ্বান। ৪ ডিসেম্বর : ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের যুদ্ধ ঘোষণা। ৫ ডিসেম্বর : ভারতের পদাতিক ও মৈত্রী বাহিনীর ঢাকা

প্রবেশ। লে, জেনারেল নিয়াজীব যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব। ৬ ডিসেম্বর : ভারত কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দান। ৬ ডিসেম্বর : নিয়াজীব আত্মসমর্পণ। পশ্চিম রণাঙ্গণে ভারত কর্তৃক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা। ১৮ ডিসেম্বর : রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ইন্দিরা 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত।

১৯৭২—১০ জানুয়ারী : দিল্লিতে ইন্দিরা সকাশে মুজিবর রহমান। ১৫ মার্চ : ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত। ৩ জুলাই ইন্দিরা ও ভুট্টো কর্তৃক সিমলা চুক্তি স্বাক্ষর।

১৯৭৩—২৬ এপ্রিল : ভারতের ২২তম রাজ্য হিসেবে সিকিমের অন্তর্ভূক্তি।

১৯৭৫—১২ জুন : এলাহাবাদ হাইকোর্ট কর্তৃক রায়বেরিলি কেন্দ্র থেকে ইন্দিরার নির্বাচন অবৈধ বলে ঘোষণা। ২৪ জুন : সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক ইন্দিরার কার্য পরিচালনার বৈধতা ঘোষণা। ২৫ জুন : দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা। ১১ই জুলাই : অমৃত নাহাটার চলচ্চিত্র 'কিস্সা কুর্সি কা'র প্রদর্শনে তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের আপত্তি। ১৪ জুলাই : 'কিস্সা কুর্সি কা' ছবিটিকে নিসিদ্ধ ঘোষণা করে ছবিটির নেগেটিভ ও প্রিন্ট বাজেয়াপ্ত করার আদেশ প্রদান।

১৯৭৭—২১ মার্চ : রায়বেরিলি কেন্দ্র থেকে লোকসভা নির্বাচনে জনতা পার্টির রাজনারায়ণের কাছে ৫৫ হাজার ভোটে শ্রীমতী গান্ধীর

O তিন প্রধান মন্ত্রী

পরাজয়। ২২ মার্চ : অন্তবর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি বি. ডি জাত্তির কাছে ইন্দিরার পদত্যাগ পত্র পেশ। ৩ অক্টোবর : ইন্দিরা গান্ধী গ্রেপ্তার। ৪ অক্টোবর : আদালত কর্তৃক মুক্তি দান।

১৯৭৮—জানুয়ারী : কংগ্রেস (ই) দলের সভাপতি নির্বাচিত। তাঁর নেতৃত্বে কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের কংগ্রেস (ই) দলের বিজয়। ৮ নভেম্বর : চিকমাগুলর কেন্দ্র থেকে সংসদে নির্বাচিত। নভেম্বর : সংসদের সদস্যপদ বাতিল। একদিনের জন্য তিহারজেলে বন্দী। ২৬ ডিসেম্বর : প্রিভিলেজ কমিটির সুপারিশ মোতাবিক একদিনের কারাবরণ।

১৯৭৯—২৮ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চরণ সিংয়ের কার্যভার গ্রহণ। ২০ আগষ্ট : চরণ মন্ত্রিসভা থেকে কংগ্রেস (ই) দলের সমর্থন প্রত্যাহার ও চরণ মন্ত্রিসভার পতন। ২২ আগষ্ট : সংসদ বাতিল ও রাষ্ট্রপতি শাসন চালু।

১৯৮০—৭ই জানুয়ারি : রায়বেরিলি ও মেদক কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে ইন্দিরার জয়। ১৪ জানুয়ারী : চতুর্থ দফায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত। ২৩ জুন : বিমান দুর্ঘটনায় সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যু।

১৯৮৩—৭ই মার্চ : ১০১টি দেশ নিয়ে গঠিত গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ আন্দোলনের চেয়ারপার্সন নির্বাচিত। ২৫-২৬ ডিসেম্বর : কলকাতায় এ আই সি সি-র অধিবেশন।

১৯৮৪—৫জুন : পাঞ্জাবে সন্ত্রাস দমনে সেনাবাহিনীর নিয়োগ ৩১ অক্টোবর : নিজের দেহরক্ষীর গুলিতে দেহাবসান।

○ সংকলন : অজিত রায়
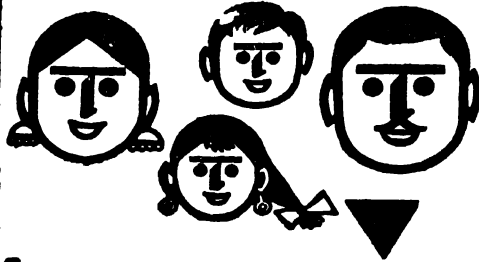
৩১ অক্টোবর ১৯৮৪/বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সাতষট্টি বছরের সে এক সৌম্য শান্ত
বিশ্ববন্দিত বৃক্ষ, অগণিত শাখা প্রশাখা
সীমাহীন বিস্তার তার।
এগাছে বাসা বাঁধে
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পাখি বাসাবাঁধে
পরম শান্তিতে, সুখে দুঃখে
হাসি কান্না মেখে
বাসা বাঁধে, নির্ভয়ে, অদৃশ্য অভয়ে।
এ বৃক্ষ অতন্দ্র প্রহরী, প্রখর দৃষ্টি।
যেন ঠো না মারে বাজ পাখি
যেন ঝঞ্ঝা না দোলা দেয়
নীড় বাঁধা পাখিদের প্রাণে।

সেদিন
কার ওই নির্মম আঘাতে
সেই বৃক্ষ শয্যা নিল পৃথিবীর কোলে,
প্রশান্তির হাসিটুকু তখনো উজ্জ্বল মুখে
সূর্য দেখি লজ্জা পায় আলো দিতে।
নীড় হারা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পাখি
হাহাকারে কেঁদে ওঠে, ম্রিয়মান, প্রিয়জন
স্বজন হারানো শোকে।
আর্তনাদ আছড়ে পড়ে আকাশে বাতাসে।

দীর্ঘশ্বাস ভেসে আসে মাটি বুক থেকে।
বলে,- ভয় নয়, কান্না নয়—
নয় কোন হিংসা দ্বেষ, প্রতিশোধ স্পৃহা।
ওপুণ্যগাছের শিকড় রয়েছে আমার বুকে
আছে প্রেমপূর্ণ সেই প্রাণ,
সে যে থেকে যাবে, দীর্ঘদিন, মাস, বছর—
তারো পরে যুগ যুগ ধরে।

একটি মৃত্যু শুধু/প্রমোদ বসু

যে-দিন দুঃখের চেয়ে ভীষণ, আত্মমগ্ন অনুতাপের,
যে দিন লজ্জায় মাথা হেঁট, আমাম দুনিয়ায়,
যে-দিন স্পর্শকাতর রক্তপাতে ভারতবর্ষই অধীর,
সে-দিন অমানবিকতার দিন,
সে-দিন নিজের দিকে থুতু ছিটোতে ছিটোতে
উন্মাদ হয়ে যাবার দিন!

শুধু এক অমোঘ নিয়তির অস্ত্রে
খানখান ভেঙে যাওয়া আমাদের স্বপ্ন ও সাধ,
আমাদের গর্ব ও গঠন,
ধর্মনিরপেক্ষতার কাছে শ্রেষ্ঠ এক 'আত্মবলিদান'।

একটি মৃত্যু শুধু বারবার ফিরে ফিরে আসে
আগুনে পেরেকে, বিষে, হিংসায়, গুলিতে
প্রেমহীন বিশ্বাসে!

শেষ বিদায়ের বেলা/অশোক চট্টোপাধ্যায়

দাউ দাউ জ্বলন্ত চিতার
আরপারে রাজীবের মুখ।
দূরে তিন নীড়ে ফেরা
বিহঙ্গের ডানার বিস্তার
দিনের সূর্য ধীরে ধীরে
পশ্চিম আকাশ সীমা ঘেঁসে।
এইসব দৃশ্য দেখে
উদাস না হতে পারে
ক'জন মানুষ ?

তবুও মানুষ কিছু থাকে
হিংস্রতা কুটিলতা ভরা।
আমাদের অখণ্ডতা,
আমাদের নির্ভরতা
অবহেলে শেষ করে দেয়।

অমরতা নিয়ে তিনি থেকে যান
মানুষের স্মৃতির পর্দায়।

ভারতমাতা/রীণা চট্টোপাধ্যায়

এবারের ছুটিতে যখন যেখানেই যাবো
কাশ্মীরের চিণার ঘেরা ডাল লেকে।
কিংবা রাজস্থানের আবু পাহাড়ে
হিমালয়ের মৌনতায় মুগ্ধ হতে
দার্জিলিং কিংবা অমরনাথের পথে
অথব বৃষ্টি ধোওয়া চেরাপুঞ্জী
কিংবা বৃষ্টিবঞ্চিত গোবিতে—

যেখানেই যাইনা কেন,
দেখার দৃষ্টিটাই এবারে পাল্টিয়ে গেছে।

কন্যাকুমারীর সাগর ধোওয়া
বিবেকানন্দ শিলায়
অথবা সাগর বেষ্টিত
আন্দামানের অলৌকিক বেলাভূমিতে

যেখানেই যাইনা কেন
দেখার দৃষ্টিটাই এবারে পাল্টিয়ে গেছে।

অথচ পরম মমতায় যিনি ভালবাসতে
শেখালেন আমাদের এই বৈচিত্রময় দেশকে—
তাঁকেই সরিয়ে দিয়েছে আমাদেরই
কলঙ্কিত হাত॥

ভারতের মানচিত্র তোমার শরীর/প্রফুল্ল অধিকারী

বাইশটি বুলেট বিদ্ধকরে একটি বুক
লুটিয়ে পড়ে ভারতের মানচিত্র
একটি অঙ্গ নয় বাইশটি শরীর

মৈত্রীর শৃঙ্খল কাটে ঘাতকের ছুরি
অখণ্ড বন্ধনে কাছে আসে
অর্ব্বুদ মানুষ

দধীচীর শীর্ণ অস্থি দুর্বল পাঁজরে
অমোঘ বজ্রের নির্মান
উন্মাদ জল্লাদ জানে না
আশ্চর্য শোনিতরঙে অজন্তা হয় মহাদেশ—
সাদা অন্ধকারে হলুদ আতঙ্কে
তৃতীয় বিশ্বে নামে গভীর বিষাদ

সন্ত্রাসের গিলোটিনে ছিন্ন হয় ভারত প্রতিমা।

যখন ভাঙল/ঋতীশ চক্রবর্তী

সফদরজঙ্গ রোডের আকাশ
উদ্বেল হয়ে উঠছিল
অক্টোবরের শেষ সকাল
ফুটন্ত হয়ে ছুটবে
দেশ থেকে দেশান্তরে
সাগরের সীমানা ছাড়িয়ে।

আকাঙ্খিত জয়ে হাসি মুখ
প্রতি অভিনন্দন মুখ থেকে স্বতোৎসার
নটা পাঁচ মিনিটে আকাশে চিড় ধরলো
নীলাকাশ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

কৃষ্ণচূড়া বা দোলনচাঁপা তাঁর প্রিয়
ঝরনার স্রোতে ছিল তাঁর আত্মনিবেদন
সুসজ্জিত বেশ তাঁর রোদের প্রদোষে
বিস্ফারিত দৃষ্টি তাঁর
প্রত্যয়ে অভিষিক্তময় মুখ।

তবুও ফুলের জলসায় নীরব মানবতা
ইন্দিরা গান্ধী নির্জোট আন্দোলনের দ্যোতক।

ফিরে এলে স্বপ্নের ভারতে/মতি মুখোপাধ্যায়

আলোরও আড়াল থাকে
বনস্পতির মতো কোন কোন মানুষেরও
থাকে কালো ছায়া
তবু আলো তুলনাবিহীন
তবু বৃক্ষ রাজ্যহীন রাজা
কেউ কেউ এরকমই, কারো মতো নয়
প্রিয়দর্শিনী তুমি যেন
উপমাবিহীন এক আশ্চর্য উপমা।
ঢের বেশী শক্তি নাকি বন্দুকের নলে
প্রাচীরেরা বলে
বারুদ গন্ধ ছোটে শতাব্দি পেরিয়ে আরো দূর শতাব্দীতে
তবুও মানুষ
আদিম আঁধার থেকে উটের মতোন
হেঁটে যায় সৌর নিকেতনে
স্বেদ রক্ত অশ্রু দিয়ে একমাত্র সে-ই
লিখে রাখে দিনলিপি তার।
কে তবে শ্রেষ্ঠ জন বলো
আগ্নেয়াস্ত্র নাকি ভালোবাসা
কে ঝোলাবে বরমাল্য, হত্যা কিংবা রক্ত গোলাপ
নিহত হৃদয়ে কার সুতীব্র পিপাসা
যা'নাকি অরণ্য মাঠ পাহাড় কী পশু পাখীদেরও
কাছে টানে
স্বপ্ন দেখায়।
স্বপ্নের ভারত থেকে দূরে যেতে হে প্রিয়দর্শিনী
ফিরে এলে পুনর্বার যেন
স্বরচিত সে তোমারই স্বপ্নের ভারতে।
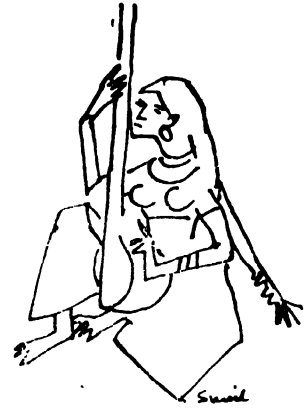
ইন্দিরাজী স্মরণে/কল্যাণ দে

আকাশ থেকে খসেছিল তারা
ত্র্যক্ষর শব্দের বাসভূমিতে বয়েছিল
পুরুষকারের ধারা।
চিনেছিলেম নিজের ভেতর বিরাট বনস্পতি
শস্য-শ্যামল ক্ষেত ধ্বংস করে গেল
সাম্প্রদায়িক হাতি!
ফসল হারা মাঠ যদিও উদাস হল আজ—
ইন্দিরাজীর অবর্ত্তমানে বাড়ল অনেক কাজ।
বিশ দফা কর্মসূচী ছড়িয়ে ঘরে ঘরে
মাতৃঋণ শোধতে হবে বছরে বছরে।

শোকাহত দিনগুলোর পরে/নিভা দে

শোকের ভস্ম উড়িয়ে দিলাম অবশেষে
আকাশে আকাশে—
আবার প্রতিদিনের আমরা
বাজারে হাটে দোকানে—
রুক্ষ ফুটপাতের ধুলোয় নেমে পড়ি
হাতের আস্তিন গুটিয়ে—
নেড়ে চেড়ে টিপেটুপে কানকো দেখে মাছ কিনি
সহকর্মীর টুটি টিপে ধরি ছুতোনাতায়
স্বাদন্তে মাংস চিবুই ঢেকুর তুলি
সব যেমন তেমন—আগের মতন—
মধ্যিখানে কিছু ছায়াছন্ন দিন
বিষন্ন দুপুর অশ্রুর গলিত উৎসার—
এখন থমকে গেছে চোখের কোণে শীতল বরফ
দরজা খুলে দেখার শুধু ভেতর ঘরে হাড়ের স্তূপ—
আমরা কী তবে মানুষ নই ! পশুই শুধু !!
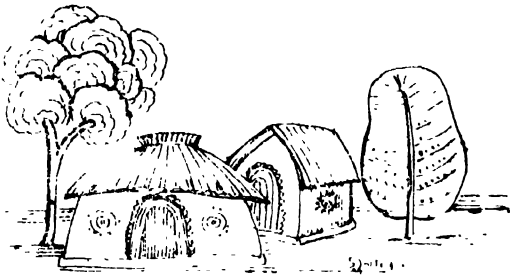
প্রিয়দর্শিনীকে/গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমাকে মানায় সব
এত বেশি মানায় যেখানে মানুষের ইচ্ছের
বিপরীতে যেতে যেতে সাহসী হয়ে ওঠো তুমি
এতো কি জরুরী ছিলো
দিনরাত্রি তোলপাড় সর্বনাস৷
নিয়মকানুনে বেঁধে থাকা

প্রতিদিন এক ভয়ঙ্কর ট্রাপিজে তুমি
যে কোন তরুণীর মতো শূন্য থেকে
ভেসে গেছো উৎরাই পার হয়ে
হয়তো দ্বিধা ছিলো দ্বন্দ্ব ছিলো
বার বার একই খেলা কার ভালো লাগে

সফদরজঙের মাঠে এখনও কুয়াশা নামে
ভোর হয় কুসুমের তাপে
মৃত্যু থেকে শৈশবে ফেরা কি যাবে কোনদিন

স্বপ্নদর্শিনীর জন্য, জহরলাল নেরা

নগ্ন পদযাত্রা, মৌন মিছিল প্রার্থনা সঙ্গীত ভেসে আসে
মাতৃহারা কারা যেন শোকে মুহ্যমান
প্রিয়দর্শিনী স্বপ্নদর্শিনী
তুমি আজ পৃথিবীতে মৃত ঘাস
বুকের বারুদে দেখি নিস্পন্দ প্রলেপ
লেখা হলো একটি নাম

গ্রাম শহরের কল ও কারখানায়
নিভে যায় বাতি ও আগুন
স্বপ্নদর্শিনী ছ্যাখো হেসে ওঠে বাঁকা চাঁদ
এ কেমন নিয়তি !

উনিশ চুরাশির একত্রিশে অক্টোবর হলো ইতিহাস
বেয়োনেট তুলে পৃথিবীতে মির্জাফর আজও নেয় শ্বাস ।
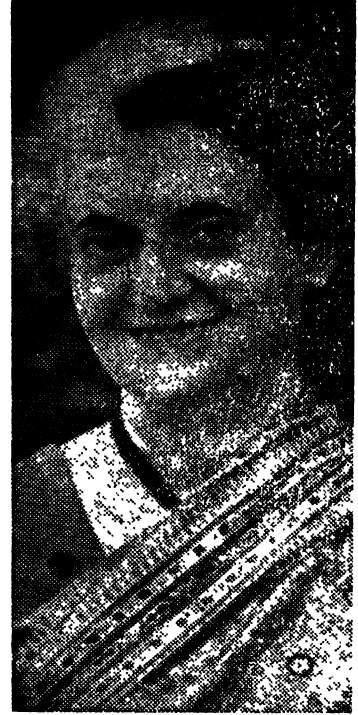
॥ শোক সংবাদ ॥

সারা ভারত ক্ষুদ্র ও মাঝারী সংবাদ পত্র সমিতির সভাপতি, প্রাক্তন লোকসভা সদস্য, প্রেস কাউন্সিল সদস্য ও 'জগৎ' এবং 'একতা সন্দেশ'-এর প্রধান সম্পাদক শ্রীপ্রেমচাঁদ ভার্মা আততায়ীর আক্রমণে বিগত ১২ই ডিসেম্বর এ ১/১২ সফদরজং এনক্লোভের বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন। আমরা তাঁর প্রয়াত আত্মার শান্তি কামনা করছি। তাঁর পরিবার বর্গকে জানাই আমাদের আন্তরিক সমবেদনা।

—গোধূলি-মন গোষ্ঠী

ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু ঃ তিনটি প্রশ্ন

॥ প্রশ্নাবলী ॥

১। শ্রীমতী গান্ধীর মৃত্যু সংবাদ প্রথম শোনার পর ঘটনাটি বিশ্বাস্য মনে হয়েছিল আপনার ?

২। মৃত্যু সংবাদ সঠিক জানার পর আপনার মানসিক অবস্থা ?

৩। ভারতীয় রাজনীতিতে এ ঘটনা কতটা প্রভাব ফেলবে বলে আপনার ধারণা ?
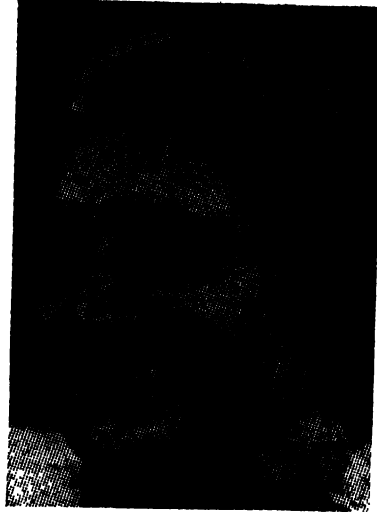
কবি মতি মুখোপাধ্যায়

হুগলী জেলার রিষড়ার ছেলে কবি মতি মুখোপাধ্যায় কর্মসূত্রে বর্ধমানের কুলটির ইসকো'য় যুক্ত আছেন। কবিতা ছাড়াও ইদানীং বিভিন্ন লিটিল ম্যাগাজিনে তাঁর গল্পও বের হয়েছে। বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের জনক এই কবি কবিতা-ভাবনা নিয়ে আলোচনাও করে থাকেন। 'গোধূলি-মনে'র সঙ্গে তাঁর গভীর আত্মীক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের।

(১) কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনি। নিজস্ব রক্ষীর হাতে শ্রীমতী গান্ধীর নিহত হওয়ার সংবাদ অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়েছিল।

(৩) দারুণ একটা অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খল মানসিক অবস্থার শিকার হয়ে পড়েছিলাম। আকস্মিক প্রিয়জন বিয়োগের মতোন একটা আঘাত চেতনায়,········· ঢেউয়ের ধাক্কায় টালমাটাল একটা নৌকোর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল।

(২) শ্রীমতী গান্ধীর আকস্মিক মৃত্যু ভারতীয় রাজনীতিতে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলবে বলে মনে হয়, নানা মতবৈষম্য সত্ত্বেও প্রায় সব রাজনৈতিক নেতারা স্বীকার করেছেন দেশের বর্তমান সঙ্কটকালীন সময়ে

শ্রীমতী গান্ধীর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব ভারতের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। আভ্যন্তরীণ নানা সঙ্কটে যখন ভারতের নানা প্রদেশে ভাষা, ধর্ম ও জাতি বিদ্বেষ এবং বিচ্ছিন্নতাবোধ দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করার প্রয়াস চালাচ্ছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে বেপরোয়া সামরিক সাহায্যদান ও আভ্যন্তরীণ বিভেদকামী শক্তিগুলিকে উস্কানী দিয়ে কিছু বিদেশী শক্তি যখন আমাদের অতি কষ্টার্জিত স্বাধীনতা বিপন্ন করে তুলেছে, শ্রীমতী গান্ধীর অনুপস্থিতি দেশবাসী তখন মর্মে মর্মে অনুভব করছেন। একথা ঠিক হঠকারী দক্ষিণ ও বামশক্তিকে সমদূরত্বে রেখে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে ভারতে বিভেদপন্থী শক্তিগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে এমনকি তাঁর নিজের দল কংগ্রেসেও ভাঙন দেখা দিতে। অবশ্য বিভেদের পাশাপাশি সমন্বয় ও ঐক্যের চেষ্টাও চলবে ব'লে আশা করা যায়।

০ কবি অধ্যাপক জগৎ লাহা

কবি জগৎ লাহা সরকারী কলেজে অধ্যাপনার সূত্রে যখন যেখানে গেছেন, সেখানের লিটিল ম্যাগাজিন এবং তরুণ প্রাণের অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে উঠেছেন। বড় কাগজে যেমন লিখেছেন লিটিল ম্যাগাজিনে লিখেছেন তার চেয়ে অনেক বেশী। গল্প অনুবাদ সাহিত্য উপন্যাস, আলোচনা-সাহিত্যের সব শাখাতেই তাঁর অবাধ গতি। সব বিষয়ের উপরেই তাঁর একাধিক বই প্রকাশিত হয়েছে।

(১) আমি সেদিন তখন দুপুর সাড়ে এগার-বার, কলকাতায় টেমার লেনে বুক সেণ্টারের মালিক গোরাবাবুর সঙ্গে আমার প্রকাশিতব্য বই 'রমণীর মন' এর ছাপাছাপি সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। হঠাৎ ওই কোম্পানির একজন এজেণ্ট এসে খবর দিল—ইন্দিরা গান্ধী তাঁরই সিকিউরিটি গার্ডের বুলেটে সিরিয়াসলি উনডেড হয়ে হসপিটালাইজড্ হয়েছেন, কমসে-কম ষোলটা গুলি লেগেছে। আমি তক্ষুনি ধরে নিয়েছিলাম ইন্দিরা গান্ধী নিহত হয়েছেন। রেডিও, টেলিভিশন তখনো ব্রডকাস্ট করে যাচ্ছে—শ্রীমতী গান্ধী ভীষণভাবে আহত। সব কাজ ভেস্তে গেল। কলেজ স্ট্রীট মুহূর্তে সমাজবিরোধীদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ল। হাওড়া স্টেশনে এসে ঘণ্টা সাত-আট ট্রেনের মধ্যে ভিড়ের চাপে খাবি খেতে খেতে খবর পেলাম ইন্দিরা নিহত হয়েছেন। ট্রেন থেকে কোনোরকমে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে স্টেটস্‌ম্যানের সান্ধ্য বুলেটিনে স্বচক্ষে ইন্দিরার মৃত্যু সংবাদ পড়ে নিলাম। এতো ডিটেলে বলার কারণ আমার মনে মনে বিশ্বাস ছিল—হয়ত মরবেন না, বেঁচে যাবেন ওই শক্ত ধাতের মহিলা। তা হল না। যত শক্তই হোক মানুষ, মানুষ-পশুর আগ্নেয়াস্ত্রের ষোলটা গুলি কখনো ব্রিট্রে করেনা। আমি চোখে শূন্য দেখতে শুরু করলাম। যেমন আমি বিশ্বাস করি না, একদিন মরব; তেমনি বিশ্বাস করতাম না—ইন্দিরা গান্ধী মরবেন, মরতে পারেন। এক মহক্ষয় আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল কতকগুলো লোভী ক্ষমতা-লোলুপ নেতা আর স্বার্থসন্ধানী দেশ সেবকের মুখ। এবার কালনেমির লংকাভাগ শুরু হবে না তো? ... আমি কাঁদিনি। তবে বুকে ভীষণ ব্যথা পেয়েছিলাম। সে ব্যথা কখনো কখনো কবিতা লিখতে বুকের মধ্যে অনুভব করেছি, তেমনি-কিছু, বা তার চেয়ে মারাত্মক আর-কিছু।

(২) বেতার নয়, আগেই বুলেটিনে ইন্দিরার মৃত্যু-সংবাদ চাক্ষুষ করেছিলাম। রাত্রে টি-ভিতে জাতীয় শোকের প্রতিবেদন, সংবাদ, দৃশ্য, ভাষ্য দেখে আর বিশ্বাস করার উপায় রইল না—ইন্দিরা বেঁচে গেছেন, বেঁচে যাবেন। ইন্দিরার মৃত্যু যখন স্বীকার করে নিয়েছি, তখন আমার মনে হল—এবার তরণীর হাল ধরবে কে? অনেকগুলো প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, প্রবৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ নেতার মুখ মনে পড়ল। মনে মনে হাসলাম—এঁরা? সর্বনাশ '......ইন্দিরা এমন কাণ্ড করে গেলেন যে একজনও উত্তরসূরি রেখে যেতে পারলেন না; না নিজের দলে, না অন্যান্য দল-অদলে। কৃষ্ণের মতো যদুবংশ ধ্বংস করে গেলেন। তখনো রাজীবের কথা মনে পড়েনি। রাজীবের মতো একটা শোভন সুন্দর ভদ্র শান্ত লোক প্রধানমন্ত্রী হবেন, ভাবতেও পারিনি।

(৩) রাজীব প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন জেনে আমারও মনে হয়েছিল, বরং ভালো হল, নতুবা যেরকম খেয়োখেয়ি শুরু হত,—ভাবতেও আতঙ্ক জাগে।

অশোকবাবু, আমি রাজনীতির লোক নই। তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা রাজনৈতিক ভাবেই দিতে হয়। মুরোদে কুলোবে না। বরং বরুণ সেনগুপ্ত কুলদীপ নায়ার খুশবন্ত সিং প্রভৃতিকে জিগ্যেস করুন। অথবা প্রণব বরকত জ্যোতি-সরোজবাবুদের। ৩৭ বছর দেশ স্বাধীন হয়েছে। দেশের প্রগতি হয়নি, কে বলবে। হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের সত্যকার দেশনেতারা যা চেয়েছিলেন তা হয় নি। দেশের কলুষ বেড়েছে। ভাঁড়ে মা-ভবানী। এখনো শতকরা ষাট জন মানুষ অভুক্ত থাকে। গ্রামে গ্রামে একটা করে 'টিউকল' হয় না, প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা যায় না। অ্যাটম বোমা, রকেট, টি ভি রিলে সেণ্টার—প্রগতির কি দ্রুতগতি। অথচ প্রতি গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা পর্যন্ত করা গেল না। দল বিশেষকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ভারতীয় মাত্রেই অসৎ। ভারতীয় মাত্রেই ভুক্তভোগী। 'এ আমার এ তোমার পাপ'। বিশ্বাস করুন, নিজেকে ভারতীয় বা বাঙালী ভাবতে লজ্জা করে। মুখে বলি 'ঐতিহ্যপূর্ণ'—কিসের ঐতিহ্য! দেশে ঐতিহ্য নেই। দেশে অদ্ভুত এক আঁধার এসেছে। যারা অন্ধ, তারা সবচেয়ে বেশি দেখে চোখে। চক্ষুষ্মান তো গুটিকয়েক ভাগ্যবান ব্যক্তি!

ইলেকশন আসছে। ডিউটি পড়েছে। ভালোয়-ভালোয় সেরে আসি। সেই আশীর্বাদ করুন। অবিশ্যি তার পরেও হয়ত বিশ/বাইশ বছর বেঁচে থাকতে হবে। পেনশন না নিয়ে মরব না। সুন্দর ভুবনে কে আর মরতে চায় বলুন।

০ ডাঃ (ক্যাপ্টেন) সমীরকুমার দত্ত

সেনাবাহিনীতে ডাঃ হিসাবে যোগদান করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে গিয়েছিলেন যে মানুষটি এবং এখন আর্তের সেবায় নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছেন আই এম এ ভদ্রেশ্বর শাখার যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে। আসলে তিনি মনেপ্রাণে একজন কবি। আলোচনার সময় স্মরণ থেকে অনর্গল উঠে আসে কবিতার লাইন।

(১) প্রথমেই মনে হয়েছিল গুজব। কারণ ইন্দিরা গান্ধীর মতো দুর্দিনের কাণ্ডারী দেশহিতৈষী মানুষকে মারার মতো অমানুষ থাকতে পারে—নিতান্তই বিশ্বাসের অযোগ্য। এমনকি বি, বি, সি নিউজ-টাকেও অসত্য মনে হচ্ছিল।

(২) যখন ইণ্ডিয়ান নিউজ রেডিওতে পেলাম, মনে হয়েছিল এত ব্যক্তিত্বপূর্ণ নেত্রী, আন্তর্জাতিক বন্ধু, প্রখর রাজনীতিবিদ এবং ধুরন্ধর প্রশাসক কি সাথে সাথেই পাওয়া যাবে? না কি যতদিন কোন নেতা সেই স্তরে না আসছেন, ততদিন ভারতকে এক দুঃসহ দুর্দিনে কাটাতে হবে?

(৩) প্রথম অবস্থায় একটু অস্থিরতা বিরাজ করলেও ভারতীয় রাজনীতি এমতাবস্থায় বেসামাল হবে না এই জন্যই যে, আমাদের ভাবী নেতা তাঁর জোট-নিরপেক্ষতা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, জাতীয় সংহতি, সংখ্যা-লঘুস্বার্থ, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি ইন্দিরা সরকারের অসংখ্য নীতি থেকে খুব দূরে যাবেন বলে মনে হয় না। জহরলাল বেঁচে থাকতেও প্রশ্ন উঠেছিল— Who is after Nehru? সেদিনের দ্বিধাজড়িত ভারতবাসীকে 'প্রিয়দর্শিনী' দেখিয়েছিলেন কি করে দেশবাসীর কাছে আরও প্রিয়তর হওয়া যায়, কি করে সময়ের সঙ্গে পদক্ষেপ রেখে জগৎসভায় ভারতবর্ষের স্থান বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করতে হয়।

ইন্দিরা গান্ধীর একটা বিশেষ কথা মনে পড়ছে—সেটা ৭১ এর যুদ্ধের ঠিক আগে ইণ্টার ন্যাশানাল বর্ডারে আমাদের জানিয়েছিলেন ওয়ারলেস সেটে। বাংকারের মধ্যে বসে শুনছি—

"প্রতিবার আমরা যুদ্ধে যাই, আমাদের সেনারা এগিয়ে এসে অনেক জায়গাও দখল করেন। কিন্তু রক্তের বিনিময়ে অধিকৃত স্থান ত্যাগ করে আমাদের আবার পিছনে ফিরতে হয় বিশ্বের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির চেষ্টায় ও চাপে। এর ফলে সেনাদের মনোবল যায় ভেঙে। কিন্তু এবারে আমরা এগিয়ে যাব একেবারে লাহোর পর্যন্ত—এবং জায়গা ছেড়ে ফিরে আসবো না। এর ফলাফল যা-ই হোক। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মনোবল চিরদিন অটুট আছে আমি জানি। আপনারা সেটা আরও উর্দ্ধে তুলে ধরুন"।

উইলে সই করার সময় মন যতই বিষন্ন বোধ করুক, যুদ্ধ থেকে জীবিত ফিরে আসবো কিনা এ চিন্তা যতই ভাবাক্রান্ত করুক ইন্দিরা গান্ধীর কয়েকটি কথা আমাদের দমে যাওয়া মনকে চাঙ্গা করে দিল।

O 'গোধূলি-মন'-এর জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯১ সংখ্যা পেলুম। জ্যোতির্ময় বসুর চিঠিটি আন্তরিক উত্তাপে স্বয়ং সম্পূর্ণ। এ শুধু আপনি একাই পেলেন না। পেলুম আমি—আমরাও। (আপনার পাওয়ার মধ্যে আমাদের পূর্ণতা)। এখানেই মনে হয়, বেঁচে থাকার দাম আছে। এখানে পঁচিশ টাকা, মাত্র পঁচিশ টাকা নয়, পাঁচ শতেরও অধিক। প্রসঙ্গক্রমে, গোধূলি-মন আগামী ১৩৯২-র বৈশাখ সংখ্যার আগে আমার কিছু বলার আছে প্রিয়জন হিসেবে। ঠিক সময় এলেই বলব। এবং আপনাকে শুনতেই হবে।

এক্ষণে শারদীয়া 'গোধূলি-মন' এর জন্য একটি ছোটগল্প পাঠালুম। আপনি পুরোটাই পড়ে দেখবেন। অন্য ভাবে, অন্য ঢঙে প্রতীক নির্ভর গভীরতাপূর্ণ লেখা—আশাকরি আপনি বুঝবেন সেটুকু। 'গোধূলি-মন' এর কিছু ধ্রুপদী পাঠক আছে বলেই আমার বিশ্বাস। অতএব গল্পটির মর্মলোকে তাঁরা ঢুকতে পারবেন, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। গল্পটির কোন মূল কপি আমার কাছে নেই। কষ্টসাধ্য ঐ পরিশ্রমটুকুর সময়টা অন্য লেখায় লাগাবো বলে টাকা ধার করে Registar Post-এ পাঠালুম। অতএব এবার আপনার ব্যাপার.........।

হ্যাঁ, একটা কথা না বলে পারছিনা 'ঈগলের' অশোক চট্টোপাধ্যায় এবং আপনি উভয়েই সম্পাদক ও লেখক। একই নাম। ভাবীকালের ইতিহাসে আপনাদের উত্তরসূরীরা অসুবিধায় পড়বে না? এখনি স্বতন্ত্রভাবে কিছু করা যায় না? অন্ততঃ সম্পাদক হিসেবে আপনার স্বাতন্ত্র আজ তর্কাতীত বিষয়। তাই বলছিলুম.........

শরীর তীব্র অসুস্থ। মন ভালো নেই। এরই মধ্যে অনেক কথা লিখলুম। চিঠিতে ভ্রান্তি ও প্রতিক্রিয়া জানতে দিয়ে খুশী করলে ভালো লাগবে। অতএব পত্রপাঠ আপনার চিঠি পাই।

প্রীতি ও উষ্ণ উত্তাপ সহ
সোফিওর রহমান

* * * *

O 'গোধূলি-মন' মহিলা সংখ্যা এবং শারদীয়া সংখ্যা পেয়েছি। তারপর চিঠিও। নানা অনিবার্য ব্যস্ততার জন্য উত্তর দিতে দেরী হলো।

কাঁচা পাকা লেখা নিয়ে মহিলা সংখ্যাটি বৈচিত্র ও বৈশিষ্টপূর্ণ হয়েছে। পরিকল্পনাটির সামাজিক ও সাহিত্যগত তাৎপর্য ও গুরুত্ব আছে। সাধুবাদ জানাই। শারদীয়া সংখ্যার প্রচ্ছদটির কাগজ একটু হাল্কা রঙের হলে আরও সুন্দর হতো। লেখাগুলিও সুসম্পাদিত। পত্রিকার মান ক্রমশঃই উন্নত হচ্ছে। 'গোধূলি-মন' সম্পর্কে আমি খুবই আশাবাদী। পত্রিকাটি সুপাঠক গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

প্রীত্যন্তে
সৌমেন অধিকারী
রবীন্দ্রভবন শান্তিনিকেতন ১৪ই নভেম্বর ৮৪

* * * *

O জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১ সংখ্যা 'গোধূলি-মন'-এ শ্রীঅজিত রায় লিখিত নিবন্ধে তথ্যের অনেক গোলমাল। তবে, বহু তথ্য তিনি যোগাড়ও করেছেন, সেটাই যথেষ্ট। শারদ ১৩৯১ সংখ্যা মহাদিগন্তে—এ সম্পর্কে বেশ কিছু নথিপত্র আছে, যদিও তাতে তথ্যের গোলমাল যায়নি।

শ্রী রায় ইচ্ছে করলে পাতিরাম থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। ভবিষ্যতে তিনি কিছু লিখলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে ভাল হয়। শুভেচ্ছাসহ—

মলয় রায়চৌধুরী
A 316 ইন্দিরা নগর, লখনউ 226016
২২শে আশ্বিন ১৩৯১

GODHULI-MONE N. P. Regd. No. RN. 27214/75 December '84 (অগ্রহায়ণ ১৩৯১)
Vol. 26, No. 12 Postal Regd. No. Hy-14 Price—Rs. 2·00 only

"দেশের সেবা করবার জন্য যদি আমার মৃত্যুও ঘটে তবে তার জন্য আমি গর্ব্ব অনুভব করবো। আমি নিশ্চিত যে আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু দেশের সমৃদ্ধি অর্জনে সাহায্য করবে এবং তাকে সুদৃঢ় ও উন্নত করে তুলবে।"

৩০শে অক্টোবর ১৯৮৪

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

84/175

…াদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পপুলার প্রিন্টার্স, বারাসত, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও নতুনপাড়া, …নগর হইতে প্রকাশিত।